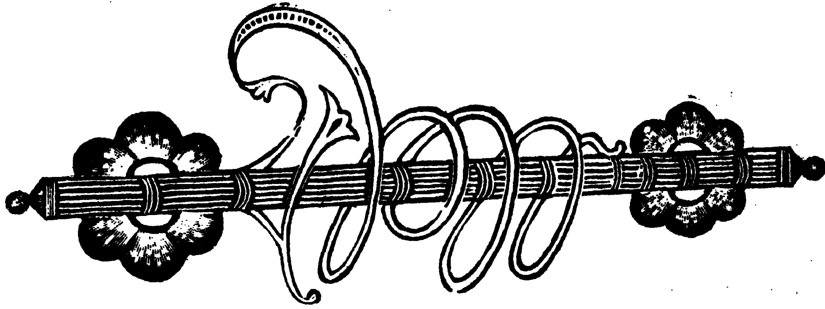


অতুলনা

Himani Press, Calcutta.



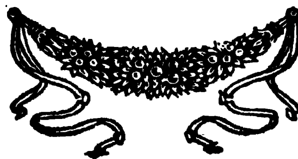
তৃতীয় বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৪। [১ম সংখ্যা

খেলার শেষে

শ্রীকালিদাস রায়

দিনের বেলায় পথের ধূলায়
খেলায় খেলায় রইনু মাতি ;
তোমায় মাগো ভুলিয়ে দিল
খেলনা এবং সঙ্গী-সাথী ॥
তাই বলে' কি কখনো মা'য়
ভুলে থাকে আপন বাছায় ?
হাজার কাজের মাঝেও আছ
এদিক পানে কানটি পাতি' ॥

মায়ের দরদ ঢের বেশী, তাই
ছেলে হেথায় খেলায় মাতে,
সকল খেলায় মনটি মায়ের
রয় যে ছেলের সাথে সাথে।
দিন ফুরালে ফিরতে ঘরে,
দেখ্‌ব দ্বারের সোপান' পরে,
পথ পানে মা চেয়ে আছ
হাতে লয়ে সাঁজের বাতি।



বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

১। বঙ্গ-ভাষার রচনা ও প্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় মনীষিবৃন্দের ন্যায় অনেক বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিও আলোচনা করিয়াছেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ভাষাও পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে পারে নাই। প্রাচীনকালে যে সব মৌলিক ভাষা ছিল, এখন সে সকলের মধ্যেও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে আমাদের এসিয়া মহাদেশই ভাষার জন্মদাতা। ইরাণ প্রদেশের উদ্ভূত এক আদিম ভাষা হইতেই ইউরোপের গ্রীক্, লাটিন্, জর্ম্মান্, স্লাবোনিয়ান্স প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি। পারসীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এই জেন্দ ভাষায়ই লিখিত। এ সকল কথার বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিতে হইলে বহু সময়ের প্রয়োজন। এখানে ভাষার নানা পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিতেছি। বেদ ভারতবর্ষের আদিম গ্রন্থ। বেদের বয়স লইয়া তর্কযুদ্ধ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বেদের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু সে সংস্কৃত ও তাহার নিয়ম অন্য কোনরূপ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের অনেক পরে বৈদিক সংস্কৃতের বহু পরিবর্ত্তন সহকারে মনু ও বাল্মীকির রামায়ণ বিরচিত হয়। রামায়ণের বহু পরবর্ত্তী যুগে মহাভারতের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বহু পরিবর্ত্তন ঘটে, সেজন্যই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষার মধ্যে বহু অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের পর বহু শত বৎসর কেবল পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। রাষ্ট্র-বিপ্লব ইত্যাদিও তাহার অন্যতম কারণ। এ সময়ের পরবর্ত্তীকালে ক্রমাগত নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবিকুলরবি কালিদাসের উদ্ভব, তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী ভাষা বিজ্ঞজগতকে যে অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল সে মধুর ধারা অদ্যাবধি সমভাবে দেশ দেশান্তরের পণ্ডিত মণ্ডলী ও কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির রসাল চিত্ত সুরসাল করিতেছে। কালিদাসের যুগে সংস্কৃত অভিনব যৌবনশ্রী ধারণ করিয়াছিল। এ সময়ের পরে তান্ত্রিক সংস্কৃত দেশে বিস্তার লাভ করে। ভাষার পরিবর্ত্তন, বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণের তারতম্যানুযায়ী ঘটে একথা বলা যাইতে পারে। ধীরে ধীরে বহু পরিবর্ত্তনের পর ভাষার অতি আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তরিত হয়, সে বৌদ্ধযুগে। সে সময়ে সংস্কৃত হইতে যে ভাষার সৃষ্টি ঘটে তাহার নাম গাথা। এই গাথার ভাষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ সরল ও শ্রুতি-মধুর করিবার নিমিত্ত ব্যঞ্জন ও স্বরের পৃথক্ করিয়া এবং স্থানে স্থানে বিভক্তির লোপ বা উদ্ধার দ্বারা বিভক্তির কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া শ্রুতি-মধুর করা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই গাথা-ভাষা প্রায় তিন শত বৎসর পরে রাজা অশোকের সময় 'পালি' নামে পরিচয় লাভ করে। এই পালি ভাষা দেশদেশান্তরে ব্যাপ্তি লাভ করে। অদ্যাপি সিংহলে এই ভাষা প্রচলিত। রাজা অশোকের গৌরব-দীপ্তি লুপ্ত হইবার পরে তাঁহার রাজত্বের প্রায় শতবর্ষ পরে সংস্কৃত ও পালি ভাষার অপভ্রংশরূপে 'প্রাকৃতের' সৃষ্টি হয়। অতি পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষা ছিল কিনা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন, যদি 'প্রাকৃত ভাষা' পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিত

তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাণিনির ন্যায় প্রাচীন বৈয়াকরণিকের ব্যাকরণে কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। যখন সে নিদর্শন নাই, তখন সেকালে 'প্রাকৃত' ভাষা ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত যুগে অর্থাৎ সংস্কৃতের অপভ্রংশ কালে মূল সংস্কৃত হইতে **প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়, শৌরসেনী, পিশাচী** প্রভৃতি নানাভাষার উদ্ভব ঘটে এবং দেশ দেশান্তরে ঐ সকল ভাষা ছড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে কোন্ অপভ্রংশ ভাষা হইতে কিরূপ রূপান্তরিত ভাবে কোন্ ভাষার পরিণতি তাহা কৌতুহলোদ্দীপক এবং অনুসন্ধানযোগ্য। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান রূপ ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে এখন তাহারই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালাভাষা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ভাষা। সমুদয় প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায়ই অধিক-সংখ্যক লোক কথা বলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অঃ আদম সুমারীতে ৪৮, ৩৬৭, ৯১৭৫ আটচল্লিশ কোটি তিন শত সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার একশত পঁচাত্তর জন লোক বাঙ্গলাভাষায় কথা বলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা বিরানব্বুই জন বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলেন। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম অঞ্চলেরও কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা বাঙ্গালা ভাষায়ই কথাবার্ত্তা বলেন। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশ সমূহে বঙ্গভাষার আকৃতিগত ও উচ্চারণগত ঐক্য-মূলক ভাষা উড়িয়া, মাগধি এবং মৈথিলি। বঙ্গের পশ্চিমে এবং উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে আসামী ভাষা প্রচলিত। হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র যেমন আধিপত্য লাভ করিয়াছে বাঙ্গালাদেশের উপরও তেমনি তাহার প্রভাব নেহাৎ কম নয়। শিক্ষা, সভ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সহিত যতই যোগসূত্র বিস্তৃত হইতেছে ততই ভাষার আকার ও রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আজ তাই পার্ব্বতীয়া বা নেপালি, ভূটানি, লেপ্‌চাদের ভাষা, সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডারি প্রভৃতির ভাষাও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালী তিব্বতীয়দের ভাষার সহিতও পরিচিত হইতেছেন। কাছাড়ী, মণিপুরী, লুসাই, আরাকানী, কুকি, চীন, বর্ম্মন্ ও তাহার মিলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য আর্য্য ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। বিবিধ আদিম অধিবাসিগণের ভাষার রূপ ও প্রকৃতি যেমন কথিত ভাষার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতেছে তাহারাও তেমনি আপনাদের ভাষাকেও অনেকস্থলে বিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকেও কথিত ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে। ভারতীয় আর্য্য ভাষাকে নিম্ন-লিখিতরূপে ভাগ করিয়া লইলে আমাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

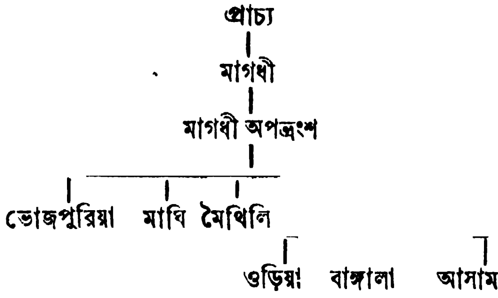
ভারতীয় আর্য্যভাষা হইতে বৈদিক ভাষা (Classical Sanskrit) বা সাধু সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত,—ইহা প্রাচীনতম খোদিতলিপি সমূহে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। পালি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রাকৃত এবং বিবিধ ভাষার অপভ্রংশ ভাগ একয়টি পরিবর্ত্তনের রূপান্তর হইতেই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে প্রাচীন সিংহলী ভাষা ও বর্ত্তমান সিংহলী ভাষার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ভারতীয় আর্য্য-ভাষা

(১) ইরানি শাখা ভারতীয় আর্য্য-ভাষা

ভারতীয় আর্য্য ভাষা—এখানে বৈদিক ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ অঃ রচিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। বৈদিক ভাষার পরে **প্রাচ্য** ভাষার

বা কোশল দেশীয় ভাষার কথা স্মরণীয়। বুদ্ধদেবের সমকালে পূর্ব্ব ভারতে এই প্রাচ্য ভাষার প্রচলন ছিল। এখানে নিম্নলিখিত রূপে ভাষার রূপান্তর লক্ষ্য করিতেছি।



এই ভাবে ভারতীয় আর্য্য ভাষা গান্ধার, পাঞ্জাব, গঙ্গা নদীর উপত্যকা ভাগ, উদীচ্যরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। উদীচ্য হইতে খারোষ্ঠির উদ্ভব।

খারোষ্ঠি ভাষায় অশোক রাজার অনেক অনুশাসনলিপি যুক্ত প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। খারোষ্ঠির তৃতীয় রূপান্তর বর্ত্তমান **সিন্ধি** ভাষা। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের গুজরাট অঞ্চলে প্রথম **প্রতীচ্য** ভাষার রূপ আপনাকে প্রকাশ করে। গিরণর পাহাড়ের অশোক অনুশাসন এই ভাষায় লিখিত। **মধ্যদেশ** অর্থাৎ কুরু পাঞ্চাল অঞ্চলে বা দোয়াব প্রদেশে শৌরসেনী, শৌরসেনীর অপভ্রংশ ইত্যাদি পশ্চিমা হিন্দী এবং উহা হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী—হিন্দী ও উর্দ্দূ, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, বুন্দেলী, ব্রজভাষা ইত্যাদি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচ্য ভাষার ক্রমবিকাশানুযায়ী যে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে সে কথা একটু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ওদিকে দাক্ষিণাত্য বা রাষ্ট্রিকা হইতে মহারাষ্ট্রী, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, মারহাট্টি এবং কঙ্কনী ভাষার উদ্ভব। সংস্কৃত—উদীচ্য হইতে রূপান্তরিত ভাবে পাণিনির ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপর সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে গাথার উৎপত্তি একথাও পূর্ব্বেই সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে দেখিতে পাই যে ভারতীয় আর্য্য ভাষা কত রূপে, কত ভাবে, কত পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে যে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে কথাও বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বুদ্ধদেবের সময় বঙ্গলিপির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে সময়ে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত ছিল কিনা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাকৃত ভাষা পাণিনির সময় প্রচলিত ছিল কিনা তাহারও প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই না। থাকিলেও তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। "কারণ পাণিনি নিজ অষ্টাধ্যায়ীতে **'ছান্দস'** ও **'ভাষা'** এই দুই শব্দ দ্বারা বৈদিক ও তাঁহার সময়ে প্রচলিত' লৌকিক সংস্কৃত ভাষারই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময়েও সংস্কৃত যুগই চলিতেছিল। * * তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সাধারণে যে ভাষা বুঝিত, তাহা 'গাথা' নামে ধরা হয়। *** তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও মধ্যবিত্তদের নিকট গাথাই চলিত ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল।" *

প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী **সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম** ও **দেশী** এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীর মধ্যে পালিকে **তৎসম,** অর্দ্ধ মাগধীকে **তদ্ভব** শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে চণ্ডাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত লক্ষণে, হেমচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। **প্রাকৃতচন্দ্রিকায়** কৃষ্ণপণ্ডিত ছয়ত্রিশটি বিভিন্ন দেশপ্রচলিত প্রাকৃত এবং সাঁতাইশটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাকৃত চন্দ্রিকা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। অতএব এই প্রমাণটুকু পাইযে ঐ

* বিশ্বকোষ—বাঙ্গালা ভাষা।

সকল প্রাকৃত ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীতেই ব্যাকরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অনেকের মতে পূর্ব্ব মাগধী ভাষার অন্তর্ভুক্ত আমাদের বাঙ্গালা ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গের বাহিরেও যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস কিংবদন্তীমূলক হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। সিংহলীদের ভাষাও ভারতীয় আর্য্যভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার সহিত ভারতের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস এই যে বাঙ্গালার বিজয় সিংহ নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার জন্মভূমি ছিল লালা (Lálá) নামক স্থান। এই লালা বা লাল স্থানটি কোথায় ছিল? কাহারও কাহারও মতে ইহা বঙ্গ বা পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কেহ বলেন পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলেন যে নির্ব্বাসিত বিজয় উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ দ্বারা গুজরাট সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লাল প্রদেশ হইতে সিংহল গিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার ঐতিহাসিকেরা বলেন,—খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে সিংহলের যোগ স্থাপিত হয়। সিংহলিরা সে সময়ে মগধের সহিতও যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মূলেও বঙ্গের অধিবাসিবৃন্দের যোগ ছিল।* মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালার সঙ্গে সিংহলের যে বিশেষ যোগ ছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই। সিংহলেও ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাকৃত যে প্রচলিত ছিল সিংহলের প্রাচীন খোদিত লিপি-সমূহ হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সে ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বিজয় সিংহের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা যে সিংহলেও যাইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা কিংবদন্তীমূলক হইলেও বহু-ভাষা-বিদ্ পণ্ডিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সিংহলের পালি ভাষায় লিখিত ইতিহাস দীপবংশ বা মহাবংশ হইতে বিজয় সিংহ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা সিংহবাহু পূর্ব্ব বঙ্গের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীর জয় যাত্রা প্রাচীন যুগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অস্ত্রের ঝন্ ঝনা ব্যতীতও যে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল তাহা ইতিহাস সত্যরূপে আমাদের নিকট দিন দিন প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষাও তখন দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

পালি ভাষাও এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—Pali as a literary language seems to have been established during the transitional M. T. A period (200 B. C.—200 A. C,) ক্রমশঃ এই ভাষা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ভারতবর্ষ, সিংহল, এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধজাতকের ন্যায় সর্ব্বজনপরিচিত গ্রন্থ পালি ভাষায় বিরচিত। ভারতীয় আর্য্য ভাষা মগধ হইতেই বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। মগধবাসী-বণিক, রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, সৈনিক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মপ্রচারকগণ দলে দলে অর্থলালসায় ও ধর্ম্ম প্রচার জন্য বাঙ্গালা দেশে আসিয়া অনেকে সুজলা সুফলা ও শস্যশামলা বাঙ্গালাদেশেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও ভাষার সৌন্দর্য্য বাঙ্গালার পূর্ব্বতন অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করিল। তাহারই ফলে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ও নূতনতর শিক্ষাকে প্রিয়তর মনে করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সহজেই আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন সহজেই আর্য্য ভাষাকে

* Later, from the 3rd century B. C. downwards, Ceylon seems to have come in touch with Magadh, through Bengal, and traditions of intimate relations between Bengal & Ceylon are preserved in medieval Bengali Literature.

গ্রহণ করিলেন তখন নিম্নশ্রেণীর পক্ষে উহাকে গ্রহণ করিতে তেমন কোন বাধা উপস্থিত হইল না। এদিকে আবার মগধ, কাশী ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে দলে দলে নিম্ন শ্রেণীর জনগণও বাঙ্গালাদেশে আসিতে আরম্ভ করিলে, তাহারই ফলে অতি সহজেই বাঙ্গালাদেশে আর্য্যভাষা প্রচলিত হইল নূতনের এই অভিযান পুরাতনের আসন টলাইয়া দিল। অনেকের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) এবং বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে আর্য্যভাষা অনেকটা পরে প্রচারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক সুনীতি বাবু বলেন * * * This early contrast betweon an advanced and Aryanised North and West Bengal, and rather backward East Bengal, possibly differing linguistically and racially (in having a prominent Tibeto-Burman element) from West Bengal, is at the root of the contemptuous use of the term বাঙ্গাল—Bangal for an inhabitant of East Bengal (Vang-ala) even at the present day when the name Vanga has been extended west to Pundra and Radha (Jointly known as Chanda-desha.) সুনীতিবাবুর এই অদ্ভুত যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। যে যুগে আর্য্যভাষা ভাবী মগধ, কাশী কোশলের লোকেরা উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে আনিতে পারিলেন, সে যুগে পূর্ব্ববঙ্গের পথটা কি তাঁহাদের নিকট সুদূরদেশ ছিল?—'বাঙ্গাল' শব্দ ঘৃণাব্যঞ্জক নহে। বঙ্গ হইতেই যে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাদেশের উৎপত্তি। ইহা যে বাঙ্গাল শব্দের ব্যবহার ভাষা ইত্যাদির ভেদজনিত ভাবে সে যুগে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা বলিতে পারি—ঐ যুগের প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হইতে বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার কি সুনীতিবাবু দেখাইতে পারেন? অনুমানের উপর কোন কথা ব্যবহার করা অনাবশ্যক।

প্রাচীন খোদিতলিপির মধ্যে বাঁকুড়াজেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের খোদিত লিপি হইতে চন্দ্র বর্ম্মন নামক একজন রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি সিদ্ধবর্ম্মনের পুত্র, পুষ্কর্ণের রাজা এবং চক্রস্বাধীন্ অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। এই লিপি ব্রাহ্মি অক্ষরে খোদিত। পুষ্কর্ণ পশ্চিম বঙ্গের কোনও স্থানে হইবে বলিয়া মনে হয়। এই খোদিত লিপি প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে দেখা যায় যে চন্দ্রবর্ম্মনই বাঙ্গালীর প্রাচীনতম নৃপতি। তিনি চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে (চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) রঘু কর্ত্তৃক বঙ্গ ও সুদেশ জয়ের কথা আছে। ভাষপ্রণীত প্রতিজ্ঞা যৌগান্ধায়ন নাটকে লিখিত আছে বাঙ্গালার রাজপরিবারের সহিত উত্তর ভারতের রাজ পরিবারের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিত এবং তাঁহারা তুল্য বিবেচিত হইতেন। ভাষ কবি কালিদাসের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীরও পূর্ব্বে। এযুগে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

সে যাহা হউক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গলিপির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও বঙ্গভাষায় স্বতন্ত্র নামাকরণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগী গুপ্তাধিকারের সময় সংস্কৃত শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রবেশ লাভ করিলে সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য গৌড়ভাষার নামকরণ হইয়াছিল। এসময়ে বাঙ্গালার প্রাচীন খোদিত লিপিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভূসম্পত্তি দানের লিপিই অধিক। সে সকল তাম্রশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে—মধ্যদেশ বিনির্গত ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয়না। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে ফাহিয়ান্ যখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বঙ্গদেশে আর্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাষার প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তিতে একটী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র দেখিতে

পাইয়া সেখানে দুই বৎসর অবস্থান করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ানচাঙ্ বা হিউয়েন্থসাঙ্গ যখন বাঙ্গালাদেশে আসেন তখন তিনি সমস্ত (পূর্ব্ববঙ্গ) অঙ্গ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, উত্তর ও মধ্যবঙ্গে শিক্ষা, সভ্যতা এবং ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইউয়ানচাঙের ভ্রমণ কাহিনী হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আর্য্যভাষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন আসামের পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ণ সুবর্ণে কিরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল সে কথার তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই।

বাঙ্গালাদেশে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ অব্দে আর্য্য প্রভাব বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে মগধ ও বাঙ্গালায় একটি সুবিস্তৃত স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়িতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাব বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এইভাবে রাজ পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন জনসমাজের মিশ্রণে ভাষার মধ্যেও বিবিধ রূপান্তর ঘটে। তাহারই ফলে—মাগধী অপভ্রংশের রূপান্তর বাঙ্গালা ভাষা, আসামী, উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী ও ভোজপুরিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল। ইউয়ানচাঙের ভ্রমণকাহিনী হইতে বেশ বোঝা যায় যে সে সময়ে বিহার, বঙ্গ, আসামের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একই ভাষা প্রচলিত ছিল। আসামীয়া ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষাকে এক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মগধান্ ভাষার সহিত অবশ্য অনেকটা পার্থক্য রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষা—বাঙ্গালা ও আসামীর রূপান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। প্রাকৃত ভাষা বা অপভ্রংশ ভাষা এইভাবে বঙ্গদেশ আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পূর্ব্ব মগধান্ ভাষা হইতে – বাঙ্গালা, আসামী ও ওড়িয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য মগধান্ হইতে ভোজপুরিয়া, নাগপুরিয়া এবং সাদনি ভাষার উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানাদেশীয় লোকের গৌড়বঙ্গে আগমন এবং তাহাদের এখানে স্থায়ী অধিবাস হেতু প্রাচীন গৌড়ীয় ভাষায় ভারতীয় অপরাপর ভাষারও নিদর্শন রহিয়াছে।

আমরা যে সমুদয় কথার আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে ইহা বেশ সপ্রমাণ হইতেছে যে গৌরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হইতে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যায়। বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতেরই অনুরূপ। প্রাকৃত ও বাঙ্গালার শব্দ সাদৃশ্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের খাঁটি পরিচয় আমরা পাই বৌদ্ধযুগে। এই যুগে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত একটা প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করে। সে সময়ে দেশমধ্যে নানাদেশের নানা ভাষার উচ্ছল স্রোতও খরভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু স্থবির বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধযুগে আমরা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় পাই তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই যুগে পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন—তাঁহার নাম দীপঙ্কর অতিষ শ্রীজ্ঞান। তিব্বত রাজ ইঁহাকে ১০৩৮ সালে তিব্বত লইয়া যান। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে তিনি নিজকে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'একবার সাধন,' 'বলবিধি', বজ্রাসন গীতি, চর্য্যানীতি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্ম্ম ইত্যাদি তাঁহার বিরচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে "তাঁহার অনেকগুলি সংকীর্ত্তনের পদাবলী ছিল।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হাজার বছর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হাজার বছরের পুরাণা বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা Buddhist songs and Cholets

in the Bengali language a thousand years old, এই বইখানার পাণ্ডুলিপি শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহা ছাপা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি ঠিক নয়। এই দোঁহা ও গানগুলি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে। এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। রাখাল বাবুর কথা মানিয়া লইলেও আমরা একথা বলিতে পারি যে এই গান ও দোঁহা প্রায় ছয় শত বৎসরের প্রাচীন। সে কালের বাঙ্গালা কেমন ছিল তাহা আপনাদের শুনাইবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের দোঁহা হইতে আমরা একটী পদাবলী উদ্ধৃত করিলাম :—

টালত মোর ঘর নাহি পড় বেশী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড় ছিলা জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে আমার॥
বসত বি আগ্রল গরিয়া বাঁঝে।
পিটা দুহি এ তিনা সাঁঝে॥

এইরূপ দোঁহা ও গান আরও সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে তাহার কয়েকখানার নাম করিলাম। (১) দোঁহা কোষ (২) ডাকার্ণব মহাযোগিনী তন্ত্র রাজ্য। ইহা একখানা বৌদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থ। এ বই খানা কয়েকটী পাতাল অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই প্রাচীনতম দোঁহা হইতেও আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাই। এই দোঁহা ও তন্ত্রের ভাষা প্রাকৃত। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার রূপ ও প্রকৃতি জানিতে হইলে এই বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, দোঁহাকোষ ও তন্ত্র আলোচনার যোগ্য। অতএব প্রাচীন বাঙ্গালায় ভাষার রূপ ও আকৃতি কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে অন্য আলোচনা অনাবশ্যক।

আজ এখানেই আমাদের কথা শেষ করিব। আমরা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে করি।

(১) বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা প্রাকৃতেরই অনুরূপ এবং মাগধী প্রাকৃত হইতে সমুদ্ভূত। বৌদ্ধগান ও দোঁহা, দোঁহাকোষ, ডাকার্ণব, ডাকের বচন, খনার বচন, মাণিকচন্দ্রের গীত, রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ।

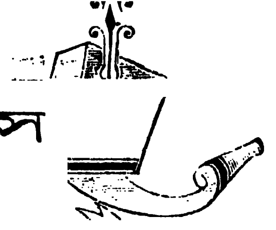
(২) বাঙ্গালা ভাষার লিখিত সাহিত্য গ্রন্থ অধিকাংশই দোঁহা বা গানের আকারে বিরচিত। খ্রীষ্টিয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিরচিত প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে সকল গ্রন্থের রচনা ও আদর্শ যে একেবারেই সংস্কৃতমূলক নহে, তাহা বেশ বোঝা যায়।

(৩) শব্দ সাদৃশ্য—সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সহিতই যে তাহার ঐক্য বেশী তাহার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য এখানে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা গেল।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বহি	বাঙ্গালা
অনেন	ইমিন	মৃচ্ছকটিক নাটক	এমনে
অষ্ট	অট্ঠ	”	আট
অম্র	অম্ব	”	আম
অহং	অম্মি	”	আমি
অন্ধকাব	অন্ধকার	”	আঁধার
কর্ণ	কণ্ণ	”	কান
কর্ম্ম	কম্ম	”	কাম।

এইরূপ ভাবে বিস্তৃত ভাবে শব্দ-সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে। আমরা বারান্তরে বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।





বাংলার মেয়ে

শেষ বৈশাখের একটি রাত্রি।

বৈকাল বেলায় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে এখানে সেখানে দুই এক টুকরা কালো মেঘ রয়ে গেছে। চাঁদের আলো আজ অন্য দিনকার মতন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি, মেঘে ঢাকা আকাশ তবুও উজ্জ্বল। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার জমাট বেঁধে দাঁড়াতে পারে নি, কতকটা পাতলা হয়ে গেছে।

পথে এখনও জল জমে আছে, কোথাও বেশ কাঁদা জমে রয়েছে। পেছনে বাঁশ বাগানে একটা পাপিয়া আচমকা ঘুম হতে জেগে উঠে তন্দ্রাজড়িত স্বরে ডাকছে "চোখ গেল, চোখ গেল"—

বিছ'নায় শুতে গিয়ে উঠে বসলুম। পাশের জানালা খোলা ছিল, বাইরের পানে দৃষ্টি পড়ল। কানে এল পাখীটির তন্দ্রাজড়িত সেই স্বর—চোখ গেল, চোখ গেল।

পথদিয়ে কে গান গেয়ে যাচ্ছে—

আজ এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী সে যদি গো
শুধু আসিত,—

আজ আমার প্রাণের নিভৃত কন্দরে এই গানটাই বেজে উঠছিল, মনে হচ্ছিল—

সকলি উঠিত পলকে বিকাশি
সে যদি গো ভালবাসিত।

বহুদূরে বিবাহের শঙ্খ শব্দ, হুলুধ্বনি কানে আসছিল, মনে পড়ল—ঠিক এমনি একটা দিন বহু দূরে চলে গেছে। সে আমারই হতে পারত, সে কোথায় চলে গেল!

ভগবানের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। দুনিয়া খুঁজলে এমন একটী লোক পাওয়া যাবে না যে প্রকৃত সুখ পেয়েছে। জীবের অন্তরে অনন্ত পিপাসা, সে পিপাসার শান্তি কিছুতেই হয় না, কখনও হবে না।

মনে পড়ছে আজ পূরবীর কথা।

সে ছিল ঠিক যেন একখানি ছবি। আজ মনে হচ্ছে সে কি সুন্দর ছিল, কিন্তু সে দিনে তা মনে হয় নি। আমারই জন্যে অর্ঘ সাজিয়ে কুমারী বসেছিল, আমি তার সে অর্ঘ পদাঘাতে ছুড়িয়ে ফেলেছি।

তখন আমি কলেজে বি, এ, পড়ি। বোর্ডিংয়ে থাকতুম, ছুটী হলে বাড়ী যেতুম। সেবার বাড়ী গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

সংসারে ছিলেন বউদি, মা ছিলেন না। বউদির মুখে শুনলুম মেয়েটী তাঁরই সম্পর্কীয় বোন। তার এক মাত্র মা ছাড়া আর কেউ ছিল না, মা মারা যাওয়ায় নিরাশ্রয়া বালিকাকে অগত্যা বউদির কাছে আসতে হয়েছে।

মেয়েটীর বয়স তখন চৌদ্দ পনর হবে। দেখলুম বউদি তার'পরে তত সন্তুষ্ট নন, দাদাও তাকে গলগ্রহ মনে করছেন। শুনলুম তার বাপ মা এমন একটী পয়সা রেখে যান নি যার সহায়তায় এই মেয়েটীর

বিবাহ হতে পারে। বউদি স্পষ্টই বললেন,—"সেই তো মরলেনই—মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে আর কোন দায়ীত্ব কাউকে নিতে হ'ত না। এখন এর উপায় কেই বা করে, কেই দেখে শোনে?"

দেখতুম—আমার দিকেও সে আসত না। আমি যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলুম সে অনেক দূরে থাকত। তার দুঃখে আমি কষ্ট অনুভব করতুম কিন্তু তা বলে এই অনুঢ়া মেয়েটীকে নিজে গ্রহণ করার ইচ্ছা আমি কোন দিনই করি নি।

সে বারে বি এ এক্জামিনে স্কলারশিপ পেয়ে এম, এ, পড়তে আরম্ভ করলুম। দাদার বুক গর্ব্বে ভরে উঠেছিল, তিনি আমার জন্যে মনের মত পাত্রী খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অৰ্দ্ধেক রাজত্ব সহ একটী রাজকন্যা এনে তাঁর ভাইকে বরণ করবে। বউদিও আমার খুব মন রেখে চলতেন। আমার বিবাহ- রাজকন্যার সঙ্গে না হোক, জমীদার কন্যার সঙ্গে যে হবে এ তিনি ঠিকই জেনে নিয়েছিলেন। আমিও যে সে আশা করি নি এ কথা বললে ভুল হবে।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুতেন রায়ের বাড়ী ছিল বোর্ডিংয়ের পাশে, এই বাড়ীতে আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। সুতেনের বোন সুনীতা, সে তখন সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করে আই, এ, পড়ছিল। কবে যে এই মেয়েটীকে ভালবেসে ফেলেছিলুম তা বলতে পারি নে। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল বিবাহ যদি করতে হয় তবে সুনীতাকে ছাড়া আর কাউকে নয়।

হয় তো পূরবীকে ভালবাসতে পারতুম যদি সুনীতা আমার সামনে সেই সময়ে এসে না দাঁড়াত।

আমি যখন দেশে যেতুম সুনীতা আমায় পত্র দিত। অবশ্য যদিও সে পত্র নিতান্ত সাদাসিধা তবু সেই পত্র নিয়েই বউদি আমায় তামাসা করতে ছাড়তেন না। সুনীতার কথা তিনি আমারই মুখে শুনেছিলেন, বাড়ীতে একরকম সবাই জানত একদিন সেই মেয়েটাই বধূরূপে এই বাড়ীতে আসবে।

বউদি প্রস্তাব করলেন—এইবার তোমার বিয়ের ঠিক করে ফেলি—কি বল ঠাকুর পো? তোমার দাদাকে একবার সুনীতার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেই, সম্বন্ধটা পাকা করে রাখাই ভাল।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললেম,—এখনই কেন বউদি? আমার এক্জামিনটা আগে শেষ হয়ে যাক, তারপরে।

সেবার পূজার বন্ধে বাড়ী এলুম।

দেখলুম বউদি সেবার রান্নাঘরে। জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি বউদি, তুমি যে রান্নাঘরে?"

অন্ধকার মুখে বউদি বললেন,—"কি করব বল ভাই, উনি তো নিত্য জ্বর করে পড়ে আছেন, রান্নাঘরে না এলে যে শুকিয়ে মরতে হয়।"

সেইদিন কথায় কথায় বউদি বললেন,—"হাাঁ ঠাকুর পো, শুনেছি কলকাতার ছেলেরা মিলে একটা কি সমিতি করেছে. তারা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে বিনাপণে বিয়ে করবে। একবার ভাল করে খোঁজটা নিতে পার?"

বুঝলুম কেন, তবুও অনভিজ্ঞের মত বললুম, "কেন বউদি, হঠাৎ সে খোঁজে তোমার কি দরকার?"

বিকৃত মুখে বউদি বললেন, "হঠাৎ নয় ভাই। দেখছ না বুকের' পরে কি বোঝা চাপানো রয়েছে? কোথাকার কে—ধরতে গেলে কেউই নয়.—ওই অতবড় এক কুমারী মেয়ে রয়েছে ওটাকে পার করতে হবে তো। বয়েস ও তো বড় কম হয় নি, এই সতের বছর হল, আর কতকাল এমনি করে রাখব?"

বললুম, "কি জানো বউদি, ওই যে বিনাপণে বিবাহ করব বলে প্রতিজ্ঞা করা, ওর মধ্যে খুব বড় মানে আছে। বিনাপণে যারা বিয়ে করবে তারা কি গরীবের মেয়ে নেবে? ওরা চায় একঢিলে দুই পাখী মারতে, অর্থাৎ বিনাপণে বড় লোকের মেয়ে ওরা নেবে যাতে নামও থাকেবে অথচ অন্য দিক দিয়ে যথেষ্ট পাওয়াও যাবে।"

বউদি খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন "এ রকম মেয়ে মরাই ভাল।"

কথাটা তিনি বললেন বেশ, আমার মনে একটা দাগ থেকে গেল। হায় রে অভাগিনী বাংলার মেয়ে, তোমাদের দুঃখ কষ্ট বুঝবে কে? তোমরা জন্মগ্রহণ কর শুধু বেদনা সইবার জন্যে, আমরণ দুঃখ কষ্টই সয়ে যাও।

স্নান করতে ঘাটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম, দেখলুম পূরবী কাঁপতে কাঁপতে এক ঘড়া জল নিয়ে উঠ্ছে। সেই দিন আমি প্রথম তার মুখখানা ভাল করে দেখলুম।

কি বেদনাভরা তার চোখ দুটী, তার দৃষ্টি তার অন্তরকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। মেঘে ঢাকা সূর্য্যের আলোর মধ্যে আমি তার সেই যে মুখখানি দেখলুম তা এখনও আমার মনে আঁকা আছে।

অত জরে জল বইতে সে পারছিল না। তার বড় কষ্ট হচ্ছে দেখে এগিয়ে গেলুম, বললুম —"আমাকে ঘড়া দাও পূরবী, আমি দিয়ে আসছি।"

মনে হল হঠাৎ তার চোখ দুইটী যেন জলে ভরে উঠল, সে একটা কথা বললে না, একবার মুখ ফিরালে না, তেমনি ভাবে চলে গেল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে এসে দেখি ভীষণ কাণ্ড বেধে গেছে। পূরবী ভাতের ফেন সরাতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে, ভাতগুলোও সব উনানে পড়ে গেছে। বউদি বারাণ্ডায় বসে অজস্র গালি বর্ষণ করছেন, অপরাধিনী পূরবী আড়ষ্ট হয়ে সাম্‌নে নতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এর পর আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম—কারণ অকারণে এই মেয়েটী কি রকম ভাবে লাঞ্ছিত হয়। নীরবে সে সব সয়ে যায়, একটা কথা তার মুখে শুনি নি।

একদিন বুঝি তার অসহ্য হয়েছিল। সে দিনে সে বউদির পায়ের কাছে টিপ্ টিপ্ করে মাথা খুড়্ছিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলছিল,—আমার বিয়ের সম্বন্ধ তোমাদের করতে হবে না দিদি, আমায় এমনি ভাবে থাকতে দাও। শুনেছি সেকালে অনেক মেয়ে কুমারী হয়ে জীবন কাটাত, এখনও দুই একটী কুমারী দেখতে পাওয়া যায়। আমায় তাদের মত থাকতে দাও, দিদি, আমার জন্যে তোমাদের এতটুকু ব্যস্ত করতে আমি চাইনে

কতখানি ব্যথা যে তার বুকে জমেছিল তা তার এই কথায় বুঝতে পারলুম। মনে হল—বাংলায় মেয়ে জন্মায় কেন?

বউদিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ তোমার বোন অত কাঁদছিল কেন বউদি?"

বউদি দপ্ করে জলে উঠে বিকৃত মুখে বিকৃত স্বরে বললেন, "ওর কথা আর বল না ভাই, কান্নার কপাল নিয়ে এলেই কাঁদতে হয়। ওর মা সব টাকা কড়ি সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে যান, এখন ওর মামারা সব নিয়ে দুর করে দিয়েছে, পত্র লিখলেও আর উত্তর দেয় না। বিয়ে দিতে হবে সে দায় যেন আমাদেরই—তাদের কেউ নয়। মেয়ে বলে—কুমারী হয়ে থাকব, ওর জন্য আমরা একঘরে হয়ে থাকি আর কি? তুমি যদি এক কাজ কর ভাই ঠাকুর পো,—ওকে যদি ওর মামার বাড়ি শাক-দহতে রেখে আসতে পার—আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তোমার দাদার অফিসের এখন ছুটি নেই, নইলে তিনিই নিয়ে যেতেন।"

আমি বললুম, "যদি তারা জায়গা না দেয়—?"

বউদি বললেন, দেবে নই কি? মামা আছেন তিনি কি আর তাড়িয়ে দেবেন? ঘাড়ে গিয়ে পড়লে যা হোক একটা উপায় তাঁকে করতেই হবে।

ভেবে দেখলুম কথাটা সত্য। মামা বর্ত্তমান, মামী যত্ন না করলেও মামা একটু দেখবেন নিশ্চয়ই। আর এখানে দিনরাত লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিজেরই চোখে দেখতে পারছি না।

বললুম, "কিন্তু তোমার কষ্ট হবে তো?"

বউদি অবহেলার ভাবে বললেন, "চিরকাল তো

ও এখানে ছিল না কিম্বা থাকবেও না। আমার কষ্ট চিরকালের, দুদিন ও এখানে আছে, না হয়, একটু কষ্ট দূর হচ্ছে, শ্বশুড়বাড়ী গেলেও সেই আমাকেই তো সব করতে হবে।"

আমি বলে দিলুম, তবে দু'একদিনের মধ্যে যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক করা হোক, আমি সোমবারে কলিকাতায় যাব।

আমার কাছে পল্লীগ্রাম ভাল না লাগলেও মাঝে মাঝে আসতে হতো। শাঁকদহতে আমার যাওয়ার কথা শুনে দাদা যে প্রথমটায় আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন তাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না। আমি ভাবলুম মুখ ফুটে বলি পূরবীকে, এখানকার অত্যাচার, কষ্ট হতে বাঁচানোর জন্যে আমি শাঁকদহ যেতে চাই, কিন্তু সে কথা বলতে পারলুম না।

যাওয়ার দিন সকাল বেলা পূরবীর দেখা পেলুম। সে কি করছিল, তাকে ডেকে বললুম, "একটু তাড়াতাড়ি করে যাও, সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

সে শুনে গেল মাত্র, বরাবর যেমন একটী কথাও বলেনি, তেমনি একটী কথাও বললো না।

গাড়ী তৈয়ারী, পূরবীর দেখা নেই। বউদি এসে দারুণ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "ভাল বিপদে পড়েছি ঠাকুর পো, সে মেয়ে যে কিছুতেই যাবে না বলছে।"

রাগ হয়ে গেল,—"যাবে না কি রকম?"

তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "তুমি একবার চেষ্টা দেখ না ভাই, আমি হার মেনেছি।"

পূরবীর ঘরে গিয়ে দেখলুম সে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে; বোধ হয় নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। কোনও ভূমিকা না করে বলে উঠলুম, "গাড়ী এসেছে, উঠবে চল পূরবী। এখন যাওয়ার সময় তোমার এ রকম কাণ্ড ভাল লাগে না।"

সে উঠে বসল, চুলগুলো এলিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি সে গুলোকে জড়িয়ে ফেললে; খানিক চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। দুই হাতে আমার পা তখনো চেপে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "নিশিবাবু, দিদি আমার উপর নিষ্ঠুর হয়ে আমায় সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আমি অনেক কেঁদেছি তবু তিনি আমার একটা কথা শুনলেন না। আপনার পায়ে পড়ি—আপনি আমায় পাঠাবেন না, আপনি আমায় সেখানে রেখে আসতে যাবেন না। এখানে এই এত বড় সংসারে আমার একটু স্থান হবে না কি? আপনার বিয়ে হলে আপনার স্ত্রীর দাসীর মতো আমি এখানে থাকব। দিদি যদি না চান তাঁর কাছে থাকব না। আপনি যদি বলেন—তবে দিদি আমায় এখনি দূর করতে পারবেন না। আমায় বাঁচান, সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় হত্যা করবেন না।"

কি জানি কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম। জোর করে তার হাতখানা ধরে টেনে তাকে তুললুম, তার অশ্রু বিগলিত মলিন মুখখানা দেখলুম, মনে হল তার অন্তরটা আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে যেতে বারাণ্ডায় সামনে পড়লেন বউদি। বললুম, "সে যাবে না বউদি। তোমরা অন্য লোককে দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দাও, আমি শাঁকদহে যেতে পারব না।"

বউদি আশ্চর্য্য হয়ে যে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তা আমি দেখলুম না, ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম।

আজ এই প্রথম আমার মনে হল—পূরবী আমায় ভালবাসে আর সেইজন্যেই সে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও এখানে পড়ে থাকতে চায়।

আবার ভাবলুম, আমি এর কে? কোথায় সে আর কোথায় আমি, সে কি আর আমি কি—এ বিচার না করেই অভাগিনী কেন আমায় ভালবাসলে? সে স্পষ্টই জানে আমার ভালবাসা অর্থে দুঃখ যাতনা বরণ করা, কারণ আমি তার

দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি দেখালেও তাকে বিবাহ করতে পারব না।

মনে করলুম—বৌউদিকে কিছু না বলে নিজে তফাতে থাকাই ভাল, কোনদিন না কোনদিন ওর ভালবাসার মোহটা দূর হতেও পারে।

তার পরদিনই কলিকাতায় চলে গেলুম।

এর পর বড়দিনের বন্ধ এল, আমি বাড়ী গেলুম না। দাদার পত্রোত্তরে লিখে দিলুম আমি এবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছি, এর পরের ছুটিতে বাড়ী যাব।

বাড়ীর পত্রে সকলেরই সংবাদ পেতুম, সংবাদ পেতুম না শুধু সেই মেয়েটীর। মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাওয়ার ইচ্ছা হ'ত, তখনই বিদ্রোহী মনকে ধমক দিয়ে বশে আনতুম। যাতে একমাত্র সুনীতাকে ভালবাসতে পারি তারই চেষ্টা করতুম।

দাদা কলকাতায় এসে সুনীতার সঙ্গে আমার বিবাহের পাকাপাকি কথা ঠিক করে গেলেন। বৈশাখের শেষে বিবাহ। দাদা বৈশাখের প্রথমেই আমায় বাড়ী যাওয়ার অনুরোধ করে গেলেন। তার মুখেও পূরবীর কথা শুনতে পেলুম না, আমিও নিজে হতে তার কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

বৈশাখ মাসের দুই তারিখে সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী গেলুম। বিস্মিত হয়ে দেখলুম—সেই দিন পূরবীর বিবাহ। দাদা ও বউদি কেউই আশাতে করেন নি আমি আজই বাড়ী আসব। আমি এর আগে পত্র দিয়েছিলুম, আমি সাতই আটই বাড়ী আসব। আমায় দেখে তারা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন দেখলুম।

তখনও বর আসে নি, শুনলুম—বর পাঁচপোড়া গ্রাম নিবাসী, অবস্থা বেশ ভাল, পূরবী বেশ সুখে থাকতে পারবে। পূরবীর মামা এই সম্বন্ধ করেছেন এবং দাদা ও বউদি মহানন্দে এতে সম্মতি দিয়েছেন। বরপক্ষকে কিছু দিতে হবে না বরং তারা খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দেবে।

এমন পাত্রও এ দেশে আছে, শুনে একটু আনন্দ পেয়েছিলুম। পূরবীকে একবার দূর হতে দেখেছিলুম তার মুখখানা তখন শবের মত মলিন বোধ হয়েছিল।

বাজনাসহ বর যখন উপস্থিত হল তখন সকলের সঙ্গে আমিও দেখতে গেলুম। পালকী হ'তে বর নামছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, চলতে যার পা কাঁপছে, এই কি সুন্দরী তরুণ পূরবীর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র? বুঝলুম—কেন দাদা ও বউদি আমায় দেখে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বেশ জানেন আমি এ বিয়ের সমর্থন কখনই করব না।

বউদিকে আড়ালে ডেকে বললুম, "পূরবীর সঙ্গে এই পাত্রের বিয়ে দিচ্ছো বউ দি? এর নামতো বিয়ে নয়, এর নাম হাত পা ধরে জলে ফেলে দেওয়া যে।"

বউদি দুঃখিত ভাবে বল্‌লেন "তা কি করব ভাই, পোড়া বাংলা দেশে কি পাত্র মিলবার যো আছে; বিনা পয়সায় কেউ তো নিতে চায় না ভাই, কাজেই বাধ্য হয়ে"—

ক্ষুদ্ধ ভাবে বল্‌লুম, "বাধ্য হয়ে এমনই নির্দ্দিষ্ট বৈধব্যের মধ্যে তাকে না ফেলে দিয়ে আজীবন কৌমার্য্য পালন কর্ত্তে দিলেই ভাল হ'ত বৌ দি।"

বউদি মাথা তুলে বল্‌লেন, "বলাটা বড় সহজ কিন্তু কাজ করা বড় শক্ত ভাই, ঠাকুর পো। জাত কুটুম নিয়ে সকলকেই তো ঘর করতে হবে, ওর জন্য আমরা সব তো বিসর্জ্জন দিতে পারি নি।"

বল্‌লুম, "পূরবী মত দিয়েছে?"

রাগত হয়ে বউদি বল্‌লেন, "ওর আবার মত কি? এ দেশের মেয়েদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে এমন দেশ এখনও হয় নি ঠাকুর পো। যার হাতে দেওয়া যাবে তাকেই বিয়ে

করতে হবে এই হচ্ছে এদেশের মেয়েদের শিক্ষা। আর সেই লোককেই দেবতা বলে পূজা করতে হবে এই হচ্ছে ধর্ম্ম। সেকালে শুনেছি শ্মশান-যাত্রী বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের কৌমার্য্যখণ্ডন করে নেওয়া হত, এতো তার চেয়ে অনেক ভাল।"

আর শুনতে পারলেম না, অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় বাড়ী ছেড়ে বাইরে চলে গেলুম।

গ্রামের প্রান্তসীমায় ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, স্থানটী বড় নির্জ্জন বলে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। সেই জন্য আমি প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকতুম্। আজও ভারি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আমি এই নদীর ধারে এসে বসলুম।

বাড়ীতে একটী বলিদান পর্ব্বের উদ্যোগ চলছিল, ঘন ঘন শঙ্খের শব্দ উঠ্‌ছিল, আমি সে বলিদান দেখ্‌তে পারব না।

হায় রে, এমনি করে কত তরুণী নির্দ্দিষ্ট বৈধব্যকে আলিঙ্গন করছে কে তার খবর রাখে? আমা'রই মত কত গর্ব্বিত যুবক আছে যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখে না, ক্ষমতা থাকলেও প্রতিবিধান করে না, দিন দিন দেশে অনাথিনী তরুণী বিধবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। আমি নিজে বিধবাদের দুঃখ কষ্ট কত জায়গায় জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করেছি, কত জায়গায় বিধবার কষ্ট নিবারণ করতে অর্থ সাহায্য করেছি, বিধবাকে স্বাবলম্বিনী করবার জন্য নিজে অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু কেন যে তারা বিধবা হল, মেয়েদের বৈধব্য কেমন করে নিবারিত হতে পারে সে দিকটা তো দেখি নি। এই যে আমার সামনে আজ একটী তরুণী জেনে শুনে বৈধব্য দশাকে আলিঙ্গন করছে. ইচ্ছা করলে একে তো আমি রক্ষা করতে পারতুম।

মনের মধ্যে ভেসে উঠল সুনীতার মূর্ত্তিখানি. আমি যে তাকে বড় ভালবাসি;—সুন ত্যাগ করে পূরবীকে আমি গ্রহণ করতে পারতুম কি?

কর্ত্তব্য মাথা তুললে নিশ্চই পারতুম। আমি পুরুষ, অনেক শক্ত আঘাত সহ্য করার শক্তি ভগবান আমায় দিয়েছেন, এ আঘাতও আমি সইতে পারতুম। কিন্তু এই তরুণী বালিকা মাত্র, সর্ব্বস্ব হারিয়ে এ কেমন করে বেঁচে থাকবে?

নদীর ওপারে পাপিয়া ডাকছিল—ঠিক আজ রাতের মতই। এমনই মেঘে ঢাকা আকাশ খানায়, চাঁদের আলো স্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি।

বিবাহ বাড়ীতে শঙ্খ বাজতে বাজতে থেমে গেল, হুলু ধ্বনি হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল বীণা বাজতে বাজতে তার তারটা যেন ছিড়ে গেল?

একটা তীব্র চীৎকার যেন কানে ভেসে এল—"কি হল গো,—"

তারপর আর কোন শব্দ নেই। বাতাসের ঝর ঝর শব্দ আর নদীর একটানা কুল কুল সুর ভেসে যাচ্ছিল। পাপিয়া আচমকা, চীৎকারে ভয় পেয়ে নিরব হয়ে গেল, আর গান গাইলে না।

উঠে পড়লুম—বাড়ীর দিকে ছুটলুম।

সমস্ত চুপ—বাজনা থেমে গেছে; অতগুলি লোক যে জমেছে—কারও মুখে একটা উঁচু কথা নেই। বাড়ীর ভেতর গেলুম, দেখলুম যে আলিপনা দেওয়া হয়েছিল তা সেখানে পড়ে রয়েছে। পূরবী তার বসবার পিড়ির পাশে পড়ে। বৃদ্ধ বর আড়ষ্ট ভাবে নিজের পিড়িতে বসে।

বউদির কোলে পূরবীর মাথা—তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে খানিকটা জায়গা প্লাবিত হয়ে গেছে।

আমায় দেখেই বউদি মুখ নিচু করলেন, মেয়েরা চুপি চুপি জানালেন—পিড়ীতে করে আনার সময় পূরবী পড়ে গেছে, বুকে খুব লাগায় বুকে রক্ত উঠছে।

কিন্তু সে যে বিষপান করেছে তা আমি দেখেই বুঝতে পারলুম। তার হাত মুখ নীল

হয়ে গেছে, তখনও তার দেহে জীবন আছে।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে তার নিমীলিত প্রায় চোখ দুটি যথাসাধ্য বিস্তৃত করে আমার মুখের পানে তুলে বরকে কি বলবার জন্য তার ঠোঁট দুখানা একবার নাড়ল মাত্র, কিন্তু একটা শব্দও তার মুখে ফুটল না। আর হাত খানা নড়ল—শাড়ীর অঞ্চলে একবার প্রাণপণে টানতে গেল, পারলে না।

দুই একবার একটু নড়ল মাত্র, তারপর সে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম—এ দেশের মেয়েরা কেমন করে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, মরণকে এরা কতখানি ভালবাসে।

* * * *

তাকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় অঞ্চলের দিকে চোখ পড়ল, দাদা তার অঞ্চলের গিরো খুলে একখানা পত্র পেয়ে আমার হাতে দিলেন।

দাহ শেষে শ্রান্তদেহে বাড়ীতে ফিরে পত্রখানা দেখতে বসলুম। পত্রে আমার নাম লেখা ছিল, ভিতরে সামান্য দু চার কথা মাত্র।

অকিঞ্চিৎকর দেহটাকে টেনে নিয়ে আর ফেরাতে পারব না নিশ্চিত জেনে মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছা করলে আমার এই নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতে, কিন্তু তুমি তা করলে না। তুমি বুঝতে চাইলে যে আমি তোমায় কতখানি ভালবেসেছিলুম আর সেই জন্যই এক জনকে হৃদয় দিয়ে আর এক জনকে দেহ দিয়ে দ্বিচারিণী হতে পারব না বলে চলে যাচ্ছি। বেঁচে থেকে তিলে তিলে মরতে পারব না, বুকে এতখানি দুখ রেখে মুখে, সুখের অভিনয় করা আমার পক্ষে অসহ্য, তাই চললুম। সকলে আমায় আজ অপরাধিনী ভাবছে কিন্তু হে আমার দেবতা, তুমি আমায় অপরাধিনী ভেব না। তুমি শুধু মনে ক'র আমি তোমায় ভালবেসেছিলুম। ব্যর্থতা আমার জীবনের সাথী, তাই নিয়েই চললুম।"

* * * *

তারপর সুদীর্ঘ তের বৎসর কেটে গেছে। আজও তেমনি বেশ সমান ভাবে আবার সেই পাপিয়া গান করে, তেমনি মেঘে ঢাকা চাঁদ থাকে।

সুনীতাকে বিবাহ করতে পারি নি। আমি যে দাগী আসামী, আমি যে অপরাধী। একজনকে হত্যা করেছি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজীবন করতে হবে।

আজও শুনছি সেই পাপিয়াটী অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

মনে হল—বলি—ভেসে যা ভেসে যা। যে চোখ দিয়ে তাকে দেখেছিলি, দেখার আগে ভবিষ্যৎ ভেবে সেই চোখ দুইটা কেন নষ্ট করে ফেলিস্ নি? আমাকেও একদিন একজন দেখেছিল, আমি তাই—সে যদি অন্ধ হ'ত তা হলে সেও বাঁচত আমিও বাঁচতুম।

তাই আজও বলি দুঃখিনী বাংলার মেয়ে ঘরে ঘরে এমনি কত নির্য্যাতনই না সহ্য করছে, কে দেখছে এদের, কে শুনছে এদের করুণ কাহিনী? কে কোথায় সরে পড়েছে কেই বা তার হিসাব রাখে? পুরবীর রক্ত আমার অন্তরে জমে আছে, এমনি কত কুমারীর বুকের রক্ত দেশ মাতৃকার চারিদিকে জমছে কেউ তা কি দেখতে পাচ্ছে? যদি দেখত—তা হলে বালিকার বৃদ্ধাস্বামী এখনও দেখতে পাওয়া যেত না, ঘরে ঘরে বিধবার এত বেশী সৃষ্টি হত না।

গাঁয়ের পথিক।

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ওপারের রবি চ'লেছে ফিরিয়া সোণার রথে
পাখি আসে ফিরে, দূর ঘিরে ঘিরে কূলায় ল'তে।
গোঠ হ'তে ধীরে ফিরিতেছে ধেনু
বাজিতেছে দূরে রাখালের বেণু,
ঘর-ছাড়া এক পথিক চ'লেছে গাঁয়ের পথে।

পথিক চ'লেছে এক-মনে, নাহি ফিরায় আঁখি
বকুলের ফুল কাঁদিছে কত না তাহারে ডাকি !
"ও পথিক, শুধু অঞ্চল পাতি'
কোন্ তরু-তলে কাটাবে এ রাতি,
কেন যাও দূরে ? যাওনা আজিকে এ গাঁয়ে থাকি ?"

চুত-তরু-শাখে মুকুল-রেণুরা কাঁদিছে ফুলি'
অভিমান-ব্যথা পাতায় পাতায় উঠিছে দুলি'।
"হে পথিক, যদি এলে এই গাঁয়ে
থেকে যাও আজি, আমাদের ছায়ে
ভোরের শিশির-পরশে বেদনা যাবে গো ভুলি'।"

গাঁয়ের বাতাস ডাকিছে পথিকে আকুল হয়ে'
টানিছে কতই, ফিরাতে তাহারে আঁচল ল'য়ে।
"ও পথিক, তুমি এস এস ফিরি'
কাটাব এ রাতি সবে তোমা ঘিরি,'
সুবাসের কণা তব তরে মোরা আনিব ব'য়ে।"

বকুলের ফুল বৃথা ঝ'রে গেল--আপন-হারা
আমের মুকুল বৃথা কেঁদে গেল—পাগল-পারা।
উদাসী-বায়ুর বুক-ভরা গানে
কোন কথা তার পশিল না কানে,
গাঁর পথ ধ'রে যেতেছে পথিক—আবাস ছাড়া!

ঋণ-পরিশোধ

(কথা-চিত্র)

শ্রীসুরজিৎ দাস গুপ্ত।

কালো, বিষম কালো; শ্মশানের পোড়া কাঠের মতো রঙ্ তা'র, হাত পা পেঁকাটি একটা লোক প'ড়ে আছে রাজবাড়ীর আস্তাবলের পাশে, একটা ফুটো মালা, কয়েক টুক্‌রো ময়লা ন্যাক্‌ড়া এই সম্বল নিয়ে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রোজই দেখি, আর ভাবি, লোকটা কে!

একদিন দেখি, কুড়িয়ে পাওয়া এক টুক্‌রো কাগজ পেতে ময়লা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ায় বেঁধে যা ভাত এনেছিলো, তাই ব'সে ব'সে চিবোচ্ছে। একটা রোঁয়া-ওঠা রোগা কুকুর পাশে ব'সে।

সে যখন ভাতে হাত দেয়, আমাকে দেবে ভেবে কুকুরটা খুসি হ'য়ে লেজ নাড়ে। দিলে না দেখে নিরাশ মনে মুখ পানে চেয়ে থাকে।

ভাত থেকে হাত তুল্‌তেই, মাছিগুলো ভাত ঢেকে কালো ক'রে ফেলে। হাত নামালে ভ্যান্‌ভ্যানিয়ে উড়ে কুকুরটার ঘায়ে গিয়ে বসে।

আমি কাছে যেতেই বসা-চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি তুলে আমার পানে চেয়ে রইলো। মুখে পোরা শুকনো ভাতের গ্রাসটা তাড়াতাড়ি গিল্‌তে গিয়ে বিষম খেয়ে উঠ্‌লো।

একমালা জল খেয়ে একটু সাম্‌লে নিয়ে বাঁ হাতটা বুকে বুল'তে বুল'তে ব'ল্‌লে—কেয়া বাবু?

আমি তখন জান্‌তে চাইলাম—সে কে।

সে হিন্দিতে ব'ল্‌লে—বাড়ী তা'র গোরখপুর জেলায়। দেশে অজন্মা হ'লো; জমিদারের খাজনা দিতে জমি বন্দক দিয়ে মহাজনের কাছে ঋণ হ'য়েছে, তিন কুড়ি পাঁচ রূপিয়া। তা' স্ত্রী সোনাদী ব'ল্‌লে—ভিখুরা বাঙ্‌লা মুলুকে নোক্‌ড়ি ক'রে সাধি ক'রেছে। তাই বাঙ্‌লা মুলুকে বহুৎ রূপিয়া আছে শুনে, লেড়্‌কী শুদ্ধ জেনানাকে তা'র বাপের বাড়ী রেখে আট মাস হয় মমিন্‌সিংহ এসে এক মোক্তারের বাড়ী চাক্‌রি কর্‌ছিলো।

মমিম মিঞা মোকর্দমায় হেরে আখেজে দিলে মোক্তারের বাড়ী আগুন ধরিয়ে। রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আগুন দেখে চেঁচামেচি। সবাই ছুটলো আগুন নেবাতে, ছেলেপুলে টাকা পয়সা সাম্‌লাতে। গোয়ালের গাভীন গাই চাঘটে বাঁধা, কারো হুঁস হ'লো না সে দিকে।

সে ছুটে গিয়ে গরুর দড়ি কেটে দিলে। গরু বাঁচ্‌লো; জলন্ত খড়ের চাল চেপে প'ড়্‌লো তা'র ঘাড়ে। মরেই যেতো; কোন রকমে বেরিয়ে এসে সারারাত পুকুরে প'ড়ে রইলো।

সকালে তা'র মুনীব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সাহেব ক'দিন রেখে, আর রাখ্‌বার আইন নেই ব'লে বের করে দিলেন।

ফের মুনীবের কাছে এলো। তিনি দু'দিন রেখে কুঁড়ে ব'লে তাড়িয়ে দিলেন। সেই থেকে ভিক্ষা ক'রে খায়। সহরের লোক ভিখ্ দেয় না;—যা বেটা খেটে খা গে!—ব'লে হাঁকিয়ে দেয়। তাই গাঁয়ে এসেছে।

এই ব'লে লোকটা হাঁপাতে লাগ্‌লো। প্রতি নিঃশ্বাসে তা'র বুকের চাম্‌ড়া পাঁজরে সেঁদোচ্ছিলো।

২

ক'দিন হয় আর সে রাস্তায় যাই না। আজ হঠাৎ মনে হ'ল। গিয়ে দেখি লোকটা সেখানে

নেই। মনে করলাম মরে গেছে। সইসদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি,

—বাবু, হিঁ—য়া!

ফিরে দেখি গাছতলায় ব'সে সেই লোকটা।

কাছে যেতে ব'ল্লে—ম'রে যাবো ব'লে সরকারের লোক এসে তাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা ছোটো ডাল ভেঙ্গে, তাই দিয়ে গাছতলা ঝেড়ে, তা'র সেই ফুটো মালা, ভাঙা এনামেলের গ্লাস, ছেঁড়া নেকড়া নিয়ে, আস্তাবলের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। কদিন ওখানে ছিলো কিনা, মায়া ব'সে গেছে। তাই তাড়িয়ে দিলেও এমন জায়গায় ব'সেছে, যাতে সে জায়গাটা দেখ্তে পায়। 'ঐখানে ছিলাম', এ মনে করেও আরাম।

সাম্নে এক মুঠো ভিজে ছোলা। বোধ হয় সইসরা দয়া ক'রে দিয়ে গেছে। তাই একটা একটা ক'রে মুখে দিচ্ছে, পাছে ফুরিয়ে যায়।

৩

রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি ব'য়ে গেছে। সকালে এসে দেখি, বাজারের হাট চালাতে মাটিতে ব'সে মুচি জুতা সেলাই করছে। তা'রই পাশে ব'সে সেই লোকটা একটা ময়লা চট গায়ে দিয়ে।

আমাকে দেখে ব'লে উঠ্লো—বাবু, রাতে বহুৎ বাদল হ'য়েছিলো, আস্তাবলে ঢুকতে দিলে না। গাছতলায় টিক্তে না পেরে এখানে এসেছি। মুচি ভেইয়া তাড়িয়ে দেয় নি; আরো তা'র পেতে বসা চটখানা গায়ে দিতে দিয়েছে।

এই ব'লে খুসি হ'য়ে চট দেখিয়ে হাস্তে লাগ্লো। তা'র রুগ্ন মুখে হাসির রেখা প'ড়লো না। সন্ধ্যার কালো মেঘে পড়া এক চম্কা আলোর মতো মিলিয়ে গেলো।

বসা চোখ আরো ব'সে, বেরোনো দাঁত আরো বেরিয়ে, কোঁচ্কানো গাল আরো কুঁচ্কে, হাসি বিকট কান্নার মতো দেখালো।

মুচি ব'ল্লে—বাবু, সেলাম।

আমি তার সেলাম সইতে না পেরে চ'লে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফির্‌ছি, দেখি মুচি নাই। লোকটা চট মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে শুকড়ে শীতে কাৎরাচ্ছে। সব গা ঢাকতে পার্‌ছে না। যখন বড় শীত পাচ্ছে, তখন মাথা থেকে চট নামিয়ে পা ঢাকছে, আর—'মাঃ, মাঃ' করছে।

৫

সকালে দেখি, একহাঁটু তুলে, একহাত পেটে দিয়ে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে। দু'চা'র জন পথিক চ'ল্তে চ'ল্তে থেমে দাঁড়িয়ে দেখ্ছে, নাকে কাপড় দিয়ে।

ম'রে গেছে!

বুঝি বড়ো জ্বলছিলো। চট্টা গা থেকে ফেলে দিয়েছে। কোমরে বাঁধা জাল থলিতে একটা টাকা, তাই মুঠো ক'রে ধ'রে আছে। মরার পর যদি কেউ কেড়ে নেয়।

এতো কষ্টেও টাকাটা খরচ করেনি। মহাজনের ঋণ শুধ্তে হবে যে!

দাঁত বের করা, চোখ চাওয়া, হাঁ করে আছে।

সেদিন হাসি দেখাচ্ছিলো, কান্নার মতো; আজ মৃত্যু যাতনার কান্নার চিহ্ন তার মুখে লেগে আছে হাসির মতো।

সে যেনো আমার দিকে চেয়ে ব'ল্ছে—ওরে, তোদের এতো বড়ো দুনিয়ায় আমার সাড়ে তিন হাত জায়গা হ'ল না। একমুঠো ভাত মিল্লো না! দেখ আজ একজন ত'ার অমল হাতে সকল মলা মুছে, আমায় কোলে তুলে নিয়েছে।

হট্ যাও বাবু!

ফিরে চেয়ে দেখি, কোদাল কাঁধে ধাঙ্গী মেথর, সঙ্গে বাঁশ ঘাড়ে আর একজন কে।

* * *

সরকার তার সৎকারের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন।

নূতন কেতন

(মালাই পান্তুম্)

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(এই "নূতন কেতন" শীর্ষক কবিতাটি একটি মালাই পান্তুম্। ইটালির যেমন সনেট্, জাপানের যেমন তান্কা, মলয় উপদ্বীপের তেম্নি "পান্তুম্"। "পান্তুম্ অর্থে গান বা গীতি-কবিতা। পান্তুমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণ পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক শ্লোকের (Stanza) চারি চরণ থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণতঃ চারি শ্লোকে একটি পান্তুম্ সম্পূর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি-সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গম স্থলে গঙ্গা যমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্তর হুগো তেম্নি ফরাসী ভাষায় প্রথম পান্তুমের অনুবাদ করেন। হুগো মৌলিক পান্তুম্ রচনা না করিলেও তৎকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পান্তুমের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্ত্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মৌলিক পান্তুম্ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দোবিদ্যা ও কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।" ছন্দের 'পিঙ্গল' কবি-বন্ধু সত্যেন্দ্র নাথ হুগো কৃত একটি মালাই পান্তুমের ফরাসী অনুবাদ হইতে বাঙ্লায় অনুবাদ করিয়া প্রথমতঃ মালাই পান্তুম্ আম্দানী করিয়াছেন। তারপর আর কোনো বাঙালী কবি ঐ পান্তুম্ রচনা আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। আমি এই যাবৎ দুইটি মৌলিক মালাই পান্তুম্ রচনা করিয়াছি। একটির নাম "রজনীগন্ধা", আর একটির নাম "নূতন কেতন"।)

হেথায় নিত্য চির-চেতনের নূতন কেতন ওড়ে !
অবুঝ্ সবুজ সতেজ সজীব চিরদিন লভে জয় !
পুরাতন শুধু মৃত্যু-যাতনে নিয়ত হাত পা ছোঁড়ে
জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ ত্যক্ত জগতের কেহ নয়।

অবুঝ্ সবুজ সতেজ সজীব চিরদিন লভে জয় !
মৃত্যুঞ্জয় নূতনেরে করে আত্ম-সমর্পণ।
জীর্ণ শীর্ণ দীর্ণ ত্যক্ত জগতের কেহ নয় ;
ব্যর্থতা নিয়ে ধ্বংসের মাঝে মিছাই আস্ফালন !

মৃত্যুঞ্জয় নূতনেরে করে আত্ম-সমর্পণ !
নবীনের জয় ঘোষিতে প্রকৃতি নিশিদিন রহে সেজে।—
ব্যর্থতা নিয়ে ধ্বংসের মাঝে মিছাই আস্ফালন !
বুঝিবার যার শক্তি নাহি গো, বাঁচিতে আসে সে যে !

নবীনের জয় ঘোষিতে প্রকৃতি নিশিদিন রহে সেজে !
তারি পদ-ভরে কাঁপিতেছে আজি স-সাগরা এই ক্ষিতি !
বুঝিবার যার শক্তি নাহি গো, বাঁচিতে আসে সে যে !
যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—এই তো ধাতার রীতি !

খেয়ার যাত্রী

(কথানাট্য)

শ্রীশ্যামাচরণ বসাক।

(রোগশয্যায় সরযূ শুইয়া আছে। রাত্রিকাল, শরৎকালের আকাশ, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা, সরযূর ছোট বোন লীলা ঘরে প্রবেশ করিল।)

সরযূ—কে ?

লীলা—আমি লীলা।

সরযূ—কাছে এসে ব'স ভাই,- দু'টো কথা কয়ে বাঁচি।

লীলা—দিদি—

সরযূ—কি বলছিস ?

লীলা—কেমন আছ ?

সরযূ—আমার থাকা থাকি কিছুই নেই ভাই !

লীলা—ওকথা ব'ল না দিদি, আমাদের মনে বড় কষ্ট হয়।

সরযূ—কষ্ট হয়—এখনও কষ্ট হয় ! এই কঙ্কাল খানার জন্য তোরা এখনও ভাবিস্ ? আমার মায়া আজও কাটাতে পারলি না, আমি আর ক'দিন !

লীলা—দিদি, আমাদের অদৃষ্টে যদি তেমন দিনই আসে······না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ওকথা আর ব'ল না। মা শুনতে পেলে এখনি কাঁদবেন। জান ত, মা এখনও রাণুর শোক ভুলতে পারেন নি।

সরযূ—রাণু আমাদের ছেড়ে কতদিন গেছে, আজ ছ'মাস নয় ?

লীলা—না, প্রায় তিন মাস হ'ল।

সরযূ—তিনমাস—মোটে তিনমাস ! দিন এত বড় হয়ে গেছে যে আর কাটতে চায় না। আমি আজ কতদিন বিছানায় পড়ে আছি ?

লীলা—পাঁচ মাস।

সরযূ—ওঃ ! এতদিন তোদেরকে এই রকম করে কষ্ট দিয়েছি ; আরও কতদিন কষ্ট দেব জানি না। না, এ আমার সত্যই ভাল লাগে না। এখন যত শীঘ্র মরতে পারি ততই ভাল।

লীলা—আমাদের যেটুকু আশা—তোমার মুখে ওকথা শুনলে তাও থাকে না। তুমি ভাল হও আর না হও, তার জন্যে আমরা ভাবিনা। তুমি এমনি করেই পড়ে থাকো তাতেই আমরা শান্তি পাব।

সরযূ—আমার মত একটা বিধবার প্রাণের কোন দাম নাই - তার জন্য কাউকে দরদী হতেও হ'বে না। একি আমার সুখের জীবনরে লীলা ! নিজের সব থাকতেও কিছুই নাই—সকল কাজেই অপরের সাহায্য নিতে হয়। আমার জীবন ত একটা বোঝা। যদি চোখে দেখতেও পেতুম—

লীলা কেন, সেজন্য কি আমরা তোমায় অযত্ন করেছি ?

সরযূ—না অযত্ন ত করিসই নি, বরং যা করেছিস তা অনেকে করে না, কিন্তু ভাই, আমার এই একঘেয়ে জীবন যে আর ভাল লাগে না।

লীলা—দিদি, কাঁদচ ?

সরযূ—দুঃখ রয়ে গেল—জীবনটা অনেক খানি অসম্পূর্ণ হয়ে রইল। যদি একটুও দেখতে পেতুম—

লীলা—দেখতে নাই বা পেলে তাতে দুঃখ কি ?

সরযূ—আগে দুঃখ করতুম না। কিন্তু তাঁকে হারাবার পর থেকে দুঃখ হয়। তিনি থাকতে চোখের অভাব বুঝতে পারতুম না—এখন সেটা বিশেষ ভাবে বোধ হয়। ওকি ! জানলা বন্ধ করছিস কেন ?

লীলা—বৃষ্টি পড়ছে।

সরযূ—না না বন্ধ করিস নি ভাই, খুলে দে।

লীলা—সে কি ?

সরযূ—না, না, তুই খুলে দে।

লীলা—ঠাণ্ডা লাগলে তোমার অসুখ বাড়বে যে ?

সরযূ—বাড়বে না। যদি বাড়ে, কোন ক্ষতি নাই তুই খুলে দে। কই, খুলে দিলি না ?

লীলা—এই দেখ দিদি, জলের ঝাপটা ঘরের ভিতর আসছে।

সরযূ—আসুক। এ আমার ভারী ভাল লাগে কিন্তু, গন্ধ পাচ্ছিস লীলা ? ঘর একেবারে গন্ধে ভরে গেছে।

লীলা—দিদি এই বার বন্ধ করেদি ?

সরযূ—দিবি দে। তুই আজ আমায় বৃষ্টির জন্য বকছিস—এর জন্যে এমনি ভাবে কতদিন তাঁর কাছেও তিরস্কার সহ্য করেছি। বৃষ্টি পড়লেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠত—জানলা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বৃষ্টির ছাঁট এসে আমার শরীর ঠাণ্ডা করে দিত—আমার এলোচুলগুলো বাদল বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি লাগিয়ে দিত—আমার যে কি আনন্দ হ'ত, তা আর কি বলব! কোন কোন দিন ধরা পড়ে যেতুম; তিনি এসে তিরস্কার করে জানালার ধার থেকে টেনে এনে আমার ভিজে চুলগুলো মুছিয়ে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে নিষেধ করতেন। তারপর পড়তেন মেঘদূত—সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবসের কথা—তাঁর মুখে কি মিষ্টিই লাগত। হাঁরে, বৃষ্টি কি এর মধ্যে ধরে গেল—আর যে শব্দ পাচ্ছি না।

লীলা—(জানালা খুলিয়া) হাঁ বৃষ্টি ধরে গিয়ে চাঁদ উঠেছে।

সরযূ—থাক থাক, জানলা খোলা থাক। চাঁদের আলোয় ঘর ভরে যাক। এই চাঁদ উঠলে কত কথাই মনে পড়ে। কত পূর্ণিমা রাত যে আমরা দুজনে জেগে কাটিয়েছি তার সংখ্যা নাই। ছাতে তাঁর মাথাটী কোলে নিয়ে বসে থাকতুম—তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিতেন। তারপর কত গল্প, কত কথা, তার ঠিক নাই, পুবের চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ত—আমাদের কথার শেষ হত না। ভোরের আকাশের কোলে যখন শুকতারা মিলিয়ে যেত—তখন আমরা ছাত থেকে নামতুম। এখন ভাবি এত কথা কোথা থেকে আসত! কোন দিন তিনি হয়ত আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন—আমি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম—মন ভরে কান্না আসত—এমন স্নেহময় স্বামীর মুখ জীবনে একদিনের জন্যও দেখতে পেলুম না—একি আমার কম দুঃখ ?

লীলা—দিদি, চুপ কর।

সরযূ—মনে ত করি চুপ করব কিন্তু পারি না। মনের মাঝ থেকে কথা ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়—লক্ষ্মি! দিদিটী আমার! রাগ করিস না ভাই।

লীলা—না দিদি, রাগ করব কেন ? একটা কথা তোমায় বলব বলব ভেবেও বলতে সাহস পাই নি, আজ যখন তুমি বলছ, তখন জিজ্ঞাসা করছি—তিনি কি সত্যই তোমাকে ভাল বাসতেন ?

সরযূ—তুই কি বলিস লীলা! ভাল বাসতেন কিনা! তিনি ভাল বাসতেন—কিন্তু সে যে কি রকম ভালবাসা—সে আমি মুখে বলতে পারব না। পাছে আমি কষ্ট পাই ভেবে এমন কি বাতাস পর্য্যন্ত করতে দিতেন না। হাঁরে লীলা—তোর ছেলে কোথায় ? তাকে একবার নিয়ে আয় না।

লীলা—ভুলে গেছ, তিনি তাঁকে আমার শাশুড়ীর কাছে নিয়ে গেছেন।

সরযূ—হাঁ, তাও বটে! তোর ছেলেও যে কেমন হ'ল তাও দেখতে পেলুম না। একটা সত্যি কথা বলবি ভাই ? আমার ছেলেটা কি আমারই মত দৃষ্টিহারা হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল ? খুলে বল ভাই, আমার মনে উৎকণ্ঠা রাখিস না।

লীলা—কেন দিদি, এ কথা ত তোমায় কতদিন বলেছি—তোমার পা ছুঁয়ে সত্যিই বলছি—সে ঠিক তার বাপের মত হয়েছিল। সে চাইলেই তার বাপকে মনে পড়ত।

সরযূ—কি জানি কেন বিশ্বাস হয় না। আমার

এ পোড়াকপালে ভাই, কিছুই সইল না, ছেলে, স্বামী সব হারিয়ে নিজে বসে রইলুম।

লীলা—যা হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ করে কি করবে? ভগবানকে ডাক, মনে সান্ত্বনা পাবে।

সরযূ—ভগবান কেমন জানি না, কোন দিন সে কথাও ভাবি নি। আজ কোন কিছু ভাবতে গেলে সকল ভাবনা ছাপিয়ে বারে বারে স্বামীকেই মনে পড়ে। তাঁর স্মৃতি যে আমার মনের অনেকখানি-জুড়ে আছে। সে যে সহজে ভুলতে পারি না।

লীলা—কেন ভেবে ভেবে মন খারাপ কর।

সরযূ—মন খারাপ করি নারে—ধ্যান করি। তখন প্রাণের কাছে পেয়েও যতটা অনুভব করতে পারিনি, এখন তিনি দূরে চলে গেলেও তাঁকে প্রাণের অতি নিকটে অনুভব করি।

লীলা—দিদি?

সরযূ—কি বোন—

লীলা—না কিছু নয়।

সরযূ—কি বলছিলি বল না—

লীলা—না কিছু নয়, যাই ভাই, মা আবার ওই ডাকছেন। (প্রস্থান)

সরযূ—আয় ভাই! এই আশীর্ব্বাদ করি সুখী হ বোন। আমাদের জীবন ত জ্বলেপুড়ে গেছে, তোদের সুখী দেখতে পেলেও আমাদের সান্ত্বনা। জানি না—আর কতকাল এই দুর্ব্বিষহ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকব।

(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।)

পেয়ে-হারাণোর ব্যথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন রায়

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে মানুষ কোন একটা কার্য্যের উপর তার স্থির বিশ্বাস সত্বেও দুর্ব্বলতা হেতু নিজকে এমন বিব্রত করে তোলে যার দরুণ সত্য ও কর্ত্তব্যের অনুকূলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত সে তখন হারিয়ে ফেলে।

তারপর এই দুর্ব্বলতা ও শক্তি হারিয়ে ফেলার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যার দরুণ তাকে সারাটি জীবন অনুতাপ ও দুঃখ করতে হয়।

আজ প্রায় অনেক দিনের কথা - কি একটা উৎসব উপলক্ষে আমার দূর সম্পর্কীয় বিনয়দা ও বৌদি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ী এলেন বেড়াতে।

এই তাদের প্রথম আমাদের বাড়ী আসা। কাজেই রাণু, ইলা, প্রীতি, গীতা, রাতুল, চরণ, ও অতুল সবাই আমার অপরিচিত হলেও বৌদির ভগ্নীর মেয়ে গীতার সাথেই যে কেমন করে আমার ভাবটা হয়ে গেল তা কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারলুম না। তাকে আমার পড়বার ঘর দেখিয়ে, স্কুলে যে আমি একজন ভাল ছেলে তৎসম্বন্ধে 'টিচারদের' অভিমত জানিয়ে, আমি যে ভাল ফুটবল খেলাতে পারি এই সম্বন্ধে, খেলার মাঠে আমাকে যে যার দলে পাবার জন্য সবার কি বিপুল আগ্রহ—বাঁশী বাজানোও আমার বেশ অভ্যাস আছে ইত্যাদি নানা আলাপের মধ্যে আমাদের উভয়ের ভেতর অপরিচিতের যে একটু সঙ্কোচ ও 'বাধ-বাধ' ভাব ছিল তা কেটে গিয়ে ভাবটা বেশ জ'মে উঠ্‌লো।

গীতাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে। সাত আট দিন এই উৎসব ও আনন্দের মাঝে কাটিয়ে গীতা-ওরা সবাই যেদিন চলে গেল, সত্যি বল্‌তে কী, সেদিন ওদের বিচ্ছেদ ব্যথায় প্রাণটা ভ'রে উঠ্‌লো। এ'কটা দিন কি মহানন্দে কেটেছে।.........চোখ্‌ দু'টো ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌তেই ওদের দিক্‌ থেকে মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলুম.........। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছেড়ে যাওয়া গাড়ীর লঘু ঘড়্‌-ঘড় শব্দের ফাকে শুন্‌লুম গীতা ডেকে বল্‌ছে—সজলদা, চিঠি দিও কিন্তু। আমি যেয়েই পৌঁছ সংবাদ দেব আগে। অনেক গুলো দিন কেটে গেছে। এর ভেতর গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ ক'রে পর পর দুটো 'ডিগ্রি' লাভ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম্‌, এ পরীক্ষা দিয়ে যখন বাড়ী চ'লে এলুম, সত্যি তখন মনে হ'লো যেন 'শরীরে আর পদার্থ নেই'।...............

ভাবছিলেম এই সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের তিনটী মাস নেহাৎ চুপ্‌ ক'রে বাড়ী ব'সেই কাটিয়ে দেব, না একটু ঘুরে বেড়াব-এমন সময় গীতার সানুনয় অনুরোধ এলো ও'দের ওখানে কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আসার জন্যে। অবশ্য আমার ভেতরটাও যে ওদের সান্নিধ্য না চাইছিল একথা না বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়।

* * * *

গীতাদের বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় পা দিতেই সন্ধ্যার তরল ধূসর ছায়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়্‌লো।

হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখতে পেয়ে বৌদি ওরা একটু আশ্চর্য্য হলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়নি বোধ হয় একজন যার দেখা পেলুম অনেকক্ষণ পর, যখন আমি সবার কাছে বেশ একটু পুরাণো হ'য়ে পড়লুম।

টিপ্‌ ক'রে আমায় একটা প্রণাম ক'রে গীতা বল্লে—আমাদের মনে আছে তো সজলদা?

হেসে বল্লুম—তোমাদের মনে না থাকার কারণ তো কিছুই দেখছি না গীতা! হ্যা, তারপর ছিলে কোথা এতক্ষণ? অমন লুকিয়ে থাকার মানে কি? লজ্জা বোধ করছিলে বুঝি আমার সাম্‌নে আসতে?

যাঃ ধ্যেৎ, তুমি ভারি দুষ্টু।—দেখলুম গীতার মুখখানা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো।

যাও, জামা কাপড় গুলো এখন ছেড়ে ফেল, আমি চা নিয়ে আস্‌ছি—এই ব'লে সে চলে যেতে যেতে একটু অনুচ্চ স্বরে বল্লে—তোমার কাছে আবার লজ্জা কিসের সজল্‌দা? খোলা ছাদের কোণে টব্‌টায় গোলাপ গাছে যে নূতন ফুল ফুটেছে ব'সে তাই দেখছিলুম।

সারাটা পশ্চিম আকাশ আবীরের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। অস্ত রবির দীপ্তি টুকু সাঁঝের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল সোনালি সেই আলোর রাশি। ভাবছিলুম—

মানুষের জীবনে এমন কেন একটা সময় আসে যখন তার চোখে পৃথিবী, নূতন রংএ রঙ্গিন হ'য়ে উঠে, চাঁদের আলো ও প্রভাত বায়ু কত নূতন সাজে সেজে প্রাণে সোণালি আলো জ্বেলে দেয়—আকাশের রং গভীর নীলিমায় ভ'রে যায়, বাতাস সৌরভে মূর্চ্ছিত হ'য়ে কাণে কত অব্যক্ত কথা ক'য়ে যায়, সায়েন্স, ফিলসফি তখন একঘেয়ে নীরস ও শুষ্ক ব'লে বোধ হয়।

হৃদয়ের তারে কত নূতন রাগিণী মোহন ছন্দে বেজে উঠে। তখন বুঝি সে নিজের হৃদয়খানি নিয়ে তৃপ্ত হ'তে পারেনা, তা থেকে অপরকে কিছু অংশ দিতে ও সেই অপরের হৃদয়ের কিছু ভাগ নিতে সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এমন কেন হয়?

আর এ সোণার স্বপ্ন তা'কে কেন এমন অভিভূত করতে চায়? শতবার নিজের মনে প্রশ্ন ক'রে ত সে এ 'কেন'র কোন একটা মীমাংসা করতে পারলে না, তবে ইহাতে সে তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে কিসের একটা অব্যক্ত অভাব জাগিয়ে দিয়েছে তা সে বেশ অনুভব করতে পারল।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভেবে বাঁশীটি হাতে ক'রে

নিলুম। আচম্‌কা একটা ভারী নিশ্বাস বেড়িয়ে পড়লো।

তারপর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সমস্ত প্রাণ ঢেলে বাজাতে আরম্ভ করলুম।

* * * *

গীতা নীরব উপাসনায় বাধা দিল না। সে নিস্পন্দ হ'য়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রইল, বেহাগের করুণ সুরে কাতর প্রার্থনা মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা উদারা তারায় উঠিয়া নামিয়া তার প্রাণে এক অব্যক্ত বিষাদ করুণ ভাবের সৃষ্টি করলে, সে সুর তার কাণে যেন কত মিনতি কত আবেগ কত আকুল প্রার্থনা জানিয়ে প্রাণকে এক মোহময় বিহ্বল সকরুণ মাধুর্য্যে বিভোর ক'রে ফেলল।

কেঁদে কেঁদে অবশেষে বাঁশী নীরব হ'ল। সুরের রেশ কিন্তু থেমে গেল না, শেষ রেশ টুকু নৈশ বায়ুর মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, হাতের বাঁশী কোলে ফেলে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে নীলাকাশের পানে চেয়ে রইলুম।

সুনীল আকাশে তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদ হেসে কৌমুদী বিতরণ করছিল, আর আলোকের সেই ঝরণা ধারায়' স্নান করতে লাগল নীচের এই ধরা-বক্ষের বিশ্ববাসী।

আমার এ নীরব উপাসনায় বাঁধা দিয়ে গীতা ডাক্‌ল—সজল্‌দা'।

এত তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলুম যে গীতা কখন যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—তা মোটেই জানতে পারিনি।

চম্‌কে ফিরে চাইলুম। দৃষ্টি পড়ল তন্বী, সুন্দরী গীতার ঢলঢলে পুষ্পিত যৌবনের' পরে। হৃদয়ে যে কিসের এক মিলনের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ খেলে গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে বললুম—কেন গীতা!

গীতা প্রশংসা ভরা কণ্ঠে বল্‌ল—কি সুন্দর, কি চমৎকার সুর! শুধু বাজানো নয় - তোমারএই বাঁশীর সুর মানুষকে কাঁদিয়ে ছায়, ভারি মিষ্টি কিন্তু!

কোন প্রত্যুত্তর না করে শুধু চুপ ক'রে বসেই রইলুম। উদাস দৃষ্টি নিয়ে গীতার মুখেও কোন কথা ফুট্‌ল না। নীরবতার মাঝেই উভয়ের কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে গীতা সহজ কোমলকণ্ঠে বল্‌লে—কি ভাব্‌ছ সজল্‌দা?

একটু বিচলিত হ'য়ে অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লুম—কই,—না! তেমন কিছু ভাবছি না ত' গীতা! তবে .....।

আগ্রহ ভরে গীতা বল্‌লে—তবে কি?—

একটু হেসে বল্‌লুম—বৌদি বলছিলেন তুমি নাকি বেশ বড় হ'য়ে পড়েছ, ঘরে রাখা নাকি আর চলে না, বিয়ে দিতে হবে তোমায়! তাই ভাবছি কোথা থেকে কোন্‌ দিন কে একজন সাঁঝের আলোয় মিলনের গীতি গে'য়ে আলো ও উৎসবের মাঝে তোমায় আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে—তখন কি আর আমাদের কথা মনে থাকবে গীতা? আমরা যে তখন তোমার পর হ'য়ে যাব। গীতার মুখখানা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠে তক্ষুনি সাদা হ'য়ে গেল।

সে নীরবে খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর আমার মুখের 'পরে তার দুইটী চোখের করুণ দৃষ্টি রেখে সঙ্কোচজড়িত স্বরে বল্‌লে—তোমরাই ত আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, পর ক'রে দিচ্ছ সজলদা, এ ত আমার ইচ্ছাকৃত সাধ নয়!

তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের ইচ্ছায় চল্‌তে পার, কিন্তু আমরা নারী আমাদের সব-ই তোমাদের উপর নির্ভর ক'রতে হয়, প্রবৃত্তিও তোমাদের আজ্ঞাধীন। ভাষা থাকতে আমরা মূক, চোখ্‌ থাকতেও অন্ধ, সুখ, দুঃখের অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও হৃদয় আমাদের জড়, আশা আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও প্রাণ আমাদের স্পন্দনহীন।..........

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ছায়ার মত-ই সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলুম। গীতার

এই কথ'গুলো ভাবতে ভাবতে প্রাণে যেন কিসের একটা অজানা পুলক শিহরণ অনুভব করলুম। আজ অতর্কিতে কোথা হ'তে এ কোন এক 'সুরের আগুণ ছড়িয়ে দিলে আমার প্রাণে'—

ঠিক এমনি সময় শুনলুম গীতা তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাইছে—

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে,
তোমার মহাসন আলোতে বাতাসে;
গভীর কি আশায় বিপুল পুলকে,
কাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে॥'

*　　*　　*　　*

সেদিন যেন কী একটা উপলক্ষে কলেজ ছুটী ছিল। কর্ম্মহীন অলস দুপুরটা যা হোক যতীনদের বাড়ী একটু তাস পিটিয়েই কাটিয়ে দেবো এই মনে ক'রে বেরোবার উদ্যোগ ক'রতে বাবা ডেকে পাঠালেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। এমন অসময়ে ডেকে পাঠান'র মানে ?

বাবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বল্লেন—বসো আমার এই পাশটায় বিছানার উপর। বাবার পাশে বসে পড়তেই তিনি বল্লেন—ক'দিন ধরেই তোমায় একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছি। জানি আমার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে তোমার আপত্তি করবার কিছুই থাক্‌তে পারে না। তথাপি তোমায় এখন আমার একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, কারণ তুমি প্রাপ্ত-বয়স্ক।

ন্যায় অন্যায়ের বিচার বোধশক্তি তোমার এখন সম্পূর্ণ আছে। বিনয় তার শ্যালিকা অনুরূপার মেয়ে গীতার সাথে তোমার বিবাহ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। তারপর শুনেছি গীতাকে নাকি তুমি বেশ পছন্দও করেছ। আর গীতাও অবশ্য তোমার গৃহ-লক্ষ্মী হবার উপযুক্তা বটে। কিন্তু আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও এ কার্য্য হতে আমায় বিরত থাকতে হল। তার কারণ শুনেছি গীতার এক মাসীমা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে কুলের বার হয়ে গেছে। কাজেই এই কলঙ্কারোপিত পরিবারের সাথে আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে বংশ-মর্য্যাদার গৌরব খর্ব্ব করে দিতে পারি নে ও লোক-চক্ষে হেয় হতে পারিনে।

আশা করি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া তুমিও যুক্তিসঙ্গত মনে করবে না।

নীরবে মাটীর পানে চেয়ে রইলুম। এতোখানি বড় হইয়েও একদিনের জন্যও যার মুখের পানে চেয়ে সহজ ভাবে কথাটী পর্য্যন্ত বল্‌তে সাহস পাইনি আজ কি ভাবে তাঁর এতো বড় গুরুতর আলোচনার ভেতর মাথা তুলে প্রতিবাদ করবো! সে সাহস যে আমার নেই।

কিন্তু অন্তর আমার ভেতরে থেকে থেকে বল্‌ছিল—কেন, একজনের অন্যায়ে কী সবাই দোষী বলে সাব্যস্ত হবে, একজনের কলঙ্কের বোঝা কি অপর নির্দ্দোষ সবাই মাথা পেতে নেবে, একের অপরাধে কী সবাই তার জন্য লাঞ্ছিত হবে?

এত বড় সত্য কথাগুলো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলেও কী যেন অন্তরের দুর্ব্বলতার নিপীড়নে ভেতরেই রয়ে গেল।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বল্লেন—কী চুপ্ করে রইলি যে? বল, তোর কি ইচ্ছা।

তেম্‌নি মাথা নীচু করেই ধীরে ধীরে বল্লুম—ওসব আমায় জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন? আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে, এবং তাই আমি মাথা পেতে নেব।

তিনি বল্লেন—বেশ, তা'হলে তুমি এখন যেতে পার।

বেশ অনুভব করলুম বাবা যেন কী একটা গুরুতর সমস্যা থেকে অনেকটা হাল্কা হয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ পাঁচটী বছর কেটে গেছে।

মাথার উপর দিয়ে কত ঝঞ্ঝা, বিপদ বয়ে গেছে। মা নেই অনেক দিন। স্নেহময় পিতার আদরে মা'র স্মৃতি প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু তিনিও সেদিন আমার সকল যত্ন ও চেষ্টা বিফল করে দিয়ে চ'লে গেলেন কোন অজানার ডাক শুনে।

মনটা যেন কেমন উদাস হ'য়ে উঠ্‌লো। কিছুই যে আর ভাল লাগে না। চতুর্দ্দিক যেন নীরস বিস্বাদ!

পুরানো বৃদ্ধ ম্যানেজার হরিদা'র উপর জমিদারীর ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম ......।

এখানে সেখানে ঘুরে পুরী স্বর্গদুয়ারে সাগরের ঠিক উপরেই একখানা বাড়ী নিয়েছি—নিঃসঙ্গ জীবনটী কোন রকমে কাটিয়ে দেবার জন্যে।

* * * *

টেবিলটার উপর রূপোর ফ্রেমে আঁটা গীতার ফটো খানার পানে চেয়ে ভাবছিলুম—যে কোন দিন কিছু পেলে না, জীবনের বোধন মন্ত্র থামতে না থামতেই যার বিসর্জ্জনের রাগিণী বেজে উঠ্‌লো তার এই হারানো সুখের স্মৃতির সম্বল টুকুও যে তার নেই! এই দুটো দিনের জীবনে যে পেয়ে হারাণোর ব্যথা স্বেচ্ছায় বুক দিয়ে গ্রহণ করলুম সে ব্যথার পূজার কবে সমাপন হবে! আজ যে এ 'ব্যাকুল বাদল সাঁঝে' আমি নিতান্ত নিঃস্ব—রিক্ত ও বাঁধন-হারা।

হৃদয়ের কোণ থেকে কে যেন ব'লে বসলে—ইচ্ছে করলেই ত তুমি তাকে পেতে পারতে, ইচ্ছে করেই ত তুমি তাকে হারিয়ে ফেলেছ, সে ত তোমারি মুখের পানে চেয়ে ছিল, সেযে তোমায়ই চাইছিল .....

আর ভাবতে পারলুম না। উদাস দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। আর ব্যথাতুর মনটী ভেসে গেল সীমাহীন দিগন্তের পানে।

বিয়ের এক বছর না যেতেই নিরাভরণা গীতা যেদিন সাদা থান পরে এসে উপস্থিত হ'লো সেই যে হঠাৎ তার বাবা বুকে বেদনা পেলেন তাতে তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হ'ল।...........

ক্রমাগত ছয় মাস অনেক চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও রোগের কোনরূপ উপশম দেখা গেল না। অবশেষে ডাক্তার মত দিলেন, সাগরের উন্মুক্ত নির্ম্মল বায়ু গায় লাগাতে। অনেক জল্পনার পর ও বাড়ীর সকলের অনুরোধে বিজন বাবু পুরী যাওয়াই স্থির করিলেন।

* * * *

ভাল লাগে না—ওগো, আমার যে আর কিছুই ভাল লাগেনা.........। দিন দিন অন্তর্বেদনা যে আমায় পাগল করে তুলছে.....আজ কত দিন তাকে দেখিনি—কোথায় সে—কে জানে?

তা'কে যতই ভুলতে চেষ্টা করছি ততই যে তার স্মৃতিতে জড়িয়ে পড়ছি . ... ।

সে তো আমায় চায়নি। তবে তার এই না-চাওয়ার ভেতরেও তার জন্যে প্রাণে আমার এ ব্যাকুলতা কেন? কে সে আমার!

কথাটা মনে করতেই গীতার চোখ্ দুটো অশ্রু-পূরিত হয়ে উঠলো।

না, না—সে যে আমার—আমার দেবতা, আমার প্রিয়। আমার অস্ফুট প্রেম কাকলী যে তারই পরশে বিকসিত হয়ে উঠেছে—সে যে আমায় ভাল বাসতে শিখিয়েছে। এ তৃষিত বিক্ষুব্ধ হিয়া যে এখন ও তারি জন্যে কেঁদে কেঁদে মরছে। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যে তাকে পেতেই উন্মুখ হয়েছিল! তবে আমি কেমন করে তাকে ঠেলে ফেলব! . ...

নারী আমি সব কথা গুছিয়ে ব'লবার মত শক্তি যে আমার নেই! তাই বুঝি আমার পরিচয় একটুও পেলে না। অভিমান হ'লো—আমায় আর তোমার করে নিলে না।

ওগো অভিমানী, ওগো আমার দয়ীত, কতখানি যাতনা যে এ ব্যর্থতা আমায় দিচ্ছে তা বুঝ্‌তে পারছ কি?

উঃ.........মাগো, আর যে পারি না আমি। বল, ওগো—কত কাল, কত যুগ এম্‌নি ক'রে তোমার চাওয়ার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকতে হবে!

গীতার চোখ ফেটে অশ্রুর বন্যা বইল। সে গৃহে একা অনেক ক্ষণ কেঁদে কাটালে। তারপর নিজকে সান্ত্বনা দিয়ে চোখ মুছে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। একটা তপ্ত নিশ্বাস তার অন্তর থেকে বেরিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

সন্ধ্যা তখন তার কালো শাড়ীর আঁচল খানি বিছিয়ে দিলে সারাটা জগতের উপর। মলয় হাওয়া যেন বিরহে উতল হ'য়ে মৃদু লঘু ভাবে সারা বিশ্বে ঘুরে মরছিল কোন প্রিয়ার সন্ধানে। বসন্ত-বিরহ-কাতর কোকিল কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছে। গীতা একমনে লঘু মৃদু চরণ ক্ষেপে সাগর পারে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে কার এ করুণ উদাসবাঁশীর সুর তার কাণে পৌঁছে বুকের ভেতর কার চাপা ব্যথা জাগিয়ে তুল্‌লে!

এ যে সেই বাঁশী! সেই যৌবন প্রভাতে প্রথম দেখা তার সাথে—প্রথম শোনা তাঁর বাশী। তারপর কত ঝিল্লি মন্দ্র মুখরিত রাত, কত সাঁঝের বেলা, কত অলস শ্রম-ক্লান্ত দুপুরে সে ঐ বাঁশীর আকুল উচ্ছ্বাস শুনে প্রাণে কত আকুলতা অনুভব করেছে।

কৌতুহলী গীতা সেই সুর লক্ষ্য ক'রে চল্‌ল। সহসা তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল—এ কী...... !

অতি কাতর ও করুণ স্বরে সে ডাকলে—সজল দা।

বাঁশী বাজানো তখন আমার শেষ হয়েছিল। হঠাৎ এ কার কণ্ঠস্বর এই নির্জ্জন কান্তারে? মুখ ফিরে চাইলুম—শুভ্র-বসনা, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী।

বিস্ময়ের মাত্রা অনেকটা কমে আসতে সহজ স্বরে বল্‌লুম—এ কী গীতা?

গীতা ধীর সংযত স্বরে বল্‌লে - খুব আশ্চর্য্য হচ্ছ সজল দা, না! কিন্তু তোমরা আমায় আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেও আমায় কিন্তু আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসতে হলো। কী করি বল!

চোখ্ দুটো ভারী হ'য়ে এলো। গলার স্বরটা কেমন ধরে গেল। ধরা গলায়ই বল্‌লুম - আর কেন গীতা, জেনে শুনে যে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে নিলে, অনাহূত রিক্ততাকে যে সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করলে সে যে অন্যের জীবনে সার্থকতা ফুটিয়ে তোলবার মত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমায় ক্ষমা কর গীতা, ভুলে যাও সে সকল।

গীতা মাথা নীচু ক'রে বল্‌লে—আমিও কিন্তু এখন সেইটে ইচ্ছে করি সজলদা। কিন্তু ভুলে যেতে পারছিনা ব'লেই ভাব্‌ছি ভালবাসায় বুঝি দুঃখ আর কান্না ছাড়া কিছুই নেই। তা নয় তো পিছনে এই যে একজন নিজের বুকের গোপন ব্যর্থতার বেদনা টুকু নিয়ে সারা জীবনটা কেঁদে কেঁদে ম'রবে তার অপরাধ কোথায় সজল দা? যার পানে একবার কেউ ভুলেও ফিরে চাইলে না! যাক্—আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে আর কোন দিন তার সাথে তোমার দেখা হয় এ তার এখন মোটেই ইচ্ছে নয়।...

* * * *

সে চলে যেতেই ডাকলুম—গীতা!

সে তেম্‌নি চলে যেতে যেতেই মুখ ফিরে শুধু একবার চাইলে। দেখলুম- চোখদুটো তার কান্নায় ভরে উঠেছে।

বিশ্বসৃষ্টি

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

সমাপ্ত হইল যবে সর্ব্ব আয়োজন,
কঠিন ধরণী-পৃষ্ঠে লতা, গুল্ম, বন
সহসা শ্যামল শোভা করিল বিস্তার।
পর্ব্বতের বক্ষ ভেদি তীব্র স্রোতধার
বহিল বিপুল বেগে ; শস্য, ফল, ফুল।
সে ধারায় প্রাণ পেয়ে ভরিল দু'কুল।
জলে স্থলে লক্ষ লক্ষ জনমিল প্রাণী ;
তারপর কে আসিবে করে কাণাকাণি
দেবতা মণ্ডলী—
এই ধরণী—বিশাল
সুধু কি পশুর ভোগ্য রবে চিরকাল ?
আশাহীন, ভাষাহীন, জড়-পিণ্ড-প্রায়
চিরদিন সুধু প্রীতি আহারে নিদ্রায়।
অনাদি, বিজ্ঞানময় বিধাতার কর
সৃজন করিল যেই আত্মা অনশ্বর,
সে কি এই পশু, পক্ষী, কীটের ভিতরে
আবদ্ধ হইয়ে রবে চিরদিন তরে ?
নহে, নহে,
সৃষ্ট হোক্ আর একদল—
সর্ব্বজীব অধিপতি, সুন্দর, সবল,
কমনীয়, সুখপ্রিয়—কিন্তু নিরলস,
ভোগ-অভিলাষী— নহে রিপু-পরবশ ;
পরাক্রান্ত, তবু ক্ষমাশীল ; অভিমানী,
তবু সহে ধীরভাবে শত শত গ্লানি
আশ্রিত রক্ষণে ; মহীয়াণ্, গরীয়ান্।
স্বর্গরাজ্য হ'তে আরো শ্রেষ্ঠতর স্থান
করে আকিঞ্চন। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, তপস্যায়
বিধাতার তুল্য যারা সদা হ'তে চায়
বিভূতি, বৈভবে।
——সৃষ্ট হলো নর, নারী
আদি পিতা, আদি মাতা—কিশোর, কিশোরী।
প্রকৃতির নব শিশু, সুন্দর, সরল,
প্রতি পদক্ষেপে ঝড়ে লাবণ্য তরল ;
অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের কিবা কোলাহল !
এখনো করে নি পান তীব্র হলাহল
বাসনার। সুখ স্বপ্নে মগ্ন সদা রয়,
ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীন, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়।
সুগঠিত, নগ্নদেহ, নাহি লজ্জালেশ,
নাহি আবরণ ; সুধু অবিন্যস্ত কেশ
গুচ্ছে গুচ্ছে পৃষ্ঠে, বক্ষে অপূর্ব্ব প্রথায়
খেলে লুকোচুরি যেন সর্প-শিশু-প্রায়
প্রথম প্রভাতে।
তরুণ অরুণ করে—
জ্যোতিঃ মূর্ত্তিমতী হয়ে দিক্ আলো করে,
নন্দন-কানন সম বন-প্রান্তভাগে।
যুগল মূরতি ঘিরি যেন বা সোহাগে
শেফালী, বকুল ঝড়ে ; মলয় পবন,
কি এক মোহের স্বপ্ন করিছে বপন।
দয়েল, কোকিল, আর পাপিয়ার তান
করে নব বসন্তের আগমন গান।
শাখে শাখে পাখী, বনে মৃগ মৃগীগণ
যুগলে যুগলে করে প্রেম আলাপন
মুখে মুখ রাখি ;
ফুলে মধুপান করে
আত্মহারা মত্তভৃঙ্গ গুণ গুণ স্বরে।
সহসা হইল বন চঞ্চল মুখর।
অনুরাগে ধরে আসি কিশোরের কর
সুন্দরী কিশোরী। রোমাঞ্চিত কলেবর
আবেশে অবশ হয়ে কাঁপে থর থর।

অজানিত কি প্রচণ্ড সুখের প্রবাহ
শিরায় শিরায় বহে। বিশ্বে অহরহ
সৃষ্টি-বীজ পুষ্ট করে যেই আকর্ষণ,
আজি হ'তে হলো তার প্রথম গঠন।
প্রিয়া-মুখ দেখে নর অতৃপ্ত নয়নে,
বাঁধে বক্ষঃ মাঝে তারে নিবিড় বন্ধনে
চির জীবনের তরে।
করে আয়োজন
আপনারে নানারূপে করিতে সৃজন।
আদি পিতা, আদি মাতা সেই সৃষ্টি দিয়া
পুত্রকন্যারূপে বিশ্বে রয়েছে বাঁচিয়া।

পারের খেয়া

(নক্‌সা)

শ্রী.........

অদূরে পাহাড়ের পর পাহাড় আর আঁকা বাঁকা নদীর তীরে ঘাসে ঢাকা পথের রেখা ;—তারই ধারে শ্বেত পাথরের বড় বাড়ীটা।

ভোরের হাওয়ায় ভেসে সে কোকিল পাপিয়ার প্রাণমাতানো সুরের রেশটকু। জেগে ওঠে—দোল দেওয়া গাছের পাতায় পাতায় বসন্তের আকুল করা শিহরণ—চুমু খেয়ে যায় কুয়াসাকাটা সূর্য্যের তরুণ আলো—প্রাণ মেতে' যায় ঝরা শিউলির অফুরন্ত সুবাসে। পাগল হাওয়ার পরশ লাগে ছোট নদীর বুকের উপর—নেচে যায় ছোট ছোট ঢেউগুলি তালে তালে।

চারদিকে যখন এমনি বিচিত্রতা—ঘুম-ভাঙ্গা আঁখী নিয়ে সে জাগলো বিভোর বিহ্বল আত্মহারা হ'য়ে।

সে ধীরে ধীরে বসলো যেয়ে ঝর্ণার পাড়ে, বেলি ঝাড়ের পাশে একখানা পালিশ মর্ম্মরের উপর—উদাস ভাবুকের মতো।

ভোরের হাওয়ার মাতামাতি নূতন আলোর স্নিগ্ধ কিরণ আর পাতার কাঁপুনি দেখলো। পাখীর গানের নহ'বৎ' ঝর্ণার ঝর ঝর, পাতার ঝির ঝির মন দিয়ে শুনলো—

পাগল হ'য়ে উঠলো, অস্থির হয়ে গেল, কোন অজানার ব্যাকুল করা ডাকে।

রৌদ্রের তাপ বেড়ে যেতে সে চলে এলো সেখা'ন থেকে। তারপর ফুল কুড়ালো মালা গাথলো, দুপুরের জমাট-বাধা নিস্তব্ধ গুমট যখন বাহিরের পিঠ পোড়ান রোদের দোলায় চড়ে সংহার লীলা আরম্ভ করলে—পারলো না সে তখন তার চিন্তার ধারা ঠিক রাখতে, সব এলোমেলো হ'য়ে গেল।

ভোরের আলোর মধুর পরশে—ফল ফুলের পশরায়, পাখীর গানে, ঝর্ণার আকুল শিহরণে প্রাণে যে কোমলতা পেয়েছিল—তা এখন রুদ্র কঠোর হ'য়ে উঠল বাইরের রোদেরই মত।

সে যেয়ে ফুলগুলি ছিড়ে দিলে—ডালগুলি মুচ্‌ড়ে

দিলে, কোকিল পাপিয়াকে ঢিল ছুড়ে তাড়িয়ে দিলে……… ।

রোদের তেজের নেতিয়ে পড়া ফুলগুলি আবার বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ার শীতলতা পে'য়ে সজীব হ'য়ে উঠল। ঘর ছেড়ে যাওয়া পাখীর দল আবার গাছের পাতার আড়ালে ব'সে নূতন সুরে গান ধরলো—করুণ কোমল সুর।

এবার আর ভোরের মত জাগিয়ে দেওয়া গান নয় কর্ম্মক্লান্ত বিদায় বেলার অবসাদের গান। প্রভাতের সোনালী আলো দুপুরের রুদ্রমূর্ত্তি ছেড়ে আবার আপনার কোমলতা ফিরে পে'ল।

তা'র মনও কেমন হ'য়ে গেল। প্রকৃতির সাথে সাথে সেও যেন কোমল শান্ত হ'য়ে এল। সে গিয়ে জুঁই কেয়ার মালা গাঁথল। মনে হল তা'র আর সময় নেই। বিদায়ের গান যেন গুমরিয়ে উঠছে প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষের ভেতর দিয়ে ভাষাহীন নীরব সঙ্গীতে……… ।

……সে হেঁটে গেল পাহাড়ের কাছে-হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে গাঁথা মালাগুলি হাতে ক'রে। সে আজ এসেছে বিদায়ের পূর্ব্বে এগুলি পাহাড়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে।

কারণ সে ভাবলো হয়ত তা'র এই ভেসে যাওয়া অর্ঘ্য একদিন আকাশ-চুম্বী সাগরের সেই সীমাহীন দিগন্তে তা'র দেবতার কাছে গিয়ে পৌছবে।

……নদীর জলে সে তা'র মালাগুলি ভাসিয়ে দিল। স্রোতের অনুকূলে মালাগুলি ভেসে চল্‌লে সাগর অভিসারে। সেও আপন কুটীরে ফিরে এল…… ।

* * *

পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য্যের শেষ আলোটুকু যখন মুছে যাচ্ছিল সে দেখলে, দূরে সমুদ্রের পাড়ে খেয়ারী তার আপন নৌকা বোঝাই কর'ছে।

সে পাগলের মত ছুটে বেরুল, এ খেয়ায় না গেলে যে তা'র আর আজ যাওয়া হবে না! ….. …।

রৌদ্রের শেষ ঝলক তখন আকাশের কোণ থেকে একেবারে মুছে গে।

সমুদ্রের পারে ছোট একখানি খেয়া- একজন খেয়ারী মাঝি, নৌকায় আর একজন হ'লেই এ খেয়া চলে যাবে অকূল সমুদ্রের অজানাতীরে… …।

সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, পাখীর কোলাহল থেমে গেছে। সুধু বাতাসের হুহু শোনা যায়।

এক যাত্রী—সে বায়ুর বেগে চলেছে—খেয়া ছাড়ে ছাড়ে এমনি সময় সে ঘাটে এসে প'ড়ল.. …। খেয়া চলেছে, উঃ—তার কি আনন্দ!

বুক তা'র ভ'রে গে'ছে অপার্থিব আলোকের পরশে—ঐ 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে' আসা স্বর্গীয় সঙ্গীতের লহরে, চেয়ে রই'লে নির্ণিমেষে সে অজানা তীরের যাত্রীর পানে।

জ্যোৎস্না জাগলো তা'র স্নিগ্ধ মধুর আলো নিয়ে……… ।

খেয়া নৌকা কিন্তু তখন অনেক দূর চলে গেছে।

সৈনিকের চিঠি

(৮)

…… ডেলী, ফ্রান্স।
২৪শে আগষ্ট, ১৯১১
সকাল।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

গত চিঠিতেই জানিয়েছি কোথায় এসে পৌঁছেছি। এই উপত্যকার নাম আমি জানি নে। তাই লিখ্‌লুমও না। তুমি যে এতে আমাকে একটা আহাম্মক ভাব্‌বে তা' বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু পরের কাছে আহাম্মক বন্‌তে যাওয়ার চেয়ে, তোমার কাছে আহাম্মক বন্‌ব এতে আমার মোটেই দুঃখ নেই।

আমি যেখানে আছি সেখানে শত্রুরাও মস্ত আস্তানা ফেলে বসে আছে। আমাদের তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তারাও কিন্তু কম হুসিয়ার নয়। সুযোগ বুঝে, তারাও আমাদের কম জব্দ করে নি।

বাপ্‌রে! বন্দী হয়েছিলুম আর কি, যদি না লুইস্‌ গানটা' কাছে থাক্‌ত। মিনিটে ছ' আউন্স করে গুলী ছুড়ে ওদের আর অগ্রসর হ'তে দিই নি। তারা কিন্তু প্রায় আমাদের কেম্পের (Camp) উপর এসে পড়েছিল। যা'হক্‌ এবারকার মতো কোনো রকমে বন্দী হতে হতে বেঁচে গেলুম।

মেজর সাহেবকে সব খবর জানালুম। কয়েকজন এখানে পাহাড়া রেখে আমাকে আবার তাঁর ওখানে ফিরে যেতে হুকুম করেছেন।

তাই এখানে ফিরে এসেছি।

—এইমাত্র ডাক এসেছে। ডাক রাত্রেই আসে আজ কি কারণে সকালে আস্‌তে বাধা হয়েছে। গোলাগুলি যে গাড়ীতে আসে, সেই গাড়ীতেই ডাক আসে কি না। আজ এই বিলম্বটুকু সৈনিকদের ভেতর কি যে একটা অবসাদ এনেছিলো তোমাকে লিখে বুঝাতে পার্‌ব না—তুমিও হয়ত বুঝ্‌তে পার্‌বে না। কার্ব্বলিক এসিড্‌ গায়ে পড়্‌লে, সাপ যেমন এলিয়ে পড়ে আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছিল অনেকটা। আমাদের দেহ যেন কেমন অবশ হয়ে পড়েছিল।

সব্বাই কেবল, কখন আসে কখন আসে এই রকম করে ঘর বার হচ্ছিল। যেই মাত্র গাড়ী এলো হুড়্‌ হুড়্‌ করে সব ছুটে বেরিয়ে গেলো।

এই যে সময়টুকু—এর জন্যে যে আমাদের কতটুকু আগ্রহ, কত ব্যাগ্রতা,—তা তুমি বুঝ্‌বে না। যদি বুঝ্‌তে তবে—। যাক্‌, সব এক লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে—মাটীর নীচে গর্ত্ত পর্য্যন্ত। সব গোলাগুলি ওখানেই জমা হয় কিনা, সব নামানো হচ্ছে—হাতে হাতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। কারণ, গোলাগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গর্ত্তে জমা হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত mail bag খোলা হবে না। তাই সব্বাই মিলে, মিলে, তাড়াতাড়ি সব নামিয়ে নিচ্ছে।

যেইমাত্র শেষ গোলটি গর্ত্তে জমা হল, অমনি সকলে সার্জ্জেন্ট মেজরের হলের দিকে ছুটল। যাদের চিঠি আসার কথা তারাও ছুটে,—যাদের আস্‌বে না জানে, তারাও যায়, যদি কেউ লিখে থাকে—আর যাদের কোন দিনই আসেনা, আজো আস্‌বে না তারাও যায়, কি জানি, যদি এ ছাড়াছাড়ির বেলায় হঠাৎ কেউ মনে করে থাকে? উঃ কি হুড়াহুড়ি, আর কি ব্যাগ্রতা!

সার্জ্জেণ্ট মেজর একে একে নাম পড়ে যেতে লাগ্‌লেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড bag সব শূন্য হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে সকলে চলে গেলো। আবার সেই স্থান নির্জ্জন হয়ে উঠল। কেবল যাদের চিঠি আসে নি, তারা দাঁড়িয়ে রইল কি জানি হয়তঃ bagএর মধ্যে দু একটা রয়ে গেছে। সার্জ্জেণ্ট মেজর সব bag গুলো আবার উল্টিয়ে ঝেড়ে দেখ্‌লেন। নেই কারো কিছু নেই। আজকের মত পথ চাওয়া সকলেরই ফুরালো।

তুমি হয়ত জিজ্ঞেস কর্‌বে সৈনিকরা কেন আগে মালপত্র নামিয়ে নিতে ছুটে যায়?

কেন যায় জান? আমাদের নিয়ম যতক্ষণ না শেষ শেলটি গর্ত্তে জমা হবে ততক্ষণ mail bag খোলা হবে না। যত বিলম্বই হোক্‌, নির্ব্বিঘ্নে সব গর্ত্তে না পৌছান পর্য্যন্ত প্রণয়িনীর, বন্ধুর, মায়ের, প্রিয়তমা পত্নীর, ছেলে মেয়ের সকলের চিঠি থলিতেই আবদ্ধ থাক্‌বে। এখানে কোন ওজর আপত্তি খাটে না—অথচ আমাদের মোটেই সবুর কর্‌বার ধৈর্য্য থাকে না। তাই আমরা গোলাগুলি নামিয়ে নিতে ছুটে যাই যদিও আমাদের কাজ তা' নয়।

তুমি ভেবো না যে, আমিও সাধারণ সৈনিকদের মতো ছুটে যাই। তা' হবার উপায় নেই। কিন্তু আমার প্রাণ চায়, যদি অন্ততঃ এই সময়টুকুর জন্যেও আমি সাধারণের মতো হ'তে পার্‌তুম!

আমার চিঠি আর্দ্দালীতে এনে দেয়। আমি কিন্তু মোটেই সেই সময়টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি নে। কেবল ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি। সময় সময় নানা অছিলায় বেরিয়ে দেখি আর্দ্দালীটা আস্‌ছে কি না।

এইমাত্র আর্দ্দালী ডাক দিয়ে গেলো। নিমেষে সব কটা চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলুম,—কিন্তু আমার সব চেয়ে পরিচিত মানুষটির কোন চিঠি নেই দেখ্‌লুম। বড্ড দুঃখ হল। তোমার নিষ্ঠুরতাকে গাল না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না। আমার যে কত কষ্টে দিন কাট্‌ছে, তা' কি বুঝ্‌ছনা, তুমি কেন বুঝ্‌বে না? আমার এক একটা মিনিট যেন এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্চে!

এতক্ষণ বসে ভাব্‌ছিলুম, তোমার চিঠিটা কতবার পড়্‌ব হয়ত গুণে শেষই কর্‌তে পার্‌ব না। আর যে সব জায়গা খুব ভালো ঠেক্‌বে, সে সব জায়গা কত শতবার পড়ে ফেল্‌ব—কণ্ঠস্থ করে ফেল্‌ব,—আর সময় সময় আবৃত্তি কর্‌ব। কিন্তু আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, যে—অতবড় সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মি নি!

সব্বাই চিঠি নিয়ে বসে গেছে—অবশ্য যারা যারা পেয়েছে। আর যারা পায় নি, তারা কেউ শুয়ে আছে,—আর কেউ বন্ধুর চিঠি পড়েই নিজের অভাবটুকু পূরণ কর্‌ছে। আমি একবার চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালুম। ক্ষণকালের জন্যে যুদ্ধের সব হাঙ্গামা থেমে গেছে সবাই যেন মুহূর্ত্তের জন্যে স্মৃতি শান্তি ও স্নেহের কোলে ফিরে গেছে।

আজ প্রায় সব্বাই দু একখানা পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী পেয়েছে Daluni (ডেলুনী।) তার পত্নীর কাছথেকেই পেয়েছে তিনখানা। বছর তিন আগে, অর্থাৎ যুদ্ধের কিছু আগে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু বেচারা তার প্রিয়তমাকে নিয়ে হানিমুন (Honey moon) খেলার অবসর পায়নি মোটেই। সে যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিয়ে করে এসেছে কেন জান? তার ভয় যদি যুদ্ধ শেষে গিয়ে তাঁকে না পায়? মিলনটাও তাদের খুব আশ্চর্য্য রকমের এবং বেশ রোমাণ্টিক।

অবশ্য, বেচারা মরণকে বড্ড বেশী ভয় করে—কিন্তু সম্মুখ বিপদে কখনো পিঠটান দেয় না। অন্যান্য বীরের মতো সেও এগিয়ে চলে। সে ভীরু মোটেই নয়। সে আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই তার প্রেমের কথা সব আমাকে বলেছে। তোমারও হয়ত বড্ড সাধ হচ্ছে জানতে, নয়? আচ্ছা বল্‌ছি তা হলে!

'জুলীর' (Jully) সঙ্গে আমার দেখা এক 'হোটেল পেভিলনে'। (Hotel pavillon) জুলী ছিল সেখানে একজন সিগারেট বিক্রেতা। সেখানে

সে একাই ছিল না। যত বিক্রেতা ছিল সকলেই ছিল মেয়ে—সুন্দরী যুবতী। সে একটি কোনে ক্রেতার আশায় বসেছিল। প্রথমে কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্যও করেনি। কিন্তু যখন তাঁর দিকে সকলের চোখ পড়্‌ল, তখন আর কেউ অন্যের কাছে যেতে চাইল না। ইস্! তাঁর দোকানে কি ভিড় জমে গেলো। সত্যি,সেখানে তাঁর মতো সুন্দরী আর কেউ ছিল না। সুন্দরের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে কি না, তাই বোধ হয় সব সেখানে জড় হচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কেউ বেশীক্ষণ সেখানে থাকৃতে পার্‌ছিল না। কিন্তু আবার কোনো কিছু নেবার অছিলায় ফিরে আস্‌ত—মিষ্টি আলাপ জমাবার চেষ্টা কর্‌ত।

আমি যখন সেখানে গেলুম, তখনও বেশ ভিড় ছিল। আমাকে সে হেসে অভিনন্দন জানালে। এতে সেখানকার সকলের চোখে মুখে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সব চেয়ে বেশী বিমর্ষ হ'ল 'ফিলিপ' (Phillip)। পরে জান্‌তে পেরেছিলুম, 'জুলীর' সাথে নাকি 'ফিলিপের' কোর্টসিপ্ চল্‌ছে। যাক্, আমি যে তাঁকে তক্ষণি ভালোবেসে ফেল্‌লুম, তা তোমাকে না বল্‌লেও হয়ত বেশ বুঝতে পার্‌ছ। কিন্তু অন্যান্যদের মতো আমাকেও ভদ্রতার খাতিরে চলে যেতে হলো—যদিও তক্ষুণি আবার সিগারেট কিন্‌বার অছিলায় তাঁর কাছে ফিরে এসেছিলুম। সিগারেট দেবার সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে দিতে গিয়ে তাঁর হাত আমার হাতে ঠেকে গেলো। অনুভব কর্‌লুম, তাঁর হাত যেন একটু কেঁপে উঠ্‌ল। আমাকে ভালোবাসার দরুণ যদি তাঁর এ রকম হয়ে থাকে, তবে—

যাক্ আমি চলে এলুম। পরদিন তাঁর আমার আবার দেখা—এক নাচের মজ্‌লিসে। তাঁর সাথে যে 'ফিলিপ'ও ছিল, তা' হয়ত না বল্‌লেও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ। জুলী' আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই ছুটে এসে অভিনন্দন জানালো এবং আমার সাথেই একটা কৌচে বসে পড়্‌ল। বিদায়-বেলা, সে আমাকে পরের দিন তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজনে উপস্থিত থাকৃতে অনুরোধ করে গেলো। আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য্য হই নি, কারণ আমার বিশ্বাস আছে যে,—সে আমার, সে আমার হবেই—যদি তাঁকে সত্যি ভালবাস্‌তে পারি।

আমাদের আশে পাশে আর যে দু-চারজন তরুণ যুবক বসেছিলো, তারা 'জুলীর' সাথে এলোমেলো আলাপ জমাবার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু 'জুলী' তেমন করে তাদের সাথে যোগ দিচ্ছিল না।

পরদিন আমি কিন্তু সময় হবার আগেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলুম। সে আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলো। বাসন্তী রংয়ের পোষাকে, সে সেদিন সজ্জিত হয়েছিলো, মাথায় একটা মখ্‌মলের টুপী বাঁকা করে বসান ছিল এবং তাতে তাঁর সৌন্দর্য্য আরো বেড়ে উঠেছিল। কি বল্‌ব, সেদিন কি অপরূপ বেশে তাঁকে দেখেছিলুম—আর কত সুন্দর তাঁকে দেখেছিলুম! আমি ভুলেই যাচ্ছিলুম যে সে 'জুলী' বসন্ত-রাণী নয়! সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল তাঁর তরুণ চোখের চঞ্চল চাহনী। আমার মধ্যে যেন সে চাহনী বসে যাচ্ছিল—আর আমার তরুণ বুকে শিহরণ এনে দিচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম এই জন্যে যে, সেদিন 'ফিলিপকে' সেখানে দেখ্‌তে পেলুম না।

ভোজ-শেষে যখন ফিরে যাচ্ছি, তখন রাত দশটা হয়ে গেছে। 'জুলীদের' বাগান পার হ'তে যাচ্ছি, হঠাৎ গুলী খেয়ে পড়ে গেলুম। শব্দ শুনে জুলীরা সব ছুটে এলো, আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলো এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি আমার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে পেলুম—অবশ্য ডাক্তারদের ঐকান্তিক যত্নের ফলে। গুলী আমার পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই বেঁচে গেলুম।

পরে জেনেছিলুম ফিলিপ জুলীকে হারাবার ভয়ে আমাকে এ দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় দিতে চেয়েছিল। অবশ্য জুলীও যখন এ খবর শুন্‌ল তখন থেকেই 'ফিলিপের' সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে দিলো।

এতে 'ফিলিপ' আরো উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল এবং আমাকে বিপন্ন কর্‌বার সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌লো। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে আমি আর বিশেষ কোনো বিপদে পড়িনি। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা—আমার ঐ আঘাতই আমাকে জুলীর হৃদয় জয় কর্‌বার সুযোগ করে দিলো। শেষে আমাদের মিলন হয়ে গেলো। যুদ্ধে চলে আসার বেলায়ও 'জুলী' সে-ই বাসন্তী রংয়ের পোষাক পড়ে মখ্‌মলের টুপীটা উড়িয়ে আমায় বিদায় দিয়েছিল।

সত্যি ডেলুনীর সুখে আমার বড্ড হিংসা হয়। আজ আমারও যদি এমনটি হ'ত, তো কত সুখী হতুম জীবনে। তার মত চিঠি পেতুম! জুলী যেম্‌নি ভাবে তাকে চল্‌তে বলে, তুমিও তেম্‌নি করে আমায় আদেশ দিতে, আমি চল্‌তুম, বুকভরা সাহস নিয়ে চল্‌তুম।

কিন্তু তা'তো হ'বার নয়! আচ্ছা—তা না হলেও তো আমরা একজন আরেক জনকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি! আমাদের চিঠি লিখ্‌তে দোষ কি? দোষ যে কিছুই নেই, তা' তুমিও বেশ বুঝ কিন্তু তবু কেন লিখ না? অবসর মেলে না? অত কি কাজ থাকো রাণী? কিসে ব্যস্ত থাক? লেখাপড়া? সেলাই? না হাঁসপাতাল duty? কোন্‌টা? ওঃ—সত্যিই তো তোমাকে ঢের কাজ কর্‌তে হয়!

ঐ যাঃ—ভুলেই গেছলুম যে তোমার 'ভুণ্ড' বেড়ালটা তিনটে বাচ্চা দিয়েছে—তাই নিয়েই তুমি ভয়ানক ব্যস্ত! ভগবান করুন, ওগুলো শীগ্‌গীর মরে যাক্‌। না না—বেচে উঠুক,—শীগ্‌গীর বেড়ে উঠুক। বাপ্‌রে! মর্‌লে হয়ত আর কলমই কালীতে ভিজ্‌বে না—তা' আমার খেয়ালই ছিল না।

হাঁ—একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। 'ডেলুনী' আমায় বলে কি জান? সে বলে যে জুলীর মতো সুন্দরী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। তাঁকে যে দেখ্‌বে সে-ই তাঁকে পেতে ব্যগ্র হবে। পাগল আর কি! ও জানে না যে, আমার অন্তরের, আমার কলিজার মানুষটার চেয়ে সুন্দরী, 'জুলী' হতেই পারে না। সে তোমায় দেখেনি তা বলেই ও কথা বল্‌ছে। সেই হেনার ঝাড়ের ধারে যদি একদিন তোমায় সে দেখ্‌ত তবে হয়ত তার সে ভুল ভেঙ্গে যেতো। আমি তাকে এ কথা বলেছি কিন্তু সে কিছুতেই তা' স্বীকার কর্‌ছে না। যাক্‌ সে স্বীকার করুক আর নাই করুক, আমার মনের কোণে চোখের সাম্‌নে সবই স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠ্‌ছে—কত সুন্দর তুমি !!!

* * *

উঃ!—কি আগুণ বৃষ্টি আর কি ভয়ানক শব্দ! আকাশ ধোঁওয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়! মনে হচ্ছে, যেন সমস্ত পৃথিবীতে কে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে। চারিদিক থেকে বোমা আর গোলা ফেটে আগুণের ফিন্‌কি বেরুচ্ছে! কি মত্ততা আগুণের? যেদিকে চাওয়া যায়, আগুণ আর ধোঁওয়া ছাড়া—আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তুমি হয়ত আমার কথা মোটেই বুঝতে পার্‌বে না—প্রচুর কল্পনা থাক্‌লেও না।

চারিদিকেই লাল! আকাশ লাল—মাটী লাল—মানুষের দেহ লাল—কেবল লাল আর লাল। আগুণের ফিন্‌কিতে আকাশ লাল হয়ে গেছে, রক্তে মাটী লাল হয়ে গেছে, বোমার ঘায়ে, বেয়োনেটের খোঁচায় রক্ত ছুটে মানুষের দেহও লাল হয়ে গেছে। তুমি যদি দেখ্‌তে তো নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতে!

ইস্‌! কি বিশ্রী গন্ধ! শ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে—ভিতরের সমস্ত নাড়ী যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌ছে! বাপ্‌রে!—মানুষ-মারা ধোঁওয়া। মানুষ মারার যত ফন্দী—এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে।

ধোঁওয়ার কথাটাও হয় ত তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না। এক রকম ধোঁওয়ার মতো গ্যাস্‌—মানুষ মারার জন্যে তৈরী হয়। শত্রুদের আস্তানা কোন্‌দিকে, যদি জানা থাকে আর বাতাস যদি ঐ দিকেই বইতে থাকে—তবে সে গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠে এবং যারা

ঐ বাতাস টেনে নেয়, তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু হয়। কখন কখন আবার নিজেদের লোকও মরে। হয় ত বাতাসে গ্যাস্ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর হঠাৎ বাতাসের গতি ঘুরে গিয়েছে—তখন শত্রুরা না মরে নিজেরাই মরে! ভারী বিশ্রী জিনিষ এ-টা!

ঐ যাঃ! আমার আর্দ্দালীটা মারা পড়্‌ল। বেশ ঘুম ঘুমুচ্ছে সে। আর জাগ্‌বে না-কোনোদিন! এক সঙ্গে শত শত কামান যদি গর্জ্জে উঠে গুরুম্ গুরুম্ শব্দে, শত শত বোমা যদি ফেটে উঠে ক্রম ক্রম শব্দে-সহস্র সহস্র রাইফেল যদি গর্জ্জে উঠে ফট্ ফট্ শব্দে-তবু না। তবু আর চোখ খুলে চাইবে না। সে বেশ শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।

মা গো-কি ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। আমার 'ওয়াটার বটলে' (water bottle) ও যে এক রত্তি জল নেই। সব ফুরিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। আজ বড্ড হয়রাণ হয়ে পড়েছি। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার জোগাড়। কাছেও তো আর কেউ নেই, যে চেয়ে নেবো!—সব মারা পড়েছে। আমি একা বেঁচে থেকে লড়্‌ছি—শত্রুদের অগ্রসরে বাঁধা দিচ্ছি। না, আর যে পার্‌ছি না। কোয়ার্টারে ফোন্ কর্‌লুম কিন্তু কেউ এলো না রিলিভ্ কর্‌তে। আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। একটু জল যদি পেতুম।—

দেখি গার্ড বন্ধু তো হাঁ করে মরে পড়ে আছে; তার 'বট্‌ল্‌টায়' একটু আছে কি না। আছে—আছে, একটু মাত্র! কি বন্ধু! হাঁ করে আছ যে। তোমারও তেষ্টা পেয়েছে না কি? না, যাক্—নিজে বাঁচলে তো তোমায় দেবো? তোমার কথা ভাব্‌তে গেলে এখন আমার চল্‌বে কেন?

আঃ এক ফোটা জল কত মিষ্টি! গভীর তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল যে কত মিষ্টি—যারা এ অবস্থায় পড়েনি কোনো দিন, তারা কি করে বুঝ্‌বে—আর আমিই বা কেমন করে বুঝাব?

ঐ যাঃ—'লুইস্ গানটা'ও যে আমারই মতো হয়রাণ হয়ে পড়েছে দেখছি! কি হে,—চল্‌ছ না যে আর? না না—তোমার তো হয়রাণ হলে চল্‌বে না? তোমাকে যে চল্‌তেই হবে—আমাকে বাঁচাতেই হবে। তোমার এ বেলা শত্রুতা কর্‌লে চল্‌বে কেন?

না-হ'ল না! অনবরত চালিয়ে চালিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ যে, ওখানে আর একটা রয়েছে—ওটাতেই কাজ চালাতে হবে। কিন্তু ওখানে যাই কি করে? যে ভাবে গুলী ছুড়্‌ছে শত্রুরা—কি সাধ্য অগ্রসর হব? বসে থাক্‌লেও তো চল্‌বে না। যেতেই হবে-যা' থাকে কপালে!

ঝপ্! ঝপ্!! ঝপ্!!! লেফ্‌ট! রাইট!! লেফ্‌ট!!! ঐ আমার সাহায্যকারী দল এলো! যাক্—

উহ্—মা—গো—

—শান্তি চৌধুরী।



মিলন শঙ্খ

(বড় গল্প)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

(এক)

দুর্ভাবনা যখন মানুষের মনকে আশ্রয় করে...... তখন মনে জেগে ওঠে নানা অবান্তর কথা......... ... প্রকৃতির শ্যাম শোভাই যা শান্তি দেয় এই সময়...... দগ্ধ হৃদয় নিয়ে পল্লীর কোলাহল-মুখর কুটীর হ'তে শান্ত স্তব্ধ কালোজলে পূর্ণ বড় পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে এসে বসলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে......... চারিদিকেই শান্তির আগমন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে— সান্ধ্য বায়ুর স্পর্শে জলের হৃদয়ে স্পন্দনের সৃজন হ'লো...... সেই স্পন্দন রবির রাঙা মুখখানা বুকে করে তার আরক্তিম গণ্ডে শত শত চুমার স্পর্শ এঁকে দেবার জন্য ছুটে আসছে......কি সুন্দর.. ......কি মনোহর! সাঁঝ আকাশের সেই সোনার ছবি......কোন্ অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের মত এই ছবি তার কুহক মন্ত্রের প্রভাবে ভুলিয়ে দিলে সব জ্বালা........... সকল যন্ত্রণা ডুবলো ও কালোজলে......... ...সবুজ মনটাকে পেষণ যন্ত্রণার মাঝে ফেলে দেয় যে সব দানব............... যাদের সহুঙ্কার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গের মত বিষ উদ্গীরণ করে............সে সব চলে যায় দূরে ...বহু দূরে...।

জলের কালো বুক হ'তে কনক রশ্মি রেখা মিলিয়ে দিয়ে সূর্য্য লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে...... ...... তার গোপন প্রিয়া সন্ধ্যার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যা তারার মালার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে হ'ল আমার স্নেহময়ী মার কথা, আদর, ভালোবাসার কথা...... ...সেই মুখ, সেই ম্লান মুখ যেন জগতের ব্যথায় ম্রিয়মান। মনে পড়ল পাঁচ ভাই যখন ষড়যন্ত্র করে মৃত্যুরহস্যের সিদ্ধান্ত করতে অজানা রাজ্যে expedition আরম্ভ করল...............আর বাবাও যেন তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করবার জন্য কম্বল মাত্র সম্বল করে ছুটে বেরুলেন.........বর্ত্তমানের তীব্র বিভীষিকার দিকে পশ্চাৎ করে কোন অজ্ঞেয় লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের গর্ভে... . ...এই সব ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করেও সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত মা আমার সে সব সহ্য করে পক্ষীমাতার মত তাঁর স্নেহপ্রবণ ডানা দিয়ে আমাদের দুই ভাই বোনকে সকল রকম দুঃখ দাহন হ'তে আড়াল করে রেখেছিলেন . ... আজ সে সব স্মৃতির আঘাত নতুন করে মনে জাগ্‌ল। যে দিন ওপার থেকে তাঁরও ডাক এল, তখন মনে হ'ল সুখের আস্বাদ আমাদের কাছে সুরার মত নিষিদ্ধ .. ..আমরা শুধু অনুভব করতে এসেছি দৈন্যের হাহাকার...ব্যথার আর্ত্তনাদ!...

দাদা অতুল ছিলেন। তাঁর ছিল স্নেহ ভালোবাসা ....আর আমার এই তরুণ হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা আকাঙ্ক্ষা...। একদিন বিধাতা এ দুয়ের মাঝেও বিরাট চীনের প্রাচীর গেঁথে দিলে......... সে আমারই সমবয়সী একটা মেয়ে। আমার আত্মার অভিমান সব ভাসিয়ে দিলে সেই চঞ্চলা কিশোরীর ক্রুদ্ধ ফুৎকার.......... . অনুকম্পার বিনিময়ে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মানের ঝুলি উজাড় করে তাঁকে দিয়ে আমার তাঁর প্রসাদ কামনা কর্‌তে হ'বে।

এই সব অতীতের ইতিহাসের পাতার পর পাতা অমনোযোগী পাঠকের মত উল্টিয়ে চলেছি........... সন্ধ্যা রাণীর চঞ্চল পাদ বিক্ষেপে বিধাতা ঠাকুরের বিরাট কালির দোয়াত উল্টে যেয়ে ধরণী মসীময়ী হয়ে গেছে... ....হঠাৎ কার স্পর্শ গায়ে ঠেকল

সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল ? কে,কে এখানে · কে আপনি এত রাত্রে······ ? উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার বসলুম···।

মাপ করবেন—অন্ধকারে দেখ্‌তে পাইনি ··· কিন্তু আমি সংকার করে ফিরছিলেম·········· আপনাকে এই রাত্রে আবার স্নান কর্‌তে হ'বে।

মনে হ'ল এ যেন চেনা গলা ··············সাহসে বুক বেঁধে বল্‌লুম কে··········· রবিদা ?

তুই লীলা······ ······ ? ধন্যি মেয়ে যা হোক্‌··· এই অন্ধকার রাত্রে একি ছেলে মানুষী তোর ?···· এত রাত্রি হ'ল—

······সে ত হ'ল—; কিন্তু রবিদা'!—তুমি যে রাত্তির বারোটাই হোক্‌ - আর তিন টাই হোক্‌··· যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও তোমার বাবা কিছু বলেন না ? আর নারী আমরা আমাদের বেলাতেই বুঝি শাসন··············মানসিক যন্ত্রণা হ'তে দূরে থাক্‌বার জন্য ঘাটে বসে থাকাটাই দোষের········· কেন এ প্রভেদ ? কেন এ অবিচার ? বৌ ত' আমায় দেখলেই ঝাঁটা তোলে·········তার রণচণ্ডী মূর্ত্তির বিকাশ আমায় টলাতে পারবে না—কথ্‌খনো পারবে না—এ আমি বলে রাখলুম।

বক্তৃতা পথে যেতে যেতে শুন্‌বো লীলা············ দাঁড়া একটু—দুটো ডুব দিয়ে নিই···।

(দুই)

পূর্ব্ব সম্বন্ধের দোহাই দিতে গেলে বাঙলা দেশের পনেরো আনা কুলীনকে পরস্পর কুটুম্বিতার বন্ধনে বদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ রবিদার সঙ্গেও আমাদের একটা ঐরূপ সম্বন্ধ আছে·········রবিদা'র বৃদ্ধ প্রপিতামহ আর আমার প্রপিতামহ ছিলেন মামাতো পিস্‌তুতো ভাই···।

মা ছিলেন যে বংশের মেয়ে, তাঁদের সঙ্গে নাকি কয়েক পুরুষ আগে মুসলমানদের সহিত সংস্পর্শ আসে। অবশ্য সেটা উহাদের অজ্ঞাতসারে বিধর্ম্মী যবন জমীদারের প্রভাবেই হয়েছিল। এত বড় কলঙ্কটা যে কিরূপে এই দীর্ঘ দুশো বৎসর চাপা দিল তা ভাবা যায় না। এর চেয়ে আরও আশ্চর্য্য এই প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক ব্যাপার কিরূপে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ সমাজ-পতিরা দুশো বৎসর পরে পুনরায় আবিষ্কার করলেন। বাবার নিজের আচরণগুলোও নাকি শুনেছি পাড়ার লোকাপবাদের সাথে খাপ খেত না—তিনি যখন দুটো তিনটে পাশ করেও কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রস্তাবিত ঐ রূপেয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া············ মার মতন এক গরীব ঘরের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া আনিলেন তখন পাড়ার লোকেরা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিল। নববধূ মার অলঙ্কারের মধ্যে ছিল সিঁন্দুর আর শাঁখা, আর পরণে ছিল সাড়ী······এই মার মুখ থেকে শোনা। এই সব দেখে শুনে পাড়ার দেবতারা চটে গেলেন—আর তারই পর বছরে সেই অপূর্ব্ব ইতিহাস প্রকাশ হ'ল !

বাবার যেমন আয় ছিল পকেটের ছেঁড়া অংশটাও সেইরূপ ছিল। আতুর অনাথ······গরীব দুঃখীদের প্রার্থনায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। সুতরাং তিনি যখন নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'লেন তখন আমাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল পাড়াগাঁয়ের ভদ্রাসনখানি।

মা যে প্রদীপটি ধরে পথ দেখিয়ে চল্‌ছিলেন মাঝখানে দম্‌কা হাওয়ায় তা গেল নিভে। সেই দিনই বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনির্দ্দিষ্টের পথে ছুট্‌তে লাগ্‌লুম।

বাবা তাঁর সারা জীবনের কার্য্যাবলীতে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষদের সংস্কারের ছাপ ছাড়াতে পারেন নি। সেজদা সেই গুলাকে দুর্ব্বলতার চিহ্ন মনে করেছিলেন। তিনি নিভ গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরামাত্রাতে কোরাণ মেনে চল্‌তে লাগ্‌লেন। সমাজের দিক্‌ থেকে এত পরিবর্ত্তন ঘটলেও রবিদা'দের সঙ্গে আমাদের কোনও রূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। রামু কাকা আমাদের তাঁর নিজের ছেলে মেয়ের মতন ভালোবাস্‌তেন। মা আর কাকিমার মধ্যে বেশ

অন্তরঙ্গতা ছিল। সেই খানেই নাকি রবিদার আর আমার একই সঙ্গে জন্ম হয়। মাত্র দু চার ঘণ্টার তফাৎ—সকলেই রবিদা'কে দাদা বল্‌ত তখন আমিই তাকে নাম ধরে ডাকি কেন?

রবিদাও আমাদেরই মত দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়া মানুষ। তারও মা নাই…রবিদা' হবার একটু আগেই পড়ে গিয়ে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায় সেই সময় তাঁর চিকিৎসা করতে রামুকা'কে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়েছিল।

রামু কাকা চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ী ফিরলেন। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়াগ্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন কাজেই কোন প্রকারে দিন চালান ভার হইয়া পড়িয়াছে। শোকে তাপে ভরা রামু কাকার হৃদয়টা মমতায় ভরা ……. …আমি, দাদা ও বৌ তিনজনেই তাঁর কাছে গল্প শুন্‌তে যাই। রবিদাদের স্কুল এখান থেকে কিছু দূরে। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সেই খানেই একজনদের বাড়ী থাকে। মাঝে মাঝে বাড়ী আসে। বৌ তার সাম্‌নে বেরোয় না……… আমি তার সঙ্গে কথা কইলে সে চোটে যায়। আমি যেন রবিদা'দের বাড়ীতে পা না দেই… …. …এই রকম কতকগুলো রুল জারী করেছে। কিন্তু শোনে কে—?

(ভিন্ন)

রতন সর্দ্দার প্রায়শ্চিত্ত না করে মারা গেছে বলে তার মৃত দেহটা স্পর্শ করা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, এই কথাটা শিরোমণি ঠাকুর ঘোষণা করে দিলেন। সে মরেছে—সমাজের দেনা শোধ দেবার ক্ষমতা তার নাই, কিন্তু তা হলে ত আর এত বড় অশাস্ত্রীয় কাজটা হ'তে পারে না…তবে যদি কালীতলায় এর দণ্ডস্বরূপ কিছু মূল্য দেওয়া হয় তবে তাঁর কোন আপত্তি নাই… তিনি আরও বল্লেন · এ-ত আর তাঁর নিজস্ব পাওনা নয় যে মাফ কর্ব্বেন, এ সমাজের কথা…এখানে ত আর দয়া দেখিয়ে অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

ভ্রান্তি

শ্রীঅণীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—১—

বিশ্ব-কবির শিষ্য হইয়া—
কেমনে বলিছ নিঃস্ব—
জগৎ-মাতার সন্তান তুমি
রাজ্য নিখিল বিশ্ব।

—২—

কণ্ঠে তোমার অমিয় পয়োধি
মাগিয়া নিতেছ তিক্ত—
বিরাট তোমারে ঘেরিয়ে রয়েছে
তবুও বলিছ রিক্ত?

—৩—

দিবা অবসানে আবরি তোমারে
মুছায়ে দিতেছে শ্রান্তি।
(তব) আপনার কেবা বুঝিয়া লইতে
তবুও গেল না ভ্রান্তি?



নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

আকাশে সেদিন সকাল হইতে মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টি মাঝে মাঝে ঝর্ ঝর্ ধারে ধরণীর গায়ে ঝরিয়া পড়িতেছিল। এক একবার এক একনিকষ কালো মেঘ আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে উঠিয়া অপর পার্শ্বে নামিয়া পড়িতেছিল। সকাল হইতে রৌদ্রের দেখা পাওয়া যায় নাই, সমস্ত পৃথিবীর উপর আকাশের মলিন ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল।

প্রণতি জানালার পর্দ্দা সরাইয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল। সে দিন রবিবার, স্কুলে যাইতে হয় নাই, তথাপি নিয়মিত ঠিক দশটার মধ্যেই আহার হইয়া গিয়াছে। আজিকার দিনটা অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়াই ঠেকিতেছিল, এ যেন কোনও মতে আর কাটিতে চাহিতেছিল না।

আহারের পরে সময় কাটাইবার জন্য সে বই লইয়া বসিয়াছে, একভাবে চোখ রাখিতে রাখিতে চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, সে অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বইখানা টেবলের উপর রাখিল। আজিকার এ দীর্ঘ দিনমান কাটিবে না কি?

কর্ম্মপূর্ণ জীবনটায় অন্যদিন কর্ম্মের ঢেউ আসিয়া লাগে, যাহাতে বুঝা যায় না কখন দিন আসিল, কখন দিন চলিয়া গেল। আজিকার অলসতাভরা এই আষাঢ়ের নীরব মধ্যাহ্নটী, এ যেন বোঝা-স্বরূপই আসিয়াছে, ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চাহিলেও এ কিছুতেই যাইতে চাহিতেছে না।

দেয়ালের ঘড়িতে সে চাহিয়া দেখিল তিনটা বাজিতে পনের মিনিট দেরী আছে। প্রণতি বিরক্তিভরে উঠিয়া পড়িল, আর এমন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকা যায় না।

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া সে বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সূর্য্যের আবরণ নিকষ কালো মেঘটা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে, সাদা মেঘের মাঝখানে সূর্য্যের আকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, মলিন আলো ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃদু বাতাসে উঠানের মাঝখানে নারিকেল গাছের পাতাগুলি সরসর করিয়া কাঁপিতেছে, প্রাচীরের ওপারে বাগানে কয়েকটী বাবলাগাছে আগাগোড়া ফুল ধরিয়াছিল, সেগুলি কাঁপিতেছে। অদূরে নদীর ধারে কয়েকটা পাখী বিকট চিৎকার করিতেছে, তাহার শব্দ কাণে ভাসিয়া আসিতেছে।

প্রণতি শ্রান্তদৃষ্টিতে একবার এই সুন্দর শান্ত দৃশ্য দেখিয়া লইল। তাহার পর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

"বাপুয়া—"

সে ভৃত্যকে ডাকিল, কিন্তু বালক ভৃত্য বাপুয়া তখন পাশের ঘরে ঘুমাইয়া, তাহাকে আর না ডাকিয়া প্রণতি নিজেই একটা গ্লাসের সন্ধানে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। দুর্ভাগ্য হেতু দুইটী গ্লাসই উঠানে পড়িয়া আছে, এখনও মাজা হয় নাই। ছয় সাত দিন হইল মাত্র সে এখানে আসিয়াছে, বেশী বাসন কিছু আনে নাই, নিতান্ত যাহা দরকার তাহাই আনিয়াছে মাত্র।

অগত্যা একটা গ্লাস লইয়া সে যে সময় মাজিতেছিল সেই সময়ে বাপুয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণতিকে নিজের হাতে গ্লাস মাজিতে দেখিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল,"এ কি দিদিমণি, আপনি বাসন মাজছেন, আমায় ডাকলেই তো পারতেন।"

হাসিমুখে গ্লাসটা ধুইতে ধুইতে প্রণতি বলিল, "তাতে কি হয়েছে রে? একটা গ্লাস মাজলেই আমার হাতটা কিছু ক্ষয়ে যাবে না। তোকে একবার ডেকেছিলুম, সাড়া পেলুম না; ভাবলুম খেটে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস, ডেকে অনর্থক তোকে কষ্ট দেব।"

বাপুয়া মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ,কষ্ট আবার কি! দিন্ গ্লাসটা, আমি ধুয়ে জল এনে দি।"

তাহার একান্ত জেদে প্রণতি হাসিয়া গ্লাসটা তাহার হাতে দিল, বাপুয়া গ্লাস ধুইয়া জল আনিয়া দিল। প্রণতি জলপানান্তে গ্লাসটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "বস বাপুয়া, ততক্ষণ তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।"

বাপুয়া ভারিচালে হাসিয়া বলিল, "গল্প, তবেই হয়েছে দিদিমণি, গল্প আমি মোটেই জানিনে।"

প্রণতি বলিল, "তোকে আমি রূপকথার গল্প বলতে বলছিনে, আমি তোদের দেশের গল্প শুনতে চাচ্ছি। তোদেরই তো এই দেশটা, তোরা একে জানিস চিনিস, আমি এর কাউকে চিনিনে এখনও, জানিও নে। এ কয়দিন নানা গোলমালেই তো কেটে গেল, এখনও তোর কাছ হ'তে কিছু শুনতে পেলুম না।"

"এই দেশের আবার গল্প—" বাপুয়ার মুখে হাসি আর ধরে না; তবু সে বসিল, বলিল, "দেশের গল্প কি তা তো আমি জানিনে দিদিমণি।"

প্রণতি বলিল, "দেশের আবার কি গল্প! তোদের এ দেশে কত লোক আছে?"

উৎসাহিত বাপুয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ, তা ঢের।"

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোক।"

বাপুয়া অঙ্গুলির পর্ব্ব দ্রুত গণনা করিয়া যাইতে লাগিল, "বামুন বোধ হয় দেড়শো ঘর হবে, কায়স্থ তারও বেশী; এ ছাড়া কৈবর্ত্ত, তেলি, নাপিত, ধোপা—"

প্রণতি তাহাকে থামাইয়া দিল, "থাম বাপু; খুব হিসেব দিয়েছিস্; তুই কি—সাঁওতাল তো—?"

তাহার কথায় হঠাৎ বাধা দেওয়ায় বাপুয়া একটু মর্ম্মাহত হইয়াছিল, একটা দম লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি সাঁওতালই বটে।"

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "তোর জাত এখানে আছে?"

বাপুয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল, "না।"

প্রণতি বলিল, "তুই কি করে তবে এখানে এলি?"

বাপুয়া আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার ইতিহাস দ্রুত বলিয়া গেল। তাহার মা একটা কি অপরাধে তাহাদের সমাজ হইতে তাড়িতা হইয়াছিল; তখন সে খুব ছোট ছিল, সে কথা এখন তাহার অল্প অল্প মনে পড়ে মাত্র। তাহার পর যে কেমন করিয়া তাহার মা তাহাকে লইয়া এ গ্রামে আসে এবং পাঁচ বছরের ছেলে বাপুয়াকে রাখিয়া সে যে কেমন করিয়া পথের ধারে মারা যায় সে সব কথা বর্ণনা করিতে করিতে বাপুয়ার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল,মায়ের সেই মরণের কথাটা তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া জাগিয়াই ছিল, সেই কথা মনে পড়িতে তাহার চোখ দুইটী অল্পে অল্পে

জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার পর হঠাৎ এক সময় উছলাইয়া গণ্ড ধৌত করিয়া কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল।

প্রণতি স্তব্ধভাবে মেঘে ছাওয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মনটায় অতীতের কোন একটী দিনের পথের ধারের একটী বিষাদময় দৃশ্যের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখখানা অত্যন্ত মলিন হইয়া উঠিল।

"হ্যাঁরে বাপুয়া, তোর মাকে এ গ্রামের কেউ দেখে নি, কেউ এতটুকু আশ্রয় দেয়নি যেখানে সে মাথাটুকু রাখতে পারে? এত ব্রাহ্মণ কায়স্থ রয়েছে কেউ তোর মাকে দেখেনি, কেউ ভার নেয়নি?"

বাপুয়া চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল, "কেউ না দিদিমণি, কেউ না। কেউ আমার মার দিকে চাইলে না, কেউ তাকে একমুঠো খেতে দিলে না, ডাকা তো পরের কথা। আমার মা আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পথের ধারেই পড়ে রইল। পথ দিয়ে এত লোক গেল এল, কেউ জিজ্ঞাসা করলে না কি হয়েছে।"

আঃ, কি নির্দ্দয়, কি পাষাণ-হৃদয় এই দেশবাসী! পথের ধারে মৃত্যুশয্যাশায়িনী মা, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে পাঁচ বৎসরের ছেলেটীকে, মৃত্যু তাহার কণ্ঠকে হয়তো আগেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু চোখ তো তখনও সে মুদে নাই, জ্ঞান হয়তো তখনও তাহার মধ্যে মধ্যে জাগছিল। সে হয় তো আর্ত্তব্যাকুলনেত্রে পথের লোকের পানে চাহিতেছিল যদি কাহারও প্রাণে করুণা জাগিয়া উঠে, যদি কেহ কাছে আসে, শিশু পুত্রটীকে তাহার হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে মৃত্যুর কবলে নিজকে সমর্পণ করিয়া দেয়। হায়রে, কেহই আসে নাই এ কথাটা ভাবিতে হৃদয় যে ব্যথায় ভরিয়া উঠে, চোখে যে-জল আসিয়া দাঁড়ায়।

প্রণতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তারপর তুই কি করলি বাপুয়া?"

বাপুয়া হাসিল; তাহার সে হাসিতে প্রণতির বুকে বড় ব্যথা বাজিল—আহা রে অভাগা বালক!

বাপুয়া বলিল, "আমি আর কি করব্ দিদিমণি? দেখতেই পাচ্ছেন—মরিনি, বেঁচে আছি। এর দোরে ঘাটি খেতে দেয়, ওর দোরে ঘাটি খেতে দেয়, এমনি দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মন্দ নয়। এমনি করে—মা মরার পরে এই দশটা বছর তো কেটেছে এমনি করে, আরও বছর কত কেটে যাবে। আপনি আসবেন শুনে শ্রীনাথ বাবু আমায় ডেকে বললেন, এখানে কাজ করতে হবে, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলুম।"

প্রণতি আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আনন্দের সঙ্গে রাজি হলি কেন রে?"

বাপুয়া বলিল, "জানি আপনি আমায় মারবেন না।"

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এখানে সবাই তোকে মারে নাকি?"

বাপুয়া পিঠের গামছাখানা সরাইয়া দিয়া বলিল, "এই দেখুন না দিদিমণি, কত মারের দাগ পিঠে দেখতে পাবেন। কাজ করছি কিন্তু তাতে যদি একটু গাফিলতি হয়, মারতে তো কেউ কসুর করে না।"

প্রণতির চোখ দুইটী বুঝি সজল হইয়া উঠিতেছিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "লোকে তোকে মারত আর তুই তা নীরবে সয়ে যেতিস বাপুয়া, একটা কথা বলতিস নে?"

বাপুয়া বড় ব্যথায় মুখখানা বিকৃত করিল, "না দিদিমণি, কথা বল্‌বার মত মুখ আমার কই? ভগবান যে আমার উপর নির্দ্দয়, নইলে মা কেন এমন করে তাড়াতাড়ি মরে যাবে? আমি সাঁওতালের ছেলে, বাঙ্গালার ছেলে নই, আমার রাগ গরম, ঠাণ্ডা নয়; মার খেলে আমরা মারতে জানি, আমার যে সে সাহস নেই, দিদিমণি।"

তাহার চোখ দুইটী জলভারে আনত হইয়া পড়িল, প্রণতি করুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল!

তাহার পর বলিল, "তা বেশ, আমার কাছেই থাক। আমি বল্‌ছি আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার কাছে তুই থাকতে পারবি, কেউ তোকে আমার কাছে হতে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। কেমন ? রাজি আছিস্ তো বাপুয়া ?"

বাপুয়া নিঃশব্দে শুধু তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের নীরব ভাষা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল, বাক্যে তাহা বুঝানো যায় না।

মাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সে, পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার মা মারা গিয়াছে, এই দশটা বছর সে লক্ষ্মী-ছাড়ার মতই দরজায় দরজায় কৃপাকণিকা ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে, দয়া সে পায় নাই। সকলেই তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, কেহ তাহাকে এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নাই।

গায়ের রংটা তাহার নিকষ কালো হইলেও বেশ মসৃণ চকচকে, চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দাঁতগুলি ছোট ছোট, শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো, মুক্তার মতই ঝল্‌ঝলে পরিষ্কার। সামনের চুলগুলা সম্মুখের দিকে বেশ বড়, তেল চকচকে, সযত্নে ঢেউ তোলানো। কাজে কর্ম্মে সে খুব চটপটে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাহার মজ্জাগত স্বভাব।

প্রণতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সে কথা ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীনাথ বাবুকে দেখলুম, তিনি জমিদারের দেওয়ান। জমিদার কোথায়, তাঁকে তো দেখলুম না।"

বাপুয়া বলিল, "আমিই একবার মাত্র তাঁকে দেখছিলুম। সে অনেক কাল আগে, বোধ হয় পাঁচ সাত বছরের কথা হবে—তিনি দেশে এসেছিলেন। শুনছি তিনি আজকালই দেশে আসবেন। তাঁর হুকুমে নতুন ইস্কুল হয়েছে, দেখতে আসবেন না ?"

প্রণতি চিন্তিত মুখে বলিল, "তিনি তো থাকেন কলকাতায়, দেশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই, তবে দেশে হঠাৎ এই মেয়ে ইস্কুলটা বসালেন কেন তা জানিস, বাপুয়া ?"

বাপুয়া বুক ফুলাইয়া মুখখানা ভারি করিয়া "তিনি বলেছেন সব দেশে ইস্কুল আছে আমাদের দেশে কেন থাকবে না ?"

প্রণতি বলিল, "সব টাকা বুঝি তাঁরই ?"

কথাটা সে স্বভাবতঃই বলিল, কিন্তু বাপুয়া সে কথা গায়ে পাতিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা কাত করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই।"

প্রণতি শ্রীনাথ বাবুর মুখেও শুনিয়াছিল জমিদার শরৎকুমার আজ কালই দেশে আসবেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "জমিদার বাবুর ছেলে মেয়ে কয়টী জানিস্ ?"

বাপুয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিল—"বউই নেই—তা ছেলে মেয়ে।"

প্রণতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "তাঁর বিয়ে হয়নি, না, বিয়ে হওয়ার পরে স্ত্রী মারা গেছেন ?"

বাপুয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, "বাবু মোটে বিয়েই করেন নি। যে মাতাল তাতে—"

প্রণতি শঙ্কিতভাবে বলিল, "মাতাল— ?"

বাপুয়া বলিল, "ভয়ানক মাতাল। এই দেশে আসুন না, দেখতে পাবেন, শুনতেও পাবেন। তিনি দিনরাতই নাকি মদ খান, মদ পেলে আর কিছু চান না। কিন্তু মাতাল হলে কি হয় দিদিমণি, লোক এদিকে বড্ড ভাল। আমি সাঁওতালের ছেলে, কেউ আমায় কাছে ডাকে না—এই ভয়েই তাঁর কাছে যাইনি, তিনি আমায় কাছে ডেকে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, শেষে দশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বিদায় করলেন। দেশের যত কাঙ্গাল দুঃখী সকলকে তিনি বড্ড ভালবাসেন, তাদেরকে কাছে ডেকে তাদের প্রতিদিনকার খরচ দেন। এই যে তিনি কলকাতায় থাকেন—দেশের যার যা অভাব আছে তাঁর কাছে গিয়ে জানালেই হুকুম হবে—দাও টাকা। মাতাল হলে কি হয় দিদিমণি, এমন উঁচু মেজাজের লোক দুনিয়া ঘুরলে আর একটী পাওয়া যাবে না।"

কিন্তু তা হোক, লোকটা যে মাতাল এই কথাটাই প্রণতির মনে বিষম ত্রাসের উদ্রেক করিয়া দিল। সে

ছোটবেলা হইতে মাতালকে ভয় করে, আন্তরিক ঘৃণা করে। মাতাল হইলে তাহার যে মনুষ্যত্ব থাকে না সে তাহাই জানে। স্কুলের টিচার সে, স্কুলের যে কর্ত্তা তাহার সম্মুখে তাহাকে বাহির হইতেই হইবে, কথা কহিতেই হইবে, মাতালকে বিশ্বাস কি? হয়তো সে এমন একটা কথা বলিয়া বসিবে—

প্রণতির কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, নাঃ এখানকার স্কুলে তাহার কাজ করা হইবে না, শীঘ্রই তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। একে এই পল্লীগ্রামে নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর মাতাল প্রভুর কথা শুনিয়া তাহার মনে হইতেছিল এখনই কাজে ইস্তফা দেই।

আর দু'চার দিন পরে সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

(২)

জমিদার শরৎকুমার রায় একদিন বহুকাল পরে গ্রামবক্ষে পদার্পণ করিলেন।

পল্লীগ্রামে তিনি মোটেই আসিতে চাহিতেন না। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন মাত্র, ইহার মধ্যে গ্রামবাসী আর তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। দেশের সঙ্গে পরিচয় তাঁহার মোটেই ছিল না, ধরিতে গেলে বরাবরই তিনি কলিকাতাবাসী। বাস করিবেন বলিয়া এইবার তিনি গ্রামে ফিরিয়াছেন।

শ্রীনাথ বাবু মহা সমাদরে তরুণ জমিদারকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখে প্রফুল্লতার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে জমিদারের শুভাগমনে তিনি মোটেই প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই।

আজ তিন বৎসর হইল বৃদ্ধ জমিদার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীনাথ বাবু অনেক জিনিস অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। শরৎ যে দেশে আসিতে পারেন, বাস করিতে পারেন তাহা তিনি কোন দিনই ভাবেন নাই, সে বিষয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শরতের কাকিমা ইন্দুবালাও এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি এই সম্পত্তির ছয় আনি জমিদার ছিলেন, কিন্তু শ্রীনাথ বাবুকে হস্তগত করিয়া তিনি বার আনা বিষয় উপভোগ করিতেন। এবার শরৎ গ্রামে বাস করিতে আসায় তাঁহারও অনেকটা স্বার্থ হানি হইল। অনেকেরই স্বার্থ হানি হইল, অনেকেরই বুকে আগুণ জ্বলিল,তথাপি মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শরতের বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না, তিনিও খুব চালাক ছিলেন। তাই 'শঠে শাঠ্যং' মন্ত্রণানুসারে চলিতে লাগিলেন।

গ্রামের ছোট বড় সকলেই তরুণ জমিদারকে দেখিতে আসিয়াছিল। প্রভুভক্ত শ্রীনাথ বাবু গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিতে ভুলেন নাই জমিদার মদ্যপায়ী অসচ্চরিত্র, কেবল সেই জন্যই তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীতে আসেন। জমিদার অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, যখন মাতাল হন তখন কাহাকে যে কি বলেন তাহার ঠিক নাই। পরিশেষে, দুঃখের সহিত ইহাও বলিয়াছিলেন—" এমন লোকটা—আহা, কেবল নেশা করেই বয়ে গেল। নেশার জন্যই লোকটার মাথার ঠিক নেই। নইলে রীতিমত শিক্ষিতও বটে, বয়েসও এমন কিছু বেশী নয়, আহা—"

তিনি খুব আপশোষের সহিত প্রভুগুণকীর্ত্তনের ছলে নিন্দাকীর্ত্তনই করিয়া গিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার এই সহজ সরল ছলনাটুকু ধরিতে পারে নাই, তাহারা শরৎকে যথার্থই মদ্যপ অসচ্চরিত্র জানিয়াছিল।

শরৎ কথা বার্ত্তায় সকলকেই তুষ্ট করিলেন, প্রত্যেককেই ঘনিষ্ঠ ভাবে ধরিয়া লইলেন। তাঁহার কথা বার্ত্তা, চালচলনে শিক্ষিত বড়লোকের অহঙ্কার ছিল না, মদ্যপ অসচ্চরিত্রের রূঢ়তাপূর্ণ নীচতা ছিল না। তিনি কিন্তু ছিলেন, যথার্থ সরল উচ্চ হৃদয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহা। দেশে না আসিয়াও দেশবাসীর সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া দেন নাই, দেশবাসীর সকল কার্য্যেই

তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। দেশের নদী মজিয়া গিয়াছিল তিনি অনেকখানি সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন; রায়েদের বড় পুকুর শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি নূতন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। দেশের কয়েকটী পথ, তাঁহারই অর্থে পাকা হইয়া গিয়াছে, দেশের জঙ্গল কাটাইবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। তিনি দেশের সবই করিতেন কিন্তু একটা বিশেষ দোষ তাঁহার ছিল তিনি নিজে কোন দিনই কিছুর মধ্যে জড়াইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কর্ম্মচারীগণ এক টাকা খরচ করিয়া পাঁচ টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট যে হিসাব দাখিল করে, তাহাদের হালচাল জানিয়াও তিনি তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে চান। সত্য কখনও গোপনে থাকে না; মনের মধ্যে সত্য আঘাত করিলেও তিনি জোর করিয়া মিথ্যার আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে চান।

এরূপ লোককে প্রতারণা করিতে একটুকও কষ্ট পাইতে হয় না, সরলপ্রকৃতি মনিবকে তাই শ্রীনাথ বাবু ঠকাইতেন বেশ। তিনি থাকিতেন কলিকাতায়, গ্রামের কোন কথা তাঁহার কানে গিয়া পৌছিত না।

বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে শরতের দৃষ্টি পড়িল পুরাতন ঠাকুর বাড়ীর প্রতি। একখানা কড়ি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, বরগা কতকগুলি একেবারেই নাই, কয়েকখানা এখনও পড়িয়া যাইবার অবস্থায় রহিয়াছে। এই ঠাকুর বাড়ীটির ভার ছিল শরতের কাকা জগৎপতির উপরে, তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার তৃতীয় পক্ষ ইন্দুরাণীর উপর, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ যাহা কিছু পাইতেন, তাহা সঞ্চয়ই করিয়া যাইতেন, পুরাতন ঠাকুর বাড়ীটার জন্য তাহা হইতে একটী পয়সা ব্যয় করিতে পারেন নাই। এই ভগ্ন মন্দিরেই বৎসর বৎসর দুর্গার শুভাগমন হইত, এবার বাহিরে ত্রিপল খাটাইয়া তিনি কোন ক্রমে তিনটা দিন কাটাইয়া বিদায় লইয়া গিয়াছেন, পূজার দালানে আর জায়গা হয় নাই।

গত বৎসর পূজার মাস দুই আগে কুলপুরোহিত যাদব ভট্টাচার্য্য শরতের নিকটে গিয়াছিলেন। অনেক দুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন কেবলমাত্র ছোটমার অমনোযোগিতাতেই রায়বাড়ীর ঠাকুর বাড়ীটা একেবারেই পড়িয়া যায়। অবশ্য যদিও এখন ইহা ছোটমারই অধিকারভুক্ত, তথাপি শরতের অর্থেই বৎসর বৎসর পূর্ব্বকার মতই জননী আনন্দময়ী রায়বাড়ীতে আবির্ভূতা হন। এই ঠাকুর বাড়ীটা একেবারেই যায়, ছোট মা অমনোযোগিনী হইলেও শরতের উদাসীন থাকা উচিৎ নয়, কেননা, এটা তাঁহারই পৈত্রিক জিনিস।

কুলক্রমে পূজা এ বাড়ীতে চলিয়া আসিতেছে, ঠাকুর বাড়ী পড়িয়া গেলে পূজাও চিরতরে উঠিয়া যাইবে ইহা ভাবিতেও শরতের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি তখনই শ্রীনাথ বাবুকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন পূজার দালান যেন নূতন করিয়া তৈয়ারী করা হয়, ইহাতে যত টাকা দরকার পড়ে তাহা যেন দেওয়া হয়।

আজ পূজার দালানের পানে তাকাইতেই তাঁহার সে কথা মনে পড়িয়া গেল। যেমন ভাঙ্গা দালান তেমনই পড়িয়া আছে, সারান দূরে থাক, সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার মুখের উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, শুষ্ককণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "শ্রীনাথ বাবু।"

"বলুন—" বলিয়া শ্রীনাথ বাবু তাড়াতাড়ি পার্শ্বে আসিলেন।

শরৎ ঠাকুরবাড়ীর পানে চাহিয়া কথাটা বলিবার আগেই চতুর শ্রীনাথ বাবু আন্দাজে তাহা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, "ওঃ, এই ঠাকুর বাড়ীর কথা বলছেন তো! আমি আপনার হুকুম পেয়েই ছোট মার কাছে গেলুম কিন্তু তিনি একবারে সপ্তমে চড়ে উঠলেন, কাজেই—"

বাধা দিয়া শরৎ বলিলেন, "সপ্তমে চড়ে উঠবার কারণ ?"

শ্রীনাথ বাবুর মুখে একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, শরতের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যাইতে পা'র নাই। শ্রীনাথ বাবু নিতান্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া বলিলেন, "তখন আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। ফিরে এসে তার পরদিন যখন তিনি আহ্নিক করতে যান সেই সময়টায় মনটা তাঁর ভাল থাকে জেনে গেলুম। তিনি আমার কথা শুনে মুখখানা অন্ধকার করে বললেন, "আমার দালান ভাঙ্গুক, পড়ুক তাতে কারও হাত দিতে আসতে হবে না। আমার যখন অবস্থা ভাল বুঝব তখন সারাব। এখন আমার ঠাকুর বাড়ী দুটো জন ধরিয়ে সারিয়ে শরৎ যে নিজের করে নেবে তা আমি করতে দেব না।"

শরৎ একমুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পরই তাঁহার মুখে চিরাভ্যস্ত মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল—" মেয়ে মানুষের বুদ্ধি বটে, আমি পূজার দালান সারিয়ে নিজের করে নেব এইটে তাঁর ধারণা হলো ? আচ্ছা, এ বিষয়ে তাঁকে রাজি করবার চেষ্টা দেখব। বল্লে বুঝবেন অন্ততঃ এ বুদ্ধিটুকু তাঁর আছে। যদিও তিনি কখনও আমায় দেখেন নি আমিও কখনও তাঁকে দেখি নি, তবু তিনি আমারই কাকার স্ত্রী, আমার মাতৃ স্থানীয়া প্রণম্যা খুড়িমা। আরও আমি শুনেছি তিনি বেশ লেখাপড়া জানেন, তাঁর মন উন্নত সরল—"

শ্রীনাথ বাবু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া বলিলেন, "সে আর একবার করে নয়, শরৎ বাবু, হাজার বার বলছি যথার্থ তাঁর মনটা ভারি সরল উন্নত। তবে জানেন কি, এই সরল লোকেরাই ভারি একরোখা হয়, অর্থাৎ তারা সত্য বলে যেটা একবার জেনে নেয় সেটা আর কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারে না। সরল লোক একবার রাগলে তাদের ঠাণ্ডা করা ভারি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তা হোক, আপনি ছোট মাকে একবার বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন তা আমি ঠিক করে বলছি। পাঁচ বছর আগে যখন আপনি দেশে এসেছিলেন তখন ছোট বাবু ঢাকায় কি কাজ করতেন। আপনি তখনও সংসারের কিছু জানতেন না—"

দেওয়ান একবার বিশৃঙ্খল গুম্ফে তা দিয়া লইলেন। শরৎ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "জানি নে শ্রীনাথ বাবু।"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "এই আপনার কাকার সঙ্গে বড় বাবুর ঝগড়ার কথা। খুব ঝগড়া করে ছোট বাবু কোথায় চলে গেলেন, তার পর বার তের বছর তাঁর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। বড় বাবু ভাই বলতে অজ্ঞান হতেন, তিনি কেঁদে কেটে কত জায়গায় সন্ধান নিলেন, কোনও খবর পাওয়া গেল না। তারপর আজ বছর চারেকের কথা—সেবার পূজার সময়ে বড় বাবু কলকাতা হতে বাড়ী এলেন পুজা করবার জন্য, আপনি তখন কোথায় বেড়াতে গেছেন—"

অতীত সেই কথাটা মনে করিয়া শরৎ বলিলেন, "হ্যাঁ, এই বার মনে পড়েছে, আমি সেবার পুরীতে গেছলুম। সেখানে বাবার পত্র পেলুম, কাকা ফিরে এসেছেন।"

শ্রীনাথ বাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন 'হ্যাঁ, আমিই সেই পত্রখানা লিখেছিলুম, বড় বাবু নিজের নামটা নিজের হাতে দস্তখৎ করেছিলেন। ছোট বাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে ছোট মা। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ এখানেই গতায়ুঃ হয়েছিলেন, তিনি দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, আর বিয়ে করব না, তাই তাঁর সঙ্গে এই তৃতীয় পক্ষকে দেখে আমরা সবাই প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেছলুম। শুনতে পেলুম তিনি ঢাকায় থাকতে ছোট মার বাবা এসে তাঁর হাতে পায়ে ধরে মেয়েটীকে দান করে

গেছেন। এই ঠাকুর বাড়ী নিয়েই ঝগড়া বেধেছিল, তাই বড় বাবু তাঁকে ঠাকুর বাড়ী একেবারে রেজেষ্ট্রী করে দিলেন আর জমিদারী একেবারে তাঁকে দিলেন।"

শরৎ বলিলেন, "বাবা বড় ভাইয়ের উপযুক্ত কাজই করে গেছেন। শুনেছি এর মাসখানেক বাদেই ছোট কাকা মারা যান।"

শ্রীনাথ বাবু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিয়তি! মরণ যে মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল তা কেউই বুঝতে পারে নি। পেলেন সব, নিলেন সব, কিন্তু ভোগ করতে পারলেন না, একি বড় কম কষ্টের কথা!"

শরৎ চুপ করিয়া গেলেন, আর কোনও কথা তুলিলেন না। বৈকালে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চা খাবার আসিয়া পৌছিল। শরৎ চা খাবার বহনকারিণী দাসীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন এখন কি খুড়িমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? ইন্দুরাণী সম্মতি দিয়া পাঠাইলেন।

যে অন্তঃপুরে একদিন অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল আজ সেই অন্তঃপুরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবেই শরৎকে প্রবেশ করিতে হইল। আজ অন্তঃপুরে নূতন কর্ত্রীর রাজত্ব, শরৎ তাঁহার অপরিচিত।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় ইন্দুরাণী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখে ঈষৎ অবগুণ্ঠন, সে দীর্ঘাঙ্গী উন্নত-দেহা, বলিষ্ঠা। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে। পাতলা কাপড়ের মধ্য হইতে তাহার উজ্জ্বল বর্ণবিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বড় বড় কৃষ্ণতার চোখ দুটি ঢাকা, কিন্তু সে চোখে যে দীপ্তি ছিল তাহা অবগুণ্ঠনের আড়ালে রাখা যায় না।

শরৎ একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইলেন। একবার দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিলেন এই মেয়েটি যথার্থই বড় সহজ নহে। ইহার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা সাধারণ মেয়েদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; আর সেই শক্তি বলেই সে তাহার নিজ অংশের জমীদারির কাজ অবহেলায় নিজেই করিয়া যাইতেছে। নিকটে একখানা কার্পেটের আসন পাতা ছিল, ইন্দুরাণী আসন খানার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয় মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এই আসনে বসো।"

শরৎ বসিবার আগে নত হইয়া একটা প্রণাম করিলেন, ইন্দুরাণী অসঙ্কোচে এই প্রণাম গ্রহণ করিল, যেন ইহা তাহার প্রাপ্য এবং সে ইহার প্রত্যাশাই করিতেছিল।

শরৎ বসিয়া বলিল, "আমায় আপনার ছেলে বলেই জানবেন কাকি মা, মা কাকিতে পার্থক্য নেই। অনেকদিন হতে আশা ছিল মাকে দেখব, এবার সে আশাটা পূর্ণ হলো।"

ইন্দুরাণী অবগুণ্ঠনটা একটু কমাইয়া দিল। শরতের উজ্জ্বল শান্ত মুখখানার পানে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে শরৎকে কখনো দেখে নাই। এতক্ষণ সে চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতে পারে নাই, শরতের মুখের বড় মিষ্ট এই মাতৃ-সম্বোধনটা তাহার মনের লজ্জা, বিরুদ্ধভাব সব দূর করিয়া দিল, সে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

উন্নত দীর্ঘাকৃতি, উদার মুখ। বড় বড় দুইটী চোখ, ইহাতে একটু কুটিলতা নাই, এই চোখ দেখিয়া এই ছেলেটীর হৃদয়ের আমূল সংবাদ সবই পাওয়া যাইতে পারে। মাথার চুলগুলা রুক্ষ অবিন্যস্ত; গায়ের সাদা পাঞ্জাবীটা আধ ময়লা, দুই এক জায়গায় ছিন্নও আছে। পরণের কাপড় খানা, তাও তেমনি আধ ময়লা, পায়ের কাছে খানিকটা উড়িয়া গিয়াছে। এক কথায়, ছেলেটী যে সকল বিষয়েই অমনোযোগী তাহা তাহার বয়সোচিত বেশভূষার এই অমনোযোগিতাতেই বুঝা যাইতেছে। তাহার যেরূপ সুন্দর আকৃতি তাহাতে সব রকমেই তাহাকে মানাইয়া যাইত যদি সে পোষাক পরিচ্ছদের দিকে মনোযোগী হইত। আর —মনোযোগ দিবেই বা কি? মদ খাইয়া যাহার দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায় সে আবার ভদ্রলোকের উপযুক্ত বেশে থাকিবে! শ্রীনাথ বাবু

শরতের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনে করিতে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে।

ইন্দুরাণী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে কথা কহে না দেখিয়া শরৎ বলিলেন, "আমি এখানে বাস করতে এসেছি অথচ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আমরা পর নই, আপনি মা আমি ছেলে; মা ছেলের মধ্যে অপরিচিত ভাব থাকলে চলবে না, তাই আপনি না ডাকলেও আমি ছুটে এসেছি মা।"

তাহার কথাগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু শ্রীনাথ বাবুর কথা মনে পড়িল—"সে ভারি ধূর্ত্ত ছোট মা, মুখে এমন ভাবে কথা বলবে যেন কতই ভাল মানুষ, কিন্তু ভেতরে জানবেন বিষে ভরা। আপনি প্রথমেই তাকে দেখে ভুলে যাবেন সেইজন্মে সাবধান করে দিচ্ছি। সে ধূর্ত্তের কথায় যেন ভুলে যাবেন না; সে বড় সাংঘাতিক লোক, আপনার জমীদারি দেখতে অভিভাবক কেউ নেই, আপনার অভিবাবক হওয়ার অছিলায় সে সব হাতিয়ে নেবে মনে রাখবেন।"

ইন্দুর মনে হইল সংসারে এরূপ লোক দুষ্প্রাপ্য নয়, সে চকিতে তাই কোমলতাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া শক্ত হইয়া উঠিল। শরতের ভক্তিপূর্ণ কথার বিনিময়ে সে একটু নড়িয়া চড়িয়া, দুবার কাশিয়া উত্তর দিল "সে আমারই সৌভাগ্য, বাবা। আমি তোমাদের ঘরের বউ, বাইরে যাওয়ার অধিকার আমার নেই, তোমরা দয়া করে দর্শন না দিলে আমি তোমাদের দেখতে পাব না। তবে—সত্যি কথা বলছি বাবা, আমি আশা করিনি যে তুমি আবার আমাকেও দেখতে আসবে।"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় চেনেন না তাই এ কথা বলছেন মা; আর সম্ভব কেউ কেউ আমার নামে অনেক কথা আপনাকে লাগিয়ে দেছে, তাইতেই এই অবশ্যম্ভাবিত আমার আসাকে আপনি একেবারে অসম্ভব বলেই জেনে রেখেছেন। আপনি এটা জানবেন কাকিমা, ছেলে যাই হোক, যত বড় উচ্ছৃঙ্খলই হোক, অত্যাচারীই হোক, মায়ের কাছে সে যে ছেলে সেই ছেলেই থাকে, মা কোনও পরিবর্ত্তন দেখতে পান না, ছেলেও মা বলে তাঁর পরে' নির্ভর করে।"

স্পষ্ট বক্ত্রী ইন্দু মাথা নাড়িল—"মা হয় বটে বাবা, কিন্তু ছেলে তেমনটী হয় না।"

শরৎ বলিলেন, "হয় তো তার মূলে থাকে আর একটা কিছু। স্নেহ বরাবর নীচের দিকে গড়িয়ে যায় মা, তাই মায়ের অফুরন্ত স্নেহধারা ঝরে পড়ে সন্তানের' পরে, তারাও আবার তাদের সন্তানকে তেমনি স্নেহ ঢেলে দেয়। কিন্তু এখানে তো তা হবে না মা আমার, আপনার আমার মাঝখানে আর তো কেউ নেই যে আমার বুকের ভক্তি কুড়িয়ে নিতে আসবে, এ দুটি মা ছেলের মাঝে আর তো কেউ নেই মা, কে বাধা দেবে।"

মুখরা ইন্দু পরাজয় মানিল, এবার সত্যই সে অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া ফেলিল, তাহার মুক্ত মুখ সম্পূর্ণভাবে শরতের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। শান্তদৃষ্টি সে শরতের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শান্তিকণ্ঠে বলিল, "তোমার কথাগুলো ঠিক, সত্যি বাবা, তোমার কথা দিয়েই তোমায় বেশ চিনতে পারা যায়।"

শরৎ হাসিলেন, "না মা, আপনি আমায় চিনতে পারবেন না। আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারিনে, আপনি আমায় চিনবেন কি করে? যাক সে সব কথা, পরিচয় তো হল, এখন আমি যে কাজের জন্মে এসেছি সেইটা বলি শুনুন।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?

শরতের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "পুজোর দালান ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে সেইজন্মে আমি এটা আজই সংস্কার করতে চাই। গত বছর এই জন্মে শ্রীনাথ বাবুকে বলেছিলুম, তাঁকে সব ভার দিয়েছিলুম কিন্তু—"

ইন্দু শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমিই তাঁকে করতে দেই নি। এ দোষ তাঁর নয়। তিনি কর্ত্তব্য পালন করতে

এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন, সে কথা বোধ হয় শোন নি।"

এই মেয়েটীর কথার ভঙ্গী দেখিয়া শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অপমানিত হলেন?"

ইন্দু বলিল, "কেন হলেন এ প্রশ্নের উত্তর আমি যদি না দেই বাবা, জোর করে জানবার অধিকার তোমার নেই।"

হার মানিয়া শরৎ বলিলেন, "সে আপনার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে কাকিমা, জোর করে জানার অধিকার আমার নেই এ কথা যথার্থ। তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তা বলে আমায় তো অপমান করে তাড়াতে পারবেন না। কেন না আমি আপনার ছেলে। মা কখনও ছেলেকে তাড়াতে পারবেন না, তাই জেনে সেই ঠাকুর দালানের উদ্দেশ্য নিয়ে আমিও আজ আপনার দুয়ারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি কাকিমা।"

ইন্দুর আয়ত চোখ দুটি মুহূর্ত্তের তরে জ্বলিয়া উঠিল, চাপা সুরে সে বলিল, "তা আমি বুঝেছি।"

তাহার কথাটা চাপাসুরে উক্ত হইলেও তাহার মধ্যে তীব্রতা যে কতখানি ছিল তাহা শরৎ অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন; তিনি তাঁহার চিরসংযতভাব ত্যাগ করিলেন না, বলিলেন, "বেশ করে বুঝে দেখুন কাকিমা, আমি এটা মন্দ করব না। দালানটা ভাল হলেও আপনারই থাকবে, আমার কেউ নেই যে শেষটায় ভোগ করবে। আমার নিজের যা আছে এই আমার প্রচুর, এর চেয়ে বেশী আমি আর কিছু চাই নি, চাইবও না।"

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, হঠাৎ উত্তর দিল না।

শরৎ ডাকিলেন, "কাকিমা—"

"হ্যাঁ, এক্ষুনিই আমি এর উত্তর দিতে পারছিনে; আগে বেশ করে ভেবে দেখি তারপর তোমায় জানাব।"

সে যে কি ভাবিয়া দেখিবে শরৎ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়াও হাসিমুখে তিনি বলিলেন, "সেই ভাল মা, তবে তাই হোক; আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন, তারপর যা আপনার মতামত হয় আমায় শীগগির করেই জানাবেন। আজ আমি তাহলে উঠি—"

ব্যস্তভাবে ইন্দু বলিল, "তাই কি হয় বাবা? এসেছ যদি, একটু বসো, একটু জলখাবার—"

"মাপ করবেন মা; এরপর কত খাব। আজ ঘণ্টাখানেক আগে একবার বাইরে চা খাবার পাঠিয়েছেন, এখনি কি আর খেতে পারা যায়? এরপর একদিন পেটুক ছেলেকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে দেখবেন, আজ মাপ করতেই হবে।"

শরৎ উঠিয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ—



সম্বর নুণের হ্রদ

মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ
এম্, আর, এ, এস্।

সম্বর হ্রদের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন কিন্তু সম্বরের নুণ কেহ বাঙ্গালা দেশে বসিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্বর রাজপুতনায়। এ হ্রদটীর মালিক জয়পুর ও যোধপুর রাজদ্বয়। ইংরাজ বণিকদের নিকট তাঁহারা বহু বর্ষের জন্য ইজারা দিয়াছেন। আগে দেশীয় লোকেরা লবণ তুলিয়া যে লাভ করিত ইংরেজেরা তদপেক্ষা বহু পরিমাণ লাভ করিতেছেন। এখানে রেল হইয়াছে। তাঁহারা ষ্টেশন হইতে লবণের কারখানা পর্য্যন্ত লবণ চালান দেওয়ার জন্য রেল লাইন দিয়াছেন। আর এখানে তাঁহারা ইংরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীর জন্য অনেকগুলি বাঙ্গলা, একটী হাঁসপাতাল, মিশনরীরা একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন ও স্থানটীকে নানারকমে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। আমি আগরা থাকাকালে এ হেন হ্রদ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হই। আগরার বন্ধু তথায় আমার যাওয়ার বিষয় কোন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট পত্র দেন। আমি আগরা হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে অন্তত্র গিয়াছিলাম। তিন দিন পরে আর একটা রেল জংশনে আসিয়া আটক পড়ি। যদি আমার ভুল না হয় তবে তাহার নাম কুলেরা জংসন। কুলেরা হইতে আর একটা রেল লাইন সম্বরের উপর দিয়া গিয়াছে, আমাকে সেই গাড়ীতে যাইতে হইবে। কুলেরা নামিয়া বাঙ্গালী ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার নাম দাশরথী রায়। পদাবলী সৃষ্টিকর্ত্তা কবি দাশরথী রায়ের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়া এ নাম আর ভুলিব না। দাশরথী বাবু আমাকে এখানে দু' একদিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু এ মরুভূমিতে কি আমাদের মত বাঙ্গালী-প্রাণ থাকিতে চায়? আমি নানা অজুহাত দেখাইয়া সেদিনই যাইব ও ফিরিবার বেলা এখানে আসিব ভরসা দিয়া আসিলাম। দাশরথী বাবু তথাপি ছাড়িলেন না, তিনি গৃহে গিয়া আমার জল খাবারের আয়োজন করিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার, গরম গরম সব আমাদের দেশী মিঠাই। এদেশে এরূপ মিঠাই পাওয়া যায় না, ইহারা ছানা কাটে না, এদেশে সবই ক্ষীরের মিঠাই। তদীয় গৃহিণীর হস্তের প্রস্তুত মিঠাই, বেশ ভাল লাগিল।

তাড়াতাড়ি গিয়া রেল ধরিব মনস্থ করিতেছি, দাশরথী বাবু বলিলেন, "তাড়াতাড়ি নাই, গাড়ী এখান হইতেই ছাড়ে, আমি না গেলে গাড়ী ছাড়িবে না।" গিয়া দেখি গাড়ী ছাড়ার সময় হইয়াছে। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল, ঘড় ধূলীময় পথ, যত লোক দেখিতেছি সবই গায় মাথায় ধূলীমাখা, মাথার চুলগুলি সকলই সাদা বলিয়া বোধ হয়। গাড়ীটেও সাদা। পথিকদের নাগরা জুতার গুড়ালী ভাঙ্গিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে, আর সেই নাগরা জুতার চটপটাপট শব্দ, আর তাহা হইতে ধূলী উড়িয়া আকাশ পাতাল রঞ্জিত করিয়াছে। আমাদের গাড়ীতে সেই ধূলীরাশি আমাদের বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ বাধা না মানিয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিতেছে। যাত্রীরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মাঠের মাঝে মাঝে ষ্টেসন। ষ্টেসনের চারিধারে আর মানুষ নাই। গাড়ীর মধ্য হইতে দেখি আকাশটা যেন সুদূরে গিয়া মাটীতে ঠেকিয়াছে। পথে কাক, শালিকের দেখাও পাইলাম

না, শেয়াল কুকুরের ত কথাই নাই। মাঝে মাঝে মানুষেরা গাড়ী ধরিবার জন্যও গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গিংগ সম্বর পঁহুছিলাম। গাড়ীতে থাকিতেও দেখি কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু বাঙ্গালীর সন্ধানে গাড়ী খুজিতেছেন। আমাকে পাইয়া বুঝি তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আমাকে তীর্থযাত্রীর পাণ্ডার ন্যায় তাঁহারা ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমরা আপনাকে ক'দিনের গাড়ীতেই খুজিতেছি। আজ আর অন্য গাড়ী দেখি নাই। এ বেলায় বেড়াইতে আসিয়া এই আপনাকে পাইলাম। যে বাবুর বাড়ী আপনি আসিবেন তিনি দুই দিন গাড়ী দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকেই সে ভার দিয়াছেন।" সে দেশী ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় করিয়া দিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু আমাদিগকে বসিবার আসন দিয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনাইলেন তখন শীতকাল,চা-টা ভালই লাগিয়াছিল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল! রাস্তায় আলো জ্বলিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম। দুইধারে গাছের শ্রেণী, মধ্যদিয়া পথ, একজন কুলী আমার লট বহর লইয়া চলিল। কিছু দূর যাইতেই রাস্তার পাশের এক বাঙ্গলা হইতে একজন ইংরাজ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের আগরা হইতে আগত বন্ধু কি আসিয়াছেন?" তাঁহারা সদুত্তর দিলেন। আমি মনে করিলাম আমার আগমনটা প্রাইভেট হয় নাই। আমাকে তাঁহারা বাড়ী দেখাইয়া দিলেন, আমি আগে আগে চলিয়া গেলাম। আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করিব এমন সময় এক দুর্দ্দান্ত সারমেয়বীর সশব্দে পথ রোধ করিল। পিছন হইতে তাঁহারা ডাকিয়া কহিলেন, "বাড়ীর ভিতর যাইবেন না, কুকুর কামড়াইবে। আমরা আসিতেছি।" তারপর তাঁহারা আসিলেন, গৃহস্বামীও বাহির হইয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়া ঘরে নিয়া বসাইলেন। কুকুরটা বে-অকুব হইয়াছে। সে আমার গায়ের অলষ্টার ধরিয়া বড় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, যেন তার কত অপরাধ হইয়াছে। কুকুরটাকে আমি আদর করিলাম।

তারপর আমার আসিবার বিলম্বের কারণ কহিলাম। হাত, মুখ ধুইয়া আহ্নিক করিয়া আবার চা ও জলযোগ। তারপর সকলে উঠিয়া যাইবেন, একজন কহিলেন, "আজ আর তবে সঙ্গীতালোচনা হবে না কি?" গৃহকর্ত্তা আমার সম্মতি চাহিলেন। আমি কহিলাম, "অমৃতে কি অরুচি আছে? অমৃত সব সময়ই অমৃত।" তারপর সকলে উঠিয়া গেলেন। কিছুকাল পর তাঁহারা সঙ্গীতযন্ত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সে গৃহে গান, বাজনা তখন বেশ হইল। অনেক রাত্র পরে আহারাদি করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম। শয়নের পূর্ব্বে গৃহস্বামী কহিলেন, "রাত্রে ঘরের বাহির হইলে আওয়াজ করিবেন নতুবা কুকুর কামড়াইয়া ধরিবে।" আমার আর রাত্রে বাহির হইবার প্রয়োজন হইল না। প্রাতে বাহির হইয়া দেখি সারমেয় বীর বন্ধন দশায় পড়িয়াছেন। রাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাই আর কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার বিক্রমে বাড়ীর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে পারে না। চোর ডাকাত প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার এই সারমেয়বীর দৃঢ় পাহাড়াওয়ালা।

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চা জলযোগ হইল তারপর কি করিব তাহার আলোচনা করিতেছি। গৃহস্বামী নিমকের বাবু—তিনি কহিলেন, "নিমকের দারোগাকে আনিয়া আপনার সঙ্গে দিব, আমার পুত্রও আপনার সঙ্গে যাইবে।" নিমকের দারোগার কাছে খবর গেলে তিনি আসিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া পুত্র সহ চলিলাম। প্রথমে যেখানে লবণ প্রস্তুত হয় সেখানে গেলাম। স্থানে স্থানে পুকুর কাটা হইয়াছে, হ্রদের জল সে পুকুরে আনিয়া তাহাতে বালুকা ও রাজ্যের যত আবর্জ্জনা ফেলা হয়, তাহা পঁচিয়া বড় দুর্গন্ধ হইয়াছে। আমাকে নাক চাপিয়া যাইতে হইয়াছিল। তারপর

যেখানে লবণের স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে সেদিকে গেলাম। এক একটা প্রকাণ্ড স্তূপ, দেখিলে মনে হয় যেন এক একটা প্রকাণ্ড তাম্বু সজ্জিত রহিয়াছে। সবগুলি স্তূপই প্রকাণ্ড তাম্বু বা আমাদের দেশী চৌরী ঘরের মত। এই সকল দেখিয়া বাড়ী আসিয়া দেখি গৃহস্বামী আফিসে গিয়াছেন। গৃহিণী ও তদীয় পুত্র আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে দুধ তরিতরকারী বেশ পাওয়া যায়। মাছ পাওয়া যায় না।

আহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম। তারপর যাইব। তদনুসারে দারোগা আসিলেন, আমিও প্রস্তুত হইলাম। গৃহস্বামীর পুত্র সেদিন আর স্কুলে গেল না, আমার সঙ্গে পুনরায় চলিল। আমার শরীরটা কেমন করিতেছিল তথাপি উৎসাহে চলিলাম। আফিসের কাছ দিয়া যাইবার সময় গৃহস্বামী কোন্ কোন্ স্থানে এ বেলায় আমাকে লইয়া যাইবেন তাহা বলিয়া দিলেন। আফিসের পাশ দিয়াই যাইতে হইল। ওপাশে গেলে একটা পাকা ইঁদারা পাইলাম। তাহার কাছে যাইতেই আমি পড়িয়া গেলাম ও সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য হইলাম, তারপর বমি হইলে শান্তি লাভ করিলাম। জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখি আফিসের সাহেব, বাঙ্গালী সব একত্র হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ মাথায় জল ঢালিতেছেন, কেহ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন, কেহ পাখা আনিতে বাড়ীতে দৌড়িয়াছেন। আমার অচৈতন্য অবস্থায় কোথায় ভগবানের নাম করিব আর আমি কিনা তখন গৃহের স্ত্রী, পুত্রের কথাই ভাবি। হায়রে অকৃতজ্ঞ মানব! মরিতে বসিয়াও ভগবানের নাম নাই, তবে আর কবে তাঁর নাম লইবে? আমি গৃহে নীত হইলাম। আমার আর সে দিন বাহির হইতে হইল না। যদিও ঔষধের প্রয়োজন ছিল না, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন। গৃহিণী বারবার গৃহ হইতে তত্ত্ব পাঠাইতে লাগিলেন। আমার নাকি বমি হইয়া সব পড়িয়া গিয়াছে, আবার জলযোগ করিতে। আমি এখন কিছু খাইব না বলিয়া বার বারই বলিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে গৃহ-প্রস্তুত খাবারের দিয়া জলযোগ করিলাম।

গৃহস্বামী আফিস হইতে আসিলেন। সন্ধ্যার সময় আবার ডাক্তার আসিলেন। এ ডাক্তার নিমকের সাহেব বাবুদের জন্যই। সন্ধ্যার সময় সকলে সমবেত হইলেন, তাঁহারা আমার অসুস্থতার জন্য আজ আর গান বাজনা করিবেন না স্থির করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি এখন ত আর অসুস্থতা অনুভব করিতেছি না, বরং গান, বাজনায় ভালই থাকিব।" তারপর তাঁহারা উঠিয়া গিয়া সরঞ্জামাদি লইয়া আসিলেন। একজন বাঙ্গালী গান, বাজনায় পারদর্শী বলিয়াই ভাল চাকরী নিমক মহলে পাইয়াছেন। তিনিও সঙ্গীতে যোগ দিলেন।

সেদিন সকলে হুকুম করিয়া গেলেন, আমার শরীর অসুস্থ, আর তিন চার দিন গেলে সব দেখিতে পাইব। সুতরাং আমাকে আর কয়দিন থাকিতে হইবে বলা যায় না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া ষ্টেসনে বেড়াইতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি হ্রদে যাইবার জন্য কয়খানা গাড়ীসহ একটা এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। এই গাড়ী লবণ আনিতে যাইতেছে। সে লবণ অন্যত্র চালান যাইবে। আমি সে গাড়ীতে চাপিয়া হ্রদে চলিয়া গেলাম। হ্রদটা ২০ মাইল দীর্ঘ, চারি মাইল প্রশস্ত, জল তিন চারি হাতের বেশী নয়। এই হ্রদে এক একবার এক এক দিকে লবণ তোলা হয়। হ্রদের অপর দিকে একটী লাল পাহাড় দেখা গেল তাহা গিরিমাটীর পাহাড়। একদিন সে পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম, প্রস্তরগুলি সবই লাল—গিরি-মাটীর রং। মধ্যাহ্নাহার করিয়া খুব বিশ্রাম করিলাম, দারোগাকে ডাকিয়া আমি বাহির হইলাম। কুলী ও পাহাড়াওয়ালাদের আড্ডা দেখিলাম। লবণ কেহ চুরী করিয়া না নিতে পারে তজ্জন্য দিন রাত্রই পাহাড়া চলিতেছে।

ইংরেজরা আসিয়া এখানে প্রত্যহ হাট করিয়াছেন। আগে সাপ্তাহিক হাট ছিল। এখানে তহশীল-

দারেরা তহশীল ছাড়া দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। লবণ চুরী হইলে তাহার বিচার ইংরেজেরা করেন। তজ্জন্য ৫।৭ জন অপরাধী থাকিতে পারে এমন একটী জেলখানা আছে। রাজাদের জেলখানা বড়। জয়পুর ও যোধপুর রাজার ইহা এজমালী কাছাড়ী। সম অংশে তাঁহারা মালিক। ইংরেজ সওদাগরেরা তাঁহাদের প্রজা হইলেও রাজারা তাহাদের নিকট কাবু হইয়াছেন। এখানে একজন তহশীলদার বা হাকিম আছেন। তিনি তহশীল ব্যতীত দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলাও করিয়া থাকেন, ইংরেজ সওদাগরদিগের নিকট তাহার কিছু হাত আছে বলিয়া বোধ হইল না।

সম্বরের লবণ রাজপুতনা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে চলে। বাঙ্গালা পর্য্যন্ত উহা আসে না। এই লবণ দেখিতে কিছু কালো, বিলাতি লবণের মত ইহা এত পরিস্কার হয় না। ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মচারিণী বিধবারা পর্য্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। এখানের প্রায় সবই লোণা বা খাট্টাজলবিশিষ্ট কূপ। তবে মাঝে মাঝে উহাদেরই ধারে কাছে মিঠা জলের কূয়া আছে। উহাদিগকে এ দেশে মিঠা কূয়া কহে। এখানে কূপ খননের পূর্ব্বে মাটী দেখিয়া কূপ খনন করিতে হয়, মাটী পরীক্ষা করিলেই উহার জল মিঠা কি খাট্টা হইবে তা বুঝা যায়। মিঠা জলের কূয়া হইতে সকলে জল নিয়া পানার্থ ব্যবহার করে। হ্রদে মৎস্য আছে কিন্তু উহা অখাদ্য, মাছগুলি কেমন এক ভুস্‌ভুসে রকমের, উহার স্বাদ বিশ্রী ও লোণা। তাই মৎস্যাহারী প্রবাসী বাঙ্গালীরাও উহা ব্যবহার করে না। এদেশে প্রচুর দুগ্ধ, নানা প্রকার ফল পাওয়া যায়। তাই মৎস্যের তেমন আবশ্যক হয় না।

এখানকার হ্রদ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ কথা এদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এখানকার রাজা কালীভক্ত ছিলেন, তিনি দেবী কালীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, "কিসে আমার ধন বৃদ্ধি হয়।" কালীদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চাৎদিকে না চাহিয়া যত চলিয়া যাইবে, সেই প্রদেশে সোনা ফলিবে, তাহাতেই তুমি ধনশালী হইবে।" রাজাও তদনুসারে অশ্বারোহণ করিলেন। ২০ মাইল ক্রমাগত গিয়া পিছনের দিকে চাহিবার তাহার খেয়াল হইল। চাহিয়া দেখেন তাঁহার পিছনে বিস্তৃত সমুদ্র। রাজা উর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন, "হায়, মা, কি করিলে?" কালীদেবী উর্দ্ধ হইতে আদেশ করিলেন, "ভয় করিও না, এই জল-সমুদ্রেই সোনা ফলিবে।" তারপর দেখিলেন উহাতে লবণ হইয়াছে. সেই হইতে এ হ্রদে লবণ উঠিতেছে। এই লবণের হ্রদে রাজারা প্রচুর ধনার্জ্জন করেন। রাজার আদেশে সেইখানে একটী কালীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখানা সেই কালীদেবীর সেবাপূজা রাজ-প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির আয় হইতে হইতেছে। উহা সম্বর হইতে ১৪ মাইল দূরে। আমি একদিন উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবাইত ব্রাহ্মণেরা আমাকে বিশেষ যত্ন, সমাদর করিয়াছিলেন। সম্বর হইতে সেখানে গোগাড়ীতে যাইতে হয়। যাইবার অন্য উপায় নাই, তবে আমি চাহিলে রাজ কাছারীর হাতীতে যাইতে পারিতাম কিন্তু তদপেক্ষা গো-গাড়ীতে যাওয়াই আরাম-প্রদ। উহা একটী গ্রাম। আমার ন্যায় উৎসাহশীল বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কেহ তথায় যায় না। কেবল বালুকারাশির উপর দিয়া কষ্ট করিয়া যাইতে কেহ রাজী হয় না। যে গ্রামে গিয়াছিলাম সেখানে মুসলমান নাই, কেবলই হিন্দু। বিশেষতঃ এ প্রদেশে মুসলমান অতি অল্প, তাহারা হিন্দুর বাধ্য।

আমি তথা হইতে পুনরায় সম্বর আসিয়া অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা করিলাম সেখানে বাঙ্গালী অত্যল্প। সেখান হইতে কোন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী সত্বর চলিয়া আসিতে পারে না। প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাহাদিগকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় আরো কয়েকদিন রাখিয়া দেন। আমিও সেইরূপ ব্যাপারেই পড়িয়াছিলাম। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া একদিন তাহাদের অনিচ্ছা সত্বে সম্বরত্যাগ করিলাম। তাঁহারা সকলে আমার সঙ্গে আসিয়া সেইখানে তুলিয়া দিয়া গেলেন। তখন হয়ত তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, "যারে বিদেশী বন্ধু, এখন তোরে চাই না।"

দশের পূজা

পূজারিগণ

১। শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।	৬। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ।
২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।	৮। শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৪। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এল্।	৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৫। শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ এম্, এ	১০। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্, এ, ডি, এল্।

ষষ্ঠ পূজা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্য-ভারতী

[**পূর্ব্বানুবৃত্তি** ঃ—এক সময়ে মামুদপুরের বাবুদের বেশ নাম কাম ছিল। কালক্রমে দশাবিপর্য্যয় ঘটে। সেজো হিস্যার মহেশ বাবুর কন্যা মনোরমার সহিত কলেজের ছাত্র দরিদ্র জগদীশের পরিণয় হয়। জগদীশ বি, এ পাশ করিয়া আশি টাকা বেতনে কলিকাতা এক সদাগরী আফিসে কাজ করে। তার পরিবারে নিজে, পত্নী মনোরমা, পুত্র বিমল ও কন্যা অমলা (ওরফে খুকুমণি)। অভাবের সংসার—তার উপর একদিন মনোরমার খুব শক্ত জ্বর হয়। তাহার চিকিৎসায় জগদীশের যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় সম্পূর্ণ ব্যয় হইয়া গেল, অধিকন্তু মনোরমার পিতৃদত্ত গহনাগুলিও বিক্রয় করিতে হইল। সারকুলার রোডের ডাঃ বোসের সুচিকিৎসায় সৌভাগ্যক্রমে মনোরমা রোগমুক্ত হয়। ডাঃ বোস্ মনোরমার বিবাহের পূর্ব্বে তাহার পিতার অর্থ-সাহায্যে ইংলণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পরিবারে তাঁহার পত্নী জয়ন্তী, দুই কন্যা রেখা ও প্রতিমা এবং এক পুত্র অশোক। রেখার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর—প্রতিমা একাদশে পদার্পণ করিয়াছে। জয়ন্তীর অনুরোধে ও ডাক্তার বোসের পরামর্শে মনোরমা স্বাস্থ্যের জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিতে কাশী যাত্রা করিল। জগদীশ দুই মাসের ছুটি লইয়া সঙ্গে চলিল। বিমল ডাঃ বোসের বাসায় রহিল। কাশীর পথে গাড়ীতে প্রফেসার উৎফুল্লের সহিত জগদীশের আলাপ পরিচয় হয়। উৎফুল্লের পত্নী চারুশীলা ষোড়শী তরুণী—তাহার পিতার নামও জগদীশ। সে জগদীশকে পিতৃসম্বোধন করে এবং মনোরমাকে মা বলে। চারুশীলা ও অমলা কয়েক ঘণ্টার কথোপকথনে সম্পর্কটাকে পাকাইয়া তোলে। উৎফুল্লের ও চারুর যত্নে রোগক্লিষ্টা মনোরমার পথটা বেশ আরামেই কাটিয়া যায়। কাশীতে পৌঁছিয়া পিতামাতার

আদর সোহাগে ও যত্নে মনোরমার দিনগুলা বেশ কাটিতে লাগিল। দৈবাৎ একদিন মহেশবাবু নিরাভরণা কন্যার লেংটা মূর্ত্তি দেখেন। মনোরমা পিতার নিকট আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। মহেশবাবু ক্ষোভে ও দুঃখে জামাতা জগদীশকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী অপ্রিয় কথা বলেন। জগদীশ অন্তরালে থাকিয়া তাহা শুনিতে পায় এবং লজ্জায় ও অপমানে মৃত্যুযাতনা ভোগ করে। মনোরমাও স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত অপমানে মৃতপ্রায় হইল এবং নানা উপায়ে স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু অন্তরে যার ব্যথা উপর প্রলেপে তাহার কি হইবে? শ্বশুরের তীব্র বাণে বিক্ষুব্ধচিত্ত জগদীশ আত্মমর্য্যাদাকে গুরুতর মনে করিয়া মনোরমার শত প্রয়াস ব্যর্থ করতঃ একদিন কাশী পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইল। মিঃ বোসের বাসায় গিয়া যখন দেখিল যে দুই মাস মধ্যেই বিমলের অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটিয়াছে তখন 'জগদীশের মনে হইতে লাগিল যেন সমগ্র ভবিষ্যৎটা একটা গভীর অন্ধকারের শত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।' জগদীশ ভাবিল, দারিদ্র্যই আপনার জনকে পর করিয়া দেয়। সুতরাং 'প্রচুর অর্থ চাই, যেন দৈন্যের সঙ্কোচ এড়াইয়া প্রিয়জনকে একান্তভাবে আপন করিয়া লওয়া যায়।' সে চেষ্টার ত্রুটী হইল না, আফিসে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলমপেশার পর সকাল সন্ধ্যায় দুইটা টিউসনী জুটাইয়া লইল। তাহাতেও পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। জগদীশ উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সুযোগও ঘটিল। একদিন আফিস ছুটির পর ট্রামে নকুরচন্দ্র দার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। নকুড়চন্দ্র উপন্যাসের পব্লিশার। তিনি জগদীশকে উপন্যাস লিখিতে উৎসাহিত করেন এবং রাতারাতি বড় লোক হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আগে জগদীশের লিখিবার একটু একটু বাতিক ছিল। নকুড়চন্দ্র তাহাতে ইন্ধন যোগাইলেন। জগদীশ এবার মরিয়া হইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথটা পরিস্কার করিয়া লইতে] মনস্থ করিল।]

—এক—

সেদিনকার নকুড়চন্দ্রের উপদেশের ঝাঁজটা জগদীশের মাথায় পাকা বন্দোবস্ত করিয়া বসিল। জগদীশ বাসায় পৌঁছিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া দক্ষিণের বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। মৃদু মন্দ দক্ষিণে হাওয়া তাহার ধরা মাথাটা একটু শান্ত শীতল করিয়া দিল।

জগদীশ কেবলই ভাবিতে লাগিল একটা উপন্যাসের প্লট। প্লট কত রকমে মাথায় খেলিতে লাগিল, এক একবার এক এক রকম design করিয়া কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া তখনই তাহা কাটিয়া ছাটিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। শিরপুচ্ছ কিছুই ঠিক রহিল না—সব ওলট্ পালট্ হইয়া গেল। জগদীশের অশান্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উঠিয়া আসিয়া স্বীয় কক্ষে কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল।

এ ভাবে বহু চেষ্টায় মাস তিনেক অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া জগদীশ একখানি উপন্যাস খাড়া করিল--শুভ দিন দেখিয়া উহার নামাকরণ করা হইল—"দরিদ্রের কু আশা।"

জগদীশ উপন্যাসখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া অসংলগ্ন স্থান কাটিয়া ছাটিয়া, আবশ্যক স্থল পুরণ করিয়া একদিন আফিসের পর অপরাহ্নে শ্রীমন্নকুড়চন্দ্রের উদ্দেশে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে কল্পনার মোহময় মদিরায় মত্ত জগদীশের হৃদয়াকাশে ঘন ঘন আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল মাঝে মাঝে আঁখির উপরে উৎফুল্ল অন্তরের বহির্বিকাশ প্রকটিত হইতে লাগিল। জগদীশ কল্পনা-বলে তাহার ভবিষ্য অদৃষ্টাকাশে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তাহার চিত্তচকোর সেই সুখ-সুধা পানের নিমিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অতি সতর্ক অনুসন্ধানের পরও যখন নকুড়চন্দ্রের সন্ধান মিলিল না, তখন সহসা তাহার আশা-সৌধ নিরাশার বজ্রাঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। জগদীশ ভাবিল, "হায়! 'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়';—এই বিশ্ব-সংসারেই কি দরিদ্রের প্রতি এমন নির্ম্মম ভ্রূকুটি করিয়া থাকে? জগদীশের স্মরণ হইল—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ। অনুসন্ধানের ত্রুটী হইল ভাবিয়া পকেট হইতে নোটবুক খুলিয়া বাড়ীর নম্বর দেখিয়া লইল। না, ভুল ত হয় নি—এই যে—নং বাড়ী। তবে কি সব উপহাস? বিশ্বপিতার বিশ্বলীলা কি তা হ'লে বিরাট উপহাসেরই একটা জ্বলন্ত বিকাশ?" দুঃখে ও ক্ষোভে জগদীশের বুকটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

বেদনা ভরা বুকে জগদীশ নকুড়চন্দ্রের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার কামনা করিতে করিতে এবং স্বীয় দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে মেসের দিকে প্রস্থান করিল। বাস্তবিক তাহার তৎকালীন বিষাদ-মাখা মুখখানা আষাঢ়ে মেঘের মতো গুরু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। মেঘ হইতে ক্রমে তাহার অন্তরমধ্যে বিষম ঝটিকা উত্থিত হইল এবং অবশেষে যখন বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন সহসা তাহার কানে গেল,—"ওগো, মশাই!"

জগদীশ তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া লইয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল অজ্ঞাত-কুল-শীল জনৈক ভদ্রলোক। জগদীশ অগ্রসর হইয়া কাছে আসিলে ভদ্রলোক বলিলেন, "কাকে চান, আপনি?"

জগদীশ ম্লানমুখে বলিল, "নকুড় বাবুকে।"

ভদ্রলোক সবিস্ময়ে একবার জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নকুড় বাবু! নকুড় ব'লে ত এখানে কেউ নেই—ঠিকানা ভুল করেছেন বোধ হয়।"

জগদীশ পুনরায় নোটবুক consult করিয়া বলিল, "হাঁ, এই ঠিকানাই বটে। নকুড়চন্দ্র দা—নং কলেজ ষ্ট্রীট। নকুড় বাবু পুস্তক পব্‌লিশ্ ক'রে থাকেন।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্মৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, "ও হোঃ, সেই নকুড়চন্দ্রের কথা বল্‌ছেন! তিনি তিন হপ্তা হ'ল কাজ গুটিয়ে উধাও হ'য়েছেন। কত ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন তিনি তার সংখ্যা নেই। আপনিও বোধ হয় একজন অথর (author), না? তা হ'লে—"

ভদ্রলোকটী বলিয়া যাইতে লাগিলেন। জগদীশ একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "না না, তা নয়, তবে আমার একটু প্রয়োজন ছিল, তাই—"

"ওঃ, আমার মনে হয়েছিল কি জানেন? খুব মেরে নিয়েছে বুঝি আপনার। যাক্, ভাগ্যিস্ সেরে গেছেন কিন্তু এবার। কেন মশাই, এসব খুচরো পব্‌লিশারের পেছনে ঘুরে নিজের এনার্জিটাকে নষ্ট করে দেন? যান না, একবার গুরুদাস বাবুর ওখানে, বেশ দু'পয়সা হবে, নাম কামাতেও বেশী সময় লাগ্‌বে না।"

জগদীশের অতটা শুনিবার মতো ধৈর্য্য ছিল না। তাই "ধন্যবাদ" বলিয়া পেঁচো মুখে সে স্থান ত্যাগ করিল। 'কালনেমির লঙ্কাভাগে'র কথাটা স্মরণ হইতেই তাহার মনের ভিতরে এত দুঃখেও একটু হাসি পাইল।

জগদীশের মাথাটা কন্ কন্ করিতে লাগিল। তখন গ্যাসের আলোয় সহরটাকে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার মতো ছাইয়া ফেলিয়াছে। জগদীশ খেয়ালের ঝোঁকে সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিল। রাস্তা একটা সরু গলির ভিতর দিয়া-সেখানে আলোর তত জাঁকজমক নাই। এখানে সেখানে দু'একটা লাইট্ পোষ্ট যেন অন্ধকারে লাল নিশান উড়াইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে পথিকের কম্পাসের কাজ করিতেছে।

বহুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত দেহে জগদীশ মেসের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখে ও বিরক্তিতে উপন্যাস লেখার নেশাটা তাহার একেবারে ছুটিয়া গেল।

—দুই—

এক বৎসর পরে।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার—অবিশ্রাম বৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বের উপর কে যেন একখানা কালো পর্দ্দা মুড়িয়া দিয়াছে—বিশ্বের নিশ্বাস বুঝি সে চাপে বন্ধ হইয়া যায়।

জগদীশ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বসিয়া ভাবিতেছিল —জীবনটার উপর দিয়া কি ঝড় বহিয়া যায়? এই সুখ, এই দুঃখ, আবার সুখ, আবার দুঃখ—ভারী বিচিত্র ব্যাপার! কাল এমন সময় আকাশ কেমন পরিষ্কার ছিল, উজ্জ্বল ছিল—হঠাৎ কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সে উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিয়াছে —আর আজ, সেই আকাশই কি কালো, কি আঁধারে ঘেরা! জীবনের প্রভাতে দিনগুলা তার উজ্জ্বল ছিল, আজ দুর্দ্দশার মেঘে সেই দিনই ঘনকৃষ্ণ আবরণে আপনার সমস্ত উজ্জ্বলতা চাপা দিয়া বসিয়াছে!

মেসের ঝি আসিয়া বলিল, "ওগো, বাইরে কে ডাকৃছে যে!"

এই বৃষ্টিতে বাহিরে কে ডাকিবে? জগদীশের বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠিল, হৃদয়ে কেমন আতঙ্ক জাগিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। কানটা খাড়া করিয়া শুনিল সত্যই বাহির হইতে কে ডাকিতেছে বটে। জগদীশ বাহির হইয়া আসিল; দেখিল বাহিরে দাঁড়াইয়া একটী ভদ্রলোক, মাথায় ছাতা—বৃষ্টিতে জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। জগদীশ বলিল, "কে আপনি?"

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলিলেন, "আমি উৎফুল্ল,—কাশী থেকে আস্‌ছি।" বলিয়া জগদীশের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

"বাবা, উৎফুল্ল",—বলিয়া জগদীশ দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। জগদীশের দুই চোখ দিয়া অশ্রু নির্গত হইল। গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল, "এস বাবা, ভেতরে এস।"

ভিতরে গিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে জগদীশ বলিল, "কাপড় ছেড়ে দাও, সব ভিজে গেছে যে!"

"না বাবা, এক্ষুনি আবার যেতে হবে। তা না হ'লে ওদিকে অসুবিধে হবে যে!"

"এখনই যেতে পার না বাবা। এ দুর্য্যোগে এখানেই থাক, তারপর কাল যা হয় করো।"

"ওদিকে শিবুকে দিয়ে সব্বাইকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি—না গেলেই নয়।"

জগদীশ প্রফুল্ল মুখে বলিল, "তা'হলে মাও এসেছে, বল।"

"হাঁ, প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার চাকুরী হয়েছে কিনা তাই! বাড়ী ভাড়া ঠিক হয়ে গেছে। মা ব'লে দিয়েছেন আজই আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে, তাই তাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি বরাবর এখানে চ'লে এসেছি। এদিকে ভারী দুর্য্যোগ—এ গলিটুকু পেড়িয়ে আস্‌তেই সব ভিজে গেছে।"

"কাশীর সব ভাল ত?"

হাঁ। মা দু'তিন দিনের ভেতরই চলে আস্‌বেন। তিনি বলেন, "বাসা ছেড়ে ভাল করেন নি। আপনার শরীরও ভাল নয় দেখ্‌ছি—এ দু'দিনের মধ্যেই একটা বাসা দেখুন।"

জগদীশ ভাবিতে লাগিল—সবই নিয়তির নিয়ম উপহাস বই ত নয়! গরীবের প্রতি এ অত্যাচার কেন বিধাতা?—জগদীশকে চিন্তিত দেখিয়া উৎফুল্ল বলিলেন, "মেসে থেকে খাওয়া দাওয়ার ভারী কষ্ট হচ্ছে—তা আপনার শরীরে সইবে কেন? বাসা না হ'লে মারা যাবেন যে!"

জগদীশের বক্ষ হইতে একটী লঘু উষ্ণশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—বলিল, "বাবা, তা মানুষমাত্রেরই ইচ্ছা বটে, তবে মানুষের সবই জোটে না, ঈশ্বরের করুণা না হ'লে। দারিদ্র্যই সকল সুখ, সকল আকাঙ্ক্ষার ধ্বংস ক'রে থাকে। কলকাতার বাড়ীতে পোষ্যি নিয়ে থাকা আমার পোষায় না যে।"

"সে জন্য ভাবতে হবে না। আমার যে বাড়ী ভাড়া হয়েছে, তাতে আপনাদেরও স্থান কুলাবে। জানেন ত, আমার লোকজন বেশী নেই। আপনার মেয়ে বলছে, এত বড় বাসায় তার একা মন কেমন করবে। তাই, মা থাকলে সংসারটাও চলবে ভাল। আপনার চেয়ে আমারই সুবিধে বেশী।"

জগদীশ কৃতজ্ঞতার অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, "না বাবা, অত কর্তে হবে না। আমরা যে গরীব। গরীবের ধাঁতে অতটা সইবে না। বেঁচে থাক তোমরা। তোমাদের যশে পৃথিবী ভরে যাক্—দেখে শুনে সুখী হই।"

উৎফুল্ল ছাড়িবার পাত্র নয়। দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের পর ভাবেন আপনি? আমরা কিন্তু ছাড়ছি নে। আপনার না হোক্ আমাদের সুবিধের জন্য অন্ততঃ মাকে আমাদের বাসায় রাখতেই হবে। আপনি অমত কর্বেন না বাবা, তা হ'লে বড় দুঃখ হ'বে।"

জগদীশ একবার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তাহার হৃদয়ের মধ্যেও একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের তড়িৎ বহিয়া গেল। জগদীশ ভাবিতেছিল—এ সংসারটা মরুভূমি। এখানে দয়া, মমতা, স্নেহ বলিয়া কোন জিনিসই নাই। এই নিষ্ঠুর ধরণীর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থই অর্থের লালসায় বদন ব্যাদান করিয়া আছে। হায়, অর্থই কি সব? যার অর্থ নাই সে কি বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ? যেখানে মানুষ নিজকে পর আর পরকে আপন করে নেয় সে স্থান কি অপরূপ! উৎফুল্ল আমার কে যে, এতটা কষ্ট স্বীকার ক'রে, আর্থিক ক্ষতি গ্রাহ্য না ক'রে আজ তার করুণ বাহু বিস্তার করতঃ মূর্ত্তিমতী করুণার মতোই আমায় দুঃখ দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত কর্ব্বার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে? ইহাই বোধ হয় করুণাময় পরমেশ্বরের অলক্ষিত হস্ত-বিগলিত করুণার পবিত্র অমৃত-ধারা।

জগদীশকে নীরব দেখিয়া উৎফুল্ল সাগ্রহে কহিলেন,—"তা হ'লে আর এ দুর্য্যোগে আজ গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই আমি শিবুকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দোব। সব গুছিয়ে রাখবেন আপনি। আর যেন কোন—"

জগদীশ বাধা দিয়া বলিল, "বাবা, তোমার ও মায়ের এ অযাচিত করুণাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি সময় সময় তোমাদের দেখতে পাই তা হলেই আমার সকল দৈন্য, সকল ক্লেশ দূর হ'য়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। আমি কালই একটা বাসা ঠিক করে ফেলবো, তোমার মা এসে সেখানেই থাকবেন। চারুও যেন এতে অমত না করে।"

উৎফুল্লের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মানুষ যে সে শত দুঃখদৈন্য-পীড়িত হইলেও কিছুতেই আত্ম-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে চায় না। জগদীশেরও তাহাই হইয়াছে। সে অকাতরে সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, সংসারের ঘৃণা, অবহেলা তাহার অচল-সদৃশ হৃদয় টলাইতে পারে না, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে হয়।

উৎফুল্ল শেষ চেষ্টা দেখিলেন, বলিলেন, "তা হ'লে ছেলে মেয়েকে ছেড়ে আপনি থাকতে চান, বলুন। তা না হ'বেই বা কেন? আমরা ত আর আপনার পর বই নয়।"

কথাগুলি জগদীশের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। জগদীশ অগত্যা স্বীকৃত হইল। করুণা যেখানে মূর্ত্তিমতী, সেখানে পাষাণ বিগলিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

—তিন—

পরদিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই জগদীশ দেখিতে পাইল শিবু গাড়ী লইয়া হাজির। মনোরমার ঐকান্তিকতা, চারুশীলার আবদার ও উৎফুল্লের অনুরোধ এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে একান্ত বাধ্য হইয়াই জগদীশ তাহার যাবতীয় আসবাবপত্র সহ কেষ্টো

উৎফুল্লের দ্বিতল বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাড়ীখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রাঙ্গণে ময়লা নাই, মেজে তকতকে। দ্বিতলের একটী বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে জগদীশের স্থান হইল। ভৃত্য শিবু চারুশীলার ইঙ্গিতে ইতিপূর্ব্বেই যথোপযুক্ত গৃহ সজ্জা করিয়া রাখিয়াছিল। এখন নবানীত দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

জগদীশ একাকী কক্ষে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। এ'ত দীনের প্রতি দয়া, স্বীয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক হচ্ছে উৎফুল্লের এই করুণার দান। জগদীশের দীর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া একটা উষ্ণ শ্বাস বাহির হইয়া অনন্ত প্রবাহে মিশিয়া গেল।

এমন সময় চারুশীলার প্রবেশ। চারু জগদীশের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা, আপনার শরীর ভাল ত?"

জগদীশ শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "হাঁ মা, ভালই আছে।"

"মা বোধ হয় কালই আসবেন। এদিকে যা যা দরকার আমায় একটা তালিকা দিন।"

"তালিকার দরকার কি মা? আমার যা দরকার নিজেই নিয়ে আস্‌বো। আজ ত রব্‌বার—আফিস নেই।"

"না থাক্। শিবুই নিয়ে আস্‌বে, আপনার কষ্ট কর্ত্তে হবে না।"

জগদীশ বলিল, "এত সুখ সহ্য হ'লে ত মা! যার নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা তার এত বড়-মানুষীতে দরকার কি?"

জগদীশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িল। চারু জিজ্ঞাসিল, "কি ভাবুছেন্ বাবা?"

"ভাব্‌ছি তোমরা আর জন্মে আমাদের কি ছিলে?"

"আর জন্মে কি ছিলেম বল্‌তে পারি নে অবশ্য, তবে এ জন্মে আপনাদেরই ছেলে মেয়ে তা জানি।"

এই আন্তরিক সরলতা এবং জগদীশ ও মনোরমার প্রতি প্রীতি যে অকৃত্রিম তাহা জগদীশ অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারিল। তথাপি কি জানি কি একটা অভাবে নিত্যই তাহার ভিতরটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল।

চারুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে জগদীশ একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে চারু চলিয়া গেল।

উৎফুল্ল সকালে কলেজের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া জগদীশের আগমনে তিনি যে কত সুখী ও কৃতজ্ঞ তাহারই একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়া জগদীশকে আপ্যায়িত করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর মনোরমা ও কন্যা অমলা আসিয়া উৎফুল্লের বাসা আলো করিয়া বসিল। জগদীশের আজ আফিস হইতে আসিতে গৌণ হইল। যেহেতু নূতন সাহেব গত কাল মাত্র আসিয়াছেন। আফিসের কাজ কর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে হইবে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। জগদীশ সারাদিনের কর্ম্ম ক্লান্ত দেহ লইয়া ছিন্ন পাদুকা ও ভগ্ন ছাতা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বারে মনোরমা—অমলা ইতিমধ্যেই নিদ্রার ক্রোড়ে সারাদিনের খেলা ধূলার অবসান করিয়াছে। জগদীশ হাসিমুখে বলিল, "কখন এলে মনো?"

মনোরমা স্বামীর পদধূলি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিল, "এই ত সন্ধ্যাকালে। তোমার শরীর ভাল ত?"

জগদীশ উপবেশনান্তে মৃদু হাস্যে বলিল—"হাঁ প্রাণগতিক ভালই আছি।"

মনোরমা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—"প্রাণগতিক কেমন?"

"অর্থাৎ শরীরটা টিকে আছে বটে, মনটা বুঝি আর থাকে না।"

মনোরমা দুঃখিত হইয়া বলিল, "তুমি এত ভাবো কেন বল ত? ভেবে কি জগতে কেউ কিছু কর্ত্তে পেরেছে? যা যখন হ'বার হ'বেই। বিধিলিপি

কেউ খণ্ডাতে পারে না। তবে দু'দিনের সংসার, এর জন্য ভেবে ভেবে শরীর খারাপ কর্ত্তে যাই কেন? সুখ দিয়ে কি কর্ব্বো, মনে শান্তি থাকলেই হ'ল। তাতেই ত লোকে বলে "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।"

এদিকে চারুর ইঙ্গিতে শিবু একটী পরিষ্কার বাঁধানো হুঁকোয় গয়ার সুগন্ধি তামাক সাজিয়া জগদীশের হাতে দিয়া গেল। জগদীশ তামাকে এক দম দিয়া বলিল, "যা বল্লে সত্যি বটে। দেখ ত কোত্থেকে কে এসে না আবার তোমার মেয়ে হ'য়ে বস্‌লো। ফলে, গয়ার তামাক, আর একেবারে From log cabin to white house কুড়ে থেকে প্রাসাদে।"

এই বলিয়াই জগদীশ হো হো করিয়া হাসিল। বহু দিন পর এই মনখোলা হাসি সত্য সত্যিই জগদীশের বহুদিনকার একটা বুকের বোঝা হাল্‌কা করিয়া দিল।

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় চারু আসিয়া বলিল, "বাবা, আগে চাট্টি খেয়ে নিন্, সারাদিনের খাটুনীর পর বড্ড কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।"

"কষ্ট কি মা? তুমি যে জলখাবার টেকে দিয়েছিলে তাতে যে দু'জনের পেট ভরে যায়। এতটা করো না, মা, এ শরীরে সইলে ত?"

"দেখ কথার ছিরি" বলিয়া চারু চলিয়া গেল। মনোরমা বলিল, "যাও, রাত হয়েছে। মেয়েটা তোমার জন্যে ভাত কোলে ক'রে বসে আছে, এখনও খায়নি। বলে,—না খেতে খেয়ে বসে থাক্‌বো, ছিঃ।"

জগদীশ মনে মনে চারুর কুশল কামনা করিয়া আহ্নিকান্তে আহার সমাপন করিল।

* * * *

কল্‌কাতা নিরব নিঝুম—সকলেই নিদ্রার কোলে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। জগদীশের চোখে ঘুম নাই—কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কোথাকার কে উৎফুল্ল আর চারু? পথের চেনা বই ত নয়। আর কোথায় কে কার জন্যে এত করে? নিজে আছি বেশ, তা নয় আবার সপরিবারে। মেয়েটাও ত বাড়ন্ত কম নয়—যেন জিওমেট্রিকেল্ প্রোগ্রেশনে বাড়্‌ছে। সেদিনকার মেয়ে। আর বড় জোর এক বছর—তারপর? তারপর আর কি, বাঙ্গালার মেয়েদের যা ঘটে থাকে তাই—বলিদান। তা বই কি? যার পেটে ভাত নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, এমন কি থাকবার যোগ্য একখানা কুড়েও নেই—যা পথের ভিখিরীদেরও থাকে—তার আবার মেয়ে কেন? লোকে বলে, যার যার কপাল জোরেই চলে যায়, কে কার কি কর্ত্তে পারে? মনোরমাও দেখ্‌ছি তাই ভেবে ব'সে আছে। আরে, পারে না বটে, তবে কেবল কপালজোরেই ত সব চলে যায় না, একটু চেষ্টা উদ্যোগও ত চাই। 'ধর রে লক্ষ্মণ' বল্‌লেই ত চল্‌বে না। যাক্, ভেবে কি হ'বে?

জগদীশের দেহ চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তবু চিন্তার স্রোত চারুপাঠবর্ণিত পুরুভুজের মতই একটীর পর একটী গজাইয়া জগদীশের ক্লান্ত মনকে বিভ্রান্ত করিয়াতুলিল। তাহার এই চলচ্চিত্ততা মনোরমার চক্ষু এড়াইতে পারিল না। মনোরমা বলিল, "তোমার কি হ'য়েছে? তুমি অমন কর্‌ছো কেন?"

জগদীশ কুকর্ম্মাসক্তের মতো শিহরিয়া বলিল, "কি কর্‌ছি, মনো?"

"ঘুমোচ্ছ না যে!"

জগদীশ হাসিয়া উঠিল,—মনোরমা অনুভব করিল, সে হাসি যেন জোর করা হাসি, প্রাণের স্ফুর্ত্তি তাতে নাই।

মনোরমা বলিতে লাগিল, "কেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ, খাও দাও না তেমন। মুখখানিও ব্যাজার, ব্যাজার। কি যেন ভাব, রেতেও ঘুম নেই।"

জগদীশ আবার হাসিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু হাসিটা আগেরকারের মতই ফুটিল না। "পাগল! পাগল!" বলিয়া হাতখানি মনোরমার কাঁধের উপর

ফেলিয়া, জগদীশ মনোরমাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইল।

মনোরমা আদর করিয়া বলিল, "বল, সত্যি বল, তুমি কি ভাব্‌ছো?"

জগদীশ মনোরমার মুখখানি আদর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি মনে করি, শুন্‌বে মনো? আমার ঘরের হাসি, প্রাণের হাসি তুমি, সেই হাসি যেন ম্লান করো না? তুমি আমার সেবায় দাসী, রসালাপে সখী, পরামর্শে মন্ত্রী—জান্‌লে?

এই বলিয়া জগদীশ মনোরমার মুখখানিতে শুষ্ক অধরে একটী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। মনোরমা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া, অপর দিকে ফিরাইয়া দু'ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, স্বামীর অজ্ঞাতে মুছিয়া ফেলিল। তারপর ফিরিয়া স্নেহবিগলিত স্বরে বলিল, "ও সব হাসি-টাসি খেলার কথা এখন থাক্। তোমার স্ত্রী আমি, কিন্তু তুমি আমায় কিছু বল্‌লে না।"

"কি বল্‌বো মনো?"

"তোমার মনের সব কথা।"

"তা শুন্‌লে তোমারও যে ঘুম হ'বে না, মনো!"

"চাই নে এমন ঘুম, তুমি বল। তুমি সইতে পার্‌লে আমিও খুব পার্ব্বো।"

"পার্ব্বে? তবে শোন। দারিদ্র্যই আমার ভাবনার মূল। দারিদ্র্যেই পিতা পুত্রে, পতি পত্নীতে অনৈক্য ঘটে। দারিদ্র্য বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ। এই অভিশাপের জ্বলন্ত আগুনে তোমায় আমায়, বিমলে ও সর্ব্বোপরি অমলায় পুড়ে ছাই হ'তে হবে। আগুনে ফুৎকার দিলে তা না নিভে যেমন আরো দপ্ দপ্ জ্বল্‌তে থাকে, মানুষের করুণার দান তেমনি দারিদ্র্যকে আরো নির্ম্মম সুস্পষ্ট ক'রে তোলে, বুঝলে?

শেষটায় মনোরমার অন্তরে তীব্র কষাঘাত করিল। মনোরমা বলিল, "ক্ষমা কর এবার, তারপর তুমি যা কর্ব্বে তাতে আর কিছুই বল্‌বো না।"

—চার—

ভাগ্য দেবতার কাছে কোন্ অজানিত অপরাধের ফলে পরিপূর্ণ যৌবনেই যেদিন রেখা ভোগ ঐশ্বর্য্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সে দিন হইতেই ডাঃ বোসের পরিবারে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। বোস্ পরিবারে সে হাসি, সে আনন্দ নাই,—সহসা যেন একটা দমকা হাওয়া আসিয়া সে হাসি আনন্দের দীপটাকে নির্ব্বাপিত করিয়া আবার কোন্ অজানা দেশে উধাও হইল।

সর্ব্বহারা নিঃস্বহৃদয় যখন সাহারার মাঝখানে শান্তিধারার আশায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল তখন আপনার অস্তিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিবার জন্য রেখা কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ইহাতে প্রতিবন্ধক ছিল তাহারই অঙ্কের নড়ি, স্বামীর শেষ দান —লেখা। লেখাকে লইয়া সদ্যঃবিধবা রেখা সাতিশয় দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়া, পার্থিব সকল আলোচনা সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়া এ যাবৎ স্বামীর মাটী কামড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই যখন দেবর কাশীনাথ দিনের পর দিন নানা ছলে বলে কৌশলে বিধবার সম্পত্তিগুলি হস্তগত করিয়া অবশেষে শেষ সম্বল বাস্তভিটাখানিও গ্রাস করিল তখন হতভাগিনী রেখার এক মুহূর্ত্তের জন্যও সোয়াস্তি ছিল না। সে সূর্য্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীটাকে শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন রজনীর মতো অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীর ভিটেয় দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রাখিয়া রেখা পিতামাতার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

বাস্তবিক কাশীনাথ ছিল সেই প্রকৃতির লোক যে বোঝার উপর শাঁকের আটিটাকেও অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ভার বলিয়া বোধ করে। কিন্তু যখন লেখার পিতা পত্নী ও কন্যাকে রাখিয়া অজানা দেশের পথিক হইলেন তখন দাদার মোটা পাওনা সম্বন্ধে কাশীনাথের একটা বড় রকমের বরাদ্দ ছিল। যেহেতু

দাদা তহশীলদারের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার চালচলনও খুব বড়মানুষী ছিল। কিন্তু সে যখন দেখিল দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বৌদির ও লেখার উদর পোষণ সম্বন্ধে নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত, তখন তাহার বৌদির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিটা নিমেষে কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। এবার সত্যসত্যই রেখা ও লেখার শুভাগমনটা তাহার নিকট নিতান্ত অশুভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে নিজের মূর্খতার জন্য অহরহ নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

যাহা হৌক্ কাশীনাথকে সেজন্য বেশীদিন অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। তাহার সহধর্ম্মিণী ভৈরবী (পিতৃদত্ত নামটা কি জানা নাই, তবে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি সে পিত্রালয়ে কালীতারা নামে অভিহিত হইত। নামটার সঙ্গে বর্ণের সৌসাদৃশ্য আছে ব'লিয়া ইহা দুষ্ট লোকের অভিধান হইতে পারে। যেহেতু পিতা-মাতার কাছে 'কাণা ছেলে পদ্মলোচন' হইয়া থাকে। যাহা হৌক্ আমরা কাশীনাথ-পত্নীকে ভৈরবী নামেই অভিহিত করিব, কারণ, তাহার ক্রোধদীপ্ত চামুণ্ডামূর্ত্তি শ্বশুরের দেশে তাহার ভৈরবী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।) স্বামীর চিন্তার ভার লঘু করিবার জন্য নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই একদিন বলিল, "বলিহারি, তুমি যে বুদ্ধির কাঁঠাল! 'আপনি শোবার স্থান নেই শঙ্করাকে ডাকে।' নিজেদেরই পেট পুরে দু'বেলা জোটে না, আবার বারো ভূতের পেটযোগানোর দানসত্র খুলে ব'সে আছ। ঈশ্বর দু'টো গুড়ো দেখিয়েছেন,নিজেও ভেবে ভেবে দিন দিন সারা হচ্ছো। ঈশ্বর না করুন, যদি একটা ভাল মন্দ হয় তা হ'লে ওদের নিয়ে পথে বসতে হবে দেখ্‌ছি।"

কাশীনাথ অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "তাই ত, কি করি বল। খুব ঠকেছি কিন্তু এবার।"

ভৈরবী নথ নাড়িয়া বলিল, "ঠক্‌বে না! তোমার ঘটে যে বুদ্ধি! তাদের পাঠিয়ে দাও না বৌর বাপের বাড়ী। শুন্‌ছি তারা বড়লোক।"

"হাঁ, বলা সহজ বটে। আমিও যে তা না ভেবেছি তা নয়। জানই ত, দাদা যখন মারা যান, তখন তাদের নিতে এয়েছিল বৌ'র বাপের বাড়ী থেকে, কিন্তু বৌ এই চুলোর মাটী কাম্‌ড়ে র'ল এখানে।"

ভৈরবী বলিল, "ধ্যেৎ! তাই তোমায় লোকে বলে 'গোবর গণেশ'।"

"লোকে নয়, তুমিই—"

উভয়ে যুগপৎ উচ্চ হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংযত করিয়া ভৈরবী বলিল, "তাদের ভিটে মাটী ছাড়া না কল্লে এখানেই পড়ে থাক্‌বে।"

"ঠিক বলেছ, কিন্তু মেও ধবে কে?"

ভৈরবী সুন্দরী দাঁতে দাঁত খিচাইয়া কাশীনাথের কানে কি পরামর্শ দিল। প্রকাশ্যে বলিল, "বুঝ্‌লে? সাপও মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে।"

"একে মনসা তায় আবার ধুঁয়ার গন্ধ"—কাশীনাথ লাফাইয়া উঠিল।

আর কথা হইল না। কাশীনাথের ম্যাক্‌বেথের বঙ্গানুবাদ পড়া ছিল। স্বীয় পত্নীর দিকে একবার চাহিয়া লেডী ম্যাক্‌বেথের কথা স্মরণ হইল। বুকটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভৈরবীর ভৈরব হুঙ্কার তাহার সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিল—"কালই একাজ কর্ত্তে হ'বে।"

"তথাস্তু"—বলিয়া কাশীনাথ নিদ্রার কোলে বিশ্রাম করিল।

পরদিন সকাল বেলা। কাশীনাথ মহাজন নিমচাঁদের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া আসিল। কেহ কিছু জানিল না—সরলা রেখার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে বজ্র উদ্যত হইয়াছে তাহা সে ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই—পাওয়ার আবশ্যকতাও তাহার ছিল না, সে আপন মনে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল।

ফলে দেখা গেল ত্রিরাত্রি না যাইতেই বিধবার খুঁদে মাটী নিমচাঁদের করাল কবলে। কাশীনাথ প্রকাশ্যে বলিল—"কি কর্ব্বো, সকলই অদৃষ্ট! তা না হ'লে দাদা এত বড় চাক্‌রে হয়েও নিমচাঁদের

দায়মুক্ত না হ'য়ে যাবেন তা কে স্বপ্নেও ভেবেছে? হাঁ, ঋণদায় বড় দায়। শাস্ত্রেও আছে, ঋণের শেষ, পাপের শেষ রাখ্‌তে নেই। দাদা ঋণমুক্ত হ'লেন তাই যথেষ্ট।"

দাদার ঋণ-মুক্তিই কাশীনাথের অভিপ্রায়-তাই সে নিমচাঁদের কার্য্য অবৈধ মনে করিতে পারিল না, বরং বৌদি ও ভাইঝি ত আর পর নয়, তাহাকেই এদের পালন করিতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া সে সকলের নিকট আত্মদোষ-ক্ষালনের সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা কাশীনাথকে জানিত তাহারা গোপনে কানাঘুষা করিল।

একদিন ভৈরবী স্বামীকে গোপনে পাইয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "দেখ্‌লে, কেমন বুদ্ধির দৌড়!"

কাশীনাথ ম্লান মুখে বলিল, "হাঁ, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

ভৈরবী হাসিয়া বলিল, "হবেই ত—আমার ওকালতির ফিস্‌টা—"

"ওঃ, না, মারা যাবে না। নিমচাঁদ থেকে নিও।"

"কি বল্‌ছো তুমি? পাগল হ'লে নাকি?"

"পাগল হই নি, সত্যি বল্‌ছি। ভোগটা যখন তার পেটেই গেল, ফিস্‌টা সে দেবে না ত কি আমি দেবো?"

"সত্যি?" ভৈরবীর কালো মুখখানা আরো কালো হইয়া গেল।

"কাশীনাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "সত্যি না ত কি আর মিথ্যে বল্‌ছি? দরকার?"

ভৈরবী এবার একদম বসিয়া পড়িল।

নিয়তি অলক্ষ্যে থাকিয়া বোধ হয় হাসিলেন।

—পাঁচ—

প্রতিমা দিনের পর দিন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, লোকনিন্দার পূর্ণ উৎস খুলিয়া বারো পাড়িয়ে তেরোয় পা দিয়াছে। বয়স কাচা হইলেও তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে তাহাকে ষোড়শী তরুণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিমা সত্য সত্যি প্রতিমা—সুনিপুণ তুলিকার পূর্ণ বিকাশ। যেদিন বিমলদের বাড়ীতে তাহার সহিত বিমলের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেদিন তাহার চাঞ্চল্য সকলকে উত্যক্ত করিয়াছিল, কিন্তু তার পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রতিমার দেহে যৌবনের লক্ষণগুলি বিকাশ লাভ করিয়া তাহাকে জানি না, কোন্ ইন্দ্রজাল-প্রভাবে সহসা সুশীলা ও গৃহকর্ম্মে নিপুণা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য বিমলকে একদিকে যেমন বিস্মিত করিল, অপরদিকে তেমনি সে যেন কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। প্রতিমার চরণ-ক্ষেপণ, কঙ্কন-নিক্কণ, বিশেষতঃ কোকিল কণ্ঠস্বর বিমলকে কি এক মোহমদিরায় মত্ত করিয়া তুলিত, তাহা সে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে চিন্তা করিয়া নিজেই মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইত। প্রতিমাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিমলের চঞ্চল তৃষিত চক্ষুর্দ্বয়ের নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল। এই দূরত্ব বিমলের চিত্তপটে প্রতিমার এক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত।

যাহা হোক সুযোগ ঘটিয়া গেল। যে দিন রেখা তাহার বৈধব্যের বেশ ধারণ করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে আসিয়া পূর্ব্বস্থান অধিকার করিল সেদিন হইতে প্রতিমার মনে কি জানি কি একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। রেখার সেই দীন বেশ, রুক্ষ কেশ ও সর্ব্বোপরি নিয়ত ম্লান মুখখানি প্রতিমার অন্তরে এক বিভীষিকার সঞ্চার করিল—সে সর্ব্বদা রেখার চক্ষুর অন্তরালে নিজকে টানিয়া রাখিত। ইহা রেখার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না বটে, কিন্তু প্রতিমার সেই নির্ম্মল মূর্ত্তিখানিতে কালিমা স্পর্শ করে তাহা তাহার আদৌ সহ্য হইত না। তাই সে প্রতিমার স্বেচ্ছাগতিতে কখনো বাধা দিত না।

প্রতিমার সঙ্গী ছিল লেখা। লেখার ক্ষুদ্র চম্পক-কালিকা সদৃশ অঙ্গুলিগুলি টিপিয়া ধরিয়া যখন তার গণ্ডদেশে যথেচ্ছ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিত তখন কি এক প্রেমরসে কিশোরীর সর্ব্বদেহ সিঞ্চিত হইত।

মাঝে মাঝে পুলকিত দেহে বালিকার ক্ষুদ্র অঙ্গ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সে অশ্রু মোচন করিত।

একদিন দুপুর বেলা—বিমল তখন কলেজে। সকাল বেলা হইতেই আকাশে মেঘগুলা আনাগোনা করিতেছিল। টুপ্ টাপ্ করিয়া দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে।

লেখা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রতিমা নিজকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে বিমলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহারই হারমোনিয়মটা খুলিয়া সুর ধরিল, কিন্তু বহু দিনের পরিত্যক্ত হারমোনিয়ম বেসুরো বাজিতে লাগিল। প্রতিমা এদিক ওদিক নাড়িয়া, স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে ইহার হারমোনিয়ম-জীবন ধন্য করিয়া পুনরায় কোমল অঙ্গুলি-সংযোগে 'সা, রে, গা, মা' ভাজিতে লাগিল। এবার সুর উঠিল। প্রতিমা গান ধরিল—

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী!

প্রতিমার সেই ললিত কণ্ঠের বিচিত্র স্বর কক্ষ ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িল। সে জানিতে পারিল না যে তাহারই প্রতীক্ষায় যে এতদিন তৃষিত চাতকের মতো আকাশ পানে চাহিয়াছিল সে তাহারই কক্ষে বসিয়া তাহারই শুষ্ক কণ্ঠে সুশীতল অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে। বিমল কিছুদিন হইল সময়ে অসময়ে প্রায়ই কলেজ হইতে চলিয়া আসিত। সেদিনও আসিল, দেখিল কাকের নীড়ে কোকিলা—তাহারই মানস-প্রতিমা। তখন বিমল অন্তরে একটা উৎকট উৎকণ্ঠা নিয়া কক্ষের পশ্চাদ্ভাগে নিঃস্পন্দ ভাবে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রতিমার কণ্ঠবিগলিত সুমধুর সঙ্গীতের অমৃতধারা যথেচ্ছ পান করিতে লাগিল। কিন্তু যখন বিমল খিড়কীর পথে প্রতিমার অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিমাখানি দেখিয়া লইল তখন একটা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে দেখিল প্রতিমার চোখ দুটীতে যেন আজ সে স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু নাই, মুখেও কেমন বিষন্নতার ছায়া পড়িয়াছে। একটা তীব্র বেদনায় তাহার মন টন টন করিয়া উঠিল।

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামিল - ঘন ঘন বিদ্যুতের খেলা, বাতাসও বেশ প্রবল। আকাশে প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা। বিমল আর নিভৃতে আত্মগোপন সমীচীন মনে না করিয়া চঞ্চল পদে কক্ষে প্রবেশ করিল।

সহসা পথে সাপ দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে প্রতিমাও তেমনি অকস্মাৎ বিমলের অভাবনীয় আগমনে নিতান্ত অপ্রতিভ হইল। তাহার গোলাপী গণ্ডদ্বয় দেখিতে দেখিতে আরো রক্তাভ হইল, সঙ্গীতের স্বর কোন্ এক অদৃশ্য কষাঘাতে সহসা থামিয়া গেল, হারমোনিয়মটা বৎসহারা গাভীর মতো বেতালে হাম্বারব করিতে লাগিল।

বিমলও প্রতিমাকে দেখিয়া বিস্ময়ের একটা কৃত্রিম অভিনয় করিল। কিন্তু কণ্ঠে সহসা বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সে কথা কহিবে কি—তাহার বাক্‌শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। প্রতিমার কণ্ঠনিঃসৃত সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতস্বর, আর তাহার শ্লথ বস্ত্রান্তলের অভ্যন্তরে যে মোহিনী প্রতিমা—তাহা দেখিয়া সে এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িল যে তাহার খেয়ালই ছিল না, এই যে অনুভূতি তাহাকে গ্রাস করিতেছে ইহা সুখের, না, যাতনার। তাহার মনটা এক বিষম ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। হুঁস ছিল না। তার পর হঠাৎ তাহারই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে একটা কম্পিত স্বর ফুটিয়া উঠিল, - "প্রতিমা—"

সহসা কাহাকেও অতর্কিত চাবুক মারিলে তাহার যেমন মুখের ভাব হয় প্রতিমার মুখেও ঠিক তেমনি একটা কাতরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

বিমলের সতর্ক দৃষ্টি তাহা ধরিয়া ফেলিল। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় ডাকিল—"প্রতিমা—"

এবার প্রতিমা হারমোনিয়মটা ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপলক দৃষ্টিতে বিমলের মুখপানে চাহিয়া নত বদনে উত্তর করিল, "কি ?"

উত্তরটা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইল। বিমল ভাবিল, সেই চঞ্চলা পরিহাসরসিকা প্রতিমার এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সে বড় দায়ে পড়িল। এখন আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহাই ভাবিয়া কুল পাইল না। কিন্তু কিছু না বলিলেই নয় ভাবিয়া বলিল, "তুমি আজকাল পড়াশুনা করছো না যে !"

প্রতিমা বিমলের নিকটই পড়া বলিত। বলিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

আবার সংক্ষেপ! বিমল একটু পরিহাস-লসিত কণ্ঠে বলিল, "গান বাজানাও—"

প্রতিমা নিরুত্তর। সে যে লুকাইয়া গান বাজনা করে তা বিমলের কাছে আর গোপন করা চলে না।

বিমল ধীরে ধীরে এক খানি চেয়ার টানিয়া বসিল। প্রতিমার চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিল, "যেও না, প্রতিমা ভয়ানক জল যে। একটু অপেক্ষা কর জল থেমে যাক্।"

বিমলের কক্ষ অন্তর্ব্বাটী হইতে একটু দুরে ছিল। সুতরাং প্রতিমাকে যাইতে হইলে জল মাথায় না করিয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও লজ্জা ও সঙ্কোচে কাতর হইয়া সে যথাস্থানে উপবেশন করিল।

উভয়ে নীরব—কিন্তু উভয়েরই অভ্যন্তরে তুমুল ঝটিকা বহিতেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিতেছে, আবার আঁধারে চারদিক্ ছাইয়া ফেলিতেছে। বিমল এক সময় চাহিয়া দেখিল, প্রতিমা বাহিরের মূক প্রকৃতির দিকে চাহিয়া আছে। বলি বলি করিয়াও বিমলের কি জানি কি বলা হইতেছে না। অবিরত তাহার অন্তরে প্রতিমার সেই বাঁশরী-কণ্ঠ মিহিসুরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা কড়কড় শব্দে চারদিক কাঁপাইয়া দীপ্ত আলোয় আকাশ ভরাইয়া অদূরে বাজ পড়িল। প্রতিমা সরিয়া আসিয়া বিমলের হাত চাপিয়া ধরিল। বিমলের দেহের মধ্য দিয়া এক তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা _ গেল। সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—"প্রতিমা-

প্রতিমা কথা কহিল না। বিমলের মাথা ঘুরিতেছিল—পাগলের মতো সহসা সে দুই হাতে প্রতিমাকে আপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "প্রতিমা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।"

প্রতিমার মুখে তেজের একটা দীপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল। সহসা সে বিমলকে প্রচণ্ড ভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বিমল দা—"

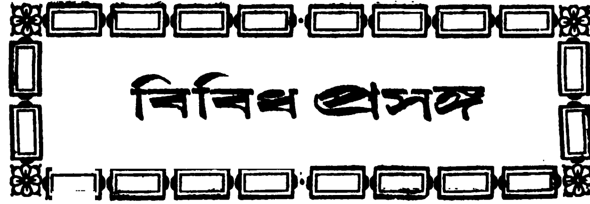
বিমল একেবারে ভড়কাইয়া গেল। প্রতিমা বলিতে লাগিল, "এত স্পর্দ্ধা আপনার! একা পেয়ে আজ আমায় এমন অপমান !"

বিমলের শরীর অবসর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে সসঙ্কোচে ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিল, "ক্ষমা কর, প্রতিমা, আমি সত্যি তোমায় বড় ভালবাসি।"

প্রতিমা আরো দৃপ্ত স্বরে বলিল, "ভালবাসা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়, বিমল দা। জগতে অনেকেই অনেককে ভালবেসে থাকে, তা ব'লে ভালবাসার অপমান ক'রে কেউ ভালবাসা লাভ করে নি, কর্ত্তে পারে নি।"

বিমল লজ্জায়, ক্ষোভে ও দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মান হইল। প্রতিমা বলিতে লাগিল, "এ আস্পর্দ্ধার ক্ষমা নেই। অবলা পেয়ে পুরুষরা মেয়েদের অপমান কর্ব্বে, আর তারা নীরবে সহ্য কর্ব্বে ? কথ্খনো না, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আপনি সে সীমা অতিক্রম করিয়েছেন। যান, এক্ষুনি চ'লে যান আপনি।"

এই বলিয়া প্রতিমা বিদ্যুৎ-শিখার মতো ক্ষিপ্র সে কক্ষ ত্যাগ করিল। বিমল হতাশ চিত্তে সেই শূন্য কক্ষে বসিয়া বাহিরের বিভীষিকাময়ী প্রকৃতির দিকে উদাস প্রাণে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া বারিধারা অজস্র নির্গত হইতে লাগিল—সে অবশ্যই প্রেমের শীতল অশ্রু নয়, ঘৃণার ও অপমানের তপ্ত অশ্রু-ধারা। অতঃপর বিমল জলধারা মাথায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।



তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য ও লাভ

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্ত্তী

এম্ এ, সাংখ্যতীর্থ

যমপুকুর, পুণ্যি পুকুর ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া অহং গ্রহ উপাসনা পর্য্যন্ত হিন্দুর সমুদয় কর্ম্মই ব্রহ্মাভিমুখী। হিন্দুর শাস্ত্রানুমোদিত আহার বিহার প্রভৃতি সকলই তাহার শরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া তোলে। মানুষমাত্রেই সত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বর্ত্তমান আছে। তমোবৃত্তি মানুষের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখে, জিনিষের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে দেয় না এবং শরীরকে গুরুভারযুক্ত করে বলিয়া নড়িবার চড়িবার সামর্থ্যও থাকে না। রজোবৃত্তি মানুষকে কর্ম্মে চালিত করে, কিন্তু অস্থির-স্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। সত্ববৃত্তি শরীরকে লঘু ও উত্থানযোগ্য করে এবং অন্ধকারের যবনিকা দূর করিয়া দিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। সত্যের স্বরূপ অবগত হওয়াই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সত্ববৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে।

মানব-শরীরে দুই প্রকার মল আছে—বাহ্য মল ও আন্তর মল। এই দ্বিবিধ মল দূর করিতে আন্তর ও বাহ্য এই দ্বিবিধ শৌচের প্রয়োজন। মৃত্তিকা ও জলের সাহায্যে বাহিরের মল এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা ভিতরের মলের শোধন করিতে হয়। শরীরে ধূলি কাঁদা লাগিলে অথবা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে পিচুটি, খইল প্রভৃতি নির্গত হইলে জল ও ক্ষার মৃত্তিকার সাহায্যে তাহা অনায়াসে দূর করিতে পারা যায়, কিন্তু মন বুদ্ধ্যাদির দুষ্ট ভাব অপনোদন করা অতীব কষ্টসাধ্য কার্য্য। শরীরের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, বহিঃ শৌচের সহিত অন্তঃশৌচেরও সেই সম্বন্ধ। শরীর ভাল না থাকিলে যেমন মনও ভাল থাকে না, বহিঃ শৌচের অনুষ্ঠান না করিলেও সেইরূপ অন্তঃশৌচের অধিকারী হইতে পারা যায় না। এই অধিকারিত্ব নিরূপণই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের ভীষণ সমস্যা। হিন্দুশাস্ত্র অধিকারী-ভেদে কর্ম্ম-ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রদত্ত এই অপূর্ব্ব বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিদ্যামদগর্ব্বিত হিন্দু সন্তান আজ আলেয়ার পেছনে পথ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া, অর্ব্বাচীন-প্রচারিত সাম্যবাদের চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লক্ষ্য মানুষমাত্রেরই এক, কিন্তু অধিকারী ভেদে গন্তব্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। বিভ্রান্ত মানুষ আজ এই মহাসত্য ভুলিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়াই সনাতন আর্য্য সমাজের আজ এই দুর্দ্দশা ও অধঃপতন।

তীর্থযাত্রা হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা স্বাবলম্বন, নানা-বিষয়িণী অভিজ্ঞতা, মানসিক উৎকর্ষ সাধন, সাধু-সঙ্গ, সদ্‌-গুরু লাভ, ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও বৈরাগ্য লাভ প্রভৃতি অমূল্য ধনে ধনী হইতে পারা যায়। ইহা একাধারে আন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ মল দূরীকরণে সমর্থ। এই জন্য ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ আশ্রমীর প্রতি তীর্থযাত্রার উপদেশ করিয়াছেন।

তৃ ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া তীর্থ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা হইতে অর্থাৎ যাহার সংস্পর্শে আসিলে পাপাদি দূরীভূত হইয়া যায় তাহাই তীর্থ। তীর্থ ও আয়তন ভেদে পুণ্য স্থান দ্বিবিধ—প্রভাস পুষ্কর প্রভৃতি জল-সন্নিহিত

পুণ্য প্রদেশ তীর্থ নামে এবং পশুপতিনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতির মন্দির এবং ঋষি প্রভৃতির তপোবনাদি আয়তন নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয়বিধ তীর্থ-গমনের দ্বারাই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীখণ্ডে উক্ত আছে যে স্থাবর জঙ্গম ও মানস ভেদে তীর্থ ত্রিবিধ। গঙ্গাদি পুণ্য প্রদেশ স্থাবর তীর্থ, ব্রাহ্মণ জঙ্গম তীর্থ এবং সত্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সর্ব্বভূত-দয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য এবং মনের বিশুদ্ধতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। স্থাবর ও মানস তীর্থে নিত্য অবগাহন করিলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার মোক্ষ লাভ হয়। জঙ্গম তীর্থ সম্বন্ধে কাশীখণ্ড বলেন—

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকম্।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥"

ব্রাহ্মণ জঙ্গম তীর্থ, তিনি নির্ম্মল ও সর্ব্বকামপ্রদ। উহাদের বাক্য শ্রবণ করিলেই মলিন ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে তীর্থযাত্রার অধিকারী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

জঙ্গম তীর্থযাত্রা সর্ব্বকালেই প্রচলিত ছিল। স্থাবর তীর্থ-যাত্রা কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা যে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে আমরা তীর্থযাত্রার বিবরণ দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, পদ্ম, স্কন্ধ প্রভৃতি পুরাণেও তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন সেই সময় একদিন দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করেন। যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! যে ব্যক্তি তীর্থ যাত্রার অভিলাষী হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তাহার কি ফল হয়, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। উত্তরে নারদ বলিলেন—মহাত্মা ভীষ্ম যখন পিত্র্য ব্রত অবলম্বন করিয়া গঙ্গা-দ্বারে (হরিদ্বারে) ভাগীরথী তীরে মুনিগণের সহিত বাস করিতে ছিলেন, তখন একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হন। ধার্ম্মিক-প্রবর ভীষ্ম তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য দান করিয়া, আপনি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঠিক সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি পুলস্ত্য যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন আপনার অবগতির নিমিত্ত আমি তাহাই বিবৃত করিতেছি। পুলস্ত্যের উত্তর হইতে তীর্থযাত্রার অধিকারী ও তাহার ফল একাধারে প্রকাশ পাইবে। পুরাণ সমূহের বিবরণ মহাভারতের বিবরণেরই অনুরূপ। সুতরাং বাহুল্যভয়ে শুধু মহাভারতের বিবরণই এস্থানে প্রদান করা যাইতেছে—যাহার হস্ত পদ এবং মন সুসংযত অর্থাৎ যিনি অন্যায় প্রতিগ্রহ ও পর-পীড়াদি হইতে বিরত, যিনি দৃষ্টিপূত দেশে পাদক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তিযুক্ত তিনিই তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্যায় দান গ্রহণ করে না, যে আপনার যাহা কিছু আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশীভূত যাহার অন্তরে ও বাহিরে মালিন্য নাই, এবং যে অহঙ্কার-বিরহিত, সেই ব্যক্তি তীর্থ যাত্রার ফল পাইয়া থাকে। যাঁহার কপটতা নাই, যে ব্যক্তি অল্প আহার করিয়া থাকেন; যে অপরের নিকট আহার্য্য বস্তু ভিক্ষা করেন না কিন্তু লোকসমূহ যাঁহাকে অযাচিত ভাবে দান করিয়া থাকে, যিনি সংযমযুক্ত ও সর্ব্বদোষ-মুক্ত তিনি তীর্থ যাত্রার ফল পাইয়া থাকেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি ক্রোধশূন্য, সত্যবাদী, গৃহীতব্রত এবং সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিয়া থাকে সে ব্যক্তিই তীর্থযাত্রার ফল পাইয়া থাকে। ঋষিগণ দেবতা ও মানবগণের জন্য নানারূপ যজ্ঞের বিধান এবং ইহকালে ও পরকালে উহার যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বহু ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য শুধু ধনী ও রাজগণই করিতে পারেন। দরিদ্রগণ উহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। পুণ্যপ্রদ তীর্থগমন এবনিষ্ঠ দরিদ্রের পক্ষেও সম্ভব; অথচ ইহা যজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ। তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস এবং কাঞ্চন ও গোদান না করিলে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তীর্থ যাত্রার দ্বারা তাহা হইতেও অধিক ফল পাওয়া যায়।

তীর্থ গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন। হৃদয় পবিত্র না হইলে যোগ, যাগ, তপস্যা আরাধনা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়াছেন, তিনি যেস্থানে বাস করেন সেই স্থানেই তাঁহার কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থের ফল লাভ হয়। এ জন্য ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ মনই মানবের তীর্থ। মদ্য পাত্র যেমন শত বার ধৌত করিলেও পবিত্র হয় না, অবিশুদ্ধাত্মা লোকও সেইরূপ শত তীর্থজলে স্নান করিয়াও তীর্থ-ফল প্রাপ্ত হয় না। তীর্থ গমন করিয়াও যাহাদের অন্তরের মল দূর হয় নাই, তাহাদের তীর্থ গমনের কোন ফলই হয় নাই।

সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তীর্থে ভ্রমণ

করিলে অতি কলুষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণও নির্ম্মল হয়। তীর্থে গমন করিলে হীনযোনিতে বা কু-দেশে জন্ম হয় না। যাহারা শীতোষ্ণ ও বাত বৃষ্ট্যাদি সহ্য করিয়া বিধি পূর্ব্বক ধীর ভাবে তীর্থ গমন করে, অন্তিমে তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

সমর্থ হইলে তীর্থযাত্রী যান, ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিবে না। ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া যে সকল ধনী যান বাহনাদি দ্বারা তীর্থ যাত্রা করে তাহার সেই তীর্থ নিষ্ফল হয়।*

কর্ম্ম লোচনে উক্ত হইয়াছে যে, যানের দ্বারা তীর্থ গমন করিলে অর্দ্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, ছত্র ও পাদুকা লইয়া তীর্থে গমন করিলে তদর্দ্ধ বিনষ্ট হয়; তীর্থে তৈল ও মাংস ব্যবহার করিলে তাহারও অর্দ্ধেক নষ্ট হয় এবং তীর্থে মৈথুন আচরণে সমুদয় পুণ্য নষ্ট হইয়া যায় †।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ স্থাবর তীর্থ। ব্রাহ্মণ শব্দে এ স্থানে প্রধানতঃ আর্য্য-ঋষিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মের সংস্থাপক ও সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই নির্জ্জন অরণ্যে, নদীতট ও গিরি-গুহা আশ্রয় করিয়া বাস করিতেন। সুদূর দেশ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থী ও রাজন্যবর্গ শুশ্রূষু হইয়া তাঁহাদের পদ প্রান্তে উপস্থিত হইত। কোনও জটিল ধর্ম্ম মীমাংসা করিতে হইলে ঋষিগণ পর্ব্বত শিখরে বা অন্য কোন পবিত্র নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। এই সকল জঙ্গম তীর্থের আবাসস্থলসমূহ এখনও হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইতেছে। এখনও ব্যাস, বশিষ্ঠ, কণ্বাশ্রম প্রভৃতি—তীর্থ স্থানগুলি ভারতের অতীত স্মৃতি-চিহ্নরূপে মানবহৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

বৈদিক যুগের ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্মবহুল ছিল। ঋষিগণ স্ব স্ব তপোবনে এবং রাজগণ কোনও পবিত্র নদীতটে বা রাজধানীতে যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। এই যজ্ঞবাটে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ নানা তত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা এবং নানা পৌরাণিক কথার অবতারণা করিতেন। এই রূপে জন্মেজয়ের যজ্ঞে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক মহাভারত কথিত হইয়াছিল। কনখল, নন্দ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান এই প্রকারেই তীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে।

* ঐশ্বর্য্য লাভ মাহাত্ম্যাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ।
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাদ্যানং বিবর্জ্জয়েৎ॥

† পুণ্যার্দ্ধং হরতি যানে তদর্দ্ধং ছত্রপাদুকে।
তদর্দ্ধং তৈল মাংসাভ্যাং সর্ব্বং হরতি মৈথুনে॥

বৈদিক যুগের পর ভারতের ধর্ম্ম-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বৈদিক যাগ যজ্ঞ বিস্তর আয়োজনপূর্ণ ও ব্যয়-বহুল ছিল বলিয়া জনসাধারণ উহার অনুষ্ঠানে আর তত মনোযোগী ছিল না। উপনিষদের জ্ঞান-গর্ভ উচ্চাঙ্গের উপদেশ শুধু দ্বিজাতির বিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিগণ ঐ সকল কাজ কর্ম্মের অধিকারী ছিল না। কালক্রমে ইহার এক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। এই সকল ধর্ম্মে চারি বর্ণ ও সমুদয় জাতিরই অধিকার ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতা ও প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নানা স্থানে মঠ, মন্দির, চৈত্য, বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। কালে এ সকল স্থানও তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিণত হইল।

এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু স্বধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম কালবশে গ্লানিযুক্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হইতে পারেনা। ভগবান নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখনি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবে তখনি তখনি তিনি আবির্ভূত হইয়া ঐ ধর্ম্মবিপ্লব দূর করিবেন। তাই স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তিনি শঙ্কর-রূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কুমারিকা হইতে হিমাচল ও পুরী হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাজয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে আবার মুসলমান ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইলে চৈতন্য কবীর রামানন্দ, তুকারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া উপনিষদাদিতে প্রচারিত উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মকে পৌরাণিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া আড়ম্বরশূন্য ও সর্ব্ব-জনের প্রিয় করিয়া প্রকাশিত করিলেন। এইরূপে বহু পুরাণবর্ণিত দেব দেবীর মূর্ত্তি ও তীর্থ নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। কালে উহারাও তত্তৎ-সম্প্রদায়ের নিকট তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল।

অন্তর্জগতের বস্তুগুলিই দার্শনিক আচার্য্যগণের মতে বহির্জগতে বিকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং বহির্জগতের স্থাপিত ও প্রকাশিত দেব দেবীর মূর্ত্তি গুলি যে সেই পরম ও চরম পদার্থের অভিব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে এই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের মূল সূত্রগুলিতে পৌঁছিতে পারে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল তীর্থ ও দেবায়তনগুলির এত মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রোক্ত ফল ব্যতীত ও তীর্থগমনে নানা প্রকার ফল বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিম্নে ২।৩ টীর উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে আজকালকার যান বাহনের বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া তীর্থ-যাত্রীকে পদব্রজেই সমুদয় স্থানে যাইতে হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পদব্রজেই তীর্থে গমন করা উচিত। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই তীর্থ গমনের প্রয়োজক। যাহাদের দেব দ্বিজে ও শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস নাই, তাহার তীর্থ গমন নিষ্প্রয়োজন। তবে অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য যাঁহারা তীর্থ যাত্রা করেন তাহাদের ও তীর্থযাত্রা একেবারে বিফলে যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষ সাধু ব্যক্তিকে উপহাস করিতে আসিয়াও তাঁহার সংস্পর্শে সাধু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ তীর্থযাত্রা করিয়াও অনেকে স্থানমাহাত্ম্যে অন্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন। অতএব যে ভাবে যে তীর্থ যাত্রা করুক তাহাতে উপকার বই অপকার হয় না। আধ্যাত্মিক ভাবে উপকৃত না হইলেও লৌকিক উপকারিতা ইহাতে নিশ্চয়ই আছে।

যাঁহারা নিঃসম্বল বা অল্প সম্বল লইয়া তীর্থ যাত্রায় বাহির হন তাঁহাদিগকে নিজ কাজ নিজেরই করিয়া নিতে হয়। বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান ও আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে তাহাদিগকে নানা জাতীয় লোকের সহিত মেলা মেশা করিতে হয়। এইরূপে লোকপ্রকৃতি অধ্যয়ন করার অতি সুন্দর অবসর পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে নিতান্ত অনাত্মীয় এবং অপরিচিত ব্যক্তিও রুগ্ন তীর্থযাত্রীর সহযাত্রী হইয়া অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, আবার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও দুর্গত যাত্রীকে নিতান্ত পরের ন্যায় অসময়ে ও অস্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমার এবারকার ভ্রমণে এরূপ ৩।৪টী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা কখনও একাকী বিদেশে গমন করেন নাই প্রথম প্রথম তাঁহাদের একটু অসুবিধা মনে হয় বটে, কিন্তু কয়েক দিন চলিয়া গেলে এ কষ্ট আর থাকে না। সুখে দুঃখে, ইহকালে পরকালে একমাত্র ভগবানই সহায়। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে হয়। তীর্থের পথে অনেক স্থানে হাঁসপাতাল প্রভৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু ঐ সকল হাঁসপাতালে যাহারা যাইয়া উপস্থিত হয় তাহাদিগেরই আশ্রয় মিলে। উহারা রোগী খুঁজিয়া লইয়া যায় না। কাজেই রাস্তায় রুগ্ন বা রুগ্ন অবস্থায় সঙ্গী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাহার কষ্ট ও দুর্ভোগের সীমা থাকে না। একমাত্র ভগবান্‌ই তখন সহায়। তিনি কোন উপায় করিয়া দিলে উদ্ধার নতুবা বন্ধুবান্ধব-পরিত্যক্ত দেশে নির্জ্জনে তাহার প্রাণ বিয়োগ বা বিপদের কথা মনে হইলে লোক ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি থাকিলে অনেক সময় তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে সাধু মহাত্মগণের সহিত সাক্ষাৎ ও সৎগুরু লাভ ঘটিয়া থাকে। সাধু মহাত্মগণ আমাদিগকে উপদেশ প্রদান না করিলেও তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও বাক্যালাপ হইতে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। একদিকে সাধুসঙ্গ ও অপরদিকে স্থানের মাহাত্ম্য। তাঁহাদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও তাঁহাদের আচরিত পথে বিচরণ করিয়া আমরা নিজেদের গলদ অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়া মনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পারি। কোন সাধু মহাত্মার কৃপা হইলে হয়ত বা মানব জীবনের আকাঙ্খিত সেই নিত্য নিরঞ্জনের পথের সন্ধান পর্য্যন্ত লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়।

তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা প্রত্যহ নূতন নূতন বস্তু দর্শন, নূতন স্থানে আগমন, অপরিচিতের সহিত সহবাস, স্বহস্তে প্রয়োজনীয় কার্য্যাদির অধিকাংশ সম্পাদন ও অন্য কর্ত্তৃক কার্য্যাদি সম্পাদন দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়িণী অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। এ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশী। পুস্তকাদি পাঠ ও অন্যের কার্য্য দর্শন করিয়া আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহা কষিয়া লইবার সুযোগ আমাদের গৃহে থাকিয়া প্রায়ই ঘটিয়া উঠেনা, কিন্তু তীর্থ ক্ষেত্রে আমরা এ অভিজ্ঞতার মূল্য নিজ হাতে যাচাই করিয়া নিতে সমর্থ হই এবং অপরকেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি।

তীর্থ যাত্রার দ্বারা শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়। বদ্রিনারায়ণ প্রভৃতি পথে প্রতিদিন নিয়মিত ভ্রমণের দ্বারা শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং শরীর লঘু ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। পথে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নানাবিধ বস্তু দর্শন করিয়া এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া মনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। আজকাল কর্ম্মক্লান্ত জীবনের প্রফুল্লতা আনয়ন করিবার জন্য ও অবসাদগ্রস্ত শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে লোকে স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যান। তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা একাধারে দুইটী কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা শরীর ও মনের প্রফুল্লতা লাভ হয় এবং আধ্যাত্মিক জগতেরও অনেকটা তত্ত্ব পাইতে পারা যায়। তীর্থক্ষেত্রের প্রাকৃতিক অবস্থাতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে যে একাগ্রতার সহিত ঐ বিষয়ের চিন্তা করিলে ভাবুকের অন্তর বিস্ময় ও প্রেম-রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। নীরব প্রকৃতির আধিপত্য সাধারণ মানবের অন্তঃকরণের উপরও নিতান্ত কম নয়। প্রকৃতি

নীরবে লোকের চিত্তে নানা সদ্ভাবের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে ভগবানের সাক্ষাৎ হস্ত দেখিতে পাইয়া নিতান্ত পামরের মনও অনেক সময়ে ধর্ম্মভাবরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। এইরূপে সংসারাসক্ত পঙ্কিল মনকেও ভগবন্-মুখী করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। উহার স্বরূপ অবগত হইতে হইলে মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। বেদের তত্ত্ব অবগত হইয়া উহার সাহায্যেও ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়, কিন্তু উহা বহু সময় ও তপস্যা সাপেক্ষ। কলির জীব সাধারণতঃ চঞ্চলপ্রকৃতি ও অল্পজীবী। উচ্চ অঙ্গের সাধনা এযুগে দুর্লভ। যাহাদ্বারা অতি সহজে এ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। তীর্থ গমন ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

জগতে নিখুঁত খাঁটি জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মানুষ সাধারণতঃই প্রবৃত্তির দাস। তাহারা ইন্দ্রিয়ের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া নিবৃত্তি মার্গের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া তীর্থ যাত্রার মাহাত্ম্য উদ্ঘোষিত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য এখন অনেকাংশে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মানুষ শুধু সংস্কার-বশে যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় তীর্থ ক্ষেত্রে গমন করিতেছে। যে পাণ্ডাগণের উপর এই তীর্থ ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তীর্থযাত্রিগণের অন্তর-রাজ্যের ভাবসমূহ ফুটাইয়া উঠাইতে যাহারা প্রাণপণ সাহায্য করিত, অনেক স্থলে আজ তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ রাজ্য হইতে তাহাদের দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়া এখন যাত্রিগণের টাকার থলিয়ার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পবিত্র দেব মন্দির ও তীর্থ স্থান সমূহ এখন কুৎসিত ক্রিয়ার রঙ্গভূমি হইয়াছে। মোহান্তগণ এখন মোহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধৃতি ও সংযমের সুধাস্বাদন করিতেছে না, কিন্তু ভগবানের নামে অর্জ্জিত অর্থের অসদ্ ব্যবহার করিয়া অলস ও উদাস জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যে সকল স্থানে এরূপ ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তীর্থের পূর্ব্ব মাহাত্ম্য ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই উহার প্রতিরোধে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বহুকাল হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপি ইহা ভারতের বক্ষ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ধর্ম্মমত জল-বুদ্বুদের মত উত্থিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম যে শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে ওরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা কি ভাবিয়া দেখিবার কথা নয়? অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে অবশ্যই দেখা যাইবে যে, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের স্বভাবই এই যে উহা বাহিরের আবরণে আবৃত হইলেও উহার প্রকৃত স্বরূপ কখনও অন্যরূপ হইয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্ম একটু ম্লান হইলেও উহা একেবারে নষ্ট হইবে না, হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আর একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপ্লবটা বাহির হইতে আসে নাই, এটা অন্তরের বিপ্লব। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া একদল কর্ম্মী এখন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতে যত্নপর হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে বিভিন্নতা রাখিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই এক পরমেশ্বরের সন্তান, সুতরাং সমুদয় কার্য্যেই সকলের সমান অধিকার থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টিই এইরূপ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য-পূর্ণ। স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় প্রকৃতিতে এ বৈষম্য দেদীপ্যমান। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্টিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রে বিভক্ত। এ শুধু শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, আমরা চক্ষের উপরেও ইহার জলন্ত সত্য দেখিতে পাইতেছি। সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা বলবান্ ও বুদ্ধি-সম্পন্ন; আম গাছ, তেঁতুল বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট। আবার সিংহ হইতে সিংহ ও আম্র হইতে আম্রেরই উৎপত্তি হয়। আম গাছে শত চেষ্টাতেও জাম ফলাইতে পারা যায় না। এই সকল বিষয়ের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিয়া বিদ্বান্ ও ভাবুকগণের একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া উচিত। মনগড়া গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা জাতির সৃষ্টি হইতে পারে কিনা এ সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাইতেছে।

দন্তরুচি-কৌমুদী।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সেদিন অরুণ এসেছিল তার বন্ধু রজতের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু রজৎ তখন বাড়ী ছিল না। তাই সে রজতের ভগ্নী কুমারী অশোকার সঙ্গে বসে গল্প করছিল।

তারা দুজনে অনেক্ষণ ব'সে ব'সে কথা কইছিল। ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। হঠাৎ দরজা খুলে অশোকার বাপ মিঃ চৌধুরী ঘরে ঢুকে অরুণের দিকে চেয়ে বললেন

"রাত্রি কত হয়েছে জানো?"

অরুণ থতমত খেয়ে উঠে পড়ল এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাদের বাড়ী থেকে পালিয়ে এলো।

মিঃ চৌধুরী অশোকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ছেলেটির কি মাথা খারাপ?"

অশোকা বললে—"না! আমার সঙ্গে তো উনি বেশ কথা বলছিলেন! এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বাবা?"

মিঃ চৌধুরী বললেন "আমার ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমি তাই সময়টা জানবার জন্য,—কত রাত হয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম তা ও ছোকরা কোনও জবাব না দিয়ে অমন চমকে উঠে পালালো কেন?"

২

ঝীয়ের দেশ থেকে একখানি চিঠি এসেছিল। ঝী চিঠিখানি দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে এ চিঠিখানি তার মানুষটি লিখেছে; কিন্তু কি লিখেছে সে পড়তে জানেনা বলে বুঝতে পারছিল না, তাই অনেক ভেবে চিন্তে খানিকটা তুলো হাতে করে চিঠিখানা নিয়ে সে বাইরে কর্ত্তাবাবুর কাছে গেল!

কর্ত্তা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা কর'লেন—"কিরে ঝী, কী দরকার?"

ঝী সলজ্জভাবে বললে, "আজ্ঞে কর্ত্তা, আমার দেশ থেকে এই পত্রখানি পচার বাপ্ আমাকে লিখেছে!"

কর্ত্তা বললেন—"তা কি হয়েছে? আবার দেশে যাবি নাকি? এই ত সে দিন দেশ থেকে এলি!"

ঝী আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—"আজ্ঞে না কর্ত্তা; দেশে যাবো না, কিন্তু মানুষটা কি লিখলে কিছু বুঝতে পারছিনে, তাই বলছিলুম আপনি যদি এই তুলোটুকু কাণে দিয়ে পত্রখানা আমাকে পোড়ে দেন, তাহ'লে—"

কর্ত্তা বললেন—"তা কাণে তুলো দিয়ে পড়তে যাবো কেন—?"

ঝী একেবারে জড়সড় হ'য়ে ঘাড় হেঁট ক'রে বললে—"আজ্ঞে, কর্ত্তা আপনি মনিব, পিতৃতুল্য। মিন্‌সেটা যদি চিঠির মধ্যে কিছু বেয়াদপী ক'রে থাকে, সেটা আর তা হ'লে হুজুরের কাণে যাবে না।"



ক্যাথেরিন্ মেয়ো ও মাদার ইণ্ডিয়া—

সম্প্রতি আমাদের দেশে ক্যাথেরিন্ মেয়োর 'ভারতমাতা' নামক বইখানা লইয়া খুবই আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের দেশের মহিলা সমাজের প্রতি অতি জঘন্য ভাবে আক্রমণ করিয়া জগৎ-সমক্ষে ভারতের নারী-সমাজকে হেয় করাই হইতেছে এই লেখিকার উদ্দেশ্য। মিস্ মেয়ো তাহার বইতে এই কথাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে—"ভারতীয়দের বিশেষতঃ ভারতীয় নারী ও শিশুদের দুঃখে আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে। আশা করি আমার লেখা তাহাদের কিছু উপকার করিবে।" ডাঃ আনি বেশান্ত,—"মাদার ইণ্ডিয়া" বহির তীব্র নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন যে, এই বহিখানির উদ্দেশ্য কেবল গলদ কাটিয়া বাহির করা,—"ভারতকে যে জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের তথা সমগ্র শ্বেতজাতির গৌরব-বৃদ্ধি ও তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দেশের সর্ব্বত্র এ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। সভাসমিতি হইতেছে, পুরুষ ও নারী সমান ভাবে যোগ দিতেছেন। এই প্রতিবাদের ফলে মিস্ মেয়োর বইখানার ক্ষতি অপেক্ষা লাভ হইতেছে এই যে বই খানা হাজারে হাজারে হু হু করিয়া বিক্রয় হইতেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। মিস্ মেয়োর এই তীব্র আক্রমণে আমাদের কোন জ্ঞান হইবে কি? আমরা আমাদের নারী-সমাজের কল্যাণ-কল্পে কোনরূপ মনোযোগী হইব কি? এই যে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এই যে নারী-সমাজ দিন দিন ধর্ষিত হইতেছে তাহার প্রতিকার আমরা কি করিতেছি? তারপর আমাদের সাহিত্য আজ কাল যে আবর্জ্জনায় পরিণত হইতেছে সে দিকে কে লক্ষ্য করেন? আমাদের দেশের নৈতিক স্বাস্থ্য যে হীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই সব বই ইংরাজীতে তর্জ্জমা হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইলে আমাদের কোন্ দিকে মুখোজ্জ্বল করিবে? এমন সব দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যাহাতে নিজেদের কলঙ্ক বই গৌরবের কিছুই নাই। মিস্ মেয়ো 'তোদের শিল তোদের নোড়া, তোদেরই ভাঙ্গি দাঁতের গোঁড়া' এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দুঃখ হয় যে আমরা মানুষ নই। ইউরোপ ও আমেরিকায় নৈতিক হীনতা ব্যভিচারের লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত ত আমাদের অজ্ঞাত নাই! কিন্তু মিস্ মেয়ো যে আমাদের লিখিত বিবরণী ইত্যাদি হইতেই সব কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই যে দুঃখের কথা। আমাদের মানুষ হইয়া ইহার প্রতিবাদ কার্য্য দ্বারা দেখান উচিত। আমরা যে কতদূর অপদার্থ তাহা ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত **বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন** শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে দুই একটী কথা তুলিয়া সপ্রমাণ করিতেছি। "* * ঘরে অমানুষ আত্মীয়ের দ্বারা, বাহিরে পশু প্রকৃতি অন্য লোকদের দ্বারা অনেক বঙ্গনারীর নির্য্যাতন চলিতেছে। ইহা জঘন্য কাপুরুষতা, এবং পশুত্বেরও অধম, কারণ পশুরা

এরূপ অত্যাচার করে না। এই সকল অত্যাচারের সুযোগ যে সকল সামাজিক প্রথা বা অন্য রীতিনীতি হইতেই হউক না কেন, তাহার উল্লেখ দ্বারা নরাধমদের দুষ্কার্য্যের আংশিক দোষ ক্ষালনও নিন্দনীয়। ভদ্রলোকের মত ঐ সব কুপ্রথা ও কুরীতির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে। * * * ১৩৩৩ সালে অত্যাচারের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। কেন? ইহার উত্তর কি বক্তৃতা-বাগীশেরা দিন না? তারপর শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের বৃদ্ধাধাত্রীর রোজনামচাখানি কেহ পড়িয়া দেখিয়াছেন কি?

সাহিত্যিকের সম্মান—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এম্. এ. উপাধি (honorary) দান করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

* * *

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান ছাত্র—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় অর্থ-নীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি ছাত্রাবাসের ৪০১ জন ছাত্রের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাহাদের মধ্যে ২৮৪জন হিন্দু, ১১৭জন মুসলমান। এই অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন এমন সব পরিবারের ছেলে যাহাদের আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত অতি সামান্য—নয় টাকারও কম! আর হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার আয় অপেক্ষা কম, শতকরা ৭ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৬০ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ গরীব। এতদিন সিংহমহাশয়ের ন্যায় অমূল্য রত্নটী কোন্ অন্ধকার খনিতে লুকাইয়াছিলেন?—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুণ এই যে তাহারা রত্ন চয়নে অসাধারণ। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিলাম যে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদত্ত হইবে! এই সিংহ মহাশয়ের অর্থ-নীতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য কত বড় সে বিষয়ে আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

অধ্যাপকের ইউরোপ পরিভ্রমণ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আগামী বৎসর ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিবেন। আমরা তাঁহার এই ভ্রমণ সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এইবার

লেগে যাবে কাড়া কাড়ি;
কে হবে Provost জগন্নাথ হলে
কে জিনিবে, কেবা হারি!

অধ্যাপকদলের মধ্যে এখন হইতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, অনেকের যে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে সে সংবাদও আমাদের অজ্ঞাত নাই।

* * *

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের স্মৃতি-সভা—

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২৯ শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছে। খান্ বাহাদুর তসদ্দক আহ্মেদ্, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, গিরিশচন্দ্রনাগ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণটী বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে আর স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইল ভাদ্রের শেষে!—এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থা হয় কেন?

Printed by Radha Ballav Basak. at the Narayan Machine Press. Dacca.



দেবদাসী　　　　　শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

Himani Press, Calcutta.



তৃতীয় বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৪ [২য় সংখ্যা

তান্‌কা-ষোড়শী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ক্লিষ্ট জীবন !
নিয়ত কি যাতনা !
দেহ-পিঞ্জরে
প্রাণ মম আকুলি'
ডানা সদা ঝাপটে !

বড় বিষাদ !
কোথা আছ, রূপসী !
বিরহে তোর
রহিব কি একাকী
আজীবন জগতে !

এসো সকাশে
ঘুচাতে এ বিচ্ছেদ !
গানে তোমার
দাও প্রাণে আনন্দ।

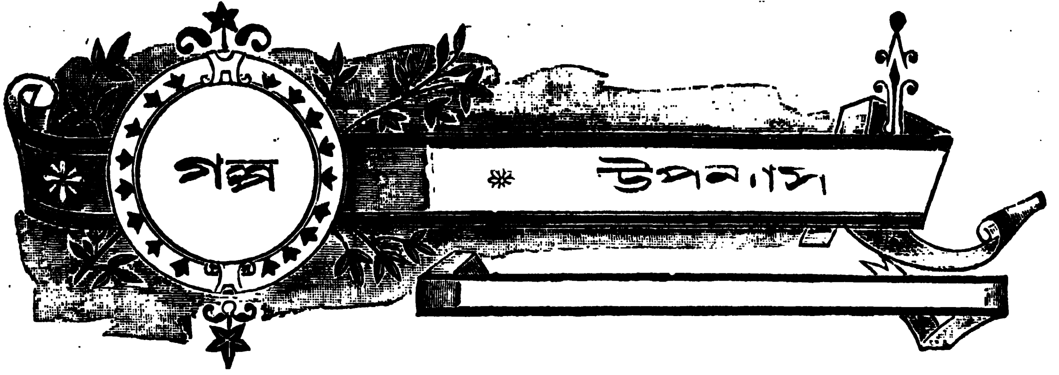
জয়ী করো জীবনে !
নব যৌবনে
লভেছিলাম তোমা' !
মোর তখন
সবি ছিল জীবনে !

সুখ-স্বপ্ন কত না !
চুম্বনে তব
জনমে প্রেম মম !
জীবন ধন্য
মানিয়াছি সে দিন !

সে' চুমু কোথা এবে
সে ভালোবাসা
ভুলিবার নহে গো !
সে কম্প্র স্পর্শে

জাগে যে শিহরণ,
আজো জাগে স্মরণে !
'বউ-কথা-ক'
ডাকে পাখী প্রভাতে !
আমিও, প্রিয়ে,
ডাকি তোমা' এরূপে
অন্তরের অন্তরে।
এ সম্ভাষণ,
কাতরতা কখনো
পশিয়া প্রাণে
করে কি আনমন
তোমারেও নিশীথে ?
মানি, লো মানী !
মোর মতো তুমিও
সহিছ জ্বালা,
লভিয়া আন জনে
দিনে রাতে কেবলি !
এ চুক্তিবদ্ধ
বিবাহ কি বিবাহ ?
গলে ঝুলায়ে
দিলে কি গো অমনি
আত্মীয় সে আত্মার !
দৈহিক ক্ষুধা
মিটিছে দেহ পেয়ে ;
অন্তর-ক্ষুধা
বিনে আর মেটে না
প্রেম-সুধা তোমারি !
সে সুধা-বিন্দু
দাও, দাও, প্রেয়সী !
ছাড়ো গো লজ্জা
কপটতা নাশিয়া !
খুলে' কহ সকলি !
মিলিব আজি
সর্ব্ব অঙ্গে তোমারি !
আমি ও তুমি
এক হবো শরীরে
সর্ব্ব বাধা ঘুচায়ে !
সবি অলীক !
প্রেম সত্য ভুবনে !
কেন গো তবে
ডুবে' রবো বিষাদে
আজীবন দুজনে !
হে মূর্ত্ত শান্তি,
শান্তিদাত্রী তুমি যে !
লো মনোরমা,
যৌবনের মধ্যাহ্নে
নাশো হেন বিরহ !
দিবা তো যায় !
রজনী কাটে কই !
চাপিতে অশ্রু
কপোলে ধারা রয় !
কপালে ছিল এই !! *

* ইতালির সনেট্, মলয় উপদ্বীপের পান্তুম্ এবং জাপানের তান্‌কা এক শ্রেণীরই বটে। প্রত্যেক তান্‌কা পাঁচ ছত্রেই শেষ হয়। প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইবার নিয়ম। কিন্তু অপূর্ব্ব শক্তিশালী কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তান্‌কা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিয়া গিয়াছেন এবং প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে পাঁচটির পরিবর্ত্তে ছয়টি এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রে সাতটির পরিবর্ত্তে আটটি করিয়া অক্ষর ব্যবহার করিয়া নূতনত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। এই নূতনতায় মধুরতাই বাড়িয়াছে বটে ;



নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩)

স্কুলে মেয়ে জুটিয়াছিল অনেকগুলি, প্রণতি প্রথম দিনেই এতগুলি মেয়ের সমাগম দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিল দিনগুলা যত নিরানন্দে কাটিয়া যাইবার আশা সে করিয়াছিল ততটা নিরানন্দে কাটিবে না। এই স্কুল লইয়া থাকিলে তাহার দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিবে।

আজ কয়দিন হইল জমিদার মহাশয় গ্রামে আসিয়াছেন ইহার মধ্যে সে এক দিনও তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা জমিদার মহাশয় আসিয়াই স্কুল দেখিতে আসিবেন, কিন্তু কয়দিনের মধ্যে তিনি আসিলেন না।

এই লোকটীর সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিরাট কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। না জানি ইহার আকৃতি কেমন, হয় তো তাহার প্রকৃতিরই অনুরূপ। মাতালের আকৃতি যেরূপ কর্কশ, তাহারও তেমনি, তাহার মধ্যে কোমলতা এতটুকু জাগিয়া নাই।

বাপুয়ার কাছে আকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ জানিবার উপায় ছিল না। সে তাহার সাঁওতালি বুদ্ধিতে বলিয়া দিয়াছে মানুষ যেমন দেখা যায় জমিদার বাবুও তেমনিই, তাহাপেক্ষা বেশী বাহুল্যতা তাহার মধ্যে একটু নাই। বাপুয়ার যেমন দুইটা হাত, দুইটা পা, একটা মাথা দুইটা চোখ প্রভৃতি আছে, জমিদার মহাশয়েরও তেমনিই আছে। জমিদার বলিয়া তাঁহার চারিটা হাত, দুইটা মাথা, গোটা দশেক চোখ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তো গেল বাপুয়ার কথা। তাহাকে আর বেশী জিজ্ঞাসা করাই ঝকমারী।

কিন্তু লোকটা যাহাই হোক, সে যে এড়াইয়া গেল ইহাতে যথার্থই প্রণতি একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মাতালের সঙ্গে মিশিতে না হয় সেই-ই ভাল। একবার সে বড় বিপদেই পড়িয়াছিল সে কথা আজও বেশ তাহার মনে আছে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াই সে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে শিক্ষার কাজ পাইয়াছিল। গৃহস্বামী মাতাল তাহা সে জানিত, কিন্তু চরিত্র যে যথার্থই তাঁহার ঘৃণিত তাহা সে জানিত না। একদিন সে যা বিপদে পড়িয়াছিল—দৈবযোগে তাহার ছাত্রী গৃহস্বামিনী আসিয়া পড়িয়া তাহাকে রক্ষা করেন। সেই পর্য্যন্ত প্রণতি মাতালের উপর চটিয়াছিল। মাতাল হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারায়, মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হয়, সে ইহাই জানিয়াছিল, প্রাণপণে সে তাই মাতালের সান্নিধ্য কাটাইয়া চলিত।

সে দিন বুধবার ছিল। যথা সময়ে স্কুলের ছুট দিয়া শ্রান্ত পদে বাসায় ফিরিয়াই প্রণতি বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। শরীরটা আজ তাহার সকাল হইতেই

অসুস্থ ছিল, কেবল সে না গেলে স্কুল চলিবে না বলিয়াই অসুস্থ শরীর লইয়াও স্কুলে গিয়াছিল। ইহার পর সমস্ত দিন মেয়েদের সহিত চীৎকার করিয়া মাথাটাও বড় বেশী রকম ধরিয়া উঠিয়াছিল।

বাপুয়া উনানে আগুণ দিয়া চাল কয়টী লইয়া ধুইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, প্রণতিকে বাসায় ফিরিয়াই স্কুলের পোষাক সুদ্ধ বিছানায় শুইয়া পড়িতে দেখিয়া চাল ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, "কি হয়েছে দিদিমণি, শুয়ে পড়লেন যে?"

হাসিমুখে প্রণতি বলিল, "কিছুই হয় নি রে, যা তুই, তোর কাজ কর গিয়ে। আজ আমার চাল দিস নে বাপুয়া, রাত্রে আমি ভাত খাব না।"

বাপুয়া বলিল "তবে যে বলছেন কিছু হয় নি! এই বলছেন ভাত ছুঁইবেন না; আবার বলছেন কিছু হয় নি, ভাল আছি। আপনার বোধ হয় জ্বর হয়েছে দিদিমণি, দেখি আপনার হাতখানা। আমি বেশ হাত দেখতে জানি।"

প্রণতি বলিল, "নারে আমার জ্বর হয় নি।"

বাপুয়া জেদ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ আপনার জ্বর হয়েছে নইলে এমন ভাবে শুয়ে পড়েছেন কেন? আপনার মুখখানাও যেন কি রকম দেখাচ্ছে, ঠিক জ্বর হলে যে রকম হয় সেই রকম। দেখিনা, দিন একবার হাত খানা, আমি নাড়ী দেখে ঠিক ধরে দেব।"

প্রণতি হাসি মুখে তাহার উজ্জ্বল সুগৌর হাতখানা বাড়াইয়া দিল, বাপুয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার হাতের চুড়ি কয়গাছি সরাইয়া নাড়ী খুঁজিতে লাগিল।

প্রণতি হাসি চাপিয়া বলিল, "কিরে, নাড়ী পাচ্ছিসনে নাকি?"

বাপুয়া অপ্রস্তুত হইবার পাত্রই ছিলনা, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এই যে নাড়ী পেয়েছি। এই নাড়ী না—এই যে টিপ টিপ করেছে?"

প্রণতি এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিয়া সে হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল "থাক থাক, যথেষ্ট দেখেছিস; আর দেখতে গেলে এর পর আর বাঁচতে হবে না।"

বাপুয়া যে বিশেষ কষ্ট পাইল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই জানিতে পারা গেল। দিদিমণি জানিল সে নাড়ী দেখিতে জানেনা, মিথ্যা বাক্‌চাতুরী করিতেছে, এ কষ্ট মরিলেও যায় না।

"বাপুয়া—"

বাহির হইতে মোটা গলায় কে ডাকিল।

প্রণতি কান উচু করিয়া বলিল, "তোকে কে ডাকলে যেন বাপুয়া; একবার চট করে বারটা দেখে আয়।"

বাপুয়ার কানে সে আহ্বান যায় নাই, সে নিজের কষ্টে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; মুখখানা অত্যন্ত বিরস অন্ধকার করিয়া সে বলিল, "কই কে ডাকছে দিদিমণি? ও আপনার শুনতে ভুল হয়েছে, কেউ ডাকছে না।"

প্রণতি ধমক দিয়া বলিল, "না, কেউ ডাকছে না বই কি। আমি নিজের কানে শুনলুম কে তোর নাম ধরে"

"বাপুয়া, বাড়ী আছিস নাকি?"

এবার বাপুয়ার কানে সে ভারিস্বর পশিল,—চিনিল এ শ্রীনাথ বাবুর কণ্ঠস্বর।—"দেওয়ান মশাই এসেছেন—" বলিয়াই সে বাহিরে দৌড়াইল।

দেওয়ান শ্রীনাথ বাবু ও শরৎ সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। সংসারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আসিয়া জড়াইয়া পড়ায় স্কুল বা এই নবনিযুক্তা টিচারের কথা শরতের মোটেই মনে ছিলনা। আজ এইদিকে বেড়াইতে আসিয়া শ্রীনাথ বাবু তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছেন। শরৎ প্রথমতঃ অপরিচিতা মহিলার নিকট আসিতে কোনমতেই রাজি হন নাই, শ্রীনাথ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন দেখা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহারই স্কুল, তাঁহারই বেতনভোগিনী টিচার, যখন তিনি গ্রামে আসিয়াছেন তখন টিচারের সহিত দেখা শুনা করিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগের কথা শ্রবণ করা তাঁহার উচিৎ।

শরৎ ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা ঠিক, যথার্থই ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ; তাই তিনি আসিয়াছেন।

বাপুয়া বাহির হইতেই শ্রীনাথ বাবু রুখিয়া উঠিলেন "এতক্ষণ কোথায় ছিলি বেটা, নবাব হয়েছিস-না? ডাকতে ডাকতে মানুষের গলা ভেঙ্গে যায়, বেটা সাঁওতাল ভূত তবু যদি সাড়া দেয়।"

শরৎ বাপুয়ার নিমেষে শুকাইয়া উঠা মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন "মিস বোস এসেছেন স্কুল হতে?"

বাপুয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল- "হাঁ তিনি এসেছেন। তাঁর শরীর ভারি খারাপ হয়েছে, তাই তাঁর কাছে ছিলুম, শুনতে পাইনি যে আপনারা ডাকছেন।"

শরৎ বলিলেন "তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে? তবে আজ ফেরা যাক শ্রীনাথ বাবু, আর একদিন আসা যাবে তিনি ভাল হলে!" আগেই তিনি ফিরিলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্রীনাথ বাবু বলিলেন "ফিরছেন কেন? শরীর একটু খারাপ হয়েছে তাতে কি, তাইতে আপনি তার প্রভু জমিদার তাঁর দরজা হতে ফিরে যাবেন? এ কখনও হতে পারবে না শরৎ বাবু, এত হেয় আপনি নন। এই বাপুয়া, মিস বোসকে খবর দে, জমিদার বাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।"

"আজ্ঞে যাই—।

বাপুয়া ভিতরে ছুটিল।

জমিদার বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া প্রণতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বিস্রস্ত বসনাদি সংযত করিয়া সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাপুয়া শ্রীনাথ বাবুকে খবর দিতে গেল।

আগে শরৎকে তাহার পর শ্রীনাথ বাবুকে অভিবাদন করিয়া দুইখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "বসুন।"

শরৎ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু গর্ব্বিত শ্রীনাথ বাবু সামান্য একটা স্কুল মিষ্ট্রেসকে একটু সম্মান দেখাইতে পারিলেন না। উভয়ে প্রণতির নির্দ্দিষ্ট দুখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন; শরৎ বলিলেন "আপনিও বসুন মিস বোস।"

প্রণতি একখানা চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে একবার শরতের উন্নত বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিল,—কই মাতালের যেমন চেহারা তেমন ত নয়। লাবণ্য উঁহার দেহে মুখে উছলাইয়া পড়িতেছে যে। চোখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দেখিল সে চোখে এতটুকু কুটিলতা নাই, শিশুর মত সরল সঙ্কোচশূন্য দৃষ্টিতে ভরা।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাকি শরীর খারাপ হয়েছে?"

অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া প্রণতি বলিল "দেখছি এর মধ্যে বাপুয়া সে খবরটাও আপনাদের দিয়েছে, না, শরীর এমন কিছু খারাপ হয়নি, অতিরিক্ত গরমে মাথাটা দুপুর হতে বড্ড ধরে উঠেছে মাত্র!

শরৎ শ্রীনাথ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "স্কুলে বোধ হয় টানাপাখার বন্দোবস্ত নেই শ্রীনাথ বাবু?"

শ্রীনাথ বাবু একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন, "না, তা নেই, আপনার আদেশ ত পাই নি।"

শরৎ একটু ভাবিয়া বলিলেন "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন পাখার কথা বলেছিলুম আর হিসাবেও ধরেছিলুম। যাই হোক স্কুলে পাখার বন্দোবস্তটা আগে ক'রে দেবেন শ্রীনাথ বাবু, নইলে বাস্তবিকই ইনি আর মেয়েরা সবাই কষ্ট পাবেন। আপনিই ভেবে দেখুন না, গরমটা বড় কম নয়।"

শ্রীনাথ বাবুর পরিস্কার ললাটে কয়েকটা রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, তিনি নরমসুরে বলিলেন "পাখা আনিয়ে দু, চারদিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে দেব।"

শরৎ তাঁহার পানে আর চাহিলেন না, প্রণতির দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এখানে থাকার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে, না?"

প্রণতির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "না, কষ্ট আর কি?"

শরৎ হাসিলেন, বলিলেন "আপনি না বললেও আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। আপনি চিরকাল কলিকাতাতেই কাটিয়েছেন, সেখান হতে এই নীরব শান্ত পল্লীগ্রামে এসে নির্ব্বাসিত জীবন ভোগ করা যে কি তা আপনি না বললে ও আমি বেশ জানি। প্রথম প্রথম অমনি আমারও কষ্ট বোধ হয়, তারপর দু চারদিন থাকতে থাকতে আবার সবই সয়ে যায়। কেমন যায় না কি, আপনিই তা বলুন না? প্রথম যেদিন এই পল্লীবক্ষে পা দিলেন সেদিনে চারিদিকে ঘন ঝোপ জঙ্গল, বড় বড় গাছ আর পানাভরা পুকুর গুলো দেখে সত্যি আপনার প্রাণটা আঁতকে ওঠে নি?"

প্রণতি এই সদালাপী তরুণ যুবকটীকে জমিদার শরৎকুমার তাহার মনিব বলিয়া ভাবিয়া রাখিতে পারিল না। সে দেখিল তিনি মহামান্য প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার নহেন, শিশুর ন্যায় তরল মনা সরল প্রকৃতির একটী যুবক মাত্র। সে বলিল, "সত্যের খাতিরে যদি বলতে হয় তবে অবশ্যই তা আমায় স্বীকার করতেই হবে।"

শরৎ বলিলেন "তারপর এসে স্কুলের মেয়েগুলো ছাড়া আর কোনও মেয়ের সাহায্য পান নি, কেউ আপনার কাছেও আসে নি।"

প্রণতি অবাক হইয়া গিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তিনি যে কি করিয়া এ সব কথা জানিতে পারিলেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

শরৎ তাহার বিস্ময়ভরা চোখ দুটি দেখিয়াই তাহার মনের খবর জানিয়া লইলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন "দেখছেন আমি কি করে এ সব কথা জানতে পারলুম। দেখুন, এটা জানা কিছু বিচিত্র নয়, কেননা আমাদের এ সব পল্লীতে শিক্ষিতা মেয়ের সম্মান কেউ করতে জানে না। যে দেশের মেয়েদের মুখে তিনহাত ঘোমটা থাকে সে দেশের মেয়েরা সকলের সামনে মুখ খুলে রাখা ভারি খারাপ বলেই জেনে রাখে। বিশেষ আপনি স্কুলের টিচার, হিন্দু নন, ব্রাহ্ম কন্যা—"

শুষ্ককণ্ঠে প্রণতি বলিল "তা যদি ভেবে থাকেন তবে শুধু তারাই ভুল করে নি, আপনিও ভুল করেছেন। মেয়েরা শিক্ষিতা হলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই যে সে ব্রাহ্ম হয় এমন কোনও কথা নেই। আজকাল অনেক হিন্দুর মেয়েও পড়া শুনা করছেন; লেখা পড়া কোনও একটা শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই তা তো জানেন আমি ব্রাহ্ম নই, হিন্দুর মেয়ে।"

শরৎ প্রণতির মুখের পানে স্তব্ধনেত্রে খানিক চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সত্যই ভুল করেছিলুম, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, তাই হোক, আপনি হিন্দুই হোন, সেটা মনে প্রাণে মেনে নিলুম আমি কিন্তু এদেশের লোক তো তা মানতে চাইবে না; কোন মেয়ে বিশ্বাস করবে না ওদেরই মত একটী মেয়ে আপনি। হয়তো কোনও দায়ে পড়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই—বুঝতেই পারছেন কেউ আপনার সঙ্গে মিশতে আসবে না; ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আপনার পড়ার, তার গার্হস্থ্য-জীবনের সংশ্রবে যেতে পাবেন না।"

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রণতি বলিল "আমি এখানে বাস করলে, আমার পরিচয় পেলেও তারা আর আসবে না?"

শরৎ আবার হাসিলেন, "ওই টুকুই এই পতিত হিন্দু সমাজের বৈচিত্র্য মিস্‌বোস, ওই সঙ্কোচটুকুর জন্যেই যে হিন্দু সমাজ টিঁকে আছে—এই পল্লীগ্রামের লোকগুলোর তাই বিশ্বাস। পল্লীবাসির পরিচয় আপনি পাননি কখনও, এইবার পাবেন, একটা দামি অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আপনার বয়স খুব কম, তা হলেও যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করতে পারতেন তা পাননি, তার কারণ সহরে যারা লালিতপালিত, পারিপার্শ্বিক কোনও খোঁজ খবর তারা রাখে না। পল্লীগ্রামে যারা বাস করে পারিপার্শ্বিক সব খবরই তারা রাখে, প্রত্যেকেই এক একটা কেন্দ্র হয়ে এখানে রয়েছে। আপনি দুদিন থাকলেই পল্লীগ্রাম

চিনতে পারবেন, অবশ্য সামাজিক হিসাবে নয়,কেন না পল্লী-সমাজ চিরদিনই আপনার সামনে রুদ্ধ হয়েই থাকবে। যাই হোক, বার হতে যা দেখবেন তাতেই বাংলার পল্লীর অবস্থা বেশ বুঝতে পারবেন। এরা আপনাকে কাছে যাওয়ার অধিকার হতে বিচ্যুতা করলে ভেবে দুঃখিতা হবেন না মিসবোস, এরা যে স্বেচ্ছায় নিজেদের কাছ হতে আপনাকে দূরে রাখলে এ শুধু ভগবানের দয়াতেই, এই দয়ার জন্যে তাঁকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। আমার মতে আমি বলি বাংলার পল্লী সমাজের কাছ হতে দূরে থাকাই মানুষের গুণের কারণ, দূরে না গেলে সে কিছুতেই উন্নত হতে পারবে না। এর বিচিত্রতা এই কাছে এলেই গলা জড়িয়ে ধরে এই পাঁকের মধ্যে ফেলবেই, সেখান হতে মুক্তিলাভ করার আশা বামন হয়ে চাঁদ ধরার মত। দূরে থাকুন, কেউ আপনার দিকে একটা চোখ রেখে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকবে না, আপনার ভাল হলে কারও বুক ফেটে যাবে না, আপনার মন্দ হলে কেউ মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে আসবে না। দেশের লোক ভাববে আপনাকে তারা নিজেদের কাছে না নিয়ে গিয়ে আপনাকে শাসিত করে রাখলে, পদানতা করে রাখলে, কিন্তু আমি বলছি আপনিই তাদের পদানতা করে ফেললেন তিনি না। আপনি সমাজের বাইরে, এর সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্কই নেই, আপনার তোষামোদ করতে কেউ আসবে না, শত মুখে নিন্দেও কেউ করবে না। মানুষ যদি প্রার্থনা করে তবে যেন এই সমাজের বাইরে এমনি একা থাকার প্রার্থনাই সে করে যায়।

কথাগুলি তিনি যে গভীর সুরে বলিতেছিলেন, সেই গভীর সুরের মাঝখান হইতে কিসের একটা অজানা ব্যথা আসিয়া প্রণতির বক্ষ স্পর্শ করিল। সে চোখ তুলিয়া শরতের মুখখানার উপর রাখিল, সেই শান্ত মুখে সে বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেখিল।

এই প্রথমদিনের সাক্ষাতে এবং সামান্য দুই চারিটা কথাবার্ত্তায় সে সহজেই ধরিয়া ফেলিল শরতের বুকের মধ্যে কোথায় একটা ব্যথার কাঁটা ফুটিয়া আছে,ঘুরিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে তাহা খচ্ খচ্ করিয়া উঠে!

শরতের দৃষ্টি প্রণতির মুখের উপর পড়িতেই সে চোখ নামাইয়া লইল। শরৎ বলিলেন "আপনি ভাবছেন কেন আমি এ সব কথা বলছি কিন্তু—না থাক আজকে একথা, সে একদিন হবে। আপনার শরীর খারাপ হয়েছে বলেছেন চাকরটাকে পাঠিয়ে দেবেন আমার বাড়ীতে সেখানে একটা ডিস্‌পেনসারী আছে, আমার বন্ধু একজন এক ঘণ্টা করে সেখানে বসেন। সেখান হতে ওষুধ নিয়ে আসবে। একটু সাবধানে থাকবেন, একে পল্লীগ্রাম, তার পরে বর্ষাকাল, একটু অনিয়ম করলেই জ্বর হয়ে পড়বে।"

বাপুয়া কুয়ার নিকটে চাল ধুইতেছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া শরৎ ডাকিলেন "এই—এই চাকরটা—"

বাপুয়া থতমত খাইয়া চালের পাত্র ফেলিয়া একবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত দুখানা জোড় করিয়া বলিল "হুজুর, আমার নাম বাপুয়া।"

শরৎ বলিলেন "বেশ নাম তোর। যাক্, আমার সঙ্গে চল, এঁর জন্যে ঔষধ নিয়ে আসবি।"

প্রণতি একটু হাসিয়া বলিল "আপনার দয়াকে ধন্যবাদ, কিন্তু, এখনি ঔষধ দেবার কোনও দরকার নেই, এ রকম আমার প্রায়ই হয়, সেরেও যায়।"

শরৎ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "রোগ একটু প্রশ্রয় পেলেই চেপে ধরে তা জানেন না বোধ হয়। রোগ আর পাপ, এই দুটি ভীষণ শত্রু অহরহ আমাদের চারদিকে ঘুরছে, এতটুকু ছিদ্র পেলে কখন এসে পড়বে আর ছাড়ানো যাবে না। অল্পেতেই সারাবার চেষ্টা করবেন নচেৎ নিস্তার পাবেন না। চলুন শ্রীনাথ বাবু, এখন ওঠা যাক।"

প্রবীণ শ্রীনাথ বাবুর এ সব কথা আদবেই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বসিয়াছিলেন নেহাৎ দায়ে পড়িয়া নচেৎ থাকিতেন না। প্রণতি নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস

করিতেন না। এই ব্রাহ্মদের তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং আপনার শুচিতা প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিতেন। আজ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ব্রাহ্ম মেয়ের ঘরে উঠিতে হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি নিজকে ভারি অপবিত্র বোধ করিতেছিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎ বলিলেন, "আপনার যখন যা অসুবিধা হবে তা আমায় জানাবেন, আপনার এই বাপুয়াকে দিয়ে খবর পাঠালেই চলবে। এ ছোকরা বেশ ছটফুটে, আর চালাক। আচ্ছা আসি তবে, নমস্কার।"

প্রণতিও নমস্কার করিল, সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গেল। শরৎ ও শ্রীনাথ বাবু চলিয়া গেলেন।

(৪)

ইন্দুরাণীর অসম্মতি সত্ত্বেও শরৎ যেদিন পূজার দালান মেরামত করিতে মিস্ত্রী ধরিলেন, সেদিন ইন্দুমতী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।

এ তো স্পষ্টই তাহাকে ছাটিয়া ফেলা। যেন সে জমিদারির মালিক নয়, সবই শরতের, পূজার দালান যে তাহার, সে দানপত্র এখনও তাঁহার সিন্ধুকে রহিয়াছে। শরৎ ছলে বলে কৌশলে বিধাতার সম্পত্তি হস্তগত করিতে চান, কিন্তু ইন্দু সে ধরণের মেয়ে নয়; তাহার কেহ সহায় না থাক, সে নিজেই ইহার প্রতিবিধান করিবে।

ইন্দুরাণী তখনই শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইল, এখনি আমার দরকার, নহিলে চলিবে না।

কি যে চলিবে না তাহা শরৎ বেশ বুঝিলেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় ডাকছেন কাকি মা?"

ইন্দুরাণী দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখখানা নিদারুণ মনোকষ্টে, নিদারুণ অপমান কল্পনা করিয়া কি মর্ম্ম আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শরতের কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল— "হাঁা ডেকেছি।"

শরৎ বলিলেন, "কি দরকার বল।"

ইন্দুরাণী বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমার অনভিমতে আমার জিনিসে হাত দেবার তুমি কে?"

শরৎ একটু হাসিলেন, পরমুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কেউ নই কাকিমা, তুমি আমার মা, আমি তোমার কেউ নই।"

ইন্দুরাণী দন্তে অধর চাপিয়া বলিল "ওটা নেহাৎ ভুলানো কথা বাছা তোমার। যদি সেই রকম যথার্থই মনের ভাব হতো তোমার; কখনই আমার জিনিসে হাত দিতে পারতে না।"

শরৎ এবার একটু কঠিনস্বরে বলিলেন, "আমার মনের ভাব তুমি কি রকম দেখছো?"

ইন্দু কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "সম্মতি না নিয়ে আমার জিনিসে হাত দিচ্ছো তখন এতে তোমার গোপন মতলব নেই কেমন করে তা বিশ্বাস করব? বিনা স্বার্থে কেউ এ জগতে কোন কাজ করে না বলেই আমি জানি।"

শরতের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন "অবশ্য স্বার্থ একটু আছে বই কি কাকিমা, বিনা স্বার্থে কেউ যে কোন কাজ করে না এ ঠিক কথাই বলেছ। আমারও স্বার্থ আছে বই কি, যেহেতু আমার পিতৃ পিতামহের বড় আদরের পুজোর দালান একটা কাণ্ডজ্ঞানহীনা তরুণীর খেয়ালের বশে নষ্ট হওয়া আমি দেখতে পারছিনে। বাবা জানতে পারেন নি যে তার বুকের পাঁজর এই পুজোর দালানটী অবশেষে একটী এই রকম জ্ঞানহীনা বিধবার সম্পত্তি-রূপে গণ্য হবে, তা জানলে তিনি কখনই এই পৈতৃক দালান হাত-ছাড়া করতেন না। তুমি পুজোর দালান সমতল করতে চাও কিন্তু যত দিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন তা পারবে না—আমার পূর্ব্ব পুরুষের কোন চিহ্ন এতটুকু আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। আমার এই স্পষ্ট কথা শোন কাকিমা, তোমার যা তা তোমারই

থাকবে,ভবিষ্যতে আজ হতে কেউ যে তাতে হাত দিতে আসবে তা আমি হতে দেব না। আমি যতদিন থাকব আমিই দেখাশুনা করব, নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ শ্রীনাথ বাবু এর মধ্যে আসতে পারবেন না। তোমার যা দরকার তা তুমি আমায় বলতে পার, আমার অন্তঃপুরে অন্য পুরুষ যে অবাধে প্রবেশ করবে আমার আদেশে তুমি তা করতে পারবে না। আমি আশা করছি আমার অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা করতে আমি যা বলব তা তুমি শুনবে, আমার কথামুসারে চলবে, আমায় শেষটা তোমার "পরে জোর করতে হবে না। ভদ্র লোকের জমিদারের অন্তঃপুর যেমন থাকে আজ হতে তাই হবে, স্বেচ্ছাচারিতা এখানে কিছুতেই চলবে না।"

শরতের তীক্ষ্ণ কর্কশ কথাগুলিতে ইন্দু থতমত খাইয়া গিয়াছিল, সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না। গম্ভীর মুখে ধীর পদে শরৎ চলিয়া গেলেন, ইন্দু নত মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথমটা সে শরতের কথা মোটে বুঝিতেই পারে নাই, তাহার গর্ব্বিত বক্ষটা এই অতর্কিত আঘাতে যেন কি রকম হইয়া গিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মগর্ব্ব ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

কি, এতদূর? শরৎ মনে করিয়াছে সে সাধারণ মেয়ে, তাই তাহাকে প্রথমে মিষ্ট কথা দিয়া শেষকালে চোখ রাঙাইয়া বশ করিতে চায়, দমন করিতে চায়? সে জানে না ইন্দুর হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাই সে বেশ সহজেই তাহাকে দমনে রাখিবার কথা জানাইয়া গেল। ইন্দু কি সত্যই তাই, সত্যই সে কি মাথা পাতিয়া এই অসম্মান নীরবে বহন করিবে, নীরবে সব সহিয়া যাইবে? আপনার যাহা কিছু সব পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া সে সামান্যা নারীর মতই পরমুখাপেক্ষী হইয়া অন্তঃপুরে গোপনতার অন্তরালে বাস করিবে? সে নারী বলিয়াই কি এই নির্য্যাতন সহিয়া যাইবে? নারী কি মানুষ নয়, নারী কি প্রকাশ্য ভাবে জমিদারি পরিচালনা করিতে পারে না, নারীর হৃদয় কি এতই হীন,নারী কি পুরুষের সমান অধিকার পাইতে পারে না? ছি ছি, শরৎ তাহাকে ভাবিয়াছে কি, অপমানমসীলিপ্ত মুখখানা ইন্দু লুকাইবে কোথায়? দাসী ভৃত্য কর্ম্মচারীগণ এই প্রবলপ্রতাপান্বিত অধিশ্বরীর কথায় উঠে বসে তাহারা যখন জানিবে ইন্দু নামে জমিদার হইলেও কাজে তাহাদেরই মত পরের মুখাপেক্ষিনী তখন তাহারা ইন্দুকে মানিবে কি?

কল্পনায় নিজের সেই হৃতমানাবস্থা দেখিতে দেখিতে ইন্দু আত্মহারা হইয়া পড়িল। পরম বিশ্বাসী একান্ত শুভানুধ্যায়ী শ্রীনাথ বাবুর মুখে ইতিপূর্ব্বে সে এই বিপদেরই আভাস পাইয়াছিল। সুক্ষ্মদর্শী শ্রীনাথ বাবু মনশ্চক্ষে এই দৃশ্যটাই বহু পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কন্যাপ্রতিম এই ইন্দুকে তিনি তাহারই ভাবী সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দুকে তিনি যতটা নির্ব্বোধ ভাবিয়াছিলেন সে তাহা নয়, অনেক বিষয়ে সে শ্রীনাথ বাবুকেই শিক্ষা দিতে পারিত চিরকাল যাহারা কষ্টে মানুষ হয় তাহারা অনেক বিষয়ে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করে যেমন একটা শিক্ষিত পুরুষ লাভ করিতে পারে না। পয়সা টাকার দিকে দৃষ্টি তাহার খুব বেশী সেই জন্যই এই কয়টা বৎসরের মধ্যে জমিদারের চালও শিখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া বড় কম কথা ছিল না।

সে নিজে এখনই শরতের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত, কিন্তু অতদূর সাহস তাহার হইতেছে না, কেননা সে নারী। তাহার আর একটী সাহায্যকারীর দরকার যে সব স্থানে বাহির হইতে পারিবে, সকলের সহিত জোর গলায় কথা কহিতে পারিবে। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, অবাধ স্বাধীনতা সে পায় নাই, শরতের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সে তাই পিছাইয়া গেল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যখন কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না তখন শ্রীনাথ বাবুকে একবার অবশ্য আসিবার কথা বলিতে দাসীকে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীনাথ বাবু জানাইলেন জমিদার তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন ভবিষ্যতে ছোট তরফের কোন কাজ তাঁহাকে না জানাইয়া করিতে পারিবেন না। ছোট তরফের নায়েব গোমস্তা পেয়াদা প্রভৃতি তিনিই ঠিক করিয়া দিবেন, এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা যাহা বলা দরকার ইন্দুরাণী শরৎকে বলিবেন, শ্রীনাথ বাবুর তাহাতে মাথা ঘামাইবার কোনও আবশ্যক নাই। একটী দুর্ব্বলচিত্তা বিধবার উপরে তিনি জমিদারী ভার ফেলিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করেন না, বিশেষ সে বিধবাটী অল্পবয়স্কা। তিনি এ বিষয়ে সরকারে জানাইয়াছেন যাহাতে তিনি এই বিধবার গার্জ্জেন হইতে পারেন। তিনি এখন গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না, নিজের হাতেই সব ভার রাখিবেন, সব দেখা শুনা করিবেন। খাজনা পত্রাদির হিসাব নিকাশ তিনিই দিবেন সে বিষয়ে পরের সাহায্য অনাবশ্যক। জমিদারের ভয়ে শ্রীনাথ বাবু ইন্দুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে আর যাইতে পারিবেন না, তবে যদি ইন্দুরাণী ইচ্ছা করেন তবে; ধর্ম্মমাতা শ্রীনাথ বাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়ী আসিতে পারেন।

ইন্দু তখনই পাল্কী আনিতে আদেশ দিল। একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের পরামর্শ এ সময় আবশ্যক, সে নিজেকে নিয়ে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্তরটা তার ক্ষুব্ধ রোষে ফাটিয়া যাইতেছিল, রাগের মাথায় কি করিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? শ্রীনাথ বাবুর মত কূটবুদ্ধি আর কাহারও ছিল না, সুতরাং এ বিপদে তিনি বই আর কেহ নাই যে ইন্দুকে সাহায্য করে।

ইন্দুর পাল্কী যখন বহির্ব্বাটী দিয়া যাইতেছিল শরৎ সে সময় বাহিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রীদের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দাসীকে পাল্কীর সহিত যাইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন কে যাইতেছে, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে যাচ্ছে?"

দাসী সম্ভ্রমের সহিত উত্তর দিল "রাণীমা।" সকলে ইন্দুকে রাণীমা বলিয়া সম্বোধন করিত।

শরৎ আর কথা কহিলেন না, তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না ইন্দু কোথায় কেন যাইতেছে। নিমেষে তাঁহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিয়া তখনই পরিস্কার হইয়া গেল।

শ্রীনাথ বাবুর পত্নী আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া ইন্দুকে নামাইয়া লইলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল "শ্রীনাথ বাবু কোথায়, তাঁর কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

শ্রীনাথ বাবুর পত্নী বলিলেন "তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আমি তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।"

ইন্দুকে বসাইয়া তিনি শ্রীনাথ বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন, ইন্দু আসিয়াছে শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু তখনই উঠিয়া আসিলেন।

"এই যে, মা জননী আমার নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। ওগো, তুমি চুপটী করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে, দেখছ না, মা আমার ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, একখানা পাখা এনে বাতাস দাও না।"

ইন্দু একটু হাসিল, অঙ্গুলাগ্রে ললাটের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—"না পাখা আনবার কোনও দরকার নেই। আপনি বসুন দেওয়ান মশাই, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, সেই জন্যে আজ নিজেই চলে এসেছি।"

দেওয়ান বসিয়া বলিলেন, "তাতো বুঝেছি মা লক্ষ্মী, তোমার দরকার ছিল বলেই ঝিকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে। কোনদিন তোমার কথা না শুনি বল মা, কিন্তু আজ আর তা পারলাম না। জমিদার এমন চালাক—তার চালাকি ধরা আমার মত লোকের কাজ নয়। মুখে বেশ হৃদ্যতা জানায়, যা বলছি তাই যেন শুনছে, এমনি ভাব দেখায়, কিন্তু আসলে তার কিছু নয়। মনের মধ্যে যে সময় সে একখানা কথা ভাবছে, মুখে সেই সময় অন্য কথা বলে যাচ্ছে, এ রকম লোককে চিনতে কেউ কখনো পারবে না। জমিদার চিরকাল জমিদারী চাল নিয়ে কলকাতাতেই বাস করে, পল্লীগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক তার কতটুকুক?

তোমার জমিদারেরা বাস করে কলকাতায়, মটর হাঁকায়, জুড়ি হাঁকায়, বড় জোর পূজোর সময় কি শীতের সময় বন্ধু বান্ধব নিয়ে দুচার দিনের জন্যে বাড়ী আসে, এই তো এই বাংলাদেশের জমিদারের প্রথা। দেশের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক বরাবর দু'চার দিনের, কিন্তু এই হতভাগা জমিদারকুলের কলঙ্ক তা উল্টাতে চায় কে। লেখাপড়া সামান্য একটু শিখেছে তাই, নইলে গণ্ডমূর্খ বলেই উড়িয়ে দেওয়া যেত।"

ইন্দু অধীর হইয়া বলিল, "আপনি যা বলছেন কথাগুলো ঠিক, কিন্তু আগে আমার বিষয়টা—"

শান্তভাবে মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "তবে আর বলছি কি মা লক্ষী, তোমার কথাতেই তো কথাটা উঠেছে। সকাল বেলা—কোথাও কিছু না, এসে হুকুমজারি করলে আজ হতে অন্তঃপুরের সঙ্গে আমাদের কোথাও সম্পর্ক নেই। তখনি লেখা হয়ে গেল, কোথায় তা পাঠানোও হয়ে গেল। কি করব মা, তারই কাজ করি, বেতনও পাচ্ছি তার কাছ হতে, হুকুম অবশ্যই শুনতে হবে। এমন মাথা পাগলা লোক দুনিয়ায় যদি আর দুটি থাকে। মাতালদের ভাবই এই রকম, এ কিছু নূতন ধারা নয়। ওদের মনের গতি কখন কেমন হয় তা বুঝতে পারা দায়। ছিঃ, ছিঃ, মাতালকে কেউ মানুষ বলে? সে—"

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, "আপনি মনে সে কথা জেনেও, তাকে আন্তরিক ঘৃণা করেও তবু তার কাজে রয়েছেন বলে একটী কথা মুখে আনতে সাহস করছেন না। আমি তার সঙ্গে কোনও রকমে জড়িয়ে না থেকেও যে জড়িয়ে পড়েছি, আমি একেবারে সম্পূর্ণরূপে তার হাতের মধ্যে এসে পড়েছি, তার অধীনা হয়েছি।"

তাহার কণ্ঠস্বর বেদনাক্লিষ্ট।

শ্রীনাথ বাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "কি করব মা; আমি চাকর সে মনিব, মন না মানলেও স্বীকার করতে হবে হ্যাঁ, সে মানুষ, চোখে তার বুদ্ধিহীনতা দেখেও বলতে হবে সে বুদ্ধিমান, পদে পদে তার দোষ দেখলেও বলতে হবে সে গুণবান। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আলাদা, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে—, তুমি যে মেয়ে কাজেই—"

ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়ে বলে আমার কোনও অধিকার নেই, আপনি এ বেশ কথা বলছেন দেওয়ান মশাই। আমার জিনিস, আমি ছয় আনির বখরা পাব, জমিদার তো আমিও বটে, সে আমার পরে অনায়াসে হুকুম চালিয়ে যাবে, আমার পরে এমনি অত্যাচার করবে? আমার জিনিসে সে অনায়াসে হাত দেবে, আমি তা সহ্য করে যাব?"

তাহার চক্ষু দুইটা ভীষণ রকম দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে উত্তরের প্রতীক্ষায় শ্রীনাথ বাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীনাথ বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমার এমন কোন একজন আত্মীয় চাই যে বেশ শক্ত, কিছুতেই দমবে না, যার আড়ালে তুমি দাঁড়িয়ে সমান লড়তে পারবে। আমার দ্বারা তা হবে না মা; লুকিয়ে আমি তোমার সৎপরামর্শ দিতে পারি, প্রকাশ্যে আমায় তোমার শত্রু বলেই জানতে হবে।"

ইন্দু বলিল, "আমার ভাইকে আন্‌লে হয় না? সে বেশ লেখাপড়া জানে, চালাক চতুরও আছে, সে আমার সম্পত্তি বুক দিয়ে রক্ষা করবে।"

শ্রীনাথ বাবু প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "সেই ভাল হবে মা, তোমার ভাই থাকলে তোমার এতটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দরকারটাই বা কি?"

ইন্দু বলিল, "তবে আপনি তাকে এখনই একখানা টেলিগ্রাম করে দিন, আমি ভারি বিপদগ্রস্ত, সে যেমন অবস্থায় আছে তেমনি অবস্থাতেই যেন চলে আসে। সে ঢাকায় লক্ষীবাজারে একটা মেসে আছে, তার নম্বরটা তো আপনার কাছেই আছে।"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "অগত্যা তাই করে দিতে হবে; নইলে তো আর কোনও উপায় নেই।"

ইন্দু অকূল পাথারে কূল পাইল। ভাই আসিলে

সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে, এত ভাবনার বোঝা তাহার মাথায় থাকিবে না। সে বলিল, "আচ্ছা, শরৎ যে পূজার দালান সারাতে মিস্ত্রি লাগিয়েছে, এতে কি করি বলুন তো।"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "করছে করুক না। তার বাপ যে উইল করে তোমার স্বামিকে দিয়ে গেছেন, সে উইল আছে তো ?"

ইন্দু উত্তর দিল, "আছে।"

"সেটা খুব সাবধানে রেখো মা, তোমার শত্রু তোমার ঘরে তা বুঝে চলো। বাইরের শত্রুকে পার আছে কিন্তু ঘরের শত্রুকে পার নেই। সে যে রকম মাতাল, তাতে বেশী দিন যে জমিদারি রাখতে পারবে তা বোধ হয় না। শুনেছি অনেক টাকা দেনা হয়েছে, সেই দেনা শোধ করবার টাকা যোগাড় করবার জন্যেই এখানে এসেছে। জমিদারির যা আয় তা দুদিনে উড়িয়ে দিয়ে, উল্টে দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে যাবে, তখন তোমার ভাগে হাত পড়বে সেই চেষ্টায় আছে। ও সব লোককে এতটুকু বিশ্বাস কর না মা। এই তো পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস এখনই এই—এখনও সমস্ত জীবনটা পেছনে পড়ে আছে। জেনো—ওর এক পয়সাও থাকবে না, শেষটায় পথে দাঁড়াতে হবে। যে সব ভূত প্রেত এসে জুটেছে চারিদিকে এরাই সব খাবে। যাক গিয়ে ও সব কথা। তোমার ভাইকে আমি আজই টেলিগ্রাম করে দেব এখন, তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি যেমন চুপি চুপি এসেছ তেমনি চুপি চুপি ফিরে যাও, সে যেন জান্‌তে না পারে তুমি আমার এখানে এসেছিলে। আমি গোপনে তোমায় যতদূর পারি সাহায্য করব, প্রকাশ্যে কিছু পারব না।

ইন্দু বলিল, "শরৎ জানে আমি এখানে এসেছি।"

বিবর্ণ মুখে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "জানে ?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সে আমি সামলে নেব। তুমি আর দেরী করোনা মা; বাড়ী যাও।"

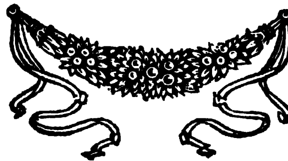
লোকটার কাপুরুষতা দেখিয়া ইন্দুর মনে এতটুকু শ্রদ্ধা রহিল না, ঘৃণাটাই জাগিয়া উঠিল। সে উঠিল, অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "শরতের কি ঠাকুর দেবতার 'পরে ভক্তি আছে ?"

বিকৃত মুখে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "রামো; ও রকম লোকদের আবার ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ? না করে এমন কাজ নেই, না খায় এমন জিনিস নেই। সেবার কলকাতায় বাসায় দেখলুম আশাদুল্লা খানসামা টেবিলে বাবুদের সব পরিবেশন করছে। আরে ছিঃ, ওরা কি জাত মানে, না ধর্ম্ম কর্ম্ম মানে ? একেবারে যাকে বলে খৃষ্টান—তাই। এই যে নূতন টিচারটী এসেছে এর সঙ্গে মিলবে ভাল।"

ইন্দু গম্ভীর মুখে শুধু বলিল, "হু।"

সে পালকীতে উঠিল।

তাহাকে বিদায় দিয়া শ্রীনাথ বাবু ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমশঃ



কাশীর কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

ধীরে ধীরে নৌকা দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মুরলীবাবু গান ধরিলেন - বেশ আমোদ হইতেছিল। মাঝী প্রত্যেক বৎসর যাত্রী আনিতে বাংলায় যাওয়ার গল্প আরম্ভ করিল। বাংলায় বিভিন্ন জেলায় সে গিয়াছে। দিন পনের পরে এবারও সে মৈমনসিংহ যাইবে বলিল।

গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীর দৃশ্য অতি মনোরম। সৌধকিরিটীনী সহরখানা গঙ্গার ধার ব্যাপিয়া ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নীরবে অবস্থিত। অট্টালিকার পর অট্টালিকা গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। অসংখ্য মন্দিরের চুঁড়া কাশীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গার জল যখন স্ফীত হয় তখন মনে হয় কাশী সহরখানা যেন গঙ্গার উপর ভাসমান।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কাশীর রাজবাড়ী ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। এই প্রাসাদ অনেকটা দুর্গের মত। বর্ষাকালে গঙ্গার উচ্ছ্বলিত বারি দুর্গ প্রাকার ধৌত করিয়া চলিয়া যায়। গঙ্গার উপরেই তিনটী গবাক্ষ,—মাঝি মধ্যের জানালাটী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল যে ওখান হইতে গঙ্গাবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়া কাশীর তদানীন্তন অধিপতি চৈৎসিংহ পলায়ন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাসাদ এক শোচনীয় স্মৃতি বিজড়িত। সে ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ "Plunder of Chaitsing"—চতুরপ্রবর Lord Clive পলাশীর আম্রকাননে বৃটিশ রাজ্যের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন,—কূটনীতি পরায়ণ Warren Hastings ভারতের শাসন গদীতে উপবিষ্ট—খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যগুলিকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ইংরাজী ১৭৭৮ খৃঃ অঃ "প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ" আরম্ভ হইল; দাক্ষিণাত্যে আগুন জ্বলিল। ভারতের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান শক্তি মহারাষ্ট্রগণ বিপুল বিক্রমে Warren Hastingsকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময়ে ফরাসীর সহিত ইংরেজের পূর্ব্ব শত্রুতা আবার জাগিয়া উঠিল। প্রথম মহীশূর যুদ্ধের সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া Hastings মহীশূর রাজ্যের ফরাসী অধিকৃত 'মাহী' নামক স্থান অধিকার করেন। এই ঘটনায় মহীশূরের নবাব হাইদর আলী সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে হাইদর আলী প্রবল পরাক্রান্ত একদল সৈন্য নিয়া ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করিয়া অমানুষী অত্যাচারে শত মাইল ব্যাপিয়া গ্রামের পর গ্রাম ভস্মস্তূপে পরিণত করতঃ ক্রোধানলে কিঞ্চিৎ বারিসিঞ্চন করিলেন। মহারাষ্ট্র ও হাইদর আলীর সম্মিলিত শক্তি ইংরেজদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য বিলাতে Court of Directors Hastings কে দায়ী করেন এবং যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে অস্বীকার করেন। উপায়ান্তরবিহীন Hastings অযোধ্যার নবাবের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারপরে অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া তাহাদের ৭৬ লক্ষ টাকা অপহরণ করা হয়; তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। ভারতের ইতিহাসে সে ঘটনা "Extinction of the Begums of Oudh" বলিয়া জ্বলদাক্ষরে লিখা রহিয়াছে।

১৭৭৮ খৃঃ অঃ Hastings কাশীরাজ চৈৎসিংহের নিকট ৫ লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিতে তিনি তাহা প্রদান করেন। ১৭৮০ খৃঃ অঃ Hastings আরও ৫ লক্ষ দাবী করেন। রাজকোষের দুর্দ্দশা দর্শনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ Hastings তাঁহার ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা ডাকিয়া দিলেন এবং টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত নিয়া স্বয়ং

কাশীতে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে কাশীরাজকে বন্দী করেন। কাশীর প্রজাসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিল। উন্মত্ত প্রজাবৃন্দ গারদ ভাঙ্গিয়া চৈৎসিংহকে মুক্ত করে। Hastings সান্ধ্য পোষাক পরিধান করিতেছিলেন এমন সময় চৈৎসিংহের মুক্তির সংবাদ তাহার নিকট পৌছিল। প্রাণভয়ে Hastings সেই সন্ধ্যাকালে অসমাপ্ত পোষাকে বেগবান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চুনার দুর্গে যাইয়া আশ্রয় নেন।

চৈৎসিংহ গারদ হইতে বাহির হইয়া প্রবল Hastings এর ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপন মানসে কান্ত মুদীর শরণাপন্ন হন। কান্তমুদী এই উপলক্ষে কাশীরাজের নিকট হইতে প্রচুর উৎকোচ প্রাপ্ত হন। কিছুতেই কিছু হইলনা। বহু সৈন্য নিয়া Hastings পুনরায় কাশীতে উপস্থিত হইলেন। ভীরু কাশীরাজ Hastings এর আগমন সংবাদে ভীত হইয়া প্রাণের ভয়ে গবাক্ষপথে উচ্ছলিত বেগা ভাগীরথি বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া পলায়ন করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ হেষ্টিংস রামনগর অধিকার পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত চৈৎসিংহের পরিবর্ত্তে এক ক্ষুদ্র বালককে কাশীর গদীতে অধিষ্ঠিত করেন। আজ কয়েক বৎসর যাবত কাশীরাজ অন্যান্য করদ নৃপতি বৃন্দের মত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দুর্গচূড়ে স্বাধীনতার যে বিজয় পতাকা একদিন সগর্ব্বে উড়িত সে স্থান আজ শূন্য, সে স্থান আজ নীরব। ধীরে ধীরে নৌকা নারদ ঘাটে থামিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় পৌছিলাম। আহারাদির পর আমবাড়িয়া ছত্রে গেলাম।

বারাণসী প্রবাসকালে আমবাড়িয়া ছত্রের ছাদের উপর উন্মুক্ত আকাশ তলে বেশ আরামেই ঘুমাইতাম। প্রখর সূর্য্যকরে ছাদ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকিত; কিন্তু মুরলীবাবু ভৃত্যবর্গের সাহায্যে বৈকালে ছাদে জল ঢালিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতেন এবং ঘণ্টা খনেক পরে জল ছাড়িয়া দিতেন। কাজেই আমরা খুব আরামেই রাত্রি যাপন করিতাম। সেদিন শেষ রাত্রিতে জাগিলে পর দূরাগত সুমিষ্ট শানাইয়ের সুরলহরী কর্ণকুহরে অমিয়ধারা বর্ষণ করিল। সেই স্বরলহরী এত মিষ্ট, এত করুণ যে বহুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকিয়াও প্রাণ তৃপ্ত হইলনা। অবশেষে ভোরের একটু পূর্ব্বে উঠিয়া মুরলী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ শেষ-রাত্রিতে শানাইয়ে ভৈরবী আলাপ করা হয়। রাস্তায় সন্ধান নিয়া আমি ও প্রমদাচরণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাবাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। শুনিয়াছিলাম দুর্গাবাড়ীতে বানরের অত্যন্ত উৎপাত, তাই রাস্তা হইতে কিছু কলা কিনিয়া নিলাম। দুর্গাবাড়ীর সিংহ-দ্বারের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ—সেটাই বানরগণের আস্তানা। আমরা সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র একদল বানর লাফাইয়া নীচে নামিয়া আসিল—আমরা কদলী দানে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

দুর্গাবাড়ী হইতে ঘুরিতে ২ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানমন্দিরে গেলাম। মানমন্দির বৈজ্ঞানিকগণের আনন্দদায়ক হইতে পারে কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তথা হইতে শিবাবতার শঙ্করের আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রখর রৌদ্রে এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বলিয়া ফিরিতে হইল। একখানা এক্কাতে বেলা ১০½ ঘটিকায় দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছিলাম।

সহর হিসাবে কাশী নিতান্ত ছোট নয়। লোক-সংখ্যা প্রায় কলিকাতার সমান হইবে। সমগ্র গঙ্গার ধার ব্যাপিয়া সৌধের পর সৌধ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। বাঙ্গালীটোলার রাস্তায় বাহির হইলে মনে হয়না যে কোন অবাঙ্গালী সহরে উপস্থিত হইয়াছি।

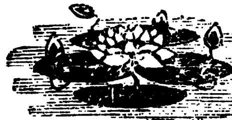
গ্রীষ্মের ভয়ে প্রয়াগ যাওয়া স্থগিত রাখিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম। মোগল-সরাই পৌছিয়া কলিকাতাগামী Bombay mailএ বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া পড়িলাম। ভোর

বেলা গয়াতে পৌছিয়া হাতমুখ ধুইয়া নিলাম। তারপরে ট্রেন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবেশ করিল। ট্রেন চলিতেছে বেলা তখন ৯টা হইবে। হঠাৎ এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পার্ব্বত্য দৃশ্য আত্ম-গোপন করিল। আমিতো একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। প্রায় ½ মিনিট পরে আবার আলোতে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম একটী অন্ধকার টানেল পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। পথে আরো ২টী টানেল অতিক্রম করিত হইল। পরে কয়লার রাজ্যের ভিতর দিয়া ট্রেন দুর্জ্জয় বিক্রমে ছুটিতে ছুটিতে Howrah Burdwan Chord Line দিয়া বেলা তিনটায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

ক্ষমা কোরো বন্ধু মোর ;
তোমারি সে প্রিয়তমা, তব প্রেম ডোর
বাঁধিয়াছে হৃদিতার—
না জানিয়া, বার বার
হোয়েছে যে ত্রুটি,
সে তুমি রেখোনা মনে,মাগি এই জুড়ি পাণি দুটি।
প্রণয়ের সম্বোধন
তোমার প্রিয়ারে প্রিয় ! করি অগণণ
গাঁথিয়াছি ছন্দে গানে
আনন্দিত স্নিগ্ধ প্রাণে
মুরতি তাহার,
আজি মোরে সেই লজ্জা তীক্ষ্ণ হোয়ে
বিঁধে অনিবার।
কেন বন্ধু বল নাই,
তুমি যারে হৃদিপথে সুখে দেছ ঠাঁই
সেতো নহে এ মনের,
শুধু যোগ্য প্রণামের
বহুদূর হোতে—
ভুল কোরে ভেসেছিনু, প্রীতি ভাবি, কলঙ্কের স্রোতে



পূজার ভূত

(ভৌতিক কাহিনী)

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়।

পরেশ বাবু উকীল ও নরেশ বাবু পুলিশের দারোগা। উভয়েই কলিকাতাবাসী এবং এক পাড়াতেই বাস করা হেতু পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺ শারদীয়া পূজার সময়ে তাঁহারা জনৈক জমিদার বন্ধু কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বরিশালের অন্তর্গত+ + +গ্রামে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল পরেশ বাবুর পুরাতন ভৃত্য ফকীর চাঁদ দাস।

ফকীরচাঁদ স্থূলবুদ্ধি ও ভয়তড়াসে লোক বলিয়া তাকে লইয়া নরেশ বাবু প্রায়ই কৌতুক করিতেন। মহাষ্টমীর দিনও সে প্রলোভন তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পরে পরেশ বাবু যখন আরামে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে একখানা ডিটেক্টিভ উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন, তখন নরেশ বাবু, গম্ভীরভাবে বলিলেন "ফকীর, আজিকার রাত্টা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়।" ফকীর, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেশবাবু আবার বলিলেন, "আজিই সেইদিন।"

ফকীর ভয়ে ভয়ে বলিল "সেইদিন কি?" নরেশ বাবু বলিলেন "মহাষ্টমীর দিনে এবাড়ীর কর্ত্তা, গিন্নি, ঢাকী, পুরোহিত প্রভৃতি সকলের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল। সে কথা এ অঞ্চলে সকলেই জানে; সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

বৃদ্ধ ফকীরের ভীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সে কাতর স্বরে বলিল "দারোগা বাবু, এ সকল কথা রাত্রে নাই বা বল্লেন, কা'ল শুনব দিনের বেলায়।" নরেশ বাবু, বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন "মূর্খ, আজ বাঁচলে ত তোমার কাছে কা'ল গল্প বলব। আজ যে মহাষ্টমী। মনে রেখো রাত বারোটা।"

গল্প শুনিবার সাহস না থাকিলেও ফকীরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"রাত্রি ১২ টার সময় কি হয়েছিল বাবু?"

নরেশ বাবু আরও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবে শোন ফকীর। যখন সন্ধি পূজার পরে বলির বাদ্য বেজে উঠলে, তখন সকলে দেখ্লে যে পাঁঠার পরিবর্ত্তে বাড়ীর কর্ত্তারই পুত্রের কাটা শরীরটা পড়ে আছে। দেখে কর্ত্তাও গিন্নি মূর্চ্ছা গেলেন। বাদ্য থেমে গেল। শেষে সকলে দেখিল যে কর্ত্তা থেকে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেরই মৃত দেহগুলি মাটীতে লুটাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কারো মাথা পাওয়া গেলনা!"

ফকীর শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "এতগুলি মাথা গেল কোথায়?" নরেশবাবু বলিলেন, "সেইতো ভয়ের কথা। মাথাগুলি সব নাকি ভূত হয়ে আছে।"

পরেশ বাবু, এই সময়ে হুকা রাখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "মিথ্যাবাদী, মাথা না থাক্লে লোকগুলিকে চেনা গেল কি করে?"

নরেশ বাবু হটিবার পাত্র নহেন। হাসিয়া বলিলেন "এতকাল ওকালতী করেও এ বুদ্ধি তোমার হলোনা?—কাপড় দেখে চেনা গিয়েছিল। পুরোহিত ভূতের নাকি পৈতে ও নামাবলী ছিল; পায়ের হাতীর দাঁতের খড়ম। ঢাকীর কাঁধে ঢাক ছিল; কর্ত্তার গায়ে সিল্কের চাদর; গিন্নির বেনারসী শাড়ী; আর চাকরের—"

বাধা দিয়া নরেশ বাবু বলিলেন "থাম, রাস্কেল, ফকীর চাঁদকে হত্যা না করে তুমি ছাড়্বেনা দেখছি। ঐ দেখ, উহার নাভীশ্বাস উপস্থিত।"

প্রকৃতই ফকীরের অবস্থা তখন শোচনীয়। সে স্থির দৃষ্টিতে দক্ষিণ দিকে চাহিয়াছিল; তাহার সর্ব্বশরীর বেতস পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল।

পরেশ বাবু ও নরেশ বাবু অনেক জিজ্ঞাসা বাদ করিয়াও কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন যেদিকে ফকীর চাহিয়াছিল তাঁহারাও সেই দিকে চাহিলেন; তখন তাঁহাদের দৃষ্টিও দক্ষিণে নিবদ্ধ হইল এবং তাঁহারাও কাঁপিতে কাঁপিতে দুইজনে দুইজনকে জড়াইয়া ধরিলেন। কাহারও মুখে বাক্য সরিল না।

* * *

ফকীর চাঁদের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন—গৌরবর্ণ, গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীত, গায়ে নামাবলী এক ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি কোষাকুষি হাতে লইয়া তাঁদের পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরাপ্লুত। পরেশ বাবু কিছুকাল পরে সভয়ে বলিলেন,"নরেশ, এই কি তোমার গল্পের পুরোহিত?" নরেশ বাবুও কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিবার ভঙ্গীতেই বলিলেন,"হাঁ। ইনিই সেই পুরোহিত বটে।" বলিয়াই তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেননা, এ ব্যক্তিকে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

পুরোহিত, অগ্রসর হইয়া গভীর স্বরে কহিলেন "হাঁ, আমিই সেই পুরোহিত, যার কথা নরেশ বাবু বল্‌ছিলেন।"

নরেশ বাবু একটু সাহস পাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি একটা ভূতের গল্প অনেক দিন আগে শুনে ছিলেম। তার সঙ্গে কতকগুলি আজগুবি কল্পনা যোগ করে ফকীর চাঁদকে ভয় দেখাবার জন্যে এই গল্প রচনা করেছিলেম। এ বাড়ীতে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না তাতো আমি জান্‌তেম না! কি করে আমার মিথ্যে কথা সত্যে পরিণত হলো, তা বুঝতে পার্‌ছিনা।"

পুরোহিত তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "মূর্খ! বলে কিনা—'মথ্যে কথা,—গালগল্প।' এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়; সব জ্বলন্ত সত্য।"

নরেশ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "যে কথা আমার অজ্ঞাত, তা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো কি করে?'

পুরোহিত বলিলেন, "আমিই তোমাকে দিয়ে বলিয়েছি এ সব। সে আজ ৪০ বছরের কথা। এই বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তার পিতামহ কোনও মহাপাতকের কার্য্য করায় মহাষ্টমী নিশায় স্ত্রীপুত্র সহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আমিও সেই সঙ্গে মরে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু তুমি ৪০ বৎসর পরে কেন এরূপ অলীক গল্প বল্‌তে চেষ্টা করে আমাকে পুরাণো কথা মনে করিয়ে দিলে? তুমি কি জাননা, মানুষের কার্য্যের ন্যায় চিন্তাও কখনো বিফল হয় না? তোমার চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তি আমাকে আকর্ষণ করে এখানে এনেছে, চল্লিশ বছর আগেকার দৃশ্য অভিনীত করাতে। মনে থাকে যেন—রাত্রি ১২টা।" এই বলিয়া পুরোহিতের প্রেতমূর্ত্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরেশ বাবু ও নরেশ বাবুর মুখ কাগজের ন্যায় সাদা হইয়া গেল। ফকীরের অন্তর্জলীর সময় সমাগত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আলো লইয়া গ্রামের এক কৃষকের বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল।

* * *

সে রাত্রিতে গ্রামের কয়েকজন সাহসী লোক পরেশ বাবু ও নরেশ বাবুর সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কৌতুহলপ্রযুক্তই হোক বা ভদ্রতা রক্ষার জন্যই হোক বর্ত্তমান কর্ত্তাও তাঁহাদের সঙ্গেই রহিলেন।

রাত্রি যখন ১০টা বাজিল, তখনি অনেকে মধুসূদন নাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ১১টা বাজিয়া গেল। ঘর এমন নিস্তব্ধ যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায়, কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিবার আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কি এক ইচ্ছার প্রেরণায় সকলেই বাহিরে যাইতে যেন বাধ্য হইল।

তাহারা বাহিরে যাইয়া দেখিল, দুর্গামণ্ডপ আলোকিত। যদিও বহুদিন যাবৎ এবাড়ীতে পূজা হয় না, তবু বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা দুর্গাপ্রতিমা ও পূজার আয়োজন দৃষ্ট হইল। মহাধুমধামে সন্ধিপূজা হইতেছে ও ঘোর রবে পূজার বাদ্য বাজিতেছে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিতেছে। কেবল বাড়ীর কর্ত্তাটী উপস্থিত নাই। বলির সময় অতিবাহিত হইয়া যায় দেখিয়া সকলে কর্ত্তার খোঁজ করিতে লাগিল। গ্রামস্থ লোকজনের সঙ্গে পরেশ বাবু, নরেশ বাবু ও বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কি এক অতিমানুষী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকলেই দেখিতে পাইল, একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে তদানীন্তন কর্ত্তা (বর্ত্তমান কর্ত্তার পিতামহ) একজন বিধবা স্ত্রীলোকের দুইখানি হাত ধরিয়া রাখিয়াছেন। রুদ্ধ থাকা সত্বেও ভিতরের দৃশ্য তাঁহারা যেন কাচের অপর পার্শ্বস্থ দৃশ্যের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বিধবা, বারম্বার কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, "ওগো, আমার ইজ্জত মেরোনা; আমি তোমার কন্যা, তুমি আমার পিতা। আমি আর কখনও এ বাড়ীতে পূজো দেখ্‌তে আস্‌বনা। আমায় ছেড়ে দাও, তোমার দুটী পায়ে পড়ি।" কর্ত্তা, এ কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার লালসাদীপ্ত নয়ন হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে ছিল। তিনি একটা উন্মত্ত পশুর ন্যায় সেই স্ত্রীলোকটীকে ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তখনও "আমার ইজ্জত মেরোনা, আমার ইজ্জত মেরোনা, আমি তোমার কন্যা" এই ধ্বনি বাহির হইতে শ্রুত হইতেছিল।

কিছুকাল পরে কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। উৎপীড়িতা বিধবাও আলুথালু বেশে তাঁহার পশ্চাতেই গৃহ হইতে বাহির হইল। সেখানে একখানা বটিদা পড়িয়াছিল। উন্মাদিনী নারী, সেই দা লইয়া তাহার নিজের কণ্ঠচ্ছেদন করিল।

কর্ত্তা, বাহির হইয়াই মণ্ডপে গেলেন। অমনি বলি হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ছাগের পরিবর্ত্তে কর্ত্তার পুত্রের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। কর্ত্তা ও গিন্নি - মূর্চ্ছিত হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন। পুরোহিত, পাঁঠা উৎসর্গ করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কর্ত্তা, গিন্নির সহিত তাঁহারও মৃতদেহ মাটিতে লুটাইতে লাগিল। যাহারা—পূজা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। বাড়ীর কর্ত্তা নতমস্তকে অন্দরে চলিয়া গেলেন। দীপ নিবিয়া গেল। সকল দৃশ্যই নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

\- - -

পরেশ বাবু, নরেশ বাবুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এই জন্যই আমি পুলিশের সঙ্গ পছন্দ করি না। বরঞ্চ দুই দিন বাঘের সঙ্গে এক গহ্বরে নিশা যাপন করিব, তবু পুলিশের সঙ্গে আর এক মিনিটও থাকা হবেনা।"

পরেশ বাবু, তখনি সেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। নরেশ বাবুও অগত্যা এই ভীষণ বাড়ী ত্যাগ করিলেন।

শুনা যায়, নরেশ বাবু সেই বৎসরই পুলিশের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পরেশ বাবু এখনও কলিকাতাতেই স্কুলের মাষ্টারী করিতেছেন—আইন পুস্তকগুলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য ফকীর চাঁদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

আমি কুলটা

(গল্প নহে)

পণ্ডিত—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ এম্, আর, এ, এস্।

কুলটার কি দুর্দ্দশা তাহা আমার চরিত্র চিত্রেই বিলক্ষণ জানা যাইবে। আমি পিতামাতার একমাত্র কন্যা, তাহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। এই ভালবাসাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। পিতা ভালবাসিয়া আমাকে একটী সুপাত্রে ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিলেন। সমবয়স্কদের সহিত খেলার ঘরে "বউ বউ" খেলিতাম। বউ সাজিয়া কৃত্রিম উপায়ে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া নিমন্ত্রিতদের পাতে ভাত দিতাম, পাড়া পড়সীদের সঙ্গে পুতুল লইয়া ছেলে মেয়ে বিবাহ দিতাম, আরো কত কিছু। আমার পুতুল খেলার সময়ই সত্যিকারের বউ সাজিলাম। আমি ইহাকে একটী খেলার জিনিষই করিয়া লইলাম; যিনি আমার বর তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন, চুমু খাইতেন। তিনি কলিকাতা পড়েন কাজেই তার সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না, তিনি চলিয়া গেলে আমি যেন একটা বড় অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। শ্বশুর, শাশুড়ী তারা সবাই আমাকে ভালবাসিতেন—আমাকে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। আমি নাকি বড় সুন্দরী তাই তারা আমাকে বেশী করিয়া আদর করিতেন।

একদিন বাড়ীতে কান্নাকাটি, আমি নাকি বিধবা হইয়াছি, আমার বর কলিকাতায় মেসে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই কাঁদে, আমার কান্না না আসিলেও কাঁদি। সকলে কহিল, আমি বিধবা হইয়াছি। জোর করিয়া তারা আমার গায়ের গহনা খুলিল আমি তখন খুবই কাঁদিলাম। আমি গহনা খুলিতে দিবনা, একথা কে শুনে? পাড়া প্রতিবাসীরা হল্লা করিয়া আমার গায়ের গহনা খুলিয়া লইল। পরণের সাড়ি ছাড়াইয়া থান কাপড় পরাইল। শীতের রাত্রে ঘাটে গিয়া স্নান করাইয়া আনিল। আমি দেখিলাম বিধবা হওয়াতে আমার গায়ের কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে নাই। আমি বিধবা হইয়াছি, আর ত কেহ বিধবা হয় নাই, বাবা, মা, দাদা তারা কেহই বিধবা হয় নাই। আমি বিধবা হওয়ায় তারা কেন কাঁদে। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা সুতরাং একাদশ দিনে স্বামীর নামে কি এক কার্য্য করিয়া শুদ্ধ হইলাম।

তার পরই আমার ভাঙ্গা কপাল আরো ভাঙ্গিল। শ্বশুর, শাশুড়ী যারা আমাকে এত আদর যত্ন করিতেন তারা আমার উপর বিরূপ হইলেন। আমার বয়স তখন সাত বৎসর, কিইবা বুঝি। আমি অলক্ষণে মেয়ে বলিয়া তারা আমাকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিলেন। বাবা, মা আমাকে দেখিয়া খুব করিয়া কাঁদিলেন, আমাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রুর বন্যা ছুটাইলেন। আমার মাছ খাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আমি আসিবার পর হইতে বাবা, মা তারাও মৎস্যাহার আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি একাদশী করি, তারাও তাই করেন। উঃ, একাদশীর দিনে কি কষ্ট, গরমের দিনে নির্জ্জলা একাদশী, আমি একেবারে মুর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়ি। "জল জল" করিয়া কাঁদিলেও বাবা, মা আমাকে বুঝান, "একাদশী দিন জল খাইতে নাই, অমঙ্গল হবে।" আমি কিন্তু বুঝিলামনা কেন বা একাদশী, কেনইবা জল খাইতে নাই একাদশী দিন ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হইলে স্নান করাইয়া আনিতেন, আর মাঝে মাঝে মাথা ধুইয়া, গা মুছাইয়া দিতেন।

এইরূপ মর্ম্ম যাতনার ভিতর দিয়া আমি বাড়িয়া উঠিলাম। আমার দুঃখে বাবা আর বেশী দিন বাঁচিলেন না, তিনি চলিয়া গেলে মায়ের একাদশীও আমার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। মায়েরও বেশী দিন আর

একাদশী করিতে হইল না। আমি ভাবিয়াছিলাম মায়ের কোলে থাকিয়াই বাড়িয়া উঠিব, কিন্তু সে ভাগ্যেও আমি বঞ্চিত হইলাম। তাঁরা চলিয়া গেলে আমার জেঠাইমা ও জেঠতাতু ভ্রাতাদের অধীনে গেলাম। আমার দাদা স্কুলে পড়িত, তাহার পড়া বন্ধ হইল, সে গিয়া এক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হইল। আমার বলিতে আমিই একটী বাড়ীতে রহিলাম।

আমি বাড়িয়া উঠিলাম, আমার সৌন্দর্য্য উথলাইয়া উঠিল। জেঠতাতু ভ্রাতা আমাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কাপড়টা, আয়না, চিরুণীটা কিনিয়া আনিয়া দিয়া ভালবাসার নমুনা দেখাইতেন। তিনি আমার রূপের লালসায় মজিয়া গেলেন, আমিও আর পারিলাম না। তাহাকেই সময়ের সাথী বলিয়া আমার রূপ, যৌবন তাহার পায় ঢালিয়া দিলাম: গ্রামে আমাদের কথা লইয়া কাণা ঘুসা হইতে লাগিল। গ্রামের যুবকেরা আসিয়া আমাকে পুনরায় বিবাহ দিতে চাহিল, কিন্তু আমার জেঠা মহাশয় একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার প্রতিবন্ধকতায় যুবকেরা সরিয়া পড়িল। আমার ভাঙ্গা কপাল আরো ভাঙ্গিতে লাগিল। আমি যে বিধবা তা বুঝিলাম, বিধবার যে কি কষ্ট তাও বুঝিতে বাকী রহিল না। পাড়ার ডে করা ছোড়ারা আমায় দেখিয়া ইসারা করে, প্রেমের গান করে, ঘাটে গেলে তারা গিয়া আমার কাছে নানা কথা বলে। আমি তাদের কারো কারো সঙ্গে মজিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ গ্রামে দেখিতাম এরূপ পল্লীবেশ্যার অভাব নাই।

দেখিতে দেখিতে আমার গর্ভ হইল। এ গর্ভের নেতা আমার জেঠতাতু ভাই। আমার গর্ভের যখন পাঁচ মাস তখন বাড়ী শুদ্ধ লোক ভীত হইলেন। কি উপায়ে গর্ভ নষ্ট করা যায় তাহার অদম্য চেষ্টা চলিল। ঔষধ খাওয়াইয়া গর্ভ নষ্ট করিতে চাহিল, আমি তাহাতে রাজী হইলাম না। ও পাড়ার বিন্দু পিশি নাকি এইরূপে গর্ভ নষ্ট করিতে গিয়া তিনি শুদ্ধ মারা গিয়াছিলেন। আমি গর্ভ নষ্ট করিতে না চাহিলে আমার উপর শারীরিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। একদিন আমার জেঠতাতু ভ্রাতা আমাকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আমার উপর অত্যাচার সুরু করিলেন। সে কি ভীষণ অত্যাচার, আমাকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া আমার পেটের উপর দাঁড়াইয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তারপর চড়, কিল, লাথি কোনটারই অভাব ছিল না। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিলে বাড়ীর লোকে কহিত, "একটু সহ্য করিয়া থাক, পেটটা খালাস হইয়া যাউক।" আমি ভাবিতাম আমার মরণ হইলে বুঝিবা ভাল হইত। এই সকল চেষ্টা করিয়াও আমার গর্ভ নষ্ট হইল না। আমি উঠিতে অশক্ত হইলেও কোন প্রকারে গিয়া এক প্রতিবাসীর বাড়ী উঠিলাম, তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে তাহার বাড়ীতে স্থান দিলেন। এখানেও নিরাপদ হইল না, আমার জেঠতাতু ভাই ও তাহার লোকেরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য উপদ্রব করিত, কিন্তু গৃহস্বামী জানিতেন, গর্ভ নষ্ট করার জন্য আমার উপর নূতন অত্যাচার আরম্ভ হইবে, তাই তিনি আর তাহাদের আশ্রয়ে আমাকে থাকিতে দিতেন না। আমি এ বাড়ী সে বাড়ী যাইয়াও দিন কাটাইয়াছি।

একদিন গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে একটা সাধারণ কুঁড়ে ঘরে অযত্নে আমার এক কন্যারত্ন প্রসব হইল। আমি গর্ভ নষ্ট করিতে দিই নাই সেই অপরাধে আমি জাতিচ্যুত হইলাম। পাড়ার সকলে আসিয়া কহিতেন, "আগেই বলিয়াছিলাম অষুধ খাইয়া গর্ভ নষ্ট করিয়া দাও, এখনো বলি মেয়েটাকে মারিয়া ফেল, তোমাকে জাতিতে তুলিয়া রাখিব।" সে কি পারা যায়, কেমন করিয়া পেটের ছেলেকে মারা যায়, এমন পিশাচ কি মানুষ হইতে পারে? আমি জাতিচ্যুত হইতে রাজী হইলাম, তথাপি নিরপরাধী মেয়েটাকে মারিতে দিলাম না। একদিন জেঠতাতু

ভাইকে কহিলাম, "দাদা, এ মেয়ে যে তোমারই, তোমার কি ইহার উপর একটা মমতা আসে না?" তুমি ইহার একটা উপায় করিতে পার না কি? তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, তাহ কে আর কিছু কহিলাম না।

ইহার পর আমার উপর গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সকলের আদেশ হইল। কোথায় যাইব এরূপ স্থান ত খুঁজিয়া পাইলাম না। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার আমার ভ্রাতা আসিয়া আমাকে সহরের এক আত্মীয়ের গৃহে রাখিয়া গেল। তিন মাস স্থান দিয়া তিনি আর আমাকে তাহার গৃহে রাখিলেন না। — সেই নাকি তার জাতি যায়। আমি পথে উঠিলাম, আমি এক গৃহে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। ইহাতে আত্মীয়েরা আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইলেন, আমি পাচিকা বৃত্তির কাজ করিলে তাহাদের মান হানি হয় কিন্তু কেহই আমার ভরণ পোষণের ভার নিতে রাজী হইলেন না। হায় রে সমাজ, আমি পাচিকা হইলে তাহাদের মান নাশ হয় না কিন্তু আমি বেশ্যা হইলে বুঝিবা তাহাদের মানের পশার বাড়িয়া উঠে। আমি যে গৃহে পাচিকা ছিলাম, সে গৃহে একটা স্ত্রীলোক বস্ত্র বিক্রীর ব্যবসায়ে যাতায়াত করিত, তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তাহার গৃহও একদিন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। একদিন আমি আত্মীয়দের তাড়নায় পাচিকা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সেই বস্ত্র ব্যবসায়িনীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সে আমাকে সাদরে স্থান দিল। মাসিক ৭৲ ভাড়ায় একখানা ঘর দিল, সঙ্গে একখানা ক্ষুদ্র পাকের ঘরও ছিল। এখানে আসিয়া দেখি এটা একটা বেশ্যালয়। অনেকগুলি ঘরে তাহারা যে যার মত বাস করে ও ঘৃণিত ব্যবসা চালায়। আগে আমি ইহাকে ঘৃণিত স্থান বলিয়া জানিতে পারি নাই। সন্ধ্যার পর হইতে পুরুষ মানুষের আনাগোণায় ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার আত্মীয়গণকে তত্ত্ব দিলাম, তাহারা আসিলেন না। পাচিকা বৃত্তিতে তাহাদের মান যায় কিন্তু বেশ্যাবৃত্তিতে তাহাদের মান যাইবে না।

স্বদেশী যুবকেরা আমাকে এই স্থান হইতে মুক্ত করিয়া নিল, তাহারা নারীরক্ষা সমিতিতে আমাকে নিয়া রাখিল। তাহারা বলিল, তাহারা আমাকে শিক্ষিত করিবে ও বিবাহ দিয়া দিবে। কিন্তু নানা ভাব ধরিতে আমার আবার কপাল পুড়িল, সেই বস্ত্র ব্যবসায়িনী পতিতা নারী আমাকে কৌশলে বাক্যমুগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার গৃহে লইয়া আসিল।



"মিটেনি যদিও ক্ষুধা তবু তৃপ্ত আজি—"

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all."

—Tennyson.

* * *

— এক —

রাত প্রায় বারোটা।...আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ...। পৃথিবীর গায়ে জ্যোৎস্নাধারা ঝ'রে প'ড়্ছে ...বেশ মিঠে হাওয়া বইচে।...ঘরটার ভেতর শুধু শতদল আর অশোকা। শতদল কবিতা লিখ্চে, অশোকা নত নেত্রে চেয়ে দেখ্চে।...আর কেউ নেই, শব্দটী পর্য্যন্ত নেই...। নিঝুম, নিশুতি নিশি .....।

... ...
... ...

কবিতা লেখা হ'য়ে গেল, শতদল ঘাড় তুল্‌ল। কপালের ওপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিলে।...অশোকার পানে চাইলে।...অশোকা মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছে। চারটে চোখ এক হ'তেই অশোকার রাঙা অধরে একটু হাসি ছোঁয়া দিল, .. মুখখানি ও বেশ টক্‌টকিয়ে উঠ্‌ল...।

অশোকা

হ'ল ?...

শতদল

হ্যা, হ'য়েচে ...... শোন ! ...

শতদল প'ড়্তে লাগ্‌ল, কখনো ধীরে ... কখনো গম্ভীরে ... কখনো অতি মৃদু স্বরে ...। প্রতি অঙ্গ তার নাচ্‌তে লাগ্‌ল, ... চরণ তার সমতালে মাটীর চুমু নিতে লাগ্‌ল। .. পর্দ্দা হ'তে পর্দ্দায় ওঠা নামা ক'রে তারপর থেমে গেল তার স্বর।...

অশোকা—

বেশ—সুন্দর...।

তরুণ কবির সকল শ্রমের সার্থক হ'ল। সাফল্যের আনন্দে চোখ্ জোড়া গরবের দীপ্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল।... তার সাধনার সিদ্ধিতো এই খানেই...।

অশোকা—

ওটা কাল্‌কেই "মাধবিকা"য় পাঠিয়ে দাও। আস্‌চে হপ্তায় ঠিক বেরিয়ে যাবে।...

শতদল

(চালাকীর ভাবে)

হ্যা, এ আবার বেরুবে—

অশোকা –

বেরুবে গো বেরুবে। আমি ব'ল্‌চি—, তুমি পাঠিয়েই দাওনা ছাই।...

কথার ধরণ দেখে শতদলের ঠোঁট খানা রাঙিয়ে উঠ্‌ল।... কেমন একটা সব চে' আপনকে আদরের ভাব তার প্রাণে জেগে উঠ্‌ল। .. অশোকার দেহ-লতাটী বাহু-পাশে জড়িয়ে ধ'রে তার ডালিম ফোটা কপোল তলে সোহাগ, স্নেহ, ভালবাসা সব জানিয়ে দিল মধুর একটী প্রাণ ভরানো চুমু দিয়ে।... নিমেষের তরে শুধু ..। বেতস্ বনে কাঁপন্ জাগার মত, কাঁপনে নাচিয়ে তুল্‌ল অশোকার সারা অঙ্গ খানি।... নিদের নেশায় চোখ্ দুটো জড়িয়ে আসার মত হ'ল। ... কপোল তলে লাল্‌চে আভা ফুটে উঠ্‌ল .., খাঁ খাঁ করা বুকটা যেন কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ভর্ত্তি হবার জন্যে।... পাঁচ মিনিট! কেটে গেল অসাড়ে। চুপ ক'রেই...। অশোকা বাহু পাশ থেকে সরিয়ে নিলে নিজেকে...।

অশোকা

শত দা.........................

কান্না এসে তার কথায় বাধা দিয়ে দিল।

শতদল

অশো, মাপ কর আমায়—

অশোকা—

এ কী ক'রলে শত দা।... দুঃখিনী, আমায় তুমি এ কী ক'রলে... !

শতদল—

পারিনি অশো…। থেমে থাকতে পারিনি। অন্তরের ভেতর কে যেন গেয়ে গেল,—ওরে এই তো তোর মানসী, প্রেয়সী, এই তোর চির যুগের দয়িতা। … তাই অশো হারিয়ে ফেলেছিলুম নিজকে। ভুলে গেছলুম কী ক'রচি? কিন্তু অশো নিতান্তই কি অন্যায় ক'রেচি আমি?

অশোকা—

অন্যায়……! চুপ্…চুপ্। থেমে যাও শতদা, ন্যায় অন্যায়ের সমস্যা এনে আমার প্রাণে চিন্তা তুলে দিও না।… পায়ে পড়ি তোমার……

একটু চুপ্ থাকার পর পাগলের মত আপন্ খেয়ালে—

বেশ সুন্দর লাগ্‌ছে আজ,—ঐ শান্ত, স্থির, ধীর, নিশ্চিন্ত আকাশ, ঐ লাজ-হীন, অমলিন্ জ্যোৎস্না, এই নিঝুম নিরালার স'বন্ধে নেশা, এই নিথর্ নিশার্ আঁচল্ হাওয়া……। মনের গোপন কাননে অযুত্—কলি ফুটে উঠেচে, প্রাণের পেয়ালায় রসের সুর উপ্‌চে উঠেছে…চুমুর অরুণ পরশনে ঘুমের স্বপন্ জেগে উঠেচে……… বাঃ … বাঃ …

হঠাৎ যেন হারিয়ে যাওয়া পথের রেখায় আবার ফিরে এল।… চম্‌কে উঠে—

শতদা, শতদা একী ক'রলে তুমি? এই বিপ্লব জাগিয়ে দিলে আমার প্রাণে?

শতদল—

অশো! বিপ্লব কেন মণি!… আমি তোমায় ভাল বাসি। পুরো পাঁচটা বছর দুজনে এক সঙ্গে রয়েচি। কৈশোরের অ-বোঝা স্বপন্ লোক্ থেকে যৌবনের চাঁদিনী ভরা স্বপন্‌পুরে এসে পৌঁছেচি,… কত নিরজন রাত্রি ঘুম-হারা নয়নে শুধু তোমার কথা ভেবেচি, ..কতদিন সঙ্গী-হারা পথে তোমায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে চ'লেচি…ভেবে ভেবে পাগল্ হবার মত হ'য়ে গেচি মাঝে মাঝে, আমার নিজের অজ্ঞাতে তোমায় আপন্ ক'রে এঁকে নিয়েচি বুকের ভেতর, তাই অশো আজ আর হৃদয়কে ধ'রে রাখ্‌তে পারিনি, মনকে চোখ্ রাঙিয়ে শাসন ক'রতে পারিনি,—স্রোতে ভাসা কুটোর মত, নেশায় ভাসা মন আমার আদরে, সোহাগে বরণ ক'রেচে তোমারে ..তাকে ফিরিয়ে দিও না প্রিয়তমে! ..

অশোকা

সে কি শতদা। দুঃখিনী আমি; অভাগিনী, নিরাশ্রয়া আমি। এ কি প্রলোভন দেখালে প্রভু? এ কী দুরাশা জাগালে প্রিয়তম?

শতদল

প্রলোভন, দুরাশা কেন প্রিয়ে?…তুমি আমার দয়িতা, তুমি আমার চির জনমের ফিরে পাওয়া হৃদয়ের রাণী।…এস অশোকা, এস প্রিয়া মোর, এই ছন্ন ছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রা ছেড়ে আমরা গুনিয়ে নিই আমাদের…জীবনটা আর কতদিন এলোমেলো ফেলে রাখ্‌বে প্রাণেশ্বরী?

অশোকা

পথের কাঁটা আমি যে নাথ।…জনম ভোর পথে পথেই বেড়িয়েচি। যার দুয়োরে গেছি তাড়িয়ে দিয়েচে, শশব্যস্তে স'রে দাঁড়িয়েচি। পাছে কাঁটা আমি…আমার থেকে ব্যথা পায় তারা।… অনাদর, অবহেলা যখন নিয়ে চ'লছিল আমার মরণের তীরের পানে, তুমি তখন এসে আমায় ফিরিয়ে নিলে। …আশ্রয় দিলে, কাঁটাকে যতন্ ক'রে তুলে রাখ্‌লে! …কেন তুলে ছিলে সখা, কেন ভেবে দেখোনি একটু? তা হ'লে তো কাঁটার ঘা আজ লাগতো না তোমায়!…

শতদল

কমল তো কাঁটাতেই থাকে অশো। কমল তুল্‌তে কার অসাধ বল?.........অতীতের কথা ভুলে যাও রাণী।.........সাম্‌নের পানে ফিরে চাও।... ...

অশোকা নীরব হ'য়ে কী ভাবছিল।......অনেক-ক্ষণ কেটে গেল। আগ্রহ আকুল নয়নে শতদল তার পানে চেয়ে রইল ....। অশোকা অশ্রুঝরা মুখখানি তুলে তার প্রিয়তমের দিকে একবার চাইলে, ...অতৃপ্ত দৃষ্টি তার সজল হ'য়ে উঠল ক্রমেই.........। শতদল সান্ত্বনা নিয়ে এল, দু'হাতে তার মুখখানি তুলে ব'ল্‌ল—ছিঃ, কাঁদ কেন অশো? অশোকা নিরুত্তর হ'য়ে রইল। শুধু মাথাটী তার প্রিয়'র বুকে লুটিয়ে প'ড়ল।........শতদল তার গলাটী জড়িয়ে ধ'রে কপোল তলে সোহাগ লালিমা ফুটিয়ে দিলে।... .....অঝোর্‌-ঝরা কান্না নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে শতদল। সে অশোকাকে পায় নি,.........পেতে পারে নি। সরকার গোমস্তা কি একটা খরচ দিয়ে আনিয়েচে তার মাকে, বাবাকে।.........মা কেঁদেচেন অনেক ক'রে।...... নারীর কান্নায় নারীর হিয়া গ'লে গেছে। অশোকা সইতে পারেনি নারীর ব্যথা। চ'লে গেছে সে।... .. কোথায়,......কেউ জানেনা,......কেউ পায়নি।... ভাবছিল, শতদল—এই অচেনা অজানা নারী আজ পাঁচ পাঁচটা বছর তার সাথে ছিল, সুখ-দুঃখের অংশ ভাগিনী হ'য়েছিল। তার দুঃখের কথা শুনে ভারী ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল তার মন। তাই মেস্‌ ছেড়ে তাকে আলাদা বাড়ীতে এনে স্থান দিয়েছিল। তার কত অভিমান, অন্যায় সহ্য ক'রেছে সে। এই কবিতা লেখা ....এর জন্যে কত উৎসাহ দিয়েছে সে। .. কোথায় গেল চ'লে আজ।... .....অশোকা,......... অশো আমার! কোথা তুই আজ প্রিয়তমে? গুমরিয়ে কেঁদে উঠল' শতদলের ব্যথিত চিত্ত। অশ্রু সিক্ত স্বরে ব'ল্‌ল কবি,—

অশো, রাণী আমার! যেথা-ই যা' তুই, তোকে আমি ভুল্‌বোনা। ভালবেসে তোকে পাইনি আমি, কিন্তু ভালবেসেচি তোকে.........তাতেই আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাচ্ছে।.........

মিলন শঙ্খ

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

শিরোমণি ঠাকুর জোর গলায় বল্লেন...অমন করে সমাজের হয়ে দয়া দেখায়ে শেষে কি সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মধ্যে একটা অনাচার ঘটিয়ে তুলবেন। এখনও যদি কেউ গদাই এর হয়ে ৺শীতলা তলায় পূজা দিবার জন্য একটা পাঁঠার দাম ইত্যাদি করে মাত্র দশ টাকা ধার না দেয় তাহা হ'লে মড়া সেখানে পচুক ...তাঁর কোনও আপত্তি নেই। শিরোমণি ঠাকুর এতে বল্লেন প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে মড়া যদি কেউ ছোঁয় ত তাকে গ্রাম ছাড়া কর্‌বেন।

সামনেই পরীক্ষা...Test হইয়া গিয়াছে...আজ তারই fee জমা দিবার জন্য রবিদা' স্কুল যাইবার পথে সংবাদ শুনেই গদাই এর বাড়ী গিয়ে হাজির। ছেঁড়া কাঁথার জন্য কেহই অর্থ দিতে রাজি হ'ল না; শেষে রবিদা' তাঁর ছেলে পড়ান পরিশ্রমের পয়সা স্কুলে জমা দিবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তাই খরচ করে ফেল্লেন; এ দিকে কাল্‌কের মধ্যে টাকা জমা না দিলে উপায় নেই, অতোগুলো টাকাও কালকের মধ্যে সংগ্রহ করা অসম্ভব—কাজেই বোধ হয় এবছর আর পরীক্ষা

দেওয়া হ'লোনা তবু রবিদা'র দুঃখ নেই, সাফল্যের আনন্দে তার বুক ভরে উঠেছে··· ।

তাই বসে বসে ভাবছিলুম···হিন্দুদের সমাজের বাইরে এসে পড়েছি সত্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক রকম ভালোমন্দ নিদর্শন নিত্যই দেখি; তাই এদের জটিল অর্থটা বুঝবার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু অল্প বুদ্ধিতে তা নির্ণয় করে উঠতে পারিনে। তবু কোন দিন এদের উপর আমার ঘৃণা বা রাগ হয়নি—আজ আর নিজেকে সংযত রাখ্‌তে পারলুম না। বড় তীব্র বিতৃষ্ণার ভাব মনে জাগ্‌ল। আবার নিজের অলক্ষ্যেই আমার বুকের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যডালি রবিদা'র শান্ত সৌম্য হৃদয়ের সাম্‌নে উৎসর্গীকৃত হোলো। রবিদার কথা শেষ হ'য়ে গেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি চুপ করেছিলুম—কথা কইতে পারিনি নীরবে শুধু কেঁদেছি··· ।

রাত্রের শেষ ক' ঘণ্টা রবিদা'র বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলুম ।

দাদার কাছে রাত্রের অভিযানের কথা বল্‌তে বল্‌তে চোখের পাতা ভিজে গিছ্‌ল। দুফোঁটা জল মুছিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন ..কাল থেকে কিছু খান্‌নি বুঝি। আমারও আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করে সেরে নিয়ে আমি কাকার হাতে টাকা দিয়েই আস্‌ছি এখুনি— !

এতদিন দেখে এসেছি রাগ হ'লে বৌ তা কথায় ব্যবহারে প্রকাশ করত, আপন মনেই কত কি বকে যেত, মুখের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেই সাত পুরুষের নাম নতুন ভাবে নতুন ধাঁজে বিনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিত। সমস্ত দিন ভাত বাড়া পড়ে থাকৃত ছুঁতোওনা আর রাত হ'লে সেজদার সামনে আমার নাম করে কত রকম যে অভিযোগ করৃত তা কি বল্‌ব। প্রথম প্রথম আমিও তাকে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি কিন্তু যখন বুঝ্‌লুম এরূপ করায় লাভ ত নেই, বরং গালমন্দের ছড়া গুলো অধিকতর তাড়াতাড়িই উচ্চারিত হ'তো তখন থেকেই আমি এ সব ব্যাপারে

সম্পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করেছি। অবশ্য কাজে দেখাতে ছাড়তুম না যে আমাকে শুধরাবার ছলে যে সব উপদেশের নামে গালিগালাজ দিত আমি তা গ্রাহ্যও করতুম না।

তার স্বভাবের এই রুক্ষ ভাবটার সহিত আগেই পরিচিত ছিলুম বরাবর, তাই আজ তার ব্যবহারে কোনও রাগের লক্ষণ না দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম। পরেই আমার কাছে এসে রন্ধন সংক্রান্ত কাজের অংশ গ্রহণ কল্লে, কথাবার্ত্তায় আজিও কিছু উগ্রভাব প্রকাশ করলেনা···আর ভাত খাবার সময় ক্ষুধা পূর্ণ হ'বার পূর্ব্বে উঠে যায় না, তাই মনে ভাবলুম আজ হয়ত সত্যই ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

—'চার'—

এই দুটো মাসের ভিতর বোধ হয় সারা জগতটাই নতুন হ'য়ে গেছে। এতদিনকার অভিজ্ঞতা···এতদিন কার ধারণা···নতুন একটা আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। গত জীবনের ষোলটা বছরের সীমান্তেই আজ বুঝলুম লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে কাটিয়ে এসেছি। দুটো মাস আমার সেই ব্যর্থ জীবনের ধারার মধ্যে নতুন করে স্রোত খেলিয়ে দিলে, সব বাধা বিঘ্ন ভাসিয়ে দিলে··· কিন্তু কেমন করে যে এতটা পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল তা আমিই বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

রবিদা'কে আজ নতুন করে চিন্‌লুম। পাড়াগাঁর স্কুলটার প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এ খবরটা সকলেই জানৃত। কিন্তু ইহার মধ্যেই বাহিরে যে তাঁর একটা বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র আছে সেটা বিশেষ জানা ছিলনা। বামুনের হোক বা অন্য যে কোন জাতের হোক মড়া তিনি কয়েক বার সৎকার করেছেন এটা শুধু লোকমুখে শুনেছিলাম মাত্র। গদাইএর মৃত্যুর দিন···দীঘির ধারে খোলা মাঠে সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করি। আর এই দিনটার পর থেকেই আমার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে বলতে হ'বে। এই দিনটা থেকেই রবিদা'র অন্তর্নিহিত উজ্জ্বল আলো দেখে ধন্য হয়েছি, প্রত্যেক কাজের মাঝে তাঁর এমন

একটা প্রাণের পরিচয় পেয়েছি যা আকাশের মত উদার…প্রভাত অরুণের আলোর মত নির্ম্মল। শিশুর মুখের চঞ্চল হাসি কান্নার মত স্বর্গীয়। এর আগে যে এটা বুঝিনি তার কারণ বোধ হয় আমি চোক থাকা সত্বেও অন্ধ ছিলাম।

দিনু মাইতীর সর্ব্বাঙ্গে মায়ের অনুগ্রহ দেখা দিলে রবিদা' তার শুশ্রূষা করে রাত কাটালেন। দক্ষিণ পাড়ার গোবিন্দ হালদারের মেয়ের বিয়েতে তাঁকে বর যাত্রীদের তামাক সাজা থেকে ময়দা ছেনে দেওয়া পর্য্যন্ত সব কাজেই ছুটাছুটি করতে দেখেছি। বছিরুদ্দিন মিঞার ছেলেটার অসুখ হ'তে রবিদা' সেই দুক্রোশ দূর থেকে ডাক্তার ডেকে আন্‌লেন। জানি এই বালিকার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁর কাযের অনুকরণ করা সম্ভবে না, তবু ক্ষুদ্র তৃণ হ'তেও ত' মানুষের উপকার হয়। আমি প্রকাশ্যেই তাঁর সাথে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়িয়েছি; যেখানেই দুঃখ দৈন্যের কাতরতা প্রত্যক্ষ করেছি সারা চিত্ত দিয়ে তা মোচন করবার প্রয়াস পেয়েছি। লোকের কষ্টের কথা শুন্‌লে ছুটে গিয়েছি।

বৌরাণীকেও এতদিনে বুঝছি…বুঝলুম এতদিন তার সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করতে পারিনি—তার বাক্যবজ্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল হৃদয়ের স্নেহ গলান সুমধুর বরষার ধারা। সে আমাকে এতদিন যে বকে এসেছে…সে শুধু স্নেহের আতিশয্যে…আর আমি অবুঝের মত মান করেছি।

তার এই করুণ স্নিগ্ধ স্নেহধারা এতদিন কোন্ মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল বুঝতে পারিনি…সে আমার কি ভেবেছে সেই জানে…এখন সে আমার প্রতি কাজে উৎসাহ দেয়—ভৎর্সনার পরিবর্ত্তে আজ ক'দিন ধরে' দেখ্‌ছি তার মুখ যেন কি বল্‌তে চায় বুক বাধা দেয়…কথা কহিতে কহিতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে…প্রশ্ন করলে হেসে উড়িয়ে দেয়… সেদিন তাকে বল্লুম… তুই কি বল্‌তে চাস্ বলে ফেল আজ বল্‌তেই হ'বে।

খানিক ইতস্ততঃ করে সে বলে উঠ্‌ল, ছেলেবেলার কথা তোর মনে পড়ে?

আমি হেসে বল্লুম, আমি কি ছোট ছিলুম না কি… বাঃ রে—

সে বল্লে, না না বল্‌না—আমার একটা দরকার আছে তাই জান্‌তে চাইছি—আচ্ছা সেই কোলকাতায় থাকার কথা মনে প'ড়ে…

বল্লুম…খুব…শুধু সে ক'দিনের কথা ভালো করেই মনে আছে…একদিন র'বিদাকে এমন কামড়ে দিয়েছিলুম যে কেঁদে ফেলে দিল… সেদিন বাবা আমায় একটা চড় মেরে ছিলেন কি কারণ কে জানে? আর একদিন হ'ল আমার বে—

বে? বে হোল সেকি…?…

বাঃ তা বুঝি জানিস্ না…দাদা বলেনি?…তা দাদা ত' সেখানে তখন ছিলই না…ছিলেন শুধু মা কাকিমা বড়দা আর মেজদ্দা—আর রবি'দা…সন্ধ্যা হ'লে মা সাজগোজ করিয়ে বল্লে, বর আস্‌ছে বে করতে…ঐ খানে বোস্…আমরা ততক্ষণ আর সব উদ্যোগ করি…কাকীমা ছিলেন আমার কাছে…তারপর সিঁড়িতে জুতার শব্দের সাথে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল…কাকীমা বল্লেন ঐ বুঝি পুরুত আস্‌ছে…আমি একহাত ঘোম্‌টা বাড়িয়ে দিলুম…বর আর আসে না…মে'জদা বল্লে রবি'র বিয়ে ..কনেও স্থির হ'য়ে গেছে…তারা সব চল্‌ল।

রবিদা'র বে'র পর ফিরে এলে আমার বে' হ'বে। আমি কি আর অতক্ষণ জেগে থাক্‌তে পারি? ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে শুনলুম বে' হ'য়ে গেছে…কিন্তু বে'র পর যখন ঘুম ভাঙল না তখন বর রাগ করে চলে গেল ..রবি'দার নাকি সেই অবস্থা…বে' করতে কনের বাড়ীতে গেল আর এলনা…

বুঝেছি তোর মতন রবি'দার কনে'ত পালিয়েছিল না…

কাকীমা বলেছিলেন . তোরা যদি সাত রাত্তির একসঙ্গে জেগে থাক্‌তে পারিস…তবেই বর এসে দেখা দে'বে…

রবিদা'র ও বুঝি ঐ ব্যবস্থা, তাই বুঝি তোরা সাত রাত্তির জেগে কাটাবার জন্য কার বসন্ত হ'য়েছে, কা'র কলেরা—এই করে বেড়াস্—?

দূর তা বই কি? খুব তা জানিস্। না বলে পালিয়ে গেলুম কিন্তু এই কথা কটা বল্‌বার জন্য অত কুণ্ঠা হয়েছিল কেন? সেই কথাটাই মনের মাঝে জেগে উঠ্‌ছিল।

পাঁচ

পাড়াগাঁর স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে রবিদা' পনের টাকা বৃত্তি পেল...গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল, প্রকাশ্য সভায় তাকে মালা পরাবে বলে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হলো।

আমার মনে তখন কি আনন্দের ঢেউ খেল্‌লে তা কি বল্‌ব? তার কাছে এত বৎসরের এত আয়োজন...তুচ্ছ নগণ্য। রবিদা' আমাকে সে দিন চুপি চুপি বল্লে...তুই সেই সময়ে টাকা কয়টা দিয়ে দিলি বলেই আমার এই সাফল্য...এই সম্মান, এ আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।

আমি হেসে উঠ্‌লুম...

সে বল্লে—আমি ঠাট্টা কর্‌ছি না লীলা—চিরদিন তোর স্নেহের ঋণ আমার মনে থাক্‌বে—

উপমা দিয়ে মন ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাও। আমি ত-এর এক বিন্দুও,......

বেশ, কি করলে বিশ্বাস হ'বে—?

আমি তোমায় কোন প্রতিজ্ঞার কথা বলিনি... যে আলোর সন্ধান তুমি দেখিয়েছ...তার তুলনায় সবই তুচ্ছ। তোমার এই গৌরবে তোমার যত না আনন্দ হয়েছে আমার হয়েছে তার বেশী।

জানি লীলা—জানি তুই—

থাক্ এ সব কথার আলোচনা এখন...দেখ আমরা পতিত...আমরা মুসলমান কিন্তু হিন্দুর গৌরব হিন্দুর স্মৃতি ভুলিনি...আমি অনেক মন্ত্র মার কাছ থেকে শিখেছি...আমার শরীরের প্রতি রক্তকণা হিন্দুত্বের গরিমা মাখালো...আজ আমার কামনা হৃদয়ের সেই চিরসুন্দর, চিরজাগ্রত চিরমহান্‌কে পূজা করবো তুমি হ'বে তার পুরোহিত—বল আসবে গ্রামের কোলাহল যখন নীরবতাকে বরণ কর্ব্বে...নীল আকাশের চাঁদ যখন হাস্‌বে তুমি তখন...মন্ত্রের ওঁকারে জগৎ কাঁপিয়ে তুলবে...বল আস্‌বে?

আস্‌বো—লীলা কিন্তু—

কিছু আট্‌কাবে না, এ পূজায় মন্ত্রের আবশ্যক নেই, চাই শুধু প্রাণভরা ভক্তি।

আস্‌ব, কিন্তু পুরোহিত দামিনার কথা মনে থাকে যেন। জানিস্ ত' বামুণ বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই জান...বুঝলি।

(আগামী বারে সমাপ্য)



গজল

কাজি নজরুল ইসলাম।

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আসলে প্রাতে পুষ্প-চোর।
ডাক্‌ছে পাখী, বৌগো জাগো আর ঘুমায়না রাত্রি ভোর॥
যুঁই কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়, চুম্ কুড়ি দেয় মৌমাছি।
শাপলা বনে চাঁদ ডুবে যায় ম্লান চোখ হায় চায় চকোর॥
ঘোম্‌টা ঠেলি কয় চামেলি, গোল করোনা গুল্-ডাকাত।
ঢুল্‌ছে নয়ন দুলছে গলায় বেল্ টগরের ছিন্ন ডোর॥
গুন্ গুনিয়ে মোর আঙিনায় কোন্ সতীনীর গাইছ গুণ।
কোন্ মালঞ্চে ফুল ফুটায়ে হুল ফুটালে বক্ষে মোর॥
বোর্‌কা খুলে বন্ কেতকীর ফুল্-রেণুতে রাঙলে গা'।
পারুল-বধুর মাগলে মধু হাস্‌না হেনার ভাঙলে জোর॥
গায় কাওয়ালী বাদ্‌লি রুম্‌ঝুম, তায় কাওয়ালী নাচে মৌর।
ঝুর্‌মে কদম, মেঘ-তমালে বিজ্‌লি চোখ চায় কিশোর॥
শোন্‌রে কবি পুষ্প লোভী, আজ ধরেছি ফুল চুরি।
হুল্ ফুটায়ে ফুল্ বালাদের কুল ভুলানো ভাঙব তোর॥

কৃষ্ণ নগর।

দন্তরুচি কৌমুদী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

রেলগাড়ীতে পুজার ছুটীর ভিড় লেগেছে। কোনও গাড়ীতেই বসবার জায়গা নেই। একটি লোক প্ল্যাটফর্ম্মের এদিকে থেকে ওদিক পর্য্যন্ত ছুটোছুটী করে সব গাড়ী খানা খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু কোথাও একটু জায়গা খালি আছে দেখতে পেলেনা, কেবল একখানা গাড়ীতে দেখলে একটি বসবার জায়গায় একটা মস্ত 'সুট কেস্' বসানো রয়েছে। ভদ্রলোক গাড়ীর কাম্‌রার ভিতর ঢুকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে "এখানে এই সুট্ কেসটি কে রেখেছেন?"

কেউ সে প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

ভদ্রলোক আবার একবার উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করাতে সামনের বেঞ্চের একজন মোটা সোটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটি একটি ভদ্রলোক রেখে গেছেন, এবং আমাকে ওটার উপর নজর রাখতে বলেছেন।"

একটু পরেই গার্ড সাহেবের বাঁশী শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন ক'রে উঠে এঞ্জিন গাড়ী টানতে সুরু করে দিলে!

আগন্তুক ভদ্রলোকটি শশব্যস্তে সুট্-কেস্‌টা

তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে দিয়ে বল্লেন—"ভাগ্যিস্, ভদ্রলোকটি দেখছি গাড়ীতে উঠতে পারেন নি, সুটকেস্‌টি তাঁর বেওয়ারিস চলে যাচ্ছিল আর একটু হলেই!"

বলতে বল্‌তে তিনি সেই স্থানটি দখল ক'রে বসে পড়লেন!

ব্যাপারটা এমন চক্ষের নিমেষে [illegible], যে সেই মোটা লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলবার সুযোগই পেলে না যে, "সুট্ কেসটি" তাঁর নিজেরই!

(৪)

পুলিশ কোর্টে একটা মাম্‌লা চলছিল। উকীল সাক্ষীকে জেরা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—

"তোমার ঠিক স্মরণ আছে যে এই আসামীর সঙ্গে সে দিন রাত্রে যখন পথে তোমার দেখা হয় তখন রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে?"

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—সেটা অমাবস্যা রাত্রি ছিল না?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—রাস্তা একেবারে অন্ধকার ছিল ত?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—অতরাত্রে পথ তখন একেবারে জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে ছিল বোধ হয়?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—তোমার কাছে ঘড়ী ছিল না বল্‌ছিলে না?

সাক্ষী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীল—কাছাকাছি আর কোথাও ঘড়ী ছিল না নিশ্চয়?

সাক্ষী—আজ্ঞে না!

উকীল—তবে তুমি কি করে জানলে যে রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে!

সাক্ষী—আজ্ঞে, আসামীর সঙ্গে দেখা হ'তেই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম 'কটা বেজেছে বলতে পারেন?"

ও বলেছিল—"রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে!'

আজ বাদলের অন্ধকারে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গান)

আজ বাদলের অন্ধকারে
দিনের আলো নিভ্‌লো রে,
ফুল বাগিচায় ভুল করে কে
কার পিঁছুতে ছুটলো রে!
পাগলা পবন বেতস বনে হায়,
ব্যস্ত আজি কার আসা আশায়?
তড়িৎ শিখায় চকিৎ আলোয়
মনটা নেচে উঠলো রে!

বাদল এলো নদীর তীরে তীরে,
কাজল মেঘে নাচছে ঘিরে ঘিরে,
তন্দ্রাতুরা তটিনী ওই
জোয়ার জলে জাগলো রে!
কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জনাতে ওই
অঝোর দেয়া সজোর মাতে সই—
উতল উচ্ছ্বাস প্রাণ সায়রে
ভাবের তরী বইলো রে!

সৈনিকের চিঠি

মিলিটারী হাঁসপাতাল,
প্যারী।
১৫ই সেপ্টেম্বর—সকাল।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

ঐ দিন, যেদিন তোমাকে শেষ চিঠি লিখ্‌ছিলুম আমি ভীষণ ভাবে আহত হয়েছি। বুকের বা পাঁজরটা এক রকম ভেঙ্গে গেছে। আজ একটু সুস্থ বোধ কর্‌ছি তাই কাগজ কলম নিয়ে বসলুম। জানিনা শেষ করতে পার্‌ব কি না, শেষ করে তাকে ছাড়তে পার্‌ব কি না ? হাঁসপাতালের আইন অনুসারে কোন কিছু লিখা বা বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ, কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও তো আমি থাকৃতে পার্‌ছিনা তোমাকে চিঠি না লিখে ! কিন্তু রাণী ! তুমি তো আমার ব্যাকুলতা, আমার বুকজোড়া ব্যথা বুঝতে চাও না !

আমার একজন special নার্স আছে। তার নাম রেণী (Reni)। সে আমায় খুব ভালবাসে—আমার এ অসুখে প্রাণপণে সেবা কর্‌ছে। তার জন্তেই আজ এ বাধাবাধি নিয়মের ব্যতিক্রম করেও তোমায় চিঠি লিখ্‌তে পার্‌ছি। নইলে পার্‌তুম না নিশ্চয়ই।

এ কয়দিন আমার বেশ কষ্টে কেটেছে। কি যে ব্যথা, বেদনা তা' লিখে বুঝাতে পার্‌ব না। তা' ছাড়াও আরেক কাজ আমার পৃথিবীর কথা ভেবে মরা। যখন যুদ্ধে ছিলুম, তখন পৃথিবীর কথা ভাব্‌বার অবসর আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু এখন, নিরিবিলি বিছানায় শুয়ে থেকে আমার মনটা বড্ড দমে গেছে। কিন্তু তাই আমি নিজের কথা ভাব্‌বার মোটেই অবসর পাই না—যত ভাবি অন্তের কথা। তাই বলে তুমি মনে করোনা, যে তোমার কথা আমি ভাবিনে। আমি আমার আঘাতের কথাও ভাব্‌বার ফুরসৎ পাইনা—সবচেয়ে বেশী আমার তোমার স্মৃতিই মনের বনে উঁকি দেয়।

আমি ভাবি সেদিনের কথা, যেদিন তুমি আমি বেড়াতে [illegible] বোটে (Boat) করে। তুমি হালে বসেছিলে [illegible] দাড় টান্‌ছিলুম আর মাঝে মাঝে ব্যাকুল চাহনী দিয়ে তোমাকে আমার ব্যথার কথা জানাবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। তুমিও হয়ত আমায় মনের গোপন কথা জান্‌তে পেরে করুণ নয়নে চেয়েছিলে কিন্তু অন্তরের ব্যথা বুঝবার চেষ্টা করেছিলে কি না, কে জানে ?

যাক্‌,—তুমি আমাকে পদ্মবনে বোট নিয়ে যেতে আদেশ কর্‌লে কারণ, তোমার পদ্ম চাই, তুমি নিজ হাতে পদ্ম ছিড়্‌বে। আমি কত উৎসাহে তোমাকে পদ্মবনে নিয়ে গেলুম—আশা হচ্ছিল, এ পদ্মবনেই বোধ হয় তোমার আমার প্রথম—।

কিন্তু একটাও পদ্ম পেলুম না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে মোটরে উঠ্‌লুম। সোফারকে, বাজারে মোটর নিয়ে যেতে বল্‌লুম। সেদিন এক গুচ্ছ বাজারের পদ্মই তোমাকে উপহার দিয়েছিলুম, তার পরিবর্ত্তে তুমি আমার বাটন হোলে (button hole) একটি লাল টুক্‌টুকে গোলাপ পড়িয়ে দিয়েছিলে।

আমি ভেবেছিলাম—এই বোধ হয় আমাদের প্রথম প্রেম বিনিময়। এই লাল ফুলেই আমাদের আজ প্রথম মিলন ! ঐ লাল গোলাপ যেন আমার বুকের রক্ত হয়ে আমায় বল্‌ছিল—আজ আমি আমার বুকের রক্তে তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। এস ওগো আমার চির নূতন, চির পুরাতন অতিথি, তুমি আমার জীবনে এস ! আমাকেও জীবনে ধন্য কর।

কিন্তু হায় ! তোমার মনের গোপন কথাই আমি তো জানতুম না বুঝ্‌তে পারিনি। আমি যা'

ভেবেছিলুম, ভীষণ স্বার্থপরের মতই ভেবেছিলুম। আর কোন বিপরীত ভাব তো আমার মনে আসেনি। কিন্তু আজ ভাব্‌তে গিয়ে দেখ্‌ছি তুমি যে স'ত্যিই অন্য ভাব নিয়ে আমাকে গোলাপ উপহার দিয়েছিলে। এখনো সে ফুলটি আমি যত্ন করে রেখেছি তুমি পত্রগুলো রেখেছ কি না, জানিনে। হয়ত রাখ নাই।

হাঁ তোমার গোলাপ আমাকে এখন কি বলে জান! সে বলে—ভুল বুঝে আমায় বুকে ধরেছিলে। আমি তো তোমায় অভিনন্দন দিইনি? তোমার পবিত্র প্রেম, যা' পূত-অনবদ্য-শুভ্র, তা'কে পায়ে মাড়িয়ে গর্ব্ব ভরে চলে গিয়েছি—তোমার ব্যথার দানের প্রত্যুপহার দিয়েছি।

উঃ এত নিষ্ঠুর তুমি? কিন্তু এখন আর তো তুমি তা নও? এখন যে তুমি আমাকে বুকে স্থান দিয়েছ। তবু, নিষ্ঠুর বলে তোমাকে আর অপবাদ দিই কেন? কিন্তু মণি, একটু নিষ্ঠুর তুমি চিঠি দেবার বেলায়। এই তো, আজ ক' মাসের ভেতর কোন চিঠি নেই। এখন যদি তোমাকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিতে হয় তবে এই দোষটুকুর জন্যেই দেওয়া যেতে পারে।

বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি—একটু জল খেয়েনি'। উহ্‌ ঘামিয়েও তো উঠেছি! কিন্তু রুমাল যে একটিও নেই? এবার কয়েকটা রুমাল পাঠিয়ো তো লক্ষ্মী! পাঠাবে তো?

একটা কথা, যা' আমার মনে দিনরাত্রি উঁকি মারছে তা' আমাকে বড্ড অস্থির করে তুলছে। আমার মনে হচ্ছে কি জান? তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে। সেদিনও খুব দূরে নয়। আমার চারিদিকের আকাশ বাতাস অন্ধকার করে সেদিন ঐ আস্‌ছে। আমি জানিনা ইহা সত্য হবে কি না? যদি সত্যই হয়, তবে—তবে—উহ্‌ বুঝ্‌বে না তুমি, কি নিষ্করুণ ভাবে আমার বুকটা ভেঙ্গে যাবে তা' তুমি বুঝ্‌বে না।

স'ত্যি, আমিও দেখ্‌ছি—আমি কিছুতেই তোমাকে আমার সঙ্গে খাপ্‌ খাওয়াতে পার্‌ছি না। তুমি তো জান যে আমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব—সবই ওই দেহেতে বিরাজ কর্‌ছে। আমার জীবনের আনন্দ, সুখ, শান্তি সবই তোমার একটি কথার উপর, তোমার করুণার উপর নির্ভর কর্‌ছে। তবু তোমার এ ছল করে ছুটে চলা কেন প্রিয়?

তুমি আমাকে যখন চিঠি দাও, দেখি কোন সম্বোধন নেই। কেন তুমি ও রকম কর? এ যে তীর হয়ে আমার বুকে বিঁধে? আমি কত আশা করে তোমার ওই 'সম্বোধনার' অপেক্ষায় থাকি—কিন্তু কই, তুমি তো আমায় ডাক না। ডাক্‌বে কি? চিঠি লিখ্‌লে তো ডাক্‌বে? নিষ্ঠুর! আমাকে এ ভাবে দুঃখ দিয়ে তোমার কি লাভ?

আচ্ছা মণি, তুমি হয়ত আমাকে ভালবাস। হয়ত কি বল্‌চি—সত্যিই ভালবাস, করুণা কর। কিন্তু, তবু কেন চিঠি দাও না? আমার মনে হয়, তুমি আমার জন্য এতটুকু ভাব না—নইলে এ ভাবে প্রতীক্ষা করে করে কি নিরাশ হতুম? তুমি হয়ত কৈফিয়ৎ দিবে যে, লিখেছ—লিখে ডাকে দিয়েছ অথবা ডাকে ছাড়্‌তে ভুলে গেছ-কারণ, তুমি এখন বড্ড ব্যস্ত। কিন্তু আমার মনে তা' মোটেই খাপ খাচ্ছেনা। আমার অন্য রকম ভাবনাই হচ্ছে—অধিক।

প্রিয়া আমার!!! আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একটা ছবি বা ময়না ভেবোনা—আমাকে চিন্‌বার একটু চেষ্টা করো। তোমায় আমি কত ভালবাসি—তোমার করুণার আমি কতটুকু প্রত্যাশী—তোমার হুকুমের আমি কতটুকু বাধ্য-এগুলো একবার তলিয়ে দেখো। কোন দিকে আমার ছল চাতুরী নেই-দেখ্‌বে।

তুমি আমাকে করুণা কর না, একথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না। যদি নিতান্ত স্বার্থপরের মতও ভাব্‌তে যাই, তবু তোমার করুণাকে বাদ দিতে পারি না। আমি সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

তা' ছাড়া, আজকাল হাঁসপাতালে তুমি কত স্নেহেই না জানি রোগীদের শুশ্রূষা কর্‌ছ—সেবার ভার হাতে তুলে নিচ্ছ—তা' কি ভুলতে পারি? সত্যি, তোমার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এ ভাবে পেতে চেয়েছি।

আমাকে যে কোন কালে যুদ্ধে আস্‌তে হবে, খুন কর্‌তে হবে—তা' তো আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। কোন লোক্‌কে যে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কর্‌তে পারি, এ যে আমার ধারণারও অতীত। কিন্তু সবই আমাকে কর্‌তে হয়েছে, এ জীবনে সবই সহ্য হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

শান্তি চৌধুরী

"গ্রহের ফেঁড়"

শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ সাহিত্য রত্ন—

প্রভা শশব্যস্তে ব'লে উঠল, "কর্‌ছ কি, এখনি কেউ এসে পড়বে।"

বীরেন—আহা-হা এ ত আজ নূতন কিছু একটা কর্‌ছি না—রোজই একটু আধ্‌টু স্ফুর্ত্তি চাই কি না! স্বামীর স্বভাব প্রভার অজ্ঞাত ছিলনা—তাই সে তাড়াতাড়ি তার চোখ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌ল। এমন সময় কর্ত্তার গলার স্বর শুনে বীরেন—ভীত স্বরে বল্‌ল, থাক্ এখানে রয়ে আর কাজ নেই—বাবার গলার স্বর শুন্‌ছি তিনি বোধ হয় এখনি এসে আমাকে ধরে ফেল্‌বেন।

প্রভা—এখন কোথায় পালাচ্ছ—বাবাকে আস্‌তে দাও, তোমার মাত্‌লামির কথা এখনি বলে দিচ্ছি—দাঁড়াও।

বীরেনের মুখখানা একটু সাদা হ'য়ে উঠল—সে খানিক্‌টা আপনাকে সামলে নিয়ে সজল চক্ষে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলল—

প্রভা আমি মাতাল নই—মাতাল করেছ তুমি। তুমি আমার মাথাটা খেয়েছ—।

এই বল্‌তে বল্‌তে বীরেন বাড়ীর বাহিরে চ'লে গেল।

হৃদয়ে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে, হঠাৎ প্রভার চোখে জল এসে পড়্‌ল।

প্রভা অনেক কাল স্বামীর ঘরে এসেও সুখের সংসারকে সংসার ব'লে চিন্‌তে পার্‌ল না।

সে ব'সে থাক্‌তে পার্‌ল না—ঘরে গিয়ে শু'য়ে পড়্‌ল। তার বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ ফু'লে ফু'লে উঠ্‌ল।

ভগবানের রাজ্যের ভেতর সুখ ও দুঃখ, মানুষের এদের হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার জো মাত্রেই নেই। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কর্ম্মের ফলভোগ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। মোহিনী মোহন বাগ্‌চী আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে জমিদারীর উন্নতির জন্য এক সময় যথেষ্ট খেটেছিলেন—বৃদ্ধবয়সে এখন পুত্রের ব্যবহার দে'খে শুনে হাড়ে হাড়ে চ'টে সংসারের অন্ত কোণে এ'সে বস্‌লেন।

মোহিনীবাবুর আদি নিবাস হুগলি। তাঁহার পিতা, খুব বড় একজন জমিদার না হলেও নাম যশ সে সময় যথেষ্ট ছিল। মোটের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সময় নামজাদা লোক ছিলেন। জমিদারীর আয় হাজার ছাব্বিশ টাকার উপর ছিল।

বর্ত্তমানে মোহিনীবাবুর নাম নানা কারণে জেলার সর্ব্বত্র খুব বিখ্যাত। ধনের খ্যাতি ত তাঁহার ছিলই, তাহা ছাড়া মানেরও অন্ত ছিল না। জেলার অনারারী মেজিষ্ট্রেট্, নিজে বি, এল, তাহার উপর রায় বাহাদুর, এতগুলি খ্যাতি ছিল। জমিদার বংশের সন্তান হইয়াও জমিদারসুলভ আমোদপ্রমোদে মাত্রই তাঁহার রুচি ছিল না।

আজ প্রায় বছর দশ হ'ল মোহিনীবাবুর স্ত্রীর ৺গঙ্গা প্রাপ্তি হ'য়েছে। মোহিনীবাবু সংসারে মরমে মরিয়া একমাত্র পুত্র বীরেনের মুখের দিকে চে'য়ে গণার দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ছয়বার বি, এ ফেল হয়ে সাত বারে পাশ করে, ইয়ার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে কলকাতায়ই থাকৃত, দেশে বড় একটা আস্ত না। সে মনে ভে'বে ছিল সারা জীবনটা যদি বাবুয়ানা করে কে'টে যায় তা-হ'লে এ কাজ করলে ক্ষতিই বা কি?

মোহিনী বাবু পুত্রের এরূপ ভাব ভঙ্গি দেখে শুনে পরিণাম যে অতি ভয়ানক দাঁড়াবে ভাবতে লাগ্‌লেন।

মোহিনী বাবুর শরীরের অবস্থাও দিন দিন ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে আস্‌ছে। তাঁহার পূর্ব্বের মত উৎসাহ নাই, জমিদারীর কাজ কর্ম্মের ভার কর্ম্মচারিদিগের উপর রেখে পরপারের যাত্রার আয়োজনের জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখখানিতে যেন সর্ব্বদাই একটা করাল দুশ্চিন্তার ছায়ায় ছেয়ে ছিল।

পুত্র বধূ প্রভা শ্বশুরের স্বাস্থ্য দেখে শুনে আকাশ পাতাল ভাব্‌তেন। সময় সময় তার বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌ত।

একদিন সন্ধ্যার পর মোহিনী বাবু শয়ন কক্ষে বসিয়া প্রভাকে নানাপ্রকার বুঝ প্রবোধ দিচ্ছিলেন। অনেক কথার পর ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে বল্লেন—"মা যা হবার-তাত হ্‌য়েছে! আমার বিবেচনার এখন গত কথা ভুলে যাওয়াই মঙ্গল।"

প্রভা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে শ্বশুরের দিকে চেয়ে বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বল্‌ল—"বাবা, বুঝলুম না—"

"মা, এ সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না—বীরেনকে ক্ষমা কর, তবে সে আমার বাড়ীর ছেলে বাড়ী আস্‌বে।"

প্রভা কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠ্‌ল "বাবা, এ উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিলে অন্যায়ের পূজা করা হয়। আজ পাঁচ বছর যাবৎ দু'বেলা বেশ্যার অন্নে যাহার দেহের পুষ্টি হচ্ছে—পৈশাচিক কার্য্য যাহার খেলার বিষয় তাহাকে ক্ষমা তাহার পৈশাচিক কার্য্যকলাপ ভুলে যাবো—এ জীবনে নয়, পর জন্মেও ভুল্‌তে পারি কি না সন্দেহ।" মোহিনী বাবু পুত্রবধূর কথায় নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের মত একখানা ইজি চেয়ারের উপর ব'সে পড়্‌লেন। তাঁহার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন, বৌমা সংসারে সময় কাহার সমান যায় না।

প্রভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করল "ভগবানের ন্যায় দণ্ড হ'তে দূরে পালাবার জো কার?"

এমন সময় মোহিনী বাবুর দূর সম্পর্কীয়া এক খুড়িমা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল—"আরে মোহিনী, বলি সংসারটা কি বোকা, পাঁজি, বদ্‌মাইসদেরই আড্ডা? দয়া ধর্ম্ম বলে কি একটা জিনিষ নেই? দিনরাত্রি এখনো সত্যি যুগের মতই আছে! এখনো চন্দর সূর্য্যি উঠ্‌ছে! কল্‌কাতার গুণ্ডারা কি ভাবে যে চার পোয়া কলির রাজত্ব আরম্ভ করেছে। বলি, বীরেন এমন ভাল ছেলে হয়ে একটা মাগির জন্যে মাসে একশত টাকা খরচ কর্‌ছে। আর দেখ কি না কত কত গুণ্ডা মাগি মদে রাজার রাজত্ব উড়িয়ে দিচ্ছে। বলি দিদিমণি ভাগ্যে চাও ভাতারকে বশ করে নিয়ে আস্।"

মাথা হেঁট ক'রে দিদি শাশুরীর কথাগুলি ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রভার কত কথা মনে উঠ্‌ল। কত দিক

দিয়া সমাজের কত সংস্কার কত অনুষ্ঠানের আমূল উৎপাটনের প্রয়োজন আছে। একে একে মনে কত কথাই আস্‌ল। নিদারুণ হতাশের ভিতর সে স্থির কর্‌ল—এখন আর বাড়ীতে বসে থাকলে চলবে না — কলকাতায় কিছুদিনের জন্য থাকা যায় কি না ?

এমন ভাবে প্রভার বছর পাঁচেক কেটে গেল, বীরেনেরও কোন সারাশব্দ পাওয়া গেলনা—

সন্ধ্যা হ'তে কিছু বিলম্ব ছিল। বর্ষার-বর্ষণ-ক্লান্ত-আকাশে বিদায়োম্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচিত্র বর্ণে ও বিবিধ আকারে নিজেদের গঠিত ও সজ্জিত করিতে ব্যস্ত ছিল।

কল্‌কাতার সহরের সার্কুলার রোডের একটী বাড়ীতে প্রভার পিতা গুরুদাস লাহিড়ী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া বস্‌বাস্‌ করিতে ছিলেন। তিনি পল্লীবাসের উপর ছোট বেলা হতে বড় একটা অনুরক্ত ছিলেননা। এজন্য কল্‌কাতায় থাকা তাহার খুবই ভাল লাগ্‌ত।

এমন সময় একটী যুবক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গল্প করিতেছিল। তাহার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব আর কিছুই ছিলনা—কেবল রঙ্‌ উজ্জল শ্যামবর্ণ। বেশভূষার পরিপাট্য, হাতে ওয়েষ্ট-এণ্ড রিষ্টওয়াচ, বুক পকেটের ভেতর একটী সোনার বাঁধানো ফাউণ্টেন পেন্‌।

এমন সময় যুবকের পিঠে এক চর মেরে অন্য একটী যুবক চীৎকার করে বল্‌ল "তুই এমন লক্ষীছাড়া—এখানে কি করে এলি রে—"এ যে আমার ভাবী শ্বশুরের বাসা"—

"এঁ্যা আমার ভাবী শ্বশুর"—কেমন কথা বল্‌ছিস—আর একটা বে কচ্ছিস্‌ নাকি ! ভবেশ ?

ভবেশ—তবে এস আমার গিন্নির সঙ্গে দু'একটা আলাপ করে যাও। ভবেশের কথায় বীরেনের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না - সে অবাক হ'য়ে ভবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভবেশ অতি কষ্টে একটু হাসিল—তাহার মুখে হাসি ফুটিল না—

বীরেন—তবে চল তোমার ভাবী গিন্নির সঙ্গে আলাপ করে আসা যাক্‌—আচ্ছা ভবেশ, তোর শ্বশুরত আমায় দেখে কোন আপত্তি কর্‌বেনা ? তবে কিন্তু নাকাল হ'তে হ'বে ভাই।

তোর এই সব মন্তব্য শুনে কার না রাগ হয় ? বীরেন—"রাগ করোনা—তুমি যে একজন সাহিত্যিক সে জন্য আগ্‌থেকে নিজকে সামলায়ে নিতে হয়"—

মেঘ উঠ্‌ছে, সন্ধ্যাবেলা—ভবেশ বীরেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখ্‌লে অমলা আরক্ত মুখখানা নীচু করে একটু সলাজ হাসি হাস্‌ছে.........

অমলা আর হাসি চাপিয়া রাখতে না পেরে—ভবেশের মুখের দিকে তাকাইয়া—"ভবেশ বাবু—এ ভদ্রলোককে কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতবার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন"......

ভবেশ একটু ক্ষীণস্বরে বল্‌ল - ছেড়ে দাও অমলা তোমার বাচ্‌লামী—

ভবেশ বীরেনকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া-বল্‌ল "ভায়া-কি শরৎচন্দ্রের—ষোড়শীতে জীবানন্দ হয়েছ না কি—তবে এখন অভিনেত্রী চারুশীলা কোথা" ?

অমলা নিজের হাসিটা সাম্‌লাইয়া উঠ্‌তেই অনেক ব্যস্ত ছিল। বীরেন অপরিচিত স্থলে একটু লজ্জিত হ'য়ে কৈফিয়তের স্বরে বলে উঠ্‌ল - আচ্ছা ভবেশ আজ তুমিই—শিশির কুমার হয়েছ—তাতে দোষ কি, আমি যে চিরদিনই শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ হয়ে বসে আছি।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—বোস্‌ বোস্‌ এখনি তোকে লাল সরবৎ খাওয়াচ্ছি আর আমাকে জীবানন্দ সেজে শিশিরকুমার হবার জন্য তোর জেদ কর্‌তে হ'বে না।

ভবেশ সিগারেট গণ্ডায় গণ্ডায় ধ্বংস করিয়া আর সময় সময় টেবিলের উপর পা দু'খানা উঠাইয়া দিয়া—সংসারের হাসি খেলার গল্প জুড়িয়া দিল—অমলা সিলিংএ আটা ইলেক্‌ট্রিক্‌ ফেনের সুইচ টিপিয়া দিল। খানসামা আসিয়া টেব্‌লের উপর দু'জনের চা ও

খাবার গুলি সাজাইয়া যাইতেছিল মাঝখানে বীরেন এক 'পেগ্' (গেলাস) হুকুম চালাইতে লাগিল।

ভবেশ হাসিয়া বলিল—বেশ জীবানন্দ এক পেগ কেন এক বোতল হ'লেই ভাল হ'ত, সারারাত অবাধে চলে যেত।

বীরেন—তোর্ কি কোন আপত্তি করবার আছে—যদি থাকে তবে বেশ খোলাকথা বলে ফেল ভায়া—একটু আধ্টুকু ফুর্ত্তিটুর্ত্তি কর্ত্তে চাই কিনা না তা ছাড়া আর পোণে ষোল আনা জীবানন্দ হ'তে পারলাম কই ?

শরৎচন্দ্র যে মিথ্যা হ'য়ে যাবে।

যদি ভায়া একবার স্বাদ পাও তা হ'লে চিরজীবনের মত জীবানন্দ সেজে যেতে পার্‌বে বই কি ?

অতি অল্প সময়ের মধ্যে খানসামা বীরেনের হুকুম তামিল কর্‌তে কসুর কর্‌ল না।

ভবেশ বীরেনকে দু'মিনিটের কথা বলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। অমলা বীরেনের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছিল, মধ্যে মধ্যে ঠাট্টা তামাসাও হইতেছিল—বীরেন সময় সময় কল্পনার নেশা ছেড়ে চির অভ্যস্ত নেকা সেজে রসিকতার চেষ্টায় রহিল—সে দিন শুক্ল পক্ষেরই রাত্রির—জ্যোৎস্না প্লাবিত—বীরেন চকিতে চাহিয়া দেখ্‌ল—অপূর্ব্ব রূপবতী যুবতী, ধীরে ধীরে দরজার পর্দ্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

বীরেন—যুবতীর দিকে তাকাইয়া আর চাহিতে পারিল না—যুবতীর চোখে একি লক্ষ্যহীন শূন্যদৃষ্টি ;

বীরেন ভাব্‌ল একি অপ্রকাশিত আহ্বান, বীরেন আবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল—যদি দয়া করে দেখা দিতে এসেছেন তবে বসুন। যুবতী অতি কষ্টে নিজকে সামলাইয়া লইয়া পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পা দু'খানার উপর মাথা রাখিল। অতীতের শত সহস্র কথা তার মনে জেগে উঠ্‌ল—

এমন সময় ভবেশ আসিয়া একখানা চেয়ার দখল কর্‌ল। অমলা এক ধারে চুপ ক'রে বসে রইল—

বীরেন—কি হে ভবেশ প্রাণঢালা সঙ্গীত একটুকো চাই কিনা ? তাতেও কি তোমার আপত্তি আছে ? তবে কেন সাহানা দেবীর একটা গান গাওনা ?

ভবেশ—পিয়ানো বাজাইতে ছিল—যুবতী গাইতে লাগ্‌ল—

মাঝি ! এবার তোমার আপন হাতে বেয়ে চল দাঁড় ?
তোমার হাতেই কাণ্ডারী গো ? দিলাম সকল ভার ?
এখন— ইচ্ছা তোমার ফ্যালো ধরো,
দুঃখ দেখে আদর করো,
আমি শুধু চাইব তোমার চরণ পারাবার ?
বইব তোমার দত্ত সুধা,—ঝরুক অশ্রুধার ?
কুলের কথা ভুল্‌লে যে মন ভাস্‌ল্ অকূলে,
তুমি এবার বাওগো তরী, হালটী নাও তুলে ?
এবার— তোমার স্নেহ পীযুষ ধারায়
সিক্ত কর রিক্ত আমায়
না হয়— কেড়ে নিয়ে সকল বালাই মারো বারম্বার?
জানব— এই তোমারি পারের কড়ি নিলে কর্ণধার !

যুবতীর প্রাণ ঢালা সঙ্গীতে বীরেন আর স্থির থাকৃতে পারল না ; সে চেয়ার ছাড়িয়া বাহিরে গেল... ভবেশ ও হাস্‌তে হাস্‌তে বীরেনের সঙ্গে বাহিরে এল —রক্ত মাংসের মায়া—বাবা বড় ভয়ানক জিনিষ হে............

বীরেন—যাঃ যাঃ ওসব বাজে কথা কেন বলছিস সত্যি সত্যি মেয়ে মানুষটার গলার স্বর বেশ মিষ্ট। এর দর্শনী কত দিতে হবে.........

এ তোমার কি হয় ভবেশ—

ভবেশ—বীরেনের কথায় চুপ ক'রে রইল ; তারপর একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বল্‌ল—ইনি একজন সাহিত্যিকা তাই এখানে এত আসা যাওয়া।

বীরেন—আর ন্যাকা সাজতে হ'বে না। যুবতীর সৌন্দর্য্য বীরেনের হৃদয় বড়ই অভিভূত করিয়া তাকে অতিষ্ঠ করে তুলিল। যুবতীর প্রাণ কবিত্বপ্রবণ, সংসারের কোন সাধই তাঁর জীবনে মিটেনি, কত

আশা নিরাশার কথা যুবতীর বুকে গুমড়িয়া উঠিতেছিল।

বীরেন চেয়ে দেখল ভবেশের মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে। হঠাৎ সে গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—বীরেন আজ তবে এখন আসি কাল বৈকালে তোমার এই নূতন পরিচিতা সাহিত্যিকাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে যাওনা কেন ভাই— ?

বীরেন—সে যে তাহার সৌজন্য—আচ্ছা, ইনি কি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্ব্বেন—

ভবেশ—প্রাণের সঙ্গে যদি এর ভালবাসার কোন সম্বন্ধ থাকে তবে কি ইনি তোমার জন্য এত আকুল হন।

বীরেন—ইনি কি সত্যি আমাকে ভালবেসেছেন ইহার সঙ্গে ত আমার পূর্ব্বে আর কখনো দেখা হয় নি, তবে কেমন করে ভালবেসে ফেল্লেন.........

ভবেশ—যাকে যে ভালবাসবে তার কি বহুদিনের চেনা জানা আবশ্যক--মাত্র চোখের এক মিনিটের দেখায় সব হয়।

বীরেন—আচ্ছা যদি তিনি আমাকে ভালবেসে থাকেন তার পরিচয় পেলুম কোথায় ?

ভবেশ - যদি তোমার ভালবাসা না চাইতেই এসে থাকে তবে তোমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল কেন ?

প্রমাণ চাও তবে এখনি তোমায় দিচ্ছি—

প্রণয়িনী প্রণয়ীকে ভাঁড়ানো.........আজ দেখছি তোমার কাছে এতটা নূতন।

ভবেশ—তুমি জান আমি মাতাল, আমি প্রভাকে প্রত্যাশিত আশায় বঞ্চিত করে চির জীবনের জন্য রেখেছি—কিন্তু পরস্ত্রী দর্শনে আমার সৌজন্যের কিছুই নাই তবে আজ ইহার একটা গান শুনে আমার অনেক দিনের লালসার বহ্নি জলে উঠল।

ভবেশ—তুমি কি প্রভার জন্য সত্যি ভাব ? ভবেশের কথায় বীরেনের স্বরটা কেঁপে উঠল। তারপর সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—প্রভার জন্য ভাববার কি অ'ছে ভবেশ—বাবার অজস্র বিষয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক প্রভা—তবে জীবনের চরম দুর্ভাগ্য একমাত্র স্বামী সুখ—সেটা হচ্ছে আমার অদৃষ্ট প্রভার হাতের লেখা বলতে হ'বে।

ভবেশ—শুনে সুখী হলুম, তুমিত প্রভার জন্য ভাবো ; আচ্ছা ক'বছর যাবৎ তোমাদের উভয়ের দেখা শুনা নেই—

বীরেন একটু শ্লেষের স্বরে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—ছেড়ে দাও ওসব বাজে কথা ! দিব্বি আরামে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি—"আচ্ছা তবে এখন যাওয়া যাক্" ভবেশ—

কাল একে নিমন্ত্রণ করে যাওয়াই ভাল—আমি এখানে দাঁড়ালুম তুই গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আয়—

সে রাত্রে বীরেনের ভাল নিদ্রা হল না—কাহার জন্য প্রাণ যেন...... কল্পনার রাজত্বে বাস কর্ত্তে ছিল—ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"বাবু, আপনাকে ভবেশ বাবু রাস্তায় ডাক্‌ছেন"।

বিছানা থেকে চট্ করে উঠে রাস্তায় ভবেশের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেল। ভবেশ ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়ে—গাড়ীতে গিয়ে বসে—গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বল্‌ল—

ভবেশ বিদায় দিয়ে বারান্দার একখানা ইজি-চেয়ারের উপর বসে—তারপর ধীরে ধীরে এন্‌ভেলাপ খানা ছিঁড়ে দেখল সেই যুবতী......চিঠির শেষে লেখা ছিল "সেবিকা তোমার হাসিরাশি দেবী"—

বীরেন আর বারান্দায় বসে থাক্‌তে পার্‌লোনা—সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে—আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিল। এমন সময় ঝি আসিয়া একটা তার বাবুর হাতে দিয়ে—অন্য কাজে চলে গেল। তারে লেখা ছিল,

Daughter-in-law died yesterday at 4-50 P. M.

"Father"

বীরেন চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্ল—প্রভা প্রভা আমায় ছেড়ে পালালে—আমি যে তোমার ঋণ শোধ করবার সুযোগ এ জীবনে পাই'ন—তবে আমাকে ঋণী করে মর্ত্ত্যে রেখে গেলে……শোক সন্তপ্ত বীরেন বেদনার পীড়নে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লোনা—

সে যে নারীর প্রেমের অপমান করেছে - প্রভা যে বড় অভিমানী ছিল—অর্দ্ধ মুদ্রিত চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে টেবিলের উপর তার দৃষ্টি পড়্‌ল -

সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ছিপি খুলিয়া একটা গ্লাসে ঢালিয়া—খোস্ মেজাজী সাজ্‌ল—।

সংসারের সুখ দুঃখ কিছু সময়ের জন্য লাঘব করে অজ্ঞান অচেতন হ'য়ে বিছানার উপরে শুয়ে পড়্‌ল—।

সন্ধ্যার সময় ভবেশ একখানা গাড়ী করে—নিমন্ত্রিতা সাহিত্যিকাকে নিয়ে বীরেনের বাসায় আস্‌ল—

বীরেন—স্বপ্ন থেকে জেগে উঠ্‌ল—সারাদিন সে মদে বিভোর ছিল, তাই সে খাওয়া দাওয়ার জন্য ভাবে নাই—ভাববারও সময় ছিল না—

একেত মাতাল—প্রভার মৃত্যু সংবাদে একেবারে মরমে মরে গিয়েছে—

ভবেশ ও যুবতীকে দেখে বীরেনের চোখ দিয়ে - বড় বড় অশ্রু ফোঁটা ঝরে পড়্‌তে লাগল—

ভবেশ বীরেনকে দু'হাত দিয়ে জরিয়ে ধরে তার কোলের উপর মাথা রাখ্‌ল—যুবতী তখন বেশ বুঝতে পার্‌ল—"বীরেন ও প্রভার মধ্যে কতখানি ভালবাসা ছিল"—

যুবতী প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে একটু গর্ব্ব অনুভব কর্‌ল—

বীরেন মুখ তুলে অশ্রুধারা অঞ্চলে মুছে রুদ্ধ স্বরে বল্‌ল—আপনারা বসুন্ আমি এখনি আস্‌ছি—কম্পিত পদে ড্রইং রুমে প্রবেশ করে - দু'একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইল তারপর একটা কৌটা হ'তে—একটা কাল রঙএর দু'টা গুলি একসঙ্গে গিলিয়া ফেলিল—ভবেশ অনেকক্ষণ বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে বীরেনের বিবর্ণ মুখ দেখে ভয়ে শিহরিয়া উঠ্‌ল—……চীৎকার করে ডাক্‌লে—আর বসে আছেন কেন সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—বীরেন আফিম খেয়েছে—যুবতীর মনে হ'ল পৃথিবী যেন চক্রের ন্যায় তাহার পায়ের নীচে ঘুরছে কম্পিত চরণে—তার ওষ্ঠভেদ করে একটা শব্দ বের হ'ল—"মাগো কে আছ আমার"

বারান্দায় ঝি-চাকর বসে আলাপ কর্‌ছিল—কক্ষে কান্নার স্বর শুনে একে একে সকলেই হাজির হ'ল—

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

ভবেশ সকলকে ধমক্ দিয়ে বল্‌ল—এখনও দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ "ডাক্তার ডাকো"—বাবু বিষ খেয়েছে—

ঝি—ভবেশের কথা বুঝতে পাচ্ছিল না—ভবেশ আবার একটু চেচিয়ে বল্‌ল—এখন দৌড়িয়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এসো জীবনের আশা আছে—ভয় কি!

প্রভার নয়নের কোণে দু' বিন্দু অশ্রু চক্ চক্ করে ঝল্‌সে উঠ্‌ল—ভবেশ ভাই তুমি আমার কি শত্রুর মত না কাজ করে ফেল্লে—এমন সময় ডাক্তার নিয়ে ঝি আস্‌ল ডাক্তার বীরেনের অবস্থা ভাল করে দেখে বল্‌ল—আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই—এখনি আর একজন ডাক্তার ডাকুন। তারপর লোকে অধীরা প্রভার দিকে ফিরে চেয়ে বল্‌ল—ইনি বোধ হয় আপনার স্বামী—……

প্রভা ব্যথিত দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর রেখে—নীরবে দু'টা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"ঝি শিগ্‌গীর ডাক্তার ডাক"—

ভবেশ উত্তর কর্‌ল—"ডাক্তার ডাক্‌তে গিয়েছে"—

কক্ষের সকলেই নীরবে ডাক্তারের চিকিৎসা দেখ্‌তে লাগল সে রাত্তির—ডাক্তারদের আর বাড়ী যাওয়ার অবসর হ'লনা। পরদিন বেলাও এম্‌নিভাবে কেটে গেল—বীরেনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না—।

রাত্রি আটটার পর একবার চোক মেলে চেয়ে—তারপর চোখ মুদ্রিত কর্‌ল—

সকলেই মনে কর্‌ল এখন জীবনের আশা কল্পা

যায়—সে রাত্রির জন্য ডাক্তারদের বিদায় দিতে চাহিল—কিন্তু প্রভার একান্ত অনুরোধে কাহাকেও বিদায় দেওয়া গেল না।

সকাল বেলা গুরুদাস বাবু—বৈবাহিক মোহিনী বাবুকে সঙ্গে করে—বীরেনকে দেখতে আস্‌ল—

ডাক্তারদের আদেশানুসারে ভবেশ ছাড়া সকলের আসা নিষেধ হ'ল—কারণ হঠাৎ প্রভাকে চিন্‌তে পেরে হার্টফেল কর্ত্তে পারে—গুরুদাস বাবুর ও মোহিনী বাবু প্রভাকে নিয়ে বাসায় আস্‌ল—এমনি ভাবে সপ্তাহ কয়েক কেটে গেল। বীরেন এখন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে—তার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ সর্ব্বদা থাকে—

যখন বীরেন একটু ভালর দিকে আস্‌তে লাগল তখন ভবেশ একদিন একটু হেসে বল্‌ল—আসছে কাল তোমার স্ত্রীর আদ্য শ্রাদ্ধের দিন—আমি তোমার বন্ধুবান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি—

বীরেন কিছুক্ষণ নীরবে থেকে তারপর বল্‌ল—বেশ করেছ তোমার সেই সাহিত্যিকাকে কিন্তু নিমন্ত্রণ কত্তে ভুলে যেওনা—সঙ্গে যেন তার ছোট বোন অমলাদেবীকে ও নিয়ে আসেন।

ভবেশ একগাল গম্ভীর হাসি হাসিয়া বল্‌ল—সে সব দিকে আমার মাত্র ভুল হ'বেনা—তুমি কিন্তু ভুলে যেওনা—

ভবেশ ভাবছিল এই হাস্যময় যবনিকা শেষ বোধ হয় এখানেই। "মানব জীবনের অনেক ভুল"—তাই সে কথাটা মনের ভেতর চেপে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল—পরদিন দু'পুরবেলা নিমন্ত্রিত সকলেই আস্‌ল পুরোহিত ঠাকুর ভবেশের আদেশানুসারে বীরেনকে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পড়াইলেন। গুরুদাস বাবু ও মোহিনী বাবু বাসার সকলকে নিয়ে আসলেন।

প্রভার দিকে চেয়ে বীরনের চোখে যেন দামোদরের বান ডেকে উঠল।

প্রভা খিল খিল করে হেসে বলল—মরা মানুষ যে বেচে এসেছে—আর শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে হবে না।

"এ যে তোমার আমার গ্রহের ফের" ॥



ভিখারিণী—পদ্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। আমরা এই কবিতা গ্রন্থখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। সকল কবিতাই প্রসাদ-গুণ-যুক্ত—ইহাতে হেঁয়ালি নাই। রাবীন্দ্রিক যুগে কবি আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। কৃতিত্বের পরিচয়, বিশ্বপ্রেম, অতিথি, তমসো মা জ্যোতির্গময়, এসো, আনন্দ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান—বী প্রেস, ৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।



শিক্ষার ত্রিধারা!

ণ সেন গুপ্ত।

এ সংসারে সবাই শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করে,শিক্ষিতের মুখে দু'টো কথা শুনতে চায়, শিক্ষিতের সঙ্গে মিশ্‌তে পারলে আপনাকে ধন্য মনে করে। কিন্তু শিক্ষা কি, প্রকৃত শিক্ষিত কে, তাহার ঠিক ধারণা প্রায় অধিকাংশেরই নাই। শিক্ষার বিকৃতিকেই তারা প্রকৃত শিক্ষা ভাবে। শিক্ষিত বলে তারা যার পায় শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে যায়, সে হয়ত শিক্ষিতের একটা বহিরাবরণ, তার ভিতরটা গোপন করে মানুষকে পদে পদে ঠকায়; তার বিদ্যার বুলির বাষ্পের মাঝে আপন ঘৃণিত স্বভাবটাকে অতি সহজেই গোপন করে ফেলে। সাধারণ লোক আত্ম-হারা হ'য়ে যায় পিছনে ছোটে, সে জানেনা আত্মীয় বোধে 'আলাদীনের' মত কোন দৈত্যের পিছনে ছুটেছে। যখন চমক ফিরে, তখন আর ফিরবার পথ খুঁজে পাওয়া ভার হ'য়ে ওঠে।

এক দল লোক আছে, তাদের ধারণা যে যত বেশী পড়েছে, যে যত বেশী জেনেছে, সেই তত বড় শিক্ষিত। তাই যখন শাস্ত্রের দুরূহ শ্লোকগুলি কেউ আওরায়, দর্শন, বিজ্ঞান জ্যামিতির সূত্রগুলি অনর্গল বলে যায় হোমার, সেক্সপীয়র, মিল্টন কিম্বা অস্মদ্দেশীয় মহাকবি বাল্মিকী, বেদব্যাস, কালিদাসের কাব্য হ'তে দুচারটা বচন উল্লেখ করে, এ দলের লোক তাদের পানে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, ভাবে, অগাধ পাণ্ডিত্য তাদের ভিতরেই আশ্রয় নিয়েছে। এদের বক্তৃতায় তারা মুগ্ধ হ'য়ে বাহবা দেয়, চলনভঙ্গীতে পণ্ডিত্যের রস ধারা দেখতে পায়, এরা যে পথ দিয়ে চলে, আপন অঙ্গে সেথাকার ধুলি মেখে নিজকে কৃতার্থ মনে করে। জানেনা এ শিক্ষিত গণ (?) (অবশ্য সকলে নয়) নিজকে প্রচার কর্‌বার জন্যই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শিখে নেয়। তারা যখন বক্তৃতা করে, তখন মাঝে মাঝে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে, কেউ সে কথায় আকৃষ্ট হচ্ছে কিনা; শ্রোতৃ-মণ্ডলীর বাহবা পেলে মনটা খুশী হ'য়ে ওঠে, ভাবে জীবনটা সার্থক হ'য়ে গেল। কিন্তু যেখানে নাম, যশ লাভের জন্য শিক্ষা, তা অতি অধম শিক্ষা। এরা অনেকেই নিজেদের চরিত্র হয়ত সংশোধন করতে পারে নাই কিন্তু লোককে চরিত্রবান হওয়ার জন্য জলদ-গম্ভীর স্বরে উপদেশ দেয়। নিজেরা হয়ত অতি হীন স্বার্থপর, পরকে তারা স্বার্থশূন্য হতে উপদেশ দেয়। তারা চায় 'নাম'। নাম, যশের জন্য তাহারা অতি কলুষিত কার্য্যেও লিপ্ত হ'তে দ্বিধা বোধ করেনা। এদের উপদেশও অনেক সময় অস্পষ্ট স্বার্থবোধক থাকে। কতকগুলি শ্রুতি মধুর বাক্য চ্ছটায় শ্রোতাকে সম্মোহিত করিয়া ধীরে ধীরে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। এরা বাহবা চায়, যশ চায়, এর জন্য সব করতে পারে, কিন্তু যে পথে নাম যশ নাই, সে পথ সর্ব্বমঙ্গলকর হ'লেও তা'দের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এরা শিক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই, তাই 'বাহবার' জন্য তাদের মিথ্যা আস্ফালন নিতান্তই বৃথা। এনাম যশের কি মূল্য? এ শিক্ষা অধম শিক্ষা।

আরেক দল শিক্ষিত লোক আছে, যারা নামও চায়, কাজও করে। এরা সত্য সত্যই দশের উপকারের জন্য ব্যস্ত হয়, পরের জন্য প্রাণ দিতেও পারে কিন্তু নাম-মদিরা পেলে খুশী হ'য়ে ওঠে। এদের প্রাণে যা' পড়েছে, পরের হিতের জন্য এরা ব্যস্ত। তবে দু'একটা নামের সুযোগ পেলে এরা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে পরে। এক হাতে নামের মদিরা, আরেক হাতে কাজের বিষাণ। এরা কাজের স্রোত-ধারায় সবেগে ছুটে চলেছে, তবু নামের ঘূর্ণাবর্ত্তে পরে একটু বিহ্বল হ'য়ে পরে। এ ধরণের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যম থাকের লোক।

জগতে আরেক শ্রেণীর লোক আছে, যারা নাম যশের প্রার্থী নয়। নাম যশের হিসাব করে তারা জগতের কাজে

অগ্রসর হয় না। পূর্ণ জ্ঞান তাদের ভিতর বিকাশ পেয়েছে, আত্মানন্দে তারা আপনাহারা। তাদের লোকের কাছে বলে বেড়াতে হয়না ওগো আমাকে দেখ, আমি কত বড়'। তারা আপনাদিগকে লোকালয়ের বাহিরে, গভীর বনে কিম্বা পর্ব্বত গুহায় প্রচ্ছন্ন রাখতে চায়, কিন্তু মানুষ তাদের খুঁজে বাহির করে নেয়। তারা গোপন থাকতে চায় গোপনে, সে গোপন-বিহারীর প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয় কিন্তু মানুষ তাদের গোপনে থাকতে দেয়না। তাদের হৃদয়ের পরিচয় আপনা হ'তে দিকে ২ প্রসারিত হয় আর মধুলুব্ধ মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে লোক তাদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়। তারা নাম যশ চায়না, মান সম্ভ্রম চায়না, এসব তাদের পায়ের তলায়। যে আনন্দের উৎস তাদের হৃদয়ে উৎসারিত, নীলকণ্ঠের মত জগতের গরল পান করেও তারা অমর। লেখাপড়ার জ্ঞান, যাকে সাধারণ লোকে 'শিক্ষা' বলে হয়ত তাদের কেউ করে নাই, তবু তারা যে শিক্ষার ধনে ধনী, জগতে তার তুলনা মিলেনা। শিক্ষার সার তারাই পেয়েছে। শিক্ষা তাদের মাঝেই সফলতা লাভ করেছে। মানুষ এ স্তরে উঠ্‌তে পারলেই ধন্য হয়ে যায়। তার আর কিছুই চাওয়ার থাকেনা। তারাই উত্তম ও প্রকৃত শিক্ষিত।

জগতে এই তিন শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে যারা নামের কাঙ্গাল নামের ফেরি করে বেড়ায় তাদের চেয়ে লেখা-পড়াজ্ঞানশূন্য মূর্খ চাষার দল ঢের ভাল। তাদের ভিতর সরলতা আছে এবং জগতের কাজে নিজ শক্তিকে প্রাণ পণ করে খাটাচ্ছে। কিন্তু অসরল প্রবঞ্চনা পরায়ণ, যশের কাঙ্গাল, শিক্ষিত নামধারী লোকগণ জগতকে শুধু মিথ্যার পথে নিয়ে চলেছে। যদি আত্মার ও জগতের মঙ্গল সাধন করতে হয়, তবে এই নাম যশের কাঙ্গালবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। সত্যের পথে, আনন্দের পথে নির্ব্বিকার চিত্তে নীরব সাধনা করে অগ্রসর হ'তে হবে। তা'হলেই শান্তি পাওয়া যাবে। নতুবা মিথ্যা নাম যশের প্রলোভনে অসত্যের পথে, অক্রুরের পথে যেতে যেতে এমন একখানে এসে ঠেক্‌তে হবে, যেখানে এই মিথ্যা যশ, অপযশ হ'য়ে কাঁধে চেপে বস্‌বে।

বীণার অন্যতম কার্য্যদক্ষ শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গের নিকট গভীর বেদনা জানাইতেছি।

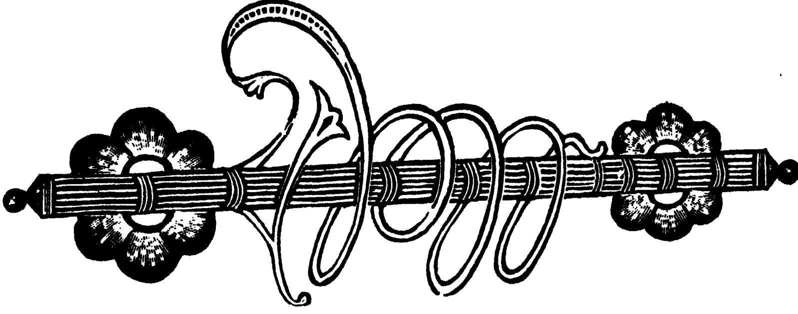
সঃ বীঃ—

ঢাকা,—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে, শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।



ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনীর উপলক্ষে

কবি-সম্রাট্ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ]　　　অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।　　　[৩য় সংখ্যা

আগুণের প্রীতি।*

শ্রীকুমুদ-রঞ্জন মল্লিক

সুদূর সুদূর অরোরার দেশ
পরিধানে পুরা বিদেশীর বেশ
বিজাতীয় ভাষা সভ্যতা লয়ে
　　চলেছি জাহাজে চড়ি,
উদ্বেল নীল সাগরের জল
কল কল্লোলে ছুটে অবিরল;
অর্থবিহীন শব্দের রোল
　　শ্রবণ দিতেছে ভরি।

বিদেশ বিদেশ একেবারে পর,
নাই চেনা মুখ, নাই চেনা স্বর,
সহসা কেমনে চমকি উঠিনু
　　পরিচিত সুর শুনি,
বন্দরে এক জাহাজ উপর
ছুটিছে মাল্লা লোক লস্কর,
তাদেরি কণ্ঠে শুনিতে পেলাম
　　আগুণ আগুণ ধ্বনি।

ছোট দুটী কথা তাও ভীতিময়
এলো মোর কাছে হয়ে প্রীতিময়,
নয়নে আবার ফুটায়ে তুলিল
　　গোটা বাঙ্গলার স্মৃতি,
ভয়ের পিনিষে কি করিয়া হায়
এত মধুরস ঢেলে দেওয়া যায়,
ভয়াল কণ্ঠে কে দিল এমন
　　হৃদয় ভোলানো গীতি।

বঙ্গভাষারে আগুণের মাঝ
সীতার মতন নেহারিনু আজ
হেরি উজ্জ্বল সোণার বাঙলা
　　আঁখি জলে এলো ছেয়ে,
মাতৃভাষা! কি দারুণ টান
এক করে দিল অচেনা পরাণ
মরি লজ্জায় বিদেশীর দল
　　হাসে মুখ পানে চেয়ে।

* কোনো বঙ্গমহিলার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছিলাম। তিনি সুদূর নরওয়েতে এক পৃথক জাহাজে চাটগাঁর খালাসীগণের মুখে 'আগুণ' 'আগুণ' শব্দ শুনিয়া বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হন, ভাষার টান এমনি মধুর।

গল্প নয়।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। শাহান শা তখনও দরবারে বসিয়া আছেন। সম্রাটের বয়স ত্রিশ বৎসর—পূর্ণ যৌবন। শরীরে অসীম শক্তি, মনে অসাধারণ সাহস, প্রাণে সজীবতার, উৎসাহের, উদ্যমের আর অন্ত নাই, মুখখানি সর্ব্বদা আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

সহসা চর আসিয়া দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কুর্নিশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। সম্রাট মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর? চর বলিল—গোপনে বল্‌তে চাই, জাহাপনা!

সম্রাট বলিলেন,—এখানেই বল—এখানে সকলেই অন্তরঙ্গ দরবারী।

চর বলিল, জাহাপনা, ইব্রাহিম হোসেন আজ সম্রাটের হিতকামী রোস্তমকে বধ করেছে—সম্রাটের হিতকামনাই ছিল তাহার একমাত্র অপরাধ। আর এমনি দুঃসাহসী এই হত্যাকারী যে মাত্র আট ক্রোশ দূর দিয়ে সদলবলে সে চলেছে,—যেন সম্রাটকে সে গ্রাহ্যই করে না!

ক্রোধে সম্রাটের সুগৌর মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—পর মুহূর্ত্তেই আর তাহা দেখা গেল না, কেবল বলিলেন—বেশ, তুমি যেতে পার।

চর কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র সম্রাট ডাকিলেন,—শাহাবাজ!

নিঃশব্দে দরবারীগণের মধ্য হইতে একটি যুবক উঠিয়া আসিয়া নতবদনে কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল।

সম্রাট বলিলেন—দুপুর রাত,—ঘুমাতে চাও, না ঘোড়া ছুটাতে চাও?

শাহাবাজ মৃদু হাসিয়া বলিল—ঘুমায় স্ত্রীলোকে, জাহাপনা, কোন দিকে যেতে হবে?

সম্রাট সস্নেহে তাহার পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—আজ ভোরে ভগবান দাস, মানসিংহ, কুলি খাঁ, খাঁ বার্হা, আরও সব গেছে মির্জ্জাদের দমন কর্ত্তে। তুমি এক্ষণি ঘোড়া ছুটিয়ে যাও—বল্‌বে সব যেন সারনালের দিকে যায়, এই ইব্রাহিমের দমন আমি চাই সকলের আগে।

"জাহাপনা, ভগবান দাস এরা কোন দিকে গেছে?"

'জানিনা, রওনা হওয়ার পরে আর কোন খবর পাইনি, তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।"

"জো হুকুম" বলিয়া সেই নির্ভীক যুবক সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সেই অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত অবস্থায় ভগবান দাসের দলকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেল।

দরবারীগণের দিকে চাহিয়া সম্রাট বলিলেন—"ইব্রাহিমের দমনের সম্মান পাবে, ভগবান দাসের দল, না আমরা?"

দরবারীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমরা—আমরা। মুহূর্ত্তে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—কোষে তাহাদের অসি ঝনৎকার করিয়া উঠিল!

সম্রাট খুসী হইয়া বলিলেন,—সাবাস বীরগণ! কিন্তু এক্ষণি নয়, শেষ রাত্রে। রাত দু' ঘড়ী থাক্‌তে রওনা হবে—সবাই তৈয়ার থেকো। একেবারে খাস চাকর দু' একজন ছাড়া সঙ্গে আর বেশী লোক নেওয়া নিষেধ।

এই সম্রাট যে সম্রাট আকবর তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। স্থান গুজরাট, আহমদাবাদের নিকট,—কাল ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি—উপলক্ষ আকবরের প্রথম গুজরাট অভিযান।

কৌতূহলী পাঠক বেভারিজ কৃত আকবরনামার অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে পড়িয়া দেখিতে পারেন যে উপরে লিখিত একটি ঘটনাও অনৈতিকহাসিক বা কাল্পনিক নহে।

২

প্রহরখানিক পরে রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকা অবশিষ্ট থাকিতে নিঃশব্দে তাঁবুর বাহিরে বিলম্বাসহিষ্ণু অশ্বারোহী বীরগণ একে একে সমবেত হইতে লাগিলেন—আবদাল্লা, জালাল খাঁ, রায়শাল, মথুরা দাস, আদম্ তাজবন্দ্ এবং আরও পাঁচ সাত জন।

ধীরে নাতিদীর্ঘ, বলদর্পিত, বিশাল বক্ষ একজন যুবক নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, —প্রতি পাদক্ষেপে যেন তাহার অঙ্গ হইতে সেই অন্ধকারেও রাজশ্রী ফাটিয়া পড়িতেছিল—রাজটীকা ললাটে পরাইয়াই যেন বিধাতা তাহাকে ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। পিছনে পিছনে অনুচর দৃপ্ত অশ্বের বল্গা ধরিয়া আনিল। সকলে নিঃশব্দে মাথা নত করিয়া যুবককে অভিবাদন করিল।

যুবক মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কয়জন?

তেমনি স্বরে আদম তাজবন্দ্ উত্তর দিল—এগার জন।

"বেশ,—দিলাওয়ার খাঁ, তাঁবুর পাহাড়ায় থাক।"

অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু এই আদেশ শুনিয়া দিলাওয়ারের মুখখানা যে মলিন হইয়া গেল, তাহা তাহার নত বদন দেখিয়াই বুঝা গেল।

"জাহাপনা, এ বান্দাকে বিনা দোষে সঙ্গে যাইবার সম্মান হইতে বঞ্চিত করিতেছেন!"

"তার চেয়ে বড় সম্মান তোমাকে দিয়ে গেলাম, তুমি দেখবে, আমি অল্প অনুচর নিয়ে দুঃসাহসিক কাজে রওনা হয়েছি এই আশঙ্কায় আর কেউ আমার সাহায্য করতে রওনা হয়ে যেন আমায় অপমান না করে। চালাও—"

একলম্ফে সম্রাট্ ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন—পিছনে টকাটক্ টকাটক্ দশ ঘোড়ার চল্লিশ কদমে নির্জ্জন পথ শব্দায়মান হইয়া উঠিল। একটু দূরে তাহারও পিছনে ছুটিল আরও জনত্রিশেক অনুচর।

কাহারও মুখে কথা নাই—সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে—আকবর সকলের অগ্রে। তাঁহারও অগ্রে একজন পথপ্রদর্শক। ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৈ, এতক্ষণে তো শত্রুর নিকটে পৌঁছিবার কথা! তবে কি ইব্রাহিম টের পাইয়া পলাইয়া গেল? ক্ষণেকের জন্ত আকবর রশ্মিসংযত করিলেন—অশ্বারোহীগণ সকলেই থামিল।

আকবরের আহ্বানে পথপ্রদর্শকগণ মুখ মলিন করিয়া আসিয়া সম্রাটের নিকট দাঁড়াইল। বলিল,—জাহাপানা,—পথ ভুল করেছি, আমায় শাস্তি দিন্।

সম্রাট্ হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, শাস্তি সময়মত পাবে,—এখন যাও, ঐ দূরের বস্তিতে জিজ্ঞেস করে পথ জেনে এস!

পথ-প্রদর্শক পথ জানিতে চলিয়া গেল, যোদ্ধাগণ ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিলেন। হিন্দু নায়কগণ উদীয়মান দিনকরকে ঘোড়ার উপর হইতেই নত মস্তকে বন্দনা করিলেন।

জালাল খাঁ বলিল,—জাহাপনার যাত্রাটা বড় সুবিধার হয় নাই, প্রথমেই রাস্তা ভুল!

ঠিক এমনি সময়ে দেখা গেল দূরে একটি হরিণ ঘাস খাইতেছে। হয়ত একদল হরিণই বনান্তরালে চরিতেছিল,—কিন্তু মাঠের প্রান্তে দেখা গেল মোটে একটিকে!

আকবরের শিকারের সখ ছিল অসামান্য! এমন কি শেষ রাত্রের এমন অদ্ভুত রণযাত্রায়ও তাঁহার প্রধান শিকারী ঘোড়ার উপর চড়াইয়া শিকারী বাজ ও ক্ষুদ্রকায় চিতা বাঘ লইয়া সম্রাটের অনুসরণ করিতে বিরত হয় নাই।

সম্রাট্ হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা দেখা যাক্ জালাল খাঁর কথা সত্য কি না! রোস্তম খাঁ,—চিতা,—

রোস্তম খাঁ ঘোড়া ছুটাইয়া আকবরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ঘোড়ার জিন সাধারণ

জিন অপেক্ষা পিছন দিকে একটু বেশী বিস্তৃত, আরোহীর পিছনে সেই বিস্তৃত অংশের উপরে একটি বহুমূল্য বস্ত্রের থলিয়া, জিনের সঙ্গে বেশ সুচারুরূপে সম্বদ্ধ। আকবর ডাকিলেন, সমন্দ্-মাণিক। শুনিবামাত্র সেই থলিয়া নড়িয়া উঠিল, এক লম্ফে তাহার ভিতর হইতে যে জানোয়ারটি বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে একটি বৃহদাকার বিড়াল বলিলেও চলে! থলিয়া হইতে বাহির হইয়াই দিব্য সপ্রতিভ ভাবে সে আকবরের কোলে লাফাইয়া পড়িল! আকবর তাহাকে একটু আদর করিয়া দূরে বনান্তে দণ্ডায়মান হরিণটির দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া কানে কানে কি বলিলেন। অমনি একলম্ফে ঘোড়া হইতে প্রায় ১০ হাত দূরে যাইয়া সে পড়িল এবং হরিণকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। হরিণও এতক্ষণে আসন্ন বিপদ বুঝিয়া এক লম্ফে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটি সমাধা হইতে বোধ হয় একমিনিট সময়ও লাগে নাই!

যোদ্ধাগণ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—কি হয়! কি হয়!

বীর শিকারী রোস্তম খাঁর কাণ খাড়া ছিল তাহার পরম আদরের চিতা "সমন্দ-মাণিকের" গতি পথের দিকে। সহসা দূরে চিতার কণ্ঠ শুনা গেল এবং রোস্তম সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—জাহাপানা, পড়েছে—পড়েছে,—পর মুহূর্ত্তেই সে জঙ্গলের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। শিকারসহায়ক অনুচর কয়েকজনও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। অনতিবিলম্বেই তাহারা ফিরিয়া আসিল—রোস্তমের কোলে তাহার সমন্দ-মাণিক্,—অনুচরগণ ঘোড়ার পীঠে চড়াইয়া লইয়া আসিল হতভাগ্য ছিন্নকণ্ঠ রক্তাপ্লুত হরিণের দেহ!

আকবর সমন্দ-মাণিককে রোস্তমের নিকট হইতে নিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—জালাল খাঁ, কি মনে হয়, যাত্রা কি অশুভ?

৩

দ্বিপ্রহরে একস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শূলপক্ব হরিণের মাংসের সহিত নিজ নিজ পৃষ্ঠে বাহিত রুটি চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যোদ্ধাগণ আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। বেলা যখন মাত্র আর ৪।৫ দণ্ড আছে এমন সময় রাস্তায় এক ব্রাহ্মণের সহিত যোদ্ধাগণের দেখা হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল—সারনাল সহর আর অল্প দূর, বিদ্রোহীগণ তথায়ই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। সারনাল পৌঁছিতে আর এক ঘণ্টাও লাগিবে না।

এইবার আক্রমণ-পদ্ধতি স্থির করিতে পরামর্শ আরম্ভ হইল।

জালাল খাঁ বলিল—আমরা সবশুদ্ধ মাত্র চল্লিশজন, আর বিদ্রোহীরা বোধ হয় দুই হাজারের কম নয়। দিনের বেলা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আকবর ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—ভয় পেয়েছ, জালাল খাঁ? প্রাণের মায়া কি এতই বেশী?

জালাল খাঁ কাতর হইয়া বলিল,—জাহাপানা, জালাল খাঁর প্রাণের মায়া কত তার প্রমাণ অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে হ'য়ে গেছে। আপনার প্রাণের উপর আমাদের মায়া সত্যই বড় বেশী।

আকবর হাসিয়া জালাল খাঁর পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—তা জানি বন্ধু, তাই প্রাণটাকে বার বার যাচাই করে দেখ্‌ছি সত্যই এটার কোন মূল্য আছে কিনা! রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ—শত্রুমিত্র চেনা যাবে না—ও আমি পারব না। আর ওটা আমার কাছে যেন জাল জুয়াচুরীর মত মনে হয়, আত্মাটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কোন ভয় নাই বীরগণ, সাহসে বুক বাঁধ—আমরা চল্লিশ জনে চল্লিশ শত্রু নিপাত তো প্রথমেই করব, তার পরে দেখতে চাই কজন ফের দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে!

আবদাল্লা বলিল,—জাহাপনা একদিন বলেছিলেন এক মরদ হাতী দশ শত্রু মারে—আমরা এক এক জনে দশ দশ জন মারব, পরে অন্য কথা,—

আকবর সোল্লাসে চীৎকার করিলেন—কেয়াবাৎ বহুত আচ্ছা,—চালাও।

আবার ঘোড়া ছুটিল এবং কিছুক্ষণ পরেই একটি পাহাড়ের মাথায় সারনাল সহর যেন একখানি ছবির ন্যায় আকাশের পটে ভাসিয়া উঠিল। সম্মুখেই মাহী নদী। উহা উত্তীর্ণ হইয়া সারনালে পৌছিতে হইবে।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন—বন্ধুগণ, বড় গরমীর সময় আসচে, এবার ঠাণ্ডা জামাটা গায়ে দিয়ে ফেল। অনুচরকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে ইস্পাতের মোটা তারে গড়া ঠাস্ বুনানীর জামার আকারে নির্ম্মিত বর্ম্মটা চাহিয়া লইলেন, অনুচর পরিতে সাহায্য করিল। যোদ্ধাগণ সম্রাটের ইঙ্গিত মত সকলেই বর্ম্ম পরিধান করিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময় দেখা গেল ঘোড়ার খুড়ের ধূলায় রাস্তা অন্ধকার করিয়া একদল অশ্বারোহী আসিতেছে।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন—হুসিয়ার—বীরগণ—

মুহূর্ত্তে সকলে দশ দশ করিয়া চারি দলে বিভক্ত হইয়া খাপ হইতে তরবারী খুলিয়া দাঁড়াইল—কাহারও মুখে কথা নাই।

কিছু পরেই আকবরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—তিনি হাসিয়া তরবারী কোষবদ্ধ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—মিত্র পক্ষ,—ভগবান দাসের দল!

দেখিতে দেখিতে নূতন দল নিকটে আসিয়া পড়িল—সর্ব্বাগ্রে ভগবান দাস, তাহার পশ্চাতে বিশ্রুতকীর্ত্তি মানসিংহ, এবং আরও নয়-দশজন সেনা-নায়ক। সঙ্গে তাহাদের প্রায় দেড়শত বাছা বাছা ঘোড় সোয়ার।

ভগবান দাস আসিয়া কুর্ণিশ করিলে আকবর মুখ ভার করিয়া বলিলেন—রাস্তায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে বোধ হয়?

"জাহাপনা, শাহাবাজকে জিজ্ঞাসা করুন, কত ঘুমাইয়াছি! সারা রাস্তা কেবল জাহাপনার শিরহীন দেহ স্বপ্ন দেখাইতে দেখাইতে যেন জিনে উড়াইয়া আনিয়াছে।"

আকবর হাসিয়া বলিলেন—গোস্তাকি! যাও, তোমরা ফিরে যাও—তোমাদেরে যুদ্ধ করতে দেওয়া হবে না।

বিশেষ বিবরণ শুনিয়া বুঝা গেল,—শাহাবাজও অন্ধকার রাত্রে অনেক ঘুরিয়াছে এবং আকবরের দল কোন দিকে গেল তাহা খুঁজিতে ভগবান দাসের দলকেও অনেক ঘুরিতে হইয়াছে।

মানসিংহ অগ্রসর হইয়া বলিল - জাহাপনা, পিছনে পড়েছিলাম, অপরাধ হয়েছে, এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, সর্ব্বাগ্রে নদী পার হতে চাই।

আকবর হাসিয়া বলিলেন—আমরা দলে কজন বা লোক এর আর আগপাছ নেই,—সব্বাইকে এক সঙ্গে নদী পার হতে হবে,—আচ্ছা মানসিংহ, তোমার আরজী মঞ্জুর। তুমি নদীতে নামলেই আমরা সব্বাই একসঙ্গে নদীতে নেমে পরব।

একটা ঢালু যায়গা দেখিয়া মানসিংহ সাবধানে ঘোড়া চালাইয়া নদীতে নামিয়া পড়িলেন—অমনি বাকী সবে যে যেমনে পারিল নদীতে নামিয়া পড়িল। নদীর তোর দেখিয়া সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে সাঁতার জল হইবে—নামিলে কিন্তু দেখা গেল যে ঘোড়া হাটিয়াই পার হইতে পারিল। স্রোতের বেগে দুই এক জনের ঘোড়া কতকদূর ভাসিয়া গেল বটে কিন্তু বেশীদূর নহে।

অশ্বারোহীদল নদীর মাঝামাঝি গিয়াছে এমন সময় শন্-শন্, ঠক্ করিয়া একটা তীর আসিয়া অগ্রগামী মানসিংহের বর্ম্মে ঠেকিল।

আকবর ডাকিয়া বলিলেন,—হুঁসিয়ার,মানসিংহ! নদীতীরে শত্রু পাহারা আছে! দেখা গেল জন পাঁচেক ধনুকধারী অশ্বারোহীগণকে লক্ষ্য করিয়া পার হইতে তীর ছুড়িতেছে। মানসিংহ জিনসংলগ্ন বন্দুক উঠাইলেন।

"এই রাজপুতগুলোর মাথায় যদি বিন্দুমাত্র মগজ থাকে! ও কর কি? বন্দুক ছুড়না—শব্দ শুনে যদি শত্রু এসে পড়ে তবে এই খাড়া পাড়

বেয়ে নদী হতে আর উঠতে হবে না"—বলিতে বলিতে আকবর জিন্ সংলগ্ন ক্ষুদ্র সুগঠিত ধনু তুলিয়া লইয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। শন্ শন্-শন্-শন্-শন্ মুহূর্ত্তে পাঁচটী তীর পর পর আকবরের ধনু হইতে ছুটিয়া গেল—পাঁচ জন শত্রুই ভূলুণ্ঠিত হইল,—তিনজন একেবারে পারে দাঁড়াইয়াছিল—গড়াইয়া নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

"শাহান শার সমস্ত শত্রু এইরূপে নিপাত হউক"—বলিয়া মানসিংহ অল্প জল পাইয়া ঘোড়া চালাইয়া দিলেন। খাড়া পার বাহিয়া ঘোড়ায় উঠিতে কষ্ট হইবে দেখিয়া একলম্ফে শুষ্ক ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বল্গা ধরিয়া ঘোড়াকে টানিয়া লইয়া দৌড়িয়া পারে যাইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহীগণ যে যেমনে পারিল পারে যাইয়া উঠিল। আহত প্রহরীগণের একজন যাইয়া ইতিমধ্যে সহরে খবর দিয়াছিল এবং তথায় বিষম সোর গোল পড়িয়া গিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ণ গলি সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহরে যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া ইব্রাহিম হোসেন সদলবলে সহরের পশ্চাতে এক উচ্চ স্থানে যাইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহরের সম্মুখের দরজায় ইব্রাহিম যে কয়েক জন প্রহরী রাখিয়া গিয়াছিল তাহারা তো প্রথম আক্রমণেই যেন ঝড়ে উড়িয়া গেল। তেমনি ঝড়ের বেগে সম্রাটের দল সারনাল সহরের মধ্য দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইল। সকলের আগে চলিয়াছেন সম্রাট নিজে—ভগবান দাস কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। মানসিংহ কয়েক জন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন। ভগবানের ভ্রাতা ভূপৎ বীরের মত যুদ্ধ করিয়া ইতিমধ্যেই বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ যে অসমসাহসী নির্ভীকহৃদয় সম্রাট বিপদে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, কে পড়িল কে উঠিল, তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে কেহ আছে কিনা, তাহার বিচার মাত্র না করিয়া রণ-মদে মাতিয়া শত্রু মারিতে মারিতে অগ্রসর হইতেছে, সে কি একটিবারও বিবেচনা করে না যে তাহার একলার জীবনের উপর মোগল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে? আকবর মৃত শুনিলে তো কথাই নাই, আকবর শয্যাগত শুনিলেও হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে এবং তাসের প্রাসাদের মত সেই সঙ্ঘাতে নব-গঠিত মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। সে কি নিজেকে দৈব-রক্ষিত বলিয়া মনে করে? শত্রুর অস্ত্র কি তাহাকে স্পর্শ করিতে ভয় পায়?

এই রকমই ছিল আকবরের চরিত্র এবং এই বিচারবিতর্কহীন দুঃসাহসই তাঁহাকে তাঁহার অনুচরবর্গের এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল!

সহর হইতে বাহির হইবামাত্র শত্রুর দল চোখে পড়িল। উন্নত ভূমির উপর রণসজ্জায় তাহারা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছে!

সহসা তিন জন অশ্বারোহী শত্রু অগ্রগামী আকবর ও ভগবান দাসকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। একজন ভগবানদাসকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল, নিজের হাতের বর্শার আন্দোলনে উহাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া এক আঘাতেই ভগবান তাহাকে ধংশায়ী করিলেন। অন্য দুই জন ইত্যবসরে আকবরকে আক্রমণ করিল। দুই ধারে কাঁটা গাছের ঝোপ—সম্মুখ হইতে দুই শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে—এক লম্ফে আকবরের সুশিক্ষিত অশ্ব কাঁটা গাছ ডিঙ্গাইয়া পার্শ্বে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল! এই সময় ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইতেই আততায়ী দুই জন পলাইয়া গেল। ইত্যবসরে অন্যান্য অশ্বারোহীগণও আসিয়া পৌঁছিল এবং সকলে মিলিয়া প্রবল বাত্যার মত যাইয়া শত্রুর উপর পড়িল। শত্রুর দুই হাজারের দল এই দুই শত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার আক্রমণে দেখিতে দেখিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সরিয়া পড়িল। শত্রুজয় করিয়া আকবর পরের দিন নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংরেজীতে যাহাকে বলে Reckless এবং যাহার প্রতিশব্দ আমরা বানাইয়াছি বেপরওয়া আকবর ছিলেন তাহাই। উপরে তাহার এক মুর্ত্তি দেখাইলাম, আচ্ছা, তার আর একটি মূর্ত্তিও দেখান যাক্!

সারনালের যুদ্ধের কয়েক মাস পরের কথা। গুজরাট অভিযান সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে—সুরাট দুর্গের পতন হইয়াছে, শাহান শার দিল্ বেশ প্রফুল্ল। রাত্রিতে অন্তরঙ্গগণ লইয়া বৈঠক বসিয়াছে, প্রত্যেকের হাতেই সুরাপাত্র—ঘন ঘন পাত্র নিঃশেষ হইতেছে। পদ মর্য্যাদার পার্থক্য প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—যেন এক দল ইয়ার, ইয়ারকিতে একেবারে মস্‌গুল্!

আকবর বলিলেন—বাবা মানসিংহ, তোমরা রাজপুত, যুদ্ধ করিতে জান বটে, কিন্তু তোমাদের মাথায় মগজ আদবেই নাই।

ভগবান দাস জড়িত স্বরে বলিল—আলবৎ আছে, একেবারে ঠাসা—এই দেয়ালে মাথা ঠুকে দেখাতে পারি এক গুতোয় একেবারে এক পিপা মগজ বেরিয়ে আসবে।

কেহ থামাইবার পুর্ব্বেই ভগবান দাস এমন জোরে দেয়ালে যাইয়া মাথা ঠুকিল যে অমনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লোটাইয়া পড়িল। অনুচরগণ তাহাকে উঠাইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল এবং শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

আকবর বলিলেন—দেখ্‌লে বোকা রাজপুত বেটার আক্কেল?—বেটা মাথার খুলি ভেঙ্গে আমাকে মগজ দেখাবে; আরে মাথার খুলির ভিতর মগজ তো গাধারও আছে! মগজ কাজে খাটাতে পারলে তবে তো হয়! সংগ্রাম সিংহের মাথায় কি মগজ ছিল না—কিন্তু খাটাতে পারলে কই?

"মগজ ছিল জাহাপানা, কিন্তু খাটাতে পারলে না—পারলে না"—বলিয়া এক রাজপুত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আদম তাজবন্দ্ বলিল,—'কিন্তু সাহস আছে, মগজ বেশী থাক্‌লে সাহস আবার তেমনি কম থাকে।"

ক্রন্দন পরায়ণ রাজপুত অমনি ক্রন্দন থামাইয়া বীর দর্পে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আলবৎ সাহস আছে—খুব আছে—অনেক আছে।

"সাহস মোগলেরও আছে।"

"না, রাজপুতের মত সাহস! কই দেখাও দেখি বাপধন! পারবে? আমরা কি করি জান? এক খানা দোরোখা বর্শা লই—মধ্যে বাট—দু'ধারে দুখানা মুখ—একজন বাটে ধরে, অন্য দুজনে দুদিক থেকে ছুটে গিয়ে বর্শার উপর পড়ি—ব্যস্—বর্শা একদম পীঠ দিয়ে ফুড়ে বের হয়। পার তোমরা? রাজপুতকে ঠকিয়ে যুদ্ধ জয় কত্তেই পার—এ আর পারতে হয় না।"

রাজপুত বীর বুক ফুলাইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল!

হঠাৎ আকবর লাফাইয়া উঠিলেন,—আলবৎ পারি—এক শ' বার পারি।

নেশা তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কি যে হইতেছে তাহার ফল যে কি, তাহা বিবেচনা করিবার মত শক্তি তখন বড় কাহারও ছিল না। তামাসা দেখিবার উৎসাহে তখন সকলে আকবরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

আকবর টলিতে টলিতে কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া দেয়ালে টাঙাইলেন এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়া তাহার অগ্রভাগ তুলিয়া লইয়া নিজের বক্ষে স্থাপিত করিলেন।

রাজপুতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেমন পারি কি না?"

রাজপুত বীর মাথা নাড়িয়া বলিল—না পারেন না—মোগলের সে সাহস নেই—পারলে এতক্ষণে পীঠ দিয়ে তরবারির ফলা বেরিয়ে আস্‌ত!

আকবর পৃষ্ঠ দেশে হাত দিয়া দেখিলেন—

তরবারির ফলা সত্যই তখনও বাহির হয় নাই। বলিলেন—"আচ্ছা, এবার ঠিক বেরবে।"

মানসিংহ মদটা তখন পর্য্যন্ত কিছু কম করিয়া খাইত—সে প্রায় প্রকৃতিস্থই ছিল, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—জাহাপনা, একি করচেন্? এক্ষনি যে রক্তগঙ্গা হয়ে যাবে।

আকবর শুধু বলিলেন,—সরে যাও, আমি পারি, এই দেখ পারি—

সহসা মানসিংহের বজ্র মুষ্টি ছুটিয়া গিয়া আকবরের বক্ষে পড়িল—তরবারি ছাড়িয়া দিতেই আকবরের তর্জ্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্য স্থান কাটিয়া হাত রক্তে ভাসিয়া গেল।

মানসিংহের মুষ্ট্যাঘাতে আকবর ভূমিতে লোটাইয়া পড়িয়াছিলেন। পর মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া উঠিয়া সেই মহামল্ল মোগল সম্রাট মানসিংহকে কুস্তির প্যাচে জাপটাইয়া ধরিলেন। মল্ল বিদ্যায় মানসিংহও কম পারদর্শী নহেন। তখন কীচক ও ভীমের মত এই দুই মল্ল বীর একবার এ উপরে—আবার ও উপরে এই ভাবে যুঝিতে লাগিলেন। কাটা হাতের বেদনায় ভ্রূক্ষেপ নাই, রক্তে উভয়ের বস্ত্র রঞ্জিত হইতেছে সে দিকে আকবরের দৃষ্টি নাই!—কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মানসিংহকে ভূমিতে ফেলিয়া আকবর তাহার বুকে চড়িয়া বসিলেন এবং এমন জোরে মানসিংহের গলা টিপিয়া ধরিলেন যে মানসিংহের প্রাণ যায় আর কি! ওমরাহগণ এতক্ষণ তামাসাই দেখিতেছিলেন এবং বাহাবা দিতেছিলেন—এক্ষণ ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া সৈয়দ মুজাঃফর যাইয়া দুই জনকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বজ্রমুষ্টি ছাড়ায় কাহার সাধ্য! অবশেষে সদ্যকর্ত্তিত হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী পিছন দিকে মোচড়াইয়া ধরিলে বেদনায় আকবর মানসিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। মানসিংহকে কয়েক জনে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে যখন উভয়ের দেখা হইল তখন হাকিম আকবরের কাটা হাতের চিকিৎসা করিতেছে। আকবর হাসিয়া বলিলেন,—নাঃ—রাজপুতেরও যে মাথায় মগজ আছে এবং সময়মত তার ব্যবস্থা সে করতে পারে—কাল রাতে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

পাঠকগণকে আবার মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে বর্ণিত ঘটনাগুলি গল্প নহে, ইহাদের অধিকাংশ ব্যাপারের বর্ণনাই আকবর-নামাতে আছে।

অশ্রুহীরা

শ্রীকালিদাস রায়।

(সাদীর ভাবানুসরণে)

ফটিকের বেদী কিবা বিভুর চরণ বিভা-
ছটা জালে জ্বলে,
ভক্তগণ তার মাঝে সানন্দ শরণে রাজে
স্বচ্ছ কুতুহলে।
লুব্ধ মন যদি তথা সাথী হ'তে ব্যাকুলতা,
শোন উপদেশ,
অশ্রুহীরা খণ্ড দিয়া ফটিকেরে বিদারিয়া
কর্‌না প্রবেশ।



নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্ষুদ্র গ্রামটীর অনতিদূরে গ্রাম্য নদী প্রবাহিতা। ফাল্গুন চৈত্র মাসের দিকে জল আগে এক হাঁটুর বেশী থাকিত না, সংস্কার করানোর ফলে এখন অনেক জল থাকে। বর্ষায় নদী-বক্ষে ঢল নামিয়াছে, একটা নদী ফুলিয়া দশটা হইয়াছে, ঈষৎ আরক্তিম জল ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে।

নদীর ঘাট পর্ পর্ যতগুলি আছে সবই মাটীর, একটী মাত্র বাঁধা ঘাট আছে সেটী জমীদার বাটির। গ্রামের কেহ সে ঘাটে যাইত না, ইহারা অন্য ঘাট ব্যবহার করিত।

প্রণতি অবসরকালে প্রায়ই আসিয়া এই নিস্তব্ধ নদীর তীরে বসিয়া থাকিত। এই নির্জ্জন তীরটীকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে বাসাতেও আর টিকিতে পারিত না।

সে দিন আকাশখানা বাদলমেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছিল; ঠাণ্ডা বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া নদীর বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। নদীর দু'পারে বাবলাগাছগুলিতে হরিদ্রা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া গাছ আলো করিয়াছিল। দুপুরে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সেই জলে ভিজিয়া ফুলগুলো ভারি হইয়াছিল, বাতাস লাগিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া তলা বিছাইয়া ফেলিতেছিল।

প্রণতি ঘাটের পাশে যে একটা গাছের মূল কাটা পড়িয়াছিল তাহার উপর বসিয়া শ্রান্ত নয়নে নদীর দু'ধারের সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার মনে কলিকাতার কথা জাগিতেছিল,—একখানা স্নেহমাখা বাড়ীর কথা তাহার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—যে বাড়ীটিতে সে এতকাল ছিল। জীবনে কখনও সে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। আগে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইবার নাম শুনিলে তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিত, সেই কলিকাতা ছাড়িয়া সে আজ কতদিন এখানে রহিয়াছে, আসিয়াও তো বেশই আছে। আগে সে ভাবিত বাংলার কোথাও পল্লীগ্রামে যদি যাইতে হয় সে মরিয়া যাইবে, কিন্তু সে তো মরে নাই।

একটু মৃদু হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, মরিব ভাবে সবাই—সেই শুধু একলা মরিব ভাবে নাই। শরৎও একদিন তাহারে এই কথাই বলিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানেন যাহারা কলিকাতাবাসী তাহারা পল্লীগ্রামের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠে। অথচ এই পল্লীগ্রামের সকল সৌন্দর্য্য লুণ্ঠন করিয়াই সহর আজ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

অদূর হইতে শিশুকণ্ঠের আর্ত্ত চিৎকার প্রণতির কাণে আসিল, সে চাহিয়া দেখিল একটী অস্থিচর্ম্মসার শিশুকে আর কয়েকটী সবল শিশু আক্রমণ করিয়াছে, সেই রুগ্ন শিশুটী প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া পলাইয়া আসিতেছে।

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার-স্পৃহা স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে ও তাহাই ঘটিয়াছিল। কাছাকাছি আসিয়া রুগ্ন দুর্ব্বল ছেলেটী পড়িয়া গেল, সবল ছেলের দল মহানন্দে তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

"এই,—এই ছেলেগুলো—"

বিস্মিতনেত্রে প্রণতি চাহিয়া দেখিল শরৎ তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছেলেগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, দুর্ব্বল ছেলেটী আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কঙ্কালসার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শরৎ তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "ফের বেরিয়েছিস্ মাণিক, তোকে না হাজার বার বারণ করেছি বাড়ীর বার হস্ নে?"

মাণিক চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে কি বলিল তাহা শোনা গেল না। তাহার উত্তর শুনিয়া শরতের মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, "আঃ, তোকে নিয়ে আমি ভারি মুস্কিলেই পড়েছি।"

তাঁহার চোখ প্রণতির উপর পড়িতেই তিনি অগ্রসর হইলেন, তাঁহার হাত সেই রুগ্ন ছেলেটা শক্ত করিয়া দুই হাতে জড়াইয়াছিল। প্রণতি সপ্রতিভভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "ছেলেটীকে পেয়েছেন বুঝি?"

প্রতি-নমস্কার করিয়া শরৎ বলিলেন, "তাই বটে; ধরুন, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। এ একটা বাগ্দীর ছেলে; এর বাপের আর কেউ না থাকায় আমার হাতে একে দিয়ে বৃন্দাবনে না কোথায় চলে গেছে। যদি তখন সহজ জ্ঞান থাকত তা হলে কি নিতুম? নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি মাতাল, বদ্ধ মাতাল যাকে বলে তাই। মদ খেলে যে সময় জ্ঞান থাকে না সেই সময় আমাকে দিয়ে অনেকে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। এর জন্যে আমার শেষে পস্তাতেও হয় বড় কম নয়।

সে কেমন অসঙ্কোচে বলিয়া গেল সে মাতাল—মদ খাইলে তাহার এতটুকু জ্ঞান থাকে না। প্রণতি এই সরল সত্য কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শরৎ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাবছেন আমি কেমন করে অসঙ্কোচে বললুম আমি মাতাল। দেখুন, সত্যি কথাটা যত বেশী ব্যবহার করতে পারা যায় ততই ভাল। মিথ্যে তো আছেই; আমাদের এই জীবনটাই যখন মিথ্যে তখন আমরা মিথ্যেকে ছাড়াতে পারছি কই? তবু এই মিথ্যের মধ্যেও সত্যিটাকে যদি এতটুকুও ব্যবহার করতে পারা যায় তাতে পাপ হয় না। এটা সর্ব্বসম্মত কথা যে আমি পূর্ণমাতাল, আপনিও নিশ্চয় এ কথা শুনেছেন। আমার জমীদারি বড় কম নয় তা জানেন। এর মধ্যে এমন কেউ নেই যে জানতে পারে নি আমি মাতাল। আপনিও এদেশে পদার্পণ করবামাত্র এ কথা শুনতে পেয়েছেন; আমিও মিথ্যের মুখোস পরে জানাতে চাইনে আমি মাতাল নই। আমি যা তা বলতে দোষ কি তা বলুন।"

প্রণতি কথার কোন জবাব দিল না, শুধু চাহিয়া রহিল, মাতাল অবস্থায় কত লোকে আমায় দিয়ে কত কাজ করিয়ে নেয়। বুঝতে পারি সব, জানতে পারি সব, তবু জেনে বুঝেও বোকা হয়ে থাকি'। সে দিন মদ খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে, ছিলুম, এই ছোঁড়ার বাপ এসে একে দিয়ে গেল। মন তখন উচুসুরে বাঁধা, 'নেব না' বলতে পারলুম না। এমনি করে—আপনি বিশ্বাস করবেন কি, আমার সুনাম গেছে, অর্থ গেছে, আমি এখন ঋণে জড়িয়ে পড়েছি।"

শরৎ যেরূপ অকপটভাবে কথা বলিতেছিলেন তাহা শুনিয়া প্রণতি নিজেকে আর দূরে রাখিতে পারিল না, আত্মীয়ার মত নিজেকে মনে করিয়া স্নেহের সুরে বলিল, "জেনে শুনে তবে মদ খান কেন? এতে আপনার লাভ তো কিছুই দেখছিনে, দেখছি কেবল ক্ষতি, এ ক্ষতির বোঝা অনর্থক মাথায় করে বয়ে বেড়ানোর দরকার কি? আমায় মাপ করবেন,

আপনাকে আমিই আবার উপদেশ দিতে যাচ্ছি, কিন্তু—"

শরৎ খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "না, আপনি বলুন, আমায় তিরস্কার করুন। যথার্থ কথা বলছি আমি এ জগতে আমার বাপের কাছ ছাড়া আর কারও কাছে তিরস্কৃত হই নি। তিরস্কারের মধ্যে বাড়ীর সমবেদনায় যে সুর বেজে ওঠে, তা স্পর্শ করতে আমার বুক বহুকাল হ'তে বঞ্চিত হয়ে আছে। আপনি বলবেন আমি বড়লোক জমীদার, আমার আবার অভাব কিসের? আমার মুখের একটা কথা রাখবার জন্যে লোকে কত ব্যগ্র, আমি কারও দিকে চাইলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়; আমার কত চাকর, কত কর্ম্মচারি, আমার মন যোগানের জন্যে এরা সবাই ব্যস্ত। আমার চারিদিকে কত স্তাবক, কত বন্ধু, কিন্তু সত্যি কথা বলবেন মিস বোস, এরা কি আমায় সম্মান করছে, আমায় ভালবাসছে, না আমার অর্থকে ভালবাসছে? আমি দেখছি এরা সকলেই অন্তরে আমায় ঘৃণা করে, সময় সময় সে ঘৃণা মুখের পর ফুটে বার হয়ে পড়ে তা আমি দেখতে পাই, তবু তারা প্রকাশ্যে আমায় ভালবাসে দেখায়; আমার এতটুকু মাথা ধরলে তারা যেন কতই অস্থির হয়ে পড়ে এমনি ভাব দেখায়; অথচ আমি পৃথিবী হ'তে একেবারে যখন মরে যাব তখন এরা কেউ আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও তাদের পড়বে না,তারা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, যাক্, আপদ গেল। এ জগতে এসে আমি কারও কাছ হ'তে একটী উপদেশ পেলুম না, কাউকে এমন কাছে পেলুম না যাকে আমার বুকের ব্যথা জানাতে পারি। আমি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি নে, কাজেই ওদের মত গোপনতার আড়ালে আমাকেও লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এই না পাওয়ার কষ্ট ভুলে থাকতে কেবল মদখাচ্ছি,আমার ব্যথা জুড়িয়ে দিতে জগতে এই একমাত্র বন্ধু আছে, আর কেউ নেই। যখন মদ খাই তখন মনে হয় দুনিয়ার কেউ আমার পর নেই, সব আপনার, এদের কপট স্নেহ তখন সত্যি বলেই মনে হয়। মদ যখন না পাই তখন বুকের মধ্যে জ্বালা জ্বলে ওঠে, এ জগৎ শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না। আমি নিঃশেষে দানই করে যাচ্ছি কিন্তু কারও কাছ হ'তে কখনও কিছুই তো পেলুম না মিস্ বোস।"

তাঁহার গোপন ব্যথা আজ মূর্ত্ত হইয়া ব্যথার সুরে ঝরিয়া পড়িল, তাঁহার সদাহাসিমাখা মুখখানা বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ প্রণতি তাঁহার পরিচয় ভালরূপেই পাইল। সে এবার করুণাপূর্ণ নেত্রে এই যথার্থ হতভাগ্য যুবকের পানে চাহিল, তাহার নারী-হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। একটা গোপন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল— "আমায় যে বিশ্বাস করে আপনার গোপন কথা বললেন, ধরুন, আমি ও তো সংসারের জীব, জগতের নিয়মানুসারে আমিও চলি, সেই রকম নীচ মন আমার, অবশ্যই স্বর্গীয় মন আমার নেই।"

মলিন হাসি শরতের মুখের উপর খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই জগতের জীবকে জগতের প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই চলতে হবে। আমার মতের সঙ্গে মিলতে গেলে জগৎ ছাড়া জীব হ'তে হয়। গোপন কথা একে বলবেন না, এর মধ্যে গো পনীয় আমার কিছুই নেই। তবে সব সময়ে এ কথাগুলো ব্যবহার করিনে তার অন্য কারণ আছে। সে কারণটা এই যে কেউ সত্যি কথা সইতে পারে না। গোপনতার আড়ালে, মুখে মুখোস চাপা দিয়ে মানুষ কিছু তার দীর্ঘজীবনকালটা কাটাতে পারে না। হয় তো কোন সময়ে কোন এক অতর্কিত আঘাতে তার সেই গোপনতাটুকু লুকিয়ে পড়ে, মুখোস খসে পড়ে যায়, আর তার স্বরূপটা সেই সময়েই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আজ এই ছেলেটীর সঙ্গে নিজের অবস্থা মিলিয়ে দেখে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল, দেখলুম— এও যেমন জগতের ঘৃণিত আবর্জ্জনা স্বরূপ আমিও তেমনি।"

প্রণতি বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, "আপনি আবর্জ্জনা ?"

শরৎ শান্ত স্বরে বলিলেন, "তা নয় তো কি মিস্ বোস ? আপনি কি বলতে চান আমি জগতে একটী উজ্জ্বল রত্ন হ'য়ে এসেছি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'য়ে জন্মেছি ? কিছু না মিস বোস, কিছু না। আমি দেখছি আমি ষোল আনা মিথ্যে মানুষ, আমার দ্বারা এ জগতে এতটুকু উপকার হবে না, অপকার যথেষ্ট হবে, এই ছেলেটী কেমন দুর্ব্বল—আমি তার চেয়েও বেশী দুর্ব্বল। আপনি অবাক হ'য়ে আমার পানে তাকিয়ে ভাবছেন—সে আবার কি কথা,—কেমন এই ভাবছেন না ?"

বলিতে বলিতে তিনি নিজেই হাসিয়া উঠিলেন, তখনই আবার মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "সত্যিই বড় দুর্ব্বল। কারও সাহায্য না নিয়ে যখন আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই, তখন আমি সবল এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারিনে। সামনে দেখুন,—ওই যে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে, ও শুধু একটানা বয়েই যাচ্ছে। তীর দুটো হাঁ করে জড়ের মত তাকিয়ে আছে, তা বলে ভাববেন না তীরের কোন আকর্ষণ নেই। তীর সে স্রোতকে আকর্ষণ করে নিজের পানে আনবার চেষ্টা করছে, দুই একটা ছোট ছোট ঢেউ কাছেও আসছে, কিন্তু তীরের চেয়ে জলের বড় ঢেউয়ের টান আরও বেশী তাই যে ঢেউগুলো দল ছাড়া হ'য়ে তীরের পানে আসছিল, তারা আবার ফিরে গিয়ে বড় ঢেউয়ের পেছনে—তাদের যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে ঠেলা দিয়ে সামনের পথে আরও এগিয়ে দিচ্ছে। এটা আমার মনের উপমা—আমার মন বলতে এখানে যে বৃত্তিগুলো আমায় চালনা করছে তাদেরই বুঝাচ্ছে। ওই রকম একটানা পথে আমার দুর্দ্দান্ত বৃত্তিগুলোও চলেছে। সংসারের আকর্ষণ তাদের দুই একটীকে টেনে আনলেও ধরে রাখতে পারছে না, তারা দ্বিগুণ বলে ফিরে গিয়ে অন্যগুলির পেছন হ'তে তাদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রণতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "নদীর ঢেউয়ের যাওয়ার স্থান আছে, তারা চলেছে সমুদ্রে মিশতে, আপনার মনোবৃত্তি চলছে তার শেষ কোথায় ?"

শরৎ একটু হাসিলেন, "আমার শেষ মদে। চরম লক্ষ্য আমার সেই ঠিক করে রেখেছে, মনোবৃত্তি উত্তেজিত হ'য়ে এগিয়ে চলেছে। মাতাল কখনও কোন সৎকাজ করতে পেরেছে শুনেছেন কি ? মাতালের দ্বারা ভাল কিছু কখনও হয় নি, কখন হ'বেও না। তবে যেটুকু তাকে প্রকৃতিস্থ পাওয়া যায়, যেটুকু ভাল পাওয়া যায় সেটা সেই তীরের আকর্ষণে যে দুই এক পলকের জন্যে কাছাকাছি আসে- তখন। যাক, অনেক বকেছি, আপনাকেও আচ্ছা বিরক্ত করে তুলেছি, আর বিরক্ত করব না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রণতি বলিল, "না, না, বিরক্ত আমি মোটেই হইনি। আপনার কথা শুনে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।"

এক পা অগ্রসর হইয়া শরৎ বলিয়া উঠিলেন," না, না, দুঃখ করবেন না। আমার জন্যে দুঃখিত হওয়া আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমার জন্যে কেউ ব্যথা পাবে এ আমি ইচ্ছে করিনে, মিস বোস। আমি চিরকাল জগতের বাইরের জীব, জগৎ আমার কাছ হ'তে কোনদিন কিছু পায়নি, পাবেও না। আচ্ছা, আসি তবে আজকার মত, নমস্কার।"

নমস্কার করিয়া তিনি মাণিকের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বাড়ী যান, সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। একা এখানে আর বসে থাকবেন না।"

যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় প্রণতি চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, দূরবর্ত্তী স্থানগুলিতে অন্ধকার ঘনীভূত বলিয়া অনুভব হইতেছিল। তরল অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে শরৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রণতি উঠিয়া পড়িল।

আজ খুব সহজেই এই লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। বাস্তবিকই বেদনায় তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিতেছিল। এমন অসহায় অবস্থায় পড়িতে প্রায়ই কাহাকেও দেখা যায় না। ইহাকে প্রকৃত স্নেহ করিতে, প্রকৃত ভালবাসিতে এ জগতে কেহ নাই। যন্ত্রণায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে একটা কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করতে পারে না অথচ তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবই আছে।

প্রণতি যতই শরতের অসহায় অবস্থা ভাবিতেছিল ততই তাহার চিত্ত করুণায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শিউলি তলার স্মৃতি

শ্রীপ্রণব রায়

পথের ধারের শিউলি-তলা অশ্রু-স্মৃতি-মাখা
আজও আছে আঁকা
বেদন-রাঙা মরম-কোনে।
ছেলে বেলায় স্বপ্নপুরী সবুজ গাঁ'টী যখন পড়ে মনে
হারিয়ে-যাওয়া-স্মৃতির সুবাস জাগায় শুধু ব্যথা,
—মনে পড়ে দুটী চোখের সজল কাতরতা।...
মুখুয্যেদের বাড়ীর একটী পাশে
শ্যামল কোমল দুর্ব্বাঘাসে
বাগানখানি ঢাকা ছিল; তারই দখিণ ধারে
পায়ে-চলা মেঠো পথের পারে
শিউলি ফুলের গাছটী ছিল ফুলের ভারে নত
—শুভ্র বেশা কোন্ রূপসীর মত।
তারি তলায়
প্রতি বিকেল বেলায়
পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে সবাই হ'ত জড়
—ছোট এবং বড়।
সেই খানেতেই হয়
সাত-বছরের বেলার সাথে প্রথম পরিচয়।...
বেলা আমার সারাক্ষণের সাথী,
ছায়ার মত সাথে সাথে ফিরত দিবস রাতি।
অকারণে সইত আমার শতেক অত্যাচার,
ঝগড়া হোলে তারই হ'ত হার।
কত সময় ঝগড়া কোরে চড় মেরেচি তাকে,
কান্না ভুলে কিন্তু আবার ফিরত আমার ডাকে।
মোর তরে সে আন্‌ত আচার লুকিয়ে দুপুর বেলায়,
থাক্‌ত পাশে পুকুর ঘাটে মাছ ধরবার খেলায়।
সকল কাজে সারা দিবস ভোর
ওকে ছাড়া একদণ্ডও চল্‌ত না কো মোর।
মোর অপরাধ গোপন কোরে শাস্তি নিত নিজে—
সে সব স্মৃতি স্মরণ কোরে চোখদুটো আজ উঠ্‌ছে
জলে ভিজে।...
শিউলি তলায় রোজই হ'ত লুকোচুরি খেলা;
দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলা.
গভীর সুরে শঙ্খ উঠ্‌ত গেয়ে
বধুর রাঙা অধর পরশ পেয়ে।
দেবালয়ে উঠ্‌ত জ্ব'লে সন্ধ্যারতির শিখা,
ছায়া-নিবিড় দীঘির জলে মিলিয়ে যেত অস্ত-রবির লিখা।
তখন সবাই ফিরে গিয়ে ঘরে
শুতুম দাওয়ার পরে;
ঠানদি বুড়ীর গল্প অফুরান্
রূপকথার কোন্ কল্প-লোকে পাঠিয়ে দিত প্রাণ।...
না হ'তে শেষ রাতি,
না নিভ্‌তে শুক তারাটীর বাতি,
তরু শাখায় থাক্‌ত লেগে নিশার কালো ঘোর,

আলোর কুঁড়ির হয় নি বিকাশ ; হয় নি তখন ভোর।
চুপি চুপি হাজির হতুম শিউলি-গাছের নীচে—
সাজি হাতে বেলা আস্‌ত পিছে।
নাড়া পেয়ে গাছের শিউলি যত
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ পড়্‌ত ঝ'রে অশ্রু-ধারার মত।
সাজি ভ'রে বেলা তখন কুড়িয়ে নিত ফুল,
—পিঠ-ভরা তার দুল্‌ত এলো-চুল।
যৌবনেরই ফাল্গুনী হাওয়ায়
ফুটল বেলার রূপের মুকুল শতদলের প্রায়।
পৌছল তার কিশোর বুকে বসন্তেরই রঙিন্‌
লিপিখানি।
ব্যাকুল ক'রে তুল্‌ত মোরে বাতাস বেলার কেশের
গন্ধ আনি'।
ডাগর তাহার স্নিগ্ধ আঁখির ছায়া
ঘুমন্ত মোর প্রাণের পরে বুলিয়ে দিল সোনার কাঠির
মায়া।
নতুন ক'রে মুখখানি তার লাগ্‌ল আমার ভালো—
সে যেন মোর চিন্তাকাশে তরুণ উষার আলো।
শুন্‌তে পেলুম, ঠিক হোয়েচে তার সাথে মোর বিয়ে—
এমন সময় দু'হাত জমি নিয়ে
বেলার বাবার সাথে বাবার বাধ্‌ল ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি।
হ'ল লাঠালাঠি।
বর্ষাকালের নদীর স্রোতের মত
উভয় দলের মোকদ্দমা চল্‌ল অবিরত।
অবশেষে বাবার হ'ল হার,
পরাজয়ের লজ্জা-গ্লানি বাজ্‌ল বুকে তাঁর।
বাবা উঠ্‌লেন গর্জ্জে রোষে ফুলে—
"...ঘোষ-বংশের মেয়ে কভু আন্‌ব নাকো কুলে..."
বন্ধ হ'ল ওদের বাড়ী নিত্য যাওয়া আসা—
নিভ্‌ল সকল আশা।...
গোপন ব্যথার বোঝা নিয়ে বুকে
যেতে হোল কল্‌কাতাতে কলেজ অভিমুখে।
বিদায়-বেলা কার সে আকুল টানে
চাইনু ফিরে ওদের বাড়ীর পানে—
জান্‌লা-ফাঁকে বিদায়-করুণ মুখটী বেলার জাগে,
উতল হাওয়ায় রুক্ষ অলক মুখের পরে লাগে...
অশ্রু-সজল নয়ন দুটীর দৃষ্টি নিমেষ-হারা—
—যেন সাঁঝের তারা।

* * * *

বছর কয়েক পরে।...
আমি থাকি কল্‌কাতার এক ছাত্রাবাসের ঘরে।
কাজ শুধু মোর কলেজ আনাগোনা,
রাত্রি জেগে তৈরী করা 'বি,এ'র পড়াশোনা।
কোথায় বা সেই পল্লী-নভের মুক্ত অরুণ আলো।
অন্ধ আকাশ হেথায় শুধু কলের ধোঁয়ায় কালো।
হেথায় ভীষণ যন্ত্ররাজের চল্‌চে বিরাট স্তুতি,
রক্ত-শোষা কলের মুখে মানুষ জীবন দিতেছে আহুতি।
দুরন্ত সেই মেঠো হাওয়ার তরে
প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে ওঠে ইট-কাঠের এই প্রাচীরে
ঘেরা ঘরে।...
শুব্ধ অলস অবসরের ক্ষণে
কোন্‌ দূরে এক পল্লীবালার স্মৃতি পড়ে মনে।
পুঁথির পাতায় ফুট ওঠে তারি মুখের ছবি -
ভুলিয়ে দে' যায় সবি।...
খবর পেলুম এক প্রভাতে—
রাজীব বোসের সাথে
বেলার নাকি এই শ্রাবণেই বিয়ে!
তীক্ষ্ণ নিঠুর তীরের মত এই কথাটা বিঁধ্‌ল বুকে গিয়ে।
বেলার শুভ্র হাস্য-উজল ফুল্ল যুথী-মুখ
ভ'রে আছে আমার তরুণ বুক।
সে ই যে আমার প্রথম ভালো-লাগা,
যৌবন-মালঞ্চে মোর প্রথম ফাগুণ-জাগা।...
আমার প্রাণের দেউল শূন্য ক'রে
বধূ-বেলা চ'লে যাবে অচিন্‌ পরের ঘরে।
মর্ম্ম-বীণার ছিন্ন-তারে তাই
বাজ্‌ল শুধু বিসর্জ্জনের বেসুর মূর্চ্ছনাই।...
কিন্তু তাদের মিলন শুভ হোক্‌—
বেলার পথে পড়ুক সুখের মঙ্গল আলোক,
আমি শুধু হৃদয় দেউলে
গোপন ব্যথার রক্ত গোলাপ-ফুলে
সাজিয়ে দেব নিতি
শিউলি তলার স্মৃতি।......



ভয় কিসে ?

শ্রীদেবেন্দ্রলাল ঘোষ রায়

মৃত্যুরে সবে রস্তা দেখাও
মরিয়া নিজের ধর্ম্মতরে ;
শত্রু-মনে জাগাও শঙ্কা
অমিত শৌর্য্য-বর্ম্ম পরে'।

অহঙ্কারী মেয়ে।

শ্রীসুবোধ রায়

...ভের ডগায় এসেছিল কথাটা।

ভাবলুম ব'লেই ফেলি। একটু শ্রুতিকটু কাঠ-খোট্টা ধরণের শুন্‌তে হবে বটে। তা' হোক্। বড় লোকের মেয়ে ব'লে তা'র সব কথাই যে বেমালুম সহ্য ক'রে যেতে হবে, আমার অসহিষ্ণু মনের অতোখানি প্রসারতা নেই।

কিন্তু তখ্‌খুনি আর একটা কথাও মনে হলো—মেয়েদের সঙ্গে এই রকম ভাবে তর্ক-বিতর্ক অথবা বাদ-প্রতিবাদ করাই কি খুব উচিৎ হবে? সেটা যে ভারী নিন্দনীয়—ভদ্রতাবিরুদ্ধ কাজ!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ ক'রে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না। খুব ধীরে পরিষ্কার স্পষ্ট কণ্ঠে বল্লুম—কিন্তু কাজটা আপনার খুব অন্যায় হয়েচে। সামান্য একটা কারণে মায়া দেবীকে ঐ রকম ভাবে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াটা—

মরাল গ্রীবাটি লীলায়িত ভঙ্গিতে সঞ্চালন ক'রে ভ্রূ কুঁচ্‌কে চোখ দু'টো ডাগর করে নিভা বল্লে—কোন্‌খানটা অন্যায় হ'য়েচে শুনি?...একটা রাষ্টিক্, আনকাল্‌চার্ড্ গার্ল্ যদি না বুঝে রাগই করে, সেজন্য কি আমরা দোষী নাকি? তা'কে ত' আর গলায় হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিতে যাই নি?

—অবশ্য দয়া ক'রে গলায় হাত দেন নি স্বীকার করি, কিন্তু যা' বলেচেন, আমার মনে হয় যে কোনো লোককে তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে ঐ টুকুই যথেষ্ট। একেবারেই আত্ম-মর্য্যাদা যাঁদের নেই, তাঁদের কথা অবশ্য বল্‌তে পারিনে।

—কি এমন মর্ম্মঘাতী কথা ব'লেচি তাকে? একেবারে ননীর পুতুল আর কি! ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান। অত যারা সেন্‌সিটিভ্, তারা তর্ক করতেই বা কোন্ সাহসে আসে? গানের 'গ' জানেন না, তিনি আবার আসেন সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে। হাসি পায়, যত সব অদ্ভুত রিডিকিউলাস্ ব্যাপার!

—কিন্তু আপনি যে চটেছেন সে ত' শুধু মায়াদেবী এই আলোচনায় যোগদান ক'রেছিলেন ব'লে নয়, তিনি যে আপ্‌নার সম্মুখেও সাহস ক'রে লহরী ও রেণুকা দেবীর গানের প্রশংসা ক'রেছিলেন, আসলে সেই স্পর্দ্ধাটুকুই আপ্‌নার কাছে অত্যন্ত অসহ্য ও বিরক্তিকর মনে হ'য়েছিল। সত্যি বলুন ত' নিভা দেবী, আমি যা' অনুমান করচি তার কি সবটাই মিথ্যে?

একটা তাচ্ছিল্য-সূচক মুখভঙ্গী ক'রে নিভা বল্লে—অল্ হাম্‌বাগ্। আপনি এ সব ছাই পাঁশ কি বল্‌চেন সুশান্ত বাবু? হ্যাভ্ ইউ লষ্ট ইওর ব্রেন্? আপনি চেনেন না ঐ মায়া মেয়েটিকে, অত বড় পর-শ্রীকাতর সেল্‌ফিস্ মেয়ে আমি ত' আর দেখিনি। ব্যাক্ ব্যাইটিংএ বোধ হয় ওর জুড়ি মেলে না। অথচ এম্নি মিষ্টি কথা বার্ত্তা যে ফস্ ক'রে কিছু ধরাও যায় না। একদম পয়োমুখ বিষকুম্ভ যাকে বলে।

তারপর একটু থেমে মাথাটা দুলিয়ে আবার বল্লে - সেদিন টেনিস্ খেলার সময় মনে আছে ত? আপনি ত' মেজ্‌দার সঙ্গে খেলা দেখ্‌ছিলেন—কি রকম অভদ্রের মতো একটা টন্টিং রিমার্ক্ পাস্ করলে! শুনেছেন ত?......না হয় ইংরাজিতেও একটা কথার উত্তর দিয়েছিলুম। ফস্ ক'রে বলে কিনা—যে রকম দেখ্‌চি মিস্ দেভির বাংলা শেখ্‌বার জন্য দু'দিন পর একটা পণ্ডিত মশায়ের প্রয়োজন হ'তে পারে। তারপর আমার হাব-ভাব ভঙ্গী নিয়ে, এমন কি আমার খোপা বাঁধা থেকে 'ভি' কলারের ব্লাউস্ আর ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা শাড়ীটিরও পর্য্যন্ত খুঁত্ ধ'রে সে সব বিশ্রী আলোচনা করে, তা' শুন্‌লে সত্যি কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে করে। কি রকম ফন্ট, ফাইণ্ডিং নেচার দেখেচেন? ঐ সব সার্‌কাজম এর অর্থ বুঝিনে, এতই কি ন্যাকা আমি?

—আপনি অনর্থক নিজকে উত্তেজিত ক'রে তুল্‌চেন নিভা দেবী। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যে ঠাট্টারই সম্পর্ক একথা ভুলে যাচ্চেন কেন? তা ছাড়া তিনি ত' আপ্‌নাকে এমন কিছু অন্যায় কথা বলেন নি। আপনি আজ যে রকম নির্ম্মম ভাবে তাঁকে তাঁর দারিদ্র্যের কথা তুলে মর্ম্মে আঘাত দিয়েচেন, শুধু তিনি গরীব ব'লেই সকলের সামনে তাঁকে যে রকম অপদস্থ অপমান ক'রেচেন—

—একটা ফলস্ কলারিং দিয়ে ব্যাপারটাকে ক্রমশই আপনি অতিরঞ্জিত ক'রে তুল্‌চেন দেখচি। উচ্চ শিক্ষা পেয়েও কেন যে আপনার এই কমন্ সেন্স টুকুর অভাব হচ্চে বুঝতে পার্‌চি নে। এত স্লো আণ্ডারষ্ট্যান্‌ডিং যা'র তা'র কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করতে যাওয়াই আহম্মকি।...দুঃখ হয়। ভেবেছিলুম আপনার মধ্যে কিছু পদার্থ আছে।

—এখন বুঝি দেখলেন, একেবারেই অপদার্থ।

—তা ছাড়া কি? এসব বিষয় নিয়ে ধানাই পানাই করা কি পুরুষের কাজ নাকি?... মায়ার পক্ষ নিয়ে প্লিড্ করতে এসেচেন লজ্জা লাগে না আপনার? আমাদের মেয়েদের ব্যাপারে আপ্‌নার ইণ্টারফিয়ার্ ক'রবারই বা কি রাইট্ আছে শুনি?

—অধিকার আছে কি না জানি না, তবে আমার মনে হয় এই অধিকারটুকু সম্পূর্ণ ভাবেই পেতুম যদি মায়া দেবীর আচরণের মিথ্যা নিন্দা ক'রে আপনার পক্ষ সমর্থন করতে পারতুম। আপনার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করতে পারিনি ব'লে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে নিভা বল্লে—আই বিসিচ্ ইউ সুশান্ত বাবু, প্লিজ্, রেস্‌ট্রেণ ইওর টাং। ইউ আর সিম্‌প্লি টকিং ননসেন্স্। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সে প্রেষ্টিজ্ রেখে কথা বলতে পারে না তার

সঙ্গে কথা বল্‌তে আমি ঘৃণা বোধ করি। ... কত বড় অন্যায় যে ক'রেচেন, সে কথা বাড়ীতে গিয়ে একবার ভেবে দেখবেন।

—অন্যায়? অন্যায়ের প্রতিবিধান কর্‌তে যাওয়া যদি অন্যায় হয়, তা' হ'লে প্রার্থনা করুন নিভা দেবী, ভবিষ্যতে এ রকম সহস্র অন্যায় কর্‌তেও কখনো যেন বিচলিত না হই।

বুঝলুম প্রতিবাদ কর্‌তে যাওয়াই বৃথা। তর্কে যে আজ পর্য্যন্ত কোথাও পরাজয় স্বীকার করেনি, তা'কে পরাস্ত করা আমার সাধ্য নয়। হয় ত দু' একজন ছাড়া তর্ক কেও করেও নি—ভয়েই করেনি নিশ্চয়। নিভা বোসের মতো বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে অসদ্ভাব রেখে কে-ই বা তা'র দুর্লভ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হ'তে চায়?

একটী কথাও না ব'লে একদম চুপ ক'রে গেলুম। আমার দিকে একটা ঘৃণাবিরক্তিভরা তীব্র কটাক্ষ হেনে নিভা তাঁর হাই হিল জুতোর খট্‌খট্ শব্দ ক'রে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর নূতন কেনা আইভরি রঙের মিনার্ভা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

* * *

এখানে নিভারাণী কিম্বা মিস্ নেভি বোসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। স্বনাম-ধন্য ব্যারিষ্টার সর্ব্বজন-পরিচিত মিঃ এন্ এন্ বোসের তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা সুতরাং আদরিণী কন্যা।

বেথুনে পর পর দু'টী বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় হয়ত ঐ কলেজেরই প্রতি কিরূপ বিতৃষ্ণ হ'য়ে, সম্প্রতি তিনি ডায়োসিসানে ভর্ত্তি হ'য়েচেন। ... ফেল করার একটা দুর্নাম ঘুচাবার জন্য একেবারে প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রেই তিনি এবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। ফলে তৃতীয় বিভাগে পাশ ক'রে দুর্নামও অনেক খানি ঘুচাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন।

তৃতীয় বিভাগে পাশ ক'রে যাঁরা খুঁত্‌ খুঁত্ করেন, তাঁরা যেন কোনও রকমে নিভা দেবীর আনন্দোজ্জ্বল গর্ব্বোৎফুল্ল সদাহাস্যময় মুখখানি শুধু একটী নিমেষের জন্যও ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করেন। ...... অবশ্য তিনি দর্শন-সুলভ বলেই এ কথা বল্‌তে সাহসী হলুম। অভিনয় অথবা সিনেমাতে তিনি ত নিয়মিত ভাবে যান-ই, তা ছাড়া University Institute, Albert Hall, কিংবা Y. M. C. A.তে ও তাঁর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি। কোনো বিশেষ অভিনয় অথবা সঙ্গীত সম্মিলনীতেও তাঁকে অনুপস্থিত থাকৃতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ...... তাঁর হাল্‌কা রেশমের মতো চুল আর ফিন্‌ফিনে শাড়ীর উড়ন্ত আঁচল শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় কত ভাবুক কত উদাসী পথিকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেচে তার আর সংখ্যা নেই।

অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল লোকও তাঁর তিন খানি মোটরের নম্বর মনে রেখে একটু আনন্দ-ভরা গর্ব্ব অনুভব করেন।

ঠিক্ সন্ধ্যার সময় তিনি নিয়মিত ভাবে গড়ের মাঠে, কিম্বা ইডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটেও বেড়াতে যান। সুতরাং নিভা-দর্শনেচ্ছু কোনো নূতন বিদেশী লোকের পক্ষে ঐ সব জায়গাতেও তাঁর দর্শন লাভ ঘটা খুবই সম্ভব। ... ...

অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা দুর্দ্দম বাসনা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে যদি কেও ব্যর্থ-মনোরথ হন, তা হ'লে সে দোষ তাঁরই। কারণ তিনি স্বভাবতঃই ওজন ক'রে কেবল মাত্র দু'চারিটি কথা বলেন, আর তাও শুধু রীতিমত আলোক প্রাপ্ত ধনী পরিবারের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। মধ্যবিত্ত কিম্বা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় রাখাকে তিনি অত্যন্ত লজ্জা এবং অপমানের বিষয় বলে মনে কর্‌তেন। ... ...

অর্থ সম্পদ ছাড়াও নিভার আরও একটী যে জিনিষ ছিল, সে হচ্চে তাঁর রূপ। রূপ বটে! অমন মন-মাতানো, প্রাণ-ভোলানো, চোখ-ঝল্‌সানো রূপ

সচরাচর খুব কমই চোখে পড়ে। ... ... শ্যামবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে কালী ঘাটের ট্রাম ডিপো পর্য্যন্ত এমন কোনো প্রেমিক যুবক ছিল না, যার মর্ম্মভাঙা মুষড়ে যাওয়া প্রাণটি তাঁর রূপের কেল্লায় বন্দী হয় নি।

সুতরাং রূপের অহঙ্কারও তার কোনো সেরা রূপসীর চাইতেও কম ছিল না। কুরূপ কুৎসিৎদের তিনি আবর্জ্জনার সামিল মনে করতেন, কথা বলতেন শুধু সুন্দরী মেয়ে এবং সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে। আর তাঁর কথা বলার মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল এইটুকু যে বাংলা কথার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরেজী বুক্‌নি না দিয়ে তিনি কোনো একটা পদকেই পূরণ করতে পার্‌তেন না।

এ হেন অহঙ্কারী চালিয়াৎ মেয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়াতে যে অহঙ্কার আরও বেড়ে উঠবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ... ...

আধুনিক রুচি ও ষ্টাইল অনুযায়ী নিত্য নূতন রকম সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে আজকাল কোন দিন তিনি মিনার্ভা, কোনো দিন উল্‌সলি কোনো দিন বা এসেক্স্ গাড়ীতে চ'ড়ে কলেজে যান। তারপর কলেজে গিয়ে চক্‌চকে নূতন বইয়ের ব্যাগটি হাতে নিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দের তালে নেভি ব্লু রঙের নাগ্‌রা পায়ে কোরিডোরে খুব আস্তে পা ফেলে ফেলে হাঁটেন। ... ...

কলেজে স্বেচ্ছায় প্রসন্ন মনে যে দু'টী মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের নাম লতিকা ও অবলা। দু'জনেই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। আর খুব অনিচ্ছায় একান্ত বাধ্য হ'য়ে যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেন, তিনি গরীব। নাম মায়া চৌধুরী। ... এই মেয়েটি তাঁর স্নিগ্ধ রূপ ও মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে কলেজের সকলকেই আপন ক'রে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আরও একটী যে প্রশংসনীয় দুর্ল্লভ গুণ ছিল, সেটি হচ্চে তিনি আজ পর্য্যন্ত বরাবর সব ক্লাশেই প্রথম স্থানটী বেমালুম ভাবে দখল ক'রে এসেচেন। ... ...

লতিকা ও অবলা দেবী এই মায়া মেয়েটীকে এক মুহূর্ত্তও কাছ ছাড়া ক'রে থাক্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর রহস্য-পটুতা ও গুছিয়ে কথা বল্‌বার বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গীটুকু তাঁদের দু'জনেরই হৃদয় ভারী মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। ... ...

দোষের মধ্যে মায়া দেবী ছিলেন একটু যেন অতিরিক্ত রকমের স্পষ্টবাদী। রেখে ঢেকে তিনি কথা বল্‌তে পার্‌তেন না। প্রয়োজন হ'লে নিভা বোস্‌কেও তিনি স্পষ্ট কথা বল্‌তে কোনো দিন কুণ্ঠিত হন নি। এ জন্য অনেক সময় অনেক অভিযোগও শুনতে হয়েচে তাঁকে। এমন কি প্রকাশ্য ভাবে নিভা বোসের কয়েকজন ধামাধরা খোসামুদে বন্ধু তাঁকে অপমানসূচক অনেক কর্কশ কটু কথাও বলেচেন।

দারিদ্র্যের অসম্মান ক'রে মায়া দেবী তবু আজ পর্য্যন্ত কোনো অন্যায়েরই প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। ..

হয় ত এই একমাত্র কারণেই তিনি নিভা দেবীর অত্যন্ত চক্ষুঃশূল ছিলেন। একজন হীন দরিদ্র ঘরের মেয়ের এই রকম অস্বাভাবিক স্পষ্টবাদিতার স্পর্দ্ধা দেখে নিভা দেবী প্রথম দিনই তাঁর ওপর হাড়ে চটে গিয়েছিলেন। তবু যে অত বড় অপরাধকেও ক্ষমা করে তিনি আজও দয়া ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, সে শুধু অবলা ও লতিকার খাতিরে, প্রিন্সিপ্যাল ও প্রফেসারেরা নেহাৎ তাঁকে ভালবাসেন ব'লে।

নিভা দেবীর চরিত্রের আরও কয়েকটী দিক দেখাতে পারা যেত, কিন্তু তা হ'লে অনাবশ্যক ভাবে গল্প ত' বড় হ'তোই, উপরন্তু নিভা দেবীও আমার ওপর মোটেই প্রসন্না হ'তেন না। পৃথিবীতে একটী মেয়েকেও বিশেষতঃ তাঁর মতো বড় লোকের মেয়েকে চটিয়ে রাখি এ আমার আদৌ ইচ্ছা নয়। সুতরাং তাঁর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েই আপাততঃ আপ্‌নারা সন্তুষ্ট থাকুন।

(২)

একটা বিশ্রী এক ঘেঁয়েমির মধ্যে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছিল। কতক্ষণ আর এম্নিভাবে চুপ্‌চাপ ব'সে থাকা যায়?...সময় কাটাবার জন্য ওর ডিডাক্‌টিভ্

লজিকটাই হাতে নিয়ে বসি—কিছুক্ষণ পরেই আবার বিরক্তি আসে।......ওর নোটের খাতাগুলো খুলে কিন্তু আগাগোড়া পড়্‌তে ইচ্ছে হয়। মেয়েলি ছাঁদে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে কি সুন্দর স্পষ্ট ওর লেখা।

অক্ষরগুলো একটার পর একটা ক'রে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি।......

আশ্চর্য্য! ওর টেবিলটায় কিন্তু কোনো লক্ষ্মী হাতের নিপুণতার আভাস পাইনে। কেমন যেন বিশৃঙ্খল এলোমেলো ভাব! সত্যেন বাবুর 'মণি মঞ্জুষা' আর রবীন্দ্রনাথের 'দীপালি' থেকে আরম্ভ ক'রে 'রঘুবংশ' আর 'রোমের হিষ্ট্রি' সব যেন মিতালি পাতিয়েছে—যেন সহোদর ভাই!

কিন্তু এ যে আধ ঘণ্টারও ওপর হ'য়ে গ্যাল। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। ছোটো একটা স্লিপের ওপর কয়েকটি কথা লিখে রেখে সীসের পেপার ওয়েট্‌টা চাপা দিতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কার মৃদু সন্তর্পণ পদক্ষেপ কাণে এসে পৌঁছুলো।

দু'টী চোখে এক রাশ বিস্ময় ভ'রে এগিয়ে এসে মায়া জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও মা—আপনি কখন এসেচেন, সুশান্ত বাবু?

—অনেক্ষণ। প্রায় আধ ঘণ্টারও ওপর।

—বলেন কি? মাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাননি কেন? আপ্‌নার মতো আর লাজুক দেখিনি। কেন মণ্টু ও ত' আছে বাড়ীতে।

বল্লুম—মাসীমার কাছেই প্রথম গিয়েছিলুম—দেখ্‌লুম তিনি আহ্নিক কর্‌চেন, তাই আর ডাকিনি তাঁকে।

—ছিঃ—আপ্‌নার হয় ত' অনেক ক্ষতি হ'লো কাজের। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন সুশান্ত বাবু—আমার কোনো দোষ ছিল না। আপনি এসেছেন জান্‌লে কাপড় কাচার কাজটা আজ আমি বিকেলের জন্যই রেখে দিতুম।

বিনয় ও কুণ্ঠায় কণ্ঠস্বরটা যেন ওর ভারী হ'য়ে ওঠে।...চেয়ে দেখ্‌লুম দীর্ঘপল্লবঘন ওর দু'টী চোখ খুব মিষ্টি স্থির ভাবে চেয়ে আছে। ডান হাতের কনুইয়ের ওপর কতকগুলো নিংড়ে নেওয়া কাচা কাপড় ব্লাউস ও সেমিজ নিয়ে কাঁধের ওপরেও কতকগুলো ভিজে কাপড় নিয়ে হয় ত' ঐ সোপ কেস্‌টি রাখ্‌বার জন্যই ও এঘরে ঢুকেছিল।

বল্লুম—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার এমন কিছুই কাজ ছিল না।...অবশ্য মিথ্যা কথাই বল্লুম। ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় এমন অনেক কথাই বল্‌তে হয়।

সেল্‌ফের ওপর সোপ কেস্‌টা রেখে একটু ব্যস্ততার ভঙ্গীতেই মায়া বল্লে,—একটু বসুন আপনি। এই তিনটি মিনিট। আমি চট্‌ ক'রে এই কাপড়গুলো মেলে দিয়েই আস্‌চি।

গতি-চঞ্চলা লজ্জাবনতা সেই মূর্ত্তির পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ নয়নে।

একটুও বুঝি রোদ সয় না। সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে ওর ঘাম ঝরে। ঘামে ত' না যেন নেয়ে ওঠে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরে ঢুকে বল্লে—বাপ্‌—যা' গরম পড়েচে।...একটু হাঁফায়ও।

হঠাৎ আমার হাতে ওর নোট খাতাখানি দেখে একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে খাতাখানি ছিনিয়ে নিলে। কী সে অশান্ত অস্থিরতা!

খাতা ত' নয় যেন গোপন চিঠি।

তারপর ক্ষিপ্র হাতে খুব তৎপরতার সঙ্গেই টেবিল থেকে সমস্ত খাতাগুলো সরিয়ে রেখে অস্ফুট মৃদু স্বরে বল্লে—আচ্ছা ত' চোর আপনি। ছিঃ, ঐ সব বিশ্রী লেখাগুলো—

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম—বেশ ত' না হয় চোরই হলুম, এখন কি জন্য ডেকেচেন আমায় তাই বলুন। আপাততঃ আমি সেই কথাটী জান্‌বার জন্যই বেশী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচি।

অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে ও বল্লে,—হ্যাঁ বল্‌চি। এক নিমেষেই ওর সমস্ত মুখখানি কেমন যেন রক্তহীন ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে।...অপলক দৃষ্টিটা মাটীর দিকে নিবদ্ধ ক'রে কি যেন ভাবে!

ওর মুখের ঐ ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য ক'রে দ্বিধা-কম্পিত কণ্ঠে বল্লুম—বলুন। চুপ ক'রে রইলেন যে!

ভৎ'সনার ভঙ্গীতে সোজা হ'য়ে বসে ও বল্লে—আমার পক্ষ নিয়ে নিভার সঙ্গে সেদিন আপনি তর্ক কর্‌তে গেলেন কেন?

আকণ্ঠ উদ্বেগ অতিকষ্টে চেপে সহজ ভাবেই বল্লুম—ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে কলহ করাই আমার স্বভাব। কেন কি হ'য়েচে শুনি?

কাঁধের সাম্‌নে এলিয়ে পড়া ভিজে চুল থেকে তখনও দু'এক ফোঁটা জল ওর গায়ে বুকে টস্ টস্ ক'রে ঝরে পড়্‌চিল। চুলগুলোকে পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে ও আবেগ ভরা জড়িত কণ্ঠে বল্লে—খুব অন্যায় হ'য়েচে আপ্‌নার। নিভার কথার উত্তর আমিই ত' দিয়ে এসেছিলুম, আপনি আবার ঐ কথা নিয়ে কেন নাড়াচাড়া কর্‌তে গেলেন? আমার মান-অপমান নিয়ে আপ্‌নারই বা হঠাৎ অত মাথাব্যথা করবার প্রয়োজন হ'ল কেন? প্রতিবাদ কর্‌বার আগে আপনি যদি সেদিন একটীবারও তার ফলাফল-টার কথা ভাব্‌তে পার্‌তেন ত'হলে হয় ত' আজ—

ওর দু'টী চোখে একটী অসহায় বেদনা—একটা নিবিড় দুঃখের ভাবই ফুটে উঠ্‌ল।

একটু থেমে আবার বল্লে—নিজের দুর্নামের জন্য আমি হয় ত' অতখানি বিচলিত হতুম না, কিন্তু আমার নামের সঙ্গে আপ্‌নার নামটিকেও জড়িয়ে ওরা—যে রকম নির্লজ্জের মতো বিশ্রী কুৎসা রটালে তা' সত্যিই অসহ্য। আশ্চর্য্য হই এমন নিষ্ঠুর আনন্দেও মানুষের মন মেতে ওঠে?...ক্লাসে আগে যে সব মেয়েরা সব চেয়ে মুখচোরা লাজুক ছিল, তারাও আজকাল হঠাৎ পরিহাস-চঞ্চলা মুখরা হ'য়ে উঠেচে। ভাবচি এমন মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা সওয়াও অদৃষ্টে ছিল?

বল্লুম—অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি যে আপ্‌নাকে এমন ভাবে অপমানিত কর্‌ব, তা' আগে কল্পনাও কর্‌তে পারি নি।...আমার যে কি অনুতাপ হচ্ছে!

অবিচলিত মৃদুস্বরে ও বল্লে—আর একটুও দুঃখ নেই সুশান্ত বাবু। এই সব কুৎসিৎ অপবাদ শোনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটী মাত্র যে উপায় ছিল, সেই উপায়ই অবলম্বন কর্‌লুম। ঠিক্ ক'রেচি আজ থেকে আর যাব না কলেজে। অবশ্য অনেক ভেবেই স্থির ক'রেচি। কারণ পড়াশুনো যে এত শীগ্‌গির ছাড়্‌তে হবে একথা কোনো দিনই ভাব্‌তে পারি নি।

ভয়'নক উত্তেজিত হ'য়ে বিস্ময়কম্পিত কণ্ঠে বল্লুম—কী! আপনি কলেজ যাবেন না? না, না, সে হবে না, কিছুতেই হ'তে পারে না। আমার জন্য আপনি এত বড় শাস্তিকে যদি বরণ ক'রে নেন—তা হ'লে আজীবন আমার আর অনুতাপের সীমা থাক্‌বে না।

ও শুধু হাস্‌লে। বল্লে—আমার সঙ্কল্প স্থির। নইলে পড়াশুনোতে অমনোযোগ বা অনিচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। আপনি একথা মাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—তা হ'লে যাবেন না কলেজে?

—না।

—মিথ্যা দুর্নামকে ভয় ক'রে আপনি এম্নি ক'রে আপ্‌নার আত্মবিসর্জ্জন দেবেন?...এত আপনি—এত দুর্ব্বল?

—দুর্নাম মিথ্যাও খারাপ। কিন্তু এ দুর্নাম ত' আমারই নয়, আপনার নামেও তারা যে মিথ্যা কলঙ্ক দেয়।

আপ্‌নার নামের সঙ্গে আমার নামটি জড়িয়ে যায়, তা' বুঝি আপনি চান্ না—ভারী বুঝি ঘৃণা হয়?

ওর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি এক নিমেষেই আরক্ত হ'য়ে ওঠে। লজ্জানত চোখ দু'টী তুলে মোলায়েম সুরে বল্লে—মানুষকে ঘৃণা কর্‌বার মতো শক্তি আজও সঞ্চয় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

সাহস পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে ব'লে ফেল্‌লুম—তা হ'লে বুঝি লজ্জা হয় খুব? আচ্ছা মায়া দেবী, যদি আমরা তাঁদের মন-গড়া সম্বন্ধকেই একান্ত সত্যে

পরিণত কর্‌তে পারি, তা হ'লে ত' কেউ আর আমাদের বিদ্রূপ কর্‌তে সাহস করে না। আগের মতো নির্ব্বিঘ্নেই ত' তাহ'লে আপ্‌নার পড়াশুনো চল্‌তে পারে।

একটা দুর্নিবার লজ্জায় সমস্ত মুখখানি ওর রক্ত গোলাপের মতোই লাল হ'য়ে উঠেছিল। মুখট. নীচু ক'রেই বল্লে—না, কলেজে যাওয়া আর কিছুতেই হ'তে পারে না।

—কলেজে না হয় না ই গেলেন আমায় গ্রহণ কর্‌তেও কি সম্মতি নেই আপ্‌নার ?

সলজ্জ কণ্ঠে একটু যেন বিস্ময়ের সুরে ও বল্লে—আমি কি জানি তার, বা রে! আপনি ওসব কথা বরং মার কাছে—

পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম রক্তস্রোত আমার দেহের শিরায় শিরায় তখন উছ্‌লে উঠ্‌চে। হঠাৎ ওর নিটোল কোমল একখানি হাত খপ্‌ ক'রে চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্লুম—কিন্তু একথা আমি আপ্‌নার মুখ থেকেই শুন্‌তে চাই। আমায় গ্রহণ কর্‌তে আপ্‌নার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে,—বলুন ?

সবলে নিজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ও শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালে। তারপর একটা দুর্দ্দমনীয় নিবিড় লজ্জাকে কিছুতেই আর গোপন কর্‌তে না পেরে দ্রুতবেগে ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে গেল।

* * * *

বিচিত্র কায়দায় অপরূপ ভঙ্গীতে নিভা অর্গ্যানের সঙ্গে কবি নজ্‌রুলের একটী গজল্‌ সুরের গান ধরে ছিল।

বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই ফুল শাখাতে
　　দিস্‌নে আজই দোল।
আজো ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি
　　তন্দ্রাতে বিলোল॥
আজো হায় রিক্ত-শাখায় উত্তরী বায়—
　　ঝুর্‌ছে নিশিদিন।
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া
　　মৌমাছি বিভোল॥

হঠাৎ পাশের ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনে নিভা খানিকক্ষণ অর্গ্যানটা থামিয়ে চুপ ক'রে কান পেতে রইল।

সে শুন্‌লে তার বাপ কাকে যেন বল্‌চেন—সে একশবার, তার আর কথা। ঐ রকম তেজী মেধাবী ছেলেই ত' বাংলায় দরকার এখন। শুধু এম-এ তে ফার্ষ্ট্‌ ক্লাস পেয়েচে ব'লেই বল্‌চিনে, সুশান্তর কথার ভেতরেই আমি ওর অদ্ভুত শক্তি, অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাই।

নিভা আশ্চর্য্য হ'য়ে শুন্‌লে তার মেজ্‌দা নির্ম্মল উত্তর দিচ্চে,—তা ছাড়া আমরা ত' সর্ব্বক্ষণ সুশান্তকে দেখ্‌চি। ওর প্রকৃতিও ভারী কোমল খুব, অমায়িক।

মা বল্লেন—আর দেখ্‌তেও ঠিক কার্ত্তিকের মতো। কি সৌম্য চেহারা! আমার কিন্তু ওকে ভারী ভালো লাগে।

বাবা বল্লেন—পাত্র হিসেবে সুশান্ত যে খুবই কামনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কথা হচ্চে নিভা যদি ওকে দরিদ্র ব'লে—

মা বল্লেন—ওদের পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতি আছে ব'লেই ত' আমার বিশ্বাস। আমার ত' মনে হয় সুশান্তকে ও নিশ্চয়ই ভালোবাসে।

বাবা বল্লেন—শোনো নিমু—তুমি তা' হলে এ প্রস্তাবটা স্পষ্টই সুশান্তর কাছে উত্থাপন কর্‌তে পারো, যদি দেখো—

মেজ্‌দা বল্লে—কিন্তু তার আগে নিভারও ত' একটা মত নেওয়া দরকার। এখন আর সে ছোটটি নয়: তা'রও ত' একটা স্বাধীন মত আছে।

মা বল্লে—সে ;ত' ঠিকই। তা' আমি এখনই ডেকে আন্‌চি নিভিকে।

মেজ্‌দা বল্লে—তা হলে আমাকে নীচে যেতে হয়। আমি থাকলে সে একটী কথাও বল্‌তে পার্‌বে না।

একটা তাচ্ছিল্যভরা বিরক্তিতে নিভার সমস্ত অন্তরটা শুধু একটী মুহূর্ত্তের জন্য অভিভূত হয়ে

উঠ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সামান্য বিবেচনায় একেবারে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে সে আবার গাইতে সুরু কর্‌লে—

ফাল্গুনের মুকুল জাগা দুকুল ভাঙ্গা
পুষ্‌বে ফুলেল্‌ বাণ।
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি
ফুট্‌বে গালে টোল॥
বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই—

ঘরে ঢুকেই মা বল্লেন—একটা কথা শুনে যা নিভি, বাবু ডাক্‌চেন।

এত শীগ্‌গির সঙ্গীত চর্চ্চাটা বন্ধ কর্‌তে নিভা আজ মোটেই রাজী ছিল না। কারণ 'বুল্‌বুলি' গানটি সে সবে মাত্র কাল্‌কেই শিখেছিল, আর তার মিঠে সুরটাও তার ভারী পছন্দসই হ'য়েছিল।

তবু অনিচ্ছা সত্বেও বিনা বাক্যব্যয়েই সে অর্গ্যান বন্ধ ক'রে মার অনুগমন কর্‌লে—কারণ তুচ্ছ হ'লেও ঐ ব্যাপারটা সম্বন্ধে তা'র কৌতূহলও হ'য়েছিল যথেষ্ট।

মিঃ বোস্‌ বল্লেন—বুঝ্‌লে নেভি, সুশান্তর সঙ্গে তোমার বিয়ের একটা সম্বন্ধ ঠিক্‌ কর্‌চি আমরা,—তোমার আপত্তি নেই ত?

উচ্চাভিলাষী দর্পিতা নিভা বাপের এই আকস্মিক অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। সে অবাক্‌ হ'য়ে ভাব্‌লে—শেষকালে বাবাও এমন অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বল্‌তে সুরু কর্‌লেন! সুশান্তকে তিনি জামাই ক'রে ঘরে আন্‌তে চান্‌—কেন, পাত্র কি দেশে এমনই দুর্ল্লভ হ'য়ে পড়েচে? না হয় মানলুম খুব রূপবান সে, খুব সুন্দর—বেশ ত' পাঁচু গয়লা আর গোবিন্দ সোফারও ত' আর কম সুন্দর নয়, তাই বলে—

ঘৃণায় বিরক্তিতে নিভার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তবু বাপের মুখের উপর একটা কর্কশ কটু উত্তর দিতেও সহসা তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেক্‌ছিল। লজ্জাজড়িত মৃদু কণ্ঠে সে শুধু বল্লে—আমার আপত্তিতে ত' আর কিছু যাবে আস্‌বে না, বাবা! তোমরাই যখন বিবেচনা ক'রে—

বাধা দিয়ে মিঃ বোস্‌ বল্লেন—আমরা সকলেই একমত। কেবল তোমার একটা কথার উপরেই বিবাহ হওয়া না হওয়াটা নির্ভর করচে।

এই নিষ্করুণ কথাগুলো নিভার মনে আরও একটু বিরক্তির সঞ্চার কর্‌লে বটে, কিন্তু বাপের কাছে এই নিজের বিয়ের সম্বন্ধেই এমন ক'রে কথা বল্‌তে সে যেন আজ সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের মতোই লজ্জায় দ্বিধায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ল।

সে বল্লে—আমার কোনো মত নেই। আমি কিছু জানিনে।

মিঃ বোস্‌ ভাব্‌লেন যে তাঁর মেয়ে হয় ত' লজ্জা করেই একটা স্পষ্ট উত্তর দিতে পার্‌চে না। পত্নীর দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত ক'রে তিনি একটু প্রসন্ন হ'য়েই বল্লেন—তা হ'লে একটা দিন স্থির ক'রে ফেলা যাক্‌—কি বলো?…এই মাসের মধ্যেই যাতে—

নিভা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সোফার ওপরে অত্যন্ত হতাশার ভঙ্গীতে আছড়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়া চুল আর লুটিয়ে পড়া আঁচলে মুখ চেপে অস্পষ্ট করুণ কণ্ঠে বল্লে—আমার বিয়ের জন্য কা'রও মাথা ব্যথা কর্‌তে হবে না। আমি চিরকুমারীই থাক্‌ব—সেই ভালো আমি কা'রও—তারপর সে কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।………

মিঃ বোস্‌ ও তাঁর পত্নী অনেক বুঝিয়ে তাঁদের সমস্ত কথা প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে সেদিন তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরিণী কন্যাকে শান্ত ক'রেছিলেন বটে —কিন্তু অনেক মিনতি অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রেও সে বেলা অভিমানিনী নিভাকে আহার্য্যের একটী কণাও মুখে দেওয়াতে পারেন নি।

* * *

টিং — টিং — টিং … …

রিসিভারটা কাণে নিয়ে নিভার বৌদি বল্লে—

হ্যালো, কাকে চান আপনি ?

কে বৌদি ? ··· আমি লতিকা। নিভাকে একটু ডেকে দিতে পারো ?

খুব পারি। তবে দরকারটাও অবশ্য আমায় জেনে নিতে হবে।

দরকার বিশেষ কিছুই নয়। কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে ফোন্ ক'রে তোমাদের বিরক্ত কর্‌তে আমার ভারী মজা লাগে। নিভা এখন কি কর্‌চে ভাই ?

আমার 'তাঁর' সঙ্গে তেতলার ঘরে বিলিয়ার্ড্ খেল্‌চে।

কার সঙ্গে বুঝ্‌লুম না। তোমার 'তাঁর' সঙ্গে মানে ?

ইস্! কচি খুকী আর কি!···দুধ খাবে ?

ভাল কথা, বৌদি, সুশান্ত বাবু তোমাদের ওখানে এর মধ্যে গেছ্‌লেন কোনো দিন ?

পরশু এসেছিলেন, কেন, বল ত ?

এম্‌নি জিজ্ঞেস কর্‌লুম। নিভা বুঝি ঐ ব্যাপারের পর আর কথাও বলে না তাঁর সঙ্গে ?

অতটা লক্ষ্য করিনি। তবে ঠাকুর ঝি আজকাল কেমন যেন হঠাৎ একটু উদাসীন গম্ভীর হ'য়ে পড়েচে ব'লে মনে হয়। যে সুশান্ত বাবুর কথা উঠ্‌লে আগে তার বিরক্তির সীমা থাক্‌ত না, আজকাল তাঁরই প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে—অপর কেউ তাঁর কথা বল্‌লে উন্মুখ আগ্রহে কাণ পেতে থাকে।

আশ্চর্য্য! তুমি বল্‌চ কি বৌদি ?

এক বর্ণও মিথ্যা বল্‌চিনে ভাই। ওর এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে প্রথমটা আমরাও ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছলুম—কিন্তু পরে বুঝ্‌লুম ও বোধ হয় এতদিনে ওর ভুল বুঝতে পেরেচে। সুশান্ত বাবুর দারিদ্র্যকেই ও বোধ হয় আজ সম্মান কর্‌তে শিখেচে। ··· ···

খুব অদ্ভুত ত! তা' সে যাক্, তুমি একবার তাকে ডেকে দ্যাও বৌদি। তার পরিবর্ত্তনটুকু প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝতে ভারী কৌতূহল হচ্চে আমার।

বৌদির সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে ফোন্‌টা হাতে নিয়েই নিভা বল্লে—কি গো স্বর্ণলতিকা ? ··· না না লতি—লতি পটোল লতি আমার! হঠাৎ আমায় মনে পড়্‌ল যে—সূর্য্য আজ কোন্ দিকে—

বাধা দিয়ে লতিকা বল্লে—তোর কাব্য পরে শুন্‌ব। এখন বল্ দিকিন্ হঠাৎ এমন ডুমুর ফুল হ'য়ে উঠ্‌লি কেন ? আজ তিন দিন কলেজ যাস্‌নি, ব্যাপার কি ?

রোজই যে কলেজে যেতে হবে তার ত কোনো মানে নেই। কেন আমার বিরহ বুঝি খুব তোর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল ?

আবদারের ভঙ্গীতে লতিকা বল্লে—তবু ভাগ্যি আমার, তুই ধর্‌তে পেরেচিস্। এমন দরদী বন্ধু কি আর সকলের ভাগ্যে জোটে ? সে যাক্, একটা খুব ভালো খবর আছে। বোধ হয় শুনেচিস্ ?

না, কি খবর ভাই ? খুব উৎসুক হ'য়ে নিভা জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

লতিকা বল্লে—সুশান্ত সেন এবার ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় একেবারে প্রথম স্থান অধিকার করেচেন। বাংলার ও বাঙালীর আজ কি গৌরবের দিন!

একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব ও আনন্দের দীপ্তি নিভার সমস্ত মুখখানিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অবাক হ'য়ে সে ভাবলে—সুশান্ত বাবু আই সি-এস্ ? সত্যিই ত এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য অধিক সম্মান বাঙালীর ছেলের আর কি হ'তে পারে ? আজ তিনি সমস্ত বাংলার—

নিভা আর ভাব্‌তে পার্‌লে না। কথায় পুলকের বাণ ডাকিয়ে সে বল্লে—ওঁর সমস্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হ'য়েচে, এর চেয়ে তৃপ্তি আর নেই।

লতিকা বল্লে—মায়ার সঙ্গে আজ সকালে অনেক সরস রঙীন গল্প কর্‌লুম। শুন্‌লে সুখী হবি নিশ্চয়ই মায়ার সঙ্গে সুশান্ত বাবুর এই ২৭শে আষাঢ়ই বিয়ে হবে। কথাবার্ত্তা কাল একেবারেই পাকাপাকি হ'য়ে

গেছে! সব দিক্ দিয়েই বেশ মানাবে কিন্তু। একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ।

অকস্মাৎ সমস্ত পৃথিবীটা যদি ভূমিসাৎ হ'য়ে যেত, তা হ'লেও বোধ হয় নিভা অতখানি আশ্চর্য্য হ'ত না। অবশ কম্পিত হাতে কোনও রকমে ফোনটা ধ'রে রেখে সে উদ্‌গ্রীব উচ্চকিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সুশান্ত বাবু মায়াকে বিয়ে কর্‌বে—তুই ঠিক্ জানিস্ লতিকা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—কেন তোমার আবার—

না—না দূর! কি যে বলিস্ তা'র ঠিক নেই।

উত্তরের প্রতীক্ষাও না ক'রে নিভা টেলিফোনটি টেবিলের ওপর রেখে একলা ঘরে অত্যন্ত বিষণ্ন মনে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। মায়ার ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের কথা ভেবে সে এক মুহূর্ত্তও আর স্বস্তি পাচ্ছিল না। আই, সি, এস্ এর ভাবী পত্নী এই ধনী বিদুষী মায়াকে আর কি আগের মতো সে অবজ্ঞা উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে? ক্রোধে হিংসায় নিভার অভিমানী অন্তর ভয়ানক রোষে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল। জোড় ক'রে সে ভাব্‌লে—না—না মায়া কিছুতেই সুশান্তর যোগ্যা নয়, তার মতো সুপুরুষ বিদ্বান্ স্বামী লাভ করা মায়ার পক্ষে কোনো রকমেই যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে না।

হঠাৎ সুশান্তর চেহারাটা তা'র চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। সুঠাম বলিষ্ঠ গঠন—কি নির্ভীক সুন্দর সে চেহারা! ঐ উচ্ছ্বসিত অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের পানে চেয়ে যুগ যুগান্তর ধরেও বোধ হয় হৃদয়ের আশা মেটে না। ... ...

নিজের মূর্খতার কথা ভেবে নিভা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তার মর্ম্ম ভেঙে ঝরে পড়্‌ল—একটা হাহাকার ভরা দীর্ঘ শ্বাস। অন্তরের বেদনাকে কিছুতেই সংযত কর্‌তে না পেরে অবশেষে সে অঘোর নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—খুব নিঃশব্দে।

* * *

এক বছর পর। ... ...

খুব সম্ভ্রান্ত বংশে ধনী ঘরের ছেলের সঙ্গেই নিভার বিয়ে হ'য়েচে কিন্তু নিভা সুখী হ'তে পারে নি। বিবাহের প্রথম কয়েক মাস স্বামীর প্রেমের উল্লাস ও ব্যগ্রতার মধ্যে সে কিছুই টের পায় নি বটে, কিন্তু তারপর তাঁর স্বরূপ চিন্‌তে নিভার একটুও দেরী হয় নি।

সমস্ত রকম সাধ আহ্লাদ পিপাসা মিটিয়ে নিয়ে স্ত্রীর নারীত্বকে পিষে চূর্ণ ক'রেও যে মোহান্ধ পুরুষ পরিতৃপ্ত হয় না, বিভিন্ন ফুলের মধু আস্বাদন কর্‌বার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তখনও যে তা'র বুকে জেগে থাকে, একথা নিজের স্বামীকে দিয়েই নিভা এই প্রথম বুঝ্‌তে পার্‌লে। ... স্বামীর জন্য সারারাত্রি অপেক্ষা ক'রেও তাঁর দেখা না পেয়ে, একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কত বিনিদ্র রজনীই যে তাকে কাটাতে হয়েচে, তার আর সংখ্যা নেই।

এম্‌নি ক'রেই দিন যায় ... ...

* * *

শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত্রি। দিল্‌দরদী খুশ্‌মেজাজী চাঁদ সেদিন যেন একটু বেশী রকম উদার হ'য়েই তার বুকের সব আলোটুকুই একেবারে পৃথিবীর বুকে উজার ক'রে ঢেলে দিয়েছিল। প্রেমময়ী জ্যোৎস্নার এই নগ্নকান্তি দেখে অত্যন্ত অকবি অসাড় প্রাণও বোধ হয় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমুবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে নিভা কেবলই বিছানায় এপাশ ওপাশ কর্‌চিল। কিন্তু ঘুমহীনার ঘুমের ভাব ক'রে পড়ে থাকার মতো অস্বস্তি বুঝি আর নেই। ... কিছুতেই ঘুমুতে না পেরে শেষকালে সে অস্থির বিরক্ত হ'য়ে উঠে বস্‌লে।

চাঁদের আলো খোলা জান্‌লা দিয়ে তা'র বিছানার ওপর যেন দুর্দ্দান্ত আবেগে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। সুইচ্ না টিপে জোছ্‌নার আলোতেই সে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে দুটো বাজতে তখনও আর দশ মিনিট বাকী। স্বামীর বাড়ী আসা সম্বন্ধে আজও হাল ছেড়ে দিয়ে সে অশান্ত পায়ে ঘরের মধ্যে খানিক পায়চারী কর্‌লে।

তারপর কি মনে ক'রে হঠাৎ বাক্স খুলে সুশান্ত ও নিভার সম্প্রতি তোলা একখানি ফটো বার ক'রে জানালার ধারে মেঝের ওপরে গিয়ে বসলে। ...অপলক স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সে সেই সুখী দম্পতীর পানে চেয়ে রইল। ... ...

......মায়ার এই সুখ সৌভাগ্যের কথা ভেবে অনেক দিন পর আবার সে ভারী অধৈর্য্য অস্থির হ'য়ে উঠ্ল। সুশান্তর পাশে তার ঐ প্রসন্ন দৃষ্টি আর অনাবিল হাসিটুকু একটা সুতীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির মতোই অতি কঠোর ভাবে তার বুকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

.........একদম কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হ'য়েই সে তখুনি একটা পেন্সিল দিয়ে মায়ার ছবিটা আঁচড়ে আঁচড়ে একদম বিশ্রী বিকৃত ক'রে দিলে।

তারপর নিবিড় অনুরাগ ভরে সুশান্তর ছবিটা খুব কাছে আন্‌তেই সে তা'র মধ্যে মায়ার চেহারাটাও যেন খুব স্পষ্ট ক'রেই দেখ্‌তে পেলে।..... বিরক্তিতে বিতৃষ্ণায় একদম উদ্ভ্রান্তের মতোই ছবিখানিকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে, হতাশ হ'য়ে নিভা বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ল। তারপর—

ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক যেমন একটা সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে খাদ্যের পাত্রটার পানে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেম্‌নি ভাবে এই সদ্যোস্থিন্ন-যৌবনা প্রেমবঞ্চিতা নারী, তা'র ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু মেলে একটা বালিশকে জোরে বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে রইল—অনেকক্ষণ, বাকী সমস্ত রাতটুকু।

দশের পূজা

পূজারিগণ।

১। শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৪। শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি, এল্।
৫। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্. এ।
৬। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ।
৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৮। শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
১০। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্, এ, ডি, এল্

সপ্তম পূজা।

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিমল ঝোঁকের মাথায় পথে বাহির হইয়া পড়িল। প্রতিমাকে সে যে অনেকদিন হইতেই ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ভালবাসা ছিল তাহার হৃদয়ের নিভৃত গোপনপুরে, সেখানে প্রেমের দেবতা যে আকাঙ্ক্ষায় বাঁশী বাজাইতেছিলেন, সে সুরে তাহার চিত্ত অনেকদিন হইতেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু কোন দিন তাহা আত্মপ্রকাশ করে নাই।

সে হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তনটা নিজে অনেকদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়া প্রথমটায় সংযমের চেষ্টাও যে না করিয়াছিল তাহা নয়। কিন্তু পারে নাই,—পারে

নাই বলিয়া কোনদিন অন্যায়ের প্রশ্রয়ও সে দেয় নাই। তবে তাহার মনটা হইয়া গিয়াছিল অতিমাত্রায় উদাসী ও চঞ্চল। কলেজের পাঠ্যপুঁথির পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সেইখানে প্রতিমার মুখখানি ফুটিয়া উঠিত, অঙ্কশাস্ত্রের জটিল মীমাংসার দিকে মন না যাইয়া হঠাৎ তাহার শেলি ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করিয়া প্রেমিক কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি আকর্ষণটা একটু বেশীমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল—প্রতিমাকে পাইবার মত আশা তাহার মনে অনেক সময় দুরাশা বলিয়াই মনে হইয়াছে। ডাঃ বোসের মত সমাজে পদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিবার মতো দুরাকাঙ্ক্ষা সদাগর আফিসের কেরাণীর ছেলের পক্ষে যে অসম্ভব এ কথাটাও অনেক সময়ই ভাবিয়াছে, কিন্তু কুসুমসায়ক অলক্ষ্যে থাকিয়া কখন কাহার হৃদয়ে যে শর-সন্ধান করেন তাহা বোঝা বড় কঠিন।

বিমল পথে বাহির হইয়া পড়িল। মানুষ হঠাৎ উত্তেজনার বশে যেমন করিয়া কোন না কোন একটা অস্বাভাবিক কাজ করিয়া ফেলে, এ কাজটাও ঠিক সেই রকম।—প্রতিমার কণ্ঠে কিছুকাল আগে যে সুরের আলো ভুবন ছাইয়া ফেলিয়াছিল, সে সুর বিমলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের 'আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি' এই মধুর কোমল সম্ভাষণেও ধ্বনিত হইল না।—হইতে পারে না—কেননা সে বিলাত ফেরত পরিবারের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিলেও জয়ন্তী দেবীর শিক্ষার গুণে শৈশব হইতেই আপনাকে সংযত ও আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞানে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ ছোট মেয়েটির বুকে এক দিকে যেমন প্রীতির শতদলটি টল টল করিত, তেমনি অন্য দিকে সাহস, তেজ ও নারীত্বের গর্ব্বটা বেশ জাঁকিয়াই বসিয়াছিল। বিমলের তরুণ সুন্দর দেহের অটুট স্বাস্থ্য ও রূপ তাহার মনের মধ্যে কোনও ছাপ বসাইয়া দেয় নাই একথা বলা চলে না, কেননা প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা এ সকল বড় বড় কথা উপন্যাসের পাতায় পড়িলেও বাস্তব জীবনে ব্যাপারটা যে কি সে বিষয়ে তার কোনও ধারণা ছিল না। কাজেই সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে পাগলের মতো বিমলের দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরা ব্যাপারটা প্রতিমার দেহ ও মনে দারুণ লজ্জা ও অপমানের জ্বালা দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিসের, কেন এ অপমান?—অসহায় নারীকে আপনার হাতের কাছে পাইয়া যে পুরুষ অপমান করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না—তেমন কাপুরুষকে পশুর সংজ্ঞার উপরে আর যে কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে ইচ্ছা হয় না—তাই সে ক্রোধে ও অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—যান, এক্ষুণি চলে যান আপনি।—একথা বলিতে তাহার এতটুকু শঙ্কা, লজ্জা বা ভয় হয় নাই।

বিমল সার্কুলার রোডের দিক্‌টা ধরিয়া শিয়ালদহের মোড়ে আসিয়া হ্যারিসন্ রোডটার ওখানে ট্রাম ধরিবার চেষ্টা করিল। ট্রাম আসিতেছে এমন সময় পকেটে হাত দিয়া দেখিল মাত্র চারিটি পয়সা আছে, কাজেই ট্রামে না উঠিয়া এবং বিশেষ করিয়া, এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে পথ চলা অপেক্ষা মোড়ের ছোট চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সে সময়ে চায়ের দোকানে মাত্র চার পাঁচটী প্রাণী বসিয়া জটলা করিতেছিল। কোণের কয়লার চুল্লীটায় কয়লাগুলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া রক্ত চক্ষে চাহিতেছিল। চায়ের জলের ক্যাট্‌লিটা তাহার উপর চড়ান ছিল। বিমল দোকানে ঢুকিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"আহা! বড্ড ভিজেছ যে! তাড়াতাড়ি জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল! অসুখ করবে যে।" তারপর দোকানের কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে কানাইলাল,একখানা শুক্‌নো কাপড় দেও না, ভাই, আমার গায়ের র‍্যাপারখানা দেবো এখন, বেচারা বড্ড ভিজেছে।" কানাইলাল নিমেষ মধ্যে ভদ্রলোকটির আদেশ পালন করিল। বিমল প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষটায় প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উপদেশ গ্রহণ করিল। দোকানের চাকরটি বিমলের কাপড়, চাদর ও জামা উনুনের পাশে

ফেলিয়া দিল। বিমল এইবার বেশ আরাম বোধ করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির আদেশে অতি শীঘ্র এক পেয়ালা গরম চাও আসিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া তাহার প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। বাহিরে তেমনি অবিশ্রান্ত ধারে বৃষ্টির ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিতেছে—গুম্ গুম্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছে। বিমলের মনের উত্তেজনা এখন অনেকটা হ্রাস পাইলেও এই প্রতিজ্ঞাটা তাহার মনে দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল যে সে আর এ জীবনে ডাক্তার বসুর বাড়ীতে ফিরিবে না—সেখানে সে আর তাহার এ মুখ দেখাইবে না! কোন্ মুখে সে প্রতিমার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? তারপর কথাটা যদি কোন রকমে তাহার পিতা ও মাতার কাণে যাইয়া পৌঁছে—তবে তাঁহারা কি মনে করিবেন? কলিকাতা থাকিলে কোন না কোন দিন যদি ডাঃ বসুর পরিবারের লোক-জনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে—তবে তাহার অবস্থাটা যে অতি লজ্জাজনক হইয়া উঠিবে। বিমলকে এইবার সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইতে দেখিয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—বড্ড ভিজেছ, বাবা, তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, কেন এ বাদলায় বেরুলে বল ত? নেহাৎ দায়ে না পড়লে কি কেউ এমন সময় বেরয়?

বিমল কহিল—'অম্নি বেরিয়েছিলাম।'

"এম্নি! আশ্চর্য্য বটে। তোমার নামটি কি বল ত?"

"আজ্ঞে, বিমলকান্ত রায়।"

"পড়াশুনা কিছু কর?"

হাঁ, বি, এ ক্লাসে পড়ি, তবে আর পড়বো না।"

"কেন?—বলতে যদি কোন বাধা না থাকে তা হলে বল।"

প্রথম হইতেই এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সস্নেহ সম্ভাষণে বিমল মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে অনেক কথা না বলিয়াও প্রকৃত সত্যটা বলিয়া গেল। একটা মোটা রকমের বর্মা চুরুট ধরাইয়া ভাবিতে ভাবিতে ভদ্রলোকটি কহিলেন—তাইত হে, এ বয়সে পড়াশুনাটা ছেড়ে দিলে কি ভাল হবে? কথা কয়টি অতি ধীরে ধীরে কহিলেন।—পাশের বেঞ্চখানিতে আরও তিনটি লোক বসিয়া চা পান শেষ করিয়া তামাক টানিতেছিল। তাহাদের কেহই যে ভদ্রলোক নয় তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল। পরিধানে নোংরা কাপড়, ছেঁড়া জামা, শত তালি দেওয়া জুতো, সকলেরই মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেহ সিগারেট কেহবা দোকানের চাকরের ডাবা হুকাটা টানিতে টানিতে থিয়েটার, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি নানা কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল,—তাহাদের কাছে বিমলের ও এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা তেমন ভাল লাগিতেছিল না। তাহারা যে মাঝে মাঝে এমন ভাব ভঙ্গী ও দুই একটা অশ্লীল রসিকতা করিতেছিল তাহাতে সে ভদ্রলোকটি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—'দেখ বিমল, এই বাদ্‌লা যে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ধর্‌বে তা ত মনে হয় না। যদি তোমার কোন বাধা না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে চল। একটা টেক্সি নেওয়া যাক্।—বিমল এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে একজন হিতৈষী ব্যক্তিকে লাভ করিয়া হৃদয় অনেকটা হাল্কা বোধ করিল। কিন্তু মনে মনে আবার এইরূপ আশঙ্কা হইল যে এই লোকটা যদি কোন্ বদ্‌মায়েস হয় তাহা হইলে হয়ত বা তাহাকে নানারূপে বিপন্ন করিতে পারে। আবার তখনি মন হইতে সেই বিপদের ও শঙ্কার ভাবটা দূর হইয়া গেল। না, না, এমন সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি, এমন করুণায় ছল ছল চোখ দু'টির মধ্যে কোনরূপ অন্যায়কে গোপন করিয়া চলা কোন মতেই সম্ভব নয়।

ঠিক্ সেই সময়ে জলে ভরা পথের জল ছিটাইয়া ছল্ ছল্ শব্দ করিতে করিতে একখানা টেক্সি সেই পথ দিয়া শিয়ালদহের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল,—ভদ্রলোকটি ঐ গাড়ীখানা ডাকিয়া তাহাতে বিমলকে লইয়া উঠিলেন। টেক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা যানে হোগা, হুজুর।" ভদ্রলোকটি পকেট

হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া নিপুণ হস্তে ধরাইয়া বলিলেন,—"বালিগঞ্জে।" গাড়ী ছুটিয়া চলিল। বিমল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চুপ্ করিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিল।

(২)

প্রতিমা বিদ্যুৎশিখার মত বেগে আপনার শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিমল ঘরের বাহির হইয়া গেল—সেই দারুণ অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেও সে চলিয়া গেল তাহাতে তাহার মনে এতটুকু আঘাত লাগিল না। তাহার কাছে বিমলের এই আচরণটা কেবল নিন্দনীয় নয় অত্যন্ত অপমানজনক মনে হইল। সে ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখনও মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন। ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ করিয়া বর্ষণ চলিয়াছে। সে তাহাকে সমুদয় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার হাত হইতে মুক্ত করিয়া যখন স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইল, তখন মনে হইল—সে যে মনে মনে বিমলকে ভালবাসে, সে কথা ত একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। তবে সে ভালবাসা বা অনুরাগ তখনও ভাল করিয়া বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই। আর ভালবাসিলেই কি কাহারও এমন কোন অধিকার আছে যে প্রেমাস্পদকে সে অপমান করিতে পারে?—কোন্ সাহসে কোন্ হীন ঘৃণ্য প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে এমন করিয়া তাহার অপমান করিল? এ আঘাত এ অপমান সে কোন মতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না। এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই—নেই। বিমলের প্রতি তাহার যে প্রীতির একটা আকর্ষণ নিবিড় ভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল,—সে পণ করিল—ঝড়ের বেগে গাছ উপড়াইয়া যেমন শিকড় শুদ্ধ বাহির হইয়া পড়ে পৃথিবীর বুকে আর তাহার কোন যোগ থাকে না, বিমলের সম্বন্ধে সমুদয় স্মৃতি তেমনি করিয়া সে হৃদয় হইতে উপড়াইয়া ফেলিবে। তাহার এই সাধনা সফলা হউক—মনে মনে বিধাতার কাছে সেই প্রার্থনা জানাইল।

মেঘের আড়াল দিয়া কখন বেলা পড়িয়া গেল। কখন মেঘে ঢাকা আকাশের অন্ধকারকে আরও নিবিড়তর করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িল, সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্য পড়িল না। রেখা একটা ঘরে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল,—লেখা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন সে জাগিয়া উঠিয়া জননীকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত করিয়া তুলিল—তখন ধীরে ধীরে রেখা লেখাকে বুকে করিয়া আসিয়া প্রতিমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। রেখা ধীরে ধীরে ডাকিল—প্রতিমা। প্রতিমা প্রথমটায় শুনিতেই পায় নাই। রেখা দু'তিন বার আহ্বান করিবার পর প্রতিমা আপনাকে সাম্লাইয়া লইয়া কহিল—কে, দিদি?

হাঁ, বোন্—একটু লেখাকে ধর। ওকে যে সাম্লাতে পাচ্ছি না। দুষ্টু মেয়ে আমাকে একেবারেই কাজ কর্তে দিচ্ছে না। প্রতিমা রেখার কোল হইতে লেখাকে টানিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনধারায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। দাসী আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। বিদ্যুতালোকে কক্ষটি ঝল্মল্ করিতে লাগিল।





সৈনিকের চিঠি

(পূর্ব্বপত্রের শেষাংশ)

কি করে নিষ্ঠুর হত্যা করেছি জান ? রাত্রিতে টেলিফোনের (Telephone) তার হাতে লুইস্গান অথবা মেশিন গান ধরে মাটীর নীচে গর্ত্তে বসে কোয়ার্টারে পাহারা দিতে হয়। কম্পাউণ্ডের চারিদিকে তার দিয়ে ঘেরাও করা। সে সব তারের সঙ্গে ফোণের যোগ আছে। অতর্কিতে যে কোনো জানোয়ার বা যে কোনো জীব তারের উপর এসে পড়্লে তার আর রক্ষা নেই। ফোনে দিক্ বলে দেবে—আর অম্নি গুলী চালাতে হবে। কারো বাঁচবার উপায় নেই। কোনো দয়া মায়া নেই—এ নিষ্ঠুর বুকে কোমলতার প্রশ্রয় নেই।

হয়ত কোনো দূরদেশাগত পথিক বহুদিন পর তার প্রিয় সন্তানদের জন্যে, বহু কষ্টোর্জ্জিত অর্থে হয়ত খেল্না নিয়ে যাচ্ছিলো,—প্রিয়তমা পত্নীর জন্যে তার কোনো প্রিয়বস্তু নিয়ে যাচ্ছিলো—বেশী করে ভালোবাসা উস্থল করে নেবে বলে—বৃদ্ধা মা'র জন্যে হয়ত একখানা বস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলো—মায়ের শুভাশীষ প্রার্থনা কর্‌বে বলে কত ব্যগ্র হয়ে ছুটে চলেছিলো সে। অন্ধকারে পথ ভুলে তারের উপর এসে পড়েছে—অম্নি গুলী খেয়ে মরেছে। তার সব আশা নিমেষে চিরতরে মিটে গেলো! আবার কেহ হয়ত রাস্তার দূরত্ব কমাবার জন্ম তারের বেড়া পার হ'তে যাচ্ছে—অম্নি মরেছে। এ যে কাদের আস্তানা হয়ত তারা জানে না, কিন্তু তা'হলে কি হয়—এলেই মর্‌তে হবে।

এম্নি রকম কত হত্যা করেছি কি বল্‌ব ? কত অনাথার একমাত্র পুত্রের প্রাণ নিয়েছি—কত তরুণীর প্রিয়তমকে তার তরুণ-হৃদয় থেকে চির-বিদায় করেছি—কত শিশুকে তাদের পিতার অনাবিল স্নেহ থেকে চির-বঞ্চিত করেছি—কত বল্‌ব ?

উঃ—সব চেয়ে একটি কথাই ভীষণ ভাবে আমাকে আঘাত কর্‌ছে। সে কি নিষ্ঠুরের কাজই না আমি করেছি ?—এই রকমই এক দিন ডিউটি কর্‌ছিলুম। হঠাৎ পূব কোণের তার বেজে উঠ্‌ল। অমনি ফায়ার কর্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুন্‌লুম। পরদিন সকালে দেখ্‌লুম ওই ওপাড়ার এক হোটেলওয়ালার ছেলে ওষুধের শিশি হাতে। আমি তাকে চিন্‌তুম তার বাবার যে আজ ক'দিন থেকে ভয়ানক অসুখ, তা'ও জান্‌তুম। কা'ল তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে তার এই সর্ব্বনাশ হলো।

অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক্ কর্‌লুম তার বাবাকে এ খবর আমার দিতেই হবে। তাই গেলুম। উহ্ বুক ভেঙে যাচ্ছে—যেইমাত্র এ নিষ্করুণ কাহিনী বর্ণনা কর্‌লুম সেই মুহূর্ত্তেই সে, সেই আঘাতে হার্টফেল কর্‌ল। সে দিন এ পাষাণ বুক চিরেও একটা দীর্ঘ তপ্তশ্বাস ঠেলে উঠেছিলো—নয়নের কোণে দু-ফোঁটা অশ্রু জমেছিলো।

হয়ত এ শোচনীয় মৃত্যু দেখেও আমার বুক কেঁপে উঠেনি। কেঁপেছিলো ন্যাপির অবজ্ঞাভরা দৃষ্টি দেখে। আমি ভাব্‌ছিলুম্ কি প্রত্যুপকারই না আজ কর্‌লুম। তাঁর প্রিয় ভাইটিকে জন্মের মতো তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় করেছি। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি, তাই, আবার তাঁকে অসহায় করে তাঁর

পিতাকেও ও পথে পাঠিয়েছি। সবই মনে পরে—কি যত্নে ন্যাথি আমাকে ক্ষুধায় আহার দিতো আর কত রকমে আমাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করত। যেদিন রেশন (Ration) আমাদের কম পড়্ত সেদিন ন্যাথিইতো আমার এ ক্ষুধায় আহার যোগাত। সে যে আমায় ভাইয়ের মতো ভালোবাস্ত, বন্ধুর মতো সাথে সাথে থাক্‌ত! আজ কি সান্ত্বনা দেবো তাকে? কি সম্বল আছে আমার?

কিন্তু আমিই বা কি কর্‌ব? দোষ আমার থাক্‌লেও নেই। আমি যে হুকুমের দাস। যা আমাকে কর্‌তে বল্‌বে তা যে আমাকে কর্‌তেই হবে। টু শব্দটি কর্‌বার যো নেই তা'হলে যে আমাকেই গুলী খেয়ে মর্‌তে হবে? আমার সান্ত্বনা আমি কর্ত্তব্য করুতে গিয়েই তাদের হত্যা করেছি।

রাণী আমার!!! আজ পর্য্যন্ত সাম্‌নের বা পেছনের কথা কোনো দিন আমাদের ভেতর আলোচনা হয়নি, হতে পারেনি। কারণ, তার অধিকার তুমি দাওনি। সেজন্যে তোমাকে মোটেই দোষ দিচ্ছিনে।

কিন্তু আমার বরাবরই কি রকম একটা বিচ্ছেদের চিন্তা মনের কোনে কাঁটার মত খচ্ খচ্ কর্‌ছে। আমার মনে হচ্ছে,—আমাদের মিলন সুদূরপরাহত। আমাদের দেখাশুনা আলাপ পরিচয় সব শেষের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই বোধ হয় আমি কার ঐ সাবধান বাণী শুনি—তোমাদের এই শেষ, এই শেষ!!!

সত্যি, আমারও মনে হচ্ছে যে, তোমাকে পাশে পাবার ভাগ্য আমার হবে না কোন দিন। আমি ঠিক্ দেখ্‌ছি আমার যে বোমার ঘায়ে মৃত্যু হবে জার্ম্মানীর বারুদ খানায় তা' জমা হয়ে আছে। হয়ত আমার গার্ডের মত দশাই হবে আমার। ওই কম্বলের নীচে ওই অম্‌নি করে শুয়ে থাক্‌ব। কেউ মাটি দেবার থাক্‌বে না বা পোড়াতে যাবে না। তাই ভাল, আমার তাই ভাল! তোমাকে হারাবার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল।

কিন্তু যখন ভগবানের অভাবনীয় দানের কথা ভাবি, তখন বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যাই। তুমি এ কথা কোনো দিনই হয়ত মনে কর না কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট না হ'য়ে পারছি না। তুমি যে কোনো দিন আমায় দরদ কর্‌বে তা' ছিল আমার আশার অতীত—আমার প্রাপ্যের চেয়েও অনেক বেশী। আর যুদ্ধের মধ্যে যে প্রেমের আমল পড়্‌বে এই টুকুই যে অভাবনীয়?

কতদিন আমি এর জন্যে অপেক্ষা করেছি তা' তুমি জান। তারপর হতাশ হয়েই এখানে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছি। এখানেই আমি আমার জীবনের সমস্ত স্নেহ মমতার বিসর্জ্জন দিয়েছি। তারপর শেষ মুহূর্ত্তে ঐ আগুণের হুঙ্কারের মাঝেই আমি তোমাকে পেয়েছি—আমি ধন্য হয়েছি।

এত সব আশা করা পাগ্‌লামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মুখের নানা কল্পনায় ও মত্‌লবে একেবারে বিভোর। এই কর্‌ব, এই হব, হাতের মুঠোয় সব রাখ্‌ব! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! দেখেছ কি পাগলামী আমার? তুমি হয়ত হেসেই খুন হচ্ছো? আমি নিজেও যে না হেসে থাক্‌তে পার্‌ছি না আমার কাণ্ড দেখে?

থাক্, আমি স্থির করেছি, তোমার সম্বন্ধে কোনো আশাই হৃদয়ে পোষণ কর্‌বো না, তা' হলে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে অন্ততঃ যতদিন যুদ্ধে থাক্‌ব। আমার জীবনে তোমার এই ক্ষণিকের আবির্ভাবই যথেষ্ট। এর বেশী আমি চাই না, চাইলেও হয়ত পাব না—তাই চাইবও না।

তবে, আর একবার যদি চিরকালের মতো তোমাকে একটু দেখ্‌তে পেতুম, মনে মনে তোমাকে আমার পূজা জানাতে পার্‌তুম আমার সাহস, শক্তি, আরো বেড়ে যেত! রাগ করো না লক্ষ্মী! যত কিছুই ভাবি না কেন, যত কিছুই লিখি না কেন, —তোমাকে ছাড়া আমি মোটেই নই।

আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার প্রেমে পড়ে, তোমায় ভালোবেসে, কত মধুর, কত গৌরবান্বিত

হয়েছি জীবনে। যদি আজই এই জীবনকে বিদায় সম্ভাষণ দিতে পারতুম, তবে কত শান্তিই না জানি পেতুম! বিদায়ের ক্ষণে তুমি যেমন হাত ছিনিয়ে, মাথা নেড়ে, দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিলে—ওই রকম করে, জীবন থেকে বিদায় নিতে, আমারও সাধ হয়।

আর আর পার্‌ছিনা। শরীরটা বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়ছে। অত্যাচারও তো আর কম করছিনে?

আজ তবে বিদায়! আমার আশীর্ব্বাদ, ভালবাসা এবং চুম্বন জেনো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

—শান্তি চৌধুরী

ব্রহ্মচারী

( )

জোৎস্নালোকিত নিস্তব্ধ রাত্রি! অদূরে শ্মশান ভূমি, পাশেই শ্মশান-কালিকার মন্দির—ব্রহ্মচারী স্থির নেত্র—একাসনে মন্দিরাভ্যন্তরে সমাসীন। হঠাৎ সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, কি একটা অস্ফুট শব্দের অনুসরণ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, সর্ব্বোচ্চ সোপানে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী শেষ সোপানের এক সীমান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন একটী মনুষ্য মূর্ত্তি আপন মনে কি বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। ধীরে ধীরে তিনি সোপান অতিক্রম করিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন একটী পাগলিনী স্ত্রী মূর্ত্তি—তার রুক্ষ কেশ, ছিন্ন মলিন বসন, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

"কে তুমি পাগলিনী, কি চাও? এ গভীর নিস্তব্ধ শ্মশানভূমিতে তোমার কি প্রয়োজন?" উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া পাগলিনী বলিল, "আমি ডোমের মেয়ে, আমার নিত্য যে এই যায়গায়ই খেলাঘর, ওগো! তোমরা কি তা জাননা? ঐ রাক্ষসী বেটীই তো আমায় ঘরছাড়া করলে! ঠাকুর, দয়া করে একবার মন্দিরে ঢুকতে দেবে? দেখবো তো সে পাগলী বেটীর সাথে একবার বোঝা পড়া করে।" এই বলিয়াই সিড়িতে উঠিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী প্রমাদ গণিলেন, তাহার সাধন এখনও তত উর্দ্ধগামী হয় নাই, অসদৃশ্য ডোমের মেয়ে মন্দিরে ঢুকে মন্দির অপবিত্র করিবে ইহা অসম্ভব। তিনি দৌড়িয়া সিড়ি বাহিতে লাগিলেন, গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে পাগলিনীকে ধমক দিলেন। পাগলিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী মন্দিরের দরজা রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বহুদূরে করুণ গানের দুই পদ ব্রহ্মচারীর কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পাগলটা চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রকৃতির দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল; ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলোতে পৃথিবী হাসিতেছে, সম্মুখের মাঠ খানাতে যেন জ্যোৎস্নার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে, অদূরে চিতাগুলি সব নির্ব্বাপিত-মৃদুমন্দ বাতাস তাহার শরীর মনকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল; তিনি পাগলিনীর কথাই ভাবিতে লাগিলেন—কাজটা ভাল হল কি? মায়ের মন্দিরে ঐ অস্পৃশ্য ডোম ঢুকিবে ইহা কি ঠিক? আবার মন বলিল, জগজ্জননীর সন্তান তো সকলেই। তবে এ ভেদাভেদ কেন? কেউ মন্দিরে ঢুকতে পায়,

কেউ বা পায় না কেন? যুগযুগান্ত কেন এ নিয়ম চলে আসছে? হঠাৎ আবার সেই গানের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—

"নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে
অলস অঙ্গ শিহরে তব কোমল কর পরশে।"

আবার এলোমেলো ভাবে অন্য গানের কয়েক লাইন শোনা যাইতে লাগিল—"নহে এ যোগ্য অর্ঘ দিতে মা বনের ফুল, গন্ধবিহীন, অন্ধ স্নেহ তো বোঝে না ভুল।" সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু মন ঠিক করিতে পারিলেন না। পরদিন সকালবেলায় ব্রহ্মচারী দেখিলেন পাগলিনী স্নান করিয়া এক ঝুড়ি ফুল নিয়া মন্দির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। বড় করুণ ভাবে সে বলিতে লাগিল—"ঠাকুর, আমায় একটীবার মন্দিরে ঢুকতে দিলে না? আচ্ছা না দাও, এই ফুলগুলি মায়ের পায়ে দিও।" এই বলিয়া ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মচারী অস্পৃশ্য জাতির ফুল গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন। ফুল সেই যায়গায়ই ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িয়া রহিল।.........
সন্ন্যাসী মায়ের মন্দিরে গিয়া ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কই মন যে স্থির হইতেছে না, কি যেন চাঞ্চল্য ভিতরে উপস্থিত। পুনরায় নেত্র মুদিত করিলেন, মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল পাগলিনীর মুখ, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিতেই চমকাইয়া উঠিলেন। প্রতিমার মুখে পাগলিনীর ছায়া!!

"একি আজ দেখছি, মা, মা, আজ তোর একি ছলনা অধম সন্তানের প্রতি"—প্রতিমার পদতলে ব্রহ্মচারী লুটাইয়া পড়িলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রতিধ্বনির মত শব্দ হইতে লাগিল, সন্ন্যাসী শুনিতে পাইলেন—"ওরে মূঢ়! তুই বৃথাই পূজা করিস্ তোর সাধনা, ভজনা, সব ব্যর্থ। যত দিন তোর হৃদয়ের অস্পৃশ্যতার বীজ উৎপাটিত না হবে, যত দিন তুই বিশ্বের সমস্ত মানবকে এক মায়ের সন্তান বলে ভাবতে না পার্‌বি ততদিন আমার পূজা আর করিস্ না। আমার পূজার অধিকারী তুই এখনও হোস্ নি—যে দিন বিশ্বপ্রেমে হৃদয়কে বিলিয়ে দিতে পার্‌বি সেই দিন আবার আসিস্। আমিই সব, আমাতেই জগৎ।"

শ্রীমতী..................





কলির পয়গম্বর

(আলোচনা)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, বি, এ, সাহিত্য-ভারতী

হিন্দু জাতটা যেন একটা বেওয়ারিস্ মাল—'সোতের সেউলি'র মতো ভেসে চল্‌ছে, আর যে যেমনে পারে তাকে ঠেঙ্গাতে কসুর করে না। সম্প্রতি এক নূতন পয়গম্বরের আবির্ভাব দেখ্‌ছি, এবার বুঝি হিন্দু আর টেকে না।

মুসলমানদের মুখে শুনি এবং দু'একখানা পুঁথি-পুস্তকেও দেখ্‌তে পাই, মহম্মদ শেখ পয়গম্বর। কিন্তু অকস্মাৎ প্রাচ্যে—এমন কি খাস বাঙ্গালায় আবার নূতন পয়গম্বরের আবির্ভাব দেখে মনে হয় কবি সত্যই বলেছেন,—

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your Philosophy."

নবাবির্ভূত পয়গম্বরের নামাকরণ হ'য়েছে মন্মথনাথ সরকার। সম্প্রতি তিনি গত ভাদ্রের "সওগাতে" 'মিলন-সমস্যা' নামক প্রবন্ধে যে অদ্ভুত হদিশ্ প্রচার করেছেন তাতে হিন্দু মুসলমানের মিলন হ'য়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু এই revelations তিনি কোন্ পাহাড়ে গিয়ে লাভ করেছেন তা প্রকাশ করেননি। তাঁর হদিশ দেখে স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ বোধ হয় বেহেস্ত থেকে বলছেন, "যে লাজ পেয়েছি আজ কইতে লাজ পায়।" এ হদিশ্ নিতান্ত তথ্যপূর্ণ ও original এবং আমরা একবাক্যে স্বীকার করি ইহা বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জগন্ময় প্রচারিত হ'লে সমস্ত জগতের বেশ উপকার হয়।

লেখকের মতগুলি উদ্ধৃত করবার পূর্ব্বে আমাদের একটি সংশয়ের মীমাংসা করে নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, "মুসলমান সমাজেও আব্দুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনমুহম্মদ মুখার্জ্জি, দীনমুহম্মদ গাঙ্গুলি প্রভৃতি কিম্ভুত কিমাকার নাম বেশ চলে যাচ্ছে।" লেখক সেরূপ 'কিম্ভুত কিমাকার' নয় ত? এক রকম কীট আছে তার নাম "বহুরূপী"। বহুরূপীর প্রধান লক্ষণ এই যে উহা ইচ্ছানুসারে অনায়াসে আপন বর্ণ পরিবর্ত্তিত করতে পারে। এজন্য ইহার স্বাভাবিক বর্ণ কি ইহা বলা দুষ্কর। বর্ত্তমান বহুরূপীর বর্ণ নির্ণয়ের ভারটা বর্ণাভিজ্ঞের উপর অর্পণ করেই নিশ্চিন্ত হলাম। এখন লেখকের মতামতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

লেখক আবিষ্কার করেছেন—হিন্দু মুসলমানের মনকষাকষির দুইটা কারণ—গো কোর্ব্বাণী ও মন্দিরের সাম্‌নে গান বাজনা।"

দুই নম্বরের কারণ সম্বন্ধে বলেন, "আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে, গান বাজনার হট্টগোলে আবার ঈশ্বর দেখা দেয় কিরূপে?"

এবিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে হিন্দুর উপর ভার

দেওয়াই উচিত ছিল লেখকের। কারণ, সেটা হিন্দুই ভাল জানে, অহিন্দুর তাতে অধিকার নেই। হিন্দু ভিন্ন—হিন্দুর ধ্যান, ধারণা, সাধনা ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতের তা বুঝবার শক্তি নেই। তা বুঝ্‌তে হ'লে হিন্দুর প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দৃষ্টি চাই। তখন সে দেখ্‌বে এই চারদিকে অনন্ত বিশ্বে অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত বাহু বিস্তার ক'রে সেই মহিমময় অনন্তময় পুরুষের মূর্ত্তি প্রকট করছে। কূপমণ্ডুক অনন্ত বিশ্বের সংবাদ কি রাখে? "হিন্দুর মনের ন্যায় সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রব্যাপী মন পৃথিবীতে আর নাই। জগতে যাহা কিছু আছে হিন্দুর মনে সকলই আছে। জগতে যেমন অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন অপূর্ব্বভাবে একে অপরের সহিত এবং সকলে একের সহিত গ্রথিত আছে হিন্দুর মনে তেমনই গ্রথিত আছে। হিন্দুর মন জগতের ছাচে ঢালা (Cosmically Constituted) মন। এমন বিরাট্‌ মন কি আছে?" ক্ষুদ্র যে সে বিরাটের, অনন্তের ধারণা কর্ব্বে কিসে?

লেখক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, "আমি নিজে সাধকও নই, দার্শনিকও নই"। আমরা বলি তবে এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? 'Fools rush in where angels fear to tread' এই সরল সত্যের প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য নয়ত?

তার পর "এত দিন ত খোলকরতাল বাজিয়ে, এত লোক নাম সংকীর্ত্তন কচ্ছে, কই, কেউতো ভগবান্‌কে পেতে শোনা যায় নি!" কেন? বধির নাকি! শুনেছি হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী কানে তুলো দিয়ে রাখ্‌তেন, পাছে সব বুদ্ধি বেরিয়ে যায়। লেখকের তেমন কোন 'বায়ু' নাই ত! শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব নির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন। খোলকরতাল বাজিয়ে, মুসলমান বৈষ্ণব ঠাকুর হরিদাস খোলকরতালের গুণাহে নিশ্চয়ই দোজকে যান নি। গৌড়পতি হোসেন শাহ তার সাক্ষী। আর এ যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথাটা স্মরণ করলে ভাল হয়। লেখক হয়তঃ মনে কর্ব্বেন তিনি বুজরুক। তা হ'লে প্রমাণ দিয়ে দিই শুনুন—

"During the last century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ramkrishna of Bengal, who knowing nothing of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and *revealed God* to weary mortals."—Mr. William Digby's *Prosperous India*, Chap II—P. 99.

আর কত বল্‌বো, মহাভারত ত লিখ্‌তে বসিনি। তারপর "পাটুয়াখালি সত্যাগ্রহে হিন্দু জেদ্‌ দেখাচ্ছে।" জেদ্‌টা কি তা লেখক প্রকাশ ক'রে বলেন নি, বোধ হয় তাতে গোল বেধে যায়। যাক্‌ There are sermons in stones. লেখকের কথায় সেটা আছে। কারণ, তাঁহার মতে "গান বাজনা সম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেকটা আধুনিক" হ'লেও অন্ততঃ "ডিপ্লোমেসির" খাতিরে হিন্দুদের চুপ থাকাই ভাল। তার কারণ বোধ হয় "হিন্দু, হিন্দু ব'লে।" অবশ্য এ কথাটা স্বীকার্য্য, তাও ডিপ্লোমেসিরই খাতিরে, যদি লেখককে হিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে কথাটা ঘরাণা বটে, বাজারে ঢাক বাজিয়ে ইহা চালান যেতে পারে না।

তবু জিজ্ঞাস্য, মুসলমানের এত ধর্ম্মপ্রীতি আজ হঠাৎ জেগে উঠ্‌লো কেন? তারা রোজ পাঁচবার 'আজান' দিয়ে হিন্দুর বিশ্রাম ও শান্তিভঙ্গ করবে, আর হিন্দু সকালে, সন্ধ্যায় দুবার মাত্র গান বাজানা করলে তাদের মাথা গরম হয় কেন? এটা একদেশ-দর্শিতা নয় কি? বরং আমরা বলি জাত ভুলে যাও। যার যার কর্ত্তব্য ক'রে যাও, কাজ কর্‌লেই ত কাজি। সকলেই মনে কর আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর ভাল মন্দ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাবে।

সুতরাং 'Give and Take' নীতির অনুসরণ উভয় পক্ষে হিতকর। হিন্দুরও 'বাজনা' চলুক, মুসলমানেরও 'আজান' চলুক। ধর্ম্ম সকলেরই এক—ধর্ম্মদ্বেষী যে সে হিন্দুই হোক্, মুসলমানই হোক্ কারও নিস্তার নেই। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, **'আমরা পঞ্চোত্তর শত ভাই।** চল আমরাও সেরূপ বলি,'আমরা আট কোটি বাঙ্গালী।'

তার পর 'গো-কোর্ব্বাণী'। লেখক বলেন, "মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে নাড়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে কেবল দু' একটা এমন দুর্ব্বল জায়গায়, যা আগে থাকতেই হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার ক'রে রাখা উচিত ছিল।" সাধু, মিত্র, সাধু! সংস্কারটা বোধ হয় এবার পয়গম্বর সেরে ফেল্‌বেন।

তারপর, "দেব মন্দির ও গরু এই দুইটাই অবান্তর জিনিষ।" অবশ্য খুব সম্ভব বাদে মস্‌জিদ্ ও গির্জ্জা।

গরুটা যেন অবান্তর হ'ল মন্মথবাবুর খাতিরে, কেননা 'যস্মৈ যদ্ রোচতে' কিন্তু দেবমন্দির ত জগৎ ভরেই আছে, তবে নামে একটু তফাৎ—মন্দির, মস্‌জিদ্ ও গির্জ্জা। মন্মথবাবু 'Eat, drink and be merry'র শিষ্য বোধ হয়। যাক্, তবু ভাল, কলির জীব ক'রে না হ'ক্ দেখে শুনে মানুষ হোক্।

"এই কল কারখানার যুগে গরু, মহিষ, কি ঘোড়ার আর বিশেষ দরকার হ'বে না।" আবিষ্কারের মতন আবিষ্কার। মন্মথ বাবুর মতে এখন সকলেই হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাক, খাবারগুলা কলে টপাটপ্ মুখের ভিতর ঢুকে পড়বে আর কি! যুক্তির মহোৎসব দেখ্‌ছি!

"সুতরাং এমন দিন আস্‌বে, যখন এসব জানোয়ারকে সখ ক'রে চিড়িয়াখানায় রাখ্‌তে হবে, কিম্বা ইচ্ছা ক'রে মেরে ফেল্‌তে হ'বে (যেমন আমরা মশা মাছি মেরে ফেলি) না হয় কোন সাধুমহারাজের পিঁজরা পোলে কি বন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আস্‌তে হবে, আর না হয় হত্যা ক'রে উদরপূর্ত্তি কর্ত্তে হবে। আমার মনে হয়, শেষোক্ত উপায়ই ভাল; কারণ যেন-তেন প্রকারেণ উদরপূর্ত্তি আমাদের কর্ত্তেই হবে; আর জিনিষ অযথা নষ্ট করার চেয়ে ভোগ করা ভাল।" বাঁচালে বাবা! এতদিনে যদি মশা মাছির একটা হিল্লে হয়, আর বাড়ীর চার ধারে কত সব অপদার্থ জমে থাকে—যদি নষ্ট না হ'য়ে ভোগে লেগে যায় তবে কতক কতক জীবের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হবে বটে। পরোপকরায় সতাং বিভূতিঃ—হিন্দু এরূপ স্বার্থত্যাগ করতে রাজি।

মন্মথবাবুর উদরাগ্নি যেমন প্রবল দেখা যায় 'যেন তেন প্রকারেণ উদরপূর্ত্তি করতেই হ'বে' সাধু সাবধান! খাট পালঙ্ক নৌকা ষ্টিমার কিছুই বাদ যাবে না এবার। সর্ব্বভুক্ মন্মথবাবু একেবারে মেতে গেছেন দেখ্‌ছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তিটা বেশ original. পণ্ডিতটী বোধ হয় লেখক স্বয়ং। কারণ এরূপ যুক্তি তাঁহার প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। সব সময় যুক্তিতে চলে না! Equity overules law একথাটা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন, "ছাগ মহিষ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে গরুর প্রতি এই যে পক্ষপাতিত্ব, এ হিন্দুদের খেয়ালপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

হিন্দু এত সঙ্কীর্ণ নয়। সমত্ব ও মৈত্রী তাহারই জিনিষ, অন্যের নাই। বিশ্বের যত কিছু আছে, মানুষ বল, পক্ষী বল, সরীসৃপ বল, গাছ বল, লতা বল, প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্ম্মিত এবং সেই এক ব্রহ্মের রূপ মাত্র। অতএব তাহার নিকট শুধু সকল মানুষই যে সমান তাহা নয়; জগতে যত কিছু আছে, সবই মানুষের সমান ও প্রীতির পাত্র। প্রহ্লাদ দৈত্য শিশুগণকে উপদেশ দিতেছেন:—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীসৃপঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৭অ, ৪৭—৪৮)

দেবতা, মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ ইহারা অনন্তদেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। যিনি এই সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছেন,তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন,কারণ,বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহা আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন। তবে স্থল বিশেষে ব্যভিচার দৃষ্ট হয় বটে, তাহা দ্বারা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনানুসারে মদ্য মাংসাদি গ্রহণীয়—সেজন্য অত্যাচার ন্যায়সঙ্গত নহে। এখানে প্রধান কথা হইতেছে সংযমের। কবুতরের মাংসের যুস রোগীর পথ্য, সেজন্য একথালা ভেড়ার মাংস ভক্ষ্য নহে। এখানেই খাদ্যবিচার। সর্ব্বভুক্ মহাশয় কি বলেন ?

লেখক আরো বলেন, "মুসলমান সাধারণতঃ যে সকল গরু কোর্ব্বাণী দেয়, তা এমন গরু যা দিয়ে বিশেষ কোন কায পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ অচল বা রুগ্ন বা আসন্নমৃত্যু গো-কোর্ব্বাণীই প্রশস্ত। কি নৃশংসতা! কি কৃতঘ্নতা! "দুগ্ধবতী গাভী বা ভাল বলদ তারা প্রায়ই হত্যা করে না।" হিন্দু রুগ্ন, পঙ্গু বা অসহায় জীব হত্যা করা নৃশংসতা মনে করেন। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

"হিন্দুধর্ম্ম সুপ্রাচীন, এ একেবারে সনাতন ধর্ম্ম কি না, তাই অনেক আবর্জ্জনা জঞ্জাল এর ঘাড়ে এসে চেপেছে। অথচ হাত দু'খানা জরাগ্রস্ত হ'য়ে পঙ্গু। আশা করি, সমসাময়িক অন্যান্য সমাজ এ অতি বৃদ্ধ সমাজকে সাহায্য কর্ত্তে কার্পণ্য কর্ব্বেন না।"

মন্মথবাবুর জরাগ্রস্থ পিতৃপিতামহের কি দশা হয়েছে বা হ'বে কে জানে—তারাও ত আবর্জ্জনা জঞ্জাল। আমরা জানি প্রাচীন সম্মানের পাত্র—প্রাচীন স্থির, ধীর, গম্ভীর—যুবকের ন্যায় দৃপ্ত নহে। আপদ্‌কালে বৃদ্ধেরই উপদেশ নিতে হয় :—

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং আপৎকালেহ্যুপস্থিতে।

বাঙ্গালীর আজ ঘোর দুর্দ্দিন, তাই বলি বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান, সকলে এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, (ধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, ইহার সুগ্রহণ ক'রে চল) দুর্দ্দিনের মেঘ কেটে যাবে। সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, সর্ব্বভূতে দয়া কর, সকলকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কর। মন্মথবাবুরও হতাশ হইবার কারণ নাই, মানুষ যত অপদার্থ হো'ক্ না কেন হিন্দু তাহাকে ক্ষমা কর্ত্তে জানে, আপন ব'লে বুকে টেনে নেয়।

লেখক অবশেষে নিখিল ভারতের একতা সাধনের একটা অকাট্য যুক্তির উদ্ভাবন করেছেন, তা এই :—

"মোটামুটী ভারতে তিনটা ধর্ম্ম চলিত—হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। সমগ্র ভারতবাসী যদি দু'এক শতাব্দী ধ'রে মুসলমান হ'য়ে রইত, তবে এই ঐক্য-সাধন হ'ত ব'লে মনে হয়।" মন্মথবাবু বোধ হয় ইতিমধ্যেই pioneer হ'য়ে গেছেন— নিজের ল্যাজ থাকলে আর অপরকে ল্যাজ কাটতে পরামর্শ দিবেন কেন ?

মন্মথ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে পিতৃদত্ত নামটার বেশ সার্থকতা করেছেন। মনঃ মথ্নাতি ইতি মন্মথ অর্থাৎ মনকে পীড়ন করে যে। তাই কামদেবের (cupid) এক নাম মন্মথ। মন্মথকে ধ্বংস করেছিলেন মহাদেব তাঁহার তৃতীয় নেত্রবহ্নি দ্বারা—সে সত্যযুগে। আবার কলিতে মন্মথের পুনরাভির্ভাব—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী"।

বড় দুঃখেই মন্মথবাবুর প্রবন্ধের অপ্রিয় সমালোচনা কর্ত্তে হ'ল। গাছ বড় দুঃখে বল্‌লে কাঠুরেকে, "ভাই, তুমি এত নির্দ্দয় কেন ?" কাঠুরে বল্‌লে, "আমার দোষ দাও বৃথা। তোমার জাত দিয়েই ত কুঠারের হাতল তৈরী। হাতল না হ'লে ত আর গাছ কাটা যায় না।" তখন মর্ম্মাহত গাছ বল্‌লে,"তা হ'লে আমার মরাই ভাল। সেরূপ আমরাও বলি,"হিন্দু হয়ে যদি হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ কর্ত্তে চায়, তা হ'লে সে হিন্দুর নিঃশেষে লোপ পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।



ভারতে বাঙ্গালী—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজসভায় স্বর্গগত গোখলে মহোদয় বলিয়াছিলেন,—

The Bengalees are in many respects the most remarkble people in all India.··· In almost all the walks of life, open to Indians, the Benglees are among the most distinguished, some of the greatest social and religious reformers of recent times have come from their ranks. Of orators, journalists, politicians, Bengal possesses some of the most brilliant.

অর্থাৎ বহু বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি ভারতে গণনীয়। ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্ম্মপথ মুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে কয়জন সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্মবেত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী। বক্তা, সংবাদ পত্রপরিচালক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী উজ্জ্বল রত্নবিশেষ।

কিন্তু এই গত বিংশ বর্ষ মধ্যে বাঙ্গালীর সে উদ্যম, সে চেষ্টা কোথায় লুপ্ত হইয়াছে কে জানে? কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প, ব্যাংকিং প্রভৃতি সকল বিষয়ে সম্প্রতি বাঙ্গালীর স্থান নিম্নে। নারীশিক্ষা বিষয়ে ভারতের অন্য কোন কোন প্রদেশ বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালার কলকারখানা বাণিজ্য প্রভৃতি প্রায় সমস্তই বাঙ্গালীর হস্তগত। কেরাণীগিরি ও শিক্ষকতায় বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ছিল। অধুনা তাহাতেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। মোট কথা, বাঙ্গালী কোন কোন কার্য্যক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিতেছে অথবা অন্যেরা তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহা অবশ্য হিংসা বা দ্বেষের কথা নয়। সকল সম্প্রদায় উন্নত হউক, তাহাতে ভারতের লাভ—আমাদের লাভ, লোকসান কিছুই নাই। তবে আমরা চাই বাঙ্গালী ভারতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন নিকৃষ্ট থাকিবে না ও হইবে না। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা উচ্চ থাকা কর্ত্তব্য নিজের দেশের কেহ অধিকারচ্যুত বা অক্ষম না হয়। রেভারেণ্ড সোভিংসের সহিত আমরাও বলিব,—The Bengali has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire.

বিবাহের ন্যূনতম বয়স—কাঠিওয়ারের দেশীরাজ্য রাজকোটের হিন্দু নরপতি

সম্প্রতি এই আদেশ জারি করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে পুরুষেরা ১৯ এবং নারীগণ ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়ম দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে দেশবাসীর মঙ্গল হইবে। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহে সমাজের নানা দিক্ দিয়া নানা অনিষ্ট হইতেছে। এ প্রথা বিদূরিত না হইলে সমাজের হিত নাই।

কলেরার প্রাদুর্ভাব—বঙ্গের সর্ব্বত্রই কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জেও ইহার আক্রমণ সহরবাসিগণের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী উহার সঙ্গে লড়াই করিতেছেন সত্য, কিন্তু ফল বিশেষে দেখা যাইতেছে না। অনেকে বলিতেছেন, প্রতিষেধক টীকা লইলে ওলাউঠা হইবে না। সেজন্য অনেকেই টীকা লইতেছেন। আমাদের মনে হয় কোনপ্রকার প্রতিষেধক পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় ও শয্যা, শুকুন ও আলোবাতাসযুক্ত বাসগৃহ, বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট খাদ্য ও জল প্রভৃতির স্থান পূরণ বা অভাবদূর করিতে পারেনা। মূলতঃ এ সকলের অভাবই দেশে নানা পীড়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ। আমাদের মনে হয় যেখানে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা নাই সেখানে বাহ্যিক আড়ম্বরে লোক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। নারায়ণগঞ্জ ক্ষুদ্র সহর হইলেও ইহার বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের তত মনোযোগ দেখিতে পাইতেছি না। এই সহরের স্থানে স্থানে যে সমুদয় গর্ত্ত, যাহারা সহরের প্রায় অর্দ্ধাংশ দখল করিয়া আছে ইহাদের কচুরিপানা পচিয়া এবং জল দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া প্রতিনিয়তই স্থানীয় জলবায়ু দূষিত করিয়া সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। এগুলির সুব্যবস্থা না হইলে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে কিংবা হাঁসপাতাল স্থাপনে রোগের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। সোজা কথায় বলিতে গেলে, মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপ্রণালী সাধারণের পক্ষে বড়ই দুঃসহ রাস্তায় আলো (অবশ্য চন্দ্রালোক ভিন্ন) কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, অবশ্য দুই একটা নির্ব্বাচিত স্থান ব্যতিরেকে—রাস্তায় জল নাই, ফলে নারায়ণগঞ্জের মত স্বাস্থ্যাবাসেও ক্ষয়কাশ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। পানীয় জল কলেই সরবারহ করা হয় বটে, কিন্তু জল নিতান্ত অপ্রচুর এবং সময় সময় উপযুক্তরূপ পরিষ্কার জল পাওয়া যায় না। মোট কথা, স্বাস্থ্যাবাস আজকাল কর্ত্তাদের গুণে প্রেতনিবাস ভিন্ন আর কি বলিব? মেম্বর নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রার্থীগণের মধ্যে যে রকম উদ্যম, উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা দেখা যায়, নির্ব্বাচনশেষে তাহাদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বই কি!

বাঙ্গালীর দৈহিক শক্তি—বাঙ্গালীর মধ্যে শক্তিশালী কৃতী পুরুষের অভাব কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। আমাদেরই শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীম ভবানী, গোবর, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন, মহেন্দ্রনাথ, ননীলাল, বলাই প্রভৃতি শক্তি সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি এলাহাবাদের রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের নিকটস্থ সমুদ্রে ৩০ মাইল সন্তরণ করিয়াছিলেন। সময় ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। বাঁশরী মুখোপাধ্যায় দ্রুত হাটার জন্য বিখ্যাত। তিনি প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌয়ে ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ২॥ সেকেণ্ডে ২৮ মাইল, দ্বিতীয়তঃ, বারাণসীতে ৬ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটে ৪৫ মাইল, তৃতীয়তঃ, ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৮৪/৫ সেকেণ্ডে ১৫ মাইল এবং চতুর্থতঃ, ৫ ঘণ্টায় ৪০ মাইল পথ হাটিয়া অতিক্রম করেন। মোহন বাগানের এস্, দত্ত সমগ্র ভারতীয় দ্রুত হাঁটার প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ৭২ মাইল হাঁটিতে তাঁহার ১৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড লাগিয়াছিল।

বাঙ্গালী এখনও সে শক্তি হারায় নাই। সাধনা করিলে সে আবার সামর্থ্যলাভে সমর্থ হইবে। শক্তি-সাধনা ব্যতীত বাঙ্গালীর কল্যাণ নাই। চিরকালই

সে শক্তির উপাসক। 'শক্তিমানের জয়'এ কথা ভুলিলে তাঁহার চলিবে না।

নারায়ণগঞ্জে হিন্দুসভা—আজ প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল নারায়ণগঞ্জে একটি "হিন্দুসভা" স্থাপিত হইয়াছে; কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সোম, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়। নরপিশাচ দ্বারা লাঞ্ছিতা ও সমাজ-পরিত্যক্তা অন্যূন পঞ্চাশটী মহিলা ৺মঙ্গলময়ের কৃপায় ও মহানুভবগণের সহানুভূতিতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে কোন "অবলা আশ্রম" নাই। আমাদের বিশ্বাস নারয়ণগঞ্জ সহরের উপর দিয়া প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক দুইশত নিগৃহীতা স্ত্রীলোক অপসারিতা হয়, যাতায়াতের সুবিধায়ই পলায়নেরও সুবিধা হয়। রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকটে একটি "অবলা আশ্রম" স্থাপনের চেষ্টা করা নারায়ণগঞ্জ সহবাসী ও এই এলাকাবাসী একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। আমরা আশাকরি তাঁহারা একটী অবলা আশ্রমের অভাব দূর করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন। নারায়ণগঞ্জে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনে মিউনিসিপ্যালিটীর প্রচেষ্টা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার সাধনা সফল হউক।

বিলাতের মাদার ইণ্ডিয়ার নিন্দা—"কমনওয়েলথ অব্ ইণ্ডিয়া"লীগের উদ্যোগে একটি বিরাট জন সভায় "মাদার ইণ্ডিয়ার" ভারতীয় দিগের সংসার জীবন-যাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে বহু মিথ্যা উক্তি ও নানাপ্রকার অশিক্ষার বিবরণ আছে বলিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ এলেন উইলকিন্সন বলেন "মাদার ইণ্ডিয়ার" স্বাধীনতা দান করিয়া ব্রিটিশরাজ খুবই অন্যায় করিয়াছেন; ভারতীয় সদস্যবিহীন কমিশন নিযুক্ত ব্যাপার নিয়া বৃটিশদের সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি আকাঙ্খার সুবিধায় জন্য এইরূপ বই বিলাতে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।" সভানেত্রী লেডি এমিলি লুটিয়েন্স্ বলেন—"এইরূপ পুস্তক অপেক্ষা বৃটিশ সরকারের পক্ষে ক্ষতিকারক আর কিছুই হইতে পারে না।" পার্লামেণ্টের সদস্য লেডি সিন্থিয়া মোসলে কর্ণেল ওয়েজ্‌উড্‌ও এইরূপ পুস্তকের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। ওয়েজ্ উড্ বলেন—"বর্ত্তমান ভারতে শুধু শিক্ষা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন; রয়াল কমিশন শুধু শাসন-পরিবর্ত্তন বিষয় নিয়া আলোচনা না করিয়া তৎসঙ্গে শিক্ষাপ্রচারের ও আলোচনা করিবেন।" সভায় দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে "বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষা ও নীতির অভাবের জন্য বৃটিশ সরকার সর্ব্বতোভাবে দায়ী।"

স্বাস্থ্যরক্ষকের স্বাস্থ্যহানি—শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত "সাহিত্যে-স্বাস্থ্যরক্ষা" (স্বাস্থ্য-রক্ষকের স্বাস্থ্যহানি) পুস্তিকাখানা পাঠ করিয়া বস্তুতঃই আশ্বাসিত হইলাম। সুপ্রসিদ্ধ লেখক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর "সাহিত্যে-স্বাস্থ্যরক্ষা" লিখিয়া অনেক লেখককেই কশাঘাত করিয়াছেন—এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র প্রভৃতিকেও "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার" উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষকের স্বাস্থ্যহানি বিষয়ে আলোচনা করিয়া হরিপদবাবু যে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি শুধু শ্রদ্ধাস্পদ যতীনবাবুর উপরে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই বলিয়া নিবেদিত হইয়াছে এমত নহে, আমাদের ধারণা, হরিপদবাবু আশা করেন কোন লেখকের লেখাই যেন সুধী-সমাজে পুতিগন্ধযুক্ত জঘন্য বলিয়া প্রতীত না হয়। আমরা হরিপদবাবুর এই সৎসাহসকে ধন্যবাদ দিতেছি। নবীন সাহিত্যিকদের এই স্পর্দ্ধা না থাকিলেও যাঁহাদের কলমে "সোনা ফলে" তাহাই যদি সময়ে "রাবিশ্" বমন করে তার চেয়ে অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে কিনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহারো লেখার স্বাস্থ্যহানি ঘটে সে ক্ষেত্রে নির্ম্মল তরুণ সাহিত্যিকদিগের নিকট স্বীকার করা অন্যায় বলিয়া মনে করি না এবং তাহাতে সম্মানের হানি

না হইয়া বরং গৌরব ও সরলতাই প্রকাশ পায়। হরিপদবাবুকেও আমাদের অনুরোধ তিনি সাহিত্য স্বাস্থ্যরক্ষকের স্বাস্থ্যহানি দেখিবার পূর্ব্বে যেন অনুসন্ধান করিয়া নেন যে Whether he has arrived at that time of life when suspicion recommends itself to us in the form of wisdom. কিন্তু যদিও পুরাণে মহাত্মা মরুত্তের এই শ্লোকটী লিখা আছে :—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, গর্ব্বপরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়, তাহা মানিয়া চলা দেশ, কাল, পাত্রবিশেষে সম্ভবপর না হইলে Beauty and folly often go together এই সত্যবাক্য স্মরণ রাখিতে ক্ষতি কি ?)

শিল্পোন্নতি—বাঙ্গালা সরকারের শ্রীযুক্ত পি, সি, বসু মহাশয় ঢাকায় শাঁককাটা মেসিনটী দেখাইতেছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্র মহাশয়ও যন্ত্র আবিস্কার করিয়াছেন। স্থানীয় শাখারীরা কয়েকটী যন্ত্র লইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ইহা আনন্দের কথাই বটে কারণ দেশীয় শিল্পের যত উন্নতি হয় ততই দেশের মঙ্গল। বসু মহাশয় নাকি সাবান প্রস্তুত এবং ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত কাজের সুবিধার জন্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিবেন। তাঁহার এবম্বিধ উৎসাহ দেশের পক্ষে কল্যাণকর। নারায়ণগঞ্জের এলাকায় অনেক স্থানেই ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত করার সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ২ বৎসর যাবৎ এই ব্যবসায়টী বড়ই দুরবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

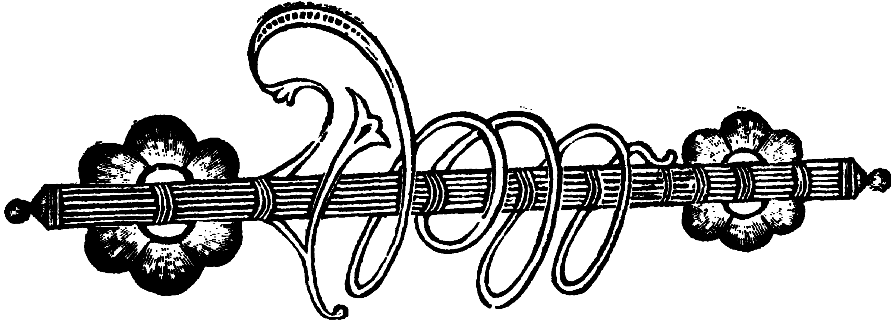
মরুভূমির হ্রদে পরিণতির প্রচেষ্টা—আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিটী হ্রদে পরিণত করার চেষ্টায় তত্রত্য সরকার ব্যয়ের তালিকা ও বিবিধ বিষয় স্থির করার পরামর্শ করিতেছেন, ইহাকেইত বলে "টাকার নৌকা পাহাড়ে চলে"। আর আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে সামান্য কচুরি পানা ধ্বংস করার জল্পনা কেবল চলিতেছে, আর এদিকে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি অলিগলির লোকক্ষয়ের চেষ্টায় তৃপ্ত না হইয়া এখন সহরে বহরে উকি দিয়াছে।



নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেস, ঢাকা। শ্রীরাধাবল্লভ ... মুদ্রিত।



পাশী সুন্দরী



সচিত্র মাসিক পত্র

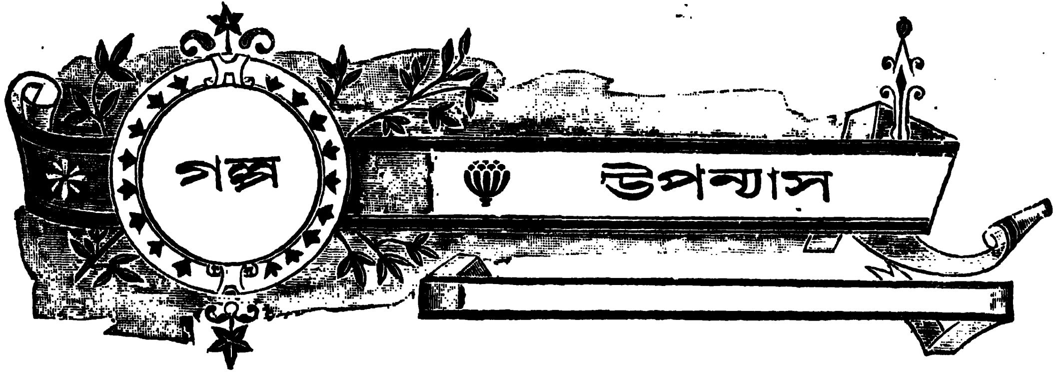
য় বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৪ ৪র্থ [সংখ্যা

রজনী গন্ধার প্রতি

(মালাই পান্তুম্)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ফুল তুমি নহ, রজনীগন্ধা, তুমি যে রূপসী রমনী !
স্নিগ্ধ গন্ধে বুকে জাগে মোর একি বিহ্বল বাসনা !
সবেগে শোণিত ছুটিয়া কাঁপায় শিরা উপশিরা ধমনী !
পাগল হইয়া বনে বনে ধাই পূরাতে প্রাণের কামনা !
স্নিগ্ধ গন্ধে বুকে জাগে মোর একি বিহ্বল বাসনা !
জীবন মিশায়ে দিতে চাই তব অমল ধবল জীবনে !
পাগল হইয়া বনে বনে ধাই পূরাতে প্রাণের কামনা !
ফুরায়ে যেতেছে জীবন আমার জাগ্রত দিবা-স্বপনে !
জীবম মিশায়ে দিতে চাই তব অমল ধবল জীবনে ।
হাতে লয়ে ফিরি দিবসে তোমায়, রাতে রাখি বুকে চাপিয়া !
ফুরায়ে যেতেছে জীবন আমার জাগ্রত দিবা-স্বপনে !
গভীর পুলকে আঁখি ঝরে মোর,থেকে থেকে উঠি কাঁপিয়া !
হাতে লয়ে ফিরি দিবসে তোমায়, রাতে রাখি বুকে চাপিয়া !
রূপ-পিপাসায় যৌবন যায়, পারি না এ-ব্যথা বোঝাতে !
গভীর পুলকে আঁখি ঝরে মোর, থেকে থেকে উঠি কাঁপিয়া !
মরণ-অন্তে তুমি হয়ে আমি মিশে যেন রই তোমাতে !



নিশীথের আলো

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রতুল ছিলেন শরতের যথার্থ বন্ধু। তিনি শরতের সহিত একত্রে আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, তাহার পর শরৎ পড়া ছাড়িয়া দেন, কুসঙ্গে মিশেন, নিজের দেবচরিত্র দূষিত করিয়া ফেলেন। প্রতুল বি, এ, এবং ল'পাশ করিয়া মফঃস্বলে কোন সহরে প্র্যাকটিস করিতে গেলেন।

কলিকাতায় যতদিন তিনি ছিলেন শরৎকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন; উপদেশ দিয়াছেন, তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু শরৎ কিছুতেই সৎপথে আর ফিরিতে পারেন নাই। একদিন শরৎ তাঁহাকে অপমানজনক কি একটা কথা বলায় তিনি যেই চলিয়া গিয়াছেন আর আসেন নাই। তাঁহার কথা শরৎ ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কোন দিন এই অকৃত্রিম বন্ধুর সৎ উপদেশ মনে করিয়া মনকে অনর্থক কষ্ট দিতে তিনি রাজি হন নাই।

আজ যখন রেজেষ্ট্রীতে একখানা পত্র তাঁহার নামে আসিয়াছিল, তিনি সেখানা উল্টাইয়া দেখিলেন, সেখানা বাঁকিপুর হইতে আসিতেছে।

বাঁকিপুরে তাঁহার কে আছে তাহাই তিনি মনে করিবার চেষ্টা করিলেন। মনে করিতে না পারিয়া পত্রের কভার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

প্রথমেই নীচে নামের দিকে তাকাইলেন, সেবা নাম যে কখনও শুনিয়াছেন তাহা মনে হইল না।

পত্রে লেখা ছিল—

মান্য বরেষু,

আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও আপনি আমার পরিচিত। আপনার নাম আমি আমার বিয়ের পর হ'তে শুনে আসছি, আপনিও আমার স্বামী আপনার বন্ধু প্রতুল মিত্রের কাছে আমার নাম শুনেছেন সন্দেহ নাই।

আজ নিতান্ত দায়ে পড়ে আপনাকে পত্র দিচ্ছি, এ বিপদে আপনি বই আমার উদ্ধারকর্ত্তা আর কেউ নেই। আমার এমন কোন আত্মীয় নেই যে এই বিপদে আমায় রক্ষা করতে আসবে।

স্বামীর মুখে একদিন শুনেছি আপনি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলতে যে শ্রেণীর জীব বুঝায়, তাঁর কথা শুনে আমি আপনাকে তা মনে করতে পারি নি। যে বন্ধু বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে এগিয়ে যায় আপনি একদিন আমার স্বামীর সেই বন্ধু ছিলেন। সেই সাহসে আমি আজ আপনাকে পত্র দিচ্ছি।

আমার স্বামী,—আপনার বাল্যবন্ধু এখানে ওকালতি করতেন, বোধ হয় আপনি শুনেছেন। এখানে তাঁর বেশ পশার ও হয়েছিল, একটী কারণে তাঁর অত মান প্রতিপত্তি, পশার সব মাটি হ'য়ে গেল; একটী কথায় তিনি আজ মানুষের চোখে একেবারে অধম হ'য়েছেন।

কথাটা পরিষ্কার করে না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সে কথা বলতে গেলে লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে পড়ে, লিখতে আমার লেখনী নিশ্চল হয়ে আসছে। কিন্তু তবু আমায় সে কথা আপনাকে জানাতেই হবে, কারণ আমার আজ কেউ নেই যার 'পরে আমি ভর দিয়ে একটু দাঁড়াবার জন্যে অন্ততঃ পক্ষে চেষ্টাও করতে পারি।

এখানকার লেডী ডাক্তার মিস গাঙ্গুলী আমার এই সর্ব্বনাশের মূল। সে দেখেছে তার দেশকে-তার মোহময় রূপে ও কথায় আকৃষ্ট করে যে সব যুবককে সে টেনে নিয়েছে, সর্ব্বস্বহারা করেছে, আমার স্বামী তাদেরই মধ্যে একজন। আমার স্বামী কাজ ছেড়ে দিলেন, ঘরের পয়সা বার করে দেশের সেবায় নিয়োজিত করলেন, অথচ আমায় একটি কথা জানালেন না।

হঠাৎ যে দিন আমি জানতে পারলুম, সে দিন আমার চোখে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল, আমি জানতে পারলুম—আমার স্বামী সব হারিয়েছেন, আমার স্বামীর কিছু নেই।

জগতে আমার গৌরবের বস্তু ছিলেন তিনি, কিন্তু আমি আজ সে গৌরব হারিয়েছি। আজ তিনি সাধারণের চোখেও হেয়, তাঁর দেশভক্ত দলের কাছে হেয়, তারা তাঁকে অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌছতে দেখে ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার এই সব-হারার আছে শুধু পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী, কিন্তু জানি নে কেন সকল আক্রোশ আমাদের 'পরেই পড়েছে। নিজের : নির্য্যাতন সইতে পারি,—হতভাগা ছেলে মেয়েকে নির্য্যাতন করা যে সইতে পারি নে, মায়ের বুক ফেটে যায়।

কিন্তু এজন্যেও আমি আজ আপনাকে চাই নে, চাই আমার স্বামীকে রক্ষা করতে। আমার স্বামী মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিস্ গাঙ্গুলীর আশায় হতাশ হয়ে তিনি নিজকে নিজে নষ্ট করে ফেলছেন। চাই তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে আপনাকে। পথে তাঁর বার হওয়ার যো নেই, নিজের থেকে সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সব হারিয়েছেন। বলতে লজ্জা করে—দলের গচ্ছিত অর্থ, মক্কেলের গচ্ছিত অর্থ সবই তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমার ভয় হচ্ছে—হয় তো তিনি আত্মহত্যা করবেন—কারণ এ রকম অবস্থায় সেটা খুবই স্বাভাবিক। বন্ধুকে রক্ষা করতে,—একটি নারী এবং দুটি শিশুকে বাঁচাতে—রক্ষাকর্ত্তারূপে আপনাকেই আজ আহ্বান করছি,—আপনি আসুন। আমার স্বামীকে বাঁচান, আমাদের বাঁচান। আজ আপনার পথ পানে চেয়ে রইলুম, বিলম্ব করবেন না।

নিঃ

সেবা মিত্র।

পত্রখানা পাঠান্তে শরৎ যেন অগাধ জলে পড়িয়া গেলেন। আজ অনেক কালের পরে চকিতে তাঁহার মনে বন্ধু প্রতুলের মুখখানা জাগিয়া উঠিল। হায় রে, কি মানুষ ছিল সে, তাহারই কিনা এই সাংঘাতিক অধঃপতন? দরিদ্রের সন্তান প্রতুল শুধু এই সৎচরিত্রের জন্যই আদর্শ-স্বরূপ ছিল, এবং ধনী কন্যা সেবা স্বেচ্ছায় তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

শরতের মনে পড়িলে প্রতুলের সেই তেজঃপুঞ্জ দীপ্ত আকৃতি, তাহার সেই উদ্দীপনাময় কথাগুলা। সেই প্রতুল—যাহার সৎচরিত্রের বর্ম্মে ঠেকিয়া শত সহস্র সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে অনেক দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে, এতকাল যে ধাপে ধাপে উপরেই উঠিতেছিল, কেমন করিয়া সে অধঃপতনের এত নিম্ন স্তরে পড়িয়া গেল? মিস্ গাঙ্গুলীর এমন কি মোহ আছে—যাহাতে প্রতুল কিছুতেই নিজকে সংযত রাখিতে পারিল না, সাধারণ পতঙ্গের মতই সে আগুণে ঝাঁপাইয়া পড়িল?

শরৎ নিজে অধঃপতনের সোজা পথ বাহিয়া

চলিয়াছেন, কিন্তু তাহাই বলিয়া তিনি চান না তাঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া আর কেহ চলুক। আজ প্রতুলের শোচনীয় অধঃপতনে তাঁহার অন্তরে বড় বেদনা বাজিল।

কিন্তু কে এই মিস্ গাঙ্গুলী?

এই অপরিচিতা অনিন্দ্য সুন্দরীর কথা মনে করিতে করিতে তাঁহার অন্তরের বড় গোপনে অবস্থিত একখানা বড় সুন্দর মুখ মনের উপর জাগিয়া উঠিল। সে একদিন মিস্ গাঙ্গুলী নামেই পরিচিতা ছিল, সেও ডাক্তারী পড়িত।

সেই মুখখানা—বাস্তবিকই কি সুন্দর ছিল! তাঁহার তরুণ হৃদয় একেবারেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সংসার ভুলিয়া শরৎ সেই তরুণীটিকে ভালবাসিয়াছিলেন? তখন মনে হয় নাই—সেই তরুণী ও তাঁহার মাঝখানে কতখানি দূরত্ব জাগিয়া আছে।

সে ভালবাসা চোখের নয়। যে ভালবাসা মুহূর্ত্তে উদয় হইয়া মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায় না, বরং দুষ্প্রাপ্য জানিয়াই হৃদয়ের স্তর কাটিয়া কাটিয়া অন্তরতম স্থানে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া যায়, ইহা সেই ভালবাসা। অন্তরতম স্থল হইতে যে প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়াছিল শরৎ তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্নাত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শরৎ যে বাড়ীতে থাকিতেন, ঠিক তাহার সম্মুখে থাকিত তাহারা। সংসারে ছিল সেই তরুণী, তাহার মা এবং একটি দাসী।

এমন একদিন যাইত না, যে দিন শরৎ সেই প্রার্থিত মুখখানি না দেখিতে পাইতেন। মেয়েটি নিজের ঘরে বসিয়া আপন মনে নিজের পড়া তৈয়ারী করিত, বেলা দশটায় কলেজে চলিয়া যাইত, বৈকালে শ্রান্তভাবে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িত। সন্ধ্যার পরে আবার পড়িতে কঙ্কালগুলা নাড়াচাড়া করিত, তাহার খটাখট শব্দ এ পাশে শরতের কাণে বড় স্পষ্ট হইয়াই বাজিত।

অন্তর যেখানে নিয়ত আকর্ষণ করে সেখানে পরিচয় হইতে বেশীক্ষণ বিলম্ব হয় না। কোন একটা অছিলায় শরৎ অনায়াসে এই পরিবারে প্রবিষ্ট হইতে পারিল।

সম্ভ্রান্ত জমিদার-পুত্র শিক্ষিত ও রূপবান এই যুবকটিকে ইভার মা বেশ আন্তরিকতার সহিতই গ্রহণ করিলেন। শরৎ যখন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন ইভার মা জানাইলেন শরৎকে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তবে ইভাকে বিবাহ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম লইলে শরতের পিতা নিশ্চয়ই শরৎকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেন, যাহাতে তাহা না হয়,—অর্থাৎ শরৎকে যেমন করিয়াই হোক পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিয়া তবে ইহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

দারুণ ঘৃণায় শরতের সারা অন্তরটা অকস্মাৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল, উন্মুখ চিত্ত অকস্মাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া গেল। এই মুহূর্ত্তটিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মূল্য ইহাদের কাছে তত বেশী নয়, সম্পত্তির মূল্য যত বেশী। ইহারা ইহাদের লালসা-ময় দৃষ্টিপাতে দেখিয়াছে শুধু তাঁহার বিশাল সম্পত্তি, তাঁহাকে নহে। হৃদয়ের মূল্য যাহারা বুঝে না তাহাদের সংস্রবে থাকিতে শরতের সমস্ত অন্তর দেহ শিহরিয়া উঠিল, তিনি ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—চলিলেন কিন্তু আর এক পথে। যে পথ বহিয়া এতদিন তিনি চলিয়াছেন, সে পথ তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সহসা এই ধাক্কাটা খাইয়া সে পথের উপর তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা চাপিয়া গিয়াছিল, তিনি তাই বক্র পথ ধরিলেন। এ পথে একবার পা দিলে দ্রুত থামিয়া না যাইবার সম্ভাবনাই বেশী এ চিন্তা মনে জাগিলেও তিনি জোর করিয়া সে চিন্তা তাড়াইয়া দিলেন।

পুত্রের এই নিদারুণ অধঃপতনের কারণ জানিতে স্নেহময় পিতার বিলম্ব হইল না। তিনি ভৃত্যের হাতে

দিয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে ইভার মাকে অনুরোধ করিলেন—তিনি তাঁহার কথাই রাখিবেন। পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি পুত্রকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন, সকল সম্পত্তি এখনই পুত্রের নামে লিখিয়া দিতেছেন; ইভার সহিত শরতের বিবাহ দেওয়া হোক।

ইভার মা উত্তর দিলেন,—তাঁহার কন্যার জন্য সৎপাত্র ঠিক হইয়া গিয়াছে। অসচ্চরিত্র শরতের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত নহেন, এ জন্য শরতের পিতা যেন তাহাকে মার্জ্জনা করেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই তাহারা সম্মুখের সে বাসা ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, দারুণ ঘৃণায় শরৎ তাহাদের গম্য স্থানের খোঁজটা পর্য্যন্ত লওয়ার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। কিছু কাল পরে এম. বি, পাসের লিষ্টএ মিস্ ইভা গাঙ্গুলীর নামটা জলজলে হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সে দিনে শরতের সমস্ত অন্তরখানা কি এক অননুভূত বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, গ্লাসের পর গ্লাস মদ্য পানেও সে বেদনা জুড়াইতে চাহে নাই।

সে বেদনা আর জুড়াইয়া যায় নাই। উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও শরৎ সফলকাম হইতে পারেন নাই। অন্যমনস্ক হইবার জন্য সকল আয়োজন তাঁহার যেন ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছিল। জীবনে আর কোনও নারীকে ভালবাসা দূরে থাক, তাহাদের পানে চাহিতে পর্য্যন্ত তিনি উদাসীন। আজ তাঁহার কঠিন প্রস্তরসম অন্তরটার পানে তাকাইয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়, কেহ ডাকিতে পারে নাই—এই অন্তরই এক দিন বড় কোমল ছিল, একটা নিদারুণ আঘাত-স্পর্শে এ অন্তর বজ্রাপেক্ষা কঠিন হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। নিজকে তিনি আর আটকাইয়া রাখিতে পারেন নাই, রাশছাড়া। উন্মত্ত অশ্বের মত তাঁহার মন ছুটিতেছিল, তাহাকে তিনি নিমেষের তরেও ঠেকাইতে চেষ্টা করেন নাই।

আজ এই মিস গাঙ্গুলী নামটা চোখের উপর জাগিয়া উঠিতেই তিনি মনোগতির বিপরীত দিক হইতে আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া একমুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

এ কে? এই কি ইভা,—সেই ইভা?

না, ইভা নয়। ইভা দেশের কর্ম্মীসংসদ গঠন করিবে, তাহাদের নেত্রী হইবে, ইহা হইতে পারে না। দেশের কাজে নামিতে গেলে যে ত্যাগের প্রয়োজন, যে শক্তির আবশ্যক, তাহা কি ইভার আছে? বিলাসিনী ইভা, তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া যে কেহ বুঝিতে পারিবে এ নারী জীবন্ত লালসা। তাহার মধ্যে নমনীয়তা নাই, আছে গর্ব্বের স্ফীতি। রূপের গর্ব্বে সে আত্মহারা, দুনিয়ার কাহাকেও সে গ্রাহ্য করে না।

আর যদি ইভা এই কৃত্রিম বেশই গ্রহণ করিয়া থাকে, নামের মধ্যে তাহার আসল মূর্ত্তিটিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যদি সে বাহিরে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশই ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে কি আছে বুঝিতে হইবে? কতকগুলি লোককে রূপে মুগ্ধ করিয়া পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া খেলা করিয়া অবশেষে পুতুলের মত নিঃসম্বল অবস্থায় দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া—

শরতের কাণ মুখ দিয়া আগুণ ছুটিতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত ভাবে আপনা আপনিই বলিয়া উঠিলেন,—"না না, এ কখনই ইভা নয়,—ইভা এ রকম কাজ করতে কখনই পারে না। ভগবান যার বাইরের দিকটা অত সুন্দর করেছেন, তার ভেতরটা মাকাল ফলের মত অসার বস্তু দিয়ে কখনই পূর্ণ করেন নি,—কখনও না, কখনও না—

ইভা অর্থ ভালবাসে, তাহার বিলাস তৃপ্তির জন্যই তাহার প্রচুর অর্থের আবশ্যক, কিন্তু সেই অর্থের জন্য সে যে নারী হইয়া এমন ছলনাময় ব্যবহার করিবে, ইহা মনে করাও যেন অসহ্য। ইহা ভাবিতে শরতের বুকে আগুণ জ্বলিয়া উঠে।

না, এ কখনই ইভা নয়—ইহা ভাবিতেও বড়

আশাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। শরৎ মানস চক্ষে দেখিতে পাইলেন, ইভা বড় ঘরের বধূ হইয়াছে, সে যেমন চায় তেমনি স্বামীই সে পাইয়াছে। হায় রে, শরতের বুকভরা ভালবাসা যদি সে অনুভব করিত, অতি অকিঞ্চিৎকর অর্থের পানে তাকাইয়া যদি সে এই মানুষটার অন্তরের পানে একবার তাকাইত—এতদিন শরতের এ শূন্য গৃহ যে পূর্ণ হইয়া যাইত, আজ যে ইভাই এখানে একচ্ছত্রী রাণী হইতে পারিত। কোথায় গেল সে দিন—যে দিন এই পৃথিবী ছিল কি সুন্দর! ইহার কিছুই সে দিন এমন ব্যর্থ ভাবে ফিরিতে পাইত না, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া লওয়া যাইত। সে দিন মনে পড়িত না হাসি গান, খেলা সবই মিথ্যা, নীল আকাশে, চাঁদের অসীম আলো, ফুলের সুবাস, আর পাখীর গান সবই অনর্থক, —ইহার কোন মূল্য নাই। আজ চোখের সম্মুখ হইতে সে মোহময় পর্দ্দাটা সরিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে পৃথিবীর বুকে মানুষের মন মুগ্ধ করিবার এ সব বৃথাই আয়োজন, বৃথা খেলা মাত্র। চোখের পাতা দুটি ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল,—হা অতীত, যে দিন লইয়া গেলে, পিছনে কেন তাহার দাগটি রাখিয়া গিয়াছ? আজ যদি সে দিনের স্মৃতি কোন রূপে মিলাইয়া দেওয়া যাইত,—আঃ, শরৎ যে তাহা হইলে যথার্থ সুখী হইতে পারিতেন।

দুই হাতে বেদনা-দীর্ণ বুকটা চাপিয়া ধরিয়া শরৎ উদার দুটি নয়নের দৃষ্টি কোন অসীমের পানে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

(৭)

সাধ্বী সতীর অন্তরের আকুল আহ্বান উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি শরৎকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। প্রতুলের জন্য যে ব্যস্ততাটুকু তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা কেবল এই নারীটির জন্যই।

শরৎ আজ রাত্রের মেলেই রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অকস্মাৎ একটা চিন্তা জাগিয়া উঠিল মাণিক,—তাহাকে কোথায় কাহার কাছে দিয়া যাইবেন?

সেই দুর্ব্বল ক্ষীণকায় বালকটির কথা মনে করিতে শরতের হৃদয় স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। হায়রে জগৎ, এই বিশাল জগতে এই ক্ষীণকায় শিশুটির স্থান নাই, তাহাকে কেহই নিজেদের মধ্যে এতটুকু স্থান দিয়া রাখিতে চায় না, সকলেই তাহাকে বড় দূরে রাখিয়া চলে, দৈব ক্রমে কাছে গেলে ও দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

অভাগা শিশু সে মাত্র, ছয় বৎসর বয়স তাহার, জাতিবিচার, উচ্চ নীচ জ্ঞান তাহার অন্তরে এখনও জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। অপর বালকেরা যখন খেলা করে সে তখন ভাবিতে পারে না, তাহাদের সহিত খেলার অধিকার তাহার নাই। সে যে সকলের মাঝে বাস করিয়াও সকল হইতে বঞ্চিত এ খবরটা এখনও তাহার কানে পৌছায় নাই। সে জানে পৃথিবীর বুকে তাহারাও যেমন সেও তেমনি; তাহারা যাহা ভোগ করিতে পারে সেও তাহা ভোগের দাবী করিতে পারে। সে শিশু জানে না—পৃথিবীর লোকই সংস্কারের জাল গাঁথিয়া তাহার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়াছে। এ জালের ভিতর হইতে সে বাহির টাকে দেখিয়াই যাইবে মাত্র, কিছুই স্পর্শ করিতে পাইবে না।

এই অপোগণ্ড ছেলেটি লইয়া শরতের হইয়াছে মহামুস্কিল। ইহাকে স্পর্শ করিতে কেহ চাহে না, পাছে স্পর্শ করিয়া ফেলে এই ভয়ে লোকে দূরে দূরে থাকে। কর্ম্মচারী, দাসদাসী সকলেরই সমান স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য বিচার। শরৎ যখন উদার ভাবে এই সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে গেলেন তখন ছোট বড় সকলেরই মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। কেহ কেহ যেন স্বগতঃভাবে অথচ শরৎকে বেশ ভালরূপেই শুনাইয়া বলিল, "তা বলে চাকরি করতে এসে জাত তো খোয়ানো যায় না, বাপু। কি আর করিব, অদৃষ্টে না থাকিলে চাকরী নাই থাকিবে, তা বলে জাত খোয়াতে পারব না।"

শরৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; আর একটি

কথাও কাহাকে না বলিয়া তিনি নিজেই দুর্ব্বিষহ বোঝার মত এই ছেলেটাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এ ভার আর কেহ বহিতে রাজি হইল না যে শক্তির অভাবে, সে শক্তি তাঁহার প্রচুর রূপেই ছিল।

এতদিন এ বোঝা অবলীলাক্রমে তিনি বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সামান্য একবারের জন্যও পদস্খলন হয় নাই. চলার বিরাম হয় নাই, আজ হঠাৎ তিনি থামিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল স্বেচ্ছায় যাহাকে তিনি আশ্রয় দিতে একটা অঙ্গুলিই মাত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, প্রকৃতির নিয়মে সে সেই ততটুকু অবস্থায় থাকিয়া ততটুকু পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার অলক্ষ্যে সে কবে বড় হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র অঙ্গুলি ছাড়িয়া তাঁহার সমস্ত দেহটাকে কবে কেমন করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। আজ এ বোঝা তিনি নামাইবেন কেমন করিয়া, এ বাঁধন আলগা করিবেন কিরূপে? আজ তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে, এমনি আকস্মিক দমকা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া পড়াই তো তাঁহার চির-অভ্যাস। আজ মনে পড়িল সীমাহীন ধারণাও আজ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ইচ্ছামত ছুটিয়া বেড়ানোর দাবী আর করিবার যো নাই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথের উপর পড়িতেই সামনা সামনি একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল, তাঁহার নাম বিদ্যাধন তর্কালঙ্কার।

তর্ক কচকচি নামটাই বেশীর ভাগ গ্রামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। অনভিজ্ঞ গ্রাম্যনারীবৃন্দ লঙ্কা শব্দটা এত বড় পণ্ডিতের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিদ্যালঙ্কার আজ বিদ্যা কচকচি নামে গ্রামে বিখ্যাত।

"হরিবোল, হরিবোল, শুভমস্তু—শুভমস্তু; বেঁচে থাক বাবাজি, আমার যত মাথার চুল তত বছর তোমার পরমায়ু থাক, বাপ পিতা মোর ভিটেতে সন্ধ্যে প্রদীপটা জ্বলুক বাবা। দেশের দশের এমনি করেই সেবা করে যাও, দেশের লোকে তোমার দয়ায় বেঁচে থাকুক। তারপর বাবাজি,—যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

গন্তব্য পথে বাধা পাইয়া শরৎ দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণের উপর আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা না থাকিলেও একটা প্রণাম করিয়া ফেলিয়া শুধু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কোথাও না, এই এখানেই একটু বেড়িয়েছিলুম।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় অজস্র আশীর্ব্বাদ ধারা শরতের মাথায় ঢালিয়া দিয়া স্নেহ গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "তা বেড়াবে না আর? তোমার দেশ,—তোমার মাটি, তোমারই সব,—তুমি বেড়াবে না, তাও কি হতে পারে?"

আবার একটু হাসিয়া শরৎ বলিলেন, "আমারই সব?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তা নয় তো কি বাবা? ছোট মায়ের কথা বলবে,—কিন্তু নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীলোক, কিছুর, পরেই তাঁর দাবী শেষ পর্য্যন্ত টিকাতে পারবে না। তোমার কাকার মৃত্যুর পরে তোমার অনুপস্থিতিতে এতদিন যে তিনি এই বিশাল জমিদারী ভোগ করতে পেরেছেন এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া হয়েছে। বিধবার কিসেই বা দরকার বাবা? একবেলা দুইটা আতপ চালের ভাত খাবে, দু'খানা মোটা থান পরবে—ব্যস, ফুরিয়ে গেল। তোমার বিষয় সম্পত্তি, তুমিই জন্ম জন্ম ভোগ কর বাবা, আমরা রাম-রাজত্বে বাস করে বাঁচি।"

শরৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন মাত্র।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সে প্রসঙ্গ ফিরাইয়া বলিলেন, "তারপর বাবাজি, বিয়ে থাওয়া করবে না, এমনি করেই দিনগুলো কাটিয়ে দেবে?"

শরৎ হাসিমুখে বলিলেন, "আর ও বালাইয়ের দরকার কি তর্কালঙ্কার মশাই,—এ বেশ আছি।"

বিস্ফারিত চোখে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বালাই! ওসব কথা মনেও এনো না বাবাজি। গৃহিণী ঘরের লক্ষ্মী, গৃহিণী হীন হয়,— জানো বাবাজি, একেবারে অরণ্য-সেও আবার কি রকম অরণ্য জানো, যে অরণ্যে বুনো জন্তুগুলো ইস্তক বাস করতে পারে না, ঠিক সেই রকম। গৃহিণীহীন ঘরে লক্ষ্মী কখনও বাস করতে পারে না—এ কথা জানো বাবাজি?"

শরৎ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনার কথাগুলো ঠিক অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে তো পারছি নে তর্কালঙ্কার মশাই। গৃহিণী থেকেই বা লাভ কি বলুন না দেখি! কেবল একটা না একটা অশান্তি লেগে আছেই। তার আবদার পুরাতে দিন কেটে যায়, তার রাগ ভাঙ্গাতে মাথাটাকে মাটিতে পাততে হয়, তারপর কতকগুলো ছেলে পুলে হ'লে— তাদের অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে, সব তাতেই কি খরচটাই না পড়ে.—হিসাব করুন।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "সেটা ঘটে বাবা আমাদের ঘরে। এটা আনতে ওটা নেই, ওটা আনতে এটা নেই; ভাত আনতে নুন ফুরায়, নুন আনতে ভাত ফুরায়,—এ অবস্থা আমাদেরই ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরের এ সব নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেলেও তোমার ঘরে তো হবে না বাবাজি। তোমার অভাবটা কিসের ভাব দেখি,—কত বড় জমিদারী তোমার, কত টাকা আয়,—"

বাধা দিয়া শরৎ বলিল, "আয়টাকেই ধরেছেন তর্কালঙ্কার মশাই,—ব্যয়টাকে ধরেন নি তো!"

তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরুব্বিয়ানা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সব ধরেছি বাবা, তোমার ঘরের কথা আমার কাছে কিছু অজানা নাই। তুমি চিরকাল বিদেশে আছ, আমায় চেন না,—কিন্তু তোমার বাবা চিনতেন। তিনি নিজে সমজদার জহুরী ছিলেন, কোনটা কাঁচ, কোনটা জহরত তা তিনি যেমন বুঝতেন এমন আর কেউ যে বুঝেন না এই তো ভারি দুঃখ। আমি তাঁর ডান হাত ছিলুম, আমায় না জিজ্ঞাসা করে তিনি একটা কাজও করতেন না। ওই সেবারে তোমাদের মহালে আলম-ভাঙ্গার প্রজারা খাজনা দেবে না বলে যখন লাঠি ধরে দাঁড়িয়েছিল, তোমার বাপ তখন ভেবেই সারা,—কি করে কি হবে কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। শ্রীনাথ বাবু ছিলেন তোমাদের নায়েব, তিনি এসে পরামর্শ দিলেন, পুলিসে খবর দাও—সব গোল মিটে যাবে। আমি বললুম, "কি! পুলিসে খবর দেব,—কেন জমিদারের তেমন ক্ষমতা কি নাই? দিন আমায় প্রকাণ্ড জোয়ান লাঠিওয়াল, আমি এই প্রকাণ্ড লাঠিওয়াল নিয়ে সব বেটাদের জব্দ করে দেব, খাজানা দেবার পথ তারা পাবে না। তোমার বাবা তো কেঁদেই ভাসাল, বললেন,—না সেটি হবে না। যে রকম মানুষ তিনি—তাঁকে বেশী বলাই নিষ্প্রয়োজন মনে করে আর কিছু না বলে চুপি চুপি আমরা প্রকাণ্ড লাঠিওয়াল নিয়ে গিয়ে পড়লুম সেখানে। সে বেটাদের কি সাহস আছে, না শক্তি আছে? লাঠিওয়াল নিয়ে গিয়ে দাড়াতেই তো তারা হাতের লাঠি ফেলে দিলে; তারপর তাদের কয়টাকে ধর পাকাড়,—মার ধর করতেই – ব্যস, যার কাছে যত পাওনা খাজনা ছিল সব তো দিলই, তা ছাড়া—বাড়ী পিছু দুই টাকা ধরে দিলে। তাই তো বলি বাবা, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, সব গেছে। আজিকে সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বিদ্যাপতি বা আর বলব কাকে? তোমার বাবা যে আমায় কি ভালবাসতেন—তা যদি আজ তিনি থাকতেন তবেই দেখতে পারতে, জানতে পারতে।"

একটা বড় গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বড় করুণ চোখে তিনি শরতের পানে তাকাইলেন।

অতি কষ্টে হাসি গোপন করিয়া শরৎ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সে সবই শুনেছি। শ্রীনাথ বাবু এ সব কথা আমায় বলেছেন।"

বিদ্যাধন তর্কালঙ্কারের কোটরে প্রবিষ্ট চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তাই তো

বাবাজি, আমিও তো তাই বলি,—তুমি দেশে এসেই সকলের খোঁজই বিশেষ করে নিয়েছ, গুণ কি লুকিয়ে থাক্‌তে পারে? আগুণ যেমন ছাই ঢাকা থাকে না মানুষের দোষ গুণও তেমনি ঢাকা থাকতে পারে না। তবে নাকি—পাড়া গাঁ গুলো বড় খারাপ, এখানকার লোকগুলো প্রায়ই বড় হিংসুটে, পরশ্রীকাতর হয়ে থাকে, কারও ভাল এরা বড় একটা সইতে পারে না"।

শরৎ মাথা কাত করিয়া বলিলেন, "সে কথা সত্যই, কিন্তু এরকম ব্যাপারটা শুধু পাড়াগায়েই ঘটে না তর্কালঙ্কার মশাই,—সহরে যাঁরা বিলক্ষণ শিক্ষিত তাঁদের মধ্যেও এই পরস্পর ঈর্ষাভাবটা জেগে আছে বলেই আমি জানি। কদাচিৎ দুই একজনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটলেও ঘটতে পারে, তারা সংসারের অনেক ওপরে তা জানবেন!"

তর্কালঙ্কার মহাশয় চট করিয়া কথাটা মানিয়া লইলেন—'তা হতে পারে, কিন্তু জেনো বাবাজি, পাড়াগাঁয়ের লোকদের মধ্যে এ ভাবটা বড় বেশী। এই যে আমি একদিন লোকের কত উপকারই করেছি তা কি কেউ আজ বলবে? আমি যে এত করেছি, এখানকার লোকদের কথা চাপা দিয়ে তোমার কানে আমার কুৎসাই তুলে দেবে। তুমি যে বাবাজি, এমন ভাল লোক, তোমার নামে কত কুৎসাই না লোকে করে। আমরা গুণ বুঝি বাবাজি, গুণের আদর আমরা করতে জানি, মন্দটাই ধরে রাখতে চাই নে। সে যাই হোক বাবাজি, একটা বিয়ে করে ফেল। আমার দাদার ছেলে তুমি, দাদার বংশটা রাখতে হবে তোমার। দাদা আমার কত দিন আমায় বলেছেন,—"বিশ্বেধন, ছেলেটা রইল, ওকে দেখ, দেখে শুনে সৎ বংশের একটি মেয়ে আমার ঘরে এনো, বংশটা যেন থাকে। তুমি ইচ্ছে করে বংশটা—"

তাঁহার চোখ দুইটি জলভারে যেন নমিত হইয়া পড়িল, এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথাগুলা শরতের গায়ে যেন বাণ বিঁধাইয়া দিতেছিল, তিনি তথাপি বেশ শান্ত সুরেই বলিলেন, "না, তা কি হতে পারে যে একেবারেই বিয়ে করব না, তবে কি জানেন,—কেউ কেউ নিজে দেখে শুনে বিয়ে কর্‌লেও আমি তার পক্ষপাতী নই। আপনারা সব প্রাচীন মানুষ মাথার 'পরে রয়েছেন, দেখে শুনে একটি সুপাত্রী ঠিক করে বিয়েটা দিয়ে দিন।"

"আচ্ছা, তাই বল বাবা, তাই হোক। তোমায় সুমতি হোক্, আমার দাদার খালি ঘরটা আবার পূরে উঠুক। তোমার প্রথম সন্তান হলেই আমি চণ্ডী তলায় গিয়ে মা চণ্ডীর কাছে সোয়া পাচ আনার কাঁচাগোল্লা দিয়ে আসব।"

মা চণ্ডী এই ব্রাহ্মণের প্রদত্ত সোয়া পাঁচ আনার কাঁচাগোল্লা খাইবার জন্য যে কতদূর ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন তাহাই ভাবিয়া শরতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আপনি নিজে থেকেই বা তা দিতে যাবেন কেন? আমিই চণ্ডীর পূজোর জন্যে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেব আপনার সেই আলাদা পূজোর জন্যে যৎসামান্য দক্ষিণা একবারে নিয়ে যাবেন। শ্রীনাথ বাবুকে আমি বলে দেব। এখন আপনি গেলেই তিনি টাকা দেবেন! আর একটা কথা, চণ্ডীপূজার জন্য আপনার বাৎসরিক চব্বিশ টাকা ধরা আছে, সেটা ডবল করে দেওয়া গেল, অর্থাৎ দুই টাকা করে মাসে দেওয়া হ'ত, সেটা চার টাকা করে এই মাস হ'তে পাবেন।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবার অপেক্ষা না করিয়া শরৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ আনন্দ বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ—

ভিত্ গাঁথ্তে ফাঁকি দেওয়া

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

সব ছেঁড়া ছেঁড়া চাটাই আর দরমার বেড়া। গোলপাতা, খড়, রাস্তা থেকে কুড়োনো এক ফালি টিন, একটুক্‌রো দরমা এই রকম অনেকগুলো জিনিষ মিলিয়ে সেই সব ঘরের চাল, ছাউনী।......একটা নয়, ছুটো নয়।

সারি সারি চ'লেছেই। বেশ লম্বা বস্তী।

গলি পথ..., পিচের তো নয়ই, কাকর, বালিরও নয়।

মাটীর—আপনি তৈরী পথ।...

বৃষ্টিতে কাদা হয়, রোদে তেতে যায়...

গ্যাসের আলো নেই গলিতে।...অন্ধকারেই চলা-ফেরা ক'রতে হয়!

তা'ও রাস্তার কোন সীমা নেই।

কোথাও চওড়া—কোথাও সরু।...কোন জায়গায় হঠাৎ মাঝখানে এক জনের বাড়ী উঠে গেছে, উঠানের উপর দিয়ে পথ।

আবার কোথাও—কার নুয়ে পড়া ভাঙ্গা কুঁড়ের সীমানা রাস্তার অনেকটা গ্রাস ক'রে ফেলেচে—নতুন দেওয়াল তোলার সময়ে।

কাজেই তার ধারির উপর দিয়েই চ'ল্‌তে হয়।...

এই গলিতে যারা থাকে-তারা সব রকমের। এই যেমন—মুটে, মজুর, কেরাণী, ভিখিরী, বদমাইস বেশ্যা, ইতর এই সব।

তাদের ব্রাহ্মণও আছে আবার।

খুব নাকি নিষ্ঠাবান তিনি!

যথা—মদ খান, বেশ্যার হাতে খান, নিশা যাপন করেন আবার আহ্নিক; গায়ত্রীও জপেন, লোকের ষষ্ঠী পূজা করেন, যখন তখন নারায়ণকে ডেকে "নমস্কৃত্যং" করেন। দুঃখও করেন।—

সব অশিক্ষিত, মূর্খ। বড় দুর্ভাগ্য তাই এখানে এসে পড়েচেন। নইলে তাঁর কি ইচ্ছে যে থাকেন?

বস্তীর লোকগুলো অশিক্ষিত, মূর্খ যাই-ই হোক্ না কেন, তাঁরা কিন্তু তাঁকে ভক্তি করে।... রোজ রাত্তির দশটার পর সকলেই কাজ থেকে ফিরে যখন রাধানাথের পীঁড়েয় এসে জমে, তখন সংসার খরচ, গিন্নীর নাক নাড়া, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, ক্যাথারিন মেয়ো, পিলচার থেকে আরম্ভ ক'রে মহাত্মা গান্ধী, হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রেম, রঙ্গ, গল্প, গান, হল্লা সব রকমই চলে।...যে যতটুকু জানে সালঙ্কারে ব'লে যায়। যে আরও একটু জানে তর্ক করে। যে জানে না নীরবে শোনে, আর অবাক হয়।

Village School master এর শ্রোতাদের মতই বোধ হয়।

They gazed......the wonder grew
One small head could carry all he knew.

এম্‌নি ভাবেই যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘুরে গেল একদিন, এই একঘেয়ে যাওয়া। ....

নতুন ক'রে দেশে বন্যা এসেচে।

জাতিকে জাগানো চাই, সঙ্ঘকে জাগানো চাই, তরুণকে শক্তিমান করা চাই। ......

তরুণই এর নেতা।

জাগ তরুণ, জাগাও তরুণ......।

......একদিন একদল লোক এসে গেল সেই পল্লীটার ভেতর।

কেউ—যারা কখনও কোনো দিন আসে নি। ও পাশের ওই বড় রাস্তার উপর থেকেই কাজ সেরে যেত, একদিন কিন্তু এল—চরকা দিয়ে গেল। সুতো কাট, পয়সা পাবে।...অনেককে দিলে, অনেকে নিলে। অনেকে হাস্‌লেও আবার।

তবুও রাখলে—থাক্‌।

পারুল ব'ল্‌লে, রেখে দে লো চারীর মা একটা। আখেরে কাজ দেবে।

তার পানে রাঙ্গা দাঁতগুলো বের ক'রে চারীর মা ব'ল্‌লে, ওলো এখন থেকেই লাগ্‌বে দেখিস্‌। এমনিই তো কতদিন ঘর খালি যায়। ঘর যেদিন খালি থাকে সেদিনটাও যদি কাটা যায়, পরের দিনের বাজার খরচাও পাওয়া যাবে।

ঠিকই তো......। তাদের তো আর এমন পুঁজী নেই যে ভেঙ্গে খাবে। বা সেরকম পায়ও না।

এই জোর রাত্তিতে দুটো টাকা।

তা মাসে আর ক'দিন ?

এমনি চার আনা থেকে আরম্ভ ক'রেই বড় নিত্যি চলে।......

......শুধু এইই নয়, আরও হ'ল।

শিক্ষা চাই যে।......

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়ে গেল। মাইনে লাগবে না। তরুণ কর্ম্মী-সংঘ সব ঠিক মত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে ভট্টাচার্য্য মশাইকে এর ভার দিলে।...... বিদ্যালয় চালানো, লোকের সুতো নিয়ে গিয়ে তাদের অফিসে জমা দিয়ে আসা, দরকারে খবর পাঠানো প্রভৃতি। ভট্‌চাজ মশাই শিখা নাড়িয়ে বলেন, সব ঠিক ক'রবেন, কোন চিন্তা নেই—এই অশিক্ষিত-গুলোকে মানুষ ক'রতে তো তিনি চানই।

—মদের দোকানটা।

—নিশ্চয়, ওটাও ওঠাবো।

তারা চ'লে গেলে বল্লেন, হ্যাঃ ক'রবি তো সবই। জানা আছে আমার। মদের দোকান ওঠাবে! ওরে গাধারা, ছোট লোক গুলো যে মদ না খেলে মরে যাবে। মদ না পেলে তোদের কাজের ছাইও হবে না।......মনের বল পাবে কোথ্‌থেকে ?

একদিন এক মেথর এলো তার ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করাতে।

কি সর্ব্বনাশ—মেথর!

রাম, রাম—হরিবোল, হরি...।

ছোঁয়া—ছুঁয়ী উঠিয়ে দিতে হবে জানি।

না ওঠালে অনুন্নত সমাজ জাগবেও না।

তাই ব'লে এত শীগ্‌গির।...তাতে ম্যাথর।

অসহনীয় যে গো!

কেউ রাজী হয় না, এগোতে পারে না, পিছিয়ে যায়। মেথর বেচারা চ'লে গেল—মুখখানা চুন ক'রে। হা ভগবান! কী অভিশপ্ত জীবনই দিয়েছ!

স্কুল কিন্তু চ'ল্‌চে বেশ।

তরুণ কর্ম্মী সঙ্ঘ কাজ খুব চালাচ্ছে।

তরুণ নইলে কি কেউ এত খাটতে পারে ?

দেশ বুঝি এবার সত্যিই উদ্ধার হয়।

হ'ত এতদিনে, কিন্তু ঐ অনুন্নত, অস্পৃশ্যগুলো যে জাগে না।

আরও ওরা চ'লে যায়—ভিন্ন ধর্ম্মে।

এত ক'রে চেঁচানো হচ্ছে—জাগো, জাগো, জাগো আচণ্ডাল—হিন্দু মুসলমান। জাগো ভাই সব। তবুও তো জাগে না।

চৈতন্য কি ওদের হবে না ?

বক্তৃতায় কি কাজ হয় ?

চেতনা আসে কি ক'রে ?

কে বোঝায় বল ?

ম্যাথর, চাঁড়াল, ডোমগুলো যায়—সবাই প'ড়চে-দেখ্‌তে পায়। তাদের ছেলেরাই মুর্খ হ'য়ে রইল। ঈশ্বর! ঈশ্বর! কত পাপ ক'রেছিলুম—এমন ঘৃণিত, হেয় জীবন দিলে! মুক্তি কি নেই ? হ-তোর অদৃষ্ট!—

............আজকাল এক পাদ্রী এসে লেকচার দেয়—টোম্‌রা আমার কাছে এস, যীশু টোমাদের

মুক্তির জন্ত প্রাণ ডিয়াছেন। সেই মুক্তি লাভ করিবার সিক্রেট আমি তোমাদের বলিব। যীশু টোমাদের জন্ত ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছেন। টোমরা টাহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শুনিটে আইস।

কত রকম ছবির বই দেয়, পড়ে দেখ্‌তে। জানিনা বল্‌লে হাত ধরে কাছে ডেকে আনে, কেমন বুঝিয়ে দেয়।...কই এরা তো এমন করেনা।......

আরও কিছুদিন পরে—

যখন সাহেব তাদের কুটীরে পর্য্যন্ত আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। শোনাতে লাগ্‌লে—যীশু করুণাময়। টিনি ঈশ্বরের পুট্র, টোমাদের নিমিট্ট ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, টোমরা আলোক পাইতে চাহ তো আইস।

তারা একদিন ঠিক ক'র্‌লে, যীশুর ধর্ম্মই নেবে। এমন ঘৃণ্য হ'য়ে আর থাকা চলেনা।......

পারেনা।........

-:*:-

রূপের মোহ্

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত

একা যেতে যেতে পথের মাঝারে দেখিলাম অবিকল
পান্নার মতো ফুটে আছে ফুল মুক্তার মতো ফল।
দেখিয়া হ'লেম বড়ই মুগ্ধ সাধ হ'লো তুলে আনি,
গৃহে লয়ে গিয়ে দিব সাজাইয়ে প্রিয়ার কবরী খানি
বাড়াইনু হাত, একি উৎপাৎ! হইলো অগ্নি-বৃষ্টি!
যাতনা বিষম, একি এ কুসুম, অদ্ভুত ছাড়া-সৃষ্টি!
যতো কিছু করি যাতনা কমে না, আরো বাড়ে জ্বালা তা'তে;
ছুটিয়া চলিনু গৃহ অভিমুখে কতোকিছু মাখি হাতে।
বলিলাম—প্রিয়ে, তোমারি জন্যে হ'য়েছি আজিকে খুন,
শুনিয়া গৃহিণী আসি তাড়াতাড়ি হাতে লেপি' দিলা চুণ।
আমি কহিলাম—আরে রাম রাম' একেতো জ্বালায় মরি,
তাতে দাও চুণ, যাইবে এখনি প্রাণ-পাখী পরিহরি।
লজ্জিতা প্রিয়া হাত বুলাইয়া দেয় বারে বারে ফু,
সে ভীষণ জ্বালা কিছুতে থামে না, আমি করি-আহা উ।
কতো কি করিনু কিছু নাহি হ'লো যাতনায় বুক ফাটে;
অনাহারে পড়ি' করি' গড়াগড়ি সারা দিবারাত্তি কাটে।

গৃহিণী আমার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করে,
মনে হ'লো হায়! এ জগতে সবে রূপেরি লাগিয়া মরে!
অজানা রূপের কুহকে পড়িয়া মিটাতে প্রাণের তৃষা,
কত জনা হায়! ও রূপ-সাগরে পড়িয়া হারায় দিশা!
অলি যায় ছুটে কুসুমের রূপে, প্রজাপতি ধায় উড়ি'।
দহন-দাহের দাহন না মানি', পতঙ্গ মরে পুড়ি।
রবি হেরি মেলে পদ্মিনী আঁখি, শশীকে কুমুদী যাচে;
মেঘের ডাকেতে সুপ্ত ময়ূরী পেখম খুলিয়া নাচে।
জ্যোছনার রূপে চকোর চকোরী চিৎকারি' কেরে দিলি,
এরূপ জগৎ রূপেরি নেশায় ঘুরিতেছে দিবানিশি।
রূপ-ফাঁদ পাতি ব'সে আছো কে গো, ও গো ও প্রিয়তম!
অরূপ-রতন ব'সে আছো তুমি ক্ষুধিত লূতার সম।

যাবনা, যাবনা ঘরে

শ্রীশচীন সেনরায়

গান-পাগলা নিতাই,—যেখানে গান, বাজনা, যাত্রা, নাটক, সেখানে যেন না গেলেই নয়।

যার যা খুশী তাই ডাকে। কেউ বলে নিতুই, কেউ বলে নিত্যা, কেউ বলে নিতা, কেউ আবার শুধু গোপ্লা। এই ভাবে কত কি। যেন শত নাম-ওয়ালা কেষ্ঠাকুর আর কি।

আসল নাম নিত্যগোপাল,—কেউ ডাকে না ও নামে। ও কিন্তু চটে না, সব ডাকেই উত্তর করে সানন্দে।

নীচের ক্লাসের ছেলেদের মহলে ওর বড্ড ডাক আছে, ওরা 'ফুটবল' খেলাতে ওকেই রেফারী-গিরি কর্ত্তে পছন্দ করে, ও-ও মাঠে যায় রোজ। ও হয়ত বড় বেশী আনন্দ পায় ছেলেদের সাথেই খেলা দিতে। সন্ধ্যা হলে খেলা ভাঙ্গবার হুইসেল দেয়।

পরে অনেক সময় পর্য্যন্ত খালের পারে, বাঁশ বনের ধারে বসে বাঁশী বাজায়, গান গায়। চওড়া বুকটার উপর আবার তালও ঠোকে—তেড়ে, কাটা, গদি, গি-না-ধা।

ওর ক্লাশের ছেলেরাও ওকে খুব পছন্দ করে, ভালবাসে; বিশেষতঃ 'লিজার' ঘণ্টায়। ওকে মধ্যে রেখে সকলেই তখন গোল হয়ে বসে, ফরমাস করে—গা না-রে নিতুই, ঐ নূতন গানটা।

ও ও চট্ করে বুঝতে পারে কোন্ গানটা,—গায়, "কি গুণ বল, কি গুণ জান, হরি হে তোমার বাঁশের

।" আর টেবিলটার উপর তাল ঠুকতে থাকে কাহারবা—তাকা-নাকা-তাকা-দুম।—

—এই, নিতুই, আজ মজাদার গান হবে নবাব বাড়ী। কলকাতা থেকে খুব ওস্তাদ তরুণ গায়িকা। যা না? শুনে আসবি?

— সত্যি-বলচিস্ তো? না—

—সত্যিই।

—যাব তবে নিশ্চয়। তুই যাবি?

—না।

সময় ফুরিয়ে যায়। ক্লাস বসবার ঘণ্টা বাজে। এই ঘণ্টা খুব সুখেই কাটে, কারণ মাষ্টারটা বড্ড মাই-ডিয়ার গোছের লোক কিনা। কাউকেই কিছু বলে না।—

গানের গীটকিরির ও মূর্চ্ছনার রেশ ভেসে ভেসে আসে। দুষ্ট বাতাস তা নিজেই উপভোগ করতে চায়। পারে না। পথ চলা-পথিকরাও একটু আধটু ভাগ পায়, থমকে দাঁড়ায়।

গেটের সামনে বড় 'লন্', নিত্যগোপাল হতাশ ভাবে বসে। অস্পষ্ট গীতের সুর যাও একটু আসে· শোনে আর ভাবে, এত কষ্ট করে এতটা পথ হেটে এসেছে। আর সারা-দিন-ব্যাপি গা-ফোটান বৃষ্টির ফোঁটা মাথায় করেছে। পরে আবার একি বিপদ! বাইরের লোকের নাকি শুন্তে যাওয়া নিষেধ!

তবু ভিতরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশাল দেহ-ওয়ালা ভোজপুরীদের মস্ত ধাক্কা কি আর সামলান যায়? ক্ষীণ-জীবী ভাত-খেকো বাঙ্গালী তো ··

মনে প্রচণ্ড ব্যথা পায়। একমনে বসে থাকে। গানের ক্ষীণ রেশটুকু—যাও একটু দূর থেকে আসে, —উৎকর্ণ হয়ে শোনে। ভাবে, এমন মিঠা প্রাণ-হরা গান আর শুন্‌বে কি? নিশ্চয় কতই না জানি আনন্দ পেতো—সামে গিয়ে তার গান শুন্‌তে পারলে।

কি মৎলব ইস্নু করলে ভেতরে ঢোকা যায় ভাবে।

কিরে, নিতুই না তুই? এখানে?

পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখে, একটু পরেই চিনে ফেলে, বলে,—আরে তুই যে! এত বুক টান করে যে? জানা-শুনা আছে বুঝি?

—কি মনে করিস্?

—না। মনে আর কি করবো। তবে আমরা ব্যাটারা কি বর্জ্জিত যাব?

—আয় না?

হরিশের দয়াটা মনে থাকে হয়ত অনেক দিন।—

হরিশ কিন্তু বেড়ে চাকরীটা বাগিয়েছে,—হউক না ওর সেই থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যে। পয়সা কামাচ্ছে তো! শুনা গেল খোদ কর্ত্তার নাকি প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তাইতো এই জোড়!

নিত্যগোপাল কোণে চুপটী করে বসে আছে। কোন দিকেই যেন লক্ষ্য নেই—একেবারে যেন বেহুস্। বাইজীর গানেই যেন ওকে একদম জেন্ত কবর দিয়ে ফেল্লে।

বাইজীও যেন ওকেই লক্ষ্য করেছে। বারে বারেই ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখে রাখে। হয়ত সহানুভূতির তন্ত্রীতে মৃদু মৃদু আঘাত কচ্ছে। অবাক হয়ে যায় ওর অসীম মনোযোগিতা দেখে। ভাবে এমন অভিনব শ্রোতা তো সে আর দেখে নি! হয়তো লোকটা নিজেও গুণী। তা নইলে কী এমন হয়? ভারী কৌতূহল হয় ওর সাথে কথা বলতে।

নাচ গান ক্ষান্ত হয়—

নিত্যকে বাইজী ডেকে পাঠায়—

সে কিন্তু আসতে অস্বীকার করলে,—ভয় পায় বুঝি, পাড়া-গাঁর ছেলে তো!

পরে বাইজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কেন? বলুন তো।

—আপনিও কিন্তু নিশ্চয়ই গাইতে পারেন, না?

—গাইতে বেশী পারিনা, তবে শুনতে খুব পারি আর ভালওবাসি খুব। আঃ! যা গাইলেন এমন আর শুন্‌বো কিনা জানি না। কষ্ট-টা সার্থক হ'ল যা'হোক!

—আপনারা গুণী, মহান্‌, তাই সকলকেই বড় করে দেখেন। আচ্ছা সময় হলে মাঝে মাঝে যাবেন। এই নিন আমার ঠিকানা।

—বোধ হয় যেতে পারবো না। আমি যে পড়ি।

—তাই বলে কি যেতেও মানা! নাচি, গাই, তা বলে কী এত ঘেন্না!

এরকম একটা অপ্রাসঙ্গিক খোটাতে যেন নিতুই টবগা লেগে গেল।

পরে সঙ্গিত সম্বন্ধেই অনেক কথা হল। নিত্যও কিছু বললে, বাইজীও তার কথা বলে গেল। অনেক্ষণ।

ওর সাথে কথা কয়ে নিত্যগোপাল যেন একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি পেলো; এমন তৃপ্তি যেমন নাকি দারুণ তৃষ্ণায় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল লাগে,—যেমন নাকি লুই-ওঠা গ্রীষ্মে এক পশলা বৃষ্টি লাগে,—যেমন নাকি এক টানা আঁধারের মাঝে আলোক লাগে।

বেশ ঝড় ঝড়ে রৌদো দিন—

হঠাৎ চঞ্চল মেঘগুলি কোত্থেকে আসে যেন, অন্তহীন আকাশের বিরাট বুকখানার উপর চেপে বসে। আকাশ ভীষণ ভার সইতে না পেরে খালি কাঁদে।

ধরণীর খাঁক্‌ হওয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

খেল্‌তে এসেছে যে ছেলেগুলো ওরাও ভারী জব্দ হয়—

ওরা সুড় সুড় করে চলে যায় কাছেই একটা ছাড়া বাড়ীর ভেতর। তার মধ্যে একটা তেঁদর ছোঁড়া হুইসেলটা খালি বাজাতে থাকে;—বড্ড কর্কশ শব্দ! তখন অতদূর থেকেই সবে মিলে ডাকতে থাকে, নিতুই দা, নিতুইদা।

ওদের গগন ভেদী ডাক শুন্‌তে পায়, তবু চুপ করে থাকে। একটা ডাকেরও সাড়া দেয় না।

জন কয়েক মাতব্বর গোছের ছেলে জুটে নিতুর বাড়ীতে উপস্থিত হয় ওকে ডেকে আন্‌তে। তবুও আসে না। ওরা সব মুখ পাংশু করে ফিরে। বড্ড দুঃখ হয় ওদের। কেই বা আজের মেচ্‌ খেলাটা কন্‌ডাক্ট করবে!

খেলোয়ারের সাজে পুরো দস্তুর সজ্জিত হয়ে এসে অমিয় বলে, চুপচাপ বসে আছ যে? মানে? অন্য পার্টি আসেনি বুঝি?

জটু উত্তর করে, আর এলে কি, না এলেই কি? রেফারী কে থাকবে?

—কেন, নিতুইদা?

—ও আসবে না। তবে তুই গেলে যদি আসে। যাবি?

যায়।

ধূর্ত্ত ভবেশটা বলে—কেন? ওর ডাকেতে কি মধু মেশান? ওর কথায়ই আস্‌বে যে!

—চেহারা খানাকে ভাল করে আবার জন্ম নিতে পার্ব্বে? তা যদি—যাক্‌ ও সব কিছু বুঝবে না তুমি।

অমিয় নিতুইকে কয়েদীর মত পাক্‌ড়াও করে আনে। ম্যাচ্‌ খেলা চল্‌তে থাকে। অমিয়র ফাউল হেণ্ডবল বড় বেশী দেখে না। কোন দিনই না। ওর যেন সাত খুন মাপ। ঐ জন্য অগোচরে অমিয়কে নাকি ওরা সবাই ক্ষেপায়। ওর সুন্দর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে যায়। কান দু'টোও।—

আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাত।—

বৃষ্টি ধোয়া চাঁদের বড় দুঃখ। আর কতদিনই বা পরাধীন হয়ে চল্‌বে মেঘের নিকট! ওর গা ভরা

রূপালী যৌবন নিয়ে একটু স্বাধীন ভাবে হাস্‌লে কিম্বা চলাফেরা কল্লে অমনি অত্যাচারী মেঘ এসে শাসায়। কিছুক্ষণ হয়ত অন্ধকারে মুখখানা বেজার করে থাকে। এম্নি ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তেই কাটে ওদের সাড়া রাত—যেন ঝগড়াটে শাশুড়ী আর মুখরা বধূর ঝগড়া আর কি।

অমিয়দের বড় দীঘী। পুব পারে একটা মস্ত বড় বুড়ো তেঁতুল গাছ। ওর আশে পাশে আরও ৪।৫ টা ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ওর তলে বসে,—নিত্যগোপাল, অমিয়, আর অমিয়র ছোট বোন যুঁই, বারো, তের বছরের মেয়ে। নিতুই বাঁশী বাজাচ্ছে—আর তা থেকে বেরুচ্ছে কত করুণ, বিরহ আনা সুর।

সহসা বাঁশী বন্ধ করে দিয়ে বলে—কাল চলে যাবরে কল্‌কাতা।

—এরই মধ্যে ছুটী ফুরিয়ে গেল? মোটে তো থাকলে আড়াই মাস। যুঁই জিজ্ঞেস করে।

অমিয় বলে—তুই কি বুঝ্‌বি? নিতুইদা আবার আস্‌বার সময় আমার জন্য একটা কালো চশমা আর একটা ফাউনটেন পেন আন্‌বে। বুঝলে? মনে থাকবে তো?

যুঁই ও বলে—তবে আমার জন্যও একটা চুলের ক্লিপ আর কাঁটা। আনবে তো?

—হাঁ, তোর জন্য আনবো না তো কার জন্য আন্‌বো? বলে। ওর গোলাপী গালটাতে আস্তে একটা চিমটি কাটে।

—নিতুইদা, তুমি চলে গেলে আমাদের খেলাও আর হয় না। অমিয় মুখটা একটু ম্লান করে বলে।

—আমার যাওয়াটা তবে তোর প্রাণেও বাজবে?

—বুঝতে পার না? বলেই অমিয় মুখটা পেছন দিকে ফিরিয়ে নেয়, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

—আচ্ছা, চল্ উঠি।

—মনে করে দু'একবার খোঁজ খবর নিও কিন্তু। অমিয় চলতে চলতেই বল্লে। একটা যেন তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে আসে।

– হাঁ, তোরাও উত্তর দিস্। নিত্য বলে।

অন্তরটা বার বার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে যেন –

চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে,—দীঘীর পার বেয়ে যাওয়া পথটার প্রতি। যতদূর পর্য্যন্ত ওদের যাওয়া মিলিয়ে না যায়।

পরে শুধু একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর হয়ত ঝড়ে অশ্রুও।—

মনের এ তুমুল বিহ্বলতা একটু কাটে, বাড়ীর দিকে যায়, আর বাঁশীতে গানটা বাজায়—

'বাহির ডেকেছে মোরে পাগল করে'।

সরু গলিটা—

বড্ড বিচ্ছিরী রকম স্যাঁৎস্যেঁতে ও নোংড়া। ছোঃ! ঘেন্না করে ও পথে হাঁট্‌তে, যেমন ঘেন্না করে, মুখ থুবড়ে যাওয়া, চামড়া-ঝুলে-পড়া বুড়ো ঝী দাসীদের হাতে জলও খেতে। ও-পথে সন্ধ্যের সময় লোকের আমদানী ঢের বেশী।

নিত্যগোপাল চলে যাচ্ছিল একমনে হয়তো পথের পরিমাণ কিছু কমিয়ে নেবে বলে।

হঠাৎ একটা সাইকেল ওর গায়ে এসে পড়লো ঘ্যাঁস করে, তক্ষণই সাইকেলওয়ালা ওকে গাল দিয়ে বলে—শালা, চোখ কাণ দু'টোই কি নেই? এতগুলি 'বেল'—তাও বুঝি কাণে যায় না? গেঁড়ে কাহাকার!

পড় পড় হয়েও একেবারে মাটিতে পড়ে নি; পাখীর ডানার মতন করে ওর হাত দুটো ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে বাতাস টেনে সাম্‌লিয়ে নেয়।

পরে বলে—মুখ খিস্তি কর কেন? সাইকেল তো আমার গা'র উপর চালিয়েছ! তার উপর আবার বুঝি গাড় চালাকী আর পাঁকামো না করলে চলে না? সরে পড়।

নিত্যগোপালেতে আর সাইকেলওয়ালাতে ছোট্ট এক পশলা ঝগড়া হ'লো। রাস্তার লোকগুলো জড় হয়ে ওদের দুজনাকে ঘিরে ধরে। ভীড়ের মধ্য হতে

একটা গুর্খা নিতাইর সাম্নে এসে জিজ্ঞেস করে—আপকো নাম ?

নাম বল্লে।

পরে গুর্খা ওকে অনুরোধ করলে সাথে যেতে। আঙুলের ডগা দিয়ে একটা বাড়ী দেখালো ওখানে নাকি কে ওকে ডাকৃচে।

অবাক-মেশান কৌতূহল বেজায় রকম বাড়ে। কারণ চেনা নেই, জানা নেই কেই বা আবার ডাকৃতে পারে! তাই হয়ত একবার হলেও দেখে আসবার আকাঙ্ক্ষা হয়!

যায়।—

গুর্খা-দর্শিত বাড়ীটার মধ্যে ঢুকৃলো। ঢুকৃতেই একটা বিরাট ঘন অন্ধকার অনুভব করে। সিড়িগুলি দুর্গম, আবার সরু সরু ও। কেন জানি অমূলক ভয় আসে। হঠাৎ থম্‌কেও দাঁড়ায়, ভাবেও, আবার চলে।

ভারী ফিট্‌ফাট ঘরখানা সাজান, সুরুচির বিশেষ পরিচয় দেয়। মেজেতে কার্পেট পাতা, ভাল ভাল দামী গদী-আটা চেয়ার, দেয়ালে টাঙ্গানো প্রসিদ্ধ শিল্পীর চিত্র অনেক প্রকার। নিত্য ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল এক যুবতীর তৃপ্তি আনা এক জোড়া মধুর হাসি।

—চিন্‌তে পারলেন? বোধ হচ্ছে না—

নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে চেয়েই রইল ফ্যাল্ ফ্যালিয়ে। চোখের পাতাও কিন্তু পড়ে না। হয়তো একটা একটা করে পুরাণ স্মৃতি টান্‌তে লেগেছে। পরিষ্কার চেনা মুখ অথচ যেন কেমন একটা ভাব, 'কোথায় দেখেছি'। পরে হঠাৎ স্বরটা একটু বড় হয়ে উঠল, বল্লে—ওহোঃ! বাইজোভ্‌! তৃষ্ণা না?—

মুখ একটু বাঁকিয়ে, মাথা নেড়ে ভ্রূ কুচকে, বল্লে, এত ক্ষণে? তবুও যাহোক—চিন্‌তে পারলেন যে!

কেন চিনবে না? তোমাকে কী আর ভুলি? —এই তবে প্রথমটা একটু—

—বাক্! কোথায় আছেন? কেমন আছেন? একবারেই প্রাণের পুঞ্জীভূত কথাগুলি যেন নিংড়িয়ে দিতে চায়। উত্তরে নিত্যও বলে—ভাল আছি, কাছেই থাকি।

—কি করেন? শুধোয়।

—পরীক্ষায় পটল তুল্‌ছি বার তিন-চার। এখনও তাই খালি ঘস্‌চি।

একটা কোচে দুজনেই একত্র বসল। এক থালা খাবার ও এক গ্লাস জল চাকর দিয়ে গেল। নিত্য খেতে আপত্তি করে, বল্লে - একা আমি খাব না।

তৃষ্ণা ঠাট্টার সুরে বলে, দোসর আবার কে হবে?

—কেন তুমি? তুমি আমার সাথে খাবে—তা না হলে খাবো না। থাক্ সব পড়ে।

আর আপত্তি করে না।—

পরে' নিশ্চিন্তে অশেষ আলাপ চলে। বেশী উচ্চ স্বরে না - এক রকম ফিস্‌-ফিস্ করেই কিন্তু। হউক না নিজেরই বাড়ী—তবুও তো—তা কি আর শব্দ করে কেউ বলে?

রাত ঘনিয়ে আসে। নিত্যগোপাল উঠে পড়ে যাবার জন্য।—যাবার বেলা সব সময়ই একটু আধটু করুণ লাগে;—নিকটেই হউক আর অনেক দূরেই হউক! বিশেষ করে কোমল প্রাণগুলোকে কিন্তু বড্ড নেতিয়ে, মুস্‌ড়ে দেয়।

তৃষ্ণার চোখের কোনে অশ্রু,—তাই কি?—অশ্রু তো না যেন কচি-দূর্ব্বার-ডগা-ভেজা নিশির শিশির আর কি।

ভীড়—প্রচণ্ড ভীড়!

মোটর বাসে আর ট্রামে; কেরাণীর দলে আর উকিল, মোক্তারের দলে। কে কার আগে খেঁপ নেবে—কে কার আগে উঠবে—তা'তে সবাই ব্যস্ত। কোন্ একটা 'বাস' হ'তে ভয়ানক ঝাঁজালো একখানা গলা অনবরতই চেঁচাতে লেগেছে, কালীঘাট, আলীপুর, ধরমতলা। এমনতর গলার স্বর—সকলেরই কানে প্রবেশ কর্ল্লে। নিতুই-ও উঠলে। ঐ বাসের মধ্যেই।

তেল-কুষ্ঠে পড়া খাঁকীর কোট পেন্ট পরা একটা লোক টিকিট বেচে। নিত্যগোপালের দিকে গিয়ে একটু দূর থেকে বলে—বাবু টিকিট।

ও-ও হঠাৎ ফিরে চায়, দেখেই বলে—আরে? তুই যে! এমন অদ্বিতীয় স্বর শুনে ভেবেছিলাম প্রথমটা তোকে একটা পত্র লিখিবো যে হরিশ, তোর-ও গলার জুরিদার এখানে একটা মোটর বাসে কাজ করে। এমন চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে কণ্ডাকটারী!

হরিশ উত্তর করে, ঝগড়া করে চলে এসেছি।

—কেন?

—আর বলিস নে, ভাই, মাল একটু টেনে টুনে বাইজীদের সাথে একটু ইয়ারকী করেছিলুম বলেই বেটী-ছুড়ী অনেক দোষ বানিয়ে নালিশ করলে। তক্ষণই চাকরী থেকে বরখাস্ত দিলে।

মোটর বাস চলতে থাকে; অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আৎকা থেমে যায়।

হাতে এক গাঁদা বই নিয়ে এক যোড়শী বাসে উঠ্‌লো। নিত্যগোপালের গা ঘেসেই বসে পড়লো। কলেজে যাচ্ছে। ওর খাতার উপর নাম লেখা রয়েছে কুমারী চামেলী দেবী, থার্ডইয়ার ক্লাশ। নিত্য পড়লো।

বাসে ষ্টার্ট দেওয়া মাত্রই একটা মস্ত ধাক্কা লাগে। চামেলীর গায়ে আর নিত্যগোপালের গায়ে ঠেস্ লাগলো। মেয়েটী বল্লে—আমি বড়ই দুঃখিতা, মাপ করুন।

বাস আবার চলতে থাকে—বেদম চল্‌তি।— নিত্যগোপাল হঠাৎ উঠে পড়েই অধীরভাবে বল্লে— হরিশ, থামা—থামা। আঃ! কদ্দূর চলে এলিরে; হাটুতে হবে যে অনেকটা।

নাবে ধপাস্ করে, চিন্তা করে, সামের গলিটা ধরে গেলেই কি সোজা হবে? চল্‌লো ঐ ধোঁয়া-ওঠা গলি দিয়েই। গলিটাকে ভারী ম্রিয়মান দেখায়। সামেই ছোট্ট খাট্ট রকমের একটা আবার ভীড়ও। ও শোনে সুমিষ্ট গানের সুর, উঁকি দিয়ে দেখে মস্ত পাগড়ী মাথায় এক ব্যাটাতে আর একটা কাঁচা ছুড়িতে। ব্যাটা হারমনিয়ম বাজাচ্ছে আর মোটা গলায় গানটা ধরে দিচ্ছে; ছুড়িটা গান গায় আর পয়সা কুড়ায়। পয়সা কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাতের ছোট্ট মুঠো অল্পেতেই ভরে ওঠে।

বাঃ! লোকটা যে ওর বিশেষ পরিচিত। হতভাগা, নিশেটা তবে আই, এ অবধি পড়ে শেষে এই কচ্ছে, নিতাই ভাবে।

কাছে গেল ওদের। ছুড়িটা এসে ও-র কোঁচা ধরে বল্লে—রাজাবাবু, একঠো রূপেয়া মাঙ্গতা। একঠোছে কম্‌তি নেহি হোগা।

ও কিছু বলে না—নিশির ছেড়া পাঞ্জাবীটার কোনা ধরে টেনে বল্লে—কিরে, চিন্‌লি?

ব্যাটা বলে, খুব।

—এখন বুঝি এই করছিস্? কেন আর কিছু জুটলো না? নিতাই জিজ্ঞাসা করলো।

—না ভাই বেশ আছি; ছুড়িটা রোজগার কচ্ছে মন্দ না। এই দু'টো বচ্ছর কড়াত টেনে টেনে শরীরটা একেবারে বেজুত হয়ে গেল; ছেড়ে দিলুম ও কাজ। পরে আর পেট চলে না দেখে জুটিয়ে নিলুম একটা ছাদ পেটাবার কাজ; নূতন দালান তৈরী হচ্ছিল। সে করে করে ভাই পায়ে চুণে খেয়ে দিলে, ঘা হয়ে গেল। সেটাও ছেড়ে দেবো মনে করে বাড়ী ফিরছিলাম; দেখলাম হাওড়াপুলের ধারে একটা ড্রেনের মধ্যে পড়ে এ ছুড়িটা পিত্তশূল বেদনায় কাৎরাচ্ছে। বড়ই দয়া হলো। নিয়ে এলুম ওকে বাড়ী। চিকিৎসা-পত্তর করে সাড়ালুম। তখন ভাবলুম নেহাৎ একটা ফান্টু-ই বুঝি আবার কাঁধে চাঁপলো! না,—পরে একদিন শুনি চমৎকার গাইতেও জানে। হাতে যা ছিল তা দিয়ে কিন্‌লুম এই হারমনিয়মটা আর তুষির জন্য একটা সাড়ী। পরে দু'জনে মিলে বার হলেম রাস্তায় গান গাইতে। লজ্জার ধার:কিছু ধারিনে, সঙ্কোচেরও তোয়াক্কা রাখিনে। দু'টো পয়সা পাই, দু'জনে মিলে,—ঘরে, বাইরেই উপার্জ্জন করি,—শান্তিতে খাই-ই। আচ্ছা,

ভাই একবার দয়া করে যাবি আমার বাড়ী?—ঐ মানিকতলা পেরিয়ে ছোট্ট খোলার বাড়ীখানা, বুঝলি?

নিত্য অবাক চোখে চেয়ে হাঁ করে নিশের ছোট্ট ইতিহাসটা যেন গিলছিল। মাথা নেড়ে সায় দিল যাবে, পরে চলে তৃষ্ণার কাছে। সারা-পথ কেবল ভাবলে, নিশার কথা;—এক রকম মন্দ ফিকির করে নি। কার কখন কি মতি গতি হয় কে বলতে পারে?

তৃষ্ণা আজ এত শীগ্‌গীরই যে শুয়ে আছে? চিৎ হয়ে পা দুটো গুটিয়ে শুয়ে আছে; মাঝে মাঝে পা দুটো মৃদু মৃদু দোলায়ও। হাতে ধরে বুকটার উপর স্থাপন করেছে ওটা কী? বই না? হাঁ,—তাই তো, হয়তো উপন্যাস—ও আবার উপন্যাসও পড়ে! বইয়ের ছায়াটা ওর মুখে এসে পড়েছে। নিশ্বাসে ওর নরম বুকটা মৃদু মৃদু ফুলে ফুলে উঠ্‌চেও। দেখাচ্ছে বেশ মন্দ না!

নিত্য এগুতে থাকে,—যেন হাটি হাটি পা-পা করে। ভাবে হঠাৎ গিয়ে চম্‌কিয়ে দেবে। পা টিপে টিপে সাম্নে গেল। ধরে ফেল্লে তৃষ্ণার বইতে নিবিষ্ট থাকা চোখ, পরে গলার সুর একটু বিকৃতি করে বল্লে—বল তো কে?

কর্কশভাবে উত্তর করে,—নাও, ছাড়! নিরস ইয়ারকী ভালবাসি না।

নিত্য বলে, তবে রসাল করে দি। বলেই হয়ত মুখের কাছে মুখ নেয়, তৃষ্ণা তক্ষণই রেগে ওঠে, বলে, তোমাকে না সেদিন বলেছি আমাকে তুমি ছুঁতে পার্ব্বে না; তবু তুমি যে—

উত্তর করে,—আচ্ছা, যখন পছন্দ করোনা তখন আর আসবো না তোমার বাড়ী। আস্তে আস্তে সজল ছল ছল চোখে তৃষ্ণার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে।

বড় বিষাদ লাগে।

তৃষ্ণা আর প্রাণকে শক্ত করে রাখতে পারে না, সে বিষাদ পূর্ণ চাওনিতে যেন সব কঠিনতা, রুক্ষতা ওর জল করে দিলো। ঘূর্ণী বায়ুর মত ছুটে ওকে ধরে, বলে, যেওনা, যেওনা, ওগো, আমাকে কাঁদালে তোমার কি লাভ হবে? তুমি তো বুঝেও বুঝলে না কেন বারণ করেছিলাম। আর বলবো না, কক্ষন বারণ কর্ব্বো না, তোমার যা খুসি কর। আমিও যে আর পারিনে।

ধপাস্ করে পড়ে যায় নিত্যর পায়ের তলায়; কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যুবতী নারীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাতে বিষম দাগা দেয়। কা'রো মনই না টলে থাকতে পারে না ও কান্না দেখলে।

নিতাই দীর্ঘ বাহুর মাঝে নিয়ে জড়িয়ে থাকে শক্ত করে, তৃষ্ণাও ঢলে পড়ে। দু'জনেই মনে করে, এ বন্ধন ছিন্ন কর্ত্তে পারে কারও সাধ্য নেই!—আবেশের চোটে চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে। পরে দুর্ভিক্ষের খাওয়ার মতনই—

নিশি বসুর বাড়ী,—

মাণিকতলায় ছোট্ট একটা গুঁপ্‌টী-খাওয়া নোংড়া বেচারী গলীতে অবস্থিত। ভাঙ্গা মেটে গ্লাসে-ছাউনী দেওয়া ঘরের ছাদ, বেড়া গোল পাতা আর বনের খড় দিয়ে ছাওয়া। পেছনদিকের অর্দ্ধেক জায়গা আর উলু পোকায় ধরা। কোঠা দু'টো—একটাতে রান্না করে আরেকটাতে শোয়। আবার একটা ছোট্ট খোঁপও আছে, অন্ধকার—যেন অন্ধকূপ আর কি! অনেক জিনিষপত্র ওখানে রাখে,—ওদের দিনের রুজীর উপায় হারমনিয়মটা, তিন চারটা কেরোসিন কাঠের কুট্টি তাঁক, সবগুলি ভর্ত্তি মাসিক পত্রিকা, ইংরাজী-বাংলা অনেকগুলো উপন্যাস, নাটক আর কত কি;—চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মিরাবাই আরও অনেক গ্রন্থাবলী বঙ্কিম, মাইকেল, দান্তে, সেক্সপিয়ার, শেলী ইত্যাদি।

দিনের কড়া আলো ক্ষীণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। ঘোর ঘোর দেখাচ্ছে।—

নিশে পা দু'টো ছড়িয়ে বসে আছে; সামে সাত,

আটটা হিন্দি, বাংলা, ইংরাজী ব'য়ের গাদা, আর মেটে পাত্রের মধ্যে কতকগুলি ময়দার আঁটা; তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে আঁটা নিচ্ছে। পোকা-খেঁকো ছেড়া বইগুলি জুড়চ্ছে। আবার এদিকে রান্নাঘরের কোণে বসে তুষি রাতের রসদের যোগাড় কচ্ছে, গুন্ গুন্ করে গান গাইচে পরে হঠাৎ ও বল্লে—ওগো ঐ নূতন গানটা বের করে সুরটা ঠিক করো না গো! পুরাণ ভাল লাগে না।

বিদ্রূপের সুরে নিশি উত্তর দেয়, পুরাণ আর ভাল লাগে না?

সরলভাবেই ও-ও বল্লে, রোজ রোজ কি পুরাণ ভাল লাগে?

নিশে বলে,—আবার কা'কে জুটিয়েছ এরি মধ্যে? নূতন বাবু-টাবু বুঝি? না?—

একটু রাগত কঠিন সুরে বলে—যাও, সব সময়ই তোমার কেবল ইয়ার্কী! এমন করলে কিন্তু আজ রাধবো না; কাল গানও গাইতে যাব না। গাল দুটো ফুলিয়ে বসে থাকে। চুপটী করে। ও রকম ঠাট্টাতে বড্ড বেশী ব্যথা দেয় বুঝি। দু'চোখে এক পশলা অশ্রুও ঝড়লো। সরল-মতি মেয়ে মানুষ কিনা, একটুতেই কেঁদে ফেলে।

নিত্যগোপাল ঘরে ঢুকেও ঢুকলো না। থমকে দাঁড়ায়।

তুষিও ব্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচল দিয়েই কোন রকমে উদ্‌লা মাথাটাতে ঘোম্‌টার মতন করে দেয়।

পরে নিশে দেখলো নিতুইকে, বল্লে—আয় না ঘরের ভেতর? লজ্জা কেন? বোস্ এসে ভেতরে—

পরে তুষির দিকে চেয়ে বল্লে,—আরে, কিরে তুষি, তুইও যে মস্ত এক ঘোমটা টেনে মুখ বন্ধ করে দিলে! এত কিসের লজ্জা? সে দিন তো গাইতে গাইতে নিতুর পঞ্জাবীর পকেটে পয়সার জন্য হাত চালিয়ে দে'ছিলি!

নিত্যাই বলে, কিরে এ আবার কি কচ্ছিস?

-এই কলেজে পড়বার সময় কতকগুলি বই কেনেছিলাম। তা প্রায় সবই পোকায় ধরেছে। সবগুলো জুড়িয়ে রাখলাম। মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখি কিনা।

- বাঃ! ভাল ভাল লেখকের বইয়ের কালেক্‌শন যে রে!

—হঁা, ভাই ছিল এককালে বই কেন্‌বার খুব হবি। যাক্, তবু তোর সাথে দেখা হ'লো, প্রাণটাতে খুব আনন্দও পেলাম।

তুষি ঘোম্‌টা-টা টেনে আরো বড় করে দিয়ে, অতিশয় সঙ্কুচিত হয়ে, বিনীত ভাবে এক ডালা মুড়ি নিত্যগোপালের সামে এনে দিল। যাবার সময় হয়ত ঐ ঘোম্‌টার তলে থেকেই চোখটা বিস্ফারিত করে দেখেও নিল একবার।

খায়, আর ভেবে ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। বড়ই চমৎকার দৃশ্য তো! উচু শ্রেণীতে আর নীচ শ্রেণীতে, শিক্ষিত বাঙ্গালীতে আর অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানীতে, মধুময় ভাব! হউক না নিচ, হউক না অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানী,—তবু তো অনুগতা, কাঁচা বয়স, যৌবন উৎলিয়ে ওঠা মাধুর্য্য এবং রোজগারেও!

মনের মিল।—

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে, এবার আর ট্রামে করে না, পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল দোদুল্য চিত্তে, ভাবলে, আজ আর যাবে না তৃষ্ণার বাড়ী অথচ না গেলেও যেন কেমন কেমন লাগে।

না যেয়ে পারে না।

অভ্যাস আর প্রাণের টান্—তা কি আর কম কড়া নেশা! মদ, আফিং, গেঁজা, সিদ্ধির চেয়েও হয়ত আরও ভয়ানক বেশী মাতাল করে তোলে।

বাড়ীর দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে কড়া নেড়ে নেড়ে ঢোকবার মতলব জানাল।

বুঝতে পেরে তৃষ্ণা নিজেই আসে দরজা খুলে দিতে, বলে,—এমন সময়? এদিন কোথায়—

—কে আমি - না দেখেই যে প্রশ্নবাণ?

—তা কি আর বুঝতে বাকী থাকে?

দরজা খুলে গেল। একেবারে সপাসপ তৃষ্ণা যে কোঠায় শোয় সে কোঠায় ঢুকে পড়ে, হাত পা ছেড়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। রুমাল দিয়ে কপালের একটু ঘামও মুছলো। পরে কাৎ হয়ে বল্লে, একটু জল খাব।

তৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে—আজ বুঝি টোঁ টোঁ করে একচোট খুব ঘোরা হয়েছে', না?

—হাঁ, এক বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে। খুব সুখে আছে ওরা যেন দুটি কোকিল; গান গায়, উপার্জ্জন করে দু'জনেই। বন্ধু হারমনিয়ম টেপে আর আশ্রিতা গান গায়, ভিক্ষের পয়সা কুড়ায়। বেশ ওদের উপায় কর্ব্বার ফিকির, কি বল?—আমারও ইচ্ছা করে আমি আর তু—

—খুব সুন্দর গায় বুঝি,—না?

—হাঁ, খুব সুন্দর গায়। তা ব'লে তোমার মত ওস্তাদ না।

—আচ্ছা গো, বেশী ঠেকার দেখাতে হবে না। নাও, এই লেমনেডটুক্ খাও তো।

একটানে সবটা মেরে দিয়ে নিতাই হঠাৎ বল্লে—

ওঃ! বড্ড ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমোবো এখানে? না থাক তোমার আবার অসুবিধে হবে।

একটু অভিমানের সুরে বলে—আ-হাঃ, হাঃ! এত বেশী বেশী ভালবাসি না। ঘুমাও তো নিশ্চিন্তে একটু। ফ্যান খুলে দি'।

ঘুমের জন্য বেশী চেষ্টাও কর্ত্তে হয় না, এসে পড়ে ধা'করে।

ভ্রান্তি-বিফল জীবনটার কথা! বড় পচা—পূতি গন্ধময়!

হঠাৎ কেন জানি নিতাইর পকেটের দিকে নজর পড়ল। দেখ্‌তে পেল একটা পত্র। অতি সন্তর্পণে টেনে বের কর্‌ল। চুপি চুপি পড়তে লেগেছে তক্ষণই।

মেয়েলি স্বভাব; কোন চিঠিপত্র দেখলেই পড়বার আকুল তৃষ্ণা! তা কি আর তৃষ্ণার বেলা ব্যতিক্রম হতে পারে?—

পত্র পড়ে। মা লিখেছেন অনেক কাকুতি মিনতি করে, নানা প্রকার উপদেশ দিয়ে চরিত্র সংশোধন কর্ব্বার জন্য, কি ছিল তার চরিত্র আগে আর এখন—এখন একটা দুষ্টা বার বনিতার প্ররোচনায় ওর নাকি স্বভাব একেবারে উচ্ছন্ন হয়েছে। আরও লিখেছে, কত শত শত লোকের সংসার ওরা ভষ্ম কচ্ছে, কত লোককে পথে বসাচ্ছে, কত সাধ্বী স্ত্রীকে স্বামী সুখ হ'তে বঞ্চিত কচ্ছে, কত বিধবার এক মাত্র অঞ্চলের নিধিকেও চু'সে খাচ্ছে!

মন বড় ভয়ানক ব্যাকুলিত হয়ে উঠলো।

অস্থির দৃষ্টি অন্তহীন আকাশের প্রতি তাকিয়ে কয়েকটা তারা কক্ষচ্যুত হয়ে উধাও হচ্ছে, দেখতে পেল। দূরে একটা পাপিয়া করুণ সুরে ডাক্‌ল।

নিজের জীবনের উপর একটা তেঁতো ঘেন্না আসলো। পালা শেষ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল তক্ষণই;—আর বেশী দূর না। আরও কয়েক দিন এরকম একটা সাংঘাতিক কথা ভেবেছে!

তৃষ্ণা আজ জীবনটাকে বড়ই ধন্য মনে করছে;—ওর বুভুক্ষু প্রাণ যে চাইতো সেবা কর্ত্তে, চাইতো প্রীতি মিশান প্রেম—অকৃত্রিম ভালবাসা, ঘর সংসার, হয় তো পুত্র-কন্যার আধ আধ মা ডাক।

চায় তো দুনিয়ার সব্বাই; লাভ করে ক'জন?—

তৃষ্ণা বসে আছে ওর শিয়রের এক পার্শে, ভাবতে থাকে, কত আকাশ, পাতাল। হঠাৎ মনে পড়ে ওর

তুমুল ঝড় তুফানের আলোড়ন এল ওর হৃদয়ে। আর বেঁচে থেকে কি লাভ?—

ওর কেবলই মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে কি লাভ! পরে নিজের মনে মনে নিজেকেই বোঝাচ্ছে, যদি বাঁচিই তবে, একবার হলেও, চোখের দেখা না দেখে থাকি কি ভাবে?—ওঁযে আমার প্রাণটাকে দখল করেছে! পরে মস্ত বড় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে,—

ওঃ! এ দেহটাকে নিয়ে তো কত জন কত ভাবে খেলা করেছে। এ প্রাণটা কাউকে দিতে তো সহ্য হয় নি,—তা তো নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখে কৃত্রিমতা দ্বারা কতজনকে বঞ্চিত করেছি—কত লোককে উচ্ছন্ন করেছি! আর মরতে হলেও তো আত্ম হত্যা ছাড়া হবে না?—তাও যে আবার ভয়ানক পাপ!

তুমুল সংগ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে, হঠাৎ সিদ্ধান্ত করল, জীবনে কত পাপ-ই তো করলাম,—না হয় শেষ কালেও আর একটা করলুমইবা! তবু তো মনে তৃপ্তি হবে যে প্রাণের দেবতার মঙ্গলের জন্যই করেছি।

তাড়াতাড়ি খট্ করে আলমারী খুলে একটা ভরা বোতল বের করে আনলো। ভাবলে, খাওয়া যাক পুরা একটা বোতলই আর একটা ভয়ানক দ্রব্যের অনুপান দিয়ে।

আধা আধি খেলো, আর যদিও পারে না তবুও মরিয়া হয়ে খেতেই লেগেছে সব টুকুন সাবার কর্ত্তে।

পরে দু'হাত জোড় করে কপালে স্পর্শ করে ভগবানের উদ্দেশ্যেই হয় তো প্রণাম জানায়, ভগবান্। আমার দেবতার মঙ্গল করো। ওঁকে সুখেই রেখো, পার তো আমার কথাও ভুলিয়ে দিও।

রাত বাড়তে থাকে,—বড় নিঝুম, নিশুতি! দূরে একটা লক্ষ্মীছাড়া পেঁচা পরিত্রাণে ডাকতেই লেগেছে নিম্-নিম্-নিম্। ঘেঁয়ো কুকুরটা বাইরে কাঁদতে লেগেছে অনর্থক। ঘরের মধ্যে মস্ত এক জোড়া টিক্‌টিকি কি ভেবে টিক্-টিক্ করে উঠলো। তৃষ্ণা উঠতে যাচ্ছে, পাটা একটা কাঠে বাড়ি খেলো। প্রথম মনে করলো, অমঙ্গলের চিহ্ন কি? পরেই বল্লে—দূর, কিছুনা, নিছক, সব বাজে।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হেটে নিত্যর কাছে গেল, আবার বস্‌লোও ওর অতি নিকটেই তন্ময় হয়ে।

ছিন্ন মেঘ—চাঁদ বলপ্রয়োগ করে উকি মারে, যামিনী হাসে, হিংসুটে মেঘের হিংসা আরও বাড়ে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে নিতাইর নিদ্রিত দেহের উপর এলিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ওর মিষ্ট হাত দিয়ে ওর গণ্ডদেশে বুলাতে থাকলো, নিজের গাল আস্তে করে ও মুখের উপর লাগিয়ে রাখলে, ঘস্‌লেও পরে হঠাৎ স্থির ওষ্ঠের উপরে প্রচুর আবেগে ছোট্ট একটি চুম্বন।

নড়ে চড়ে ওঠে —

তৃষ্ণা বলে, আহাঃ! তোমার ঘুম ভেঙ্গে দিলাম! পরে আস্তে আস্তে কপালের উপর মৃদু মৃদু থাবড়াতে থাকে, মাথার চুলগুলো আস্তে আস্তে টানে—মার ছেলে ঘুম পাতানর মতন করে কিন্তু।

কোমল হাতের পরশে ওর সাড়া দেহে যেন দোলা খেলে যায়। পারে না আর চুপ করে থাক্‌তে। দু' হাত দিয়ে নাগ-পাশের মত জড়ায়, বলে—আমার পাওনা আমি পুরিয়ে নিলুম।

লজ্জায় ওর চোখ বুজে এল। ওকথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বল্লে,—আমি কি খেয়েছি বল তো—

নিতাই শুধোয়, নেশা করেছ।

—আর কি?

—জানিনা। কি, তুমি বল তো?

—আরও একটা সাংঘাতিক জিনিষ,—মরবার জন্যে।

অধীর হয়ে ও বল্লে, কি? মরবার জন্যে? কেন এমনটা করলে? আর আমাকে কেন তবে পথের ভিখারী বানালে?

—তুমি তো জান সব—আরো এক কথা—এমন ছি-ছি আনা জীবন যে বওয়া বিষম! আমায় ক্ষমা করো, ভুলে যেও লক্ষ্মীটি। শেষ সময় একটা কথ রাখবে? ..

অবস্থাটা দেখে নিতাই একেবারে হাউ হাউ করেই কেঁদে ফেল্লে। কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লে, বল, কি কথা? রাখবো। ওঃ! তুমি যে আমার কি করলে তা আর তোমাকে কে জানায়?—

—এই নাও কাগজটা, ধর। সব দেখেশুনে নিও, পর্য্যবেক্ষণা ক'রো। আর যদি ভোগ কর্ত্তে ঘেন্না করে, তবে না হয় গরীব দুঃখীকেই সব বিলিয়ে দিও। কেমন? একটু পা'র ধুলো দাও,মাথায় করি।...

ভোর প্রায় হয়ে এল, দূর থেকে মুরগী কর্কশ ডাক ডাকে, দোয়েল করুণ শীস্ দেয়। নিতাইও বুক ফাটা কান্না কাঁদলে।

লুপ্ত—

জীবন—মরুর মরীচিকা সব।

বিরহ

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

১

আধ জাগরণে নিরখি নয়নে
প্রিয়তম তুমি এসেছ,
ঘুমে অচেতনে হেরেছি স্বপনে
ওগো প্রিয় পাশে বসেছ।
আমার বিরহ-বিধুর হৃদয়
পরশি শীতল করেছ,
দু'বাহু বাড়ায়ে প্রেমালিঙ্গনে
আমার এ তনু বেঁধেছ।
সে পরশ স্মরি চমকিয়া চাই
কোথা তুমি, কই তুমি গো
নিমেষে টুটিল তন্দ্রার ঘোর
একেলা জাগিয়া রহি গো।

২

প্রভাতের পাখী জাগেনি তখন
গাহেনি প্রভাতী গান,
গগনে তখনো শুক তারকাটি
জ্বলিছে অপরি-ম্লান।
ঝড়েনি শেফালী ধরণী চুমিয়া
আপনা করিয়া দান
প্রভাতের মৃদুসমীর পরশে
আকুল করিল প্রাণ।
মনে হল ওগো প্রিয়তম তুমি
কানে কানে মোরে কহিছ
কখন যামিনী নিয়েছে বিদায়
এখনো শয়নে রয়েছ।

(৩)

জেগে দেখো প্রিয়া তোমারি লাগিয়া
প্রবাস হইতে এসেছি
গভীর আঁধার হইতে আসিয়া
প্রাণের আলোকে হেরেছি।
এমন করিয়া আশা নিরাশায়
কাটাই দীরঘ বেলা
আপনার মনে কুড়ায়ে শেফালী
গাঁথি বসে কত মালা।
কত দিনে প্রিয় এ বিরহ ব্যথা
মিলনের মাঝে মিলায়ে
কবে প্রিয়তম 'পরবাস' ত্যজি
আপন আবাসে আসিবে।

বেলার শেষে আমার আশে যখন তুমি তখন আমি সুদূর সাগর পারে

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

মুখুয্যেদের ছোট বৌয়ের সহিত চক্রবর্ত্তীদের সেজ বৌ সই পাতাইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের ভিতরে সমভাব ছিল না। একজন ছিল চরিত্রহীনা মাতালের স্ত্রী, আর একজন ছিল, স্বামীর ভালবাসার অধিকারিণী, সংসারের মধ্যে একজন। মুখুয্যেদের ছোট বৌই ছিল সৌভাগ্যবতী এবং চক্রবর্ত্তীদের সেজ বৌ অচলাই ছিল, দুর্ভাগিনী।

একদিন মুখ ঘুরাইয়া মনোরমা অচলাকে বলিল, "যাই বল ভাই সই, তোর স্বামী কিন্তু ভাই তোকে মোটেই ভালবাসে না। এ খোঁটা সে প্রায়ই অচলাকে দিত, আজও দিল, কিন্তু অচলা তাহাতে দুঃখ করিল না। একটু হাসিয়া বলিল, "সে কথা তো আজ নতুন নয় সই, পুরাণ হ'য়ে গেছে যে।"

একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মনোরমা বলিল, তবুও তোর মনে দুঃখ হয় না অচলা?

"না, আর দুঃখ হবারও তো কথা নয়! তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় যা খুসি তাই করছেন, তাতে বাধা দেবার আমি কে সই।" মনোরমা যেমন সময়

সময় তাহাকে খোঁচা দিতেও ছাড়িত না, তাহার উপরে রাগ করিতেও ছাড়িত না, তেমনি তাহার দুঃখে যে দুঃখিতা না হইত তাহাও নহে। এ কথা যে কত বড় নিরাশায় মানুষ বলিতে পারে, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। মুহূর্ত্তে তাহার মুখের ব্যঙ্গের হাসি মিলাইয়া গেল। সে সক্রোধে অচলার পৃষ্ঠে একটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল "তুই মর।"

হাসিয়া অচলা বলিল,—"মাইরি সই। ওইটিই একমাত্র আমার সাধ আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মরতে পারি।"

* * *

অচলার স্বামী অবনী ছিল এম এ পাশ।

কিন্তু চূড়ান্ত মাতাল ও অসৎচরিত্র।

আর মনোরমার স্বামী ছিল ম্যাট্রিক ফেল। কিন্তু তাহার চরিত্র অতুলনীয়। উভয়েই এক বয়সী এবং এক সময়ে বন্ধুও ছিল, কিন্তু অবনীর চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়া পর্য্যন্ত নলিন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ঘৃণাভরে বলিয়াছিল,—

—"তোমাকে এখন আমি ঘৃণা করি অবনী। আমার সুমুখ থেকে যাও। তুমি মাতাল, চরিত্রহীন! যাও, তোমার মুখ দেখাও আমি পাপ মনে করি।"

অবনী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "ক্ষতি নাই। আমি তোমার সুমুখে আসতেও চাইনে নলিন।"

যখন একদিন রাত্রে মনোরমা অচলার জন্য অবনীকে একটু অনুরোধ করিল তখন নলিন ঘৃণাভরে উত্তর দিয়াছিল,—

—"ওই নরপিশাচটার কথা আমার কাছে আর করো না, মনো। আমি ওটাকে ঘৃণা করি।" মনোরমা বলিল, "কিন্তু ও হতভাগির কষ্ট দেখেও তো তোমার এই কষ্ট স্বীকার করা উচিত।

নলিন উত্তর দিল "আচ্ছা, কাল তাকে বলব এখন।"—

* * *

পরদিন অবনী আসিয়া ডাকিল "অচলা—"

অচলা বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর মুখে ডাক শুনিতে পায় নাই। স্বামীর দেখাই যে পাইত না। অবনী যদিই বা এক আধবার আসিত, তাহা হইলে সে সময়টুকু বাহিরে কাটাইয়াই চলিয়া যাইত।

সৌভাগ্য মনে করিয়া অচলার সারা দেহে একটা পুলক শিহরণ বহিয়া গেল। সে মাথার কাপড়টা কপালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অবনীর ঠোঁটের উপরে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"বলি কালিন্দি ঠাক্‌রুণ! মুখুয্যেদের নলিনের সঙ্গে তোমার কি এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শুনতে দোষ আছে নাকি? যদি না থাকে বিবেচনা কর, তা হ'লে চট্ ক'রে ব'লে ফেলতো লক্ষ্মীটি।"

অবনীর ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া অচলা লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। অভিমানে, দুঃখে, তাহার উভয় চক্ষু পুরিয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সে বাম হস্তে অশ্রু মোচন করিয়া অকম্পিত স্বরে বলিল,—"সে আমার সইয়ের স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। তাকে চিনিও না।"

অবনী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,"বাঃ বেশ, বেশ। তা হ'লে দেখছি তুমি ঐ রূপেও মানুষ ভুলাতে পার। বাঃ! তা কর। আমি আর আসব না। চল্লুম।'

—সে সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। একটা উত্তর শুনিবারও প্রতীক্ষা করিল না। অচলা স্বামীর এই কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক ফোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে পড়িল না।

ব্যথার ব্যথী মনোরমা লোক লাগাইয়া খবর লইল অবনী সেই সহরেই বীণা খেম্‌টাওয়ালীর বাড়ী পড়িয়া আছে। মনোরমা অচলাকে ডাকিয়া বলিল—"শুন্‌লি একবার আক্কেলখানা?"—

অচলা বলিল "তাঁর কি দোষ আছে সই! আমিই

যে কুরূপা।" রাগ করিয়া মনো বলিল, "হলিই বা। ঈ—স। হাজার হোক বিয়ের স্ত্রী তো বটে।"

অচলা উত্তর করিল না। মনো কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া অচলাকে আপনার উভয় বাহুর মধ্যে বেষ্টন করিয়া বলিল, "আয়, আজ তোকে চুল বেঁধে, সাজিয়ে দিই।—"

হাসিয়া অচলা বলিল—"না ভাই, ভাল লাগেনা"—মনো তাহা শুনিল না। সে অচলার চুল বাঁধিয়া, টিপ পরাইয়া ও একখানি গোলাপী রংয়ের শাড়ী ও ব্লাউজ পরাইয়া দিল,—পরে একজনকে বীণা ঘেমটা-ওয়ালীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া বলিল, "বলগে, যা' বাড়ীতে একজনের বড় অসুখ, মারা যাচ্ছে। শীগ্গির আসতে। আর তুই তাকে যেমন করে হোক ধরে আনবি।—এই বাড়ীতে নিয়ে আসবি।—"

লোকটি চলিয়া গেল।

* * *

অবনীকে এ বাড়ীতে আনিয়া একটি কক্ষে বসাইয়া রাখাইয়া মনোরমা জোর করিয়া অচলাকে সেই কক্ষে পাঠাইয়া দিল।

চমকিয়া উঠিয়া অবনী প্রশ্ন করিল "একি কালিন্দি, তুমি এখানে যে। আমি মনে ক'রেছিলাম তুমিই বুঝি মরণাপন্ন। ভারী আনন্দই হ'য়েছিল। কিন্তু তুমি ম'লেনা কেন? —"

মনোরমার শিক্ষাক্রমে অচলা অবনীর পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"সেটা নিজের ইচ্ছাধীন হ'লে, তোমার আদেশের আগেই হাসতে হাসতে প্রাণ দিতুম। তোমার বলতেও হতোনা।"

অবনী হাসিয়া বলিল,—"বাঃ তোমার বক্তৃতা ক'রবার ক্ষমতা আছে দেখছি। যাই হোক কালিন্দি ঠাক্রুণ, উঠলুম। তোমার ও মুখখানা দেখতে আর আমার ভাল লাগছে না।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অচলা হঠাৎ তাহার দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমায় ফেলে কোথায় যাবে তুমি, আমাকেও নিয়ে চল,—নইলে আমি আত্মহত্যা করব।"

—"বেশ, তাই কর।"

একটা ঝাড়া দিবা মাত্র অচলা ঘরের এক কোনে গিয়া পড়িল। দেয়ালে লাগিয়া তাহার মাথার খানিকটা কাটিয়া গেল। —"উঃ"—বলিয়া সে দুই হাতে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিল।

আর তাহার স্বামী অবনী দ্রুত পদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল। পত্নীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না।

* * * *

অচলা অত্যন্ত অসুখে পড়িল। অনেক ডাক্তার দেখান হইল। ডাক্তার জবাব দিয়া গেল।

মনোরমা ম্লান মুখে ডাকিল—"সই"—

অচলা শয্যায় শায়িত ছিল, চোক মেলিয়া ক্ষীণ-স্বরে উত্তর দিল—"কেন ভাই"—

—"তোর বাপের বাড়ীরও কি কেউ নেই?—"

—"সবাই আছে।"

—"তবে তাদের টেলিগ্রাফ করে দেই।"

কাতর স্বরে অচলা বলিল—"না সই। ভাল লাগেনা। যে ক'টা দিন আছি, শান্তিতে কাটিয়ে যাই। আর মানুষের মুখ দেখতে ভাল লগ্‌ছে না। শুধু তুই আমার কাছে থাক, ভাই। আর কেউ যেন এ ঘরে না আসে।"

একটু নীরবে থাকিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল,—"অবনীকে দেখবি সই?"—

দৃঢ় স্বরে অচলা উত্তর দিল—"না"।

* * *

অচলার চিতা নিভিয়া গেল।—

তাহারই চিতার পার্শ্বে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল মনোরমা। এমন সময়ে অবনীকে লইয়া নলিন সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনীর সম্মুখে মনোরমা কখনও বাহির হয় নাই। আজ সে এই নর পিশাচটার প্রতি ঘৃণা ভরে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

নলিন অবনীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত

করিয়া বলিল,—"এ কার চিতা বুঝতে পেরেছ" ?—

অবনী বলিল —"না"—

—"নাঃ! ওরে, হতভাগা, আজও তুই বুঝতে পারলি না কি অমূল্য রত্ন তুই হেলায় হারালি ?"

অবনী বিরক্ত হইল—বলিল—"এ কার চিতা ?—"

—"অচলা,—তোমার কালিন্দির—"

"অচলা"—কি বলছো, তুমি কি পাগল হ'য়েছো নলিন,—" নলিন ঘৃণা ভরে উত্তর দিল,—"পাগলও মাতাল, চরিত্রহীনের চেয়ে ঢের উঁচুতে।"

অবনী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নলিন আর দাঁড়াইল না। ঘৃণায় অপর দিকে, মনোরমার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে মনোরমা একখানি খামে মোড়া পত্র অবনীর নিকট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

অবনী সেইখানা কুড়াইয়া লইয়া খাম হইতে পত্রখানি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।—

তাহাতে লেখা ছিল,—

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করিলাম। কালিন্দি বলিয়া, অচলা বলিয়া আর কেহ তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না। কামনা করি, সুখে থেক। প্রণতা—কালিন্দি—

পত্রখানা হাতে লইয়া অবনী সেই স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল......চিতার শেষ অগ্নিকণা টুকুও তখন নিভিয়া গিয়াছিল।

সৈনিকের চিঠি

(জ)

মিলিটারী হাসপাতাল
প্যারী।
২১শে সেপ্টেম্বর।

প্রিয়তমা, মানসী আমার !!!

তোমার চিঠি আজও এলনা। তুমি আমায় লেখনা কেন ? আমি ভাবছিলুম--আজ দুপুরে নিশ্চয় তোমার চিঠি পাব-কিন্তু দুরাশা! আমি দিন গুণ্‌ছি, দিন গুণে দেখেছি—কাল তোমার চিঠি আসা উচিৎ ছিল। কালতো পাইনি, তাই ভেবেছিলুম, আজ নিশ্চয়ই আসবে। যাক্ ও রকম তো কতদিনই যাচ্ছে ? আজ নতুন তো কিছু নয়!

আমার নার্সটি খুব ভালো মেয়ে, নামটি ও তার তেমনি সুন্দর। তাহার নাম আমি আরো তোমায় লিখেছি। রেণীর নাম কি তোমার মনে আছে ? এইই সেই রেণী। বাড়ী তার এখানেই। বেশ শিক্ষিতা। দেশের জন্যে ওর যা' টান্—আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মেয়েদের এত মনের জোড়—এত সাহস ? তা' না হলে কি আর ছেলেরাও এমন হয় ? আমার যখন মনে হয়, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তখনই মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হই। আমাদের দেশের মেয়েতো দূরের কথা ছেলেদেরও তো এর অর্দ্ধেক নেই। তা' নইলে কি আর আমাদের এত অধঃপতন হয় ? সত্যি, আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না এত পার্থক্য কেন ?

রেণী প্রায় সময়ই আমার কাছে থাকে। আমাকে আমার যুদ্ধের ইতিহাস বলতে বলে।—আমি যখন বলতে থাকি, তখন সে কত ব্যগ্র হয়ে শুনে আর যেখানে আমার বীরত্বের কিছু দেখে,—সেখানে কত

বাহবা দেয়, আনন্দে অধীর হয়ে আমার গা ঘেষে বসে। আমার যুদ্ধের ইতিহাস সে যেমন আগ্রহে শুন্‌ছে—তুমি হয়ত এত আগ্রহে শুন্‌তে চাইতে না। তার কারণ, আমরা এর মূল্য বুঝিনা !—

বাস্তবিক, ফরাসী জাতিটার দিকে যতই তাকাচ্ছি—ততই এদের উপর আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ করে গম্ভীর মুখে নয়—হাসি দিয়ে। জীবন—ভারী পাথরের মত এদের বুকে চেপে বসে না—হাওয়ার মত হাল্কা পা ফেলে এদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারাও লঘু হাতে একে তুলে নেয়—স্নিগ্ধ হাস্তে শেষ করে একে নামিয়ে রাখে। এরা রক্তে—রাঙা মাটীর উপর দিয়ে, হাসির হাওয়া ছড়িয়ে চলে যায়- তাতে এদের লঘু নৃত্যের তাল ভঙ্গ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়—। দুনিয়াতে যা' কিছু প্রধান—সব এই ফরাসীদের মুঠোর মধ্যে। ধন, দৌলত, শিল্প, সাহিত্য—ফরাসীরাই জগতে সব দিচ্ছে।

তার চার ভাই—বিয়ের কিছুদিন পরেই যুদ্ধে নেবেছিল এবং সেই-ই শেষ বিদায় তাদের। তারা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। সত্যি, এখানে বাঁচাটাই অস্বাভাবিক—মরাটাই স্বাভাবিক। আমি যে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে যাচ্ছি—ভগবান জানেন এর মধ্যে তাঁর কোন্ শুভেচ্ছা লুকানো রয়েছে! হাঁ—তার ভাইদের মৃত্যুর পরই ওরা রেড্ ক্রশএ যোগ দিয়েছে। কি ধৈর্য্য ওদের। জীবনের যত কিছু আশা, সার্থকতা সব নিঃশেষ হয়ে গেছে—তবু মুখটি বুজে পরের ভার হাসি হাসি মুখে তুলে নিচ্ছে।

আর যদি তোমরা হতে—তবে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে দিতে,আর যদি সে লাশটা একবার কাছে পেতে, তবে তার মাথাটা বুকে ধরে কি কান্নাই না কাঁদতে!

আমার বড্ড হাসি পায়—যখন এ সব ভাবি।

তারা বলে কি জান?—মৃত্যু যা' নিছক সত্যি—একটা স্বাভাবিক জিনিষ, তা' নিয়ে আবার কান্নাকাটি কেন? এত বড় একটা সত্য তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই এম্‌নি ক'রে জীবনাহুতি দিতে পারে!

আজ আমি এই অসুস্থ অবস্থায়ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছি—তার কথায়। আমার যে কি একটা বিপুল আনন্দ বুক ছাপিয়ে উঠ্‌ছে—তা' এই পেন্‌টার কি করে লিখে জানাব? বুক চিড়ে দেখালেও তা' সম্পূর্ণ দেখানো হবে না।

সে আমায় বল্‌ছে- আমি তোমায় খুব শীগ্‌গীর সুস্থ করে তুল্‌ব। তারপর আমিই তোমায় রণ সাজে সাজিয়ে বিদায় জানাব। তোমাকে এবার জয় পতাকা উড়িয়ে ফিরে আস্‌তে হবে। আমার দেশকে বাঁচাতে হবে- তোমায় বাঁচাতেই হবে। তার চোখ আমার মাঝে কি দেখে নিলো—কে জানে?

আমি এ পবিত্র-বেদনা-মাখানো আদেশের কি জবাব দেবো? আমি সুস্থ হয়ে উঠ্‌ব কি-না কে জানে? আমি মনে মনে একবার ভবিষ্যৎটা কল্পনা করে নিলুম।

সে আবার বলে উঠ্‌ল—কি ভাব্‌ছ তুমি? তুমি পার্‌বে—আমি জানি। আমার এই প্রচুর বিশ্বাস থেকেই তোমাকে ওকথা বল্‌চি। ভগবান তোমায় বর্ম্মের মতো রক্ষা করবেন।

তাই হবে দেবী—তাই হবে। আমি এবার ভীষণ ভাবে ঝাঁপিয়ে পর্‌ব—আগুণ জ্বালাব—শত্রু নিঃশেষ কর্‌ব, ধ্বংস কর্‌ব। তোমার এত স্নেহের প্রতিদান আমার দিতেই যে হবে—রেণী? বাইরের দিকে একবার তাকালুম—দেখ্‌লুম চারিদিকে সব কেমন যেন নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। সব যেন একটা নতুন আশার বাণী নিয়ে সমুপস্থিত হয়েছে। চারিদিকে যেন আলোয় ভেসে যাবার জোগাড়!

এই সময় দূরে মিলিটারী ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল। আহ্‌—কি মধুর !!!

পরের দিন। ২২শে সেপ্টেম্বর।

আজ আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে। পূর্ণিমা বলেই বোধ হয় এমন হয়েছে। রেণী ছায়ার মত আমার কাছে রয়েছে। ডাক্তার সাহেবের হুকুম

আমাকে যেন এতটুকু অসুবিধা ভোগ করতে না হয়। দিব্যি আরামে আছি, তবে যা' কষ্ট ব্যথা, বেদনায়।

একে আমার একার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ জীবনের বিনিময়ে আমার তো কোনো লাভের আশা নেই—ওদের জন্যেই আমার এ প্রয়াস এবং তা' ব্যর্থও হয়নি। সেই জন্যেই বোধ হয় বিশেষ করুণা করছিল।

উঃ! আমার তো মনেই ছিল না যে এতক্ষণে তুমি রেগে হয়ত আগুণ হয়েছ, হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরচ। না—গো, না তোমার আগুণ হবার বা হিংসায় জ্বলে মরবার কোনো কারণই নেই। আমি যত প্রশংসাই তার করি না কেন, যত ভালই বাসিনা কেন-পাশে তুলে নেবার সাধ বা আশা মোটেই নেই। এইজন্যে তুমি অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না। বুঝলে?—

এইমাত্র ডাক্তার সাহেব ও কমাণ্ডিং অফিসার এসেছিলেন। তাঁরা বলে গেলেন—আমার এ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ—আমাকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। আচ্ছা আর যদি ভালো হয়ে না-ও উঠি, তবু কি আমায় পুরস্কার দেওয়া হবে? আর তখন দিলেই বা কে দেখতে আসবে? গোরের উপর মণি মাণিক্য দিলেও আমার তো আর কিছু এলো গেলো না বা আমি দেখতে আসব না কি দিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে?

রেণী এসে জানাল—আর পাঁচ দিন বাদেই না-কি আমাকে আবার যুদ্ধে নাবতে হবে।

অন্য সময় হলে বলতুম, এ তাদের অবিচার! আমাকে এ অসুস্থ অবস্থায় চালান দেওয়া কেন? আর কি-ইবা হবে এই অক্ষম দেহটায়? কিন্তু আজ তা' আর মনে হল না।—

আনন্দ হল এই ভেবে যে—আমার একটা কদর আছে—এদের কাছে। আমাদের মূল্য এরা বুঝেছে। আমাদের ভীরু বলে যে এতদিন একটা অপবাদ ছিল—আজ তা' পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে গেলো। ইতিহাসের আজ এক নতুন পাতা খুলে গেলো। তা' ছাড়া রেণীর ব্যাকুল অনুরোধ কি করেই বা উপেক্ষা করব?

আমি বললুম—বেশ! তাই যাবো।

হাঁ, তোম'কে যেতেই হবে—বন্ধু! তুমি যে আমাদের কত বড় সম্পদ—তা' আমরা জানি। তাই না তোমায় এ অবস্থাতেও আমরা পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি।—

বিদেশিনী!!! তুমি আমাকে বুঝলে, তুমি আমাকে চিনলে—কিন্তু তোমারই মতো নিটোল সৌন্দর্য্যশালিনী—আমার চির-পরিচিত মানসী প্রিয়াই যে আমায় চিনলো না—বুঝলো না! আমায় অবহেলায় তাড়িয়ে দিলো।

তাই না আজ আমি এখানে—এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে। জীবন দিয়ে প্রতিশোধ নিতে—পাষাণে বুক বেঁধে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে—এই সুদূর ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হয়েছি।

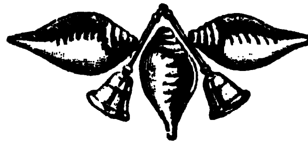


অসমাপ্তি

এখনো ভাঙেনি ঘুমের ঘোর
লতিকা বিতানে লুকানো ভোর ;
আঁখির জড়তা মুছিতে মুছিতে
গোধূলি বসায় মেলা।
কেমনে গেল রে বেলা ?

এই না ফুটিল কুসুমের কলি ?
সবে না গুঞ্জরি জুটিল অলি ?
কুড়ায়ে গাঁথিতে সাধের মালাটি
ঝরা দলে ভরে তলা।
একটু করিনি হেলা ॥

এই না ডাকিল তটিনীতে বান ?
দুকূল ডুবিল ভরি কাণে কাণ ;
জ্যোছনা লহরী স্রোতে না ভাসিতে
অমনি থামিল ভেলা।
ফুরায়ে গেল রে খেলা ॥



সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে ?

শ্রীপ্রণব রায়

ভূষণবাবু শহরের খ্যাতনামা ডাক্তার।

ধন, মান, যশের অন্ত নাই—

'ডাকের' ব্যস্ততায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পান না!......

ভূষণ বাবুর দুটী কন্যা।

—কেতকী আর করবী।

কেতকী বড়, করবী ছোট।

দুজনেই অপরূপ সুন্দরী......

কনক-চাঁপার মত সুগৌর রঙ......

মুখ-চোখ যেন তুলি দিয়া আঁকা......

নিটোল স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ বিকশিত যৌবনের সুষমায় ঢল-ঢল।

উভয়েই বেথুন স্কুলে সুশিক্ষিতা।

বিংশ শতাব্দীর সভ্য প্রথায় অভ্যস্তা।

সুতরাং পাত্রী হিসাবে উভয়েই দুর্লভ।

বিলাত ফেরৎ তরুণ মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—

কেতকী করবীর রূপের এবং গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সকলেরি মুখে।

পার্টি ডিনারের নিমন্ত্রণ তো লাগিয়াই ছিল!

ভূষণবাবু কেতকীর বিবাহ দিয়াছিলেন ধনীর ঘরেই।

ছেলেটী বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার—

যথেষ্ট পশার......

ধনৈশ্বর্য্যও প্রচুর......

মূল্যবান্ আস্‌বাবে ভরা সুউচ্চ সৌধ, বেয়ারা, খান্‌সামা, 'মিনার্ভা কার'......

কেতকীর কিছুরই অভাব নাই।

অভাব শুধু মনের সুখের!

এত বিলাস ঐশ্বর্য্যের মাঝে থাকিয়াও কেতকীর অন্তরে তৃপ্তি নাই!

ফুল শয্যার রাত্রেই সে স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পাইয়াছিল......

শুধু তাই নয়......

স্বামীর জামার পকেটে একদিন কোন এক বাইজীর প্রেম পত্র দেখা গিয়াছিল .....

—সে দিন কেতকীর তরুণ হৃদয়ের আশা-মঞ্জরী না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িল। তার আকুল অশ্রু......

ব্যাকুল মিনতি......

সব ব্যর্থ হইয়া গেল।

স্বামী বলিলেন, শাড়ী গয়না দিয়েচি, আর কি চাই?......পুরুষ মানুষ আমি, একটু ফুর্ত্তি কোরব না? সারাক্ষণ স্ত্রীর আঁচল ধ'রে বসে থাক্‌তে হবে! ......ছোঃ......

শাড়ী, অলঙ্কার......

ব্যস্, নারীর আর কিছুই দাবী করিবার নাই!

কেতকীর ইচ্ছা হইল মুখ ফুটিয়া বলে, ওগো, শাড়ী গয়নাই নারীর সর্ব্বস্ব নয়......নারীরও প্রাণ আছে......

কিন্তু কিছুই বলিল না।

তার মুখে রহিল হাসি—

আর বুকে রহিল অতল অশ্রু-সাগর।......

কিন্তু কন্যার মুখের বেদনা করুণ হাসিটুকু পিতার স্নেহ-দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রহিল না।

ভূষণবাবু সব বুঝিলেন—

বক্ষ হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।......

এইবার করবীর পালা—

কিন্তু আর ধনী নয়।

ভূষণ বাবুর আর ধনী জামাতা করিবার অভিলাষ ছিল না।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, গরীবের ঘরেই করবীর বিবাহ দিবেন।

ছেলেটী দরিদ্র হোক্ ক্ষতি নাই······

কিন্তু চরিত্রটী তার যেন অকলঙ্ক হয়।

করবীর পাণি-প্রার্থী ধনী যুবকের দল হতাশ হইল—

পাত্র জুটিল—কমলেশ।

কমলেশ বেশ নম্র, ধীর······

শ্যামবর্ণ হইলেও মুখে বেশ একটী স্নিগ্ধ-শ্রী আছে······

সুস্থ, সুগঠিত দেহ······

সর্ব্বোপরি চরিত্রটী তার একেবারে শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক······

অতি বড় শত্রুও তার চরিত্রের দোষ দিতে পারে না।

শুধু একমাত্র খুঁত—বড় গরীব!

তা হোক্।

এম, এ পাশটা দিলেই, বছর খানেক পরে একটা প্রোফেসরি জুটাইয়া লইতে পারিবে—

ভূষণবাবু কমলেশকেই নির্ব্বাচিত করিলেন·· ···

শরতের এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায়—কমলেশ করবীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল।······

বিধাতা বোধ করি অলক্ষ্যে হাসিলেন।—

বিবাহের পর করবী প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেল।...

সঙ্কীর্ণ একটা গলির মধ্যে বহু পুরাতন একখানা বাড়ী,—

যেন জরাগ্রস্ত প্রাচীন বৃদ্ধ।

দেয়াল হইতে চূণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে......

শ্যাওলা-ধরা ইটে নোনা ধরিয়াছে......

ঘরগুলি যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁৎ স্যাঁতে ··

শ্বশুরবাড়ী দেখিয়া করবীর নাসিকা কুঞ্চিত হইল।

এখানে মানুষ থাকে!

গোটাদুই তক্তাপোষ, ছিন্ন বিছানা, আর হাঁড়ি কুঁড়ি, বাসন পত্র······

আস্‌বাব বলিতে তো এই!

না আছে একখানা সোফা, না আছে একটা ড্রেসিং-টেবিল······

আজন্ম-বিলাস-লালিতা করবীর চোখে ভারি বিশ্রী ঠেকিল।

সে বসিবেই বা কোথায় .....

প্রসাধন সারিবেই বা কোন ঘরে!

এই দুর্গন্ধময়, নোংরা বাড়ীতে—

করবীর বুক ভরিয়া কান্না আসিল।

পিতা জানিয়া-শুনিয়া তাকে বনবাসে পাঠাইলেন।·····

বধূ-বরণ করিয়া তুলিলেন—কমলেশের বিধবা মা।

শুভ্র শুচি বেশা......

স্মিত সহাস মুখখানি .....

করুণা কোমল দুটী নয়ন······

দুনিয়ায় কমলেশের আপন বলিতে ওই মা।

কত কষ্ট স্বীকার করিয়া মা তাকে মানুষ করিয়াছেন!

ভাবিলেও শ্রদ্ধা ভক্তিতে কমলেশের মাথা নত হইয়া আসে।

সেই কমলেশের বৌ......

সুন্দরী কিশোরী......

মার আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই।

এতদিনে সাধ পূর্ণ হইল—

পুত্র-বধূর ইন্দু-মুখ দেখিয়া চোখ জুড়াইলেন।

স্বর্গগত স্বামীর মুখখানি মনে পড়িল......

কত আশা ছিল তাঁর......

নীরব ব্যথায় বিধবার আঁখিপল্লব সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু শুভ-কার্য্যে চোখের জল ফেলিতে নাই যে!

ত্রস্ত হাতে তিনি অঞ্চল প্রান্তে দু'ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

ফুল শয্যার রাত্রি।......

বাহিরে শরতের জ্যোৎস্না।

কমলেশ ঘরে আসিল।

ফুল, ফুল, শুধু ফুল—

মৃদু পুষ্প-গন্ধ কমলেশের মনে মোহের আবেশ আনিয়া দিল।

ফুল-বিছানো শয্যায় নিদ্রিতা করবী······

যেন শুভ্র একটী শতদল......

কবরী শিথিল······

অঞ্চল স্খলিত...

ল্যাম্পের আলো তার ঘুমন্ত মুখখানি দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে......

কমলেশ দেখিল, করবীর মুখখানি বড় সুন্দর!

এমন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি·····

পুষ্পিত-যৌবনা পুষ্প-ভূষিতা প্রিয়া...

কমলেশের তরুণ মন মাতাল হইয়া উঠিল।

মৃদু স্বরে ডাকিল, করবী......

করবীর নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

তার ফুল্ল রক্তাধর দু'খানি কমলেশকে আকর্ষণ করিল......

কমলেশ সহসা নত হইয়া প্রথম প্রণয়-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল—

করবীর ঘুম টুটিয়া গেল।

মুগ্ধ কমলেশ আবার তার গোলাপী কপোলে অধর পরশ দিল .....

করবী ত্রস্তে সরিয়া গেল......

মুখে লজ্জার রক্তিমা······

বিহ্বল স্বরে কমলেশ বলিল, আজকে রাতে কি ঘুমোতে হয়, করবী?

করবীর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল—

এ কি অভদ্রতা!

কমলেশের প্রফুল্ল মুখখানা নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

করবী কি তবে সুখী হয় নাই!

ম্লান স্বরে শুধাইল, আমাকে পেয়ে কি তুমি সুখী হও নি?...বল, করবী, বল...গরীব ব'লে আমায় ঘৃণা কর না তুমি?

করবী ভাবিল, ভালো জ্বালা!

বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, জানি নে...এখন ঘুমোতে দিন্ আমায়......

এই কি নব-বধূর প্রথম সম্ভাষণ?

কমলেশের বুকে তীব্র ব্যথার কাঁটা বিঁধিল।

অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, বেশ, তোমায় আর বিরক্ত করব না করবী—

করবী পাশ ফিরিয়া শুইল।

কমলেশের মনে হইল, দরিদ্রের ঘরে এ ফুল মানায় না!

ধনীর সুরম্য প্রাসাদেই শোভা পায়।

একটা বেদনা-তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

জান্‌লার ধারে গিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিল।

বাহিরে তেম্‌নি শারদ-জ্যোৎস্না......

ঘরে ফুলের সৌরভ .....

কিন্তু সব বিফল!

পুত্রের রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মুখখানি দেখিয়া মা শুধাইলেন, শরীর কি ভালো নেই, বাবা কমল?

কমলেশ ম্লান হাসিল—

বলিল, বড় লোকের মেয়ে আনা তোমার ভুল হোয়েছিল মা...আমাদের গরীবের ঘরে ও মানায় না...

মা সবই বুঝিলেন।

স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, না রে না, বৌমা আমার লক্ষ্মী!·ছেলে মানুষ, তাই এখন স্বামীর ঘর চেনে নি, বড় হোলেই চিন্‌বে...

করবী বাপের বাড়ী যাইবার জন্য অস্থির—

এ নোংরা বাড়ীতে সে টিঁকিতে পারিবে না।

চিরকাল সে বিলাসের কোলে লালিতা...

দারিদ্র্যের এ রুক্ষ মূর্ত্তি সহিতে পারিবে কেন?

আজন্ম পরিচিত একটী গৃহের জন্য তাই তার মন উতলা—

মা স্নেহের হাসি হাসেন।

বলেন, ছেলে মানুষ ..বাপ-মায়ের জন্যে মন কেমন কোরচে .....

জান্‌লার ধারে করবী বসিয়াছিল।

হাতে একখানি নব-প্রকাশিত উপন্যাস......

বোধ করি বিবাহের উপহার-প্রদত্ত......

অবগুণ্ঠনটী শিথিল .....

শুভ্র ললাটে সিঁদুরের রক্ত-বিন্দু... ..

কমলেশ ঘরে আসিল।

তার মুগ্ধ চোখে পলক পড়িল না—

সহসা করবীর একখানি কর-কমল ধরিল...

বলিল, কবে ফির্‌বে করবী?...বাড়ী গিয়ে চিঠি লিখ্‌বে তো আমায়?

কণ্ঠস্বর তার তৃষ্ণা-ব্যাকুল!

করবী হাত ছাড়াইয়া লইল—

মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া...

বলিল, কবে ফির্‌ব বোল্‌তে পারি নে...এ রকম নোংরা বাড়ীতে থাকা তো আমার অভ্যাস নেই ..

বেদনার আঘাতে মুগ্ধ কমলেশের মোহ টুটিয়া গেল—

দরিদ্রের প্রতি এত ঘৃণা!

মেঘ-কালো মুখে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।......

পিতার বিলাস-সৌধে আসিয়া করবী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—

মুক্ত আলো বাতাস...... সখীদের হাসি-গল্প...

এরি মাঝে সে তার আনন্দ-চঞ্চল প্রাণটীকে মেলিয়া দিল।

এ সব ছাড়িয়া সেই সঙ্কীর্ণ গলিতে......

অন্ধকার নোংরা বাড়ীতে অহরহ বন্দী হইয়া থাকা......

অসম্ভব!

মানুষ তো আর খাঁচার পাখী নয়!

নিশ্চিন্ত সুখে করবীর দিন কাটে—

ভূষণ বাবুর মুখ কিন্তু গম্ভীর।

কন্যার এই আচরণে তিনি ব্যথিত।

হা'রে মূঢ় মেয়ে...... রত্ন চিনিলি না......

তুচ্ছ বিলাস-লীলায় মাতিয়া রহিলি! ..

কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না।

রহিয়া রহিয়া করবীর মন উদাস হইয়া যায়...

সখীরা আসে।

গল্প করে।

হাসি পরিহাসে ঘর মুখর করিয়া তোলে।

কিন্তু মাঝে মাঝে করবী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—

সখীরা গান গাহিতে বলে।

করবী আন্‌মনে গাহে—

—'বিদায় কোরেচ যারে নয়ন-জলে,

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে—'

বিরহ-করুণ সুর!

কৌতুক-হাসিতে সখীদের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বলে, বিরহিণীর মন উতলা হোয়েচে—

করবী গান বন্ধ করিয়া দেয়।

মনটা বিরক্ত হইয়া ওঠে অকারণে।

কখনো চুপ করিয়া বসিয়া থাকে......

একেলা......

স্তব্ধভাবে......

বসন্ত আসে।

নীলাকাশে সোনার আলো।

মুকুল ফোটে।

মুদিত কলিকা পাপ্‌ড়ি মেলিয়া চায়।

বাতাস গন্ধ-মদির।

ধরণীর বুকে সবুজের শোভা।

শুষ্ক শাখা নব-কিশলয়ে ভরা।

চারিদিকে যে উৎসবের সমারোহ—

করবীর মনে কি এক আবেশের মোহ ঘনাইয়া আসে।

বসন্তের অলস বেলায় সে উদাস মনে বসিয়া থাকে—

হাওয়ার দোলায় পল্লব-মর্ম্মর শোনা যায়......

যেন কাহার মৃদু প্রণয়-গুঞ্জন......

করবীর মনে পড়ে প্রেম স্নিগ্ধ দুটী আঁখি......

ফুল শয্যার রাত্রে একটী গোপন চুম্বন......

সারা দেহ তার শিহরিয়া উঠে।

- মলয় পরশে ফুলের মত।

বসন্তের জ্যোৎস্না-রাত্রে করবীর চোখে ঘুম আসে না—

মনে হয়, যদি কেহ পাশে থাকিত!

দুটী কোমল-বাহুর আলিঙ্গন......

একটী অতর্কিত চুম্বন......

এরি জন্য তার তরুণ হৃদয় তৃষিত।

দূরে কুহু ডাকে—

করবীর যৌবন-জাগ্রত বুকের তৃষা ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

সেদিন সুলতা আসিয়াছিল।

সুলতা করবীর সহ-পাঠিনী ছিল।

সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে।

সুলতা সারাক্ষণ তাহাদের নব-বিবাহিত জীবনের গল্প করিল.. ...

তাহাদের সুখের ঘর-কন্নার ইতিহাস......

স্বামীর অনাবিল প্রেম- সোহাগ......

শুধু এই সব কথা।

স্বামী তার কেরাণী।

কিন্তু সুলতার মনে কোনো ক্ষোভ নাই—

দরিদ্র হইলেও তাহাদের শান্তি-নীড়টী বড় সুখের।

করবী দেখিল, সুলতার মুখে তৃপ্তির আভা......

নিজকে বড় রিক্ত বোধ হইল।

বুঝিল, তার নারী জীবনে মস্ত একটা অভাব, একটা অতৃপ্তি রহিয়াছে।

করবীর হিংসা হইল—

সুলতা কি সুখী!

সহসা সে উঠিয়া চলিয়া গেল—

বলিল, বড় মাথা ধরেচে ভাই—

অকারণে তার আঁখি অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।...

মা বলেন, এইবার বৌমা'কে আনতে পাঠাই কমল?

কমলেশ বলে, কি দরকার মা?......বেশ আছি আমরা মায়ে পোয়ে......

মা সন্তানের গোপন অভিমান-বেদনা বোঝেন।

বলেন, সে না হয় ছেলেমানুষ, অবুঝ......তুইও কি অবুঝ হবি রে?

কমলেশ জবাব দেয় না।

ভূষণবাবু সেদিন গৃহিণীকে বলিলেন, শুনলুম, কমলেশের নাকি অসুখ......

পাশের ঘরে ছিল করবী

কথাটা সে শুনিল—

সহসা তার বুকে যেন একটা কাঁটা বিঁধিল।

এ কি উদ্বেগ, ব্যাকুলতা তার মনে!

ইচ্ছা হইল, মুখ ফুটিয়া শুধায়, কি অসুখ?... ... কেমন আছেন তিনি?

তার বুকে জাগিয়া উঠিল এক মমতাময়ী নারী—

অর্থের অহঙ্কার... ..

ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব

সবি পরাজয় স্বীকার করিল।

সে বুঝিল, অর্থ ই নারী জীবনের সর্ব্বস্ব নয়।

লজ্জা-সঙ্কোচ জয় করিয়া করবী বলিল, মা আমি যাব।

মা বলিলেন, রোগের বাড়ী ·····সেখানে গিয়ে কাজ নেই······

করবীর রুদ্ধ অশ্রু মানা মানিল না—

বলিল, তবু আমি যাব—

ভূষণবাবু সস্নেহে কন্তার মাথায় হাত রাখিলেন।

বলিলেন, বেশ তো মা··· · চল আমিই তোমায় রেখে আস্‌ব······

শয্যার উপর কমলেশ বসিয়াছিল—।

মুখখানি রোগ-ম্লান······

চোখের তারায় বিষাদের ছায়া······

করবী ধীরে ঘরে আসিল।

লজ্জা-কুণ্ঠা-রক্ত অপরূপ শ্রী—

ধীরে কমলেশের পায়ে একটী প্রণাম করিল—

যেন শ্রদ্ধা-নতা পুজারিণী !

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, ক্ষমা চাইতে এসেচি আমি ······আজ বুঝেচি, এ বাড়ীই আমার তীর্থ······

কমলেশ দেখিল, করবীর চোখে অশ্রু !

পাণ্ডুর মুখখানি তার আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল।

শীর্ণ বাহু-পাশে করবীকে বন্দী করিল।

বলিল, করবী, আজই আমাদের স'ত্যিকারের মিলন-রজনী—

বাহিরে বসন্ত পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না······

দূরে একটা পোষা কোকিল ডাকিতেছিল······

কুহু কুহু ···

উপহার

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

স্বামিন্

গিয়েছ স্বরগ পুরে,
কোথা গো সে কত দূরে,
অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস ?
পশিতে কি পারে তথা,
বিষাদ বিরহ গাঁথা,—
বেদনার অশ্রুজল দুঃখের নিশ্বাস ?

২

পরপারে জীবনের,
গেছ চলে ; দু'জনের
মাঝে, আজি অন্তরাল সৃজিয়া অপার
নিয়ে গেছ সুখ আশা,
প্রেম প্রীতি ভালবাসা—
রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রুধার ॥

৩

হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
বিষাদ বরষা ঝরে
শোক বায়ু হু হু করে সদা করে খেলা,
গণিতেছি কতদিন,
একাকিনী সাথী হীন,
জানিনা ফুরাবে কবে জীবনের বেলা

৪

মর্ম্ম বিদ্ধ শোক-বাণে,
যে ক্ষত আহত প্রাণে,
উৎসবে রোদন রূপে এ প্রীতি আমার,
লহ নাথ একবার,
দীর্ণ হৃদি বেদনার,
অশ্রুজল বিন্দুমাখা প্রেম উপহার ॥



আত্মোন্নতি ও সমাজ সেবাই ধর্ম্ম। শিক্ষা ও ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হইলেই মণিকাঞ্চন যোগ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা।

ধর্ম্ম বলিতে কোন দেবতাবিশেষে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস বুঝায় না। ইহাতে প্রাণহীন আচারের হৃদয়হীন পীড়ন নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার ইঙ্গিত নাই, ব্যক্তিগত ঈর্ষা নাই, সমাজগত রেষারেষি নাই; আছে জগতের হিতার্থে স্বাধীন চিন্তা ও সম্মিলিত চেষ্টা, দুঃখীর দুঃখমোচনের আপ্রাণ যত্ন, নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া জগতের উপচিকীর্ষা। ইহাতে ভেদ নাই, আছে মিলন, আছে সাম্য; ঈর্ষা নাই আছে ভালবাসা, আছে প্রেম; ইহাতে ঘৃণা নাই, আছে ভক্তি; ইহাতে ভাগ নাই, আছে সম্মেলন, আছে আত্মদান। সকলকে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টাই পরম ধর্ম্ম, চরম শিক্ষা।

যেখানে প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম্ম, সেখানে শৌর্য্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রাণে ভয় বা দুর্ব্বলতার লেশমাত্রও নাই। তিনি সংসারের আপদ বিপদে ভীত হন না, তিনি জানেন উহা জীবনের নিত্য সহচর। তিনি কাপুরুষের মত বিপদ্ এড়াইয়া চলিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি বীরের মত আত্মবলে বাধা বিঘ্ন, দুঃখ দৈন্য অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হন। তিনি মনের বলে বিশ্ববিজয়ী হন। তিনি নিয়ত সুখের আশা করিয়া অবিরত দুঃখের ফাঁদে অবরুদ্ধ হন না। তাঁহার প্রার্থনা—

"দেও লক্ষ দুঃখ শোক,
লক্ষ লাজ ভয়,
দেও দৈন্য প্রতিদিন
নব বিঘ্ন-ময়;
তুচ্ছ ব'লে সবে আমি
করিব আহ্বান,
শুধু চাই প্রাণ।"

এই প্রাণ শিক্ষা ও ধর্ম্মের সম্মিলিত ফল।

ভারতের শিক্ষানীতি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা দেহ, মন বা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ভারতীয় বীরের আদর্শ কি? প্রকৃত বীর কে? "যিনি শুধু দৈহিক বলে বলীয়ান, অথবা যিনি শুধু ধনুর্ব্বিদ্যায় বা অস্ত্রশস্ত্র চালনায় পারদর্শী? না, প্রকৃত বীর তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হইবেন; তিনি নীতিপরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞানী হইবেন, সর্ব্বোপরি

তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। এইরূপে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হিন্দুশিক্ষার চরম আদর্শ।"

এই শিক্ষার ফলে প্রাচীন ভারত উন্নতির চরমে উঠিয়াছিল—শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্য্যয় সহিয়াও আজও বাঁচিয়া আছে, নিজ অবিনাশী বীর্য্য ও জীবন লইয়া পর্ব্বত হইতেও দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃত-স্বরূপ, আমাদের এই ভারত-ভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

তাই সমগ্রজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। আজ কাল যে শিক্ষা দেশে চলিয়াছে, সে শিক্ষায় মানুষ তৈয়ার হয় না—তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। "বালক স্কুলে গেল। সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।…মাথায় কতক গুলা ভাব ঢুকাইয়া সারা জীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধ ভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে বিভিন্ন ভাবসমূহকে এমনতর ভাবে আপনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়।"

আমরা বৃথা উল্কার পথে ধাবিত হইতেছি, ঐ যে উজ্জ্বল তারকা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে চাই, অথচ এক পোয়া পথ হাটিবার ক্ষমতা নাই। বৃথা আস্ফালনে কাজ হইবে না। চাই কাজ। মানুষ হইতে পারিলে সকলই পাওয়া যাইবে- অভাব, অভিযোগ কিছুই লাগিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন আমাদিগকে সেই আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, "মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও সব বাকি আপনা আপনি গড়্ গড়িয়ে আস্‌ছে।"

জীবনের আদর্শ কর "জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।" প্রথম পূজা বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের পূজা—ইহাদের পূজা করিতে হইবে। এই সব মানুষ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে।

Give the devil his due—সকলকেই তাহার নিজ প্রাপ্য দিতে হইবে। একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতিকে নীচু করিতে হইবে না—উহাদের ভয় নাই। নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। এখন "প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য নিজের সমাধি নিজের খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবে উহা তত পচিবে আর উহার মৃত্যু তত ভয়ানক হইবে। এই কারণ ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যত দিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি যদি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।"

সংহতিই শক্তির মূল। শক্তি লাভ করিতে হইলে সকল ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মেলন করিতে হইবে। ঋগ্বেদ সংহিতা বলেন,—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে ইত্যাদি। ১০।১৯১।২

তোমরা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণ বিশিষ্ট হও, কারণ পূর্ব্বকালে দেবগণ একমনাঃ হইয়াই তাঁহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কারে ত প্রচেষ্টা নাই ই, অথচ আমাদের উদাসীনতা ও নিশ্চেষ্টতার দরুণ আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব-গুলির পূরণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। একদিন বঙ্গের পল্লীগুলির দিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইত। সেদিন মানুষের "চিত্ত প্রবাহ বাঙলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল— এখন সেই বাঙলার পল্লী-ক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত —সেখানে উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি উঠে না।"

আমরা আজকাল
"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

এজন্য সোঁতের সেঁউলির মত ভাসিয়াই চলিয়াছি। আমাদের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নাই—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি সেই ঋষিবাক্য—কুরু পৌরুষমাত্ম-শক্ত্যা। আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে, অতি বৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষ কোন দিন ত্যাগ করে নাই, যাহা কিছু ঘরের এবং যাহা কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ সমাজকে নূতনভাবে গঠিত করিয়া তুলে।

দেশের একনিষ্ঠ সেবক চিত্তরঞ্জন একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার মতে, জাতীয়তা অর্থে পাশ্চাত্য দর্শন হইতে ধার করা একটা রাজনীতিক ধারণা মাত্র নহে। আমার মতে প্রত্যেক জাতি উন্নতি-শীল। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে; কারণ, অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে মানবজীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। প্রত্যেক জাতি সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুজীবনের একটী সত্ত্ব। জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতিকেই বিস্তৃতি লাভ করিতে হইবে। আমি নিজে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সে জাতিকে কাজে কাজেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা কেবল তাহার বিস্তৃতির সাহায্য করিব। আমি নিরপেক্ষতাকে এবং ধর্ম্মকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, জাতীয়তার এই নীতিকেও আমি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করি, দেশের কাজ করা, জাতির কাজ করা মনুষ্যত্বের সাধনা। মনুষ্যত্বের সাধনা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা।"

বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যগুলি আজকাল বেশ ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে। সাহিত্যের ভাবগুলি ফুটাইয়া তোলার জন্য যতখানি প্রয়োজন, তার চেয়ে অন্যবিধ কল্পনা সাহিত্যের মর্ম্মে সত্যসত্যই আঘাত করে। শিক্ষা ও ব্যবসায় এক কথা নয়। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য দীন বাঙ্গালীর মর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে ততদিন আমরা উহাকে সাহিত্যের বিকাশ না বলিয়া বিলাস বলিব। সমাজ নিয়া, মানবজীবন নিয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে পারে সে সমাজের হিতকারী ত নয়ই—তাহাকে ঘাতক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মন্দকে ভালর মধ্য দিয়া চালাইলে সমাজের যতটা উপকার হয়, ভালকে মন্দের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিলে উহা কলঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই। সোনা অগ্নিদগ্ধ হইলে নির্ম্মল হয়, ভস্মাবলেপিত হইলে উহার রং বিবর্ণ হইবে বৈ কি? আজকাল পতিতার প্রতি কোন কোন লেখকের একটা অপরূপ শ্রদ্ধা দেখিতে পাই। পতিতার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে গিয়া কেহ কেহ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাহাও

দেখিতে পাই। অবশ্য জীবে দয়া ও শ্রদ্ধা সদন্তঃকরণেরই পরিচায়ক বটে। কিন্তু অধুনা সাহিত্যে যে প্রকারে করুণার স্রোত অবাধগতিতে বহিতেছে, না জানি উহা কোন্ দিন স্বর্গচ্যুত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সমাজ-ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্' কথাটা আমাদের মতে সাহিত্যেও খাটে বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা ত Direct ও Indirect ভেদে দুই প্রকারই হইতে পারে। যেমন, কোন পিতা শিশুকে বলিতেছেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে', পক্ষান্তরে, আর একজন বলিতেছেন, "কখনও মিথ্যা কথা বলিও না।" কোন্‌টা ভাল? আমাদের মতে প্রথমটা। কারণ, উহাতে 'সত্যের' অর্থ প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট, 'মিথ্যার' দিকে মোটে মাড়াইলই না। 'মিথ্যা' বুঝাইতে যাইয়া পরোক্ষে তাহাকে সে বিষয়ে কতকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়। অতএব, প্রথমটা Direct এবং দ্বিতীয়টা Indirect শিক্ষা বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন, 'মাতৃবৎ পরদারেষু'—পরস্ত্রীকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করিবে। মায়ের নামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই, এমন কি তেমন দাম্ভিকেরও হৃদয়ে সাময়িক একটা শ্রদ্ধা ও বিনতির ভাব আনয়ন করে—ইহাতে মনের কলুষ দূরীভূত হইয়া মানুষকে স্বতঃই নির্ম্মল পথে টানিয়া নেয়। পক্ষান্তরে বাইবেলে দেখিতে পাই,—

"Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart"—Mathew 5-28.

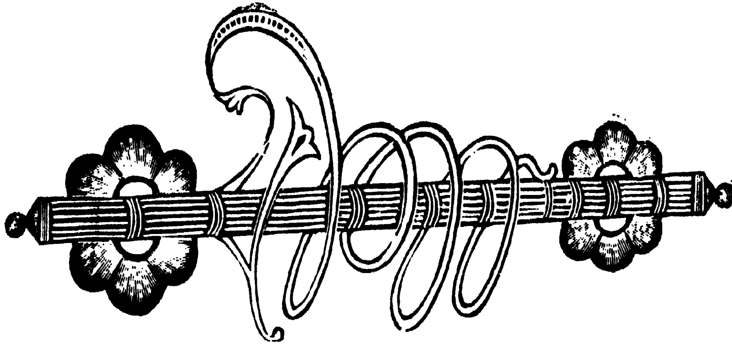
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে মনে মনে সেই স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে উপদেষ্টাকে প্রথমতঃ 'ব্যভিচার' কি তাহা শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে হইবে। ব্যভিচার বুঝিতে গিয়া শিক্ষার্থীর ইষ্ট কি অনিষ্ট হইবে তাহা সুধীজন বুঝিতে পারেন। গল্পে আছে, বুড়ী রাজপুত্রকে বলেছিল—বাপু, উত্তর দিকে যাইও না, বিপদ্ ঘটতে পারে। অমনি রাজপুত্রের মনে দুর্ব্বার কৌতূহল হইল সে উত্তর দিকে যাইবেই। মানুষের মন ত! যে দিকে বাধা পায় উহা সাধারণতঃ—সে দিকেই ছুট্‌তে থাকে। তাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, লেখকগণ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে কাটা উঠাইতে গিয়া পা-টীকেই কাটিয়া না ফেলেন। দুর্ব্বল, শ্রীহীন বঙ্গসমাজ আপনাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে, একবার উহার মুখের দিকে চাহিয়া লেখনী সংযত করিতে চেষ্টা করুন।

মাসিক সাহিত্যের আর একটা প্রতিকৃতি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠে। ওটা আর কিছুই নয়—উহার গাফিলতি বা পূর্ব্ব-কথিত ব্যবসায়-বুদ্ধি। দু'চারজন নামকরা লেখকের উপন্যাস হইলেই উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারে মাস মাস প্রকাশিত হয় এবং পাঠকের ধৈর্য্য হরণ করে—অনেক সময় দেখা যায় উহা হনুমানের ল্যাজের মত বর্দ্ধিত হইতে হইতে যোজনব্যাপী দীর্ঘ হয় এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। গ্রাহক সংরক্ষণের ইহা একটা উপায় নয় ত! যদি তাই হয় তবে উহা যত শীঘ্র সম্ভব পরিত্যাজ্য। পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষে হউক প্রতারণা—প্রতারণাই, উহার যে কোন নামই দাও না কেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ভারতবর্ষ'ই ধরা যাউক। উহার 'দিক্-শূল' অনেকের 'হৃদ্‌শূল' উপস্থিত করিয়াছে। শরৎ বাবুর 'শেষ প্রশ্ন' সেদিনকার হইলেও কোথায় ইহার শেষ হইবে কে জানে? নরেন বাবু 'খেলার পুতুল' লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আশা করি যথাসম্ভব সত্বর পুতুলখেলা শেষ করিয়া তিনি গুরুতর মায়ের সেবায় ব্রতী হইবেন। চারুবাবুর 'ধোকার টাটীর' ধোকায় পড়িয়া অনেকেরই চোখে বিষম ধোকা লাগিতেছে। আমরা বলি, চারুবাবু তাড়াতাড়ি টাটী ছাড়িয়া মন্দির গঠনে লাগিয়া পড়ুন। বাঙ্গালী দুষ্টগ্রহের জ্বালায় অমনি অস্থির, তায় আবার নরেশ বাবু তাহার ঘাড়ে আর এক নবীন 'দুষ্টগ্রহ' চাপাইয়াছেন। "বোঝার উপর শাঁকের আঁটি" কেন? বাঙ্গালীর গ্রহের ফের কবে দূর হইবে? যত সত্বর হয় ততই বাঙ্গালীর মঙ্গল।

ঢাকা, নবাবপুর—নারায়ণ-মেশিন প্রেসে শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত—১৩৩৪।



আনন্দিতা



তৃতীয় বর্ষ] মাঘ—১৩৩৪ [পঞ্চম সংখ্যা

লাঙ্গলের জন্ম।

(ইংরাজী কবিতাবলম্বনে)

শ্রীমতী সরসীবালা বসু

ধরণী তখন লভেছে জন্ম সূর্য্য কুক্ষি হ'তে,
আদিম মানব—প্রকৃতির শিশু নূতন বিস্ময়েতে—
দেখে চাহি চাহি চারি পাশে ঘেরা ঘন রহস্য-জাল,
জ্ঞানরশ্মির নবীন বিভার তখনো রাত্রিকাল।
ছিল একজন নিপুণ শিল্পী সবল সুদৃঢ় কায়,
ভাবে নিতি নিতি নব কর্ম্মের কি করিবে সদুপায়,
লৌহ তখন ধরার বক্ষে নূতন আবিষ্কার,
ভাবে সে কর্ম্মী লৌহে সে দিবে গঠন দিব্যাকার!
জ্বলে দাউ দাউ আগুণের শিখা—লোহা লাল অঙ্গার,
পেশল দুহাতে হাতুড়ী আঁকড়ি হানে সে বারম্বার—
আনন্দে তার মুখে ফোটে বাণী—জয়—শিল্পের জয়,
তরবারি আর বর্ষা গড়িব—ধরণীর বিস্ময়॥

তারপর—

নূতন অস্ত্র ফলকে বুঝি বা বিদ্যুৎ চমকায়,
সূর্য্য কিরণে করে ঝকমক—আঁখি বুঝি ঝলসায়;
দলে দলে আসে মুগ্ধ মানব লয়ে কত উপহার,
মণি মুক্তা ও হীরা জহরৎ আরণ্য-সম্ভার॥
বিনিময়ে লয় তরবাল আর বর্ষা সে খরসান,
আনন্দে সব করে কলরব—মুখরিত জয় গান;
জয় জয় জয় লৌহের জয় জয় শিল্পীর জয়,
কীর্ত্তি তাহার চির ভাস্বর অমৃত, অক্ষয়॥

তারপর—

কেটে যায় দিন—শিল্পীর মনে ক্রমে আসে অবসাদ,
শক্তির পণে কিনিল কিবা সে একি ঘোর পরমাদ,
অস্ত্রের বলে একি হানাহানি, একি এ অত্যাচার,
রক্তে ধরণী রাঙা হয়ে ওঠে—মায়া দয়া নাই আর,
মানবের মনে ছিল কোন পশু নিদ্রিত গুহালীন,
রক্তপিয়াসে জেগে ওঠে অই নির্ম্মম স্নেহহীন;
শিল্পী টুবাণ করে হায় হায়—একি এ কর্ম্মফল,
নিয়তি তাহারে কোন্ পথে নিতে নিলে কোন্ রসাতল।

তারপর—
সহসা একদা শিল্পীর চোখে জাগে উৎসাহ জ্বালা
পেশল দু' বাহু উর্দ্ধে বাড়ায়ে কহে—অস্ত্রশালা
নয় নিস্ফল—নয় নিস্ফল মোর জীবনের শ্রম,
ধেয়ানে ধরেছি যে ধন—সবারে দেবো সেই অনুপম ॥
ধরণীর বুকে লিখিব যে লেখা যুগে যুগে অক্ষয়,
সবুজ সরস শোভায় ক্ষেত্র হয়ে রবে শোভাময় ॥
তারপর—
শিল্পীর পণ হোলো সার্থক—সার্থক শ্রম তার,
তাহারি ধেয়ানে সেই প্রথম লাঙ্গল আবিষ্কার,
রক্ত পিপাসা ভুলে সব জন এলো সেথা দলে দলে,
শিল্পীর গড়া নূতন যন্ত্র লয়ে যায় কুতূহলে ॥
ভেদ ভাব ভুলি শেখে এক সাথে কৃষি শিক্ষার পাঠ,
কঠিন মাটির বুক চিরি চলে—লয়ে লাঙ্গল ঠাট ;
ধরণী উহাতে নহে কো ক্ষুন্ন—উর্ব্বরা হয়ে ওঠে,
নিত্য নূতন শস্য শ্যামলে রস-মঞ্জরী ফোটে ;
তরবারি আর বর্শা রহিল আত্মরক্ষা তরে,
শিল্পীর জয় গাহে নরনারী শ্রদ্ধামুগ্ধ স্বরে ॥

লজ্জাবতী ।

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত

[কথা-চিত্র]

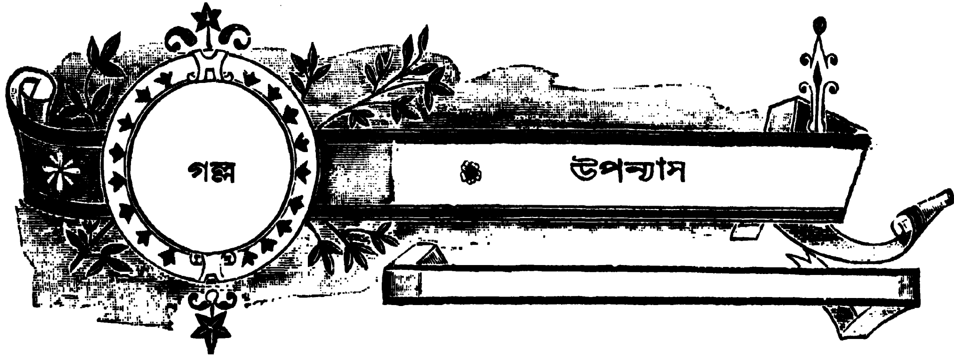
ওই যে একটি লতা সংকোচে একধারে স'রে আছে, ওকে কেউ দেখেও দেখে না। ও কারো পরশ সইতে পারে না। বাতাস একটু জোরে বইলে, আতঙ্কে চোক বোজে। ফাগুনের আগুন হাওয়া আমের মঞ্জরীর সুবাস মেখে আসে, সবাই তাকে আদরে আঁক্ড়ে ধরে ; ওর কাছে যেতেই ও মিলিয়ে যায়। ব্যাঙের গানে, চাতকের চীৎকারে, মাছরাঙ্গার কান্নায়, দারুণ নিদাঘ-শেষে বাদল আসে, সবাই তা'কে বুক পেতে নেয় ; ও একেবারে নেতিয়ে পড়ে।

ও তবে কা'কে চায় ?

আমি জানি—জানি, ওর মনের কথা জানি ; ও যা'কে চায় তা'কে পায় না। আমি দেখেছি দুপুর দিনে সারা সংসার যখন নিঝুম, পাখীরা পাতার কোলে লুকিয়ে, ও তখন পা ছড়িয়ে ব'সে সারা গা এলিয়ে দিয়ে দেখে—দেখি তো, আয়োজনের কি কিছু কম আছে! তবে সে আসে না কেনো ?

নিশীথে যখন চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, ও তখন নত-মুখে নীরব-চোখে কাঁদে, কেবল কাঁদে। আমি দেখেছি প্রভাত বেলায় ওর সারা মুখ অশ্রু-মাখা। ও এমন কোন কোমলকে চায়, যা'র পরশের স্পর্শ নেই ?

ওগো অপরশ, তুমি কবে আস্‌বে ?



নিশীথের আলো।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

স্কুল হইতে বাসায় ফিরিয়াই প্রণতি বিস্ময়ে দেখিল শরৎ বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছেন।

প্রণতির পায়ের শব্দ পাইয়াই তিনি চোখ ফিরাইলেন, পত্রিকাখানা সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "আপনার আসবার অনেক আগেই আমি এসে বসে আছি। আমি ভেবেছিলুম আপনি এতক্ষণ বাসায় এসেছেন।"

শরতের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সামান্য নগণ্য একটি টিচার সে, শরৎ যে তাহাকে এতটা সশ্রদ্ধ সম্মান দেখান ইহাতে প্রণতি অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে প্রতিনমস্কারটা সাড়িয়া লইয়া বিনীতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, আজ বাসায় ফিরতে সত্যই আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সাড়ে তিনটের সময় স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, এখন সাড়ে পাঁচটা বেজেছে দেখছি।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্কুলে কোন কাজ ছিল কি?"

কুণ্ঠিতা হইয়া প্রণতি বলিল, 'স্কুলে আমি ছিলুম না। স্কুলের একটি মেয়ের বড্ড অসুখ করেছে শুনে তাকে দেখতে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সেখানেই এতক্ষণ দেরী হ'ল।"

শরৎ বলিলেন, "কি অসুখ?"

প্রণতি উত্তর দিল, "জ্বর আর তার সঙ্গে সর্দ্দিও বেশ আছে। তারা ভারি গরীব, এমন অবস্থা নয় যে ডাক্তার এনে চিকিৎসা করায়। দিন গেলে খেতে পায় না,—

ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন, "খেতে পায় না?"

প্রণতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বই কি?"

শরৎ বলিলেন, 'তাদের নামটা জানতে পারি কি?"

প্রণতি বলিল, "মেয়েটির বাপের নাম হরিসাধন ঘোষ।"

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হরি ঘোষ? তাঁকে আমি চিনি। আমার কাছে তিনি দু'তিন দিন গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে একটি কথাও শুনতে পাই নি। সম্ভব তিনি কিছু সাহায্য চাইবার প্রত্যাশাতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিজে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নি, কেউ কোন কথা আমায় জানায়ও নি। আপনার মুখে এখন শুনে বুঝছি কতখানি আশা নিয়ে তিনি আমার কাছে যেতেন, বলতে না পেরে কতখানি ব্যর্থতা নিয়ে প্রত্যহ ফিরিতেন।"

প্রণতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তিনি ভারী গরীব, তাঁকে সাহায্য করলে বাস্তবিকই একটা যথার্থ কাজ হয়। আমি গিয়ে তাঁর ছোট মেয়েটির মুখে চুপি চুপি শুনতে পেলুম, আজ তাঁরা মোটেই খেতে পান নি। এমনি

নাকি তাদের প্রায়ই হয়ে থাকে। পাশে অনেক ভদ্রলোকেরই বাড়ী আছে, তাঁরা এই দুঃস্থদের দিকে চাইতে একেবারেই উদাসীন। সামনে একটি অভুক্ত পরিবার রেখে তাঁরা যে কি করে খেতে পারেন, আমি তাই ভাবি।"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু এই রকমই তো আবহমানকাল পর্য্যন্ত ঘটে আসছে, মিস বোস। কেউ বা পেট ভরে খেয়েও কত আহার্য্য পথের কুকুর ডেকে খাওয়াচ্ছে, কেউ বা একমুঠো খাবার জন্যে হাহাকার করে ফিরছে। এ যে ভগবানের দত্ত দান, সুতরাং এর কিছুতেই পরিবর্ত্তন হতে পারে না। সামনে দেখতেও পাচ্ছেন তাই তো।"

প্রণতি ঘৃণার সুরে বলিল, "ভগবানের দান বলবেন না, এ কথা বললে ভগবানের অবমাননা করা হয়। বলুন—মানুষের হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তি এটা। মানুষ ইচ্ছে করলে দেবতা হতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে সয়তানও হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার বিশেষত্ব এই যে—দেবতা হতে পারে খুব কম লোকে, কারণ তাতে একটু বেশী রকম স্বার্থশূন্যতার দরকার, তাতে নিজের দিকে লোকসানের ভাগটাই বেশী থাকে, কাজেই লাভ যে দিকে মানুষ সেই দিকেই যায়। আচ্ছা, বসুন একটু, আমি আসছি।"

ক্ষিপ্রপদে সে বারাণ্ডা ঘুরিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে শরৎ তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

মেয়েটির স্বভাব সত্যই বড় সুন্দর। অসঙ্কোচে নিজের মতটা—যাহা সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে একটুও দ্বিধা রাখে না,—তা ইহাতে যাহার যাহা খুসী সে তাহাই ভাবুক। ইহার মনটা বেশ সরল, সতেজ, কোথাও একটু কুণ্ঠিত ভাব নাই, যেখানে তাহার কোনও কথা ঠেকিয়া যাইতে পারে। শরৎ অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন শান্ত, নম্র অথচ নিজের সত্যমত প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়ে আর একটিও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। নিজের আত্মমর্য্যাদা অটুট রাখিয়া সে এখন সকলেরই সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, কোনও সঙ্কীর্ণতার জন্য তাহাকে ঠেকিয়া যাইতে হয় না।

একটু বাদেই প্রণতি ফিরিয়া আসিল। স্কুলের কাপড় জামা ছাড়িয়া ফেলিয়া সে যত সত্বর পারিয়াছে চলিয়া আসিয়াছে। একখান' চেয়ার টানিয়া লইয়া একটু তফাতে বসিয়া সে বলিল, 'কিন্তু—আপনি হঠাৎ এখানে এমন সময়ে এসেছেন কেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি।"

শরৎ গম্ভীরমুখে বলিলেন, "আপনি যদি জিজ্ঞাসা করতে একেবারেই ভুলে যেতেন তাও আমায় বলতেই হত, কারণ গরজটা আমারই। জানেন তো যার গরজ বেশী, আগ্রহও তার অনেক বেশী। গরজ বড় বালাই, মিস্ বোস,—যার নেই, সে বেঁচেছে।"

তাঁহার কথাবলার ধরণ দেখিয়া প্রণতির হাসি আসিতেছিল; সে হাসি দমন করিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "আপনার কি গরজ তাই বলুন। আমার মত সামান্য একটা টিচারের কাছে আপনাকে গরজের বালাই বয়ে নিয়ে আসতে হয় এইটেই ভারি আশ্চর্য্য বলে আমার কাছে ঠেকছে।"

শরৎ খানিক হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, ওই অতিরিক্ত বিনয়যুক্ত কথাগুলো আপনাকে ছাড়তে হবে। আপনি সামান্য টিচার, আর আমি মহামান্য জমিদার, এ কথাগুলো এ রকম জায়গায় প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি বলছি,—যখন জমি জমা নিয়ে কোনও দরকার পড়বে তখন আপনি আমায় মহামান্য জমিদার মনে করে আমার দরবারে যাবেন, অন্য সময়ে সামান্য মানুষ হিসাবেই দেখবেন। আমিও জানি আর আপনিও জানেন, প্রজা হিসাবে আপনাকে কখনই আমার সামনে যেতে হবে না।"

এবার প্রণতি স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল। শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাসছেন যে,—?"

প্রণতি বলিল, "আপনার কথা শুনে।"

শরৎ বলিলেন, "না, সত্যই আমি যা বলছি তা ঠিক। বেশ জানবেন মিস বোস, সংসারের স্নেহত্যক্ত যদি কোথাও প্রকৃত স্নেহের আস্বাদ পায়, সে জায়গা আর সে ছাড়তে পারে না। তার চাওয়ার চেয়েও অনেক অসঙ্গত দাবী সে করে বসে থাকে—যিনি কখনও তাকে একটু স্নেহ দেখিয়েছেন তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন; শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে

বলতে হয়—ছেড়ে দাও, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। এই দেখুন না আপনি আমায় একটু ভাল কথা বলেছেন আমি ভাবছি আমি বুঝি আকাশের চাঁদখানাকেই হাত পেতে নিতে পেরেছি, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা আরজি পেশ করতেও এসেছি। আপনি এতে বিরক্ত হবেন নিশ্চয়ই—"

বাধা দিয়া শশব্যস্তে প্রণতি বলিয়া উঠিল, "বিরক্ত হব অমন কথা বলবেন না। আমি আপনার সব কথা শুনব—যদি আপনি মুখ ফুটে বলতে পারেন।"

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল। ছিঃ, কাহাকে কি বলিতেছে তাহার ঠিক নাই; তাহার কথা গুলা যেন সকল দূরত্ব ঘুচাইতে চাহিতেছে।

শরৎ তাহার কুণ্ঠিত ভাবটা অতি সহজে ধরিতে পারিলেন. স্বভাবতঃ শান্ত মুখে তিনি বলিলেন, "কথাটা যা বলেছেন তাতে সন্দেহের কোন হেতু নেই, কিন্তু তাই বলে আপনার অনর্থক লাল হয়ে উঠবার হেতু থাকতে পারে বলেও মনে হয় না মিস্ বোস। আপনি তো জানেনই আমি কতটা সঙ্কোচে, কুণ্ঠায় নিজকে গুটিয়ে রাখি, অনেক কথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনে, সে গুলো আমার মুখে এসে ফিরে যায়। কিন্তু আজ সে রকম হবে না মিস বোস, কথা আমার ফুটিয়ে তুলতেই হবে, যেহেতু সঙ্কোচ লজ্জা অন্য সময় দরকারে এলেও এ সময়ে অপকারই সাধন করবে। আমি বড় বিপদগ্রস্ত, আমার সে বিপদ হতে উদ্ধার করতে আপনি বই আর কেউ নেই। মাণিককে দেখেছেন তো?"

সেই শিশুটির কথা প্রণতির মনেই ছিল. অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দীপ্তিহীন করুণ মুখখানা সে অন্তরচ্যুত করিতে পারে নাই। সে উত্তর দিল, "দেখেছি বই কি।"

শরৎ বলিলেন, "তার ভার আপনাকে যদি আমি দিতে চাই, নিতে পারবেন কি?"

প্রণতি এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। একবার ভাবিয়া লইল এই শিশুটিকে লইয়া শরৎকে কতখানি বিব্রত হইয়া উঠিতে হয়, সকল কাজের মধ্যে সেই শিশুটির চিন্তা মনে জাগিয়া থাকে।

সে রাজি হইয়া গেল, বলিল, "আমি তাকে নিতে রাজি আছি কিন্তু আপনি যে তাকে এখন এমনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছেন, কোথাও যাবেন কি?"

অন্যমনস্কভাবে শরৎ উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমায় উপস্থিত কিছু দিনের জন্যে পশ্চিমে যেতে হচ্ছে। বেশী দিনের জন্যে নয়, মাস খানেকের জন্যে ছেলেটিকে আপনার হাতে দিয়ে যাব, এই মাসখানেক আপনাকে একে দেখতেই হবে। আমি যে এ বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাব তার যো নেই। ছেলেটা যেমন দুষ্ট তেমনি নোংরা। নিজের বাড়ীতেই তাকে আমি শাসন করে রাখতে পারিনে, বিদেশে পরের কাছে নিয়ে যাব কি করে? আজই সকালে এমন কাণ্ড করে বসেছে যা শুনলে আপনি পর্য্যন্ত হাসবেন। আপনাকে তাই আজ হতে বলে রাখছি, সে কিন্তু কোন কথাই বলবে না। পেটের ব্যারামেই সে ছেলেটা গেল, আর লোভও আছে তার তেমনি। খেতে দিন বা না দিন সে চুরি করে খাবেই,- তা আপনার ঘরে যা থাক না কেন। আর রাত দুপুরে তার ধাক্কা সামলাতে আমার চাকরগুলোর প্রাণান্ত হয়ে যায়।"

প্রণতি বলিল, "আমার বাপুয়া আছে, দু'জনে আমরা তাকে দেখব। আপনি যা বলছেন তা যথার্থই বটে। দেখুন ছোট বেলা হ'তে মায়ের স্নেহ না পেলে ছেলেপুলেরা এমনি হয়ে যায়, তারা সংসারের সকল শোভার আকর হয়েও অসীম দুঃখের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষে কতদূর যত্ন করতে পারে, কতটা আর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে? আপনাদের কাজ বাইরে, ছেলেপুলে কেমন করে মানুষ করতে হয় আপনারা তার কি জানবেন? তারা কতটা খেতে পারে সে আন্দাজ না রেখে কতকটা গিলিয়ে দেন; যখন ক্ষিধে না থাকে, চোখের লোভে পড়ে তারা তখনও গিলে যায়, তারই ফলে অজীর্ণ, উদরাময়ে ভোগে। আপনাকে আমি এরজন্যে অপরাধি করছি নে, আপনি যা করেছেন তা খুবই হয়েছে, অনেকে এ রকম পারেন না। আপনি তাকে আমার কাছে রেখে যান, মাসখানেক বাদে ফিরে তাকে দেখবেন অন্য ভাবে। চুরি করে খাবার কথা বলছেন, সেটাও এই কারণেই হয়। রোগে ভুগে ভুগে বড় মানুষেরই লোভ হয়, তারাও না পেলে চুরি করে খেতে ভোলে না, ও তো ছেলে

মানুষ। আপনি ওষুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবেন, আমি তার আর সব ভার নেব।"

শরৎ কৃতজ্ঞনেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে বাঁচালেন। এই অস্পৃশ্য ছেলেটার ভার দুনিয়ায় আর কেউ নিতে চায় না, এতে আমি যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট পাই তা আর কি বলব। এখন দেখছি দুনিয়ায় আপনার মত লোকও আছে যে তাকে অস্পৃশ্য জেনেও গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত হয় না।"

প্রণতি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল. কি বলিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার কুণ্ঠিত লজ্জিত মুখখানার পানে তাকাইয়া শরৎ বলিলেন, "আপনার প্রশংসা করছি বলে আপনি বড় লজ্জিতা হয়ে উঠছেন। আপনাকে লজ্জা দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। বাধ্য হয়ে আপনার প্রকৃত গুণটা আমার মুখ দিয়ে বার করতে হ'ল, সেজন্য মাপ করবেন। আমি কাল ভোরেই রওনা হব, আজই তাহলে মাণিককে পাঠিয়ে দেব গিয়ে। আমি হিরণ্ময় বাবুকে বলে যাব, তিনি প্রত্যহ সকালে—যখন আপনি বাড়ী থাকবেন তখন এসে মাণিককে দেখে ওষুধ দিয়ে যাবেন। আর তার থাকার জন্যে কিছু খরচ এনেছি; জানি—এতে আপনাকে আরও বেশী রকম লজ্জা দেওয়া হবে,—তবু কি জানেন,—আমি—"

তিনি নোটের তাড়া পকেট হইতে বাহির করিতেই প্রণতি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না না; মাপ করবেন, আমি তার জন্যে এক পয়সাও নেব না। ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান, আমার দরকার নেই।"

শরৎ বলিলেন, "আপনি নিতে চাইবেন না তা আমি জানি মিস বোস। কিন্তু আমারও তো কর্ত্তব্য আছে একটা। আপনি স্কুল হতে অতি সামান্যই বেতন পান, এতে কোনক্রমে আপনার চলে মাত্র, এই ছেলেটাকে খাওয়াবেন কোথা হতে?"

প্রণতি বলিল, "সে যতই কম বেতন হোক না, তবু আমি ওই ছেলেটির জন্য টাকা নিতে পারব না। মনে করুন, তার বাপ যদি আপনার কাছে ছেলেটিকে না দিয়ে আমারই কাছে আনত, আমাকেই তো তাকে নিতে হতো। আমার যদি একটি ভাই কি বোন থাকত, আমার কি তাকে এনে পুষতে হতো না? আপনাকে কি তার জন্যে আবার নূতন খরচ দিতে হতো? এও মনে করুন তেমনি। মনে করুন, এ আমার সেই ছোট ভাই, আমার কাছে সে থাকবে তার জন্যে আপনার কিছু দেওয়ার কথা মুখে আনাই অন্যায়।"

নোটের তাড়াটা হাতে লইয়া একান্ত নিরুপায় ভাবে শরৎ বলিলেন, "তবে এ গুলো দিয়ে কি করব এখন?"

প্রণতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "টাকা রাখবার জায়গা পাচ্ছেন না, বড় সাংঘাতিক কথা তো তবে।"

শরৎ হাসিলেন, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সাংঘাতিক কথাই বটে। মাতালের হাতে টাকা বেশীক্ষণ থাকে না, সেটা বোধ হয় আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। দেখুন, আমি নিজে মাতাল সেই জন্যেই মাতালকে আন্তরিক ঘৃণা করি। পথে এই টাকা নিয়ে যেতে যেতেই সয়তান এসে মাথায় চাপবে, তারপর —তারপর দেখব আমার হাতে একটা আধলাও নেই, রিক্ত হাতেই বাড়ী ফিরে গেছি।"

প্রণতি একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করুন না কেন? যখন এমন অবস্থা আপনার, তখন এ টাকাটা সেই অভুক্ত পরিবারকেই দিয়ে যান না। তারা খেয়ে বাঁচবে, ভগবানও আপনার মঙ্গল করবেন।"

হাসিয়া শরৎ বলিলেন, "শেষের কথাটা ছেড়ে দিন, ভগবান আমার যা মঙ্গল করছেন তা আমি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি। আমি কোন দিনই নিজকে বিশ্বাস করিনি, নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের 'পরে ফেলে দিয়েছিলুম, তিনি বড় বিশ্বাসীর মত কাজ করেছেন, একে একে আমার সবই কেড়ে নিয়েছেন। আমায় এমন জায়গায় এনে ফেলেছেন সেখানকার কথা মনে হলে আমিই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। ভগবানের মঙ্গলের কথা আর বলবেন না মিস বোস, তিনি অশেষ কল্যাণময়—তাই আজ আমি সৌভাগ্যের তুঙ্গে উঠেও একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়েছি। আজ আমার কি এমনই অবস্থা হতো মিস বোস,—আমিও যে আজ একটা মানুষ, কতখানি উপরে উঠতে পারতুম, লোকে আমার কাছ হতে তাকে পাওয়ার আশাই করেছে।

আমি যে আজ ঘৃণিত, অপদার্থ, এর জন্যে দায়ী কে বলুন দেখি!"

প্রণতি শান্ত কণ্ঠে বলিল, "দায়ী আপনি নিজে। ভগবান আপনার সামনে সরল পথ বিস্তৃত করে রেখেছেন, কিন্তু আপনি সে পথে না গিয়ে যে পথটা বাঁকা, বিপদসঙ্কুল সেই পথে চলেছেন। এতে দোষ কার,—আপনার না ভগবানের বলুন দেখি? আপনি সব বুঝেও ভগবানের 'পরে দোষ চাপাচ্ছেন এইটেই ভারি কষ্টের কথা। ভগবান আপনাকে দেন নি কি, তাই বলুন দেখি? আপনার জ্ঞান দিয়েছেন যাতে ভাল মন্দ বিচার করতে পারেন, বুদ্ধি দিয়েছেন—বিবেচনা করতে পারেন, চোখ, কান, কথা বলার শক্তি, নাক সব দিয়েছেন যাতে আপনি নিজে সব দেখতে পান, শুনতে পান, কথা বলে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন? আপনাকে অটুট স্বাস্থ্য দিয়েছেন, আপনাকে কোন অঙ্গহীন করেন নি, সব থাকতেও আপনি যদি সদ্ব্যবহার না করতে পারেন, সে দোষ কার তাই বলুন দেখি! আপনি দরিদ্রের ঘরে জন্মান নি, ধনীর ঘরে জন্মেছেন, ধনের সদ্ব্যবহার করবার জন্যেই নয় কি? এ রকম ভাবে নষ্ট করবার জন্যে কখনই নয়, কিন্তু আপনি নিজের দোষে নিজে অধঃপাতে যাচ্ছেন যে। এর জন্যে দোষ দিন নিজেকে, ভগবানকে দোষ দেবেন না। মানুষের আয়ু অবশ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে যদি দুষ্কর্ম্ম করে তার নিজের দেহকে চিররুগ্ন করে ফেলে সে দোষ কারও নয়, নিজের।"

শরৎ টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

প্রণতি বলিতে লাগিল, "আপনি যতটা হতাশ হয়ে পড়েছেন এতটা হতাশ হয়ে পড়বার কোন কারণ নেই, কেন না, যদি ভাল হওয়ার ইচ্ছা করেন, এখনও ঢের সময় আছে ভাল হতে পারেন। কত লোক প্রথমে আপনার মত থাকে, তারাই এত ভাল হয় যে লোকে তাদের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দেয়।"

শরৎ মুখ তুলিলেন, ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "অত ভাল আমি হতে চাই নে, মিস বোস, কতকটা হতে পারলে বাঁচি। আপনি আমার উপকারী বন্ধুর মত কথা বলছেন, যদি ভাল হতে পারি তবে আপনার উপদেশেই হতে পারব। যদি ভাল নাও হতে পারি, আপনার কথা আমি জীবনে ভুলব না, কারণ সংসারে এসে আপনার কাছে ছাড়া ভাল হওয়ার উপদেশ আর কারও কাছে পাইনি। যাক, ছেড়ে দিন ওসব কথা, একটা কথায় অনেক কথা এসে পড়েছে। টাকা আপনার কাছে রইল, আপনি তাদের পাঠিয়ে দেবেন।"

প্রণতি বলিল, "আমি আপনার এ অন্যায় আবদারের প্রশ্রয় দিতে পারব না। আপনার নাম করে আমি যদি তাদের টাকা দিতে চাই, সহজেই লোকে একটা কথা বলে বসবে; আশা করছি সে কথা আমাকে আপনি শুনতে দেবেন না।"

শরৎ যেন অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিলেন, ত্রস্ত ভাবে নোট লইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছেন, আমার এ কথা মোটেই মনে হয়নি। আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, যাওয়ার পথে তাদের দিয়ে যাব এখন। বাড়ীতে আর এ টাকা নিয়ে যাব না সে কথা ঠিক।"

তিনি উঠিলেন।

প্রণতিও উঠিল। তাঁহার পিছনে চলিতে চলিতে বলিল, "তাই দিয়ে যাবেন। আর বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবেন, ভুলে যাবেন না যেন।"

"ভুলব?" শরৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, হঠাৎ প্রণতির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কখনই ভুলব না মিস বোস, আপনার এ দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলব না।"

প্রণতি কম্পিত হাতখানা টানিয়া লইবার পূর্ব্বে শরৎ সেই সুন্দর হাতখানা ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, প্রণতি চকিতে অনেকটা পিছনে সরিয়া গেল।

কৃতজ্ঞ শরৎ বলিলেন, "আবার একমাস পরে ফিরে এসে দেখা হবে, একমাসের মত বিদায় নিলুম।"

হাসিয়া তাহার পর বলিল, "এসে দেখব এই দুর্দ্দান্ত ছেলেটাকে কেমন করে বশে আনতে পেরেছেন। আপনার পরিচয় এইবারই বিশেষ রকম পাওয়া যাবে।"

মিস বোস হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটিল না।

শরৎ চলিয়া গেলেন।

প্রণতি ফিরিয়া আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। হাতের যেখানে শরৎ ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়াছিলেন সেখানটা যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল। প্রণতি পলকহীন নেত্রে হাতের পানে তাকাইয়া রহিল।

হৃদয়ে তাহার যে তুফান উঠিয়াছিল বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পায় নাই।

সন্ধ্যার সময়ে মাণিক আসিয়া পঁহুছিল। বাপুয়া মহানন্দে তাহার এই ক্ষুদ্র বন্ধুটীকে গ্রহণ করিল; তাহার উৎসাহ দেখে কে? কিন্তু প্রণতি যতটা আনন্দ পাইবে ভাবিয়াছিল, ততটা আনন্দ কিছুতেই লাভ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় যেন গুরুভারে অবসন্ন হইয়া রহিল।

(৯)

শরৎ চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে ইন্দুরাণীর ভাই মণীশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে ইন্দুর চেয়ে কয়েক বৎসরের ছোট হইলেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল বেশী। ইন্দু জানিত তাহার ভাইয়ের মত বুদ্ধি জ্ঞান আর কাহারও নাই।

ছেলেটী পাতলা ছিপছিপে ধরণের কবি প্রকৃতির লোক। বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, পরীক্ষা দিয়া পাস করিতে পারে নাই, সেটা অতিরিক্ত কাব্য-প্রিয়তার জন্য। কোন কাজেই মাথা স্থির রাখিতে পারে না, এক কাজ করিতে আর একটা ভাবে, কাজেই হাতের কাজ মধ্য পথে থামিয়া যায়। কয়েকখানা মাসিক পত্রিকায় ইতিমধ্যে তাহার প্রকাশিত কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় সে বন্ধুসমাজে কবি আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

এখানে আসিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল নিশ্চিন্তভাবে এবার সে কাব্যালোচনা করিতে পারিবে, কোন দিককার গণ্ডগোলের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে না। নির্ঝঞ্ঝাটে সে দুইটা খাইবে আর দিনরাত লিখিবে।

কিন্তু এখানে আসিয়া দিদির মুখে যাহা শুনিল তাহাতেই তাহার সুখের আশা মিলাইয়া গেল। সে খানিক গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সে চিরদিন দারিদ্র্যে দিন যাপন করিয়াছে, ভাবিয়াছিল দিদির কাছে আসিয়া একটু বাবুয়ানা করিবে; দু'পাঁচজন বন্ধুকে আনিয়া নিজের প্রভুত্ব দেখাইবে। এখন দেখিল তাহার প্রভুত্ব সাজিবে না, একজন আছে যে বাধা দিবে।

অভিমানে, দুঃখে চোখের জল মুছিয়া ইন্দু বলিল, "বুঝেছিস মণি, সে আমাদেরই গ্রাস্থের মধ্যে আনতে চায়না, খুব নীচু হয়ে এসে ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে, এখন অবাধ প্রভুত্ব করে নিচ্ছে। আমি জমিদার, সম্পত্তিতে আমারও ছয় আনা অংশ আছে, কিন্তু সে নাকি ইচ্ছা করলে আমার এ দাবী অগ্রাহ্য করতে পারে, হয় তো এমন সব প্রমাণ এনে ফেলবে যাতে আমার এ সম্পত্তির কিছুতেই দাবী থাকবে না। বল দেখি, তাই কি হতে পারে, সত্যিই কি তাই ও করতে পারে?"

শুধু হাসিয়া মণি বলিল, "এও কি একটা কথা হতে পারে দিদি? কে তোমায় এই সব কথা বলে ভয় দেখিয়েছে দেখছি। তুমি আলাদা সে আলাদা তোমার আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি তাই বল দেখি।"

ইন্দু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বলাতো সহজ ভাই, কিন্তু আমার মনে হয় সে সব করতে পারে। কে সে? এই প্রশ্নের এমন একটা উত্তর পাওয়া যায়, যার পরে আর কোন কথা বলতে পারা যায় না।"

মণীশ বলিল, "কি সে উত্তর?"

ইন্দু বলিল, "যথার্থতঃ সেই সব বিষয়ের উত্তরাধিকারী, আমার এতে কোন অধিকার নেই কারণ আমি সন্তানহীনা বিধবা। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এই ছয় আনা বিষয় ভোগ করতে পারব তার পর সবই তার।"

মণীশ বলিল, "তাইতেই তুমি ভয় পাচ্ছো?"

ইন্দু বলিল, "ভয় পাইনি, তবে একটু ভাবনা হয় বটে।"

মণীশ অবহেলার সহিত বলিল, "মেয়ে কিনা তাই অল্পেতেই ভেঙ্গে পড়। বেশকথা, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে সম্পত্তি তোমার; এখন তুমিতো ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পার।"

ইন্দু বলিল, 'তা হওয়ার যো নেই। সন্তানহীনা বিধবার অভিভাবকরূপে দাঁড়িয়েছে সে,—সে জানিয়েছে আমি হয় তো যা তা করে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলব সেইজন্য

সে অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে আমার পানে চেয়ে আছ তার মতানুসারে না চললে সে নাকি তার সম্পত্তি হতে আমায় বঞ্চিতা করবে, সে অধিকার তার আছে। শুনেছি নাকি আমার স্বামীর এ সম্পত্তিতে কিছুমাত্র অধিকার ছিল না, শরতের বাপ দয়া করে জীবন সর্ত্তে তাঁকে এই ছয় আনা বিষয় ভোগ করতে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যেত, শরৎ দয়া করে আমার জীবন সর্ত্ত দিয়েছে অর্থাৎ এর এতটুকু কিঞ্চিৎ অপব্যয় করতে পারব না, যখন যা করতে হবে তার অনুমতি নিয়ে করতে হবে, অথচ আমি ছয় আনি জমীদার গ্রামে প্রসিদ্ধ থাকব। আমি বেঁচে থাকতে অবিবাহিত বা নিঃসন্তান অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তবে আমি দশজনকে ডেকে আমার সম্পত্তি যা খুসি তাই করতে পারি। যত দিন সে বর্ত্তমান থাকবে ততদিন কিছু করবার অধিকার আমার নেই।”

মণিশ খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, “সবই তো পাকা বন্দোবস্ত হয়ে রয়েছে, তবে আমায় টেলিগ্রাম করে আনার দরকার কি ছিল? আমি ভেবেছিলুম না জানি কি ভয়ানক কাণ্ডই বেধে গেছে, সেই জন্যে ছুটে এসেছি।”

রাগ করিয়া ইন্দু বলিল, “পাকা বন্দোবস্ত কিসের? এত কাল আমি সম্পত্তির মালিক হয়ে ভোগ করে এসেচি আজ ওর কথাতে আমি এত সহজে এমন ভাবে এর সর্ত্ত ছেড়ে দেব, এই কথাতে রাজি হয়ে যাব?”

মণিশ হতাশ ভাবে বলিল, “তা আমি কি করব?”

ইন্দু বলিল, “শোন কথা একবার,- বলে আমি কি করব? তুই যে পুরুষ মানুষ রে, তুই যা পারবি, আমি কি আর তাই পারব, নইলে তোরে আনারই বা আমার কি দরকার ছিল?”

মণীশ বলিল, “এখন আমায় কি করতে হবে তাই আগে বল তো, তারপর যা ভাববার, করবার তা আমি ভেবে করব এখন।”

ইন্দু বলিল, “শরতের ম্যানেজার আছেন শ্রীনাথ কর, অবশ্য তিনি আমায় সব পরামর্শ দিলেও আমি তাঁতে বিশ্বাস করতে পারিনি,—পারবও না। যে নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে মুনিবকে বিপদগ্রস্ত করতে পেছনে হটে না, আমায় সহায়হীনা দেখে এর পর আমারও তো সর্ব্বনাশ করবে। সে নাকি বড় চালাক তাই আমায় দিয়ে শরতের সর্ব্বনাশ করিয়ে শেষকালে আমার সর্ব্বনাশ করতে চায়। এ রকম প্রকৃতির লোককে আমি কিছুতেই পছন্দ করিনে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা সবই করতে পারে, অসাধ্য কিছু দুনিয়ায় নেই। তবু লোকটাকে হাতে রাখতে হবে, কেন না আমার অনেক কিছু প্রমাণ এরই হাতে; আগে শরৎকে জব্দ করে তারপর একে জব্দ করতে বেশীক্ষণ লাগবে না। তুই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সব বুঝিস, সব বুঝে কাজ করতে পারবি এ আশা আমার আছে, সেই জন্যেই তোকে এনেছি।”

মণীশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “কিন্তু তুমি তো জানো দিদি, আমি বেশী গণ্ডগোল পছন্দ করিনে, একটু নির্জ্জনতা পছন্দ করি। যাই হোক, তোমার কাজটা শেষ করে দিলে আমায় কিন্তু সেই নির্জ্জনতাটুকু দিতে হবে। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, জীবন পণ করে তোমার কাজ শেষ করে দেব তুমি আগে একটা কাজ কোরো; একখানা দরখাস্ত লিখে ফেল, সেই দরখাস্তখানা আমি দাখিল করে দেব, যাতে শরৎকে জব্দ করতে পারি তার চেষ্টা করব। তোমায় মেয়ে মানুষ পেয়েছে, বেশ চোখ রাঙিয়ে শাসন ক'রে নিচ্ছে, এখন আর সহজে তা করতে হচ্ছে না।”

উৎসাহিত ভাবে ইন্দু বলিল, “তাই কর ভাই, ওকে একটু ভাল রকম করে জানাতে হবে-- কথায় কথায় চোখ রাঙানীর ধার আমি ধারি নে। হলই বা সে দশ আনি আমি ছয় আনি। সে আমার কে, কোন অধিকারে সে আমার অভিভাবক হতে চায়?”

মণীশ বলিল, “বোসো, এই তো সবে এলুম, দুদিন যেতে দাও, চাল চলনটা আগে বুঝে নেই। কাউকে জব্দ করার ইচ্ছে যদি হয়, জব্দ করতে বড় বেশীক্ষণ দেরী হয় না তা জানো? যতদূর শুনেছি তাতে জেনেছি শরতের অন্তরঙ্গ বন্ধু এখানে কেউ নেই, সকলেই তাহাকে অল্প বিস্তর বিদ্বেষের চোখে দেখছে। দেখবে নাই বা কেন?

যারা কর্ম্মচারী তারা মনে ভাবে মনিব দূরে থাক, তা হলে তাদের এই সুবিধা হয় যে নিজেদের ইচ্ছামত তারা জিনিষ লুটতে পারে। শরৎ এখানে আসায় যাদের অল্পবিস্তর স্বার্থহানি হয়েছে তারাই তার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। রাগ কোর না দিদি, আমি তোমার কথা বলছি নে, তুমি যেন ভেব না, আমি তোমায় উদ্দেশ করে এ সব কথা বলছি। জগৎটাই যে স্বার্থ-ভরা তাই যার স্বার্থে আঘাত পড়ে সেই বিরক্ত হয়, রাগ করে। এইসব স্বার্থ পর লোকদের দিয়েই অনেক কাজ পাব, তা তুমি দেখে নিয়ো। যে আগুন জ্বালাব সে আগুণে ইন্ধন যোগাবে এরাই। যেমন করেই হোক, শরৎকে আগে এখান হতে সরাতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে সব দিক গেঁথে ফেলতে হবে। শরৎ এখানে থাকতে বিশেষ কিছু কাজ যে হবে তা বোধ হয় না।"

ইন্দু বলিল, "সে কথা সত্যি, এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, চারদিকে চোক রয়েছে, কারও কিছু করবার যো নেই। ভারি সতর্ক লোক, যে কাজ করে তা কাঁচা নয়।"

মনীশ বলিল, "তুমি বলেছ বাড়ী নেই, কোথায় গেল ?"

ইন্দু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কে জানে, আমায় কি কোন কথা শুনতে দেয়, আমি যে ওর শত্রু। একটা বাবাজি, না চাঁড়াল—কার ছেলে রেখেছিল কাছে, যাওয়ার আগের দিন আমায় সেই ছোঁড়াটাকে দিতে এসে ছিল। মাগো, আমি সেই বাগদী ছোঁড়াকে নেব, মনে করলেও গায়ে কাঁটা দেয়।"

মনীশ বলিল, "তারপর সে ছোঁড়ার কি হ'ল, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বুঝি ?"

ইন্দু বলিল, "না, কোথায় কার কাছে রেখে গেছে কে জানে ? ঝির কাছে খবর পেলুম, এখানকার মেয়ে স্কুলের টিচার নাকি তাকে নিয়েছে। তা হতে পারে, ওরা জাতে খৃষ্টান, যা করে তা মানিয়ে যায়, তা বলে আমাদের কি মানায় ? আমার পূজার্চ্চনা আছে, সন্ধ্যাহ্নিক আছে, ও ছোঁড়ার ছায়া মাড়ালে যে আমাদের স্নান করতে হয়।"

ঘৃণায় ইন্দু বার কত শিহরিয়া উঠিল।

"আর শরতের কথা বলবি ? তার কি জাত জন্ম কিছু আছে ? খৃষ্টানদেরও সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে, এর তা কিছু নেই। ভগবানের কথা বললে কাণে হাত চাপা দেয়, সে নামটা কাণে গেলেও তার যেন মহাপাপ হবে। ওর আবার জাত জন্ম, ওর তো সবই গেছে। ছিঃ ছিঃ, ঘেন্না ধরালে, বাপ পিতামহের নাম ডুবালে। জমীদার লোক কিনা, সবাই তবু খোসামোদ করে, নইলে টেঁকা দায় হতো। যদি অন্য কেউ হতো, এতদিন একঘরে হয়ে থাকতে হতো।"

মনীশ চুপ করিয়া রহিল। কারণ এ বিষয়ে দিদির সহিত তাহার মতের মিল হইবে না ইহা জানিত সত্য কথা। সে ছিল কতকটা সেই প্রকৃতির যাহারা জাতি ও ধর্ম্মকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না, অসীমের মধ্যে যাহারা নিজেদের বিস্তার করিয়া দিতে চায়।

ভাইকে সব শুনাইয়া, সব বুঝাইয়া ইন্দু কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এখন হইতে আর তাহাকে সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে না ইহাই তাহার বড় আনন্দের বিষয়।

(ক্রমশঃ)

উপেক্ষিতা।

শ্রীনীহারকুমারী দেবী

তরী যায় ধীর বায় যমুনায় বাহিয়ে,
ঢেউগুলি মাথা তুলি খোঁজে কারে চাহিয়ে ?
কালো জলে নভঃতলে ছায়াসম ভাসিয়া,
তরী চলে, কোন ছলে বায়ু বহে শ্বাসিয়া !
কেগো ধনি রূপখানি তরীখানি মাঝেতে ?
বিরহিণী কি রমণী বিষাদিনী সাজেতে ?
অতি মিঠি প্রেমদিঠি আঁখি দুটি ভরিয়া ;
কার তরে হেন করে ঝরে তাহে দরিয়া ?
ওলো এই কিলো সেই সোহাগিনী রাধিকা ?
বৃন্দাবন সে মোহন শ্যাম-প্রাণ-অধিকা ?
সে নিঠুর যবে দূর মথুরায় চলিয়া
গেল তদ্ গত যত গোপী-চিত ছলিয়া,
রাধিকার দুঃখ ভার সে কি আর বুঝে না ?
রমণীর নব নীর হৃদি আর খোঁজে না ?
পরে বর্ম্ম রাখে ধর্ম্ম ধর্ম্মে আর নাহি চায়,
সখিগণে জনে জনে বলে তাই রাধিকায় !
কত আর দুঃখভার সুকুমার পরাণে
সহে তাই দেখ রাই কারো কথা না মানে !
বিরহিণী উন্মাদিনী ধৈর্য্যখানি টুটিয়া,
গিয়েছিল বুঝি কিলো মথুরায় ছুটিয়া ?
একবার দুঃখভার প্রিয়-পদে রাখিতে,
একবারে সে নিঠুরে নিজ চোখে দেখিতে !
কালিন্দীর কালো নীর আজো মনে পড়ে কি ?
তীরে তার সে বিহার আজিও সে স্মরে কি ?
হায় নারী রীতি তারি বুঝেও কি বুঝে না ?
সে যে আজ কর্ম্মরাজ ! গত প্রেম কুজনা
মনে তার হয় আর কভু স্থান পাবে কি ?
বৃন্দাবন দুঃস্বপন ভিন্ন কিছু ভাবে কি ?
মথুরায় তাই হায় রাধিকায় সে নিঠুর
চিনিল না ; বুঝিল না হেলা তার কতদূর
ভেদিল যে, বধিল যে, অসহায়া অবলা !
হের তাই বহে রাই চোখে নদী তরলা !
মূর্ত্তিমতী দুঃখ যেন তরী পরে বসিয়া !
দুর্নিবার অশ্রুধারে যায় কবি ভাসিয়া

পাপের ফল।

শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমাকাশের লোহিত আভা তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় নাই। উৎসবান্তে উৎসব গৃহের দীপ যেমন একটী একটী করিয়া নিবাইয়া দেওয়া হয়, তরল অন্ধকার রাশি তেমনি করিয়া একটী একটী আলোকরেখা মুছিয়া দিতেছিল। বাহিরের বাগান হইতে হাস্নাহানা ও লেভেণ্ডার চাঁপার তীব্র গন্ধ যেন বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মাধুরী, জানালার ধারে বসিয়া একটা হারমোনিয়ামের চাবি টিপিতেছিল ; হঠাৎ আকুল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

ভোরের বেলা বকুল তলা যাই না সেই হতে
তুমি দাঁড়িয়ে থাক পথে।

কি যে তুমি চাও বিদেশী, এসো কোথা হতে
কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে !'
দৃষ্টি তোমার মিষ্টি লাগে, ভুলে যাই যে সৃষ্টিটাকে
আমি কাজ ফেলেও পাকে পাকে আসি গৃহ হ'তে
তুমি কও না কথা, মনের ব্যথা জানাও নয়নেতে
কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে ?
বিকেল হলে এলো চুলে বসি যবে আয়না খুলে
তখন তুমি আপন ভুলে চাহ পিছন হতে
আমার মুখের পাশে, তোমার মুখটী হাসে
লাজে চাই যে গো মরিতে
কেন দাঁড়িয়ে থাক পথে ?

মাধুরী এমন তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল যে, তার পিছনে যে তার স্বামী ইন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তা সে বুঝ্তেই পারে নাই। ইন্দ্রনাথ মিনতির সুরে বলিল, "আর একবার গাও মাধুরী। এই একটী মাত্র গানের বাঁধনে আমি তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়েছি; সে বাঁধন আরো বেশী করে এঁটে দাও।"

লজ্জা-নম্র কণ্ঠে মাধুরী বলিল, "অমন চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমার লজ্জা করেনা বুঝি !"

ইন্দ্র। লজ্জা করে বলেই তো সাড়া দি' নাই। আমার কাছে বসে গাইলে তোমার সুরে কি এ আকুলতা থাক্‌ত ? আচ্ছা, তিন মাস আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে মাধুরী ?

মাধুরী। সে আর মনে পড়ে না—তোমার কীর্ত্তিকাহিনী ?

ইন্দ্র। তুমি রোজ বিকেলে ছাতে বসে পড়া কর্‌তে, আর আমিও রোজই ঠিক সেই সময়টীতে বই নিয়ে ছাতে উঠ্‌তেম, আর তোমার চাঁদমুখখানা অতৃপ্ত চোখে চেয়ে দেখ্‌তেম, বইয়ের আড়াল থেকে।

মাধুরী। আচ্ছা, তা যেন দেখ্‌তে; কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েকে চিঠী ছুঁড়ে মেরেছিলে কোন সাহসে ? আর এত কথা লিখ্‌লেই বা কি করে ?

ইন্দ্র। আমার ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল তখন; সেই আমাকে দিয়ে লেখালে সব। সত্যি মাধুরী, তখন যেন আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলেম। রোজ একবার করে তোমায় না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারতুম না কিছুতেই। মনে হতো তুমি বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, আরো কত কি।

মাধুরী। মাগো! যেদিন তুমি ছাত থেকে চিঠি ছুঁড়ে মার্‌লে, আর তা আমার খোলা বইয়ের উপর এসে পড়্‌লো, তা মনে কর্‌তে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। যদি কেউ দেখ্‌তেই পেতো তা হলে কি মনে কর্‌তো, বলত ? প্রথম ভাবলুম, না পড়েই ছুঁড়ে ফেলে দি। তারপর মনে হলো যদি কেউ তুলে পড়ে ? তখন নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে ল্যাম্প্‌ জ্বাল্‌লুম, চিঠী পুড়ে ফেলে দিতে। শেষে কি মনে করে চিঠীটা পড়েই ফেল্‌লুম। তখন ভারী দুঃখ হলো।

ইন্দ্র। এই মনে করে যে, একটা হতভাগা তোমার জন্য একবারে উন্মাদ হয়ে গেছে, না ?

মাধুরী। কতকটা তাই বটে। রোজ রোজ তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিঠী পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার করুণ মুখের ছবিটী যেন আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লো। পত্রখানা চা'র পাঁচবার পড়্‌লুম। তারপর যা মনে এলো একটা উত্তর লিখে আমিও ছুড়ে মার্‌লুম। কি দুঃসাহসের কাজই করেছিলেম সেদিন। মনে হ'তে বুকটা কেঁপে উঠে। তোমার গায়ে ছুঁড়ে মার্‌তে—

ইন্দ্র। এসে আমার পায়ে পড়্‌লো। কিন্তু পা থেকে তুলে তা আমি আমার কণ্ঠের হার করেছি। তার প্রত্যেকটী অক্ষর আমি ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করে থাকি।

মাধুরী। সে তোমার অনুগ্রহ। অন্যে হ'লে আমায় কি মনে কর্‌তো বল্‌তে পারিনে। ঘরে গিয়ে সেদিন কি কান্নাটাই কেঁদেছিলেম।

ইন্দ্র। আর আমি দোর বন্ধ করে ধেই ধেই করে কি নাচ্‌টাই নেচেছিলেম!

মাধুরী। তা আমি বিশ্বাস করি। তুমি যখন দুইহাতে চোখ চেপে আমার ভয়ে বসে পড়্‌লে, তখন বই মুখে দিয়ে আমিও খুব হেসেছিলেম—সে পরের দিন। কিন্তু, আমি যে দুরদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি, সেই কথা মনে করে সদাই ভয় হয়। তুমি কি চিরদিন আমায় এম্নি ভালবাস্‌বে ? কখনো পায়ে ঠেল্‌বে না ?

কথাগুলি বলিতে বলিতে মাধুরীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছিল। ইন্দ্রনাথ, দুই হাতে অশ্রুস্নাত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। শেষে নিবিড় বাহুবেষ্টনে মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিল।

যখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতির রোমন্থন ও ভাবের আদান প্রদান চলিতেছিল, সেই সময়ে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মাধুরী, ধীরে ধীরে আপনাকে স্বামীর বাহু-পাশ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া বাহিরে যেখানে খণ্ডখণ্ড মেঘ জমাট বাঁধিয়া ক্রমে বড় হইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রনাথ, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

বাহির হইতে পুরুষ কণ্ঠে কে বলিল, "ইন্দ্র, তুমি যে অবশেষে একটা বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করে চৌদ্দ পুরুষের জলপিণ্ড লোপ করবে, তাতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো! তুমি এই মুহূর্ত্তে পত্নী-ত্যাগ কর, নইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব।"

ইন্দ্রনাথ, পিতার স্বর চিনিতে পারিল। কিন্তু সংসার-ত্যাগী বৃদ্ধ কাশীবাস ত্যাগ করিয়া হঠাৎ কেন এখানে আসিলেন তা বুঝিতে পারিল না। সে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলিল "বাবা, আপনি ভুল শুনে থাকবেন। মাধুরী বেশ্যাকন্যা নয়। রাম বাবুর গৃহে তাঁর কন্যাতুল্য স্নেহে প্রতিপালিতা হয়েছে।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "রাম বাবুর কথায় বিশ্বাস করেই যে তুমি একাজ করেছ, তা আমি শুনেছি। নিজে সব জানলে না কেন? দু'পাতা ইংরেজী পড়ে তোমরা এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাও যে জাতিবিচার করাটা আবশ্যকই মনে কর না। তা ছাড়া, আগেকার কালে প্রকাশ্যভাবে সমাজের বিরুদ্ধে এমন অত্যাচার করতে কেউ সাহসীই হতো না।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "বাবা, ঘরে আসুন। আমি সব বলছি আপনাকে। বাসুদেবপুরের রামতনু মুখোপাধ্যায়কে আপনিও চিনতেন বোধ হয়। মাধুরী তাঁরই কন্যা, আমি নিজে জেনেছি। এর মায়ের নাম ছিল সরস্বতী দেবী।"

বলিয়াই ইন্দ্রনাথ, বৃদ্ধকে নমস্কার করিতে দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইতেই দেখিল যে, বৃদ্ধ বেতস পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। কোনওরূপে দেয়াল ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, কিছুই বোঝা গেল না। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল "বাবা, আপনার কি অসুখ করেছে?" সে তাঁহাকে প্রায় কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল। মাধুরী তখনও বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। যেন পিতাপুত্রের কথোপকথন কিছুই তাহার কাণে যায় নাই; যেন সে এ জগৎ হইতে বহুদূরে বসিয়া কি এক মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন "মাধুরী, মাধুরী!—কই এনাম ত আমার স্মরণ হয় না। এর কি শৈশবে অন্য নাম ছিল?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "ছিল। এর নাম ছিল লক্ষ্মী।" পুত্রের কথা শেষ হইতেই বৃদ্ধ বলিলেন "বাবা ইন্দ্র, তোমাদের বিয়ে কি হয়ে গেছে?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "হাঁ তিনমাস আগে।"

বৃদ্ধ বলিলেন "কি সর্ব্বনাশই হয়েছে তা হলে। আর তোমারই বা দোষ দি' কেন? তরুণ বয়সের চাঞ্চল্যে বিধবা সরস্বতী আর আমি যে পাপ করে ছিলেম, তারই ফল এই লক্ষ্মী বা মাধুরী। এ যে তোর বৈমাত্রেয় ভগ্নী হয় রে, ইন্দ্র। এখন উপায়?"

এই ভীষণ কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ ও মাধুরী, বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহাদের মুখ দিয়া একটী বাক্যও নির্গত হইল না।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্র, পিতা, মাতাই পুত্র কন্যারূপে নিজেদের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে থাকে। এ পাপ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে কাশীতে পালিয়েছিলেম। কিন্তু পাপ ত আমায় ছাড়লে না! ভাখ্ বিধাতার দণ্ড কি অমোঘ। কি ভীষণ! এ যন্ত্রণা থেকে তুষানলে মৃত্যুও যে আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ছিল।"

বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া চেয়ার হইতে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। ইন্দ্রনাথও মাধুরী যেন এতক্ষণে স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল।

রাম বাবু এতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন এবং পিতাপুত্রের কথোপকথনও শুনিয়াছিলেন। এখন ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ইন্দ্রনাথ, তোমার পিতা ভুল করেছেন। মাধুরী সরস্বতী দেবীর কন্যা বটে, কিন্তু তোমার পিতার ঔরষজাতা কন্যা নয়। মাধুরীর জন্মের পরে সরস্বতী দেবী বিধবা হন এবং মাধুরীকে কাশীধামে পরিত্যাগ করে তোমার পিতার সঙ্গে এলাহাবাদে চলে যা'ন। কাশীবাসিনী হরিমতী মাধুরীকে প্রতিপালন করেছিল; তার কাছেই আমি সব শুনেছি। সরস্বতীর দ্বিতীয় কন্যার নাম লক্ষ্মী ছিল; সে শৈশবেই মারা গিয়াছে। হরিমতি, মাধুরীকেও লক্ষ্মী বলিয়াই ডাকিত। তাই এ গোলমাল হয়েছে। মাধুরী সত্য সত্যই তোমার বৈমাত্রেয় ভগ্নী নয়।

উদাসভাবে ইন্দ্রনাথ বলিল "সে একই কথা;—মাধুরীর মা যে আমার বিমাতা এর ত সন্দেহ নেই? এখন থেকে আমরা পরস্পর ভাই বোন্‌ই থাকব। হায়, তিন মাস আগে যদি এসংবাদ জানা যেতো!"

নয়নের জল।

শ্রীশচীন সেন রায়

জায়গাটা মনের মত।

গ্রাম নয়। কিন্তু গ্রামের অনেকটা ভাব লাগে। অনতিদূরে একটা মস্ত বড় নদী, ওটা থেকে ছোট্ট একটা খাল জন্মেছে; খালটা এঁকে-বেঁকে চলেছে ঐ জায়গাটার সারা বুক ভেদ করে। নদীর জল খালে এসে পড়ে বারমাস; তাই বুঝি ওটাকে রোগা হতে দেখা যায় না, হৃষ্ট-পুষ্টই থাকে সব সময়। মনে হয় ওটা যেন খালটার-মা।

সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস বয়। মনে খুশীও আনে।

মাস খানেক যাবৎ এখানে আছি,—দীর্ঘ অবসরের পরে। কাজের খুব ভীড়। হয়ত তাই সারা জীবন-জোড়া দুঃখের ভাবনা আসে না। ব্যথাও দেয় না।

ঝুণ, ঝুণ করে তালে তালে শব্দ করে রাণার ডাক নিয়ে আসে। শব্দটা ভারী অলস অথচ নিঝুম্! আমিও শুন্‌তে পাই; কান দু'টোও খাঁড়া হ'য়ে যায়, বন্দুকের আওয়াজে ভয় খাওয়া খরগোসের মতন।

মস্ত, মস্ত 'ক্যান্‌ভাসের' পাঁচ, সাতটা ব্যাগ তার মাথার 'পরে। রাণার ব্যাগ্‌গুলির ভাড় যেন আর বেশীক্ষণ বইতে পারে না। ধুপ্-ধাপ্ করে ফেলে দেয়।

না ফেলে কি করবে? কতক্ষণ আর বইতে পারে?—

তবুও ধম্‌কে দি'। রা' করে না। মাথা গোঁজে থাকে। অন্য একটা ডাকঘরে—ডাক্ পৌছে দিতে বার হয়ে যায়।

ডাক বাছুনী কর্ত্তে বসে যাই। পিয়ন তিন তিনটে; একটাকে সিল দিতে বলি, একটাকে সাজিয়ে রাখতে বলি। আর একটাকে আফিসের কাজে বড় বেশী পাই না। ও ব্যাটা ব্যস্ত থাকে বড় বাবুর পাকা চুল বাঁছতে, ওঁর দুলালদের আদর কর্ত্তে আর বড় বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নির ফুট-ফরমাস করে মন যোগাতে। পিয়ন ব্যাটা তো ভারী ধূর্ত্ত। আসল পর্দ্দাতেই ধরেছে বটে!

—বাবু, দোঠো পোষ্টকার্ড, আওর দুঠো মণি অর্ডার-ফারম। বাইরে থেকে ডাকতে থাকে, অনেকবার।

পোষ্ট-মাষ্টার তো না, যেন লাট্-সাহেব। দেখ্‌তে পাচ্ছে আমাকে ডাক সর্ট কর্ত্তে, তবুও আমাকেই বলে কিনা—দেওনা হে অসীত, ও কি চায়?

দেই। পরে ভাবি আচ্ছা কাণ্ডজ্ঞান তো! মেজাজটা গরম হ'য়ে যায়। কিছু বল্‌তেও পারিনে—হজম করে ফেলি মনেরটা মনেই।

পাকা পাচীল ঘেরা আফিস ঘর। ছনের ছাউনী দেওয়া ছাদ। দু'টী কোঠা তিনটে টেবিল, আমাদের জন্য দু'টো, আর একটাতে থাকে টেলীগ্রাফের টরে টক্কার কল। দু'টো চেয়ার।

সকাল হতে তামান্ আকাশটা গুমট্ করে আছে; ছোট্ট ছেলেপিলেদের ট্যোবা ট্যোবা গাল দু'টো রাগ করে ফুলিয়ে বসে থাকার মতন কিন্তু। অবস্থাটা কতকটা চোখের জল—'প'র প'র' ভাব। তাই কি ঝীড় ঝীড় করে

ইলশে-গুড়ি ঝড়চে। কাছের বস্তীর ছোট্ট ছেলেমেয়ে গুলোর যা স্ফুর্ত্তি! ওরে, বাবা! ধিং ধিং করে লাফায় আর জোরে জোরে সুর করে—একদল বলে—

'এতটুকু পানী

আর একদল বলে—গাগড় খানি।'

কাজের যা চোট্! ঘাড় তোল্‌বারও যে ফুরসুৎ নেই। মাষ্টার বাবু তো টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঠিক লাড্ডু-খানার মত চেয়ারে বসে থাকেন। ইচ্ছে হয়তো কিছু লিখ্‌লেন, তা না হয় তো নাই।

একটা ছোট্ট মেয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আস্‌চে। এদিকেই তো। আফিস ঘরের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। ভিজা গা-টা মুছ্‌তে থাকে। ভারী সুন্দর ফুট-ফুটে মেয়েটী তো! আপেলের মত চক্‌চকে রঙ্গীন দু'টী গাল। স্নিগ্ধ শান্ত চোখ দু'টী। স্নেহ, মায়া-মমতা-ভরা চেহারা। কিন্তু বড্ড চঞ্চল ও অস্থির। ছোট্ট মেয়ে কিনা, তাই।

টরে টক্কা টরে টক্কা—শব্দ। তার এসেছে, ধরি। কাগজের উপর লিখে ফেলি।

মাষ্টার বাবু, পোষ্টকার্ড দিন্। একটা দিলেই হ'বে। মেয়েটী ডাক্‌তে থাকে, বাইরের ছোট্ট খোঁপেতে হাত বাড়িয়ে দেয়, দেরী দেখে পয়সার গায় পয়সা ঠুঁকে বারে বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে।

হাতের কাজ টাজ সব ফেলে রেখে ওকে দেই। ওর মমতা-ভেজা ডাক যে উপেক্ষা কর্ত্তে পার্ল্লুম না।

অসীম সাধ করে পরিচয় জান্‌তে।

—খুকী, তোমার নাম? জিগ্‌গেস করি।

—লেখা। ও উত্তর করে।

—বাড়ী কদ্দূর?

—ঐ। অঙ্গুলের ডগা দিয়ে বাড়ীটা দেখায়। বুঝলাম অতি নিকটেই।

—মার জন্য বুঝি পোষ্টকার্ড নিচ্ছ?

—মা নেই। জল-ছল-ছল চোখ দু'টো বুজে বলে।

পরিচয়টাকে এর বেশী দূর এগিয়ে যেতে সাহস পাই না। ইচ্ছা থাক্‌লেও চেপে যাই।

ওর সেদিনের মিষ্টি কথাগুলো অহরহ কানের মধ্যে বাজতে থাকে। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিতেও ঝং ঝং করে ঝঙ্কার দিতে থাকে। সাথে সাথে জাগিয়ে তোলে,—আর একটী ঠিক এমন তর মুখের কথা—এত কচি না, পূর্ণ যৌবন ভরা;—যার অভাবে আমার চক্‌চকে জীবনটা এমন হতচ্ছড়া, এমন লক্ষ্মীছাড়া এবং এমন ব্যর্থ হয়েছে। চেহারার এমন বেমালুম মিলও ভগবানের রাজ্যে আছে! দেখে মনে হয় যেন তুষারই ছোট্ট কালে তোলা একখানা ফটো।—

মন বড় দোলে। যত বেশী ভাবি তত আরও বেশী দোলে। এ দোল খাওয়া মন থামাতে পারি না।

মেয়েটী একবার না একবার এদিকে আসে, রোজ। তাই আমার সাথেও দেখা হয়। কাগজ-টাগজ সব ফেলে থুয়ে চলি ছুটে ওর সাথে কথা-বার্ত্তা বল্‌তে। তা'তে কী ভালই লাগে—না দুঃখই পাই?—বুঝ্‌তে পারি না।

তবুও তো।—

মাঘ পূর্ণিমা।

ভরপুর চাঁদনির রূপালী আলো। পৃথিবীর সাড়া গা বেয়ে বেয়ে পুলক উৎলে পড়ে।

লেখাকে কোলের মধ্যে রাখি, অনেকক্ষণ বসে থাকি দুজনাতে খালের পাকা বাঁধানো ঘাট্‌লার উপর। এখন আর পরের মত করে না। যতদিন যায়, যাতায়াতও বাড়ে, তত খাঁতিরটাও গাঢ় হয়। সংসারেরই নিয়ম!

ওকে চেপে ধরে বসি, কপাল, গাল চুমোয় চুমোয় ভরে দি'।—খাঁক হওয়া প্রাণটা জুড়িয়ে যায় বোধ হয়।

কাকা বাবু, গাটা শোঁক কেন? লেখা বলে। এখন কাকাবাবু বলেই ডাকে। কি জানি, ওর দিদিমা বলে দিয়েছেন বুঝি।

—ভাল লাগে তাই। শুধোই।

—কেন? আমি কি গোলাপ ফুল? লেখা বলে।

ভাবি—গোলাপ হয়তো ও বড্ড ভালবাসে; তাই গোলাপের কথাই বলে

—হ্যাঁ, তুই তাই। উত্তর করি।

হা, হা, হা করে হেসে উঠে। চেঁচিয়ে 'চিয়ে বল্‌তে থাকে—আরে আমি বলে গোলাপফুল, আমি বলে গোলাপ ফুল, কাকাবাবু বলে। ধাই, ধাই করে নাচ্‌তেও থাকে কিন্তু; আরও অনেক কিছু।—ছোট মেয়ে তো;—সরম করে না।

— গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে। বলি।

—আর ক'দিন বাকী?

—দিন পনার।

— তুমি খালি আজ না কাল, কাল না পরশু এম্নি করে ফাকী দিচ্ছ। সত্যি বল তখন নিয়ে যাবে?

— হাঁ রে, নোব, নোব।

চটকলের কুলীগুলো ঝুঁন্তু বেধে আসে; এরা আমায় বড্ড উৎব্যস্ত করে। কেউ চায় দুটো টিকেট; কেউ চায় চারটে পোষ্টকার্ড, কেউ আবার আসে মনি-অর্ডার পাঠাতে। এম্নি করে আরও কত কি। আৎকা মনে পড়ে লেখার আকুল অনুরোধ আমার সাথে আজ বিকেলে কাঁচা রাস্তা ধরে বেড়াবে।

ছুটে চলি। অনেকে অনেক কথা শুনায়। কান তো পাতিই না;—তোয়াক্কাও করি না।

আকুল হয়ে পাগলের মত যাই। কেন যে যাই তা তারা কী বুঝবে?—

দেখতে পাই, লেখা দাঁড়িয়ে আছে ওদের দরজায়। আমার জন্যই তো!

আমাকে ও দেখে। দৌড়িয়ে আসে কাছে. যেন মেঘের রাণী। ঝাক্‌ড়া চুলের গোছা-টা উদ্দাম হয়ে ফুর্ ফুর্ করে হাওয়ায় উড়ে। সুন্দর লাগে দেখতে। তক্ষন তক্ষনই ওকে সাপ্‌টে ধরে বসে পরি.—সবুজ ঘাসের উপর। হাওয়ায় দোদুল খাওয়া অবাধ্য চুলগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে দি'; বুলিয়ে বুলিয়ে ঠিক্ ঠাক্‌ কর্ত্তে থাকি।

—কাকাবাবু, বেড়াতে যাবে না? বড় যে বস্‌লে? লেখা জিজ্ঞেস করে।

—চ'। বলি।

লেখার হাত শক্ত করে ধরে বেড়াতে থাকি, এ প্রশ্ন সে প্রশ্ন করে করে আমায় ব্যস্ত করে তোলে। তথাপি কিন্তু বিরক্ত হই না।

—কাকাবাবু, একদিন না বলছ, আমায় কল্‌কাতা দেখাবে? কবে? লেখা জিজ্ঞেস করে।

নাম-করা যা, যা আছে—ওকে দেখিয়ে দেই; পশুশালা যাদুঘর, ইডেন্‌গর্ডেন, পরেশনাথের মন্দির—আরও অনেক।

ট্রামে করে আস্‌চি। হঠাৎ বিকাশের সাথে দেখা। আমায় প্রথমটা চিন্‌তেই পারলে না। বার বার আমার দিকে তাকাতে থাকে। আমিও কিছু বলি না।

এই-রে, মাটী করলেরে! চিনে ফেল্লে। বলে, কিরে, তুই অসিত না?

উত্তর করি;—ঠিক ধরেছিস্‌। কোর্ট ফেরতা বুঝি?

—হাঁ।

—ভারী দয়ার শরীর তো-রে তোর!

—কি রকম?

—এতগুলো ছাড়্‌পোকা পোষচিস্‌ এই গাউনটার মধ্যে।

— লক্ষ্মীর চিহ্ন।

ঠুং করে ঘণ্টা বাজে, ট্রামটাও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—আচ্ছা, তবে আসি রে, কেমন?

—যা। বলি।

আমরাও যাই বায়স্কোপ দেখ্‌তে।—

পিক্‌চার প্যালেস, না-তো, যেন ঠাকুরমার মুখে শুনা পরীর দেশ। রূপের ঝল্‌সা ছোটে সন্ধ্যার সময়, ট্রুঙ করে ঘণ্টা বাজে, বায়স্কোপের পর্দ্দা উঠে, যে যার জায়গায় বসে ছবি দেখ্‌তে থাকে। তাতে ছিল এক সুন্দরী তরুণীর সাথে এক ধনী যুবকের প্রেম। অবলা, অবুঝ তরুণী; বোঝে না, চিন্তাও করে না; ধনী যুবকের মিলনের প্রথম অর্ঘ্য প্রাণে বরণ করে নিলে।

তার পরে অনেক দিন চলে যায়। যুবকের স্বভাব-গুণ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বার হ'য়ে পড়ে। যার যা স্বভাব—তা

আর কতদিন লুকিয়ে, চুকিয়ে রাখ্‌তে পারে? তাঁর স্ত্রীর দিকে বড় একটা তাকায় না। মন সদাই উড়ো, উড়ো। নিত্য নূতন ফুলের মধুর আস্বাদ পেতেই যুবকের প্রাণ ব্যস্ত। সে কী বুঝ্‌বে সাধ্বী স্ত্রীর কদর! সে যে কামের পূজাতে মস্‌গুল! তারপর ইন্‌টারভেল।—

দপ্‌ করে সবগুলি আলো জ্বলে উঠে। লেখা তার সিট ছেড়ে উঠে আসে।

—কিরে, কেন ওঠে এলি? জিজ্ঞেস করি।

—ডর লাগে যে। বলে।

—কেন?

-ঐ দেখ! কত মোটা! আস্তে আস্তে বলে, ঈশারা করে কিন্তু।

সত্যি তো কী মোটা ঐ ব্যক্তিটার চেহারা, ঠিক যেন পাম্প করা ফুটবলটা আর কি।—

ছবির নায়িকার দুঃখের করুণ কথা মনের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। এ বেদনা ও বিষন্নতা যদি সত্যি সত্যিই ঘটে তাও আবার মনে পুষে রাখা কী কম বিষম! সাথে সাথে এসে আমার মনে ধাক্কা দেয় নিজের বিফল জীবনটা—জীবনটাতেও কী ভাবেই না বিফলতা, ব্যর্থতা ভরাট হয়েছে! এ জন্য দায়ী কী রূপই?

কখন যে ইন্‌টারভেল শেষ হ'লো, আবার কখন যে ছবি দেখান সুরু হল—খ্যাল থাকে না। পুঞ্জ পুঞ্জ চিন্তার রাশি, তা'তেই কি? আৎকা ভেঙ্গে যায় চিন্তার চমক তখন, যখন লেখা হাতে ধরে একটা ঝাকুনী দেয়। পরে বলে—কি কর? দেখ্‌চো না? কি সুন্দর!

ছবি দেখতে থাকি। তরুণীর সকল দুঃখের প্রদীপ একটু একটু করে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তরুণীর দিকে কেউ চায় না। তিলে তিলে দগ্ধ হয়,—তবু না। আমার পরাণ কিন্তু না কেঁদে পারলে না। প্রচুর সহিবার ক্ষমতা কিন্তু ওর। স্বামীর এত পৈশাচিক অত্যাচার কেমন ভাবে সয়ে যাচ্ছে—যেন অত্যাচারে আর ওতে খুব মিতালী। মেয়ে-মানুষ তো, তাই পারেও বোধ হয়।

সায়ের অরচেষ্ট্রা হ'তে বেহালা ও পিয়ানোর দুঃখ ভেজা সুর বাজ্‌তে থাকে। ভিজিয়ে দেয় আমার মন-প্রাণ। ওঃ এত করুণ—এত প্রাণ ফাঁটান!—যেন আমারই বিরহী আত্মার খোঁজ এরাও পেয়েছে।—

শেষ খণ্ডেতে দেখি—পূর্ণিমার ফর্শা তরল জোচ্ছনা; ধরণীর বিপুল বপুটাকে পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দে'ছে। নিশুতি রাত। সেই ধনী যুবক টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী আসে। বাড়ীর দরজায় বার কতক ধাক্কা দেয়। ঝনাৎ করে খুলে যায়। দেখি, ম্লান-বসনা ক্ষীণ তনু সেই তরুণী। ঝড়ে-পড়া বাসি শিউলির মতন মুখখানি তার।

মাতালটা স্ত্রীকে অশ্রাব্য গাল-মন্দ দেয়, মদের ঝোঁকে আরও—আরও কত কী—নিঃসহায় নারী ওদের উপর অত্যাচার তা কি বড় বেশী সাবাসী! এতভাবে ওকে পীড়ন করছে তা'তেও কিন্তু খুসী না। শেষে কী একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারে তার সাধ্বী স্ত্রীকে সন্দেহ করে, পরে দু'টো পিস্তলের গুলির শব্দে;-একটাতেই একেবারে কাবার; তার উপর আবার আরও একটা কেন?

সাথে সাথে,—ওঃ, চলো, চলো যাই এখান হ'তে। লেখা বল্‌তে থাকে। আমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে আসে-ভেতর থেকে একদম বাইরে। একটা টেক্সী ডেকে দু'জনে দেই সটান চম্পট ষ্টেশনের দিকে। আসতে আসতে লেখাকে জিগ্‌গেস করি—কিরে অমন করে চেচিয়ে উঠেছিলি কেন হঠাৎ?—মার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।

শুনেছি, বাবাও নাকি মাকে একটা বাড়ি দিয়ে—আর বলতে পারলে না, আবার একেবারে কেঁদে ফেল্লে।...

স্ত্রীলোকটার দুঃখটা বড় বাজে। এ রকম অত্যাচার যে কত চলচে তার খবর কে-ই বা রাখে? আবার ভাবিও—এজন্য দায়ী কে? কর্ম্ম-ফল না অন্য কেউ?

ভোর অনেক্ষণ হয়ে গ্যাছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের রোদ আসে। তা চোখে লাগে। ঘুমও তক্ষনই ভেঙ্গে যায়। ধরফড়িয়ে বিছনা থেকে উঠে পড়ি। টুইলের সার্টটা কাঁধে ফেলি, গায়েও পরি-না, চটী পায় ফট্ ফট্ কর্ত্তে কর্ত্তে চলি আফিসে।

আগের দিনের জমিয়ে-রাখা কাজগুলো সব কর্ত্তে থাকি।

—তোমার তো-হে সোঁনারপুরে রিলিফ কর্ত্তে যাওয়ার আদেশ এসেছে। মষ্টার বাবু বলে।

—এর-ই মধ্যে? এত শীগ্‌গীর এখান হ'তে আমার বদলী? জিজ্ঞেস করি। এর বেশী কিছু বলি না। মনটা যেন দারুণ আই-ঢাই কর্ত্তে থাকে, বার বার খালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েও ওঠে। দু'চোক দিয়ে কান্না বেরুতে চায়। সেই দমন করে—অতি কষ্টে। পুরুষ-মানুষ যে, কেঁদে ফেল্লে লোকেই বা কী বলবে?

—আরে মন খারাপ কর্চ্ছো কেন? ছেড়ে যাবে বলে? তা দিন তো আর বেশী না; মোটে একটা মাস। বলে। বুঝি, সুরটাতে যেন ঠাট্টা মিশান আছে।

—কী? একমাস! তবু যে—শুধোই।

—তবু কি হে! এ জায়গা তো আর বাড়ী না বা শ্বশুর বাড়ীও না; তবে আর কষ্ট কেন? আরে কি বলচি, ওদিকে যে একদম বর্জ্জিত।

ভাগ্যিস বুড়ো, তার উপর আবার উপর-ওয়ালা; তা নৈলে কষে মারতাম থাব্‌ড়া। ব্যাটা বলে কিনা—ছাড়তে কেন কষ্ট হয়?

ওরা সব কি বুঝবে? কেন?

সাড়া গা-টা জোড়া কত মস্ত একটা ডগ্‌-ডগে ঘা! কেটে যাওয়ার ঘা না—গোপন-ব্যথার।

নতুন যায়গা, সোঁনারপুর।

মনটা বড্ড নিরালা; যেন সব সময়েই 'কি নাই কি নাই' করে। তাই হয়তো সবই নিরালা, নির্ব্বাসিত লাগে; মনের সাথে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা যে।

অন্য লোকের রিলিফ্‌ করা ভয়ানক ঝকমারী। কত দিনের ফেলে রাখা কাজ,—আমিই করি। পরের কাজ কর্ত্তে কার না বিরক্তি লাগে! ব্যাটা-ছেলের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে সেই অকথ্য, অশ্রাব্য গাল দিয়ে।

এর উপর আরও এক উৎপাত। গোটা কতক গায়-পড়ে-কথা-কওয়া-বন্ধুর মত জুটে যায়। সময় নেই, গময় নেই,—আছেই 'ভেগাবনের' দল আমার পিছে। এটা নাকি ও ব্যাটাদের একটা ধারা চলে আসচে। ছোঃ! ঘেন্না করে ওদের অনবরত সঙ্গ। তবু তো মিশি; নৈলে ওদের যা টিট্‌কারীর চোট্!—

বসে আছি চুপ-চাপ। কেমনতর একটা আশঙ্কা ও বিহ্বলতায় প্রাণটা পুরিত হয়ে পড়ে যেন। ভাবি, কখন 'তার' পাঠিয়েছি লেখাদের সংবাদ আনতে, এখন পর্য্যন্তও তার জবাব আসে না যে। প্রায় দু'মাস হ'তে চল্লো,—সংবাদ পাই নি। একটা নিদারুণ দুর্ভাবনা মনেতে খাঁই-খাঁই করে কেন?

উত্তর আসে। জানতে পারলাম লেখার নাকি ভয়ানক ব্যারাম। ট্রেণ ধরতে ছুটে চলি।

মনটা বড্ড খারাপ লাগে। দিন কয়েকের আলাপে পরিচিত একটা ছোট্ট মেয়ে! ওর জন্য কেন এত বেশী দরদ লাগে? কেন ওর চিন্তাই যেন আমাকে পেয়ে বসেছে? কেন মিছে মমতায় টেনে নিয়ে যায় আমার সব মন-প্রাণ? কেন'র উত্তর কে দেবে?...

শীতকাল। রাত আট-টা।

শীতের ঘোলাটে কুয়াসা ও কৃষ্ণা রাত্রি,—এ দু'জনের গলাগলি ভাবে এক বিরাট অন্ধকার জমেছে। কুয়াসা-ধোয়া আঁধার—বড় ঘুর-ঘুট্টি, বড় গম্ভীর।

খালের গা-ঘেঁসা, আঁকা বাঁকা সরু রাস্তা,—তা ধরে চলি ঝড়ো হাওয়ার মত; দিশা থাকে না।

সপাসপ্ ঢুকে যাই ও যেখানে আছে। একটা বিরাট বিস্ময় আসে, স্তম্ভিত হয়ে যাই। একি! এত পরিবর্ত্তন! দু'দিনের ব্যারামে!

বড় ম্লান হয়ে গেছে মুখখানা ওর; যেন রোদে শুকো ঝড়া বকুল।

—এসেছ কাকাবাবু? বলে।

—হ্যাঁ। স্বরটা আটকে আসে। রুমাল দিয়ে শুকো কচি মুখখানা ওর মুছিয়ে দি'।

রাত ক্রমেই বাড়তে লেগেছে। আর সাথে নিস্তব্ধতাও; মনে লাগে যেন শোকার্ত্তা বিরহিণীর চাপা কান্নার মতো।

আঙিনার ঐ বড় জাম গাছটা, তা থেকে পুরাণ পাতা ঝরে পড়ে টুপ্-টাপ্। নেঁয়ো কুকুরগুলো সে শব্দে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ওদের কেরামতি ঐ পাতার সাথেই; এর বেশী দূর না।

পুরো একটা রাত কাটে,—হয়তো আধখানা বেলাও—

রোদের আঁচ্ আসে, গা পোড়া রোদ না কিন্তু—প্রভাতী রোদ—ঠাণ্ডা, মিঠা।

ঐ জাম গাছটার উপর একটা পাতি কাক আর দুটো দাঁড় কাক বসে। গাছের ডালে ঠোঁট ঘসে, আর বাঁড়ি মারে। অনবরত ডাকতেই লেগেছে.—ভীষণ অপেয়া ডাক, তৃষ্ণা পাওয়ার মত এত শুষ্ক ডাক, বিমর্ষ ভরা ডাক, বিরক্তি আনা ডাক; ঢিল ছুঁড়ে খেদিয়ে দি'; আবারও আসে বেহায়ার মত।...

আজ বেশী খারাপ দেখাচ্ছে ওকে। চোখ মুখ যেন সাদা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে, নিখুঁত নাকটাও যেন একটু বেঁকে গেছে। প্রলাপ তো লেগেই আছে! বেশী অস্থিরত' যেন একটু ক্ষীণ হয়েছে। তবে কি পূর্ব্ব লক্ষণ—? কিসের পূর্ব্ব লক্ষণ—ওটুকুন আর মনে করতেই যেন কণ্ঠ চেপে ধরে।

—কাকাবাবু, আমার মাকে তুমি দেখবে? হঠাৎ কেন জানি এ প্রশ্ন বলে উঠে।

—না, ঘুমো তো একটু, কাল তো সারা রাত জেগেই ছিলি।

—মার একটা ফটো আছে। দেখবে? আমি রোজ রোজ দেখি—অনেক্ষণ।

বিপুল কুণ্ঠা হয় দেখতে; যদি বা সেই হয়—তবু বলি—না কথা কস্‌নে, ঘুমো।

একেবারে ভয়ানক অবাধ্য হ'য়ে যায়; বিদ্রোহ-ভরা স্বরে বলে, দু'দিন যাবৎ যে দেখি না। ঐ দেরাজের মধ্যে আছে; আন। আনবে না? তুমি না পার—দিদিমাকে বল না!

পরে নিজেরও ভীষণ আগ্রহ হয়।

এর পর আর না এনে কি পারা যায়?

কি অসীম যত্নে সিল্কের থলের ভিতর রক্ষিত; যেন মাণিক রতন সাত রাজার ধন।

পেয়ে কত তৃপ্তি, কত শান্তি! আর মা, মা বলে কতবার যে ডাক! এক একবার মাথায় ঠেকে, এক একবার হয়তো বুকে চেপে ধরে। ফটো—তাতেই চুমার 'পর চুমা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে থাকে। যেন তাজা সত্যের মা ওটা ওর। যেন বহুদিন পরে ওর হারান মাকে ফিরে পেয়েছে। এমনি গভীর মমতা ওর।

—কাকাবাবু, দেখ কেমনতর করে চেয়ে আছে মা আমার দিকে; না?

আচ্মকা অবাধ্য চোখ দেখে ফেলে।

বুকের ভিতরটায় যেন একটা বড় রকম উতরোল বইতে থাকে। বিশ্বাস হয় না বোধ হয়, আরও ভাল করে দৃষ্টি দিয়ে দেখি; এযে বাস্তবিকই ওরই চেহারা।—দীর্ঘ দিবস ধরে আমার মনে প্রাণে সবখানে গেঁথে রেখেছি! এও কী বিভ্রম হ'তে পারে? তা'হলে তো নিজের অস্তিত্বটাও সম্পূর্ণ বিভ্রম-পূর্ণ! তবুও জিগে্গস করি, তবে তুই ওর-ই? বল্, বল্ শীগ্‌গীর করে?—

ফাল্‌ফাল্ করে তাকিয়ে থাকে; বোধ করি, আমার এমনতর ব্যকুলতা দেখে।

বলে, হাঁা, আমার মা-রই তো ছবি এটা! চেন মাকে?

শুনে কেবল একটা দুঃখ ভরাট হাহাকার করা শুক্নো দীর্ঘশ্বাস; তার পরক্ষণেই চোখে ও মনে ভেসে ওঠে তুষার বিবাহ রাত্রির মুখখানা,—মুখখানা কত বিষাদপূর্ণ কত সজল, কত করুণ ছিল!...

সৃষ্টিকারকের নামের উপর একটা বিদ্বেষ ভাব আসে। ধীক্কার দিতে থাকি,—শেষ সময়ে কেন পরিচয়টা ঘটিয়ে দিলো! আগে দিলেই বা কী ক্ষতি ছিল? না, আমাদের নিয়ে হাসিয়ে কাঁদিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বড্ড ভাল লাগে ওঁর!—

বিকার সুরু হয়েছে;—ঘোরতর প্রলাপ-মিশান বিকার। দেখে জানি কেমনতর হয়ে পড়ি।

ও হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কাকাবাবু, কাকাবাবু; ঐ

দেখ মা আমাকে নিতে এসেছে। যাবে তুমি? তবে শীগগীর করে এস।

মাথাটা জোর করে তুলতে চেষ্টা করে; পারে না। তারপর খাঁটের কোনার দিকে চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে। বলে—মা, আস্‌চি। একটু দাঁড়াও। আর ফাঁকী দিয়ে যেও না; তবে আমি খুব কাঁদবো। তোমার সাথে কথা বলবো না।

খানিক পরে আবার বলে, কী? তবে তোমরা কেউ আসবে না? কিরে পারুল, তুইও যাবি না? মা, ওঁরা বলে কেউ যাবে না। আমি কিন্তু আর তোমাকে ছেড়ে থাকবো না। বুঝ্‌লে? মা, একটু দেরী কর না; কাকাবাবু আর পারুলের সাথে দু'টো কথা বলে আসচি। থাক্, বলবো না। দেরী হয়ে যাবে, শেষে যদি আবার ফেলে চলে যাও।

হাত, পা, শরীর সব শিথিল হয়ে পড়চে। ঘামও বইতে লেগেছে প্রচুর পরিমাণে। হয়ত আর বেশী বাকী নেই।

লেখা শেষবার বল্লে, কি কাকাবাবু, কাঁদচো কেন তোমরা? মার কাছে যাব বলে? আমি তো তোমাকে আর দিদিমাকে সাধলাম; তোমরা তো কেউ যাবে না। আচ্ছা তবে যাই। ঐ আবার ডাকৃচে; হয়তো দেরী দেখে কতই রেগে থাক্‌বে। যাই—

— লেখা, লেখা, লেখা! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকি। জবাব আসে না; আসে খালি প্রতিধ্বনির ক্ষীণ শব্দ।

আমিও সংজ্ঞা হারাই।

পরকালের টান্ যে পর্য্যন্ত না আসে সে পর্য্যন্ত চালিয়ে দিতে থাকি ছন্ন-ছাড়া—হতভাগা জীবনটার গন্তিকরা দিন গুলি—শোকাশ্রুর বিরাট ভার ব'য়ে। কতকটা হয়তো গুরুভার বোঝাই করা ছ্যাকড়া গাড়ীর চাম-ওঠা, হাড়-জীড়-জীড়ে ঘোড়ার ঝিঁমিয়ে ঝিঁমিয়ে চলার মত। ।

রূপ-পূজারী

শ্রীহরিপদ গুহ

(১)

রূপ নগরের রূপসী সে
বোসের বাড়ীর ওই ছুঁড়ি;—
চল্‌তে পথে নয়না হেনে
কর্‌লে আমার মন চুরি।
কাননে ফুল তুল্‌তে এসে,
দুলিয়ে আঁচল, মুচ্‌কে হেসে,—
বুকের ব্যথা যায় সে কয়ে
ডাগর দুটী চোখ দিয়ে;—
রোজই ভোরে এম্‌নি করে
যায় সে আমার মন নিয়ে।

(২)

বুকে তাহার তীব্র-দাহন
আলোর-কমল ফুটফুটে;-
মানস-মধুপ ওই দুটীতে
উদাস হয়ে যায় ছুটে!
কত যে যাদু জানে সে বালা,
গাঁথিয়া নিতি শিউলী মালা,
গলেতে মোর পরিয়ে দিয়ে
চপল চোখে রয় চেয়ে।
ধর্‌তে গেলেই পলায় ছুটে—
এম্‌নি দুষ্টু সেই মেয়ে।

(৩)

ফাগমাখা তার গাল দুটীতে
আঙ্গুর-রসে তুলতুলে ;—
হাস্‌তে গেলেই টোল্ খেয়ে যায়
ওইতে আমার মন ভুলে।
যদি তার ওই বাহু-হার,
কণ্ঠেতে মোর দেয় উপহার,
দুঃখ সকল ভুলে গিয়ে
রচ্‌ব হেথায় স্বর্গপুরী।
মন্‌টী আমার কর্‌লে চুরি
একটুখানি ফঁচ্‌কে ছুড়ি !

(৪)

চিত্ত-চকোর উঠ্‌ছে নেচে
তাহার মধু-পরশ আশে ;—
কাজল-কাল নয়ন দুটী
সদাই আমার চোখে ভাসে।
তারি একটী চুমার তরে,
হতাশ-পরাণ গুম্‌রে মরে,
বিভোল-চিত্ত হলো আজি
চরণে তার বন্দী গো !
হায়, রূপসী নিঠুর বালা,—
জানে সে কত ফন্দি গো !

সৈনিকের চিঠি

প্যারি কেম্প—ফ্রান্স।
২৬শে সেপ্টেম্বর।
মেঘলা রাত।

ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছ আবার কেম্পে ফিরে এসেছি। কাল পরশু নাগাত আমি যাচ্ছি আবার রণক্ষেত্রে! এবার যদি আর না ফিরি তবে কেমন হয় রাণী? বেশ হয়—না? তুমি সমস্ত ভাবনা চিন্তার হাত থেকে, এ ছন্নছাড়ার জ্বালাতন থেকে রেহাই পাও—না? দেখেছ তামাসা? আমি এত হিংসু হই যে তোমাকে একটু আনন্দ পেতে দিতে যেন আমার কত বাজে ; আমার ভারী সাধ হয় আমাকে যত ব্যথা দিয়েছ, তুমিও তেম্‌নি করে ব্যথা পেয়ে বুঝ যে কত দুঃখে মর্‌তে চেয়েছিলাম।

একি—আবার বিগ্‌ল যে?
ফায়ার এলার্ম! আগুন! আগুন!!

কাল ফায়ার এলার্ম পড়্‌ল তাই আর লিখতে পারিনি। এখন কাল্‌কের খবরটাই দিচ্ছি প্রথমে।

বিগলের ডাকেই বুঝেছিলুম আগুন লেগেছে ; সব লাইন করে দাঁড়াল। এই-ই নিয়ম কি না? এমন সময় পেছন থেকে এসে আলো আমাদের সাম্‌নে পড়্‌ল। তখনো কোন হুকুম হয়নি। আমরা দাড়ায়ে রইলুম—আর নিরীহ লোকগুলির কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। হু হু করে বাড়ীর পর বাড়ী উজার হয়ে যাচ্ছে, অথচ একটু সাহায্য কাউকে কর্‌তে পার্‌ছিনা। হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত নড়্‌বার যো নেই। অন্যথায় কালই মার্শাল ল'তে গুলির হুকুম হবে। এদের দুরবস্থার কথা ভাব্‌চি, এমন সময় Renault (রেণো) বলে একজন নায়েক ফাইল থেকে বেড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—প্রাণের আশা ছেড়ে কেউ কি এ অসময়ে এদের সাহায্য করতে পার না? সাহস থাকে তো চলে এসো। এই বলে সে উল্কা বেগে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ বাদে আমাদেরও এগিয়ে যাবার হুকুম হ'ল। অতি কষ্টে সেই ভীষণ আগুন নিবানো হল। কিন্তু রেণোকে এম্বুলেন্‌স্ করে আন্‌তে হয়েছে। তার গাটা অনেক পুড়ে গিয়েছে।

তাকে জিজ্ঞেস করে যা' শুনলাম তা'ও লিখ্ছি নইলে আবার কত অসন্তুষ্ট না জানি হবে ?

'আমি ছুটে ওখানে যখন পৌঁছেছি, তখন শুনলুম, একটি রমণী চীৎকার করছেন, ওগো আমার শিশুপুত্র ঐ ঘরে যে পড়ে আছে। তাকে বাঁচাও, কেউ ! ওগো তাকে বাঁচাও। কেউ তার ডাকে সারা দিলো না। তার বুক ফাটা আর্ত্তনাদ কারো প্রাণে আছড়িয়ে পর্লো কি-না জানিনে, কিন্তু আমি চুপ করে থাক্তে পারলুম না। ছুটে আগুণের ভিতরে ঢুকে পড়্লুম। ঘরে ঢুকে ধোওয়ায় সব অন্ধকার দেখ্লুম, এ ঘর ওঘর ছুটাছুটি করে খোঁজ করলুম—পেলাম না। তারপর উত্তর কোনে একটা অস্ফুট কান্না শুনতে পেলুম ছুটে উপরে উঠে গেলুম এবং ছেলেকে মেঝে পড়ে আছে দেখ্লুম। বুকে জড়িয়ে নিয়ে নীচে নেবে এলুম, কিন্তু তখন চারিদিকেই আগুণ তার বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা বাড়ায়ে গিল্তে আসছিলো। উন্মাদের মত দিশেহারা হয়ে ছুটলুম। তারপর আর কিছু মনে নেই ! উঃ কি জ্বালা !—

ভাই, আমার কি হুকুম হয়েছে ? যাক্ গে ছাই ! ওসব ভয় আমি করিনে, তা'হলে কি আর বেড়িয়ে যেতুম ? মরতে তো হতই, যখন সৈনিকদলে যোগ দিয়েছি। যে মরণ দু-দিন পেছনে হত, তা না হয় আজ হবে। এতে ভাব্বার কি আছে ? তবে ভাই আমার মরণের বেলায় এ শান্তনা যে, অনাথার বুকে তার নয়ন সর্ব্বস্বকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। আঃ কি তৃপ্তি !!! মাগো —

মিথ্যা ভেবোনা, রেণো ! তুমি কি এত অন্যায় করেছ যে তোমায় গুলি খেয়ে মরতে হবে ? তোমার বীরত্বের কি তুলনা হয় ভাই ? নিশ্চয়ই তোমার কোন শাস্তি হবে না।

না না মিঃ রয়, তুমি ভুলে যাচ্ছ—এ মিলিটারী আইন। দুনিয়ার সমস্ত কিছুতে একটু পক্ষ পাতিত্ব দোষ থাক্তে পারে, কিন্তু এখানে তা নেই ! মার্শাল 'ল ভয়ানক জিনিষ। কোন ওজর আপত্তি নেই। আইনের ধারার মধ্যে পরলেই, বাস্।'

এই মাত্র আর্দ্দালী এসে জানাল যে, কমেণ্ডিং অফিসার আমাকে যেতে হুকুম করেছেন। কাজেই উঠি এখন। বিকেল বেলা চিঠিটা শেষ করে ডাকে দিতেই হবে আজ।

মণি—শুনে আশ্চর্য্য হবে রেণোকে সৈন্যদল থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। তাকে গুলি করা হত, কিন্তু তাকে একটু করুণা করে তার প্রতি এ সহানুভূতি দেখানো হলো। সে ভালো হয়ে উঠ্লেই তাকে চলে যেতে হবে।

হাঁ, বল্তে ভুলে গেছি যে কমাণ্ডিং অফিসার আমাকে সকালে হুকুম করেছেন পাঁচটার সময় আমাকে হিণ্ডেনবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। রেণী আমার জন্য কেম্পে অপেক্ষা করছে। সে আজ আমাকে খাল্লিয়ে রেবে বলেছে।

প্রিয়তম আমার ! আমি জানিনা, এবার কি নিয়ে ফিরব। হয় শান্তি—চিরশান্তি, নয় গৌরব, চির গৌরব। তুমিই তার সমাধান করো—কোন্টা আমার জীবনে খাপ্ খাবে।

আজ কেন জানিনা—দীপশিখা যেমন বাতাসে হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠে, আমার হৃদয়টাও আজ তেম্নি করে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে। আমাকে কে যেন বল্ছে, বিদায় ! বন্ধু ! বিদায় !! কোন্ প্রিয়জনের হারিয়ে যাওয়া ব্যথার কান্না এ ?

যাক্, যাবার বেলায় আর অনর্থক মন খারাপ করবনা,—কষ্ট করবনা। যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। লক্ষ্মীটি আমার ! কেন চিঠি লিখ না ? জবাব দেবেতো ? আমি দিন গুণ্ব ! তুমি চিঠি দিয়ো ! দিয়ো !! দিয়ো !!! ওগো, আমার ব্যথা একটু বুকে অনুভব করতে চেষ্টা করো।

তবে আজ আসি। আমার আশীর্ব্বাদ, ভালোবাসা এবং চুম্বন জেনো। ইতি—

(ক্রমশঃ)

-শান্তিচৌধুরী।

স্মৃতি-রেখা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলী সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট সাঁঝের আঁধারে
তুমি আর আমি যবে বসেছিনু বালুকা-বেলায় ;
দিবাকর অস্তমিত—ঘন-কৃষ্ণ-মসীর আকারে
অলক্ষ্যে কে আসে ধেয়ে—চরাচর নীরবে ডুবায় !
তরঙ্গের উলঙ্গ কটীতে সন্ধ্যারাণী ধূষর অঞ্চল
ধীরে ধীরে পরাইয়া সন্তর্পনে ওই যায় চলে',—
দিগন্তের সিন্ধু'পরে আচম্বিতে খুলিয়া অর্গল
কে আসিল চুপে চুপে ? অন্ধকার নিশিথিনী কোলে !
সীমাহীন সিন্ধু'পরি, গগন-চুম্বিত শৈল-শিরে,
উদয়াস্ত দুই-তটে সবিতার স্বর্ণ রেখা ধরি' ;
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উঠে আসে ধীরে অতি ধীরে—
কি যেন সঙ্গীতে ভরা ধরাখানি মরি মরি মরি !
উলসি' বিলসি' ওঠে কুলে কুলে ভরা সিন্ধু জল,
প্রসারিয়া স্ফীত-বক্ষ মেঘে-মেঘে করে কাণাকাণি ;
পার্শ্বে থাকি 'তারকারা' ম্লান চোখে চায় ছল্‌ছল্—
তারাই আমার মত এজগতে ব্যথা-ভরা-প্রাণি।
মনে হ'লে সেইদিন—আজও বুকে ব্যথা জাগে মোর,
শিরায় শিরায় মোর শিহরণ পলকে কাঁপায় !
ফুল্ল-চাঁদোয়ার-তলে বসেছিলে স্মিত-মুখে ভোর
সারা তনু তরঙ্গিয়া রূপাগ্নির-বিজুলী-আভায় !

* * * * *

আজ তুমি কাছে নাই—একাকী বসিয়া বেলাভূমে,
কত না অতীত স্মৃতি অনিবার বুকে জাগে হায় !
জ্যো'স্নার অজস্র-ধারা আসি মোর-সারা অঙ্গ চুমে' ;
তারকা-খচিত শুভ্র-সীমাহীন নীল নভো-গায়
রহি' রহি' কে সান্ত্বনা দেয় আজি মোরে,—
ফেন-বিম্ব-অম্বু-রাশি আছাড়িয়া পড়ে বার বার,
মথিয়া মথিয়া উঠে,—অবিরাম সকরুণ স্বরে
কি কথা কহিতে চায়, আমি জানি, জানে সে আমার !

রবিকরে বারিধারা

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপের জ্যোতিতে কানন আলোকিত করে যুবা তপস্বী তার জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাক্‌ত। বহির্জ্জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না; সে যেন সৃষ্টিছাড়া! এমনই করে দিন যায়। একদিন প্রাতে এক ধনী লোকের সঙ্গে নগরের প্রধানা গণিকা মণিমঞ্জুষা সেই কাননে বন-ভোজন করতে এল। ধ্যান-নিরত তপস্বীকে দেখে সে একেবারে বিস্ময় বিমুগ্ধ! অনেকক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে গণিকা মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল,—এমন সুন্দর পুরুষ এতদিন ত তার নজরে পড়ে নি; এত তেজও ত কই কারও অঙ্গে সে দেখে নি! এ কে! কে এ! অপরাহ্নে গৃহে ফেরবার সময় মঞ্জুষা দেখ্‌লে, তখনও তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হয় নি। সে একটু করে পথ চলে, আর বারবার তার দিকে ফিরে চায়। তারপর যখন সে তপস্বীকে একেবারেই দেখ্‌তে পেলে না, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ঠেলে উঠে বাইরের বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

* * *

মঞ্জুষার আর কিছুই ভাল লা'ছিল না। তার এই সুদীর্ঘ পতিতা-জীবনে আজ কেমন বেঁধে গিয়ে ছিল। গণিকা কেবলই ভাব্‌ছিল,—সে এতদিন শুধু স্বপ্নের মধ্য দিয়েই নিজের দিনগুলো অতিবাহিত করে এসেছে, সত্যের সন্ধান পায় নি!

ব্যর্থতার বেদনায় তার বুক মুচ্‌ড়ে চোখের কোণে অশ্রুর বাণ ছুটে চলেছিল। অতীতের ঘুমন্ত-প্রায় স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়াটা এতদিন সে জোর করেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজ আর তা পারলে না!—কৃপণের গচ্ছিত রত্নের মত একটীর পর একটীকে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে তার বর্ত্তমানটা ক্রমে তিক্ততায় ভরে উঠ্‌ল। বিদ্রোহীর মত কেবলই সে নিজকে নিজেই লাঞ্ছিত করে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

* * *

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সেই বনানীর মধ্যে এসে দাঁড়াল। তখনও সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গে নাই। পূর্ব্ব-দিনের মত তার গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি বনভূমি জ্যোতির্ম্ময় করে তুলেছিল। মঞ্জুষার দৃষ্টিতে আর পলক পড়ে না; মন্ত্রমুগ্ধা হরিণীর মত সে অবশ অসাড় দেহে তপস্বীর অনতিদূরে মাটির উপর ধীরে ধীরে বসে পড়্‌ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন্ ফাঁকে নিত্য-নৈমিত্তিকের পালা শেষ করে চলেছিল, সেটা হুঁসই ছিল না; পাখীদের কুলায় ফিরে আসার কল-রবে হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে গেল।

তপস্বীর নয়ন উন্মিলীত হয়ে এল। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বল্‌লেন—"এ কি! কে তুমি! এখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

মঞ্জুষা বাক্‌হীন! তার দৃষ্টি ভাবোজ্জ্বল!—"চুপ করে রইলে যে? এই নির্জ্জন বনে আমার কাছে তোমার মত সুন্দরীর কি আবশ্যক, তা ত বুঝ্‌তে পারছি না!"

'সুন্দরী' কথাটা মঞ্জুষার বুকে গিয়ে তীরের মত বিঁধ্‌ল। সে ধীরকণ্ঠে বল্‌লে—"নির্জ্জনে অনিষ্টের আশঙ্কা আমার নেই; আমি পতিতা! কাল বনভোজনে এসে মনকে হারিয়ে ফেলে গেছলুম; আজ তাকে ফিরিয়ে নেবার খোঁজে এসেছি।"

"এ কি হেঁয়ালী! কিছুই বুঝ্‌লুম না।"

"না বোঝাই সম্ভব। মানুষ ভোলানই যার স্বভাব, সে আজ নিজকে ভুলতে এসেছে; আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু উপায় কি! আমি যে কোনমতেই আপনাকে ধরে রাখ্‌তে পারছি না; অসম্ভবের নেশা আমাকে পাগল করে তুলেছে! সন্ন্যাসী তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছ!"

"আমি!"

"হ্যাঁ তুমি! এত রূপ কোথায় পেলে? যা আজ রূপোপজীবিনীর অন্তরেও রূপের সাধ জাগিয়ে তুলেছে! আলেয়ার আলোয় যে সবার পথ হারিয়ে এসেছে, সে আজ পথের সন্ধানে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে!"

তপস্বী মুখ বিকৃতি করে বল্লেন—"উন্মাদিনী!"

"উন্মাদিনী! তা হবে; কিন্তু,………"

"এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই রমণী। যাও, ফিরে যাও! আর এখানে এস না।"

এই বলে সে ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

দীর্ঘ দিন পরের কথা। বসন্ত তখন আকাশে বাতাসে মদিরার মাদকতা ছড়িয়ে দিয়েছিল। মধুপদল নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বারাঙ্গণা মণিমঞ্জুষার অভাব অনুভব করে মনে মনে গুমরে মর্‌ছিল। আর মঞ্জুষা? সে তখন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রলোভনটীর উন্মাদনায় একাকী বনের মধ্যে! তপস্বী সেই যে সে স্থান ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন তার সেই বেদীটীর উপর উপুড় হয়ে পড়ে মঞ্জুষা নিজকে শেষ পথের পথিক করে তুল্‌ছিল।

পূর্ণিমার রাত্রি। ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে মঞ্জুষা শূন্য পানে তাকিয়ে কার আরাধনায় নিমগ্ন ছিল। একি! কার কণ্ঠস্বর! তার সর্ব্বাঙ্গ একবার থর থর করে কেঁপে উঠ্‌ল! নিশিদিন যে সুরের আলাপনে তার হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত, সেই রাগ কি মূর্ত্তি ধরে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল!

তার দেহ তখন সোজা হতে পার্‌ছিল না; তবু অতি কষ্টে সে উঠে বস্‌ল।

বিস্মিত তপস্বী প্রশ্ন করলে—"এখনও তুমি এখানে পড়ে রয়েছ?"

মঞ্জুষা একটু হাস্‌লে; তারপর মৃদুকণ্ঠে বল্লে—"কোথায় যাব? আমার সত্যকার আশ্রয় যে এখানেই গড়ে উঠেছে!"

ক্ষণিকের উত্তেজনায় সে উঠে বসেছিল; আর পার্‌লে না; ধীরে ধীরে বেদীর উপর শুয়ে পড়্‌ল। এক ঝলক রক্ত তার মুখ দিয়ে উঠে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। সে প্রাণপণ বলে চেষ্টা করে বল্‌তে লাগ্‌ল—"এ জীবনটা শুধু অভিনয়েই কেটে গেল! আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন সত্য হয়! ওঃ! আজ যেন সারা পৃথিবীর ঘুম আমার চোখে আসছে! আর ত কিছুই দেখ্‌তে পারছি না! বিদায়! তপস্বী………"

অর্দ্ধপথেই সে স্বর চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেল!

সন্ন্যাসী একবার সেই মরণাহতার দিকে চেয়ে হাস্‌লে; তারপর বনবীথির অন্তরালে ধীরে—ধীরে আপনাকে মিলিয়ে দিলে।

নারী-সমস্যা

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান জগতে নারীর স্থান কোথায় তাহা নিয়া বহু তর্ক, বহু বাদানুবাদ, বহু লেখালেখি চলিতেছে। অধুনা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষাগর্ব্বিত সমাজ সংস্কারকগণ পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানে কৃতসংকল্প। আমাদের সমাজে নারীগণের দাসীত্বের দুঃখে তাহাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সমাজটাকে বেওয়ারিশ মাল পাইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। মহামানবের মহাশত্রু মনু প্রভৃতি সুললিত বাক্যচ্ছটায় মনুর আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেও ছাড়েন নাই। মনুর উক্তি:—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি।"

এর বহু প্রতিবাদ হইয়াছে; এমন কি মনুকে স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সংস্কারকগণ ইংরাজী পড়িয়া পরানুকরণে এতদূর সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন, যে বিচারবিহীন

ভাবে পাশ্চাত্য রীতিনীতি প্রচলিত করিয়া সমাজরূপ বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর সনাতন বিশিষ্টতাটুকু আজ মৃতপ্রায়। এই বৈশিষ্ট্যটুকু হিন্দু সমাজের অতুল সম্পত্তি। শক বা হুনের আক্রমণে তাহা নষ্ট হয় নাই ; মঙ্গোলিয়া বিজেতৃগণের গর্ব্ব যে বৈশিষ্ট্যের নিকট মস্তক নত করিয়াছিল ; মাসিডোনিয়া আলেকজাণ্ডারের সমক্ষে যে শক্তি লইয়া গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিল ;—চেঙ্গিজ বা তৈমুরের বিজয়াভিযানে যাহা দলিত হয় নাই ;—সর্ব্বোপরি দীর্ঘ সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসনে ও অত্যাচারে যে বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় হয় নাই, তাহা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে বৈশিষ্ট্যের সমুজ্জল জ্যোতিতে শক, হুণ ও গ্রীক প্রভৃতি বিজেতৃগণের শিক্ষা সভ্যতা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল ;—এবং পরিণামে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হিন্দু সভ্যতার গৌরব প্রভায় বিসর্জ্জন দিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিল —সে টুকু এই মনু প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণের বহু গবেষণা সম্ভূত সামাজিক শৃঙ্খলা। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ যাহা পারে নাই ভারত তাহা পারিয়াছে। সেই গ্রীস নাই, রোম নাই ; কিন্তু ভারত এখনো আছে।

যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতার অপূর্ব্ব লীলায় মুগ্ধ মন,—রুদ্ধদৃষ্টি সংস্কারকগণ মনুর 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' উক্তিতে বিরাগ প্রকাশ করেন—তাঁহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে চিন্তাশীল পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ নারীজাতির সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাদের সহিত তুলনা করিলে মনুর উক্তি নিন্দার্হ নহে। Spencer বলেন—"Woman is only a man paralysed and anested in her evolution" ; —Velpeau বলেন - "Women are degenerate beings of a primitive masculinity" ;—আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তো এই সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখেন—এই সকল উক্তিতে তাঁহাদের কি বলিবার আছে ? বাইবেলে উল্লেখ আছে—"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord"—Ephesians. V. 22. ;—"The head of the woman is the man"—Corinthian XI. 3.—মনু যদি স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন—তবে উপরোক্ত লেখকগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবেন ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তো নারীকে paralysed,—degenerate বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুগণ তো নারীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী, —সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়াছেন—বিবাহ ব্যতীত পুরুষ অপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র তো নারীকে স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণের অবাধ অধিকার দিয়াছেন—কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র নারীর ধর্ম্মাচরণের কিরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুনুন—বাইবেল বলেন—"Let your woman keep silence in the churches"—I Corinthinan XIV-34. কি চমৎকার ব্যবস্থা! ধর্ম্মমন্দিরে নারীর কোন অধিকার নাই।

পুরুষের প্রকৃতি ধ্বংসপ্রবণ, আর নারী-প্রকৃতি গঠনময়ী। মানব সভ্যতার আদিযুগে সমাজে কোন বাঁধন ছিল না। নারী ও পুরুষ একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিত। বিবাহের প্রথা সমাজে তখনও প্রচলিত হয় নাই। একই নারী বিভিন্ন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইয়া স্ত্রীর কার্য্য নিষ্পন্ন করিত। সে ছিল স্বেচ্ছাচার—তন্ত্রের যুগ—যথেচ্ছাচারের পূর্ণ প্রকটন। সন্তান তখন মায়ের নামে পরিচিত হইত। যেমন মাতা মনু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার সন্তান মানব নামে অভিহিত হইয়াছে। তেমন মাতা দিতি হইতে দৈত্য ও মাতা অদিতি হইতে অমরগণ উৎপন্ন হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগের এক শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়, নচেৎ সৃষ্টিক্রিয়া রক্ষা হয় না। পরিণয় প্রথার পূর্ব্বেও সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। উক্ত বিবাহ প্রথার প্রচলনের পরে সমাজ যখন ধ্বংসশীলতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া গঠনশীল হইয়া উঠে তখন গঠনশীলতার প্রভাবে সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে বেশী হয়। তখন বহু নারী এক পতিকে বরণ করিত। তখনো কিন্তু সমাজে মাতৃপরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রথা ছিল। তাই অতি প্রাচীনযুগে বিবাহ প্রথার প্রচলনের পরেও দক্ষ-প্রজাপতির দিতি, অদিতি, মনু প্রমুখ ত্রয়োদশ কন্যা পিতা কশ্যপের সঙ্গে পরিণীতা হওয়া সত্বেও তাঁহাদের নিজ

নিজ পরিচয়ে পরিচয় লাভ করে। তাই বৈজ্ঞানিক Dr. Ward বলেন—"For long generation women exercised rule over man and matriarchy was the apparently natural order of things."—

আদি যুগের সেই স্বেচ্ছাচার প্রচলিত থাকিলে পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত কিনা সন্দেহ। সেই যুগে ধ্বংসপ্রবণ পুরুষজাতির সংস্পর্শে আসিয়া নারীত্ব অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। গঠনশীলতা সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া ধ্বংসপ্রবণতা তাহাদের মধ্যে বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। তাই, আদিযুগে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ছিল। কারণ ধ্বংস প্রবণতা যেথানে অধিক সে স্থানে পুরুষ অধিক জন্মে এবং যেথানে গঠনশীলতার প্রভাব অধিক সেখানে মেয়ে অধিক জন্মে। আদিযুগে দু'একটী চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ধ্বংস-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া বিবাহের প্রচলনে সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করেন। বিবাহের স্পর্শে ধীরে ধীরে নারীর সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে,—স্নেহ, দয়া, প্রেম, কোমলতা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া নারী পূর্ণতা লাভ করে।

পুরুষের বৃত্তিচয় বহির্মুখী—নারীর বৃত্তিচয় অন্তর্মুখী। পুরুষ প্রাণপাত পরিশ্রমে সরঞ্জাম যোগাড় করিবে—নারী প্রতিমা গঠন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। পুরুষ চঞ্চলচিত্ত প্রস্তর বাহক—নারী দক্ষ শিল্পী। নারী ভবিষ্যত সমাজের জন্মদাত্রী। স্ত্রী-স্বাধীনতার ভীষণ আন্দোলনের দিনেও আমরা দেখিতেছি যে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই নারীই সংসারে সম্পূর্ণ কর্ত্রী। পুরুষ শুধু অর্থোপার্জ্জন করিয়াই খালাস। তবে দু'একটী নারী যে লাঞ্ছিতা না হয় তাহা নয়, কিন্তু তাই বলিয়া জনৈক ব্রিটিশ ভ্রমণকারী যেমন লিখিয়াছেন যে, "এদেশে (লাহোরে) এক একটী স্ত্রীলোক বোধ হয় একসঙ্গে বহু পুত্র প্রসব করে। এদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি কম। পুরুষের অনুপাতে শতকরা ৪১৫ জন ইত্যাদি" উক্তির ন্যায় সমগ্র সমাজকে দোষী করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

তবে মনুর উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহে নারী আত্মবিস্মৃত হইয়া আবার Catabolic (ধ্বংসশীল) না হয়। সমাজে আবার মহামারী প্রবেশ না করে। সাংসারিক কাজকর্ম্ম নারী ও পুরুষ যদি বিভাগ করিয়া না নিয়া কার্য্য করিতে থাকে তবে অচিরেই সাংসারিক সুখশান্তি সমাধি প্রাপ্ত হইয়া "যথারণ্যম্ তথা গৃহম্" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে।

পুরুষ স্বার্থপর—নারী পরার্থপর। পুরুষ ব্যক্তিগত সুখ চায়, নারী পরের সুখের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সদা প্রস্তুত। পুরুষ চঞ্চল, তরল আমোদ প্রিয়—নারী স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা। পুরুষ উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল,—আর নারী তাহার পশ্চাতে রাশ ধরিয়া শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ শক্তির ক্ষুদ্র কণিকামাত্র—নারী শক্তির আধার। পুরুষ কঠোর, নারী কোমল। হিন্দু আদি যুগেই এই সকল তত্ত্ব জানিত বলিয়া নারীকে পুরুষের নিয়ামক করিয়া গৃহলক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নহিলে, নারীও বাহিরের কঠোর আব্‌হাওয়ার স্পর্শে স্বেচ্ছাচারে প্রমত্ত হইয়া পৃথিবীতে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত।

নারী আধার বা ক্ষেত্র—পুরুষ আধেয়। যদি স্বাধীনত বনাম স্বেচ্ছাচারে বিপরীত গুণ সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘর্ষে সেই আধার বা ক্ষেত্র দূষিত হইয়া উঠে তাহা হইলে সমাজের স্থান কোথায়? সমাজ রক্ষায় নারীর দায়ীত্ব পুরুষের চেয়ে অনেক অধিক। ঐ দায়ীত্ব পরার্থপরা নারী একদিন স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া নিয়াছিল।

অধুনা আমাদের দেশে সংস্কারকগণ ও অতি শিক্ষিতাগণ স্বাধীনতার জন্য পাশ্চাত্যানুকরণে ঘোর কোলাহলে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। পরার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থপরতার ঘোড়দৌড় খেলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের মূলমন্ত্র ত্যাগকে বিসর্জ্জন দিয়া বিলাসবাসনার তীব্র মদিরা পানে তাহারা বিহ্বল। পোষাক পরিচ্ছদে অজস্র মুদ্রা জলের মত ব্যয় হইতেছে। যেথানে সংযমের অভাব, ধ্বংস সেখানে অনিবার্য্য। মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালী আজ গৃহ ও সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জা চর্ব্বণে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যে বাংলার বক্ষের পঞ্জর এক একখানা খসিয়া পড়িতেছে—দারিদ্র্যের নাগপাশে ঐ জাতিটা আজ দৃঢ়বদ্ধ। আমাদের

সমাজ এখন আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট মহাশ্মশান। বাংলায় এখন "ঘোরারাবী মহারৌদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী" ধ্বংসমূর্ত্তি তাণ্ডব নৃত্যে বেড়াইতেছেন। বাংলা আজ মৃত্যুপথের পথিক। ঐ জন্য দায়ী কে? অন্ধের মত বাল্যবিবাহের ঘাড়ে দোষ চাপান বৃথা, শুধু একটী মিথ্যার দ্বারা আর একটা বিরাট ভ্রান্তিকে আবৃত করার চেষ্টা মাত্র। সংযমের অভাব ও দারিদ্র্যই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ; একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নহিলে বাঙ্গালী কখনও এমন উপেক্ষিত জীবন যাপন করে নাই। মহাভারতে দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙ্গালী বীরগণ কৌরব পক্ষে থাকিয়া অসীম বীরত্ব ও আলোকসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল। বাংলার সাম্রাজ্যস্পৃহা একসময়ে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার রাজপুত্র এক সময়ে সপ্তশত মাত্র বঙ্গ সন্তানের সহায়তায় দুস্তর বারিধি পারে সুদূর সিংহলে সগর্ব্বে বিজয়বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিলেন। বাংলার বণিক অকুতোভয়ে তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত সাগরবক্ষ ভেদ করিয়া সিংহল, যাবা, সুমাত্রা, শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। বাংলার রাজা গণেশ, সীতারাম, মুকুন্দরাম, চাঁদরায়, কেদাররায়, প্রতাপাদিত্য, ঈশাখাঁ প্রভৃতি বীর পুত্রগণের বীরত্ব গাথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর বাহুতে বলের অভাব ছিল না। আর আজ বাঙ্গালী দুর্ব্বল, ভীরু, বলীবর্দ্দ বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট উপহাসাস্পদ। শস্য-শ্যামলা বাংলার শস্য-সম্ভার বিদেশীয় শাসনে প্রচুর পরিমাণে দেশান্তরে রপ্তানি হইতেছে। খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইতেছে; তদুপরি আমরা পাইতেছি বিদেশীয় শাসক হইতে প্রচুর পরিমাণে বিলাসের সামগ্রী। বিলাসিতা দারিদ্র্য আরও বাড়াইয়া দিতেছে। গৃহলক্ষ্মীগণের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইতে গৃহস্থ আজ ফতুর হইবার উপক্রম হইয়াছে। সমাজের সর্ব্বত্র ধ্বংসপ্রবণতা কাজ করিতেছে। বর পণে কন্যার পিতার বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। এই ধ্বংসপ্রবণতা আরো কিছুদিন কার্য্যকরী থাকিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে সংস্কারকগণ তাহা ভাবিবার অবকাশ কখনো পাইবেন কি?-না মরীচিকার পশ্চাতে অন্ধের মত শুধু ঘুড়িয়া বেড়াইবেন।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী আজ গৃহলক্ষ্মীদিগকে বিলাসের বিনোদিনী তৈয়ার করিয়াছে,—ষোল আনা পূর্ণ হইতে আর বাকী নাই। উচ্চশিক্ষার নামে নারী চরিত্রে অসংযমের ভাব রুদ্র-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় নারী সমাজ এখন সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া হাবেভাবে, বাক্যালাপে, ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, চালচলনে ইয়ুরোপীয় ললনাকুলের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হোটেলের খানা না হইলে মুখরোচক হয় না। অনেকে নাকি ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায়ও মত্ত। নারীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত Sir Almroth Wright বলেন "The women are insolvent; they do not pay their way; they should be grateful if they do not starve; still more if they live in ease and luxury; grateful to man who "makes all the money."—Catabalic tendency যে নারী চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে।

শিক্ষা নারীর উপায় হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র হইতেছে প্রধান লক্ষ। কি কাজ এই সংযমহীন শিক্ষায়? বিদ্যা ত বিনয় দিতে পারে নাই, অহং ভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে মাত্র। লালসার অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেয় যে শিক্ষায়, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" যে শিখায়, তাহাকে ত্যাগ করা চলে না কি? নারী অশিক্ষিতা থাকুক ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে, কিন্তু তাহারা যে ভারতীয় আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশীয় আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে গার্গী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীই তাহাদের আদর্শ পাশ্চাত্য ললনাকুল নহে। প্রাচীন ভারতে নারী-শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। তাহা মহাভারতে দ্রৌপদি-চরিত্র পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তারপরে বৌদ্ধযুগেও নারীশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। উক্ত কামশাস্ত্রানুসারে নারীগণকে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিতা হইতে হইত।

বিলাসের স্রোতে সমাজ এখন হাবুডুবু খাইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষিতাগণ নিত্য নূতন পোষাক ও fashion আমদানী করিয়া শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল নারীর মনেই এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আয়ের পথ নাই কিন্তু ব্যয় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী শিক্ষার হলাহল পানে সমাজ এখন অস্থির—তাহার মজ্জায় মজ্জায় বিষের তীব্র ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ বণিকের জাতি, তাহারা চায় কামধেনুর মত ভারতকে দোহন করিতে, তাই এই সংযমবিহীন শিক্ষা। তাহারা জানে নারী চরিত্র অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রিয় ;—তাই আমাদের দেশে নিত্য নূতন এত fashionএর আমদানী—নহিলে তাহাদের পণ্যদ্রব্য কাটে না। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে লেখা-পড়ার চেয়ে কাপড় কোঁচান এবং বেশভূষার পারিপাট্য বেশী মনযোগ সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য ললনাকুল এখন দীর্ঘ কেশপাশ বহন করিতে চান না; তাহারা পুরুষের মত করিয়া চুল কাটান। সে চাঞ্চল্যের ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়া পৌছিয়াছে। India Britanised হইবার বেশী দেরী নাই। ঐ কথা তথা-কথিত সংস্কারকগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? শিক্ষিতাগণ দিন দিন বিলাসের দাসী হইয়া পড়িতেছেন। স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র সাম্যবাদের অগ্রদূত আমেরিকার নারীসম্বন্ধে William Thomas কি বলেন শুনুন "The American woman of the better classes has superior rights and no duties yet she is worying herself to death ; not over specific troubles, but because he has lost her connection with reality. Many women, more energetic and more intelligent than their husbands and brothers, have no more serious occupations than to play the house cat, without ornament"—এ কি অবস্থা—অতি শিক্ষার এ'কি পরিণাম ? বিলাস ছাড়া ইহারা কিছুই জানেনা। মার্কিণ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মেয়েদের পরিচ্ছদের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। ঐ সব দেশে হাজার হাজার লোক দেনার দায়ে আদালতে উপস্থিত হয়। এই সব অবস্থার কারণ কি ?—বিলাসিতা নয় কি ?

নারী সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি'। এই যুগে ইয়ুরোপের সমাজে বহির্মুখীনতার প্রভাব এত বেশী যে কেন্দ্রানুগ শক্তি সমাজ গঠনে এক প্রকার অসমর্থ। ইয়ুরোপ শিক্ষায়, দীক্ষায়, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ; কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবন যাত্রা কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরা জীবনযুদ্ধে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত—তাই পুরুষ সহজে বিবাহ করিয়া ভার বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক ;—কারণ সে নিজেই অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কত কুমারী মনোমত পাত্রের অপেক্ষায় চিরজীবন অবিবাহিতা থাকে ; কাহারও বা স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে—সাবালক পুত্র জীবন যুদ্ধে পর হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহ, প্রেম, কোমলতা যাহা নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার পূর্ণ সাফল্য তাহারা পায় না। তাই য়ুরোপ নারী সমাজে এই বিদ্রোহের ভাব।

শান্তির আসল দিকটা যখন তাহাদের সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়—তাহারা প্রাণের তৃষ্ণার শান্তির জন্য নকলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। টেবিল, চেয়ার, কৌচ, কেদারা পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসে ভোগে তাহারা শূন্য মনটা পূর্ণ করিয়া নিতে চায়। ইয়ুরোপে চিরকুমারীর হৃদয়নিহিত স্নেহরস বাস্তবের পথে বাধা পাইয়া অবাস্তবের পথে নিষ্ফল ব্যয় হয়। ইহাতে তাহাদের নারী প্রকৃতির চরিতার্থতাতো হয়ই না,—পরন্তু, নিজেদেরও প্রকৃত পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। সুখের পথে বাধা পাইয়া পাশ্চাত্য নারীকুল এখন বন্ধনহীন, প্রেমহীন, নীরস কঠোর স্বাধীন হইয়াছে। ইয়ুরোপ তাহার কবির উপদেশ ভুলিয়া সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চাত্য কবি Tennyson বলেন—

"Man for the field, woman for the hearth,
Man with the sword-with the needle she,
Man with the head, she with the heart,
Man to command, woman to obey,
All else confusion."

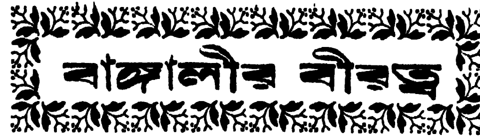
পাশ্চাত্য সমাজে কবির বাণী সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। পাশ্চাত্যানুকরণে নারীর এই প্রকার মরুভূমির মত স্বাধীনতা ভারত সমাজের কল্যান কি পরিমাণে সাধন করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য। তাই মনুর "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রং অর্হতি"র ব্যবস্থা। পুরুষের ঘাঁড়ে যদি বোঝা না চাপে তবে সে সহজেই দায়ীত্বহীন উচ্ছৃখল হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যবস্থা নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য। নারী কেন্দ্রাণুগ শক্তিদ্বারা সমাজকে পরিপোষণ করিবে—পুরুষ তাহাকে প্রতিপালন করিবে। উক্ত ব্যবস্থায় উভয়েই দায়ীত্বে বদ্ধ—সমাজও শৃঙ্খলাবদ্ধ।

য়ুরোপের তুলনায় আমাদের সমাজে নারী অশিক্ষিতা, একথা অস্বীকার করা চলে না;—কিন্তু শিক্ষায় যে তাহাদিগকে আপনাভাবিনী করিয়া তুলিয়াছে,—জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাহারা যে স্বার্থপর হইয়াছে!

শিক্ষায় তাহাদিগকে সংযম শিখাইতে পারে নাই। আবার আমাদের সমাজে নারী প্রকৃতির স্বার্থকতা পতি পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র লইয়া। স্নেহ, দয়া, প্রেম কোমলতার চরিতার্থতায় নারীপ্রকৃতির পূর্ণ সার্থকতা। কৌচ, কেদরা, কার্পেট, টেনিস-লন, বলনাচ প্রভৃতি আমাদের সমাজে না থাকিলেও নারী জীবন ব্যর্থ হইতেছে মনে করা একটা বিরাট ভ্রান্তি। য়ুরোপের মত অবাস্তবের পথে শুষ্কহৃদয়ে কুকুর বা বিড়াল পোষিয়া জীবপ্রেম আমাদের নারী শিখেনা বটে। তাহারা পায় বাস্তবের পথে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি। আমাদের নারী ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া প্রাণের তৃষ্ণার শান্তি পায়। অত্যাচারী পতি বা অত্যাচারী পুরুষ যে আমাদের সমাজে নাই, একথা বলা চলেনা বটে;—কিন্তু য়ুরোপেও ঐরূপ পুরুষ বা পতির অভাব নাই।

স্নেহ প্রিতীরস—পূর্ণ হৃদয় লইয়া গঠন শীলতা আমাদের নারী সমাজের বৈশিষ্ঠ। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব তরঙ্গ ঐ বৈশিষ্ঠটুকু দিনের পর দিন ক্ষুন্ন করিতেছে। মরুভূমির মত মহা শুষ্কতা ও শূন্যতা, অবাস্তবের পথে সুখের তৃষ্ণা,—অসংযমের প্রাবল্য আমাদের নারী সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষায় নারীর anabolic tendency দিন দিন নষ্ট হইতেছে। পুরুষ সর্ব্ব সমাজেই কিঞ্চিদধীক অসংযমী? কেন্দ্রানুগ শক্তি অসংযমের স্রোতে নিজের বৈশিষ্ট ভাসাইয়া দিয়া বহির্মুখী পুরুষের শক্তিকে অন্তর্মুখী করিতে অসমর্থ। শিক্ষার সঙ্গে সংযমের যোগ চাই,—নহিলে সে শিক্ষা কল্যাণকরী হইবে না। পরার্থপরতা, গঠনশীলতা নারীচরিত্রের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষায় নারী যাহাতে লক্ষ্যহারা না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে! মনে রাখিতে হইবে আমাদের সমাজ, ধন, জন, বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। আর নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

শিক্ষায় যাহাতে নারী অসংযমী না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কারণ নারীই ভবিষ্যত সমাজের আশ্রয়-স্থল,—শিক্ষয়িত্রী। নারী যদি উচ্চাদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিতে না পারে তবে সমাজও ধীরে ধীরে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিয়া যাইবে। Ibsen বলেন—"Nearly all men who go to ruin early have had untruthful mothers"— এ'কথা অতি খাঁটী। তাই সমাজে আজ এই অবস্থা। তাই বলি নারী!—আজ তোমরা দাঁড়াও,—বিলাসের ফাঁস হইতে নিজদিগকে মুক্ত কর,—সংযমের মধ্য দিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হও। নহিলে কে ভবিষ্যত সমাজকে গঠন করিবে?



রাজা গণেশ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্য-ভারতী

আমরা দেখিয়াছি, কেবল মাত্র হিন্দু রাজন্যবর্গই ক্ষাত্রধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রতিপালন জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন। হিন্দু প্রজার সে বিষয়ে সহানুভূতি ছিল না; তাহারা নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকিত এবং তাহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। রাজার পরিবর্ত্তনে হিন্দুপ্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজার বশ্যতা স্বীকার করিত। বাদশাহ্ বাবরও তাঁহার আত্মচরিতে একথার সমর্থন করিয়া বলেন, বাঙ্গালীরা শুধু রাজ-সিংহাসনের উপরেই শ্রদ্ধাবান্, সেই সিংহাসনে যিনিই উপবিষ্ট হউন না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। *

পাঠান শাসন কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একথার সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সুলতান গিয়াসুদ্দিন পিতৃহত্যার মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন, তিনি ইতিহাসে ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাবৎসল নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহা হোক্, কখন কখন দেখা যায় যে সেকালেও রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে বুদ্ধিমান্ শক্তিশালী ভূস্বামী বাহুবলে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। এই রাজপরিবর্ত্তনের সহিত বঙ্গের জন-সাধারণের বেশ সহানুভূতি ছিল। রাজা গণেশের কাহিনী ইহারই একটী উদাহরণ।

রাজা গণেশ ভাতুরিয়ার পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জিলার অন্তর্গত।

রাজা গণেশ ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীনের আমলে, রাজসভার একজন প্রধান আমীর। রাজসভায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, স্বরাজ্যে তাঁহার সেনাবল ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সমচক্ষে দেখিতেন। রাজা গণেশের বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ নাড়িয়াল ওঝা,—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥"

—ঈশান নাগর বিরচিত "অদ্বৈত প্রকাশ"।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেহান্তর হইয়াছে, সে দুই শত বৎসরের কথা। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার স্বাধীনতা-রবি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। তারপর বঙ্গের রাষ্ট্রগগনে যে এক ভীষণ উল্কা রেখাপাত করিল তাহা দিন দিন বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন, সামাজিক সঙ্কীর্ণ-তাদির দ্বারা বাঙ্গালার আকাশ বাতাস তীব্র পূঁতিগন্ধময় করিয়া তুলিল। যখন ধনী, দরিদ্র সকলের ঘরে ঘরে একটা হতাশার উৎকট উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইল, তখন দক্ষিণ বঙ্গের গগনকোণে একটা অস্পষ্ট আলো দেখা দিল। প্রজা-সাধারণের ক্ষুন্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া রাজা গণেশের শরণাগত হইল। গণেশ তাঁহার মঙ্গল হস্তে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

* Tuzak-i-Babari: Elliot,—Vol. IV. P. 260,—The people of Bengal say, "We are faithful to the throne; whoever fills the throne we are obedient and true to it.—"

গণেশ নারায়ণ নির্ভীক বীর পুরুষ ছিলেন। কাপুরুষ-জনোচিত বিশ্বাসঘাতকতা বা রাজদ্রোহিতা কাহাকেবলেম তিনি জানিতেন না। তিনি সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রজার দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন গিয়াসুদ্দিনের পুত্র সৈফউদ্দীন বঙ্গের সুলতান। তিনি রাজা গণেশকে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন। তাঁহার পোষ্যপুত্র ও বঙ্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আলিম শা তৎস্থানীয় হইয়া সমুদয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। আলিম শা উদ্ধত যুবক, অসংযত ও অপরিণামদর্শী। তাঁহার প্ররোচনায় ও অনেকটা স্বীয় দৌর্ব্বল্যহেতু সুলতান রাজ্য গণেশ নারায়ণের উপদেশ উপেক্ষা করিলে গণেশ বলিলেন "প্রজার প্রতি দয়া হ'ল না, সুলতান! দরিদ্র প্রজাদের কল্যাণ করুন, হিন্দুকে মিত্র ভাবে গ্রহণ করুন, পাঠান রাজ্য অটুট থাক্‌বে। ভেবে দেখুন, জাহাপনা, প্রজার সন্তোষে রাজার শক্তি,—প্রজার অসন্তোষে রাজার দুর্ব্বলতা! অত্যাচারে রাজ শক্তির অপচয় হয়, প্রজার বাহুতে শক্তি সঞ্চয় হয়।"

সুলতান বাক্‌প্রয়োগ করিলেন না। আলিম শা বলিলেন, "গণেশ, তুমি পাঠানের শত্রু, পাঠানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে জাগাইতেছ, হিন্দুকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছ।"

রাগে ও ঘৃণায় গণেশ নারায়ণের চক্ষু ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আলিম শা, সে মিথ্যা কথা, গণেশ নারায়ণ এত সঙ্কীর্ণ নয়, সে মিথ্যা কাহাকে বলে জানে না। গণেশ রাজ্য চায় না, চায় শুধু শান্তি। হিন্দুকে অত্যবাস, সে তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে, পীড়ন কর, সে অস্ত্র ধরে দাঁড়াবে। সে জানে, আজ যদি বাঙ্গালী স্বাধীন হয়, কাল আবার পরাধীন হ'বে—কারণ, ঐক্যহীন, স্বার্থান্ধ বাঙ্গালী দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা কর্ত্তে পারবে না। বাঙ্গালী স্ত্রীপুত্র ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন কর্ত্তে চায় না। যখনি ধৈর্য্যচ্যুত হয়, তখনি অস্ত্র ধ'রে দাঁড়ায় যেমন পিপ্‌ড়েটাও মাড়ালে ফিরে কামড়ে ধরে।"

আলিম শা গণেশের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুঃখে ও ক্ষোভে গণেশ নারায়ণ দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

হিন্দুর উপরে অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব অপহৃত হইতে লাগিল। একদিন দৈবক্রমে গণেশ নারায়ণ স্বয়ং দেখিতে পাইলেন ইন্দ্রিয়ের দাস আলিম কতিপয় সৈনিক সহ একটী যুবতী হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তখন সন্ধ্যাকাল। পূতসলিলা কালিন্দী খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাজা গণেশ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া একাকী আলিম শা ও সৈনিকগণকে তরবারি সঞ্চালনে পরাভূত করিয়া রমণীর উদ্ধার সাধন করিলেন। রাগে আলিম শার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। গণেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রমণীকে সহ রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সুলতানের দরবারে গণেশ নারায়ণের তলব হইল। গণেশ নারায়ণ গজারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শত শরীররক্ষী চলিল।

সুলতান সৈফউদ্দীন দরবার গৃহে উচ্চ সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দরবার গৃহ লোকে লোকারণ্য। সিংহাসন পার্শ্বে আলিম শা। গণেশ নারায়ণ আসিয়া বিচারপ্রার্থীর স্থানে দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া আলিম শা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গণেশ নারায়ণ, বিচারপ্রার্থীর স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।"

গণেশ নড়িলেন না। আলিম শা পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গণেশ নারায়ণ, অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।"

গণেশনারায়ণ। আমার অপরাধ কি?

আলিম শা। রাজবিদ্রোহ।

গণেশ। রাজবিদ্রোহী আমি, না, তুমি! তুমিই পাঠান নরপতির সুনাম ধ্বংস করিতেছ।

আ। তোমার অপরাধ গুরুতর,—তুমি রাজসৈন্য নিহত করিয়াছ।

গ। আমার অভিযোক্তা কে?

আ। আমি।

গ। তবে তুমি আগে বিচার-প্রার্থীর স্থান গ্রহণ কর।

আলিম শা নিরুত্তর।

সুলতান এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গণেশনারায়ণ, তুমি রাজবিদ্রোহী ?"

গণেশ। কার্য্যতঃ নয়।

সুলতান। তুমি রাজসৈন্য নিহত করিয়াছ ?

গণেশ। করিয়াছি।

সুলতান। কেন ?

গণেশ। আত্মরক্ষার নিমিত্ত।

সুলতান। বিনা কারণে রাজসৈন্য তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল ?

গণেশ। আলিমশার আদেশে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

সুলতান। আলিম শা অকারণ কেন এরূপ আদেশ দিবেন ?

গণেশ। সেই কথা বলিতেই আমি অভিযোক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছি। নামিয়া এস, আলিম শা—অপরাধীর আসন গ্রহণ কর।

গণেশ নারায়ণের নির্ভীকতা দেখিয়া সভাসদ্‌গণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সুলতান অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা গণেশকে অমাত্য পদে বরণ করিলেন। এরূপে বিবাদের মীমাংসা হইল।

রাজা গণেশনারায়ণ সম্বন্ধে এরূপ বহু উপাখ্যান আছে। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, ইতিহাস সপ্রমাণ করে যে রাজা গণেশ দেশহিতে, লোকহিতে স্বীয় জীবনের মায়াকে উপেক্ষা করিতেন। তিনি পাঠান-গণকে নির্জীত রাখিতেন এবং তদীয় প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বাস করিত।

ক্রূরহৃদয় আলিম শা গণেশের অপমান ভুলিলেন না। দশ বৎসর রাজত্বের পর সুলতান সৈফউদ্দীন পরলোক গমন করিলে আলিম শা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গণেশ নারায়ণকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। গণেশনারায়ণ সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, আলিমশার আমলে হিন্দুর ধনমান কিছুই নিরাপদ হইবে না। হিন্দুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিন্দুকেই অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। সুতরাং রাজা গণেশ সাঁতোলরাজের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সাঁতোলরাজ ভাদুরী চক্রবর্ত্তী গণেশের সাহায্যার্থ রামাশ্যামার অধীনে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

রামাশ্যামা ছিল সে কালের প্রসিদ্ধ দস্যু। রাজ-সাহীর বিখ্যাত চলনবিল তাহাদের লীলাক্ষেত্র ছিল। ইহাদের প্রতিপত্তি এতাদৃশ ছিল যে সাঁতোলরাজ ও ভাদুরী চক্র ইহাদের বীরহুঙ্কারে কম্পবান্ হইত, এমন কি পাঠানরাজও ইহাদিগকে শাসনাধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই।

রাজা গণেশ উপযুক্ত সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া পাঠানরাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনিয়া আলিম শা আদেশ দিলেন, "প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ হইতে এক একজন বলিষ্ঠ যুবক ধরিয়া আন।"

আদেশ গণেশ নারায়ণের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারই ইঙ্গিতে হিন্দুগণ দলে দলে আসিয়া কারাগৃহ পূর্ণ করিতে লাগিল।

এদিকে গণেশ ভাদুরিয়া ও বর্দ্ধনকোট হইতে সৈন্য লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বঙ্গের অত্যা-চারিত ভারাক্রান্ত প্রজাগণ আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিল। যে লাঠি ধরিতে জানে তাহার হাতে লাঠি, যে তরবারি ধরিতে জানে তাহার হাতে খড়্গ, যে ধনুকে গুণ দিতে জানে তাহার হাতে তীর ধনুক, যে কিছুই জানে না তাহার হাতে শুধু বর্শা। এরূপে প্রায় ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীকে সজ্জিত করিয়া গণেশ সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু শিক্ষিত সৈন্যও ছিল। তাহারা সংখ্যায় এক সহস্রের অধিক হইবে না। সৈন্যেরা বলিষ্ঠ, কার্য্য-কুশলী ও শিক্ষিত। গণেশ স্বয়ং তাহাদের শিক্ষাদাতা।

তিনি বলিয়াছিলেন এই সৈন্যতুল্য পঞ্চাশ হাজার সেনা থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করা যাইতে পারে। রাজা গণেশ এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে বন্দী বাঙ্গালীদের মুক্ত করিলেন।

বাঙ্গালী তখনও নির্জীব হয় নাই, তখনও বাঙ্গালীর ভুজে অতুলনীয় শক্তি। বাঙ্গালীর অসাধ্য কিছুই ছিল না। শিল্পে, কারুকার্য্যে, হলাকর্ষণে, গৃহনির্ম্মাণে, রণক্ষেত্রে, নৌগঠনে, বাণিজ্যে, মল্লযুদ্ধে বাঙ্গালী একদিন অতুলনীয় ছিল। বাঙ্গালী ধর্ম্ম হারাইয়া একে একে সব হারাইল। বাঙ্গালী তখন বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী ছিল না। দেবতাজ্ঞানে রাজাকে পূজা করিত—এখন বাঙ্গালী দেবত্বে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে। এখন তাহার বাহুতে সে শক্তি, হৃদয়ে সে অধ্যবসায়, সমাজে সে ঐক্য কই ? সে স্বার্থত্যাগী, পরহিতব্রতাশ্রয়ী, সে বীরকুলগৌরব বাঙ্গালী কোথায় গেল ? আর কি জন্মিবে না ?

পাঠান বাঙ্গালীদের দেখিয়াছে, তাহাদের বীর্য্যও দেখিয়াছে। বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ঘা খাইয়া পাঠান বা মোগল আর সেদিকে ঘেঁসে নাই। তারপর সেদিন সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্য মোগলকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা ইতিহাস ভুলিলেও বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না।

ইতিহাস, বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু বীর্য্যগাথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী রাজা কিরূপে অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া লক্ষ সৈন্যের অধিপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম-ই-সরকীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছে। আবার কিরূপে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট, বিতারিত আরাকানের মগরাজা মেংসু-মেয়ানকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, * ইতিহাস সে কথা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইতিহাস এমনই অনেক কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা আজ ইতিহাস হারাইয়া ভাবিতেছি, বাঙ্গালীর ভুজে কোন কালে বুঝি শক্তি ছিল না।

শক্তি যে ছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতে রাজা গণেশ অগ্রসর হইলেন। অশিক্ষিত, অস্ত্রবিহীন বাঙ্গালী সেনা লইয়া তিনি দুর্দ্ধর্ষবেগে পাঠান নরপতির প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। অচিরে ফটক ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাঙ্গালীরা 'জয় পাটলা দেবীর জয়', 'জয় রাজা গণেশ নারায়ণের জয়' বলিতে বলিতে বাধামুক্ত নদী-প্রবাহের ন্যায় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠানের সহিত বাঙ্গালীর তুমুল যুদ্ধ হইল। আলিম শা নিহত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী রাজা গণেশের অঙ্কাশ্রয় করিলেন। পাঠান সিংহাসন উদ্বেলিত জাহ্নবীগর্ভে ডুবিয়া গেল।

মেঘ কাটিয়া গেল, বাঙ্গালার আকাশে নবীন সূর্য্য সমুদিত হইল। জাহ্নবী আবার কলকল নাদে বেদ-গান করিতে লাগিল—বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায় পাখীগণ আবার মাঙ্গলিক স্তোত্র গাহিয়া উঠিল, বিন্ধ্যাচল পুনরায় সমুন্নত মস্তক তুলিয়া সাহঙ্কারে চাহিয়া দেখিল। দুইশত বর্ষ পরে আবার বাঙ্গালার নীলাকাশ তলে বাঙ্গালীর নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল—বাঙ্গালার মাঠে ঘাটে আর্য্যকীর্ত্তি-গাথা আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। "মহারাষ্ট্রে শিবাজী এবং পঞ্জাবের রণজিৎ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা" এরূপ সম্মুখ সমরে মুসলমান ভূপতিকে নিহত করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই।

হিন্দুর ঘরে ঘরে জয় জয়কার উঠিল, আবার বাঙ্গালার মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ধূপধুনার গন্ধে দেবায়তনগুলি সজীব হইয়া উঠিল। যজ্ঞের ধূমে দেশ পবিত্র হইল, আবার সামের মধুর ধ্বনি জাহ্নবী সলিলে ভাসিয়া চলিল। হিন্দু বহুদিন পর পুনরায় নবজীবন লাভ করিয়া ধরণীতলে বীরপদভরে দণ্ডায়মান হইল।

* "১৪০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ মেংস্থমেয়ান পলাইয়া আসিয়া গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন জৌনপুর রাজের সঙ্গে গণেশের বিবাদ চলিতেছিল। গৌড়রাজের সেনার সাহায্যে আরাকান-রাজ স্বরাজ্যের উদ্ধার করেন ও আপনাকে গৌড়েশ্বরের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করেন।"

ঊষা

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত তত্ত্বনিধি

১ম অঙ্ক

৮ম গর্ভাঙ্ক

গোলাপী বাইজির দ্বিতল বাসভবনের সম্মুখস্থ বারেন্দায় বাইজি তয়কা হেলানে বসিয়া তামাক টানিতেছে—দাসীরা সন্ধ্যাবাতি ধুপধুনাদি দিতে ব্যস্ত।

কাল—সন্ধ্যা

(গোলাপী বাইজি, কুসুম, ওস্তাদজি, নরেন্দ্ররায়, দয়াময় সোম, হীরা ও কাহু)

ওস্তাদজির প্রবেশ।

গোলাপী—আইয়ে ওস্তাদ জি! ও হীরা! হীরা!

হীরা—(নেপথ্যে)—যাচ্ছি মা।

গোলাপী—কি কচ্ছিস্?

হীরা—এই যে দীপ ধরাচ্ছি—ধুপ-ধুনোর জোগাড় কচ্ছি।

গোলাপী—ও সব এখন রেখে দে। ওস্তাদজি এসেছেন—তার বস্‌বার জন্য একটা কুর্চ্চি নিয়ে আয়।

হীরা—ও মা! এ কি রকম কথা! সন্ধ্যা যে বয়ে গেল। বাতি জ্বালবো কখন? কাহুকে বলুন্ না।

কাহু—(নেপথ্যে) আর বোল্‌তে হবে না। এই আমি নিয়ে আস্‌চি মা।

(কুর্চ্চিসহ কাহুর প্রবেশ)

গোলাপী—বৈঠিয়ে ওস্তাদজি। মেহেরবাণি করকে উহা পার্ বৈঠিয়ে।

ওস্তাদজি—(বসিতে বসিতে) কেয়া বেটী! তোমরা তবিয়ৎ আচ্ছা হায়্?

গোলাপী—নেহি ওস্তাদজি! দুরোজ্ সে মেরা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হায়। মেজাজ বি ঠিক্ নেহি।

ওস্তাদজি—কাহে?

গোলাপী—দুরোজ রাতকো জেরা বোখার মালুম্ হোতা। আউর খানা পিনা কুচ্ নেহি আচ্ছা লাগ্‌তা। ইস্‌ওয়াস্তে মেজাজ বি মোরা বিগার্ গায়া।

ওস্তাদ খোদাকা মেহেরবাণিসে সব্ ছুট্ জাগা। বেটী! সব্ ছুট্ জাগা। তবিয়ৎ জরুর আচ্ছা বান্ জাগা।

গোলাপী—বহুত্ বহুত সলাম ওস্তাদজি! খোদাকা মেহেরবাণিসে দুনিয়ামে আপ্‌কা মেহেরবাণি হাম্ জাস্তি মান্‌তা।

ওস্তাদজি—তোমরা লারকি কাহা?

গোলাপী—কলেজকা একঠো ছুক্‌রীকা সাথ্ আন্দরমে বাত্‌চিৎ করণে রাহা। আচ্ছা হাম্ উন্‌কো বোলাতা। মা! কুসুম! কুসুম!

কুসুম—(নেপথ্যে) যাচ্ছি মা!

গোলাপী—বসে—বসে—কি গল্প কচ্ছিস্? কতক্ষণ হলো ওস্তাদজি এসেছেন! তিনি ফিরে যাবেন্ নাকি?

কুসুম—(নেপথ্যে) না ফিরে যাবেন কেন? এই যাচ্ছি।

গোলাপী—পাশের কোঠা হতে হার্‌মোনিয়মটে নিয়ে এসো। হীরা! ও হীরা! এক ছিলিম্ তামাক দিয়ে যা। আর আমার জন্য এক গেলাস্ জল নিয়ে আয়। বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে।

(হার্‌মোনিয়ম্‌সহ কুসুমের প্রবেশ)

কুসুম। আদাব্ ওস্তাদজি!

ওস্তাদ—বৈঠো। আভি কোন্ গানা কস্‌রৎ করতা?

কুসুম—আভি একঠো মর্ বাঙ্গলা গানা কসরৎ করতা থা।

(এক ছিলিম্ তামাক ও জলের গেলাস সহ হীরার প্রবেশ)

গোলাপী—(জল পান করিতে করিতে) বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছিল। প্রাণটা যেন ঝাৎ ঝাৎ কচ্ছে। আবার বুঝি জর আসে!

কুসুম—ওস্তাদজি! থোরা ঘড়ি বৈঠিয়ে। হাম্ জল্দি ঘুমকে আতা। মা! ও মেয়েটী আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বোন্‌ঝি। ও আর আমি এক এক ক্লাশেই পড়ি। ওকে আমি বিদায় করে দিয়ে আসি।

গোলাপী—শীগ্‌গীর এসো। ওস্তাদজি বসে রলেন্।

কুসুম—যাবো আর আসবো। হদ্দ চার পাঁচ মিনিট গৌণ হতে পারে। (প্রস্থান)

ওস্তাদ—দেখো তোমরা বেটীকা আওয়াজ বহুত মিঠা!

গোলাপী—ঐ মিঠা আওয়াজ শুনকে কৈ রূপেয়া দেগা ওস্তাদজি? কোয়েলা বহুত মিঠি বোল্‌তা—এসি-ওয়াস্তে কৈ উন্‌কো রূপেয়া দেতা নেহি।

ওস্তাদ—নাহি দেনেসে কেয়া হরজ্?

গোলাপী—খানা-পিনা চলেগা কেইসে?

ওস্তাদ—উই মুস্কিলকি বাত হায় বেশাক।

গোলাপী—আচ্ছা— আচ্ছা— গানা— শিখ্‌নাই পরেগা।

ওস্তাদ—দেখো বেটী! গানা—বেচ্‌নেকা চিজ্ নেহি হায়। গায়েগী দিল্‌সে—বো শুনেগা—উহ মস্‌গুল হো জায়েগা।

গোলাপী—গানা বেচ্‌না সুরুৎ বেচ্‌না তো হাম লোক্‌কা পেশাই হায়।

ওস্তাদ—সমাজ্‌লিয়া বেটী—সমাজলিয়া। তোমরা লারকীকো যেয়সা মিঠি আওয়াজ—চেহারা বি উস্‌কা বহুত খাপ্‌সুরুৎ হায়। বো উনিকা গানা শুনেগা আউর সুরুৎ দেখেগা ওহি রূপেয়া দেগা।

গোলাপী—(স্বগত) সব সত্য ওস্তাদজি। সব সত্য। যে আমার মেয়েকে দেখবে—যে ওর দুটো গান শুনবে সেই ওকে ভালবাসবে। মনঃপ্রাণ সপে দিয়ে আত্মহারা হয়ে ওকে ভালবাসবে। কিন্তু অহো! চীর নির্ম্মল—চীর উজ্জ্বল—চীর পবিত্র শান্ত শীত চন্দ্রিকা যেমন মসীলিপ্ত কাচ মধ্যে নিপতিত হ'লে কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব প্রদান করে—এও তেম্নি। এই ভালবাসাও ঠিক সেইরূপ একটা কলুষিত কলঙ্কিত ঘোর কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব! এই সুর-সম্ভব সৌন্দর্য্য, কিন্নরী-সম্ভব সুমধুর কণ্ঠস্বর যদি পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়রূপ নির্ম্মল স্ফটিকস্তম্ভে প্রতিফলিত হ'ত তা হলে সে কত দীপ্তিময় শান্তিময় ভালবাসার প্রতিচ্ছায়া প্রদান কর্ত্তো তাহা কল্পনারও অতীত! স্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু তা হবার যো নেই। আমরা বেশ্যা! সমাজের ঘৃণ্য গণিকা! আমাদের রূপ, আমাদের গুণ দান প্রতিদানের জিনিষ নয়—শুধু কেনা-বেচার জিনিষ! অহো কি বিড়ম্বনা! কি দুঃখ! আমরা বেশ্যা। তাই রূপ বেচে খেতে হবে। নারীর রূপ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান, ইন্দ্রধনুর মত সর্ব্ববর্ণ-বিশিষ্ট—নভোমণ্ডলের মত মানব হৃদয়ে সর্ব্বব্যাপী! নারীর রূপ জগতে অতুলনীয়! সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্য্য এই রূপে লীন হয়ে যায়—শব্দ সঙ্গীতে বেজে উঠে—ভাষা ছন্দ গেয়ে উঠে—জ্ঞান-বিজ্ঞান অজ্ঞান উন্মাদে পর্য্যবসিত হয়। হায়! আমরা জঘন্য বেশ্যা, তাই রূপ বেচ্‌তে বসেছি! ঐ বালিকা আমার মেয়ে। কিন্তু আমি ওর গর্ভধারিণী মা নই। দুর্ভিক্ষের বছর এক নিঃস্ব ভদ্র পরিবারের মেয়েকে আমি টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি আমার মত বেশ্যাবৃত্তি কর্ত্তে—আমার মত রূপ বেচ্‌তে। একে যদি গৃহস্থের মেয়ের মত সুপাত্রস্থ কর্ত্তে পার্ত্তুম—তা হলে কত সুখের হতো! আঃ! মাথাটা ঘুর্চ্চে। আর বসে থাকতে পার্চ্ছিনে। যাই একটুকু শুয়ে থাকিগে। ওস্তাদজি! হামারা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি। আভি যাকে শুৎ রহেঙ্গে। হুকুম্ করিয়ে।

(হীরার প্রবেশ)

হীরা—মা ! বাহিরে দুটী বাবু দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে আস্‌তে চায়।

গোলাপী—কেন ? জিজ্ঞাসা কর্‌লি কি ?

হীরা—ওরা আরও একদিন এসেছিল। কোন্ জমিদারের ছেলে।

গোলাপী—ওঃ চিনেছি। ওরা কুসুমের গান শুন্‌তে চায় বুঝি। আচ্ছা আস্‌তে বল্ গে যা।

ওস্তাদ—ঠিক্ বেটী, ঠিক। আভি হামারাবি ইয়াদ হুয়া। গেয়া রোজ উন্‌লোক পাঁচ রূপেয়া দে গিয়া।

(নরেন্দ্ররায় ও দয়াময় সোমের প্রবেশ)

গোলাপী—আসুন আসুন। হীরা ! তুই শীগ্‌গীর যা ঐ ছোট সতরঞ্চ খানা এনে পেতে দে।

(হীরার প্রস্থান)

গোলাপী—আপনারা না আর একদিন এসে ছিলেন ?

দয়াময়—হাঁ।

গোলাপী—গান শুন্‌তে চান বুঝি ?

দয়াময়—হাঁ, বটে। দুটী একটী গান শুন্‌তে পাব কি ?

(হীরার প্রবেশ ও সতরঞ্চ পাতিয়া দেওয়া।)

গোলাপী—ওখানে বসুন্। মা কুসুম, তাড়াতাড়ি হারমোনিয়মটে নিয়ে এস। ওস্তাদজি ! ঘাব্‌রানা মাৎ। আপ্‌কো বি দু এক রূপেয়া মিল যায়েগা।

(হারমোনিয়ম সহ কুসুমের প্রবেশ ও উপবেশন)

ওস্তাদ--ফরমাইয়ে বাবুলোক। ফরমাইয়ে।

গোলাপী--ছোরদিজে ওস্তাদজি ! মা কুসুম ! তুমি যে দুটো বাঙ্গলা গান অভ্যাস কর্চ্চো সে দুটোই গেয়ে শুনাও না।

কুসুম—আচ্ছা গাচ্ছি।

(গান)

ভাল বাস্‌তে ভালবাসি, তাই তোমায় ভালবাসি।
অদর্শনে কেঁদে মরি দেখলে মুখে ফুটে হাসি ॥
কি যেন মাধুরি রূপেতে মাখিয়ে,
চাহনিতে কি মোহিনী লুকায়ে,
এলে যদি বঁধু ! যেওনা চলিয়ে
চরণে দলে এ দাসী ॥

যা কিছু ছিল মোর সকলি বিলায়ে
আমি গিয়াছি তোমাতে হারাইয়ে
বধ না হে বধু বালিকা হেলায়ে
দিয়ে গলে প্রেম ফাঁসি ॥

তোমারই স্বপনে যাপি নিশিদিন
দিওনা দিওনা ভাঙ্গিয়ে স্বপন,
(তুমি) নয়নের তারা, তৃষিতের ধারা
আমি হে প্রেম-পিয়াসী ॥



জগতে নিত্যই বাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। ইহার শান্তি কিরূপে হয় এ বিষয়ে বহু মনীষী অতি প্রাচীন কাল হইতেই মাথা ঘামাইতেছেন। অনেকেই অনেক কথা বলেন, কিন্তু জগতে আজিও শান্তি স্থাপিত হয় নাই এবং হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যই জানে।

পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদের বিলাসভূমি। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান নিতুই নব আবিষ্কার দ্বারা জড় জগতে একটা অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করিয়াছে। 'Greatest happiness of the greatest number' যাহাদের উক্তি তাহারা এরূপ কৌতুক পরিস্পর্দ্ধে কতখানি সুখ লাভ করিতে বা দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বিশ্ববাসী অনবগত নহে। Machine Gun, Torpedo boat প্রভৃতি মানুষ-মারা কলগুলিই কি শান্ত স্থাপনের পরিচায়ক! এদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য অনেকেরই রাত্রিতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিন্তু মানবজাতির ধ্বংসের কল নির্ম্মাণ করিতে কেহই নিরস্ত নহে। যাহা হোক্ 'ভালর ঝুটাও ভাল।' অনবরত সন্ন্যাস চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাসী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যখন 'ধুয়া' উঠিয়াছে, দেখা যাউক্ কেথোকার জল কোথায় গড়ায়।

এইচ্, জি, ওয়েলস্ ইংলণ্ডের জনৈক চিন্তাশীল লেখক। তিনি সম্প্রতি জগতে শান্তি আনয়নের একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ওয়েলস্ বলেন, বিশ্ব-প্রীতি ও বিশ্বশান্তি স্থাপন করিতে হইলে উৎকট স্বদেশ প্রীতি ও স্বজাতি প্রেম হৃদয়ে পোষণ করিলে চলিবে না। League of Nations (জাতি সঙ্ঘ) Disarm-ment Conference (নিরস্ত্রীকরণ সভা) এবং Universal Arbitration (জগতের সকল জাতির পরস্পর বিবাদ সালিশী নিষ্পত্তি)—এ সকল কাণে শুনায় ভাল বটে কিন্তু মূলতঃ প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ জাতির প্রতি অত্যধিক অনুরাগী। সুতরাং কেহ প্রাণের সহিত উক্ত সভা সমূহের কার্য্যকারিতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। ওয়েল্স্ আরো বলেন, বর্ত্তমান কালে প্রত্যেক দেশে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আছে, তাহাই যুদ্ধের মূল হেতু এবং স্বদেশ প্রীতিই ইঁহার ইন্ধন। "সুতরাং দেশ প্রীতিকে সুসংযত করিতে না পারিলে এবং দেশ সকলের সীমারেখা মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্র (World state) গড়িতে না পারিলে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের তিরোধাণের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।...মানুষ যতদিন স্বদেশাভিমানের দিক হইতে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য্য।" ওয়েল্স্ সাহেবের মতে বিশ্ব-রাষ্ট্র সর্ব্ব দেশ ও সর্ব্ব-জাতির রাজনীতি ও অর্থ নীতির কর্ত্তৃত্ব করিলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।

শাদা মেঘে জল দেয় না, শাদা কথায়ও কখনও কাজ হয় না। যেখানে স্বার্থ সেখানেই প্রতিযোগিতা,

এবং যেখানে প্রতিযোগিতা সেখানেই যুদ্ধ বিগ্রহ, বাদ বিসংবাদ। জগতের যত কাটাকাটি, মারামারি তাহার মূলে ত স্বার্থ ই। স্বার্থ থাকিবে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ' কাজে কাজেই যুদ্ধাদিও থাকিবেই। মূলতঃ গালভরা কথায় কোন কাজ হয় না, পেটভরা ক্ষুধায়ও সকল সময় আহার মিলে না। যতদিন মানুষ স্বার্থ ভুলিয়া বিশ্বজনীন প্রেমে বদ্ধ না হইবে ততদিন মানুষ মরিবেই যুদ্ধ করিয়া। সে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে একটা বিপুল অধ্যবসায়, অলৌকিক প্রতিভা, নির্ব্বাধ উৎসাহ ও বিপুল মনীষার প্রয়োজন। সেই মনীষা, সেই প্রতিভা, সেই অধ্যবসায় একদিন ভারতের হিন্দুর ছিল। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র মহিমময় বাণী এক দিন তাঁহারাই বজ্রনির্ঘোষে বিশ্বে প্রচার করিয়াছিলেন। তাই 'সত্য যুগের' অপূর্ব্ব সাম্যনীতিবিষয়ক পরিকল্পনা তাঁহাদেরই সম্ভব হইয়াছিল।

তাঁহারা জানিতেন—আত্মজয় করিয়া তবে বিশ্বজয় করিতে হয়। বিশ্বজয় করা যায়—পাশব বল দ্বারা নহে, maxim gun বা torepedo boat দ্বারা নহে, —কেবল বিশ্বগ্রাসী হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহ দ্বারা প্রীতি বা প্রেম বিশ্ববিজয়ী, ইহা ত্যাগেরই নামান্তর। সেই ত্যাগের, সেই প্রেমের উপর যে দিন বিশ্ব-রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে (?) সে দিন ধরাতলে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইবে, সে দিন পৃথিবীর অভিধান হইতে 'অশান্তির' চির নির্ব্বাসন হইবে।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ, মানুষের ভিতর দিয়াই দেবতার প্রকাশ হয়,— মানুষের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে বিশ্বের অনন্ত শক্তি। কালের মহাযাত্রার পথে বিশ্বমানব যে উদ্দাম, বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে একটা আদর্শের আশায় একটা ভাবের প্রেরণায়, একটা মুক্তির সন্ধানে।

পৃথিবীর দ্বিধা-প্রধাবিনী গতির মত মানুষের জীবনেও দুইটী গতি—একটীর কেন্দ্র নিজের ব্যক্তিত্বে অপরটির কেন্দ্র এক কল্পিত মানব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে। মানবব্যক্তিত্বে যে 'সত্য' নিহিত আছে, তাহাতে আর বিশ্ব মানবের অন্তরে যে নিত্য 'সত্য' বিরাজমান, তাহাতে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। বাস্তবিক বিশ্বের যাহা সম্পদ্, তাহা বিশ্ববাসীর আত্মব্যক্তিত্বেই তাহার অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া থাকে —The true universal finds its own manifestation in the individual.

এই ব্যক্তিত্ব অনুসারেই আমাদের উপনিষদের 'ব্রহ্মত্ব'—তত্ত্বমসি,—সত্যম্, শিবম্, অদ্বৈতম্। 'সত্য' নিজেই সত্য, তাতে আবার শান্তি মঙ্গলের অভিন্নতা। "এই অভিন্নতা বোধেই মানবে মানবে মিলন স্পৃহা, আর প্রেমে সেই মিলনের সম্ভবতা। প্রেমেই অপরের সঙ্গে নিকট সংস্পর্শ, প্রেমেই 'একের পক্ষে 'সমস্তের' মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার, প্রেমেই বিশ্ব আত্মার দ্বার উদ্ঘাটন করে।"

এই প্রেমকে মূল মন্ত্র করিয়াই ভারতের আর্য্য ঋষিগণ একদিন ভারতে 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ 'সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা' ফরাসীর নরশোণিত-প্লাবী সেই 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' নয়। ইহাতে শত্রু মিত্র ভেদজ্ঞান নাই— ইহার ধারণা, 'তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময় তোমা হইতে আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই।" এই সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার সংজ্ঞা একদিন দৈত্যকুমার পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদের মুখে শুনিয়াছিলাম,—

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

অর্থাৎ হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ যখন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা কেন? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন?"

এইরূপ সাম্যসাধনা দ্বারাই মৈত্রীর রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্র সকলেই স্বাধীনতা লাভ করে, কেহ কাহাকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। ইহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশ নাই,—ইহা আমার ভারত উহা আমার ইংলণ্ড, ঐ আমার ফ্রান্স এরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা উহাতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। 'Patriotism সেই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ধারণার ফল। Patriotism এর মূলে স্বার্থপরতা ও পরহিংসা।" সুতরাং ওয়েল্‌স্ সাহেবের সঙ্গে আমরাও বলিব "তুচ্ছ এই স্বদেশ প্রীতি, তুচ্ছ এই ব্যক্তিগত, সমাজগত স্বার্থ। এ সকল হীন স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভুলিয়া বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠ জীব জগতে সকলেই ভাই ভাই, উহাতে হিংসার, রেষারেষির স্থান নাই, আছে পরস্পর মিলন, ত্যাগ, প্রেম, প্রীতি।"

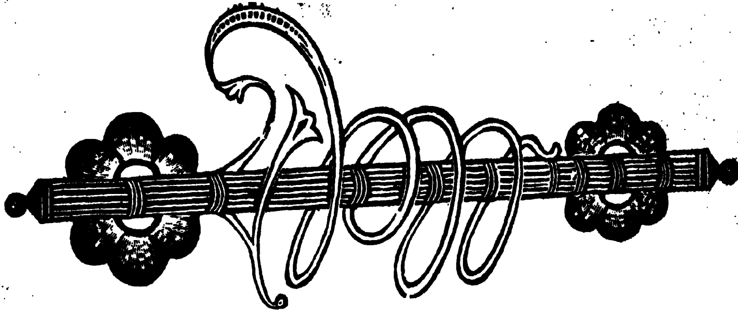
ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজগাঁ গ্রামে "দি বেজগাঁ রাজমোহন লাইব্রেরী" বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে পূর্ণ। নারায়ণগঞ্জে ইহার একটী শাখা বর্ত্তমান থাকিয়া বহু জনের জ্ঞানপিপাসার শান্তি করিতেছে। পরলোকগত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণের উৎসাহেই সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। সে আজ অষ্টাবিংশ বর্ষের কথা। সম্প্রতি ঐ লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবীদাস চূড়ামণি। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ ললিত ও মধুর ভাষায় শিক্ষার উপকারিতা এবং শিক্ষা বিষয়ে লাইব্রেরীর উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। [illegible] নাই। সহরের বিভিন্ন অংশে এবং প্রতি পল্লীতে এইরূপে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিলে বস্তুতঃ দেশের মহদুপকার হইবে সন্দেহ নাই।

তরুণদের লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা মস্তবড় রাহা-রানী কাণ্ড চলিতেছে। তরুণ সাহিত্যিকেরা নাকি সাহিত্যের মধ্যে নানা প্রকার আবর্জ্জনা ঢুকাইতেছেন এবং অনেক ভেজাল মিশাইতেছেন। তরুণদের দোষের মধ্যে দোষ এই যে তাঁহারা কাহিল বঙ্গভাষাকে গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া নানা-প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষাটাকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহা পাপের জন্য কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দের যেন ভাবনার চোটে ঘুমই আসে না। বিশেষরূপে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িতেছেন 'শনিবারের চিঠি।' পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে দেখা দিতেন তারপর এমন ঘুমই দিলেন যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে তরুণের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কে যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন, 'জাগ, জাগ, তরুণের এবার হবে বাজী মাৎ।' বড়ই গাত্রশূল হইল। এখন মাসিক রূপে বাহির হইয়া সাহিত্য সমালোচনার মুখস পরিয়া কতকগুলি ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করিয়া জন কতক লোককে জব্দ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু স্রোতের জল যখন আসে তখন সম্মুখের শত শত বাঁধ ভাঙ্গিয়াই চলে।

লেডী ড্রামণ্ড হে নাম্নী আর এক মার্কিন মহিলা মেয়ো বিবির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ভারতের কুৎসা প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মার্কিন নারীর পরহিতব্রত প্রশংসনীয় বটে! পরনিন্দা নিন্দাকারীর হৃদয়েরও ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচায়ক—Mockeries are the fumes of little hearts.



'বিদেশিনী'



সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয়বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩৩৪　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যথার কথা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জন্ম আমার মাইরে জানা, মরণও ঠিক তথৈব চ ;
মাঝখানে এই জীবন নিয়ে কর্‌ছি কেবল খচমচ !
যেই দিকে চাই দেখ্‌ছি অসীম দুখের পাথার কর্‌ছে ধূধূ ।
বুদ্বুদেরি মতন তা'তে ক্ষণিকের সুখ মিলায় শুধু ।

রঙীন্ আশার মায়ার মোহে বাড়্‌ছে তবু প্রাণের তৃষা !
হাৎড়ে মরি, পাই না নাগাল্, এযে জমাট আঁধার্-নিশা !
আঁকড়ে ধরে বল্‌ছি যাকে, 'এই যে আলো ! এই যে আলো !'
চ্যাচায় এরা, "এসব ছাড়ো ! নয় এ ভালো, নয় এ ভালো !"

আমার বিজন রাস্তা চলার সঙ্গী স্যাঙাত্ পাই না খুঁজি' ।
পেতাম যদি প্রাণের দোসর, দিতাম পাড়ি সোজাসুজি !
[illegible] দেখতাম অকূল সাগর, [illegible] দেখতাম [illegible] গিরি !
[illegible] 'হাতিগিরি' ।

হায়! তথাপি এদের মাঝে থাক্‌তে তিলেক চায় না হিয়া।
কথায় যারা তুষ্ট রেখে মার্‌তে চাহে গরল দিয়া!
'সভ্যতা'টা খুব চিনেছি, খুব চিনেছি 'মানবতা'!
ধাপ্পাবাজির আদর বেশী, পাচ্ছে ঘৃণা সরলতা!

হে ভগবান্, জুড়াও জ্বালা! ঝাঁজ্‌রা হোলো পাঁজর ক্রমে!
ইঙ্গিতে আজ পন্থা বাতাও। মাতাও যদি, রই না ভ্রমে!
ঘোর অসহায়, কোথায় উপায়! ফুরায় আয়ু, কাঁদ্‌ছি একা!
শান্তি-সুধার মিটাও পিয়াস, বিজ্‌লি-আলোয় দাওহে দেখা!

তাতেই আমার মলিন হিয়ায় উঠ্‌বে ফুটে' প্রেমের আলো!
অন্তরে মোর তলিয়ে যাবো; সেই যে আলো জ্বালো, জ্বালো!
তোমার কাছে ঢের চেয়েছি, এখন তা'তে দুঃখ জাগে!
এবার প্রভু চাই নে কিছুই, দাঁড়াও একটু আঁখির আগে!

নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শরৎ যখন বাঁকিপুরে গিয়া পৌছাইলেন, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও রৌদ্রের তেজ বিলীন হয় নাই।

ষ্টেশনে একখানা গাড়ী লইয়া তিনি প্রতুল মিত্রের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রায় মাইল খানেক যাইয়া গাড়ী থামিল, "এই বাড়ী বাবু,"—কোঁচম্যান হাঁকিল।

গাড়ীর উপর হইতে শরতের ভৃত্য রঘুনাথ নামিয়া পড়িয়া শরতের ব্যাগ নামাইয়া লইল, শরৎ গাড়ী হইতে নামিলেন।

বাড়ীটি বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর। সম্মুখে সবুজ তৃণাবৃত খানিকটা জায়গা, তারের পর তার দিয়া ঘেরা ফুলবাগান, সাময়িক নানা ফুলে শোভিত, ইহারই মধ্য স্থলে লাল বর্ণের বাড়ীখানি।

ফুলবাগানের মধ্যে কয়টী শিশু খেলা করিতেছিল। গেটের কাছে শরৎকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া খেলা বন্ধ করিয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। শরৎ ইহাদের মধ্যে বড়টীকে লক্ষ্য করিয়া মিষ্ট সুরে ডাকিলেন, "এদিকে এসো তো খোকা, একটা কথা বলি শোন।"

বিনা আপত্তিতে ছেলেটী তাঁহার কাছে সরিয়া আসিল। শরৎ বুঝিলেন ছেলেটী বেশ অমায়িক।

তিনি তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীটাই কি প্রতুল বাবুর বাড়ী, খোকা?"

বালক মাথা দুলাইয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁ। আমায় খোকা বল্‌ছেন কেন, আমার নাম জ্যোতির্ম্ময়, আমায় সকলে জ্যোতি বলে ডাকে, আপনিও আমায় জ্যোতি বলে ডাক্‌বেন।"

শরৎ মৃদু হাসিয়া তাহাতেই রাজি হইলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, তিনি কি বাড়ী আছেন?"

জ্যোতি বলিল, "তিনি কে,—আমার বাবা? না, তিনি বাড়ী নেই। আপনি বুঝি জানেন না, বাবা আজ এক মাস হ'ল মফস্বলে চলে গেছেন? মা বলেছেন, আজকালই তিনি আস্‌বেন। আপনি বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন বুঝি?"

ছেলেটীর মিষ্ট কথায় শরৎ তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসি নি বাবা, তোমাদের দেখ্‌তে এসেছি।"

জ্যোতি বিস্মিতনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে? ও,—আপনি বুঝি কল্‌কাতা হ'তে আস্‌ছেন?"

শরৎ বলিলেন, "হ্যাঁ,—"

"তা হলে মা আপনার কথাই বল্‌ছিলেন। চলুন ভেতরে,—এখ্‌খুনি যেতে হবে—"

আর সে ভদ্রতার ধার ধারিল না, নিতান্ত আপনার লোকের মতই সে শরতের হাতখানা চাপিয়া ধরিল। ছোট মেয়েটী বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে শরতের পানে তাকাইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ছেলেটী তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "এই মিনি, দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে আয়, আমাদের কাকাবাবু এসেছেন।"

দাদার ধাক্কায় সচেতন হইয়া মেয়েটী বাড়ীর মধ্যে মাকে খবর দিতে ছুটিল।

শরৎকে বারাণ্ডায় একটা গদি আঁটা বেঞ্চে বসাইয়া জ্যোতি গম্ভীরমুখে বলিল, "মিনিটা কি বোকা দেখেছেন? দেখ্‌ছে আপনাকে আমি টেনে আন্‌ছি,—জান্‌ছে আপনি আমাদের কাকাবাবু না হয়ে যায় না, তবু হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। বড্ড ছেলেমানুষ কিনা, তাই ওর মোটে বুদ্ধি নেই, না কাকাবাবু? আগে আমার মত হোক্, তার পরে বুদ্ধি হবে।"

তিনি আসিবার আগেই যে ইহাদের নিকটে এত পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, তাহা শরৎ মোটেই জানিতেন না। ছেলেটীর সরল ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিলেন; আধঘণ্টার মধ্যে সে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল।

রঘুনাথকে আপ্যায়িত করিতেও সে ভুলিল না। শরতের সহিত আলাপ করিয়া সে রঘুনাথের সহিত আলাপ করিয়া লইল। তাহার পরিচয় লইতে গিয়া সে যখন শুনিল সে অনেক কাল শরতের নিকটে আছে, তাহার কাকা ও পিতাকে সে এতটুকু বয়সে দেখিয়াছে, তখন সে বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ইস, তবে তো তোমার বয়েস অনেক হয়েছে। তোমায় কি বলে ডাক্‌বো বল দেখি, নাম ধরে তো ডাকা যায় না।"

রঘুনাথ হাসি মুখে বলিল, "নাম ধরে ডাকবে কেন খোকাবাবু, আমায় তুমি দাদা বলে ডেকো, আমিও তোমায় দাদা বলে ডাকব,—কেমন?"

মিনতি দাদার পাশে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্যভাবে ইহাদের দেখিতেছিল ও কথা শুনিতেছিল, কোন কথা সে বলিতে পারে নাই। তাহার দিকে তাকাইয়া রঘুনাথ বলিল, "আর তুমি খুকি, তুমিও আজ হতে আমায় দাদা বল্‌বে, আমি তোমায় দিদি বল্‌ব, রাজি আছ তো?"

মিনতি একটু হাসিয়া সম্মতি জানাইয়া দাদার পিছনে মুখ লুকাইল। হাসিয়া বোনটীর এলোচুলগুলা এলাইয়া দিয়া জ্যোতি বলিল, "মিনি মোটে কথা বল্‌তে পারে না দাদা, কেবল দুষ্টুমী কর্‌তে জানে।

মার কাছে পড়্‌তে বসলেই ওর জলতেষ্টা পায়, মনে হয়—বাইরে গেট খোলা আছে, গরু এসে গাছপালা বুঝি খেয়ে গেল। ঝি চাকর কেউ নেই কিনা, ওর তাই বড্ড মজা হয়েছে, সে রকম করে আর পড়্‌তে হয় না। মা সব কাজ কর্ম্ম সেরে দুপুর বেলাটা মাত্র ছুটি পান, সে সময় প্রায়ই মিনি কোথায় পালায় ঠিক নেই, যদিও বাড়ী থাকে—অমনি হাজার কাজ মনে পড়ে।

শরৎ আহার করিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি চাকর কেউ নেই ?"

জ্যোতির প্রফুল্ল মুখখানা নিমেষে অন্ধকার হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "মা বলেন—যারা গরীব তাদের ঝি চাকর রাখ্‌তে নেই। এই বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, মা বলেছেন,—তারা ওমাসে এসে এই বাড়ীতে থাকবে, আমাদের এই মাসেই উঠে যেতে হবে।"

তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণভাবে শরতের কাণে বাজিল। এই ছেলে ও মেয়েটীর মুখের পানে তাকাইয়া তিনি ইহাদের জননীর নিতান্ত অসহায় মূর্ত্তিখানা অন্তরে কল্পনা করিয়া লইলেন। হায়! হতভাগ্য প্রতুল, এমন দেবশিশু যাহার গৃহে সে এমন পাষণ্ড হইল কি করিয়া, কেমন করিয়া সব ভাসাইয়া সে চলিয়া গেল, ইহাদের এমন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে কি তাহার হৃদয় কাঁদে নাই ?

কিন্তু না, তাহারও বুঝি আর উপায় ছিল না, তাই সে এই মুক্তি খুঁজিয়া লইয়াছে। মোহে পড়িয়া তাহার মত অনেকেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহাদের অন্তরও আঘাতে আঘাতে শক্ত হইয়া উঠে, কাহারও সুখ দুঃখ বোধ করিতে এ শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই উদাস হইয়া থাকে।

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন, "তোমার মায়ের জ্বর মোটে ছাড়ে নি ?"

প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া মেয়েটী বলিল, "না, কাকাবাবু, মোটেই ছাড়ে নি।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নিয়ে সব কাজ কর্‌তে হয় ?"

মিনতি মাথা নত করিয়া বলিল, "তা নইলে আর কে করবে ? দাদা একদিন তরকারী কুট্‌তে আঙ্গুল এমন করে কেটেছিল যে মা আর কোনদিন তরকারী কুট্‌তে দেন না। আমি একদিন কড়া উল্‌টে ফেলে পা পুড়িয়ে ফেলেছিলুম। তখন বাবা এখানে ছিলেন; বাবা তার উপরে আমায় এমন করে মার্‌লেন যে কি বল্‌ব। মার তখন বড্ড জ্বর এসেছিল, শুয়ে পড়ে আর উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। আমি পুড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই তিনি তবু ছুটে আস্‌ছিলেন, বাবা আমায় অমন করে মার্‌ছেন দেখে মা কি রকম হয়ে গিয়ে মাথা ঘুরে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। তা আমি কি ইচ্ছে করে পা পুড়িয়েছিলুম, কাকাবাবু ? দেখুন না—কতখানি যে পুড়ে গিয়েছিল— ?

তাহার হাটুর কাছে পোড়ার দাগ দেখিয়া শরৎ শিহরিয়া উঠিলেন।

দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা মিনতির চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে দুই হাত উল্টাইয়া সেই জল মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা আগে খুব ভালবাসতেন, মা যদি আমাদের বকৃত, বাবা মাকে বক্‌তেন; সেই বাবা শেষকালে এমন মার্‌তেন আমাকে আর দাদাকে, তা আর কি বল্‌ব ? মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তেন, কোনদিন ধর্‌তে আস্‌তেন না। একদিন ধর্‌তে এলে বাবা তাঁকে গালাগালি দিয়েছিলেন, সেই জুতো দিয়ে মাকে পর্য্যন্ত মেরেছিলেন—

আত্মবিস্মৃত শরৎ বলিলেন, "তোমার মাকে পর্য্যন্ত মার্‌ত সে,—হৃদয়হীন—পিশাচ,—"

মিনতি বলিল, "উঃ, সে কি মার,—মা অত মার খেয়ে একটা কথাও বল্‌তেন না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌তেন না, বাবা চলে গেলে খুব

কাঁদ্‌তেন। আমরা আর কি বল্‌ব, দুজনে চুপ করে মার দুই পাশে বসে কাঁদ্‌তুম। মা বল্‌তেন—যদি আমরা না থাক্‌তুম তবে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তেন। শুনে দাদা খুব কাঁদত।

শরৎ একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে তাঁহার সুন্দর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র।

তিনি বলিলেন, "তুমি কাঁদ্‌তে না, মা ?"

মিনতি বলিল, "বা রে, মা কাঁদলে বুঝি কান্না আসে না ? আপনার মা ছিল কাকাবাবু ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস দমন করিয়া শরৎ বলিলেন, "ছিল বই কি !"

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা যখন মদ খেয়ে এসে আপনার মাকে মার্‌তেন, আপনার মা যখন কাঁদ্‌তেন তখন আপনি কাঁদ্‌তেন না, কাকাবাবু ?"

শরৎ বলিলেন, "আমার বাবা কোন দিন মদ খান নি, মিনু, আমার মায়ের গায়েও কোনদিন হাত তোলেন নি, কাজেই আমার মাকে কোনদিন কাঁদ্‌তে দেখি নি।"

মিনতি খানিক নীরব হইয়া রহিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মদ খান, কাকাবাবু ?"

তাহার প্রশ্নে শরৎ থতমত খাইয়া গেলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না।

মিনতি বলিল, "মদ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, মা বলেন—তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মাতাল হয়ে যায়। দেখুন কাকাবাবু, আপনি যেন কিছুতেই মদ খাবেন না ; মদ খেলে আপনি যে আমাদের এমন ভাল কাকাবাবু, তা আর থাক্‌বেন না, অন্য রকম হয়ে যাবেন। বাপরে, মদ খেলে মানুষগুলো কি ভয়ানক হয়ে যায়, দেখ্‌লে ভয় লাগে। আমি ওই জন্যেই তো বাবার কাছে যেতুম না।"

তাহার কথাগুলা শরতের অন্তর কাটিয়া বসিতেছিল। ক্ষুদ্র একটা শিশু, মাতালকে সেও কি ঘৃণা করে! আজ সে জানিতেছে শরৎ সচ্চরিত্র, কিন্তু পরে যখন জানিবে শরৎও মাতাল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া শরৎ নীরব হইয়া গেলেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন, "কোথায় যাবে তোমরা ?"

তেমনি করুণ কণ্ঠে বালক উত্তর দিল, "কি জানি, কিছু বলেন নি তো, শুধু আমাদের যে চলে যেতে হবে এই কথাই বলেছেন। সে দিন অমরের মা বেড়াতে এসেছিলেন ; মা কাঁদ্‌ছিলেন আর বল্‌ছিলেন কে,—আঃ, মিনি, চিমটি কাট্‌ছিস কেনরে ?"

মিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি মার কাছে গিয়ে বলে দিচ্ছি তুমি এমনি করে সব কথা বলে দিচ্ছো। মনে নেই—মা কি বলে দিয়েছে ?"

বিকৃত মুখে জ্যোতি বলিল, "ইস, বল্‌লি তো ভারি বয়ে গেল, আমিও বল্‌তে জানি,—আমি বল্‌ব আমি কিছু বলি নি।"

সে এ কথা বলিল বটে কিন্তু সে কথা আর তুলিল না। ক্ষুদ্র একটা বালকের এই সাবধানতা দেখিয়া শরৎ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রথমটা মনের ঝোঁকে সে যে সব কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল চকিতে মনে পড়িয়া গেল অন্য কাহাকেও সে সব কথা বলা অন্যায়।

শরৎ তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "সে বাবা, তোমায় কোন কথাই আমায় বল্‌তে হবে না। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, আমি যখন এসেছি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাবে। তোমরা বোধ হয় জানো না আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি, আজ দিনটা থেকে কাল পরশু নিয়ে যাব।"

একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া জ্যোতি বলিল, "আপনার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবেন, কাকাবাবু ?"

শরৎ তাহার বিস্ময় দেখিয়া একটু হাসিয়া

বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাদের না নিয়ে গেলে আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছিনে। আমার বাড়ীতে কোন ছেলে পুলে নেই অথচ ছেলেপুলেদের আমি বড় ভালবাসি।"

"কেন, আপনার ছেলে নেই?"

শরৎ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না—।"

একটু ভাবিয়া জ্যোতি বলিল, "না, আমাদের আপনার সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না।"

তাহার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া শরতের হাসি আসিতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "কেন?"

একটু উত্তেজিত ভাবে জ্যোতি বলিল, "বাঃ, আমরা যাব আর আমার মা বুঝি একলা এখানে পড়ে থাক্‌বেন? এই তো বাবা চলে গেছেন, মা আমাদের দুইজনকে কোলে নিয়ে বলেন,—'তোদের নিয়েই আমি বেঁচে আছি, নইলে কবে মরে যেতুম।' আমরা গেলে মা বুঝি বাঁচ্‌বেন? সেবার রামরশিয়া যেমন করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মাও তেমনি করে মরে যাবেন।"

কল্পনার কেমন একটা ছবি মনে করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

শরৎ বামহস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দূর্ বোকা ছেলে, আমি বুঝি তোমার মাকে একা এখানে রেখে তোমাদের দুটী ভাইবোন্‌কে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছি? আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব, তোমার মাকে পর্য্যন্ত।"

আনন্দ-পুর্ণ কণ্ঠে জ্যোতি বলিয়া উঠিল, "মাকে পর্য্যন্ত?"

শরৎ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

"হো হো, তবে আমি মাকে বলে আসি। মা আজ সকালেও কত ভাব্‌ছিলেন—"

শরতের আলিঙ্গন হইতে নিজকে ছিনাইয়া লইয়া সে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল।

আচমন সমাপ্তে শরৎ আসিয়া বসিলেন। মিনতি পান আনিয়া দিল, এতক্ষণে তাহার মনের ভুল ধারণা দুর হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে সে ইহাদের কি ভাবিয়াছিল তাহা সে জানে, এখন সে বুঝিয়াছে শরৎ তাহার সত্যকারের কাকাবাবু, কাজেই সে ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে আসিয়াছিল।

যখন ধীরে ধীরে সে বলিল, "জানেন কাকাবাবু, দাদাভাই কি দুষ্টু,—মাকে গিয়ে কি সব বলেছে যে খুব কাঁদছে। একে আজ ছয় সাতদিন জ্বর, জ্বর মোটে ছাড়্‌ছে না, তার ওপরে কেঁদে আরও মাথায় যন্ত্রণা ধরেছে।"

(১১)

অভাগিনী সেবার কথা মনে করিয়া শরৎ যথার্থই অন্তরে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হতভাগ্য প্রভুকে, সে না উচ্চ শিক্ষিত, তাহার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সে এমন করিয়াই নষ্ট করিয়া ফেলিল, এই সতী সাধ্বী স্ত্রীর মর্য্যাদা সে রাখিতে পারিল না, নিজের মনুষ্যত্বের সম্মান সে রাখিতে পারিল না, একটা মোহে পড়িয়া সব হারাইয়া ফেলিল?

শরতের মনে পড়ে নব পরিণীতা সেবার কথা। কি শান্ত তাহার মুখখানি, আজও সেবার কথা। ভাবিতে গেলে সেই নব পরিণীতা বধূটির কথাই মনে পড়ে, মাতৃমূর্ত্তিতে তিনি সেবাকে দেখিতে পান নাই, তাই সে মূর্ত্তি মনে ভাসে না। যখন পুতুলের বিবাহ হয় তখন তাঁহারা দুইজনে আই এ পড়িতে ছিলেন। এই নব বধূটীকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কতই না বিদ্রূপ করিতেন। দেবররূপে সেবাকেও কতদিন কতরূপে উত্যক্ত করিয়াছেন।

ধনীর একমাত্র আদরিণী কন্যা সেবা দুঃখ কি তাহা সে জানিত না, সংসারে আসিয়া যে কাজ করিয়া তবে খাইতে হয় তাহা সে জানিত না। তাহার পিতা বিবাহ দিয়া মারা যান, তাঁহার সম্পত্তিও ত কম ছিল না, সে সবই প্রতুল পাইয়াছিল। দুইদিনে কি করিয়া সে সেই প্রচুর সম্পত্তি উড়াইয়া দিল, ইহা

যথার্থই ভাবিবার কথা বটে। আজ সেই সেবাকে নিজের হাতে সব করিতে হইতেছে, ব্যারামকেও উপেক্ষা করিয়া পুত্র কন্যার আহার তৈয়ারী করিতে হইতেছে। প্রতুল অপমানে মুখ দেখাইতে না পারিয়া পাপের দংশনে জ্বলিতে জ্বলিতে কোথায় গিয়াছে কে জানে—তাঁহার সন্ধান ইহারা কেহই জানে না। সেই প্রতুল—তাহার আজ এই পরিণাম ভাবিতে শরৎ কোনও মতে দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময়টাতে শরৎ পড়ার ঘরে বসিয়াছিলেন, রঘুনাথ সহর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জ্যোতি কাকাবাবুকে নিজের পড়ার বহর দেখাইবার জন্য একরাশি বই লইয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে ছিল, মিনতি একটা ছোট টুলে বসিয়া বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিতে ছিল দাদা এত বই পড়িল কি করিয়া! নিজের না পড়ার জন্য এই মুহূর্ত্তটীতে সে বাস্তবিক লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

"মিনু"

"ওই মা আসছেন" বলিয়াই মিনতি সোজা হইয়া উঠিল। শরৎ পা দুইখানা জানালার উপর তুলিয়া দিয়া সকৌতুকে জ্যোতির পড়া শুনিতে শুনিতে সিগারেট টানিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া পা নামাইয়া বসিলেন।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া একটী রমণী।

একবার মাত্র সে মুখের পানে চাহিয়া শরৎ আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি যে কিশোরী সেবাকে একদিন দেখিয়াছিলেন, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে অটুট সৌন্দর্য্যে যে তখন ঝলমল করিতেছিল, এই কি সেই সেবা? এ যে শোকের মূর্ত্তি, একেবারে পাণ্ডুর সৌন্দর্য্য, ইহার দিকে তাকাইয়া হৃদয় বেদনাপূর্ণ হইয়া যায়। দুঃখ কষ্ট রোগের যন্ত্রণা সেবার মুখ খানার উপর নিজেদের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। শরৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"বসুন, দাঁড়াইবেন না, পড়ে যাবেন।"

আজ সেবার মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না, অবগুণ্ঠন দিবার আবশ্যকতাও আজ তাহার ছিল না। রমণী যতদিন না নিজেকে মাতৃভাবে ধারণা করিতে পারে, ততদিনই তাহার অবগুণ্ঠনের আবশ্যকতা থাকে, মা হইলে আর তাহার কোন দ্বিধা, লজ্জা সঙ্কোচের প্রয়োজন হয় না। শরৎ চাহিয়া দেখিলেন সে মুখ বড় মলিন। ভবিষ্যত ভাবনা সে মুখের উপর অন্ধকার মাখাইয়া দিয়াছে।

সেবার পা দুখানা কাঁপিতেছিল, সে বসিয়া পড়িল। শরৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার আস্‌বার কি দরকার ছিল বৌদি, আমায় একবার বল্‌লেই—"

সেবা মলিন হাসিল, বলিল "এইটুকু আমি বেশ আস্‌তে পারি, ঠাকুরপো, আমার কিছু কষ্টই হোত না যদি না পায়ে হোঁচট্ খেতুম।"

শরৎ তাহার পায়ের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন "ইস্ তাইতো, অনেকটা কেটে গেছে, রক্ত পড়্‌ছে যে—। মিনু, তোমার মায়ের পাটা আগে বেঁধে দাও তো মা।"

মিনতি একটু ছেঁড়া নেকড়া আনিয়া আঙ্গুলটা বাঁধিয়া দিল। সেবা আবার একটু হাসিয়া বলিল—"ওতে আমার কিছুই হোত না ঠাকুরপো ওতে আমি দৃক্‌পাতও করিনে। বুকে যে অহোরাত্র ভীষণ আঘাত পাচ্ছে, দৈহিক এ সামান্য আঘাত তার আর কতটুকু অনিষ্ট করতে পারে?"

শরৎ করুণনেত্রে এই হতভাগিনী নারীর পানে চাহিলেন। কথাটা যথার্থ সত্য। আঘাতে আঘাতে সেবার বুক একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৈহিক এমন কি বেদনা আছে যাহা তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে। সেবার মুখ চোখই তাহার স্বরূপ পরিচয় দিতেছে, মুখে বলা আর নিষ্প্রয়োজন।

শরৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি জ্যোতি মিনুর কাছে আগেই সব শুন্‌তে পেয়েছি বউদি, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে। আমি আপনাদের আমার বাড়ী

নিয়ে যাব। সেখানে যেতে আপনার কোন আপত্তি হবে কি ?"

সেবা দীননেত্রে শরতের পানে চাহিল, তাহার চোখদুটি ব্যথার অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে সেবা বলিল—"আপনি আমাকে নিয়ে গিয়ে আবার ভারী বিব্রত হয়ে পড়বেন।"

"বিব্রত"—শরৎ হাসিলেন "সত্যি বলছি বউদি, যদি তা ভেবে থাকেন, তা'হলে বড্ড ভুল করেছেন। আপনি জানেন না আমি জগতে একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী আমি, তাই এমন সঙ্গের প্রার্থনা করছি। কারণ এ রকম একঘেয়ে ভাবে জীবন যাপন করা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আপনার এই দুটী ছেলে মেয়ে, এদের সঙ্গ আমার এখন প্রার্থনীয়, এই সামান্য দু তিন ঘণ্টায় এরা আমায় এমন ভাবে আকৃষ্ট করেছে যে আমার মনে হচ্ছে যে এদের ছাড়্‌লে আমার এর পরের দিন গুলো কাটানো দায় হয়ে উঠ্‌বে। অকূল সমুদ্রে যে ভাসছে বৌদি, সে যদি একখানা তক্তা পায় আর কিছুতেই সে তা ছাড়্‌তে পারে না। আমার চির অন্ধকারাবৃত জীবনে যে আলোটী হঠাৎ জ্বলে উঠেছে, এ আলো যাতে চিরস্থায়ী হয়, তা আমার কর্‌তে হবে। অন্ধকার খনিতে যদি একবার আলো পড়ে, তারপর সে আলো যদি নিভে যায় তার অন্ধকারের গাঢ়তা আরও বেশী হয়ে উঠে। এখন এই ছেলেমেয়ে দুটীকে ফেলে চলে যাওয়া তা আর আমার দ্বারা হবে না। আর শুনছি নাকি এ বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে।"

শরতের এলোমেলো কথা শুনিতে শুনিতে সেবার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, এই শেষ কথাটা তাহার মুখ আবার অন্ধকার হইয়া উঠিল; সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে কথা সত্যি।"

তাহার মুখখানি অবনত হইয়া পড়িল।

শরৎ একটু হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"যাক, যা গ্যাছে তার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। আপনি আমায় অনেক আগে জানিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছেন বউদি, কিন্তু তবু আমি আর আগে আস্‌তে পার্‌তুম—নানা গোলমালে আস্‌তে পারিনি। আমার বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলেই মনে কর্‌বেন। আমি সত্যিই জ্যোতি মিনুর কাকাবাবু, আপনার ভাই। আমার বাড়ী যেতে আপনার কোনও আপত্তি কর্‌বার কারণ নেই।"

সেবা তাহার সজল চোখ দুটী শরতের মুখের উপর রাখিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "আপনার এ করুণাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার সঙ্গে যাব, কারণ না যাওয়া ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। এই ছেলে মেয়ে দুটী যদি না থাকৃত তবে কি কর্‌তুম বল্‌তে পারিনে, এখন কিন্তু এদের জন্যে আমায় মাথা নোয়াতেই হবে। কিন্তু তিনি যদি আপনার বন্ধু কোন দিন ফিরে আসেন ? মনের কষ্টে তিনি কোথায় চলে গ্যাছেন, লজ্জায় মুখ আর তুল্‌তে পারেন নি আমার সঙ্গে, এই ছেলে মেয়ে দুটীর সঙ্গে পর্য্যন্ত আর একটা কথা বলেন নি, কোথায় চলে গেছেন, আবার তো তিনি ফির্‌তে পারেন।"

শরৎ বলিলেন, "সে ভাবনা আপনার কর্‌তে হবে না, আমি সে সব ঠিক করে রেখে দিয়ে যাব। প্রতুল এখানে এলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনি এখন ভাল হয়ে নিন তো, আপনাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়। জ্যোতি, তোমার মাকে নিয়ে যাও, কাল সকালেই আমি ডাক্তারের বন্দোবস্ত কর্‌ব। যান বউদি, আপনি গিয়ে শুয়ে থাকুন। যখন দরকার হবে আমায় ডেকে পাঠাবেন, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।"

জ্যোতি মায়ের হাতে ধরিয়া বলিল—"ওঠ"।

কম্পিত পদে সেবা চলিয়া গেল।

শরৎ আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে এই মেয়েটীর অসাধারণ স্বামীভক্তির কথা ভাবিতে লাগিলেন। এত যে নিষ্ঠুর স্বামী, তবু সেই স্বামীর একটা নিন্দার কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। স্বামীর কথা উঠিতেই তাহার মুখখানা কি নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের বেদনা সবটাই ফুটিয়া উঠিল সেই বড় বড় দুটী চোখে।

নিষ্ঠুর প্রতুল—

ক্রমশঃ



প্রেম আগমনে

(শ্রীনিরঞ্জন সেন বি, এ,)

আমিতো বুঝিনি আগে
হেন বিষ জ্বালা লুকাইয়া রয়
অমন ফাগুয়া রাগে !
ও প্রেম আমি তো বুঝিনি কখন
ভিতর বাহিরে প্রভেদ এমন
কুসুম-পেলব তার আবরণ
পরশে শরীর দহে ।
উপরে এমন মধুর কলস
অন্তরে বিষ রহে ।

যখন প্রথমে আসি
দাঁড়াল সম্মুখে বঙ্কিম ঠামে
মুখে মৃদু মৃদু হাসি !
তখনো সভয় বেদনা পরাণে
উপেক্ষার শর সে যদি রে হানে
উতলা পরাণ প্রবোধ না মানে
এত যে বুঝাই তারে ।
'কম্‌লি'কে আমি ছাড়িতে যে চাই
'কম্‌লি' তো নাহি ছাড়ে !

৩

লভিলাম তারে যবে,
ভাবিলাম তবে দগধ এ হিয়া—
বুঝিবা শীতল হবে !
তৃপ্তি খুঁজিয়া যত না বেড়াই
তৃপ্তিরে আমি তত যে হারাই
যত পাই তত আরো পেতে চাই
মনে জেগে উঠে ভয় !
আমার নিধিরে হৃদয়ে হেরিয়া
বিধির যদি না সয় !





শ্রীসুবোধ রায় বি, এ

প্রাণটা বিষিয়ে ছিল, কান দু'টোও।

বল্লুম—ভাল লাগ্‌চে না। কোন কথা এখন শুন্‌তে পার্‌ব না।

ব্যথিত অপমানিত হ'য়ে ঘাড় নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলে না।

কি কর্‌ব উপায় নাই। আমার এ বজ্রাহত নিষ্করুণ হৃদয়ে আর এতটুকু মমতা সমবেদনা জানাবার কোমলতা নেই যা দিয়ে আমি পৃথিবীর কাউকে কিছুমাত্র আশ্বস্ত পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারি। এই স্বার্থপর, পিশাচ হীন মানুষের সঙ্গ আর ভাল লাগে না। একমাত্র নিজেকে আঘাত দিয়েই আমি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ একটা অপরিসীম তৃপ্তি পাই।

অপমান ভুলে আবার বলে—একবার চেষ্টা করেই দেখ না, নীরেশ বাবু ত তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু! এমন অসময়ে পাঁচটি টাকা ধার চাইলে কি আর দেবেন না? খুকীটার যে আজও জ্বর ছাড়ল না শেষটায় যদি কিছু বাড়াবাড়ী হয়! যদি শেষে—

ওর অস্থির আকুলতা দেখে হাসি পায়। দু'টী চোখে কি অপূর্ব্ব দরদ, কি অনন্ত ভালবাসা!

ভুলেই গেছলুম ও খুকীর মা। হয় ত' তাই হাস্‌তে পেরেছিলুম। ঐ একরত্তি মাংস পিণ্ডের ওপর ওর কী আকর্ষণ! পৃথিবীর সব মা-ই বুঝি ঐ এক রকম।

স্বভাবটা বুঝি আর শুধ্‌রানো যায় না।

পরক্ষণেই আবার তিক্ত কটু কণ্ঠে বল্লুম—পার্‌ব না, যাও। লাঞ্ছিত বুভুক্ষু ভিখারীর মতো আর কারও কাছে হাত পাত্‌তে পার্‌ব না। প্রাণ যায় তবুও না। আমি আমার দারিদ্র্যের অসম্মান ক'রে আর আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে পার্‌ব না, কিছুতেই না।

ও কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজেই কথা বলে। মিনতি ভরা সুরে নম্র কণ্ঠে বলে—ওঠ লক্ষ্মীটি ভারী অবুঝ তুমি! না না রাগ করো না ছি! তুমিও যদি এমন ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে চুপচাপ হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো, তা হ'লে আমি একা কোন্ দিক সামলাই বল ত?

মিষ্টি কথায় আর মন ভেজে না। ইস্পাতের মত কঠিন শক্ত হয়ে গেছে। কাণের কাছে সর্ব্বক্ষণ এই ঘ্যানঘ্যানানি এমন অসহ্য বিরক্ত মনে হয়।

বল্লুম—আমায় কি তুমি এক দণ্ডও সোয়াস্তি দেবে না? এ কি যন্ত্রণা বল ত? দিন রাত এমন ভাবে উদ্বাস্ত করে তুললে আমার এখানে বাস করাই দায় হবে দেখ্‌ছি।

আবার কিন্তু মোলায়েম সুরে নয়। আমার সুরে সুর মিলিয়ে বিরক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-বেশ ত না খেয়েই আজ আফিসে যেও তা'হলে। চাল নেই, ডাল নেই, এক কণা ক্ষুদ কুঁড়ও যদি হাঁড়ি হাত্‌রে

পাওয়া যায়! এক ফোঁটা দুধের জন্য মেয়েটা এত দিন ধরে কি কান্নাটাই না কেঁদেছে! সান্ত্বনা দেব কি, ওর মুখের দিকে চাইতেই—

সন্তানের দুঃখে মার প্রাণটাও বুঝি হঠাৎ কেঁদে উঠে। ধরা গলায় অভিমানের ভঙ্গিতে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে—আমার আর কি! ভারী ত পোড়া পেটের জন্য ভাবনা আমার! যা' ইচ্ছে কর তুমি! আমার এত দায় কিসের? রোজ রোজ পরের বাড়ীতে নির্লজ্জের মতো ভিক্ষা করতে থাকে—কেন কিসের জন্য?

দুঃখীর সংসারে এই সব কথাগুলো একটুও বেমানান খাপছাড়া শোনায় না। কিন্তু মাথায় আজ কেন জানি খুন চেপে গেল।

রাগে দুঃখে সর্ব্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠ্‌ল। আজকে উপোস ক'রে আফিসে যাবো ব'লে নয়, স্ত্রী পুত্র নিয়ে আরও কতদিন এমনই উপোস করে থাকতে হবে তাই ভেবে। বুক ফুলিয়ে একদম রুখে উঠলুম। এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন মানুষের ফুর্ত্তিহীন নিষ্ঠুরতার আর সীমা থাকে না।

ভুরু কুঁচকে কর্কশ কণ্ঠে বল্লুম—কী! এই ত' পরশু দিন চাল আনলুম! এরই মধ্যে সে গুলো সাবাড় করেচ?...এমন অভাবের সংসারেও দু'টী উড়ুক্কুরে বে-হিসাবী মেয়ে মানুষ ত' আর দেখিনে! এমন অভাবের সংসারেও দু'টী বেলা পেট পুরে না খেলেই নয়?...হুঁঃ আশ্চর্য্য।

কথাগুলোর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা নিজেই অনুভব করলুম। নারীর খাওয়া সম্বন্ধে তা'কে খোঁটা দেওয়া যে তা'র কত বড় অপমান, তা'ও আমার অজানা নয়।.........কিন্তু খিটি খিটি না ক'রেও যে পারিনে! অভাব আর অত্যাচারের পেষণে মানুষের প্রকৃতি যে কতদূর বীভৎস জঘন্য হ'তে পারে, আমি তা'র একটা জীবন্ত নমুনা।

পাতলা ফুরফুরে ঠোঁট দু'টী কাঁপিয়ে আবার কি বলতে চেয়েছিল।...... ...আবার বলবে? মুখ খানি শুকিয়ে একেবারে ফ্যাকাশে পাংশু হ'য়ে উঠ্‌ল। সবে পোঁতা চারা গাছটি প্রখর রৌদ্রের তাপে যেমন ঝল্‌সে ম্লান হয়ে পড়ে—তেম্‌নই।

চাক্‌রী যে আজ তিন দিন হ'ল খুইয়েছি—তা'ও জানে না। যদি বলি এখন, হয় ত' খুকীর মতো চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। থাক্—না বলাই ভালো। অনর্থক ওর দুঃখের মাত্রাকে আর বাড়াই কেন? জানতে ত' পারবেই একদিন।.........কিন্তু ওকে কাঁদাতেও যে ভালো লাগে!

* * * *

আকাশকে আজ ভারী কাছে পেতে ইচ্ছে করে। আমার এই পঙ্গু-বন্দী জীবনের অপার রিক্ততার সঙ্গে উদার আকাশের বন্ধন হীনতার বিনিময় করতে চাই... ... ...

নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়। মানুষের হাসি-কান্নার যে বিচিত্র বিপুল ধারা আমার চারপাশ দিয়ে ব'য়ে চলেচে, তা' থেকে আমি যেন বিচ্ছিন্ন। এই প্রাণ চঞ্চল পৃথিবীর প্রশস্ত বুকের মাঝখানে আমার যেন এতটুকুও ঠাঁই নেই, কিন্তু তা'র জন্য দুঃখও নেই। একান্ত মরিয়া হ'য়েই যে ফুরুতে হবে। নইলে যে বাঁচা হয় না। এই নিষ্করুণ কঠোর জীবন-সংগ্রামই ত' চলেচে সংসারে। ... ...

পৃথিবীর কাছে নিজেকে এমন অনাদৃত উপেক্ষিত জেনে আনন্দও হয় কিন্তু।

মাত্র আর দু'টী টাকা সম্বল। তবু দু'টী দিনও ত' খেতে পাবো। তারপর কি হয় সে কথা নাই বা ভাবলুম এখন। কি লাভ? অদৃষ্টে যা' আছে সে ত' আর খণ্ডন করতে পারব না। ... ...

আশ্চর্য্য! এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা কিন্তু হাসতে ভোলে নি। কি অসাধারণ দৃঢ়তা, কি অলৌকিক সহিষ্ণুতা! ......দৈন্য ওকে আজও পরাজয় স্বীকার করাতে পারে না। ... ...

টিনের প্যাঁট্‌রা থেকে শেষ সম্বল দু'টী টাকা বার ক'রে ও সহজ সুরেই বলে,—"এই দিয়েই এখন চলুক ত', তারপর দেখা যাবে।"

দু'টী চোখে সে কি নির্ভরতা!……টিনের প্যাঁট্‌রায় টাকা নেই বটে, কিন্তু ওর বুকের সিন্দুক যেন ভরাট্ হ'য়েই আছে।

কিন্তু সন্দেহ হয় এত সাহস এতখানি উৎসাহ ও পায় কোথায়? পাশের বাড়ীর ঐ সুখেন ওকে সাহায্য ক'রে না ত? আমার সঙ্গে ত' গায়ে প'ড়ে আলাপ জমিয়েচে। হঠাৎ তা'র এরকম অনুরাগ বা অনুগ্রহ প্রকাশের বাড়াবাড়িটা কেমন যেন অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনে হয়। সব দিক্ বজায় রেখে একটু সতর্ক হ'য়ে চল্‌বার জন্য আমার সঙ্গে পরিচয় রাখা যে দরকার তা' ও জানে। জান্‌বে না-ই বা কেন, এ অভিজ্ঞতা আজ্‌কেই ত' প্রথম নয় আর। নিঃস্ব কেরাণীর স্ত্রী, সুতরাং সুলভ হওয়াই স্বাভাবিক, এই হয় ত' তার ধারণা!

সান্ত্বনা কিন্তু অনেকদিনই ঐ ছেলেটির আপত্তিকর কুৎসিৎ চাহনি ও ভঙ্গীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েচে। ……মোটেই আশ্চর্য্য হই নি। আশ্চর্য্য হতুম ছেলেটি যদি ওর রূপের প্রভাবকে অমান্য ক'রে থাক্‌তে পার্‌ত, তা হ'লেই।

কথা বলে না কি? কি আর অসম্ভব এমন? আমার অসাক্ষাতে বল্‌তেও পারে। যে চাপা মেয়ে, ওর পেটের কথা বার করা আমার সাধ্য নয়। অবশ্য তাদের এভাবে গোপনে সাক্ষাৎ করার মধ্যে আমি কোনই অপরাধ দেখি নে। ‥ মেয়ে পুরুষে দু'টী কথা বল্‌লেই, মহাভারতটা একেবারে অস্পৃশ্য অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে, এমন অন্যায় ধারণা নীতিবিদ্ ভণ্ড পাণ্ডাদের থাক্,—আমার নেই।……দর্‌কার কি বাজে চিন্তায় আমার মাথাব্যথা কর্‌বার! সুখেন যদি সত্যিই ওকে কোনোদিন এতটুকু সাহায্য ক'রে থাকে, কিম্বা ভবিষ্যতে কর্‌বে ব'লেও আশ্বাস দিয়ে থাকে, তাহ'লে তা'র এ সহৃদয়তায়, উদার মহানুভবতায় আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত নয় কি? ‥‥ বিয়ে ক'রে বৌটীকে ত' চিরদুঃখিনী কর্‌লুম, কত লাঞ্ছনা কত অপমানই না সইতে হ'ল তাকে? স্বামী হ'য়ে তা'র গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতে পারি নে, এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ আর কি হ'তে পারে? লজ্জায় ঘৃণায় আমার মর্‌তে ইচ্ছে হয়। তাই ভাবি সুখেন যে আমাদের অনুগ্রহ করে, তাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তার এ অনুগ্রহের অন্তরালে কোনো গূঢ় গোপন অভিসন্ধি আছে কি না, তা' নিয়ে বিচার করা শোভা পায় না।

ক্ষতি কি? আমি ত' হাঁফ ছেড়ে বাঁচি তা' হলে। এতদিন যা হোক্ ক'রে সান্ত্বনাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লুম—আজ থেকে সেই না হয় আমার ভরণ পোষণের ভার নিক্।—একটু হিংসেও হয়। এক এক সময় মনে হয়, সুখেনের মতো যদি অবস্থাপন্ন, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হতুম—প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো মিটিয়ে নিয়ে সান্ত্বনাকে রাণীর হালে রাখ্‌তুম।

* * * *

চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে বেরিয়েচি। কাল্‌কের জন্য আর একটা আধ্‌লাও বাঁকী নেই। দেখ্‌চি খুব হিসেব ক'রেই চল্‌তে হবে। দু'টা বেলা ত' চালানো চাই। খুকীর দুধটুকুর জন্য আজ না হয় আর একটা বার তুলসী গয়লার কাছে খোসামুদিই কর্‌ব…… ‥ তা' দেবে বোধ হয়। দয়া ত' ঐ নীচ জাতের-ই—যা'রা ইতর—ছোটলোক।

পথ ভুল করি নি ত? শরীরটা কেমন যেন নিঝুম নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌চে। পথ চলায় জীবনে এই বুঝি প্রথম ক্লান্তি অনুভব কর্‌চি। কাছেই একটা পার্কে ঢুকে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে ব'সে পড়্‌লুম।……প্রায় সমবয়সী কতকগুলো চঞ্চল ছেলে মেয়ের দল খুব কলরব ক'রে খেলা কর্‌চিল।…… বাংলা মায়ের যত্ন পালিত সব স্নেহের দুলাল!……

মেয়েটিকে ঠাস্ ক'রে এক চড় ক'সে দিয়ে ছেলেটী অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বল্লে—"কেমন এবার কি হয়? তোকে ওদের দলে খেল্‌তে না মানা ক'রে ছিলুম আমি!"

ঘুঁসি কাসয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে কি তিরস্কার করবার ভঙ্গী! শুধু একটা চড়েও তুষ্ট নয়, একটা ল্যাং মারবারও বুঝি ইচ্ছে ছিল।

মেয়েটির ফুলের মতো তুলতুলে গালে পাঁচটি আঙুলের দাগ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। রক্ত যেন উপচে পড়তে চায়। দু'টী চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তবু কাঁদে না।..... না কাঁদাটাই বুঝি বাহাদুরী, কাঁদলে যেন পরাজয় স্বীকার করা হয়।

দলের বড় মেয়েটি এগিয়ে এসে ওর গালে হাত বুলিয়ে দেয়। আলগোছে খুব আলতো চাপ দিয়ে।... মুখের ওপর থেকে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলো সরিয়ে দিয়ে সমবেদনার স্বরে বলে—ইস্! মাগো! কি ক'রে মেরেচে ত্যাখ্ ভাই! তারপর ছেলেটির দিকে কটমট্ ক'রে তাকান,। মারতে সাহস না পেয়ে শুধু বলে,— দস্যি ছেলে, ষ্টুপিড্ কোথাকার! চল না বাড়ীতে, তোমার বাবাকে ব'লে একবার দেখাচ্ছি মজাটা!

ছেলেটি ঠোঁট্ উল্টিয়ে দু'হাত চিতিয়ে কলা দেখায়। মেয়েটি তবু মারতে ওঠে না। বছর খানিক আগে হ'লে কি করত বলা যায় না। মারামারি করবার মতো এখন যে আর ওর বয়স নেই, সে কথা ও স্থির জানে। হয় ত' সেজন্য একটু আফশোষও করে। মনে মনে হয় ত' বলে কিছু দিন আগে হ'লে একবার দেখে নিতুম।

ছেলেটির স্পর্দ্ধা এবং ঔদ্ধত্যকে নির্ব্বিচারে ক্ষমা ক'রে আবার সে মেয়েটিকে আদর করে। নিবিড় স্নেহে বুকে টেনে নিয়ে গালে হাত বুলিয়ে দেয়।...... সমব্যথী বন্ধু নয় যেন সেবাময়ী মা।

এবার কিন্তু এক নিমেষে মেয়েটির সব দৃঢ়তাই ভেঙ্গে যায়। আদর পেয়ে আস্তে, নয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সাত বছরের ঐ আহ্লাদী, চঞ্চল মেয়েটিকে কেন জানি দেখেই ভালো লাগচে। আমার খুকীর সঙ্গে হয় ত' কোথাও সাদৃশ্য আছে। ফুটফুটে রঙ্, মুখ চোখ সবই সুন্দর। হাটবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত। হ'লে এক জন অসামান্যা সুন্দরী যে হবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।.....বেগুনী রঙের ঐ বেলুনটা নিয়ে কেমন অবাধে ঐ রোগা কালো ছেলেটির সঙ্গে খেলা করচে! সর্ব্বাঙ্গে ধুলা মাখা ঐ নোংরা ন্যাংটা ছেলেটির সঙ্গে খেলা করতে তা'র ময়লা কাঁধে হাত দিয়ে চলতে ফিরতে ওর একটুও বাধে না। নিজের রূপ সম্বন্ধেও একদম উদাসীন হ'য়ে আছে, যৌবন যে আসবেই একদিন, তা' কি ও জানে?

ভাবচি বসন্তের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়ে বিপুল সমারোহে যেদিন মেয়েটির যৌবন আসবে—ওর দেহের শিরায় শিরায় পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম রক্তস্রোত অকস্মাৎ যেদিন আপনিই উছলে উঠবে, মনে থাকবে তখন তার এই নিঃস্ব কাঙ্গাল ছেলেটির কথা? তেমনি নিঃসঙ্কোচে ওর নোংরা গায়ে হাত দিতে, হাত কাঁপবে না তার?

* * * *

মেজাজ শুধু আমারই রুক্ষ নয় রোদেরও।......

যেম্নি চড়া, তেম্নি প্রখর! তেতে আগুন হ'য়ে উঠেচে রাস্তা। বিদ্রোহ নয়, সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা!...

মনেই ছিল না যে বাজার করতে বেরিয়েচি। সান্ত্বনার বেদনাবিধুর মলিন মুখ খানি মনে পড়চে। উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে হয় ত' সে এতক্ষণ আমারই প্রতীক্ষা করচে।

সিকিটা হাতের মুঠোতেই বন্দী হ'য়ে আছে। পকেটে রাখতে সাহস হয় না। সিকি ত' নয় যেন কি অমূল্য সম্পদ! খুকীটিকেও কোনোদিন এত যত্ন ক'রে আঁকড়ে রাখিনি!.........

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি। থেকে থেকে অন্ধকারের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝ'রে পড়চে।

বৈশাখের এই নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে একান্ত নিভৃতে সঙ্গোপনে নিজের জীবন কাহিনী লিখতে সাধ হয়। আমার এই অশ্রুসজল জীবন কাহিনীগুলো এবার আর মনের মধ্যে নয় ছাপার হরফে রেখে যেতে চাই। আমার এই ব্যাথার

কাহিনী বইয়ের আকারে প্রকাশিত করবার জন্য আফিসের বড় বাবুও একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঠাট্টা ক'রে নিশ্চয়ই।

আলোটা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছিল। ঐ উজ্জ্বল উদ্ধত দীপ্তিটুকু সংসারে দীনতাকেই যেন বিশেষ ভাবে ব্যঙ্গ করে।......পলতেটা নামিয়ে দিতে করুণ চোখে চায়, একটা মর্ম্মভাঙ্গা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে।... শুধু একটা ম্লান অস্পষ্ট নীল রেখা, কম্পমান মুমূর্ষু। অনন্ত পথ যাত্রীর শেষ মুহূর্ত্তের যেন একটা সকরুণ মিনতি, একটা সুস্নিগ্ধ অভিবাদন।

দু'টী ঘণ্টা ঠায় ব'সে থেকে মাত্র একটি পাতা সারা হয়। লেখা আসে না। আর কি-ই বা আছে লিখ্‌বার? নিজের ওপরেই রাগ হয়। কেন এই অকাজের কাজ করতে যাওয়া? এতক্ষণে দু'টী পয়সার হয় ত' তেল নষ্ট হ'ল।...... এক মোচড় দিয়ে তক্ষুনি আলোটা নিভিয়ে দিলুম।... চিম্‌নির ভেতর আলো শিখাটি একবার কেঁপেই রঙ হারা বীভৎস হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া কি? এই দৈন্য পীড়িত সংসার মিথ্যা আড়ম্বর শোভা পায় কখনো?

নিস্তব্ধ রাত্রি। সমস্ত শরীরে অন্ধকারের বেদনা ভ'রে নিয়ে উৎসুক হ'য়ে বাইরের পানে চেয়ে আছি। নিস্পৃহ জ্যোতিঃহীন কি কুৎসিৎ বিশ্রী ঐ আকাশ!

কাছেই ক'রে মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লুম। খুব সন্তর্পণে উঠ্‌তে চাইলেও ভাঙ্গা বেতের চেয়ারটা করুণস্বরে কঁকিয়ে উঠ্‌ল। তারপর খুব ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হ'য়ে শুনলুম...

কিন্তু আমি যে তোমায় সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি সান্ত্বনা! সর্ব্বক্ষণ আজ যার জন্য এমন উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠেছি, সে তুমি—তুমি। আমার এ উদ্বেলিত প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমায় অপমান কোরো না সান্ত্বনা, তোমার দু'টী পায়ে পড়্‌ছি। আজ যদি একটীবার বুঝতে—

......মাফ করবেন সুখেন বাবু, আপনি অনর্থক নিজেকে উত্তেজিত পরিশ্রান্ত ক'রে তুলচেন। এই ধরণের গভীর কবিত্বপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বক্তৃতায় রস করতে পারি এমন অসাধারণ রসগ্রহণশক্তি, অসম সাহসিকতা আমার নেই। আপনি হয় ত' অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু এই সব নীচ ঘৃণিত কথা শোন্‌বার জন্য এখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাকতে আমার আর এতটুকুও প্রবৃত্তি নেই।......কি বল্‌ব আপনাকে, আপনি মোহান্ধ—কাপুরুষ! বিবাহিতা হিন্দু নারীর পক্ষে কোনো পর পুরুষের মুখ থেকে এমন অভদ্র অপ্রীতিকর কথা শোনা যে কি ভয়ঙ্কর পাপ, তা' আপনি ধারণাও করতে পারেন না।

......এই বুঝি প্রতিদান? তোমার গরীব অকর্ম্মণ্য স্বামীই তোমার মাথার মণি হ'য়ে থাকবে আর আমি—এতদিন ধ'রে স্বেচ্ছায় বাড়ীর সকলের অগোচরে এই যে অকাতরে সাহায্য করলুম তোমায়, প্রাণ ঢেলে ভালবাস্‌লুম, তার কি কোনই মূল্য নেই? কিছুই না? এতটুকু কৃতজ্ঞতা একরত্তি অনুগ্রহও কি আশা করতে পারিনে আমি?

......আমি জান্‌তুম না সুখেন বাবু। আপনি সাহায্য করচেন জান্‌লে সে সাহায্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হতুম না। ভিক্ষার জন্য আমি আপনার মার কাছেই হাত পেতেছিলুম, আপনার কাছে নয়। আপনার কৃপার প্রত্যাশী হ'তে আমি ঘৃণা বোধ করি।

কথাগুলো যেন বেসুরো বেখাপ্পা শোনায়। সান্ত্বনার এই অসামান্য দৃঢ়তায় আমি একটুও সুখী হ'তে পারিনে। ওর সংযম, ওর আত্মনির্ভরতাকে আমার উপহাস করতে ইচ্ছে হয়। ভিখারী কেরাণীর স্ত্রী, তার আবার সতীত্বের অহঙ্কার!

বিনি পয়সায় ত' নয় আর! উপযুক্ত মূল্য দিয়েই ত' সুখেন ওর দেহখানিকে কিনে নিতে চায়, তবু কেন যে অনিচ্ছা বুঝি না। কি লাভ এই

আত্মবঞ্চনায় ? ······এই স্বার্থপর ছলনাময় সংসারে নিজকে বঞ্চিত পীড়িত ক'রে রাখার চাইতে মূর্খতা আর কি হ'তে পারে ? বুভুক্ষু প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর্‌বার জন্য ছিনিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষারই যেখানে প্রবল হাওয়া উচিত, সেখানে কি অযাচিত অনুগ্রহকে উপেক্ষা করা চলে ? এই দুঃখের সংসারে ওর এই সংযমের আতিশয্যকে নেহাৎ খাপ্‌ছাড়া মনে হয়।

অন্তরের আগুনটাও আবার দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে ক'রে ছুটে গিয়ে সুখেনের টুঁটি টিপে দিই শেষ ক'রে অপমান যাঁকে কর্‌চ সে যে আমারই দুঃখিনী প্রেমময়ী পত্নী !

······কিন্তু শক্তি থাক্‌লেই কি সব সময়ে সাহস করা চলে ? বড়লোকের বিরুদ্ধে কাঙ্গালের এ অভিমান শোভা পাবে কেন ?

* * * *

ফাল্গুনের অলস অপরাহ্ণে একটী খেয়ালী ঘূর্ণীবায়ু হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সব খোয়ামো গাছের শাখায় মৃত্যু মর্ম্মর জাগে। দুরন্ত হাওয়ার দোলায় ভাঙ্গা জানালাটি কি উগ্র আনন্দেই না নৃত্য সুরু ক'রেচে ? বিকৃত পঙ্গু হ'য়েও এতটুকু উৎসাহ কমে নি, নাচ্‌বার কি অপরূপ ভঙ্গী।

সজোরে সশব্দে জানলাটি টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসি। গলসওয়ার্দ্দির একখানি সদ্য প্রকাশিত নভেলে মনোযোগ দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে শেষে সেখানি এক রকম ছুঁড়েই ফেলে দিই। ভালো লাগে না। বিরক্ত হ'য়ে অন্ধকার ঘরে ক্রমাগত পায়চারী ক'রে বেড়াই। এই হৃদয়হীন নিষ্করুণ পৃথিবীর কাছে অনবরত লাঞ্ছনা পেয়ে মনটা ভারী বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। আমি যে নিতান্ত অনাবশ্যক শুধু একটা আবর্জ্জনার মতোই এখানে প'ড়ে আছি, সে কথা পৃথিবী ত' আমায় কতবারই জানিয়ে দিয়েচে।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ জীবনের নিরর্থকতাকে মাটী যেন বিদ্রূপ করে বইতে চায় না।······

চাকরীর সন্ধানে আজও গিয়েছিলুম, হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেচি। নিষ্ফলতা আর আমায় একটুও আঘাত দিতে পারে না। দুঃখ আমার ধৈর্য্যক্ষম পরম সহিষ্ণু ক'রে তুলেচে।

জুতো জোড়ার দুরবস্থা দেখে কষ্ট হয়। এই ক'দিনে ওরা দু'টীতে মিলে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না ক'রেচে।······রৌদ্র তপ্ত গলিত পিষের রাস্তায় বুক পুড়িয়ে ক্ষইয়ে ফেলেচে, একটী কথাও বলে নি। স্যাঁৎসেতে মেজের ওপর নিতান্ত অসহায়ের মতো বেদনাগম্ভীর দৃষ্টি মেলে কি করুণ চোখেই চাইছে ! যেন বল্‌তে চায়, এবার তোমার ছেঁড়া পাম্প দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও—আমরা আর পারি নে।

আমার কলজেখানিও বোধ হয় এতদিনে অনেকখানি ক্ষয়েছে। জীবনী শক্তি যে ফুরিয়ে এসেচে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। একটা দুরারোগ্য ভয়ানক ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ি যদি বেশ হয়। না—না, আমি বাঁচ্‌তে চাই। আমার এই রিক্ততা অপার ব্যর্থতার মধ্যেই আনন্দকে বরণ ক'রে নিয়ে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ নিরাময় হ'য়ে থাক্‌তে চাই। নইলে মৃত্যুপিপাসু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ মরণের প্রতীক্ষায় থাকে। উঃ সে কল্পনাতীত ! তা'র চাইতে ভীষণ শাস্তি বুঝি আর নেই।

মনের পুঁথির একটা কথা কিন্তু আজ সহজ হ'য়ে এসেচে। নিজকে যেন আবিষ্কার কর্‌তে পেরেচি আজ।······শুধু সান্ত্বনার জন্যই বাঁচ্‌বার ইচ্ছে যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে আমা'র, একথা মনে ভেবে একট অপরিসীম তৃপ্তি পাই কিন্তু।

এরই মধ্যে কখন সান্ত্বনা এসে যে পেছনে দাঁড়িয়েচে, টেরও পাই নি। কাঁঠের ওপর একখানি হাত খুব আল্‌গা ভাবে রেখে ভর্ৎসনার সুরে মিষ্টি হেসে বলে—দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ত' বসে আছ, যত ভাবনা ছাই আমার বুঝি ? নাঃ—তোমাকে নিয়ে দেখ্‌ছি—ওগো মশাই আর কত দিন এম্‌নি অভুক্ত হ'য়ে থাক্‌তে হবে শুনি ? আশ্চর্য্য ছেলে যা হোক !

ওর স্বচ্ছ দু'টী চোখে ভরন্ত সন্ধ্যার বেদনা টলমল করে। নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছি, আছি যেন কতদিন দেখিনি। আজ ওকে তিরস্কার করতে ভুলে যাই। সহজ সুরেই বলি—কেন সুখেনের মা? আর বুঝি সাহায্য করবেন না তিনি?

……না। চির জীবন সাহায্য করবার জন্য তিনি ত' কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি আমাদের।

কথাটায় একটু খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা ছিল হয় ত' কিন্তু তা' গ্রাহ্য না ক'রেই বল্লুম—দেখ, তুমি যদি নিজে গিয়ে সুখেন কে একটু গোপনে বুঝিয়ে বলতে পারো, তা হলে সে নিশ্চয়ই সম্মত হবে। তোমার অনুরোধ প্রাণান্তেও সে যে অবহেলা করতে পারবে না, এ ভরসা আমার যথেষ্ট আছে।

এই ধরণের কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু কোনো নারীর কাছেই দুর্ব্বোধ্য থাকে না। ভুরু দুটী কুঁচকে, অভিমানের ভঙ্গীতে চোখ দুটী ডাগর করে বলে—আ —হা, ভারী কথা শিখেছেন! অমন করে কথা বললে আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকব না বলচি।

বিরক্তি ও অস্থিরতার মধ্যেও ওর চোখে মুখে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের আভাস ফুটে ওঠে।…… লজ্জারক্ত সেই সুন্দর মুখ খানির পানে আবার অনিমিষে চেয়ে থাকি।

অনেকদিন পর হঠাৎ আজ অকারণ ওকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে। উচ্ছ্বসিত আবেগকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে কোমল স্বরে বলি—তুমি কি সুন্দর সান্ত্বনা! তোমার এই ঠাণ্ডা রূপ, স্নিগ্ধ চাউনি মিষ্টি হাসি—

…আচ্ছা গো আচ্ছা, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই। কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে তেমনই নম্র কণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে বলি—কেরাণীর স্ত্রী হওয়া কি তোমার সাজে সান্ত্ব? তোমার সৌন্দর্য্য চায় আয়াস স্বাচ্ছন্দ্য। আমি গরীব, ইচ্ছে থাকলেও কি সে অভাব পূরণ করতে পারি?…তাই ভাবি আজও সুখেন যদি তোমায় জীবন সঙ্গিনী করতে পারে, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের উচ্চ সিংহাসনে ব'সিয়ে তোমার যথেষ্ট সমাদর করে সে, তোমার সৌন্দর্য্যের যথোচিত সম্মান করতে পারে। তুমি জানো না সান্ত্বনা, সুখেন তোমায় কি গভীর ভাবে ভালোবাসে!

…আঃ জ্বালাতন! তবুও আসবে না তুমি? ব'লেই বাণবিদ্ধা ভীতা হরিণীর মতো যেন নেহাৎ অনন্যোপায় হ'য়েই দেওয়ালের গায়ে মুখ চেপে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।…আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ পরেই নিঃশব্দে অজোরে কাঁদে—ফুঁপিয়ে নয় কিন্তু।

আজ কিন্তু ওর কান্নায় আমারও মর্ম্ম ডুকরে ওঠে। এ কি নিষ্ঠুর খেলা সুরু করেচি! এ কি সর্ব্বনেশে খেয়াল? অনাহারে দুঃশ্চিন্তায় যা'র দেহ মন ভেঙ্গে পড়েচে—তা'কে ব্যথা দিতেও মন সরে? এত বড় পাষাণ আমি! নিজেকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত দিতে ইচ্ছে হয়। যা'কে একটি দিনও ভালোবেসে দরদ দেখাতে পারিনি, তা'কেই কাঁদাতে চাই—এ কি অমানুষিকতা!

অভিমান ভাঙানো একটু কঠিন হবে বুঝতে পারচি। কণ্ঠস্বর সমবেদনায় ভ'রে মোলায়েম সুরে বল্লুম—ভারী অবুঝ তুমি! এই সামান্য বিদ্রূপ টুকুও বুঝতে পারো না? সত্য তুমি এমন ব্যথা পাবে জানলে - ব'লেই এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে ওর কাঁধে হাত দিই।

দারুণ বিরক্তির সঙ্গে হাতখানি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তেমনই দেওয়ালে মুখ গুঁজরে পড়ে থাকে একবার তাকায়ও না ফিরে।…ব্যথাভিমানী লাঞ্ছিতা নারী একটু আদরের কাঙাল হবেই ত!

একটুও অবিচলিত নিরুৎসাহ না হ'য়ে একরকম জোর করেই ওকে নিবিড় ভাবে বুকে টেনে নিই। সুরে বলি—ছিঃ রাগ করো না

আজকের দিনে কি চোখের জল ফেল্‌তে হয়? আজ যে দোল পূর্ণিমা!

অগোছাল এলোমেলো চুলের গুচ্ছগুলো দুই হাতে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ওর কান্নাভরা চোখের পাতায় একটী চুমু দিই।...ওর অভিমান ভাঙাতে আর কিছুর দরকার হয় না।

কি এক ঘন আবেশের মধ্যে এতক্ষণ ও চোখ বুজেই ছিল। হঠাৎ চোখ মেলে মুখে একটু সলজ্জ হাসি এনে স্নিগ্ধ চোখ দু'টী আমার মুখের ওপর তুলেই নামিয়ে নিলে।...এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর এক ছিল্‌কে রোদ। জলভরা মেঘের বুকে বিজলীলেখার মতোই অপরূপ।...সর্ব্বাঙ্গ থেকে খুসী যেন উছলে ওঠে ওর! কে বল্‌বে এই একটু আগেই কাঁদ্‌ছিল!

বুকের ওপরেই মাথা রেখে শুধু চোখ দু'টো তুলে বলে—কেন বল্‌লে ও কথা? ব্যথা দিতে বুঝি ভারী ভালো লাগে, না? কেন? আমি তোমার কি করেচি শুনি, তাই যে রোজ রোজ—

বেদনায় অভিমানে কথাগুলো অস্পষ্ট ভারী হ'য়ে ওঠে। পলকহীন দৃষ্টি মেলে আবার লক্ষ্য করি। ওর দীর্ঘ দিনের উপোসী চোখ দুটো শ্রাবণের কান্না ভরা মেঘের মতো বিষণ্ণ ম্রিয়মান। গভীর রাত্রির দুর্য্যোগ অভিসারে ও যেন একটী নীড়হারা পাখী!

(ক্রমশঃ)

মায়াজাল

[শ্রীহরিপদগুহ]

হিতেশ সুকেশকে ডাকিয়া বলিল—চ' একবার 'মাঘীপূর্ণিমা' মেলা থেকে ঘুরে আসি!"

সে অনেক আপত্তি করিয়াও বন্ধুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না; অগত্যা মেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সুকেশ আর হিতেশ দুই বন্ধু। একত্রে প্রবেশিকা পাশ করিয়া সুকেশ বাড়ীতে থাকিয়া জাগা জমি দেখে, আর হিতেশ কলিকাতায় থাকিয়া আই এ পড়ে। উপর্য্যুপরি দুই-দুইবার ফেল হইয়াও সে কিন্তু ধৈর্য্য হারায় নাই। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র সে, কাজেই অর্থের অভাব তাহার কোন দিনই হয় নাই; আর সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। তাহাদের কলেজেরই কে এক জন অধ্যাপক থিয়েটার করিয়া কলিকাতাবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন; অতএব তাহার সেখানে নিয়মিত যাওয়া চাই; কেন না, তিনি তো তাহারই ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর! হিতেশকে উৎসাহ দিবার জন্য দু'একজন কর্ম্মঠ বন্ধুও জুটিয়াছিল। পরের পয়সায় স্ফূর্ত্তি করিতে কেই বা ছাড়ে! সে লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, কলেজে পড়াইবার সময় এই অধ্যাপক তাহাকে কত ভাল বাসিতেন! এমন কি তিনি এখনও তাহাকে তাঁহার দলে লুপিয়া নিতে চান ইত্যাদি। ইদানীং তাহার মতিগতিরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে আর এখন থেয়েটার দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত ছিল না; বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অভিনেত্রীদের বাটী যাইয়া গান শুনিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া আসিত। বন্ধুরদল তাহাকে 'কুমার' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল; সে বড়ই খুসী, মনে ভাবে—'রাজকুমারই হয় তো!

সাজগোজ করিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

প্রতি বৎসরই মাঘ মাসের প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা বসে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া এখানে সমবেত হয়; নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাবতীয় দ্রব্য সম্ভারই তখন এখানে পাওয়া যায়।

দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা পরিদর্শন করিল। হিতেশ কত বড় একটা আশা লইয়াই না মেলায় আসিয়াছিল; কিন্তু সাজগোজ বিহীনা, রূপহীনা নীচ জাতীয়া পল্লীরমণীদের দেখিয়া আর এক মুহূর্ত্তও তাহার সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ঘৃণায় তাহার দেহ মন বিষিয়া উঠিল।

মেলার অনতিদূরেই হাটের পাশে রূপোপজীবিনীদের বস্তি। আজ তাহাদেরও একটা উৎসবের দিন; যদি বা কাহারো ভাগ্যে দু—একটা ভাল শিকার জুটিয়া যায়! ভাল বেশ-ভূষা করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে তাহারা পথের পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; পথিকের দর্শন মিলিলে চপলচোখের চটুল নয়নবাণ হানিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

দলের একটীকে দেখিয়া হিতেশ বলিয়া উঠিল—"বাঃ। খাসা আমদানী হে! ছুঁড়িটা তো দেখ্‌তে বেশ! চল একবার ঘুরে আসি।"

সুকেশ লজ্জায় ঘৃণায় লাল হইয়া কহিল—"সে কী, তুমি যাবে সমাজের আবর্জ্জনা এই পতিতাদের কাছে? এত নীচ প্রবৃত্তি তোমার!"

হিতেশ হাসিয়া বলিল—"একে তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না হে! স্বর্গের দেবতারাই যখন উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা ইত্যাদিকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ কর্‌তেন, তখন সেই তাদেরই বংশধরকে নিয়ে আমরাও না হয় একটু ফুর্ত্তি কর্‌লাম—তাতে ক্ষতিটা কী?"

সুকেশ রাগিয়া বলিল—"তোমার যা খুসী হয় কর, আমি চল্‌লাম।" বলিয়া খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া গেল।

হিতেশ আগাইয়া গিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"নে, আর সতীপনা দেখাস্ নি।" তারপর তাহাকে প্রায় এক প্রকার জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

ছোট্ট ঘরটীতে আসিয়া দুই বন্ধু বসিল। সুকেশ ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিল; দাঁত দিয়া ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরিয়া নির্জ্জীবের মত একপাশে বসিয়া রহিল।

হিতেশ হাসিয়া বলিল—"তোমার নামটী কি ভাই?"

সে বিনীত-কণ্ঠে বলিল—"উজ্জ্বলা।"

"বাঃ, খাসা নাম। জ্যোৎস্না হলে আরও ভাল হতো" বলিয়াই সে আপন মনে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। একটু পরে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা উজ্জ্বলা, গান-টান্ কিছু গাইতে পার তুমি?"

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে অভ্যাস তাহার নাই। তারপর মেজেতে বসিয়া পান সাজিতে লাগিল; সাজা হইলে ডিবাটা হিতেশের দিকে আগাইয়া দিল। হিতেশ হাসিয়া কহিল—"সঙ্গে প্রাণটাও দিলে না কি?"

উজ্জ্বলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

হিতেশ সুকেশের দিকে ডিবাটা আগাইয়া দিয়া বলিল—"নাও না হে, জাতি যাবে না।"

সুকেশ তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিল।

উজ্জ্বলা হিতেশকে প্রশ্ন করিল—"আপনাদের বাড়ী কোথা বাবু?"

হিতেশ কহিল—"এই সাম্‌নেই,—সুন্দরগাঁয়।"

উজ্জ্বলা হাসিতে লাগিল। তারপর হাসিতে হাসিতেই জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানকার সবই বুঝি খুব সুন্দর?"

হিতেশ সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "ব্রেভো, জিনিয়স! মাইরি, তুমি যদি কল্‌কাতা থাকৃতে—"

উজ্জ্বলা তাহাকে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল—

"সুন্দরগাঁর অতুল বাবুকে চেনেন? মিত্তির।"

হিতেশ সুকেশের মুখের দিকে চাহিল। সুকেশ 'চিনি' বলিয়া উজ্জ্বলার মুখের দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি চক্ষু নামাইয়া লইল।

হিতেশ বলিল—"আমি তো আর দেশে বড় একটা থাকি না, তাই কাউকে চিনিটিনিও না। হ্যাঁ, তারপর অতুল বাবুর কথা কি বল্‌ছিলে?"

উজ্জ্বলা কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হিতেশের প্রশ্নটা কাণে যাইতেই বলিল—"না অম্‌নিই বল্‌ছিলাম। তিনিও মাঝে মাঝে আমার কাছে আস্‌তেন কি না। অনেকদিন তাঁর খবর পাইনি, তাই।"

সুকেশ গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল—"অসম্ভব। তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ দিও না। চিরশত্রুও তাঁকে এ অপবাদ দিতে পার্‌বে না। তাঁর নামে মিছে কথা বল্‌লে জিভ্‌ খসে পড়্‌বে। তিনি যখন বর্ম্মায় ছিলেন, তাঁর বউটা একটা ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাড়ী এসে যখন তিনি একথা শুন্‌লেন, কিছুতেই বিশ্বেস কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর বিশ্বাস—হয় তো জলে ডুবে-টুবে মরেছে। সেই থেকে তিনি বে'থা পর্য্যন্ত কর্‌লেন না। সেই অসতী বউটার ফটো নিয়েই থাকেন রাতদিন।"

উজ্জ্বলার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

হিতেশ সুকেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"থাক্‌, সে সব বাজে কথায় আমাদের কাজ কি। 'অয়েল ইওর অউন মেসিন' (Oil your own machine.)। স্ফূর্ত্তি করো ভায়া! লাইফ্‌ ইজ লঙ এণ্ড আর্ট ইজ ফ্লোইং' (Lile is long & Art is flowing.)"। তারপর উজ্জ্বলার দিকে ফিরিয়া কহিল—"মাইরি প্রাণ, তুমি চলো আমার সঙ্গে কল্‌কাতা, সোণা দিয়ে তোমার গা মুড়ে ফেল্‌ব।"

উজ্জ্বলার মুখে বাক্য নাই; সে নির্জ্জীবের মত দাঁড়াইয়া হিতেশের দিকে সজল-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর হিতেশই সর্ব্বপ্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া গিয়া উজ্জ্বলার একটী হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"এস, লক্ষ্মীটি,পাশে বসে হেসে দুটো কথা কও!"

সে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া ধরা-গলায় কহিল—মাপ কর্‌বেন; হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তো পাশের ঘরে যেতে পারেন।"

সুকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিতেশ বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল—"বেশ্যার মুখে হঠাৎ এ হরিনাম! বাঃ বাঃ! মাইরি, তুমি যদি প্লে কর্‌তে……"

দপ্‌ করিয়া উজ্জ্বলার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। পরে একটু সমীহ হইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দ্বার দেখাইয়া বলিল—"যান, বাইরে যান আপ্‌নারা। আমায় বিরক্ত কর্‌বেন না।"

অপমানে হিতেশের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া কহিল—"এত দেমাক! আচ্ছা দেখা যাবে।" তারপর বন্ধুর হাত ধরিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * *

শরতের প্রভাত। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া একব্যক্তি আহ্নিক করিতেছিল; সহসা তাহার সম্মুখে একটী ছায়া পড়ায় সে পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিল—একটী রমণী তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

তাহাকে দেখিয়া রমণীর আর আর আশা মিটে না। সে একটা সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া ঠায় চাহিয়া রহিল ওই আহ্নিকরত লোকটীর দিকে।

রমণী আমাদের পূর্ব্ব-কথিত উজ্জ্বলা। যেদিন হিতেশের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, যেদিন সে তাহার প্রতি স্বামীর ভালবাসা, অগাধ বিশ্বাসের কথা শুনিল, সেইদিন হইতেই তাহার মতির পরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছে। সেই পাপ-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া সে কাশী চলিয়া আসে। এখানে অতি দীন ভাবে থাকিয়া দেবতা দর্শন, ধর্ম্মালোচনা ও বাকী সময়টুকু স্বামীর চিন্তা করিয়াই কাটাইয়া দেয়। পাপের লালসায়, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে যাহা করিয়া বসিয়াছে, সেই অধঃপতনের পরিণাম তুষানলের দাহন ও শত বৃশ্চিকের দংশন তাহার আরম্ভ হইয়াছে।

আর এই উপবিষ্ট লোকটীই তাহার স্বামী— অতুলচন্দ্র মিত্র। কয়েক দিন হয় এখানে তীর্থ-দর্শনে আসিয়াছে।

আহ্নিক শেষ হইলে, সে উঠিয়া সূর্য্য নমস্কারপূর্ব্বক সোপান বাহিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা রমণীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সে চমকিত হইয়া থামিয়া পড়িল; নিজের চক্ষুকে তাহার বিশ্বাস হইল না। সে পলক-হীন দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

নবাগত এক দল যাত্রী তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সে কেমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল; ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। এ কী ধাঁধাঁ! কিছুতেই তাহার অবিশ্বাস হয় না; সেই মুখ, সেই চোখ, কপালের উপর সেই কাল দাগ। তাহার ভুল হইতেই পারে না। সে তাহাকে অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও আর তাহার দেখা পাইল না। হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল।

* * *

শেষ রাত্রিতে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অতুলচন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই; কয়দিন হইতেই পত্নীর স্মৃতি নূতনরূপে তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রাতঃস্নান করিবার মানসে গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া 'শ্রীদুর্গা' নাম স্মরণপূর্ব্বক সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও একটু একটু অন্ধকার আছে। অতুলচন্দ্র নদীতটে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। অদূরে সোপানাবলীর উপর দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল—একজন রমণী ও যুবকের সাথে কি লইয়া বচসা চলিয়াছে; যুবক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

রমণী কাতর-কণ্ঠে কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও। বললুম তো তোমাকে, সে পাপ, ব্যবসায় আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। যে কটাদিন আছি, যেন স্বামীর চিন্তা করেই যেতে পারি;—দোহাই তোমার, আমাকে বিরক্ত না করে আর কোথাও যাও।"

যুবক ব্যঙ্গ-স্বরে জোর গলায় কহিল,—"বেশ্যার আবার অত সতীপনা কিসের? অত সাধ্বীই যদি হবি, তবে আর এ দেহ বেচা ব্যবসায় করতে গিয়েছিলি কেন, হারামজাদী?" বলিয়া তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। সে টাল্ সামলাইতে না পারিয়া পিছল সিঁড়ি হইতে বেগে পতিত হইল।

যুবক আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত হিতেশ, আর রমণী উজ্জ্বলা। হিতেশ একজন বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া পাপ ঢাকিতে কয়েকদিন হয় তাহাকে লইয়া কাশী আসিয়াছে। একদিন উজ্জ্বলাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পাপ-বাসনা জাগিয়া উঠে। সে গোপন অনুসন্ধানে জানে যে উজ্জ্বলা শেষ রাত্রে স্নানে যায়, তাই আজ তার এ অভিযান!

এতক্ষণ অতুলের দৃষ্টি ইহাদেরই উপর ছিল। অস্পষ্ট তাহাদের দুই-একটা কথাও তাহার কর্ণে আসিয়াছিল। সহসা রমণীকে পতিতা হইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া ঘটনাস্থলে যায়। হঠাৎ এ অঘটন ঘটায় হিতেশ ও কেমন মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অতুল উজ্জ্বলাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কর্দ্দমাক্ত পিছলসিঁড়ি হইতে পতিত হওয়ায় তাহার মস্তক ফাটিয়া গিয়া স্থানটা রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে; দারুণ আঘাতে চৈতন্য লোপ পাইয়াছে।

সে গামছার খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার

ক্ষতস্থানে ভাল করিয়া পটি বাঁধিয়া দিল; তারপর অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া তাহার চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা মারিল। একটু পরেই সে চোখ মেলিয়া অতুলকে দেখিয়াই উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু না পারিয়া করুণ আর্ত্তনাদের সহিত 'মা গো' বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হিতেশ অতুলকে বিদ্রূপ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মশাই, মাগীটা আপনার কেউ হয় নাকি?"

অতুল তিক্ত-কণ্ঠে জবাব দিল—"হ্যাঁ, হয় আমার স্ত্রী।"

হিতেশ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া কহিল—" কি রকম? তার মানে? বাজারের—"

অতুল বাধা দিয়া কহিল—"হ্যাঁ। আমি সব জানি।"

"ওঃ আপনার নামই বুঝি অতুল বাবু? একে নিয়ে আবার কোন্ মুখে গাঁয়ে ফিরে যাবেন? সেখানে কি আপনাদের স্থান হবে?" বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

অতুল বলিল—"গাঁয়ে যাবার হয়তো আমার আর দরকার হবে না। বিশ্বেশ্বর যখন তাঁর চরণে স্থান দিয়াছেন, তখন আর সে ভাবনা আমার নেই।"

হিতেশ মুখ বিকৃত করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, "বাঃ বাঃ এইতো চাই, সাবাস্। একে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে তোমার একটু লজ্জাও হলো না।" তারপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অতুল উজ্জ্বলাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এস। নিকটেই বাসা, বেশী কষ্ট হবে না; বেলা হলেই লোক জমে যাবে।"

উজ্জ্বলা কোন প্রতিবাদ করিল না; তাহার কাঁধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

* * *

ঘা শুখাইয়া গিয়াছে। উজ্জ্বলা এখান হইতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতুল তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানায়, কাতরচক্ষে মুখের দিকে চায়।

উজ্জ্বলা বলিল—"আমি যে পতিতা।" আরও কি বলিতে যাইতেছিল; বাধা দিয়া অতুল কহিল—"আমি সে সব কথা আর শুন্‌তে চাইনে। পূর্ব্বে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই থাক্‌বে।"

সে কহিল—"না গো না। এজন্মে আমাদের আর দেহের মিলন হতে পারে না।"

অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অতুল কহিল—বেশ, না হলো, চাইনা দেহের মিলন। তবু আমার কাছটাতে থাক; তোমাকে ছেড়ে আমি একা থাক্‌তে পার্‌বনা।

সে তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ছল ছল চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হয় তো দু-এক ফোঁটা তপ্ত-অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল তাহার চরণে।





অভিশাপ।

(শ্রীচিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়)

মলয়ের মৃদুশ্বাসে বিকশিত কুসুমের প্রায়
যেদিন জন্মিলে তুমি ঋষিদের তপোবনচ্ছায়,
প্রথম প্রেমের রাজ্যে প্রবেশিলে পাগলিনী-পারা
সলজ্জ-শঙ্কিতপদে, একেবারে হয়ে আত্মহারা,
বল্কল-বসন শ্লথ, আকুলকুন্তলা,—
ওগো শকুন্তলা!

করতল-লগ্ন-শীর্ষ, নিমীলিত যুগল নয়ান
যুগল তারকা যথা গোধূলীর মেঘেতে শয়ান;
তুমি কি দেখিতেছিলে প্রণয়ের প্রথম স্বপন?—
দুষ্মন্তের সুখস্পর্শ, প্রীতির নূতন সম্ভাষণ?
বেতসে বিসিনী-শয্যা নিতান্ত নিরালা,
ওগো শকুন্তলা?

তুমি কি ভাবিতেছিলে প্রাসাদের স্বর্ণ-সিংহাসন
কোন শুভক্ষণে তব পরশিবে রাজীব চরণ?
মহিষীর দিব্যবেশে বরবপু হবে আবরিত,
পুষ্পিতা ব্রততী সম আপনার গৌরবে নমিত,
ভুলেছিলে কণ্বাশ্রম একান্ত বিহ্বলা,
ওগো শকুন্তলা?

বাহিরে যে মেঘমন্দ্রে বিদারিত করি নভস্তল
উঠিল প্রলয় শব্দ, অতিতীক্ষ্ণ, অব্যর্থ, অটল—
"অতিথিরে অবহেলি ভাব যারে একাগ্র মানসে,
সে তোমারে পাশরি মিলনের প্রথম দিবসে,
ভুলিবে সে তবদত্ত গুপ্ত বরমালা,
অয়ি শকুন্তলা!"

তুমি কি শোননি! হায় অভিশাপ—দারুণ দুর্ভাষা,
সাহঙ্কারে উচ্চারিল ক্রোধোন্মত্ত তপস্বী দুর্ব্বাসা!
ভীম-কান্তি মূর্ত্তি দুই বাহিরে ও অন্তর মাঝারে
তোমারে যে ডুবাইল বিরহের অকূল পাথারে,
তুমি কি বোঝ না তাহা মোহমুগ্ধবালা
ওগো শকুন্তলা?





সৈনিকের চিঠি

শান্তি চৌধুরী

প্রিয়তমা মানসী আমার !

তোমার সেই প্রথম চিঠির পর আর কোনও চিঠি এতদিনের মধ্যে একখানাও পেলুম না। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করবার অধিকারও কি নেই আমার ? আর থাকলেই বা কি তোমার তাতে কি আসে যায় ?—নয় ? তুমি কি আমার খোঁজ নেওয়া আবশ্যক মনে কর ? আমার খবর জানতে ইচ্ছা কর ? আমার তো তা' মনে হয় না! যদি তা-ই হত, তবে এত অনুরোধ করেও তোমার সাড়া পাচ্ছিনে কেন ? হাঁ বুঝেছি—তোমার কাছে তো আমি একজন পথিক, আমাদের দেখা পথের—বিলীনও পথেই। তাই কি ? তুমি কি আমাকে একজন পথিক ঠাওরিয়েছ ? না, না তুমি আমাকে কখনই পথিক ভাবতে পার না; তুমি ওরকমটি যে নও তা আমি বেশ জানি। তবে লক্ষ্মীমণি ! লজ্জা করেই কি লিখছ না ? কিসের জন্ম এ লজ্জা ? প্রাণের কথা জানাবে এই তো ? এতে লজ্জার কি থাকতে পারে ? না, তুমি একে অন্যায় মনে কর ? কেন ? প্রাণটি হাল্কা করা এতই কি অন্যায় ? আমি তো কোন দোষের মনে করতে পারি না ? তাই তো তোমাকে বিদায়ের দিন সমস্ত জানিয়ে এসেছি। তোমাকে জানিয়ে এসে ভালো করিনি কি! আমারতো মনে হয় খুব ভালো করেছি। তোমাকে জানিয়েছি, আমার বুক হাল্কা করেছি, তুমিও আমাকে বুঝে দেখবার অবসর পেয়েছ। বাস্তবিক আমি যে কত উতলা থাকি তুমি তা মোটেই বুঝতে চাও না। আমার যে কত কষ্ট হয় তুমি তা জানতেও চাও না। আমার কি ভাবে যে দিন যায় বেলা কাটে রাত্রি শেষ হয়, তুমি তা ভাবতেও চাও না। এত নিষ্ঠুর তুমি।

আচ্ছা মণি তুমি ! কি আমার অভাব প্রাণে বোধ কর ! আমার তো বিশ্বাস হয় না ! যদি তাই হত তবে তুমিও ঠিক আমারই মত উন্মাদ হয়ে উঠতে। আমি যে ষোল আনা রকমে তোমার ব্যথা প্রাণে অনুভব করে থাকি এবার যখন চিঠি লিখবে তখন আমাকে এ কথাটারও জবাব দিও। আমি বড্ড ব্যগ্র হয়ে আছি এই খবরটুকু জানতে। আজ আমি যদি জানতে পারতুম যে আমার জন্যে একটি তরুণী ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, তবে জীবনে অনেকটা শান্তি পেতুম।

দেখেছ তামাসা ! আমি তোমাকে ষোল আনা রকমে পেয়েছি, অথচ কি সব পাগলামী করছি। আমি তোমার ভালোবাসা পেয়ে কত গর্ব্ব অনুভব করছি। কতজনার ভাগ্যে এ স্বর্গ সুখ ঘটে ? কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমার বড্ড কষ্ট হয়। এখন হয়ত তুমি কত অনুতপ্ত হচ্ছ আমাকে অবহেলা করে তখন তাড়িয়ে দিয়েছিলে বলে। আমি যেন দেখছি তোমার চোখ দুটো বেজায় ফুলে গেছে

কেঁদে কেঁদে। থেকে থেকে বুক চাপড়াচ্ছ আমাকে 'নয়ন জলে' বিদায় করেছ বলে। এই সব কি সত্যি মণি?

আচ্ছা—যদি ওরকম একটা কিছু হয় যে—

সে জন ফিরেনা আর যে গেছে চলে
বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে……

তবে তুমি কি কর্‌বে? ইস্‌, কত ব্যথায় লুটিয়ে পড়্‌বে। ভাব্‌তেও গা কাঁটা দেয়।

আমি প্রাণ থেকে ওকথা বল্‌চিনে জেনো, অভিমান করেও নয়। আর আমি যে ফির্‌ব না তার ওতো স্থিরতা নেই। তবে মর্‌লেও মর্‌তে পারি, কারণ যে মরণের তটে বাসা বেঁধেছে তার বাসা যে কখন উড়ে যাবে, তার কি কোন ঠিক্‌ আছে? তাই বল্‌ছিলুম কি, যদি আমার এই বিদায়ই শেষ হয় তবে তুমি কি কর, এইটুকু জান্‌তেই আমার ভারী সাধ হচ্ছে।

একটা কথা মনে হলে আমি বড্ড আশ্চর্য্য হয়ে যাই,—হবার কথাও। কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তুমিও তা জান—ভালো করেই জান। তোমার বিরহে যখন বুক ছাপিয়ে কান্না আসে, বেদনায় বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠে, তখন বিপরীত দিক থেকে একটা তীব্র আনন্দ এসে মনটাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়, সেইটা হচ্ছে :বিরহের আনন্দ। এই ব্যথা একমাত্র বিরহীরাই বুঝ্‌তে পারে, তা' প্রকাশ কর্‌তে আর কেউ কখনও পারে না। পৃথিবীতে যত রকম আনন্দ আছে, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী আনন্দময়, আর এর স্মৃতিটাই সবচেয়ে বেশী সুখকর। তাইগো তাই-ই, এতগুলো দিন বিরহে কেটে যাওয়ার পরও তোমায় না হারিয়ে বরং বড় করে পেয়েছি।

আচ্ছা মণি! তোমাকে যে এভাবে বিরক্ত করে থাকি এতে তুমি আমাকে কি ভাব? নিশ্চয়ই একটা আহাম্মক বা বদ্ধ পাগল। নয়? আমিও তাই ভাবি এবং নিজের উপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে পড়ি। কেন জান তোমার সঙ্গে তো আমার মুখের আলাপ ভিন্ন অন্য কোনও সম্পর্ক নাই, এত সামান্য পরিচয়ে তোমার উপর এত জুলুম কর্‌ছি কেন? আমার কি অধিকার?

দাঁড়াও, একবার পড়ে দেখি কি লিখেছি। তোমাকে এতসব যা লিখেছি তা মোটেই সৈনিকের উপযুক্ত হয়নি। এই যে আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! এইটাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

বুঝ্‌তে পার্‌ছনা? এই নিষ্ঠুরতার মাঝে কোমলতার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? এতে কর্ত্তব্যে অবহেলা আসে না কি? বা হয় না কি? তুমি নিশ্চয়ই সব বুঝ্‌তে পার আমি ভাব্‌তে অবাক্‌ হয়ে যাই। তুমি আমাকে এভাবে যা দিয়ে দিয়ে তৈরী কর্‌ছ শুধু এই জন্যেই যে, নইলে আমি ভারী কর্ত্তব্য অবহেলাকারী হয়ে দাঁড়াব, তার ফলও হয়ত ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা মণি! কি করে তুমি এতদূর থেকে আমার অন্তরের কথা টের পাও? আমি অবাক্‌ হয়ে যাই তোমার শক্তির পরিচয় পেয়ে। ঐ যাঃ—আমি ভুলেই গিয়েছি যে তুমি আমায় খুব ভালোবাস, আমার ভাঙ্গা পথের রাস্তা ধুলায় তোমার পায়ের চিহ্ন এঁকেছ। তোমার আমার অন্তরের টান্‌ আছে বলেই সব চোখের সাম্‌নে পরিষ্কার হয়ে উঠে, এতেই বুঝা যায় তুমি আমায় কত ভালোবাস!

হাঁ কি বল্‌ছিলুম? দুর্ব্বলতাকে দূর কর্‌তে না পার্‌লে যে জীবনে শান্তি মোটেই পাব না, একটা হাহাকার—একটা উন্মাদনার মাঝে সারাটা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমি যে সে ভার বইতে পার্‌বনা, তাহা যে আমার অসহনীয় তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কাজেই আমাকে রীতিমত শক্ত হতে হবে। নিজকে আর অত দুর্ব্বল হতে দেবো না, দুর্ব্বল বল্‌তে দেবোনা।

যদি আমার সে সুযোগ কোনদিনই ঘটে, আমাকে পাশে তুলে নেবার মত সৌভাগ্য আমার হয়, যদি কোনদিন এ অভাবনীয় সুখের অধিকারী হই, তবে

সমস্ত কঠোরতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার চরণেই লুটিয়ে পড়্‌ব সেইদিন।

কি করে আমি দুর্ব্বলতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পার্‌ব জান? যদি নিজকে কোনদিন ভুল্‌তে পারি, নিজের দেহকে ভুল্‌তে পারি, নিজের দুঃখ বেদনা নিজের যা কিছু সব যদি দূর কর্‌তে পারি, এই জীবন-মৃত্যুর খেলা যে আদর্শের জন্যে যুদ্ধে যোগ দেওয়া, এইটাকেই যদি সবচেয়ে বড় করে দেখ্‌তে পারি, তবেই আমি মুক্তি পেতে পার্‌ব।

তোমায় আর বেশী করে ভাব্‌ব না আমি, তাহলে ঠিক ল্যাভার্ণের মতন আমাকে মর্‌তে হবে। করুণ-তাকে মৃত্যু দিতে গিয়ে, দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় কর্‌তে গিয়ে শেষে তাকে কাপুরুষ বল্‌তে হয়েছিল—যদিও শেষে তার জীবন দিয়ে সে সে দুর্নামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ওরকম তাদেরই অদৃষ্ট হয় যারা ভালোবাসায় পড়ে যুদ্ধে আসে। ভালবাস্‌তে বাস্‌তে তারা এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হয়, যখন সে ব্যথা বহন কর্‌বার মতন ধৈর্য্য আর তাদের থাকে না। তারা যত ভালোই থাক্‌না মনে, যত সুস্থই থাকনা দেহে, তারা বেশ বুঝ্‌তে পারে যে তাদের একটা সময় আস্‌ছে, যার হাত থেকে রক্ষা পাবার মতন ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। তাদের ভেঙ্গে পড়্‌তেই হবে। তারা তাদের দেহ মন ভেঙ্গে যাবার ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং মরার আগেই মরে। তাদের সেই অবস্থা সকলের মনে সন্দেহ এনে দেয়। সন্দি-হান হয়ে তাদের সন্ত্রস্ত ভাব দেখে তারা তাদের চৌকী দিতে বাধ্য হয়—বলাতো যায় না কখন কি করে বসে!

ল্যাভার্ণের কথা বল্‌ছি। সে ছিল আমার দলের একজন নায়েক। সে টেলিগ্রাফের কাজেও বিশেষ পারদর্শী ছিল, তাছাড়া সে তার অপরিসীম সাহসিক-তার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যখন খুব গোলা বৃষ্টি হত, আর আমাদের তারগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত, তখনই আমাদের ল্যাভার্ণের আবশ্যক হত। সে সেই গোলা বৃষ্টির মাঝে ছুটে গিয়ে সমস্ত ঠিক করে ফিরে আস্‌ত। তাকে আমি এত ভালবাস্‌তুম যে কোনদিন আমি তাকে আমার কাছছাড়া করিনি। আমি যুদ্ধ যখন নাব্‌তুম, ল্যাভার্ণ ছিল তখন আমার প্রধান সহচর। আমি তাকে আমার সাহচর্য্যে না পেলে কখনই এত সম্মান পেতুম না। আমার যুদ্ধে জয়লাভ তার জন্যেই, তাকে যদি না পেতুম তবে আজ আমি আর সর্দ্দার হতে পার্‌তুম না।

যাক, তার জীবনের সমস্ত ইতিহাস আমি জান্‌তে পেরেছি। সে আমায় খুব ভালবাস্‌তো বলে কোন কিছু আমাকে গোপন কর্‌ত না। আমিও তাকে আমার সব বলেছি। তার মানসীর সাথে তার বিদায়ের পালা শেষ হয়েছিল ঠিক আমারই মত অপমানিত হয়ে। যে দিন যুদ্ধে এলো সেইদিনই তার মানসীকে প্রেম জানিয়ে উপেক্ষা অপমান আর অবহেলা পেয়ে খুব মর্ম্মাহত হয় এবং যুদ্ধে চলে আসে।

প্রথম তার আর জেসমিনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। কেউ কাউকে ছেড়ে থাক্‌তনা, কিন্তু ল্যাভার্ণ প্রেম জানাবার আগেই 'এলেন' বলে একটী উচ্চশিক্ষিত এবং ধনীর সঙ্গে জেসমিনের বন্ধুতা হয় এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাবও হয়। ল্যাভার্ণ কিন্তু তবু হাল ছাড়েনি। সে দেখ্‌ত, তাকে আর তেমন করে তারা আদর করে না বা ভাবেনা, বরং তার আগমনে জেসমিন যেন একটু বিরক্তই হয়, সে কাছে এসে বস্‌লে অবসর নেই বলে চলে যায়, তবু সে তার কাছে যেত। তার খুব বিশ্বাস ছিল জেসমিনকে সে পাবে। এলেন জেসমিন যেখান যেত, ল্যাভার্ণও তাদের অনুসরণ কর্‌ত। সে পালিয়ে পালিয়ে তাদের কাজে চোখ রাখ্‌ত, মাঝে মাঝে সামনেও এসে পড়্‌ত। যেন কোন কাজে এসেছিল, হঠাৎ তাদের দেখা এইরকম ভাব দেখিয়ে সরে পড়্‌ত। সে বলেছে, একটা দিনের জন্যেও সে কোথাও নড়েনি জেসমিনকে ফেলে। ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করত।

একদিন এলেন ও জেসমিন বোটে সমুদ্রে বেড়াতে

যায়। ল্যাভার্ণও তাদের পিছু পিছু আরেকটা বোটে যায়। তারা যখন অনেক দূর এসেছে, তখন হঠাৎ চারিদিক আঁধার করে তুমুল ঝড় আরম্ভ হল। প্রাণপণে এলেন তীরাভিমুখে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। একটা প্রচণ্ড ঢেউ তাদের বোট উল্টিয়ে দিলো। এলেনকে দেখল তীরের দিকে জেসমিনকে অতল জলধির মাঝে ফেলেই সাঁতারে চলেছে। জেসমিনকে দেখতে পেল না। কতকক্ষণ দেখলে, সে ভেসে উঠেছে। এক একবার বিশ ত্রিশ হাত উচুতে উঠছে আবার কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। সে ঝাঁপ দিল এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাকে নিয়ে তীরে এসে পৌছল। তখন জেসমিনের জ্ঞান ছিল না। তাকে তীরে পৌছে দিয়েই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হলে জানল যে তাহার এক বন্ধুই তাহাকে সমুদ্রের কিনার থেকে কুড়িয়ে এনেছে। সে জেসমিন বা এলেনকে দেখে নাই।

ল্যাভার্ণ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠল। একদিন সে জেসমিনকে জানাল যে সেইদিন, সেই তাকে বাঁচিয়েছে; সে কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস করল না। এলেন তাকে বলেছে এবং তার মা বাবাকেও জানিয়েছে যে সেই জেসমিনকে বাঁচিয়েছে। অন্ধবিশ্বাসে যদিও এতে তার কোনো দোষ নাই, কারণ সে যেমন তীরে পৌছে তখন সে অজ্ঞানই ছিল; দ্বিতীয়তঃ ভালবাসা লোককে যে অন্ধ করে, জেসমিন ল্যাভার্ণকে গালাগাল করে তাড়িয়ে দেয়, এলেনও তাকে খুব অপমান করে।

জেসমিন মিথ্যায় আচ্ছন্ন হল, সে মিথ্যাকেই আকড়ে ধরল। যাকে খুব ভালবাসা দেখাতো, আপনার জন মনে করত, সেই তাকে ফেলে প্রাণ ভয়ে পালিয়েছিল, আর যাকে সে এতটুকু করুণা করে না, কেবল অবজ্ঞা করে এসেছে, ঘৃণা করে এসেছে, সেই বাঁচাল। তার জীবন সে যে এই সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে নিজকে বিপন্ন করে তাকে বাঁচাল, তার পুরস্কার সে পেল অপমান আর একবুক বেদনা। শুধু এই বেদনাতেই তার শেষ নাই, ঠাণ্ডা লেগে তার ডাবল নিমোনিয়া হয়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে সে বেঁচে উঠে।

জেসমিনের অবজ্ঞা তাকে খুব ব্যথিত করল। হওয়ার কথাও। ভালবাসার জন যদি অপমান করে, তবে তা যে কত ভীষণ হয়ে বুকে বাজে যারা কোনদিন বুকে অনুভব করেছে তারাই জানে। সেও সে ঘা খেয়ে মুয়ে পড়ে এবং সেইদিনই বুকের বেদনা চেপে রাখতে এখানে—এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে আসে।

যুদ্ধের প্রথম থেকেই সে সাহসিকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করে। সে মৃত্যুকে মোটেই ভয় করত না। সে বলত ভয় জয় না করলে 'সৈনিক' হওয়া যায় না। দু বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে কত কাজ করে গেছে। এর মধ্যে আর এতটুকু অনিষ্ট হয়নি, যদিও অনেক বার আগুনের মাঝে ছুটে গিয়েছে।

কিন্তু তারপর থেকেই সে যেন কেমন কেমন হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে দেখতুম, যদি কখনও গোলাবৃষ্টির মধ্যে যাবার কথা হত, তখনই নিজ হাতে গুলি খেয়ে আহত হয়ে হাঁসপাতালে চলে যেত।

প্রথম প্রথম আমার কেমন ঠেকৃত কিন্তু পরে সব বুঝতে পারলুম। সেই দিন থেকেই তাকে কড়া পাহাড়ায় রাখতে লাগলুম। সে সবই বুঝতে পারল। এর পরই দেখতুম সে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। সহজে কি তা পারা যায়? যখন ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধত, তখন তাকে আমার সামনে থামিয়ে রাখতুম। এক একটা কামানের শব্দ শুনে সে কেঁপে উঠত। তাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল আমার উচিত, কিন্তু শেষে আমাকে অনেক বেগ পেতে হবে, কারণ তারমত সাহসী পুরুষ আর কেউ আমার দলে ছিল না, তাই তাকে ছাড়লুম না।

একদিন সে নামজাদা বীর বলে সম্মানিত হয়ে এসেছে, আর আজ কাপুরুষ বলে সকলের কাছেই ঘৃণ্য হয়েছে। অন্য কেউ জানত না কেন যে এরকমটি হয়েছে। সে বুঝতে পারল যে সকলেই

তাকে বেশ করুণার চোখে দেখছে। এইটা তার সহ্য হলনা। এই ঘা তার বুকে ভীষণ ভাবে বাজ্‌ল। আবার সে তার দুর্নাম ঘুচাবার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগল।

সেদিন 'হিণ্ডেন বার্গে' ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছিল। সে এসে আমায় জানাল যে সে সেখানে যেতে চায়। আমিও আপত্তি করলুম না। আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, সে ভীষণ উত্তেজিত হয়েই ওখানে যেতে চাচ্ছে। যদি যেতে না পারে তবে আত্মহত্যাও করতে পারে। তা ছাড়া এই জায়গাটা জয় যে করতেই হবে আমাকে। 'রেণী' এই জায়গার কথাই বলেছিল আমাকে। তাকে এ অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হল। তক্ষুণি আমার মনে হল যে এবার আমার জয় নিশ্চিত।

তাকে পাঠালুম, কিন্তু নিজেও বসে থাক্‌তে পারলুম না। তার পেছনে পেছনে আমিও সেখানে গেলুম। দেখ্‌লুম, শত্রুদের সাম্‌নের ট্রেঞ্চে বসে সে অবিরাম 'মেসিনগান' ছুড়ছে। আমি তার পাশে 'টেলিস্কোপ' হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছিলুম আর তাকে হুকুম করছিলুম কোন্ কোন্ দিকে গুলী ছুড়তে হবে।

উঃ! কি যুদ্ধটাই না সে সেদিন করেছে। একটিবারের জন্তও টু শব্দটি করেনি বা থামেনি। অবিশ্রাম চালিয়ে চালিয়ে 'মেসিনগান' বন্ধ হয়ে গেলো। তখন 'রাইফেল' হাতে কোমর পর্য্যন্ত গর্ত্তে ডুবিয়ে রেখে গুলী ছুড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ একটা কামানের আগুন তার কাণ দুটো বধির আর চোখ দু'টো অন্ধ করে দিলো। একটু অস্পষ্ট শব্দ করে বীর ধরাশায়ী হল। আজ তার কাপুরুষ নাম ঘুচ্‌ল।

আমি তার ভূ-লুন্ঠিত দেহটা কোন রকমে ট্রেঞ্চে নিয়ে এলুম। তারপর সৈন্যের জন্ত 'ফোন্' করে একাই কামান দাগছিলুম। সাহায্যকারীদলও এল। তারপর ভীষণ লড়াইর পর সে স্থানটা অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কি, নিজের প্রতি করুণা দেখানোর সময় বিশেষভাবে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। নইলে ওরকম কাপুরুষ বনে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। ছিঃ! এর চেয়ে মরণও ভালো!

পরদিন নব-অধিকৃত স্থানটি দেখ্‌বার খুব সাধ হল। ভয়ে ভয়ে এদিক্ সেদিক্ তাকিয়ে তাকিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলুম—বলাতো যায় না কোন্‌দিক থেকে গুলী এসে এপিঠ ওপিঠ করে দেয়? হামাগুড়ি মেরে একটা সুরঙ্গ-পথে মাটীর নীচে ঢুক্‌লুম।

বাপ্‌রে! কি অন্ধকার, আর কি বিশ্রী গন্ধ! নাড়ী সব উল্টিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে চায়। সাম্‌নে এগুতে গিয়ে মানুষের মৃত দেহের উপর এসে পড়লুম। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল ফিরে যাই—কিন্তু আবার ইচ্ছা হচ্ছিল, শত্রুদের গর্ত্তগুলো একবার দেখে যাই

মানুষের দেহের উপর দিয়েই চলেছি। কতটুকু এসে আর পথ দেখ্‌তে পেলুম না। পকেট থেকে বিজ্‌লী বাতির ব্যাটারী দিয়ে চারিদিক চেয়ে সুরঙ্গের আরেকটা মুখ দেখ্‌বার চেষ্টা করলুম। অনুসন্ধানে পথটা দেখ্‌তে পেলুম এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলুম। ভয় হচ্ছিল—যদি কেউ বেঁচে থেকে থাকে আর আমাকে দেখ্‌তে পায়, তবে হয় মৃত্যু নয় বন্দী হতে হবে। বন্দী হওয়ার চেয়ে মরণ তবু শ্রেয়ঃ।

চল্‌তে চল্‌তে একটা dug out পেলুম। তার সিঁড়িও ছিল নীচে নেমে যাবার। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলুম।

ওরে বাপ্‌রে! পড়্‌বি তো পড় একেবারে বাঘের গুহায়। দেখ্‌লুম কয়েকজন শত্রু সৈন্ত বসে বসে বিমর্ষভাবে কি পরামর্শ করছে। কেউ এলিয়ে শুয়ে পড়েছে, কেউ গালে হাত দিয়ে বসে আছে আর কেউ বালুর বস্তার উপর বসে বসে বুট দিয়ে মাটী খুঁড়ছে। আমারতো অন্তরাত্মা কেঁপেই অস্থির। মাগো! এই বুঝি দেখে ফেলে! এই বুঝি এসে ধরে ফেলে! এই বুঝি গুলী ছুড়ে। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পড়্‌তে পড়্‌তে

কোনো রকমেতো উপরে চলে এলুম। আমাকে তারা দেখ্‌তে পায়নি ; খুব চিন্তান্বিত ছিল বলেই বোধ হয়।

উপরে এসেই semaphore signalএ আমার সৈন্যদের জানালুম যে এখানে কয়েকজন সৈন্য এখনো বেঁচে রয়েছে। শীগ্‌গীর এসো, ওদের বন্দী কর্‌তে হবে।

তারা এলো এবং ছোট রকমের একটা যুদ্ধ হল। দু'জন শত্রু হস্তে বন্দী হল, আর তিনজন মরে বাঁচ্‌ল।

একজন বন্দী যেন বৃদ্ধ ছিল। তাঁর শ্মশ্রুরাজি বুক পর্য্যন্ত নেমেছে, চুলগুলো বেশ বড় বড় এবং কোঁকড়া কোঁকড়া—পিঠ পর্য্যন্ত নেমেছে। দেখ্‌লে মনে হয় যেন কবি। দেশমাতার জন্যে, রাজার আহ্বানে তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবন নিয়ে এই আগুনের মাঝে ছুটে এসেছেন। তাঁর সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন। কি সহিষ্ণু!

আবার তাঁর শরীরটাও ষাঁড়ের মতো। দেখ্‌লে ভয় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাঁকে বন্দী হতে হল। এমন কত কষ্টই না পেতে হবে তাঁকে!

তাঁর জন্যে একটু কষ্ট হল। আমি তাঁকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে দিলুম না। আমার কাছেই তাঁর স্থান দিলুম।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম কি করে তিনি এ বুড়ো বয়সে এত কষ্ট সইছেন, শান্তির আসন ছেড়ে, কি করে এই ধূমকুণ্ডলীর মাঝে, আগুনের মাঝে নেমে এলেন?

তিনি জবাব দিলেন—সকলে যেম্‌নি করে সহ্য করে আমিও তেম্‌নি করে সয়ে থাকি! আশ্চর্য্য হচ্ছ! আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—অন্ততঃ আমরাতো এতে আশ্চর্য্য হতে পারি না! হাঁ—তোমাদের পক্ষে তা বিস্ময়কর বটেই তো! তোমরা যে ভীরু কাপুরুষ! অল্প ভারেই তোমরা নুইয়ে পড়। অপর্য্যাপ্ত আহার আর পানীয় পেয়েও তোমাদের সাহস এতটুকু নেই। যে দেশ পরাধীন, যারা দাস খত দিতে গৌরব বোধ করে, তাদের সাহস কতটুকু হতে পারে? আমরা শুনেছি, তোমরা এত নীচ যে, মা বোনের অত্যাচারেও তোমাদের বুকে বাজে না। তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পার—কিন্তু কোনো প্রতীকার কর্‌তে পারনা, করনা। কর্‌বেই বা কি করে? যারা বিদেশীর মুখাপেক্ষী, যাদের দেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের কোনো উপায় নেই, যারা কেনোদিন সৈনিক বিভাগে যোগ দেওয়ার ফুরসুৎ পায়না, যাদের রাজা বিদেশী—তাদের সাহস কি পরিস্ফুট হতে পারে? সর্ব্বদাই যে ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়!

তোমরা যদি দেশমাতার আহ্বান শুন্‌তে পেতে, মনুষ্যত্ব যদি তোমাদের থাক্‌ত—তবে তোমাদের দেশের বৃদ্ধেরাও আমাদের মতন যুদ্ধে নাচ্‌তে পার্‌তেন, সাহস পেতেন, শক্তি পেতেন। তোমরা কোনোকালে বিপদের মুখে যাও না, কারণ তোমরা ভয় পাও, সাম্‌নে পড়্‌লেও পিছিয়ে পড়, কারণ তোমাদের সে শক্তি বা সাহস নেই যে তার মুখে দাঁড়াতে পার! কিন্তু আমাদের ছোটকালেই সে সবের মাঝে যেতে হয়। পিতামাতা সন্তানদের ছোট বেলায় তৈরী কর্‌তে চেষ্টা করেন। তাই বলে ভেবোনা তোমাদের তাদের কম স্নেহ করেন? আমরা আচম্বিত মৃত্যু সম্ভাবনায় দাঁড়িয়ে থাকি, কারণ আমরা যে দেশের রাজার হাতে, পিতামাতার হাতে তৈরী হয়েছি! তাদের সুশিক্ষার ফলে আমরা সহিষ্ণু হয়েছি, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী হয়েছি, আর তাঁদেরই সুশিক্ষার ফলে আমরা বিপদকে বিপদ বলে ভাব্‌তে পারি না—মরণকে ভয় করি না।

এইতো তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছি, তোমরা আমাদের দ্বারা কত কাজ করিয়ে নেবে—কত কষ্ট আমাদিগকে দেবে, কত অত্যাচার কর্‌বে, নিষ্ঠুরের মতন ব্যবহার কর্‌বে, সে সব জেনেও আমাদের এতটুকু ভয় হচ্ছেনা। কেন জান? আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, ভয় জয় করা। ভয় জয় করাই হচ্ছে মহৎ জীবনের ভিত্তি। বাল্যকালে এই

সত্যটুকু উপলব্ধি করবার সুযোগ পাইনি—পেয়েও বুঝিনি। তখন মনে করতুম কি জান? মনে করতুম যে ভয়কে চিরকালের মতো জয় করব।

তা কি হয়? তা কখ্খনও হয় না। সব সময়ে বুঝ্তে চেয়েছি যে প্রত্যেকবারেই নূতন করে ভয়কে দমন করতে হয়। আমাদের মেজর কি বলতেন জান? তিনি বলতেন—ছোটকাল থেকেই ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করা উচিত। যারা তা করেনা তারা জীবনে উপহাসাস্পদ হয়। ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়। যে ভয় পায়, সে সম্ভ্রান্ত হবার সুযোগ পায় না। কিন্তু শেষ সময় তিনি বুঝেছিলেন, ভয় পায় সকলেই, কিন্তু প্রকৃত মানুষ সেই, যে ভয়কে জয় করে এবং অগ্রাহ্য করে, একেবারে মন থেকে দূর করে দেয়।

এইমাত্র আর্দ্দালী এসে বলে গেলো যে দু-ঘণ্টার মধ্যেই বন্দীদের এবং আহত ন্যাভার্ণকে নিয়ে প্যারী রওনা হতে হবে—সার্জ্জেণ্ট জেনারেল খবর পাঠিয়েছেন।

ওগো আমি যে বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তোমার কাছে না গেলে যে আর চাঙ্গা হয়ে উঠ্ব না। কবে যে সে সুযোগ ঘটবে কে জানে?

তবে আজ আসি। আমার আশীর্ব্বাদ, ভালোবাসা এবং চুম্বন জেনো। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

ক্রমশঃ—

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

শ্রীবিনয় ভূষণসেনগুপ্ত

(১)

বন্দিতোমায় রাখাল-বন্ধু বৃন্দাবনের বিপিন-চারী,
ধরার জীব তরাতে এলে হরি, গোপের ঘরে দয়া করি।
দয়ার তুমি শিরোমণি, বিরোধ শুধুই শঠের সনে,
সহজ ঠাকুর সহজ ভাবে, প্রেম বিলালে বৃন্দাবনে।

(২)

এলে, সুধা হয়ে সাধুর তরে, ওগো, মৃত্যুরূপী দুষ্কৃতের,
কংস তোমার রোষে ধ্বংস, হলে জীবন-রূপী জগতের।
তুচ্ছ করতে বিপদ যত শিখালে নেচে সাপের মাথায়,
গিরি-গোবর্দ্ধন ধরলে হাসি বিন্দু-কাতর হলেনা তায়।

(৩)

ধনীর চেয়ে ভক্ত দুঃখীর রাখ তুমি শত অনুরোধ,
দুর্য্যোধনের অন্ন ছাড়ি, খেলে অন্নহীনের ঘরের খুদ।
দুর্ল্ভ তুমি দেবগণের মুনিগণ হায়, না পায় ধ্যানে,
হ'য়ে সেই অচিন্ত্য, কি আনন্দ ধেনু চরাও বৃন্দাবনে।

(৪)

ছাড়ি' বৈকুণ্ঠের রাজ্য-সম্পদ রাখালগণের হ'লে রাজা,
তোমার কার্য্য হ'ল ভক্ত সনে কদমতলায় বাঁশী-বাজা।
বিশ্ব মানব পাগল করা-মূর্ত্তি তোমার ভুবন-মোহন,
মনসিজদর্প-হারী, তোমার পদে কাম বিচেতন।

(৫)

আপন বলে তোমায় শুধু আপন হ'তে অধিক জড়াই,
হোক্‌না প্রাণে বেদনা ঘোর তার তরে মোর দুঃখ নাই।
তুচ্ছ করি মান-অপমান, সবার চেয়ে সেরা চাওয়া,
সকল ধর্ম্ম পরিহরি, তোমার পদে শরণ লওয়া।

(৬)

তোমার অন্ত বল হে অনন্ত কে পায় ভাবি অন্তর্য্যামি!
নিরন্তর মোর থেকো প্রাণে, এর বেশী সুখ চাইনা আমি।
অন্তর করি পাপ অন্তরের বাঁজাও বাঁশী প্রাণের হরি,
বন্দি তোমায় রাখাল-বন্ধু, বৃন্দাবনের বিপিনচারী।

সমাজের জীবন

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

জগতের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিকতার মধ্যদিয়া যে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা একদিনে বা দশ বিশ বৎসরে হয় নাই, শত শত বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাতে, শত শত বৎসরের পরিবর্ত্তনের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জাতিগুলির চিন্তা ও ভাবধারার আদানপ্রদানে প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি নিয়া প্রত্যেক জাতিই ভাবের আদানপ্রদানে নিজের সমাজকে পুষ্ট করিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ বাণিজ্য-জগতে একচ্ছত্র সম্রাট ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যুগে যুগে বহু উপনিবেশ জগতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হইয়াছে; আবার যুগে যুগে বহু জনপ্লাবন ভারতের বক্ষে আসিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিশাল ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে।

এই যে আদান প্রদান, তাহা আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও যে ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়না। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় মধ্যএশিয়া নিবাসী আর্য্যনামে পরিচিত কতকগুলি বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে। কালক্রমে তাহারা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন। উন্নত সভ্যতা নিয়া তাঁহারা জগতের যে প্রদেশেই গিয়াছেন; তথায়ই আদিম অধিবাসী অসভ্য বর্ব্বরদিগের সহিত শক্তির পরীক্ষায় ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত প্রদেশে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে এবং জগতের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত আদিম নিবাসিগণের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া দেশ জয় করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রে এত সাদৃশ্য আছে যে অধুনা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঐতিহাসিক টেলর সাহেব বলেন :-

"These tribes are now generally classed as Turanian, and belong to a very large section of one of the most ancient people on the Earth, who inhabited India, the Eastern and part of the Pacific Islands, and Australia. They have been also termed as Negritos, because of certain points of similarity with the Negroes of Africa...........A striking instance of this agreement is afforded in "boomerang," which was first met within Australasia, and was supposed to be peculiar to its inhabitants; but the wild tribes of Southern India possess exactly the same weapon and use it in the same manner. So also the science of language when applied to all the tongues of this wildly spread people, finds agreement in construction in roots of words, in idioms and phrases, and often in the very words themselves."

দ্রাবিড়গণ দাক্ষিণাত্যের এক প্রবল প্রতিপত্তিশালী জাতি। প্রাচীন যুগেও এই জাতি অসভ্য বর্ব্বর ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, অথচ এই দ্রাবিড়গণও সেই অনার্য্যজাতি যাহাদিগকে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া আর্য্যগণ ঘৃণা করিতেন। দ্রাবিড়গণ পূর্ব্বোক্ত বিশ্বব্যাপ্ত বিশাল অনার্য্যশাখার বংশধর। দ্রাবিড় ভাষার সহিত অন্যান্য অনার্য্যভাষার সাদৃশ্য আছে, ইতিহাস তাহাই বলে—"These Dravidian languages are found by philologists to be akin to the Turanian or Sythian of remote times"—Mannual of Indian History, Page 40—প্রাগৈতিহাসিক যুগে তমসাচ্ছন্ন

অতীতের কোন সুদূর মুহূর্ত্তে যে দ্রাবিড়গণ ভারতে প্রবেশকরতঃ কোন পথে তাহারা ভারতআক্রমণ করে, তাহার সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক বলেন যে অতি প্রাচীন যুগে তাহারা ভারত জয় করে—"it may be assumed therefrom that a Turanian or Seythian race became settled in the Southern portions of India after an in vasion or invasions, by a more southern route than the Aryans"—দ্রাবিড়গণ জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে যত উপাদান যোগাইয়াছে অনেক সভ্য জাতিই তাহা পারে নাই। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য একপ্রকার তাহাদের হাতেই ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে তাহারা উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত সমুদ্রবক্ষ অকুতোভয়ে অতিক্রমকরতঃ প্রাচ্য এবং পাশ্চাতের সুদূর দেশসমূহ বাণিজ্যের যোগসূত্রে ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন মানবশাখার উন্নতির যেমন সহায়ক হইয়াছিল তেমনি নিজেদেরও সামাজিক জীবনে এমন একটা গৌরবময় অঙ্কের অভিনয় করিয়াছিল যাহা অধুনা নব নব বিস্ময়ে জগত প্লাবিত করিতেছে। দ্রাবিড় সভ্যতা-সম্ভূত অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ আজও দাক্ষিণাত্যে বিজন গহনে পার্ব্বত্য কান্তারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্রাবিড় সভ্যতার গৌরবময়ী কাহিনী জগতে উচ্চকণ্ঠের ঘোষিত করিতেছে। দ্রাবিড়সভ্যতা একসময়ে আর্য্য সভ্যতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। দ্রাবিড় বংশসম্ভূত রাবণ আর্য্য অযোধ্যারাজ হইতে সভ্যতা হিসাবে কোন অংশে ম্লান ছিলেন না। তাহারই মৃত্যু সময় সুসভ্য রামচন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজনীতির পাঠ নিয়াছিলেন।

ধরিত্রীর সর্ব্বত্রই আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশসমূহ অধিকার করিয়াছেন। এই সমস্ত অনার্য্য শৌর্য্যবীর্য্য বা পরাক্রমে তথাকথিত আর্য্যসম্প্রদায় হইতে কোন অংশে খাটো ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বরং তাহাদের স্বাধীনতার স্পৃহা, তাহাদের স্বসমাজের প্রতি স্বাভাবিক প্রেম, তাহাদের চরিত্র এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহারা আর্য্যপ্লাবন দ্বারা যুগে যুগে বিজিত, নির্জ্জিত লাঞ্ছিত হইলেও, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সরলতা সেই স্বজাতি প্রেম ভুলিয়া এখনও আর্য্য সমাজে সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। বিশ্বব্যাপী এই যে বিরাট অনার্য্যজনসমূহ, তাহারা সহস্র বৎসরেও আর্য্যগণের উন্নত সভ্যতানুমোদিত উৎকৃষ্টতর যুদ্ধপ্রণালীর সম্মুখে নতশির হয় নাই। প্রতিপদে তাহারা আর্য্যগণকে বাধা দিয়াছে—উভয়পক্ষে বহু রক্তপাত হইয়াছে। অনেকবার তাহারা পরাজিত হইয়াছে—আবার বহুবার আর্য্যবিক্রম তাহাদের শৌর্য্যের নিকট নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে রোমের সাম্রাজ্যগর্ব্ব এক সময়ে বর্ব্বরগণের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়াছিল এবং বহুবর্ষ পর্য্যন্ত রোমের আর্য্য সভ্যতা অনার্য্যসভ্যতার পদসেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা এমন ভাবে পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা ছিলনা বলিলে সত্যের অপমান হয়। আর্য্য শিক্ষাসভ্যতার নিকট অনার্য্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও একথা অতি খাঁটী যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন ছিল। এখনও ভারতের কোল, ভীল সাওতাল, গাড়ো, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে কিয়দংশে সামাজিক শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও অসভ্যগণ সর্ব্বদাই কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হইয়া একজন প্রধানের অধীনে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর্য্যগণের চক্ষে এই সমস্ত আইন কানুন যতই উপহাসাস্পদ হউক না কেন, ঐ কথা অতি খাঁটী যে বিংশ শতাব্দীর আর্য্য সভ্যতা গৌরবের ঘোর কোলাহলের মধ্যেও এই সমস্ত প্রাচীন জাতি তাহাদের প্রাচীন আইনকানুনের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন

করে নাই, বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতার ইন্দ্রজালে তাহাদের বন্যপ্রাণ আকৃষ্ট হয় নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার গৌরবময় দীপ্তিতে তাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়া তাহারা মরীচিকার পশ্চাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটে নাই।

মানব-সভ্যতার আদিযুগে কোনপ্রকার সমাজ-বন্ধন ছিল না। মানবসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানব যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন শুধু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই আবদ্ধ ছিল। একই স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নীরূপে ব্যবহৃত হইত। ইচ্ছামত যৌনসম্মিলন, ইচ্ছামত আহার বিহারই ছিল সেই যুগের মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

পুরাণানুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মানসী সৃষ্টি আরম্ভ করেন; কিন্তু বহুকালগত হইলেও মানসী প্রজাবৃদ্ধি হয় না দেখিয়া প্রজাপতি মৈথুনধর্ম্মে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হইলেন। তথা উক্তঞ্চ ব্রহ্মপুরাণে—

"যদাস্য মানসী বিপ্রা ন ব্যবর্দ্ধতি বৈ প্রজা।
তদা সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ
স মৈথুনেন ধর্ম্মেন সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥"

৩য় অধ্যায়—

তখন এই মৈথুনধর্ম্মটা কোনপ্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতার আবদ্ধ ছিল না। আত্মসুখই ছিল সেই যুগে প্রত্যেক প্রাণীর উদ্দেশ্য। মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোনপ্রকার সামাজিক বন্ধন না থাকাতে সংসারে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। সেই অবস্থায় সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। অবাধ যৌনসম্মিলনের বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। তখন এই সমস্ত অত্যাচারের বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম ধীরে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইল, মৈথুন ধর্ম্মটাকে নিয়মে আবদ্ধ করা হইল, ইচ্ছামত যৌনসংসর্গকে নিরোধ করা হইল। তখনই প্রকৃতপক্ষে সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু সমাজ ছিল তখন সদ্যজাত শিশু।

নিয়মানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ যৌনসম্মিলন হইতে বিভিন্ন বংশধারায় সৃষ্টি হইল। তখন সেই আদি উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। অল্পকালমধ্যেই প্রত্যেক বংশ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিখিল। এইভাবে এক একটা বংশ ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখনও কিন্তু মানবসমাজ আত্মপর ভেদাভেদে অন্ধ ছিল। তাই একবংশ অন্য পার্শ্ববর্ত্তী বংশের সঙ্গে সর্ব্বদাই শত্রুতায় লিপ্ত থাকিত; এই শত্রুতা হইতে যুদ্ধাদি পর্য্যন্ত হইত। পুরাণে দেখিতে পাই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা বহুকাল অর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল। সেই রেষারেষি হিংসাদ্বেষের যুগে এক বংশ অপরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্ববংশীয় একজনকে প্রধান করিয়া তাহার অধীনে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। এইভাবে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকাতে তৎকালীন সমাজে ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এইরূপে এক একটা গোত্র বা বংশ যখন নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া উঠে তখন কতকগুলি গোত্র বা বংশসমষ্টি একত্রিত হইয়া গ্রামের সৃষ্টি করে। যখন এক একটী গ্রাম কোন বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তিতায় সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিখিল, তখন কতকগুলি গ্রামসমষ্টি 'বিশ্‌' আখ্যায় অভিহিত হইত। এই বিশের উপরে যে কর্তৃত্ব করিত, ঋগ্বেদে তাহাকে বিশ্‌পতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ সমষ্টিকে 'জন' বলা হইত এবং জনের উপরে যিনি প্রাধান্য করিতেন, 'তিনি' 'রাজন্‌' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। পূর্ব্বে আর্য্যগণ একজনকে বিশ্‌পতি নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। অভিযান সময়ে রাজন্যগণ একজন পরাক্রমশালী মহাবীরকে বিশ্‌পতি নিযুক্ত করিতেন। এই প্রধানকে আর্য্যগণ

ভাষায় বিশ্‌পতি, ঝেন্দ পারসীক বেশপৈতে, লিথোনীও উইষ্‌পতি, এবং রুষ ভাষায় বিষ্‌পাত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ্‌পতি শব্দটীর বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা এক আর্য্যবংশসম্ভূত।

সভ্য আর্য্যগণ যখন জগতের বিভিন্ন প্রদেশে ভীমবেগে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন, তখন অনার্য্যগণ প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু আর্য্যগণের উন্নত সভ্যতার নিকট, সুশৃঙ্খলতার নিকট অনার্য্যগণ প্রতিপদে পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। আর্য্যগণ ভারতাক্রমণ করেন নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়া। তাঁহারা শিরে শিরস্ত্রাণ, শরীরে বর্ম্ম ধারণকরতঃ রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেন। পৃষ্ঠদেশে তাঁহারা শরপূর্ণ তূণীর এবং হস্তে খড়্গ ধারণ করিতেন। ভারতাক্রমণের সময় বীরেন্দ্রকেশরী সুদাস ছিলেন আর্য্যগণের বিশ্‌পতি। সুদাস ইরাণদেশের দেবদাস রাজার পুত্র এবং দেববান্‌ রাজার পৌত্র। সভ্যতানুমোদিত উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত সুশৃঙ্খল যোদ্ধৃগণ সমভিব্যাহারে বীরপুঙ্গব সুদাস অদীনপরাক্রমে এবং অলোকসামান্য বীরত্বে দুরারোহ হিমালয়ের পার্ব্বত্য অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শেতয়াবরী, শর্ষণাবতী, বিযুদী, কুভা, অসিক্লী, শতদ্রু প্রভৃতি নদী অতিক্রম করতঃ পঞ্চনদপ্রান্তে আর্য্যের বিজয়বার্ত্তা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বহু যুদ্ধের পর সুদাস ধীরে ধীরে পঞ্চনদ জয় করেন। সুদাসের ভারতজয়ের ইতিহাস ঋগ্বেদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন যুদ্ধে ৩০ হইতে ৫০ হাজার কৃষ্ণকায় অনার্য্য হত হইয়াছে। সুদাসের সময়ে ভারতের নানাপ্রদেশে আর্য্য সামন্তরাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুদাসের সাম্রাজ্য মগধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যপ্লাবনের সময় ভারতীয় অনার্য্য সম্প্রদায় বনে জঙ্গলে পশুর মত জীবন যাপন করিত তাহা নহে; পরন্তু তাহারাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল, ৩০সূঃ উল্লেখ আছে যে—"শত শত দুর্ভেদ্য পাষাণনির্ম্মিত পুরীর অধীশ্বর দাসরাজ কুলিতরের পুত্র শাম্বর সুদাস কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।" আর্য্যগণ ভারতজয়ের পর ভারতের আদিম অধীবাসিগণকে দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। শত শত পাষাণনির্ম্মিত পুরীর যিনি অধীশ্বর তাহাকে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিলে ঠিক হয় না। তবে আর্য্যসম্প্রদায় সভ্যতাহিসাবে অনার্য্যগণ হইতে অনেকটা উন্নত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং তাহাদের সামাজিক জীবন তাহাদিগকে আরও উন্নত করিয়াছিল তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। একটা বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হয় তো আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধীবাসিগণের ছিল না। কিন্তু আর্য্য সুদাসের সেই ক্ষমতা ছিল। অনার্য্যগণের যদি সে ক্ষমতা, ততটা একতাবন্ধন, ততটা সামাজিক সংগঠন থাকিত, তাহা হইলে আর্য্যগণ তাহাদের উন্নততর সভ্যতা সত্ত্বেও এত সহজে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

ধীরে ধীরে, দিনের পর দিনে আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত, বিপর্য্যস্ত করিয়া দেশের পর দেশ হস্তগত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত শত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও অনার্য্যগণ বক্ষশোণিতের বিনিময়ে আর্য্যসম্প্রদায়কে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল। আর্য্যগণ নির্ব্বিবাদে ধর্ম্মকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না। যজ্ঞাদির সময় তাহাদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। অনার্য্যগণের এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং উৎপীড়নের ইচ্ছা আর্য্যসম্প্রদায়কে সুদৃঢ় একতাবন্ধনে বদ্ধ করিল। এই সময় সমস্ত অবস্থাবিপর্য্যয়ে আর্য্যসমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিল। জাতিভেদের প্রথম সূত্রপাত হয় ভারতে আর্য্যাভিযানের পূর্ব্ব হইতেই। প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে অথর্ব্বান অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্র অর্থে যুদ্ধশীল রাজন্য

এবং বিশ্ অর্থে সাধারণ প্রজা বুঝাইত। অনেকের মতে আর্য্যগণ পারসীকগণের সহিত একত্রাবস্থানের সময় হইতেই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক যুদ্ধেই মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রকে আহ্বানকরতঃ তাঁহার দ্বারা জয়দান করিতেন। সময় সময় তাহারা যুদ্ধাদিও করিতেন। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবিদ্, জ্যোতির্ব্বিদ্, তপস্বী ও বীর ছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সংগ্রামশীল বীর ছিলেন।

পারসীকগণের সহিত একত্রাবস্থানের কালে আর্য্যগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস একই ছিল; কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মবিশ্বাসে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে আর্য্য সম্প্রদায় জাতি পারসীকগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং অসিবলে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজেও নূতন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। পারসীকগণের মত আর্য্যগণও পুরাকালে অগ্নিহোত্র করিতেন—ইহা তাদের নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। কলির প্রারম্ভে আদিত্য পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা অগ্নিহোত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। যথা—

"অগ্নিহোত্রহবন্যাশ্চ লেহোলীঢ়া পরিগ্রহঃ
এতানি লোক গুপ্তর্থ্যং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥"

আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশে ছিলেন। শীতের প্রাণান্তকর কুহেলিকার মধ্যে অগ্নি জীবনদায়ক সন্দেহ নাই। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি রক্ষা করা হয়। সেই সময়ই সম্ভবতঃ অগ্নিকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দেবতার সম্মানে উক্ত অগ্নিহোত্রের প্রচলন হইয়া থাকিবে। তারপরে আর্য্যগণ ভারতে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গৃহে অগ্নি রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই দেখিয়া অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়াছেন। তবে আর্য্যগণ ভারত জয়ের পর এই বিশাল দেশের প্রকাণ্ড মহীরুহ সমাচ্ছাদিত বনভূমি দর্শনে বৃহৎভাবে অগ্নিহোত্র করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন; অগ্নিহোত্রের ক্ষুদ্র অগ্নি ক্রীড়া হইতেই বিরাট ভাবে-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। বিরাটভাবে যজ্ঞের জন্য যেমন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দরকার হইত, তেমনি তাঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহুসংখ্যক যোদ্ধপুরুষের দরকার হইত। নচেৎ যজ্ঞার্থী ব্রাহ্মণগণকে যদি আবার যজ্ঞস্থল রক্ষার জন্য সজ্জিত থাকিতে হইত তাহা হইলে যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ তৎকালে সামাজিক কল্যাণসাধনে আরব্ধ হইতেন। এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিভাগে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল।

অনেকে বলেন বৈদিক সময়ে বর্ণভেদ ছিল না। বেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ নাই। একথা ঠিক নহে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতমগ্রন্থ। ঋগ্বেদের বহুস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন:—

"ব্রাহ্মনাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
শিবে নো দ্যাবা পৃথিবী অনেহসা ॥" ৬ম, ৭৫ সূ, ১০ ঋক "হে ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, সোম্যগণ তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদের মঙ্গল কর হও।" সপ্তম মণ্ডল, ১০৩সূ, ১ঋক, বলিতেছেন—

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জ্জন্যজিন্বিতাং প্রমংস্পকা অবাদিষুঃ ॥"

"সংবৎসর ব্রতচারী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মণ্ডুকগণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্ উচ্চারণ করেন।" পুনরায় ৪ম, ৪২সূ, ১ম ঋক বলিতেছেন—

"মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য।
বিশ্বা যো বিশ্বে অমৃতা যথানঃ ॥"

"আমি ক্ষত্রিয় ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার।" এই সমস্ত ঋক্ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক সময়েও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আর্য্যদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্ম যাঁহারা করিতেন তাহারা বৈশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ আখ্যায় অভিহিত। হইতেন। উপনয়ন, ও অঙ্গিরা ঋষি প্রবর্ত্তিত অগ্নিহোত্রাদি তাঁহাদের সাধারণ সংস্কার। সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ অবশ্য ছিল না। তখন সকলেই সমান পদবীতে সমাজে বিচরণ করিতেন। পরে কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারত তাহাই বলেন—

"ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতেঃ কর্ম্মভিব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥"

শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়॥

কর্ম্মানুসারে অতি প্রাচীন যুগেই এই বর্ণবিভাগ সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী এবং সাহসিক কার্য্যে তৎপর, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ, কৃষিকর্ম্মে নিরত দ্বিজগণ বৈশ্য এবং হিংসা, অসত্যপ্রিয় লুব্ধ, কৃষ্ণকায়, শৌচপরিভ্রষ্ট অনাচারী দ্বিজগণ শূদ্র আখ্যায় অভিহিত হইত। সর্ব্বোপরি শুভ্র-সত্যগুণসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর্য্যগণের মধ্যে প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়া কোন বর্ণভেদ ছিল না। তাঁহাদের ভারতে অবস্থানের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়ার গুণে যাহারা কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণে অশুচিকার্য্যে রত, লোভী এবং অসত্যবাদী হইয়া পড়িলেন, তাহারাই শূদ্র নামে খ্যাত হইয়াছে এবং বিজিত অনার্য্যদিগের মধ্যে যাহারা আর্য্যদের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সংশ্রবে রহিয়া গেল, তাহারা আর্য্যসভ্যতার মহিমময় দীপ্তির সম্মুখে নিজেদের বৈশিষ্ট বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া শূদ্র নামে সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর যাহারা স্বাধীনতা বিসর্জ্জনে দাসত্ববরণ ঘৃণ্য মনে করিয়া দূরে সরিয়া রহিল ভারতের নানাস্থানে তাহারা ভীল, কোল, সাঁওতাল, নাগা গাড়ো, খাসিয়া, আবর প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই শিশু সভ্যতা আকড়াইয়া আজও জগতে জীবিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রম ভারতীয় সভ্যতার তাঁত।" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্মবিভাগ প্রচলিত না থাকিলে যে প্রাচীন সভ্যতা গৌরবে গৌরবান্বিত আমরা জগতের বক্ষে সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করি, তাহার উপায় ছিল না। প্রাচীন ভারতে দেখিতেছি সত্য ত্যাগের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি জটাচীরধারী ব্রাহ্মণ জগতের সমস্ত ভোগ-বিলাস, সুখসম্পদ পদদলিত করিয়া বিশ্বের সমগ্র দারিদ্র্য সাদরে মাথায় তুলিয়া নিয়া নির্জ্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিশ্ববাসির হিতের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। আমাদের মানসনেত্রের দ্বারে ভাসিয়া বেড়ায় ব্রাহ্মণ দধিচীর মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি, যিনি "জগদ্ধিতায়" অম্লান বদনে, অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে আমরা পাই ব্যাস, বাল্মিকী, গৌতম; কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য; মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ নিবিড় অটবী বিভাগে আজন্ম সাধনা-সলিল-সিঞ্চনে যে সমস্ত অতুল রত্নাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্ত আজিও দেশে বিদেশে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। নহিলে আজ আমাদের কি আছে? ভারতের ক্ষাত্রশক্তি নির্ব্বাপিত, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের গর্ব্ব ধুলায় লুণ্ঠিত, মৃত। বৈশ্যের বাণিজ্যপিপাসা আজ অসম্ভব অতীত স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতের গৌরবের দিনের চিহ্ন আজ আর কি আছে?

বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ-বেদান্ত-প্রসবিনী,

ভক্তিতত্ত্বের-জন্মস্থানরূপিনী, পুণ্যপুঞ্জময়ী ভারতীয় সভ্যতা একদিন স্বীয় বিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভারত তো প্রাচীন ভারতের আত্মবিস্মৃত কঙ্কালমাত্র। অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় আদর্শে সমগ্র জগতের সমাজ সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার সম্মোহিনী মন্ত্র নিয়া যুগে যুগে বহু জনপ্লাবন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারে তদ্দেশীয়গণকে আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। মিশরের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার ছায়া মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকারে ভারতীয়গণই মিশরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বিস্তার করেন। ঐতিহাসিক Pocock সাহেব তাঁহার "Indian in Greece" নামক পুস্তকে বলেন—"An Egyptian is made to remark that he heard from his father that the Indians were wisest of men and that the Egyptians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers and acknowledged their ancient origin.—মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ব্রুগস্ বে বলেন—"স্মরণাতীত সময়ে একদল ভারতবাসী নীলনদের উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।"

মিশরীয় সমাজে জাতিভেদের মধ্যে আমরা ভারতীয় প্রভাব দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক টেলর বলেন—"মিশর দেশেও ভারতবর্ষের মত জাতিভেদ ছিল। পুরোহিত এবং যোদ্ধগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন ছিলেন। তাহাদের নীচে কৃষক, বণিক, নাবিক, শিল্পী ও সর্ব্বনিম্নে মেষপালকগণ স্থান পাইত। পুরোহিতগণের মধ্যেই আবার বিচারক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও চিকিৎসক ছিল। রাজা ও রাজপরিবার যোদ্ধজাতির অন্তর্গত ছিল। সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্য বংশানুক্রমিক ছিল। আত্মার পুনর্জ্জন্মবাদ মিশরে প্রচলিত ছিল; ইহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই আনীত হইয়াছিল। মিশরবাসীরা গাভীর পূজা করিত, তাহারা পৌত্তলিক ছিল, তাহাদের দেবমন্দির ছিল।" প্রাচীন মিশরের মুইট নাম্নী দেবীমূর্ত্তি ভারতীয় কালীমূর্ত্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতীয় প্রথাতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন এবং অধুনাও আবিসিনিয়াবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সময় প্রাচীন সংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যথা—Another survival of the Hindu influence seems to be mateb or blue silk neck cord, the badge of baptism, in modern Abysinian christianity, which suggests, more than one Arab custom, the Zenner or sacred cord of the Brahmin priest"—Ibid. P. 139.—অতিপ্রাচীন যুগে ভারতীয় প্রভাব য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি বৃটেনেও সামাজিক জীবনের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক Godprey Higins বলেন—"ভারতবাসী ব্রিটনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং বৃটনের Druidsগণ হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায়।"

ভারত এবং জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার আরও বহু প্রমাণ আছে এবং আরও দিন দিন আবিষ্কৃত হইয়া বিশ্ববাসির নিকট এক অদ্ভুত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের সামঞ্জস্য দেখিয়া মনে হয় যে একই সামাজিক প্রভাব বিভিন্ন সমাজের গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এই যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যোগসূত্র, ইহা বাণিজ্য এবং উপনিবেশের সাহায্যে সেই যুগেই সফল হইয়াছিল। প্রাচ্যের সামাজিক প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালেই এবং ভারতীয় সমাজের প্রভাব আমরা মিশরে, গ্রীসে, রোমে এবং ইয়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের সমাজ এবং ধর্ম্মের উপর দেখিতে পাই। তাহার আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

'যদি এই মালাখানি পরাতেগলে'

শ্রীহাসিরাশি দেবী

তিন জন অর্থাৎ প্রভাতের মাষ্টার অসীম, প্রভাত ও তাহার তিন বৎসরের বড় দিদিটি লহরীতে যখন বিজয়ার দিন সিঁড়ির মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া গেল, তখন দিদিটি লজ্জার লাল হইয়া গিয়া ভাবিল,—'প্রভাতটার কি আর আমায় বল্‌বারও অবসর হয়নি', এবং মাষ্টার মুখ নত করিয়া ভাবিল,—'ভাল আপোদ যা হোক',—এবং শ্রীমান প্রভাত চন্দ্র উভয়ের নত মুখ দেখিয়া ভাবিল "বেশ মজা।" সুতরাং সে উভয় হস্ত একত্রিত করিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ! বাঃ!"

লহরী একবার ক্রূর কটাক্ষে এই কম আক্কেল ভ্রাতাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল এবং তরুণ মাষ্টারটি চকিতে মুখ তুলিয়া একবার সেই গমনরতা তরুণী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, চকিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছাত্রটির প্রতি চাহিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল—

'দেখ, প্রভাত, যা ব'লবে বা করবে তা একটু ভেবে করো।' প্রভাত মাষ্টারের তিরস্কারে এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল,—"কেন মাষ্টার মশাই, দেখুন ব'লেছিলাম যে আমার দিদি খুব সুন্দর দেখ্‌তে; বলুন তো, সত্যই খুব সুন্দর দেখ্‌তে না; হ্যাঁ মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মশাই কি বলিয়া যে এই অবুঝ ছাত্রটিকে বুঝাইবে ভাবিয়া পাইল না। সুতরাং সে নীরবে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মশাইয়ের তরফ হইতে আর কোনও জবাব আসিল না দেখিয়া ছাত্রটি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অসীমের হাত ধরিয়া নীরবে উপরে উঠিতে লাগিল।

জননীর দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রভাত ডাকিল "মা, মাষ্টার মশাই তোমার বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন বাইরে এস।"

জননী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"রাজ্যেশ্বর হ'য়ে সুখে বেঁচে থাক বাবা!" বারান্দায় এক খানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন—'বস বাবা।' অসীম বসিল। জননী কক্ষ মধ্যস্থ কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"জল খাবারের থালাটা আর এক গ্লাশ জল নিয়ে এস তো, লহরী! কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া জল খাবার আনিতে বলা হইল সে আসিল না, উচ্চৈঃস্বরে বলিল—'আমার পায়ের আঙ্গুলটা কাঁচে লেগে কেটে গেছে মা, উঠতে পাচ্ছিনা বড় রক্ত পড়ছে। তুমি নিয়ে যাও।"

"ভালো বিপদ, কোথায় কেটে এলি বাছা" বলিতে বলিতে জননী উঠিয়া গেলেন এবং একটু পরেই এক হস্তে খাবার ভরা রেকাবী ও অপর হস্তে জলের গ্লাশ লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া, অসীমের সম্মুখে রাখিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন,—"আজ বছরের ভাল দিন বাবা, মায়ের কাছে এসেছো তোমার আমি শুধু মুখে তো যেতে দেব না, বাবা।

অসীম কথা কহিতে পারিত না। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির সে ছিল। তাহার হইয়া প্রভাত বলিল, "মাষ্টার মশায় তো বেশী খেতে পারেন না মা।"

মাতা বলিলেন, "যা পারো, তাই খাও বাবা। জবরদস্তি ক'রে খেলে আবার পেটে হজম তো না হ'তেও পারে।' কক্ষ মধ্য হইতে চাপা হাসির একটা অস্ফুট শব্দ ভাসিয়া আসিয়া অসীমের সুগৌর মুখে মুহূর্ত্তের জন্য আবীরের ছাপ মারিয়া দিল।

ইহার পরে জননীর আদেশে অসীমকে জোর অনুরোধ করিয়া প্রভাত প্রায়ই উপরে লইয়া আসিত এবং প্রভাতের জননীর, এবং আর কাহারও হাতের তৈয়ারী খাবারের রেকাবী ও কয়েকটা সাজা পান আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং তাহাকে

তাহা বিনা আপত্তিতে উদরসাৎ করিতেও হইত। ইদানীং আর লজ্জা করিত না। সেদিন প্রভাতের জননী প্রভাত ও তাহার দিদিকে রাখিয়া লালবাজারে বোনের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মাষ্টার এখবর জানিত না

অন্য দিনের মত সেই দিনও প্রভাত অসীমকে টানিতে টানিতে উপরে উঠাইতে ছিল। বারান্দায় বসাইয়া রাখিয়া প্রভাত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "ও দিদি খাবার দাও, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এসেছি।" কিছুক্ষণ পরে সে একহাতে জলের গ্লাশ ও অন্য হাতে পানের ডিবা এবং তাহারই পশ্চাতে লহরী একখানা রেকাবী ভরিয়া খাবার আনিয়া অসীমের সম্মুখে রাখিল।

মৃদু স্বরে অসীম বলিল, "আমি তো এত খেতে পারবনা, লহর!"

"লহরী" এই নাম অসীমের মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া লহরী একবার চোখ তুলিয়া অসীমের মুখের প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল, বলিল, "যা পারেন তাই খান। বেশী খেতেতো আপনাকে অনুরোধ ক'রছিনা।"

অসীম আর কোনও কথা বলিল না, আহারে বসিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে তাহার পাত্রে যাহা অবশিষ্ট র'হল তাহারই একটু মুখে ফেলিয়া দিয়া লহরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

যেদিন কথা উঠিল অসীম নাকি সাগর পারে বিদ্যার্জ্জন করিতে যাইবে সেই দিন যেমন আশ্চর্য্য হইলেন প্রভাতের জননী তাহার চেয়েও আর একজন আশ্চর্য্য হইয়া, জানালার ফাঁক দিয়া অসীমের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

প্রভাতের জননী বলিলেন –'তবে সত্যিই আমাদের ছেড়ে চল্লে বাবা।"

অসীম হাসিয়া বলিল—"আপনাদের ছেড়ে ওই কথাটা ব'লবেন না মা! সত্যিই আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যেমন ভাবে মিশেচি এমন ভাবে আমি বোধ হয় আর কোথাও মিশ্‌তে পারিনি।

জননী বলিলেন –"আশীর্ব্বাদ করি বাবা, সুস্থ শরীরে কাজ শিখে পড়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে এস।" অসীম প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উপর হইতে নামিবার সময় সে যেন কাহাকে দেখিবার আশায় একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু যাহাকে দেখিবার আশা সে করিয়াছিল তাহার দেখা মিলিল না।

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে অসীম দেশে ফিরিল। অনেক খোঁজের পরে প্রভাতের দেখা পাওয়া গেল। সে জানাইল তাহার মাতা তিন বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন আর দিদি লহরীর সহিত একটি সিভিলিয়ানের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অসীমের চতুর্দ্দিক যেন একবার কম্পিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"আমায় একবার লহরী কে দেখাতে পার ভাই?" তাহার কণ্ঠস্বরে যেন দুর্নিবার রিক্ততা বাজিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া প্রভাত বলিল "আজ সন্ধ্যার সময় আমি আস্‌ব আপনাকে নিয়ে যেতে, ঠিক থাকবেন।

অসীম বলিল—"আচ্ছা।"

একটি কক্ষে অসীমকে বসাইয়া রাখিয়া প্রভাত আসিয়া ডাকিল—"দিদি, ও ঘরে যাও তো একবার টেবিলের পরে আমার ইয়ে খানা ভুলে রেখে এসেচি নিয়ে এস।

লহরী চলিয়া গেল। দ্বারের পর্দ্দা সরাইবার শব্দে অসীম চমকিয়া মুখ তুলিল। তাহার উভয় চক্ষে রক্তবর্ণ ও কপালের শিরা গুলি সব ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

সম্মুখে কাল সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে লহরীও সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিল। ডাকিল "মাষ্টার মশাই!"

শুষ্ক স্বরে অসীম উত্তর দিল,—"কেন লহরী?—"

—"আমার সুখের সংসার দেখ্‌তে এসেছেন?—"

—"হাঁ।—"

লহরী আর কিছু বলিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই চেতনা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল, আর চেয়ারের উপরে স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল অসীম। বাহিরে তখন কে গাহিতেছিল,—

সে দিনও তো মধু নিশি,
প্রাণে গিয়েছিল মিশি
মুকুলিত দশ দিশি
কুসুম দলে,—
দু'টি সোহাগের বাণী
হ'ত যদি কাণাকাণি,
যদি ওই মালাখানি
পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তারে—
কিসের ছলে।



পৃথিবীর নানাদেশে কত ব্যভিচার চলিতেছে, কত প্রকার অনীতি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু মেয়ো বিবির চক্ষে ঠেকিল অভাগী ভারত। নিজের দেশের কথাটা তিনি ভাবিয়া দেখেন না, নিজের ঘরের দোষটা দূর করিবার চেষ্টা নাই, চালুনি হইয়া সুঁচের দোষটাই কেবল দেখেন। তাঁহার নিজের দেশে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি ১৭টা বিবাহে একটা করিয়া বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদের মামলা হইত। এখন তাহা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিয়া প্রতি ৭টায় একটা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে ঐ দেশে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৯টা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা হইয়াছে। আমেরিকায় যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিবার আদালত আছে, উহাদের বিচারকগণ বিচার শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দোষ কি? সভ্য দেশ ত! দেবতার বেলা লীলাখেলা!

নারায়ণগঞ্জবাসীর গানের একটা বাতিক আছে। বৎসরের এ সময় এখানে যেন যাত্রা গানের একটা epidemic লাগে। চারিদিকে হৈ চৈ, যুবকগণের তরল হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব আমোদের উত্তেজনা। দুঃখের বিষয় অভিবাবকগণও এ বিষয়ে উদাসীন। অবশ্য গান মাত্রই অগ্রাহ্য নয় তবে স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষে উহার ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। ছেলেদের অশ্লীল ব্যবহার, সিগারেটের ধুঁয়ায় আসর গরম করিবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক বীভৎস চীৎকার এবং কখন কখন সামান্য বিষয় নিয়া মারামারি প্রভৃতি নিশ্চয়ই সভ্যতা ও শিষ্টাচারের পরিচায়ক নহে। গানের উদ্যোক্তাগণও এবিষয়ে একটু বিবেচনা করিলে দেশের বহুঅর্থ অনাবশ্যক ব্যয় হইতে বাঁচিয়া যায়, অথচ দেশের মেরুদণ্ড এবং ভবিষ্যতের প্রাণস্বরূপ বালকগণের মাথা খাওয়া হয় না। আমাদের মতে আমোদ যদি করাই অভিমত হয় তবে তাহা অন্য শ্লীলতর ও ভদ্রতর উপায়েও করা যাইতে পারে। আমরা দেশের জন্য কাঁদি, কিন্তু কাজের বেলায় 'ঢুঁঢুবা'; কেবল হৈ চৈ করিলেই দেশের কাজ হয় না, তজ্জন্য কার্য্যকারণে সকলের সতর্ক দৃষ্টি চাই। রামায়ণ অমৃতের খনি, উহাতে শিক্ষার যথেষ্ট আছে। সেকালের সেই অমৃতময় রামায়ণ গাথা কই? দাশরথির পাঁচালী আর এখন আমাদের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করে না। অভিমন্যুর শৌর্য্যবীর্য্যের অভিনয়ে যুবকের হৃদয়ে বীরত্বের উত্তেজনা জাগে না, কিন্তু উত্তরার প্রেমের কাহিনী তাহার মর্ম্মে অলক্ষিতে একটা স্থায়ী উন্মাদনার সৃষ্টি করে। লোক শিক্ষা এখন কল্পনার রাজ্যে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখসোয়াস্তিও নির্ব্বাসিত। ছেলেরা অভিবাবকের আর আজ্ঞাধীন নহে, তাহারা স্বেচ্ছায় দিগ্‌ভ্রমণ করিয়া কুৎসিৎ অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করিয়া থাকে। কোন সৎকার্য্যে আহ্বান করিলে অতি অল্প যুবকই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, অথচ কুৎসিৎ আমোদে বা ক্ষণস্থায়ী সুখপ্রদ যাত্রাগানাদিতে আমন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করে না। দেশবাসী এখনও সাবধান না হইলে উচ্ছৃঙ্খল সমাজের নিত্য তাড়নায় তিষ্ঠান ভার হইবে। ছেলের শিক্ষার ভার অভিবাবকের নিজ হাতে না লইলে আর উপায় নাই, পাঁজি পুথি কিনিয়া দিয়া ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই সে মানুষ হইবে না। মানুষ সজীব পদার্থ, ইহা পুতুল নহে যে কলে ফেলিয়া দিলে আপনাআপনি গড়িয়া উঠিবে। জীবনের অধিকাংশ কাল যাহাতে তাহার বৃথা ক্ষেপণ না করে এবং অসৎ নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত না হয় তদ্বিষয়ে অভিবাবকগণ সতত সতর্ক থাকিবেন। নিজের ছেলে পরের তত্ত্বাবধানে নষ্ট হইলে সে দোষ অন্যের নয়, নিজের। নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞতাই সর্ব্বনাশের কারণ। অপরের স্কন্ধে দোষ আরোপণ করিয়া সকল সময় নিজকে বাঁচান যায় না।

ঢাকা, নবাবপুর—নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত—১৩৩৪।



ঘাটের পথে

শিল্পী—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার



তৃতীয় বর্ষ]　　　　চৈত্র—১৩৩৪।　　　　[সপ্তম সংখ্যা

রক্ত ফাগুয়া

শ্রীহেম সেন।

দখিণ হাওয়া বইত যবে প্রাণে,
অযুত হাতে বেজে উঠ্‌ত বীণ,
আনন তাদের রেগে উঠ্‌ত রাগে,
মুক্তি খেলার গরম রক্ত ফাগে,
আঁখি তাদের জ্বল্‌ত রাত্রি দিন।

বদ্ধ অসি দুল্‌ত কটি তটে
প্রতিহিংসার দারুণ পিপাসায়।
উঠ্‌ত সেথা মুক্তি সেনার গান
গগনভেদী উঠ্‌ত জয়নিশান,
মুক্তি কামী জুট্‌ত সে খেলায়॥

বাজ্‌ত ভেরী গভীর গুরুনাদে
ডাক্‌ত সবে—এস ত্বরা করি,
আজকে হোরী খেল্‌বো শেষের দিনে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সবাই যাবে চিনে,
মুক্তি খেলায় শক্ত আর্য্যনারী।



নিশীথের আলো।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১২)

উপযুক্ত চিকিৎসায় সেবা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। শরৎ এই কয়দিনেই সেবার সহিত পরিচিত হইয়া গেলেন। বুদ্ধিমতী সেবা বুঝিল শরৎ যথার্থই বড় সরল, যথার্থ হৃদয়বান্। অসঙ্কোচে শরৎ বউদি কথা ছাড়িয়া দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেবা তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পরস্পরের দূরত্ব ঘুচিয়া গেল।

যাত্রার আয়োজন করিতে করিতে শরৎ বলিলেন—"কাল আমরা এতক্ষণে বাংলা দেশে, না দিদি?"

সেবা একটু হাসিয়া বলিল—"তা বটে। অনেকদিন বাংলা দেশ ছেড়ে এসেছি, বাংলার কথা প্রায় ভুলে গেছিলুম। এখন আবার নূতন করে বাংলার কথা মনে পড়ছে।"

শরৎ বলিলেন—"ভুলে গেছলে বাংলার কথা?"

সেবা বলিল "তাই কি হয় দাদা? জন্মভূমির কথা কি কেউ ভুলতে পারে? তবে যে বল্‌ছি ভুলে গেছলুম সেটা হচ্ছে—"

সে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

শরৎ বলিলেন—"সেটা যা তুমি বল্‌ছো স্বাভাবিক, হবারই কথা। দেশে আপনার কেউ না থাক্‌লে সে রকম আন্তরিক টান কিছুতেই হতে পারে না। তোমার আপনার লোক কেই বা দেশে আছে? সংসার যা, তা তোমার এখানে, কাজেই তোমায় এইখান নিয়েই ভুলে থাকতে হয়; সে সময়টায় যে তার ছবি মনে জাগে, সে কেবল অতীতকাল মনে করে না কি?

সেবা বলিল—"হাঁ। মনে পড়ে ছোট বেলাটা বাংলা দেশেই আমার কেটে গ্যাছে। সহরের বুকে জন্মাইনি, সহরের বুকে ছোট বেলায় মানুষ হইনি; জন্মিয়েছি, মানুষ হয়েছি একটা পাড়াগাঁয়ে। সেখানকার কথা যখন আমার মনে পড়ে দাদা, আমার বাহ্যজ্ঞান তখন হারিয়ে ফেলি। এই যে বুকে দিনরাত রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে, সে কথা মনে করলে এই রাবণের চিতাও যেন নিভে যায়। মনে পড়ে—ছোট বেলার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা, পুকুরের কালো জলে সাঁতার দেওয়া, সমস্ত দিন ছোটাছুটী করে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে ক্লান্ত মনে বাড়ী ফিরে গিয়ে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়া। সকাল হতে না হতে এই ভাদ্রআশ্বিন মাসে সিউলি ফুল কুড়ানোর কি আমোদ! সেই স্মৃতিটী আজও মনের মধ্যে স্পষ্ট গাঁথা রয়েছে দাদা! আমার বড় বেদনায় শান্তি দেয় সেই ছোটবেলার স্মৃতি। আঃ! মর্‌লে যদি জ্ঞানে আবার সে দিনটী ফিরে পাই!

গভীর বেদনার সুর তাহার কণ্ঠে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ছোটবেলাকার সেই চিন্তাশূন্য দিনগুলোর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

শরৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"আমার ওখানে সবই পাবে, দিদিমণি। কাঁচের মত স্বচ্ছ জলপূর্ণ পুকুর পাবে, শিউলি তলা পাবে, অনেক সঙ্গিনীও পাবে—"

বিষাদে সেবা হাসিল—"পাগল দাদা তুমি—সবই তো পলুম, কিন্তু সে দিনটী কি আর পাব ?"

শরৎ বলিলেন—"তা পাবে না বটে, কিন্তু আনন্দকে ইচ্ছা করলেই তো ফিরে পেতে পার দিদি ?

সেবা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তা পাবার পথ যে বন্ধ হয়ে গ্যাছে দাদা, আর আনন্দ জীবনেও পাব না। আনন্দ জন্মের মতই আমায় ছেড়ে চলে গ্যাছে : মানুষের ছোটবেলায় যে আনন্দ উৎসাহ থাকে, বড় হয়েও যদি তা থাকত, তবে সকলকেই ছোটবেলার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হোত না।

এই যথার্থ সত্যের বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলা চলে না। এমন কেহ নাই যে অতীতের পানে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে, যে না বলে আহা ! যদি সে দিন ফিরিয়া পাইতাম! মানুষের সুখের সময় পূর্ব্বস্মৃতি প্রায়ই মনে পড়ে না, দুঃখের আঘাত পাইলে সেই দিনের কথাই মনে হয়। প্রাণের মাঝে যে ব্যথার সুর বাজিয়া উঠে, তাহার মধ্য হইতে ঝরিয়া পড়ে সেই পুরাতন কথাগুলি। আজ তাই সেবার বুকে বাজিতেছিল।

কবে সে এসেছিল, কবে যে চলে গেল
জানিতে পারি নাই গো জানিতে পারি নাই,
সে দিন না আসিবে, আর না দেখা দিবে,
কাঁদি যে ভাবি তাই গো, কাঁদি যে ভাবি তাই।

বৈকালের দিকে সব গুছানো শেষ হইয়া গেল। শরৎ সেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ গাঙ্গুলী কি এখানে আছেন, - সে সন্ধান জানো দিদি ?"

"মিস গাঙ্গুলী" ! মুহূর্ত্তে সেবার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, পুরাতন কথা মনে পড়িল ; বিবর্ণ মুখেই সে বলিল, "কেন, তাকে কি দরকার ?"

শরৎ বলিলেন, "তাঁকে আমার একবার দেখা দরকার। আমার মনে হচ্ছে দশ বার বৎসর আগে ইনি আমার পরিচিতা ছিলেন।"

নত মুখে সেবা বলিল, "তা হতে পারে। তিনি এখন কোথায় আছেন তা আমি ঠিক বলতে পারি নে, তাঁর খবর আমি ইচ্ছা করেই রাখি নি। তুমি একবার খোঁজ করলে জান্‌তে পার্‌বে

শরৎ ষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলেন। এই নারীর গোপন কথাটী তাঁহার নিকট গোপন রহিল না। মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করিলে হয় তো প্রতুলের আরও অনেক নিন্দাকর কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেই ভয়েই সেবার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মিস্ গাঙ্গুলীর বাংলো সহরের প্রান্ত সীমায় ইংরাজ পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। একটী বড় পুষ্করিণী এই বাংলোর তিনদিক ঘেরিয়া আছে, সম্মুখদিকে একটী সুন্দর ছোট ফুলবাগান, সাময়িক নানা ফুলে প্রায় বার মাসই রমণীয় থাকে। পুষ্করিণীর একপার্শ্বে একটী বাঁধানো ঘাট, তাহার দুইদিকে বকুল গাছের শ্রেণী বাংলোটী দেখিতে বড় সুন্দর, ঠিক একখানি ছবির মত।

শরৎ গেটের বাহিরে থাকিয়া ভিতরে নিজের নামের কার্ডখানা পাঠাইয়া দিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদখানা খানিকদূর উঠিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার রজতশুভ্র আলো স্ফুটভাবে পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানে নানাজাতি ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সদ্যপ্রস্ফুটিত শেফালীর কোমল মিষ্টগন্ধ ও হেনার উগ্রগন্ধ এক হইয়া মিশিয়া গিয়া এক অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়া বাতাসে ছুটাছুটি করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছ পুষ্করিণীর বক্ষে বায়ুতাড়িত বীচিমালার উপর শুভ্র চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে।

বহুদূরে কোথায় কোন দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল তাহার কাঁসের ঘণ্টা শঙ্খনিনাদ শব্দ কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল। ভাদ্রের মাঝামাঝি, বর্ষাগতে এই অসময়েও একটা পাপিয়া এই চাঁদের আলো, ফুলের মিষ্ট গন্ধের মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই, বকুলগাছের অন্ধকারময় ঝোপ মধ্য হইতে সে তাহার চিরপ্রথামত চীৎকার করিতেছিল, 'চোখ গেল চোখ গেল—'।

বাংলোর মধ্যে পিয়ানো বাজিতেছিল। সম্ভবতঃ লেসের আস্তরণ যে জানালায় দেওয়াছিল, শুভ্র আলোর দীপ্তি যাহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া শুভ্র চাঁদের আলোর সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, সেই

কক্ষটীর মধ্যে পিয়ানো বাজিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে একটী অতিমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও পিয়ানোর সুরের সহিত মিলিয়া গেল।

গায়িকা যে গানটী গাহিতেছিল সেটী শরতের চির পরিচিত। এই গানটী শুনিতে শুনিতে একদিন তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন।

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর--"

এই একটী লাইন কাণে আসার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

কোন বিরহিনী এই সুন্দর সন্ধ্যায় এ গান গাহিতেছে, তাহার মন্দিরের দেবতা আজ কোথায়? এই ভরা ভাদ্রের পূর্ণতা তাহার মধ্যেও পূর্ণতা আনিয়া ফেলিতে চায়, কিন্তু হায়, মন্দির যে শূন্য, কিছুই যে নাই। দেবতা, ওগো কোথায় তুমি? পূজার্থিনী তোমার পূজার সাজ লইয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া ওই যে কাঁদিতেছে—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর,

"বাবু, মেমসাব বহুৎ সেলাম দিয়া আপকো।" আত্মভোলা শরৎ চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে মেমসাহেবের ভৃত্য।

পিয়ানো কখন থামিয়া গিয়াছিল, তথাপি শরতের কাণে পিয়ানোর মিষ্ট সুরের সহিত ততোধিক একটী মিষ্ট সুর বাজিতেছিল, তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তখন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

দরজার লেসের স্ক্রীণ সরাইয়া ভৃত্য বলিল. "ই কামরা মে মেমসাব হ্যায়।"

দরজার স্ক্রীণ সরাইতেই চেয়ারে উপবিষ্টা নারী মুখ ফিরাইল। বৈদ্যুতিক আলোক দীপ্তভাবে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির উপর গিয়া পড়িল, সেই মুখের পানে তাকাইয়া শরৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত নারীও স্তম্ভিতভাবে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল, তখনই সে নিজকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; শুষ্ক মলিন মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল "আসুন।"

বেয়ারার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সে একখানা চেয়ার সরাইয়া দিল।

এই সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই; এই সেই সুন্দর ললাট, এখনও একটী চিন্তার রেখা তাহাতে পড়িতে সমর্থ হয় নাই, সুদীর্ঘ দশ বার বৎসরে তাহার সৌন্দর্য্য হ্রাস হয় নাই—বরং বাড়িয়াছে।

"ইভা!"

দাঁড়াইতে অসমর্থ শরৎ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মলিন হাসির রেখা ইভার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল, সে পার্শ্বের চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল,—"হ্যাঁ আমিই বটে। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেননি অপরিচিতা মিস গাঙ্গুলী আপনার চিরপরিচিতা ইভারূপে ফুটে উঠ্‌তে পারে।"

শরৎ বলিলেন, "একটু যেন বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, তবু মনে সন্দেহ যে ছিল না একথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে।"

ইভা একটা লঘুনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আপনার কার্ড পেয়ে আমরাও ঠিক এই সন্দেহ জেগে উঠেছিল। সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি যে আপনি এই দূরদেশে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্য আমি জানতুম প্রতুলবাবু আপনার বন্ধু,—কিন্তু এমন বন্ধু অনেকেরই থাকে,-কেউ বন্ধুর বিপদে বড় একটা সাহায্য করতে যায় না, আপনি যে প্রতুলবাবুর যথার্থ বন্ধু, তা এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারলুম।"

শরৎ ক্লিষ্টমনে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি প্রতুলের এ বিপদ্ উপস্থিত হল কেন, কার জন্যে সে নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট কর্‌লে?"

ইভার আয়ত চক্ষু দুইটী দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "যদি মনে করে থাকেন আমার জন্যে, সে ধারণা আপনার ভুল। মনে করুন, একটী আলো জ্বলছে, কত পতঙ্গ উড়ে আস্‌ছে, সেই অলোতে পুড়ে মরছে, আলো তার কি খবর রাখে? মূর্খ লোকগুলো যদি আমার চারিদিকে ঘুরে মরে শেষে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, সে কি আমার দোষ, শরৎবাবু?

অকস্মাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া শরৎ বলিলেন "তোমার দোষ নয় তবে কার দোষ? হ্যাঁ, দোষ তোমারই, কেননা তুমি তোমার ওইরূপের আগুন জেলে মূর্খ পতঙ্গদের

আকর্ষণ করেছ। সে তো শুধু আজ নয় ইভা ! মনে আছে কি বার বছর আগের কথা ? তোমার কাছে সে এক যুগ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে সে যে সে দিনের কথা ইভা, এই বুকের নীচে সে ক্ষত আমার এখনও তেমনি রয়েছে, অনেক সান্ত্বনার প্রলেপ তাতে দিতে গেছি, সব ভেসে গেছে। আমি জানি হ্যাঁ, আমি জানি, ইভা তুমি যেমন করে আকর্ষণ কর, তারপর কেমন করে নিজেকে মুক্ত করে তফাতে সরে যাও।”

ইভা একবার, চোখ দুইটী শরতের মুখের পানে তুলিয়া ধরিয়া তখনই নামাইয়া লইল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, “বার বছর, হ্যাঁ তাই বোধ হয়—”

তেমনই উত্তেজিত কণ্ঠে শরৎ বলিলেন, “যত বছরই হোক ইভা, মনে করে দেখ, সে দিনে তোমার আমি ধর্ম্মসঙ্গতভাবে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, আমায় জীবনের সুখদুঃখের সমান ভাগ দিতে চেয়েছিলুম, বড় ভালবেসেছিলুম ইভা, তোমার জন্যে সব ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছিলুম। কোনদিকে চাই নি, কিছু ভাবি নি, একমাত্র তোমাকেই ভেবেছিলুম, কিন্তু কি পেলুম ইভা,—অত ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমার কাছ হতে কি পেলুম ? পেলুম নিদারুণ অবহেলা—ঘৃণা, যাতে আমার ভবিষ্যৎ আমার সাম্‌নে কালো হয়ে গেল, আমি সেই যে পড়ে গেলুম আর উঠতে পারলুম না। নিষ্ঠুরা নারী, তুমি তো একবার চেয়েও দেখ্‌লে না, এই বুকখানা দলে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলে। আমি অধঃপাতে গিয়েছি ইভা,—আজ আমি মাতাল, কেউ আমায় বিশ্বাস করে না, তবু বলতে পারি আমি চরিত্রহীন নই, জগতে একজনকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারি নি। কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় নেমে এসেছ ইভা, একবার তোমায় তাই দেখ্‌তে বলি। তোমায় কোথায় বসাতে চেয়েছিলুম, সে অর্ঘ্য পদাঘাতে ফেলে নেমে এলে কোথায় ?”

ইভা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

শরৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আমি স্বপ্নেও আশা করি নি, মিস গাঙ্গুলীরূপে এখানে ইভাকে দেখ্‌তে পাব। আমি জানতুম, ইভা ব্যারিষ্টার অতুল মিত্রের স্ত্রীরূপে সুদূর বম্বেতে বাস করছে। স্বপ্নেও ভাবি নি ইভা মিস গাঙ্গুলীরূপে এখানে থেকে আমারই বন্ধুর সর্ব্বনাশ করেছে।”

ইভা দুই হাত কচলাইতে লাগিল, কি বলিতে যাইতেছিল, শরৎ বাধা দিলেন, “আজ, আমি ও সব কথা শুনতে চাইনে ইভা ! যে যা করেছে বা করছে, তা যদি মন্দও হয় তার জন্যে কৈফিয়ত দেওয়ার কোন দরকার দেখিনে। আজ এই মুহূর্ত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমায় যে আমি স্ত্রীরূপে পাইনি সে আমারই সৌভাগ্য। এই জ্বলন্তপাবকরূপিণী নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে আমি সুখী হতে পারতুম না, চিরজীবন আমায় জ্বলে মরতে হতো ! কিন্তু তবু বলছি এ রকমে স্বেচ্ছাচারের মধ্য দিয়ে না চলে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে কেন বিয়ে করলে না, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাত্রের জগতে কি অভাব ছিল ইভা ? স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তুমিই যে সকলের কাছে ঘৃণ্য হয়ে পড়েছ, কাউকে জয় করেছ ভেবে যদি গর্ব্বান্বিতা হয়ে থাকো, সে তোমার ভুল ধারণা, আমি দেখ্‌ছি, স্বেচ্ছায় তুমিই পরাজিতা হয়েছ। তোমার শিক্ষা তোমায় উন্নত করতে পারে নি, তোমায় অধঃপাতে এনে দিয়েছে ; সেটুকু কি বুঝতে পার্‌ছো ইভা ?”

ইভা মুখ ফিরাইল, তাহার অনিন্দ্য ও সুন্দর মুখখানা শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কৃষ্ণ তার বড় বড় দুইটী চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল ; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “কিন্তু আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন শরৎ বাবু, আমায় ঠিক চিন্‌তে পারেন নি। আমার অপরাধ—আমি সুন্দরী, কিন্তু সে কি আমার দোষ ? এ জন্যে যদি দোষ দিতে হয় তবে ভগবানকে দেওয়া উচিত, কেন না প্রাণীদের সুশ্রী অথবা কুৎসিত করে তিনিই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে বাস করে আমার পৃথিবীর পরে ঘৃণা জন্মে গেছে, শুধু লুব্ধ পুরুষগুলোর জ্বালায়। এদের স্তব আমার কাণ বধির করে দিয়েছে, এরা সব রকমে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এদের ছাড়াতে চাই, এরা ছাড়্‌তে চায় না, আমায় পদে পদে এরাই বাধা দেয়।”

শরৎ তাহার মুখের পানে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে প্রতুল—"

ইভা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মুগ্ধ অন্ধ যদি তার যথাসর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় আমার পায়ের কাছে জড় করে, সে দোষ তার,—আমার নয়, এটা বোধ হয় বুঝ্‌বেন।"

শরৎ যদিও তাহার সুন্দর মুখখানার পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া ছিলেন তথাপি তাঁহার অন্তরে যে সত্য জাগিতেছিল সে গর্জ্জন করিয়া বলিতেছিল,—মিথ্যা কথা। সেবার মুখে যে পবিত্রতা জাগিয়া, ইহার মুখে তাহা কই? প্রণতির চোখে যে সরলতা, তাহাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠা হইলেও ইভার চোখে তাহা নাই। ইহার মধ্যে পবিত্রতা নাই, সরলতা নাই, বিশ্বাস নাই। ইভা সব করিতে পারে, প্রকৃত ভালবাসার জ্ঞান তাহার নাই, ধর্ম্মকে সে তর্কদ্বারা উড়াইয়া দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস শরতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কখন বাহির হইল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

(১৩)

কাজটা প্রণতি যত সহজ ভাবিয়াছিল বাস্তবিক পক্ষে তত সহজ ছিল না; মাণিককে লইয়া সে বেশ একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

মাণিক যেদিন আসিল, সেই রাত্রিটা সে বাপুয়ার কাছে শুইয়াছিল। প্রাতে প্রণতি ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, বাপুয়া মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বারাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"কিরে বাপুয়া! মুখখানা অমন ভারি করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সকাল বেলা তোর আজ কাজকর্ম্ম কিছু নেই বুঝি?"

প্রণতির কথার উত্তর বাপুয়া দিল না, মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল।

প্রণতি অনুভবে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়া লইল। বাপুয়া এই ভোর বেলায় স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার কাপড় উঠানে বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিয়াছে। এই ধরণের কথার আভাস সেদিন শরৎ দিয়াছিলেন, প্রণতির মনে সেই কথাটা আজ জাগিয়া উঠিল। ছেলেটা অজীর্ণতে কষ্ট পাইতেছে, যাহা খায় কিছুতেই তাহা জীর্ণ করিতে পারে না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও কাল রাত্রে তাহাকে আহার করাইতে গিয়া তাহার লোলুপতা দেখিয়া নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয়াই খানিকটা দুধ আনিয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই ফল চিন্তা করিয়া অনুতপ্তা প্রণতি ঠিক রহিল, আজ হইতে ছেলেটার আহার সম্বন্ধে রীতিমত সাবধান হইতে হইবে, নহিলে ইহার আরোগ্যের আশা করাই বৃথা।

বাপুয়ার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া প্রণতির বড় হাসি পাইতেছিল, কোন মতে সে হাসি চাপিয়া রাখিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত ভোরেই চান করে ফেলেছিস্ বাপুয়া, এখনই কি রান্নার যোগাড় করে দিবি না কি রে? মাণিক কোথায় গেল, এখনও ঘুম হতে উঠে নি বুঝি?"

বাপুয়া বিরাট মুখভঙ্গী করিল, তাহার পর হঠাৎ জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, "ওকে আমি কিন্তু কক্ষণ এখানে রাখ্‌তে দেব না, এখনি ওকে দূর করে দিন।"

প্রণতি গম্ভীর মুখে বলিল, "কেন রে, কি হয়েছে?"

বাপুয়া তেমনি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "কি হয়েছে? ঘর বিছানা সব নোংরা করে ফেলেছে; আমার কাপড়ে গায়ে—"

প্রণতি আর কোন মতে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উদ্ভাসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া বাপুয়ার মুখখানা, আরও অন্ধকার হইয়া গেল, সে দারুণ বিরাগে মুখ ফিরাইল।

হাসিটা যে একান্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিয়া প্রণতি হাসি সামলাইল, অতিকষ্টে মুখখানা গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "না না, তুই কিছু মনে করিস নে বাপুয়া, তারপর কি হল তুই বল।"

কিন্তু বাপুয়া রাগ করিয়াছিল, একটা কথাও বলিল না।

প্রণতি হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তারপর সে আছে না গেছে, ঘুমাচ্ছে না জেগে আছে সেইটাই না হয় বল; তার অবস্থাটা দেখে তাকে দূর করবার পথ দেখি।"

বাপুয়া বিরাগভরে বলিল, "ওই দরজার পাশে বসে

আছে চুপটি করে, দেখুন। গিয়ে আজই ওকে পাঠিয়ে দিন বলছি, আমি কখনো আর ওকে রাখ্‌তে পারব না।”

সে কথায় কান না দিয়া প্রণতি অগ্রসর হইয়া দেখিল ছেলেটী বাস্তবিকই উদাসগম্ভীরমুখে দরজার কাছে বসিয়া আছে। বাপুয়া তাহাকে গালাগালিই দিক আর মারুকই, আবার নিজেই তাহাকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

প্রণতি বাপুয়ার উপর ভারী খুসি হইয়া ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোর নাম কি রে?”

সে প্রশ্নটাকে উত্তরের যোগ্য বলিয়া মনে করিল না, একবার প্রণতির পানে অবহেলার দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বাপুয়া ধমক দিল,—“কথা বল না রে - চুপ করে রইলি যে বড়? কথা না বলে তোর পা ধরি—হু হু,”

সে এমন বিকৃত মুখভঙ্গী করিল যাহাতে ছেলেটি চমকাইয়া গেল, উত্তর দিল,—‘ মাণিক।”

মাণিকই বটে; প্রণতি হাসি চাপিয়া তাহার পানে চাহিল। মাথাটী মোটা, পেটটী মোটা, হাত পা সরু, পেটের উপর সবুজ রঙ্গের শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে। গলাটী লম্বা এবং সরু, বুকের পাঁজরাগুলি স্পষ্ট গণিয়া লওয়া যায়।

প্রণতি চা করিয়া ছেলেটীকে আগে একটু খাওয়াইল, বাপুয়া হালুয়া দিতে প্রবল আপত্তি তুলিল বলিয়া সামান্য একটু দিল। তাড়াতাড়ি রন্ধনান্তে তাহাকে আগে খাইতে দিল।

নিজে আহারান্তে স্কুলে যাইবার কাপড় পরিতে পরিতে মাণিককে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেমন মাণিক, পেট ভরেছে তো?”

মাণিক আনন্দে মাথা কাত করিয়া সম্মতি জানাইল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রণতি মাণিককে নূতনভাবে দেখিতে পাইল। সকালবেলার মুখচোরা সে মাণিক আর নাই বাপুয়ার সঙ্গে ইহারই মধ্যে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, বাপুয়ার ফরমাস খাটিতেছে।

প্রণতি ইহাতে খুব খুসি হইল। সে রাত্রে সে মাণিকের জন্য খুব হালকা খাবারের বন্দোবস্ত করিল, বলা বাহুল্য, প্রভাতে সেদিন মাণিকের অসম্ভব রকম উন্নতি দেখা গেল।

শরৎ বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার পারিবারিক ডাক্তার হিরণ্ময় বাবু প্রত্যহ একবার করিয়া এই ছেলেটীকে দেখিয়া যাইবেন। সেই কথা অনুসারে সে দিন বেলা আটটার সময়ে হিরণ্ময় বাবু মাণিককে দেখিতে আসিলেন।

ডাক্তারটী বয়সে তরুণ, আজ বৎসর তিনেক মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভাল চিকিৎসক বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, পসারও বেশ জমিয়া গিয়াছে।

মাণিককে পরীক্ষা করিয়া প্রণতির পানে তাকাইয়া হাসিমুখে তিনি বলিলেন, “আপনাকে কিন্তু একে নিয়ে বেশ বেগ পেতে হবে মিস বোস, এমন নোংরা জগতে বোধ হয় আর দুটি নেই। শরৎ বাবু একে নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই কোন মতে আপনার ঘাড়ে একে চাপিয়ে কিছুদিনের মত তিনি সরে পড়েছেন। শীঘ্র যে ফিরবেন সে আশা খুব কম।”

বিস্ফারিত নেত্রে হিরণ্ময় বাবুর পানে চাহিয়া প্রণতি বলিল, “না, তিনি বলে গেছেন দিন পনের কুড়ির মধ্যে ফিরে আসবেন।”

হিরণ্ময় বাবু চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, “আপনি তাঁকে চেনেন না মিস বোস, তিনি যে কি ধরণের মানুষ তা সহজে কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। ‘এই আসছি’ বলে তিনি এমন গা ঢাক দেন যে ছয়মাসের পর যদি আবার দেখা হয়। দিন পনের কুড়ি বলে গেছেন তো, দেখুন না—কতদিন বাদে ফেরেন। আমার ছোটবেলার বন্ধু তিনি,—তাঁর যত কথা আমি জানি সব কথা বল্‌তে গেলে মস্ত একখানা বই হয়ে পড়ে।”

তাঁহাকে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রণতি শরতের যে টুকু পরিচয় পাইয়াছিল তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, ইহার বেশী সে আর কিছুই জানিতে চাহে না। প্রণতি জানে—স্বচক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য, কাণে যাহা শুনা যায় তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নেহাৎ মূর্খতার কাজ।

হিরণ্ময়বাবু অনেক কথা বলিয়া গেলেন, সব কথা

প্রণতির কানে গিয়া পৌঁছায় নাই। শরতের কথা শুনিতে গিয়া সে শরতের উন্নত দেহখানা, সরল উদার মুখখানা মনে অঙ্কিত করিয়া তাহাই দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হিরণ্ময় বাবুর প্রশংসারূপে ব্যক্ত অজস্র নিন্দাবাণীর মধ্যে তাহার কাণে শরতের সেই করুণ সত্য কথাটা ভাসিতেছিল, —"আমায় জগতে স্নেহ করতে, ভালোবাসতে কেউ নেই, আমি জগতে একা, অথচ ভার বয়ে যাচ্ছি বেশ।"

অনেকক্ষণ অনর্থক বসিয়া হিরণ্ময়বাবু প্রায় দশটার সময় আসন ত্যাগ করিলেন, মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনেক কাজের ক্ষতি করে দিলুম মিস বোস, মাপ করবেন।"

প্রণতি প্রত্যুত্তরে একটু হাসিয়া বলিল, "না, ক্ষতি কিছুই হয় নি। আপনি আসার অনেক আগে আমার সব কাজ হয়ে গেছে; এইবার ওদের দিতে পারলেই হয়।

ইহার পর হিরণ্ময় বাবু বৈকালের দিকেই আসিতেন, সকালের দিকে আসিয়া প্রণতির কাজের ক্ষতি করিতেন না। সন্ধ্যার সময় তিনি চলিয়া যাইতেন, নানা দেশবিদেশের গল্প করিতেন।

প্রণতি ইহাতে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুবতী অভিভাবকহীনা, হিরণ্ময় বাবু যে এরূপভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকেন, গল্প করেন, ইহাতে তাহার চরিত্রে কেহ কলঙ্ক দিতেও তো পারে। মুখ ফুটিয়া ভদ্রতার খাতিরে সে না হয় কিছু বলিতে পারে না, হিরণ্ময়ের ইহা বিবেচনা করা তো উচিত। তাঁহার এ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে একাকিনী যুবতীর গৃহে তাঁহার ন্যায় যুবকের সন্ধ্যাবেলা গল্প করিতে যাওয়া বাস্তবিকই দোষাবহ।

মনে মনে বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া প্রণতি ভারী অস্থির হইয়া পড়িল, তথাপি সে মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

সীতা

শ্রীমতি কনকলতা ঘোষ

ধরামাঝে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনকের ঘরে
আবির্ভূতা লক্ষ্মী সীতা বিধাতার বরে।
নিঠুর নিয়তি সনে যুঝিতে জনম
লভিয়া দেখাল সীতা নারীর ধরম।
লোকে বলে সীতাদেবী জনম দুঃখিনী,
মোরা বলি ধন্যা সীতা স্বামীগরবিনী।
কি ছার সাম্রাজ্যগর্ব্ব ছার রাজ্যসুখ!
বনবাসে পতি পাশে সদা হাসিমুখ।
নিজ সহোদরসম দেবর লক্ষ্মণ
সীতারে করিতে সুখী ব্যস্ত অনুক্ষণ।
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হেথা দেখাতে সবারে
সাধ্বী সীতা পতিব্রতা রাবণের ঘরে।
সত্যব্রত রামচন্দ্র সীতার কারণে
সবংশে বধিল লঙ্কাপতি দশাননে।
অগ্নির পরীক্ষা নহে রামের আদেশ
পবিত্রা সীতার মূর্ত্তি দেখাতে দেবেশ
করাইলা অগ্নি শুদ্ধি দেখে সর্ব্বজনা
নতমুখে সতীপদে করিলা বন্দনা।
ভাগ্যবিড়ম্বনা হেতু বনেতে বসতি
পতি করে নাই ত্যজ্যা, করিল নিয়তি।
ধর্ম্মের প্রভাবে বনবাস মধুময়
বাল্মীকির তপোবন স্নেহের আশ্রয়।
লব কুশ দুই পুত্র গুণের আধার
বংশের গৌরব তারা গৌরব মাতার।

দূরে রহিলেও তবু স্বামীর অন্তরে
কি উজ্জ্বল ছিল মূর্ত্তি ! স্বর্ণ সীতা গড়ে
দেখাইলা রামচন্দ্র সবার সম্মুখে
'ভুলি নাই— ভোলা নাহি যায় রাজ্য সুখে'।
রাজ গৃহে তপোবনে দোঁহার হৃদয়ে
যে প্রেমের মন্দাকিনী ধীরে যায় বয়ে,
সে প্রেমে যে প্রাণ পূর্ণ কি দুঃখ তাহার
তার কাছে রাজ্য সুখ অতীব অসার।
রাজকন্যা রাজবধূ রাজরাণী সীতা
যুগে যুগে দেশে দেশে তুমি মা বন্দিতা॥

বন্দীর আত্মকাহিনী

শান্তি চৌধুরী

(এক)

ডাক্তারীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সবেমাত্র রাঁচী পাগলা গারদের (Lunatic Asylum) চাকুরীতে যোগ দিয়েছি। যার পরিবর্ত্তে আমি এখানে এসেছি, তিনি কয়েকদিন এখানে অপেক্ষা করে সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে তার কর্ত্তব্যস্থানে চলে গেলেন।

একদিন দুইদিন করে কিছুদিন অতিবাহিত হল। যতই আমি রোগীদের সঙ্গে মেশামেশি বেশী করতে লাগ্‌লাম, ততই আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে লাগ্‌ল। কি আশ্চর্য্য ! এক একজন এক এক ভাবের পাগল। তবে এখানে দেখ্‌বার এবং শিখ্‌বার অনেক কিছু আছে।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার এক তরুণ যুবক। বয়স ত্রিংশতি বর্ষ হতে পারে বা কিছু বেশী কম হতে পারে। অনেক রকম অনেক পাগলের মধ্যে আনাগোনা করে থাকি কিন্তু এই তরুণবয়স্ক পাগলটীর পাগলামী যে কোথায় আজ পর্য্যন্ত তার কোনো সমাধান করতে পারলাম না তাকে এক একদিন এক এক অবস্থায় দেখ্‌তাম। কখনও দেখ্‌তাম তার দৃষ্টি অতীত কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে, কখনও নিজের ভাবে তন্ময় হয়ে আছে, আর কখন কখন নিজের মনে কি বকে যেত বুঝ্‌তে পার্‌তাম না। মধ্যে মধ্যে দু-একটা কথা শুনতে পেতাম, তারমধ্যে-'অশ্রু 'নিষ্ঠুর'-এই দুটি কথাই বেশী শুনতে পেতাম। তার জন্যে সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠ্‌ল। অন্তরে তার জন্যে একটা টান্ অনুভব করলাম। আর আমার মাঝে জেগে উঠ্‌ল একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা, একটা প্রবল কৌতূহল —তার জীবনের ইতিহাসটা জান্‌বার জন্যে। যতদিন না তা জান্‌তে পার্‌ছি ততদিন আমার আর স্বস্তি নাই।

সেদিন ছিল বর্ষণক্লান্ত আষাঢ়ে সন্ধ্যা। জমাট বাধা মেঘের কোন্ ভাঙ্গা ফাক দিয়ে সূর্য্যদেব আড় চোখে ধরণীর বুকের উপর একটু খানি চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। লাল আভা চিক্‌মিকিয়ে ঝড়নোন্মুখ জবার মতন দেখাচ্ছিল। এলোমেলো লম্বা লম্বা শুভ্র কুন্তলরাজি তার মুখের এখানে সেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ঝরে পড়েছিল। মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিল।

আমি দ্বিতলের উপর থেকে জানালা দিয়ে প্রায়ই তার হাবভাব লক্ষ্য কর্‌তাম, আজও কর্‌ছিলাম। গর কোঠাটা (cell) ছিল আমার পড়ার ঘরের সাম্‌নাসাম্‌নী। আমি প্রায় সময়েই খালি খালি বসে বসে তাকে দেখ্‌তাম। এতে আমার কেমন যেন একটা আমোদ বোধ হত। আমার মনে হত তার সঙ্গে আমার যেন কি একটা সম্বন্ধ পাতা রয়েছে। যাক্ এখন তাকে আমি একটু বেশী করুণা করি অবশ্য তাকে বাধ্য করবার জন্যেই। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বল্‌ল—পাগল নিয়ে খেলা করলে অনেক আশঙ্কা আছে। আমি ওদের কথায় বর্ণপাত কর্‌তাম না। বরং তার সঙ্গে আরো বেশী অন্তরঙ্গের মতন মিশ্‌তাম। কিন্তু আমার আশ

পূরল না। যত সহজে কাজ সিদ্ধ হবে ভেবেছিলাম তা হল না। সেদিন হঠাৎ তার কি খেয়াল হল বুঝলাম না; সে মোটা মোটা লোহার সিক যা তার দরজায় ছিল, ভাঙবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। যখন কোনো রকমেই সফলকাম হতে পারল না তখন নিজের মাথা খুড়তে লাগল। আমি আর থাকতে পারলুম না। ছুটে তার কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে ফিরে এলাম। যদিও তাকে জেলের বাইরে নেওয়া আইন বিরুদ্ধ তবু তাকে নিয়ে এলাম।

তাকে দেখে, আমার মেয়ে 'মলিনা' তো কেঁদেই অস্থির। বোধ হয় তার উন্মাদের চেহারা দেখে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা আমার ভয় পেয়েছিল। 'শুভা' তো রেগেই অস্থির। কেন ওসব পাগল নিয়ে খেলা সুরু করেছি! শেষে কোন সর্বনাশ করে বসে। আমি তার কথা শুনে বিশেষ কোনো জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করলাম না কারণ, আমি জানতাম, বীরেন্দ্র অন্যান্যদের মতো নয়।

এমনি করে কিছুদিন অতিবাহিত হল। আমার এই ঐকান্তিক যত্ন, অকৃত্রিম স্নেহ যে ব্যর্থ হয় নাই, তা বেশ বুঝতে পারলাম। দেখলাম সে ধীরে ধীরে আমার বেশ অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তার আসা চাই-ই। আমাকে আর যেয়ে ডেকে আনতে হয় না। প্রহরীকে বললে সে তাকে মুক্ত করে দেয়, সে আমার এখানে চলে আসে। 'মলিনা' আর তাকে দেখে অস্থির হয়ে উঠেনা। তাকে দেখলে 'মলিনা' ছুটে গিয়ে তার কোলে ঝাপিয়ে পড়ত। 'বীরেন' মাঝে মাঝে তার মাথায় হাত রেখে বলত লক্ষীটি তুমি ফুলের মতন নির্ম্মল হও সীতা সাবিত্রীর মতন সাধ্বী, পবিত্রা হও আর ঝান্সীর রাণীর মতন কর্ত্তব্যপরায়ণা হও।' 'মলিনা' তাকে আমার নির্দ্দেশমত কাকাবাবু বলে ডাকত। যে দিন 'বীরেন' আসত না, সেদিন 'মলিনা' কেঁদে চোখ ফুলিয়ে দিত। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যেত না।

কিন্তু 'শুভার' সঙ্গে এখনও তার পরিচয় হয় নাই। 'শুভা' কিছুতেই তার কাছে আসতে চাইতো না। আজ অনেক বলে কয়ে স্থির করেছি যে, যখন 'বীরেন' আজ আসবে, তখন 'শুভা' আমাদিগকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করবে। তখন আমি তাদের পরিচয় করিয়ে দেবো।

'বীরেন' 'মলিনাকে' নিয়ে খেলা করছে এমন সময় দু-হাতে দু-থালা মিষ্টান্ন নিয়ে 'শুভা' উপস্থিত। 'বীরেন' তারে দেখে মুখখানি এমন আরক্ত ও বিকৃত করে তুলল যে সে অবর্ণনীয় ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি আজ পর্য্যন্তও আমি ভুলতে পারিনি। আলাপ করিয়ে দেওয়াতো দূরের কথা, আমিত ভয়ে এতটুকু! সে 'শুভার' দিকে পেছন দিয়ে ঘুরে বসল। আমি 'শুভাকে' চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। সে চলে গেলে আমি তাকে একখানা থালা এগিয়ে দিলাম অন্যখানা নিজে তুলে নিলাম। খেতে খেতে নানারকম আবেগপূর্ণ এবং উত্তেজক গল্প করতে লাগলাম যার একটা না একটা তার বুকে আঘাত করবেই। যার একটা না একটাতে তার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করে বেসুরা ঝঙ্কার তুলতে পারে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল না।

শাঁ করে এক ঝাক পাখী আমার জানালার পাশ দিয়ে কোথায় কোন্ দূরদেশের উদ্দেশে চলে গেলো। আকাশে একটি দুটি করে ম্লান তারা ফুটে উঠে আকাশ ভরে ফেলতে চলল। বীরেন হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেলো।

আমি তাকে বললাম—বীরেন, তোমাকে পাগল বলতে আমার যে কত কষ্ট হয়, তা' বোধ হয় আমার ব্যবহারেই স্পষ্ট বুঝতে পারছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে বোধ হয়, তুমি আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ তা খুব মানসিক উত্তেজনা থেকেই একমাত্র সম্ভব। আর মেয়েদের উপর তোমার যে অস্বাভাবিক ঘৃণা দেখছি এতে মনে হয় এর গোড়ায় কোনো রমনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। যদি তোমার বলতে কোনো আপত্তি না থাকে, বাঁধা না থাকে, তা হলে তোমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে পেলে আমি খুব সুখী হব। এই বলে আমি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

আমার কথা শুনে তার চক্ষু দুটো এখন অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বলে উঠল যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সেই চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে। নিজকে প্রকৃতিস্থ করে সে বলে উঠল, 'উঃ! সে কি নিষ্ঠুর কাহিনী!

শোন তবে ডাক্তার! আমার জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। এ বুক ফাটা ব্যথার কথা শুনে আনন্দ পাবে না, সুখ পাবে না কেবল দুঃখ, কেবল ব্যথা। সারাটা জীবন সে বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি, কাউকে এতটুকু দিয়ে হাল্কা হতে চাইনি। আজ তোমাকেও বল্‌তাম না, কিন্তু তা হলে তোমার স্নেহের অবমাননা করা হয়, তাই বল্‌ব। কিন্তু না শোনাই ছিল তোমার ভাল

সে দিন আমি এ পৃথিবীকে মনে কর্‌তাম সুখ-স্বপ্ন-রাজ্যবিশেষ। এখানে এতটুকু দুঃখ থাক্‌তে পারে, অবসাদ থাক্‌তে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু একদিন সে ভাব আমার টুটে গেলো। আমার সমস্ত স্বপনের ঘোর ভেঙ্গে গেলো। আমি দেখ্‌লাম, এ পৃথিবী শুধু হাহাকার আর ব্যর্থতায় ভরা। আমি সত্যের দ্বারে এসে দেখি, আমার সমস্ত ভুল। কল্পনায় আর বাস্তবে কত আকাশপাতাল প্রভেদ!

আমার বাড়ী 'মোহনপুর' গ্রামে। শৈশবাবস্থা থেকেই অতিরিক্ত স্নেহমমতার মাঝে বর্দ্ধিত হয়েছি। বাবার শেষ বয়সের ছেলে, তাছাড়া আমিই 'সবেধন নীলমণি।' আমরা তখন গৌহাটী থাক্‌তাম। বাবা সেখানকার একজন ব্যবহারজীবী ছিলেন। বাবার প্রথম সংসারের কোনো সন্তান না থাকায় আবার বিয়ে করেছেন এবং তাঁরই গর্ভে আমার জন্ম। বিমাতা হলে কি হয়, তাঁর কোলেই মানুষ হয়েছি। একমাত্র গর্ভে ধারণ ছাড়া আর যা কিছু সমস্তই তাঁর করতে হয়েছে। তাঁর নিজের অভাবটুকু পুরণ কর্‌তে দ্বিগুণ উৎসাহে এবং সমস্ত স্নেহ উজার করে দিয়ে আমাকে লালনপালন করেন। বাবার পসারও বেশ ছিল, কাজেই আমি যে কিরূপ আব্দার ও বিলাসিতার কোলে পরিপুষ্ট হয়েছি, তা না বল্‌লেও হয়ত বেশ বুঝ্‌তে পারছ।

আমি ক্রমে বেড়ে চল্‌লাম। ক্রমে সেখানকার পাঠ সমাপ্ত কর্‌লাম—অবশ্য ম্যাট্রিক পর্য্যন্তই। তারপর বাবার ইচ্ছানুসারে কল্‌কাতা প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হলাম। দিন কাহারো জন্যে অপেক্ষা করে না—অতি দীর্ঘ পথেরও অবসান আছে। আমি আই এ পাশ কর্‌লাম। তারপর যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখন একদিন আমার এক বন্ধুর বাড়ী তার অসুখের খবর শুনে যাই। ফির্‌বার পথে একবার ইডেন উদ্যানে গেলাম, কারণ সেদিন ভয়ানক গরম পড়েছিল। একটা ঝোঁপের কাছে বেঞ্চিতে বসেছিলাম, তারপর কখন এবং কেমন করে যে ঘুমিয়ে গেছিলাম জান্‌তেও পারিনি। যখন জাগ্‌লাম, তখন উদ্যান এক রকম শূন্য হয়ে এসেছে, কেবল এখানে সেখানে দু-চারজন এখনও বসে হাস্য কৌতুকে ব্যস্ত। আমি উঠে পড়্‌লাম। কিছুদূর এসেছি, দেখি একটা 'গোড়া' একজন বাঙ্গালী তরুণীকে লক্ষ্য করে নানারকম বিশ্রী গালাগাল কর্‌ছে। সঙ্গে যে যুবকটী ছিল, সে গোড়া দেখে ভয়ে ত্রিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি কিন্তু বেশ সওয়াল জবাব শুনিয়ে দিচ্ছিল। এবার ষ্টুপিড্‌টা মেয়েটাকে ধর্‌তে এলো। সইতে পার্‌লাম না, এক লাফে সেই রাস্‌কেলটার টুটি চেপে ধর্‌লাম। সেও যে কম জোড় রাখে তাও নয়। আমাকে বেশ দু চার ঘা ঘুসী বসিয়ে দিলো। আমিও তাকে এমন জোড়ে এক ঘুসী বসিয়ে দিলাম যে সে ছিট্‌কিয়ে ঘুরে পড়ে গেলো। আমি সেই অবসরে তাদের নিয়ে চলে এলাম। বাইরে তাদের মোটর অপেক্ষা কর্‌ছিল, সেখানে এলে আমাকে মেয়েটী বল্‌ল, আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ী আপনাকে যেতেই হবে। তা না হলে বাবা আমাকে খুব বক্‌বেন। আমি কিন্তু কিছুতেই যেতে চাইলাম না, কারণ আমার শরীর বড্ড ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। যত শীগ্‌গীর হয়, নিজের বাড়ী যেয়ে পৌঁছ্‌তে পার্‌লেই বেঁচে যাই। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়্‌ল না। আবার পেছনে চেয়ে দেখি অনেকগুলা লোক দৌড়ে আস্‌চে; আবার কি বিপদ্ না জানি উপস্থিত হয় ভেবে উঠে পড়্‌লাম। ভোঁ ভোঁ ডাক ছেড়ে মোটর ছুটল। তারপর মনে পড়ে যখন ওদের 'রিডিং রুমে' রুমে পৌঁছলাম, যেখানে তার বাবা বসেছিলেন, হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

যেদিন জ্ঞান ফিরিয়ে পেলাম, সেদিন চেয়ে দেখ্‌লাম, আমার কাছে 'অশ্রু', তার মা ও তার ছোট এক বোন্ বসে আছে। আমাকে চাইতে দেখেই তাদের মুখে একটা

আনন্দের রেখা ফুটে উঠল। 'অশ্রু' আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ল, আমার কেমন লাগ্‌ছে। কি আর বল্‌ব! আমি দেখ্‌ছিলাম, আমার কিছুই হয় নি। যা কেবল একটু দুর্ব্বলতা। আমি ধীরে ধীরে সমস্ত স্মরণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। হঠাৎ মাথাটা চিন্‌চিন্ করে উঠ্‌ল। হাত দিয়ে দেখি বেণ্ডেজ বাঁধা। 'অশ্রু' বল্‌লে,—"মাথায় আপনার গুরুতর আঘাত লেগেছে। ওটাই আপনার যত অসুখের মূল। যাক্ আপনি শীগ্‌গীরই ভালো হয়ে যাবেন।" আমি সে দিনই চলে যেতে চাইলাম, তারা কিন্তু যেতে দিলেন না। আরো দু-তিন দিন থেকে চলে এলাম।

(দুই)

এখন থেকে রোজ আমাকে না গেলেও মাঝে যেতেই হত। তারা আমাকে কত আদর যত্ন যে কর্‌ত তা বলে বুঝাতে পার্‌ব না। অশ্রুর বাবা যতীন বাবু, আমাকে যে স্নেহই না কর্‌তেন, বলে শেষ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি স্নেহের হাতে বাঁধা পড়ে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের টেবিলে বসে আছি। যতীনবাবু গল্প বল্‌ছিলেন—আমি, 'নরেশ' এবং 'অশ্রুর' ছোট বোন্ 'লীলা' শ্রোতা ছিলাম। একটু পরে অশ্রু চায়ের জল নিয়ে উপস্থিত হল এবং চা ঢেলে দিতে দিতে বল্‌ল, আমার কিন্তু নরেশবাবুর বীরত্ব দেখে হাসি পায়। ঐ দিন যদি ধীরেনবাবু এসে না পড়্‌তেন তা হলে আমাকে কি অপমানই না পেতে হত?

'নরেশের' দিকে চেয়ে দেখি, শ্বেত পাথরের মূর্ত্তির মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে। বুঝ্‌লাম অশ্রুর অপবাদ তাকে অত্যন্ত আহত করেছে এবং সে খুব লজ্জিত আছে।

আমি বল্‌লাম,—আপনি ভুল বলছেন মিস্ ঘোষ! নরেশবাবু ঠিক্ পথই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ গোঁয়ার হাতে অপমানিত হওয়ার চেয়ে নীরবে চলে যাওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। আমিও হয়ত চলে যেতাম কিন্তু তার অশ্রাব্য গালাগাল বরদাস্ত কর্‌তে না পেরেই ঝগড়া করেছি।

যতীনবাবু বলে উঠ্‌লেন -'নরেশ' যদি মানুষ হত তবে মেয়েদের শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হতে তুলে দিয়ে নিজে পেছনের দিকে সরে যেত না। এতেই বুঝা যায়, তার সম্মানবোধ খুবই কম। সত্যিইতো যদি তুমি মাঝখানে এসে না পড়্‌তে তবে 'নরেশ' 'অশ্রুকে' তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চয়ই পালাতো।

—না যতীনবাবু! মানুষ অত নীচ হতে পারে না কখ্‌খনও। নরেশবাবু তখন সমস্ত ভুলে যেতেন যদি তার এরকম ইচ্ছা থাক্‌তও যে তিনি এ সব হাঙ্গামায় মধ্যে যেতে চান্‌না তবু, যদি সে তাকে আক্রমণ কর্‌ত, তবে যা তার সাধ্য তা' তিনি কর্‌তেনই।

আমি সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বল্‌লাম,—নরেশবাবুর পরিচয় তো এখন পর্য্যন্ত জান্‌লাম না। আমার—

কথায় বাঁধা দিয়ে অশ্রু বল্‌ল—তার নাম নরেশচন্দ্র বসু, সুরেশবাবু এডিসনাল্ ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। এম এ তে ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট। শীগ্‌গীরই বিলাত যাবেন। গবর্ণমেণ্ট থেকে বৃত্তি পেয়েছেন। এখানে তার কাকার বাড়ীতে থাকেন। তিনি আলীপুর কোর্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

আমি বল্‌লাম—নরেশবাবু কি I. C. S পড়্‌তে যাচ্ছেন?

সে বাইরের দিকে চেয়েই বল্‌ল—হাঁ, তাইতো ইচ্ছা। তবে যাওয়া হবে কি না সে বিষয়ে স্থিরতা নাই।

আমি বল্‌লাম—কেন? এ সুযোগ হারাবেন না নরেশবাবু? আমি যদি এমন সুযোগ পেতাম তবে বোধ হয় হাতছাড়া কর্‌তাম না।

তিনি তারও কোনো জবাব দিলেন না—জানালা দিয়ে বাইরে কি যেন দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন।

যাক্, তার চিন্তার আর বাধা দিলাম না। আমি সন্ধ্যা হল দেখে উঠে পড়্‌লাম। নরেশবাবু বসে রইলেন।

কিছুদিন আর ওখানে যেতে পারিনি নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সে দিন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসেছি, বেহারা এসে জানাল, আমার সঙ্গে কে একজন স্ত্রীলোক দেখা কর্‌তে চান্। আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না কে এসেছে। কতকক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হল, ও তো এখনো বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছেন? লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম,—উপরে নিয়ে এস। একটু পরে 'অশ্রু' লীলার হাত ধরে এসে উপস্থিত।

আমি এ কয়দিন যাইনি বলে সে চিন্তিত হয়েছিল, না জানি আমার কোনো অসুখ করেছে, তাই সে দেখ্‌তে চলে এসেছে। আমি তো অবাক্, কারণ, তিন চারিদিনের অনুপস্থিতি অত কি চিন্তার কারণ হতে পারে! আজ হয়ত যেতামই। যাক্, তাকে প্রাতরাশ আজ এখানেই সমাপ্ত করতে হল। আমার অতিথি হয়েও সে নিজেই চা ঢেলে আমাকেও দিলো. নিজেও নিলে

শেষে আমার পড়ার ঘরে এসে আমার বিশৃঙ্খলতা দেখে বল্‌ল,—ভারি তো বিশ্রী আপনি? এসব কি সাজিয়ে রাখ্‌তে পারেন না?

—কেউ তো সাজিয়ে দেবার নেই? আমার কি সে সুযোগ বা অবসর আছে যে নিজেই সব সাজিয়ে রাখ্‌ব? আর এই সব কি আমাদের কাজ?

সে আমার কথায় কাণ দিলো কি না জানি না কিন্তু সে বইগুলো বেশ গুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো। হঠাৎ আমার 'ডায়েরীটা' সে খুলে বস্‌ল। এত বিশেষ কিছুই না থাক্‌লেও আমার অতীত জীবনের কয়েকটী স্মরণীয় ঘটনা ছিল। আমার জীবন দিয়ে যে একদিন আমি ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম, কোথায় কোন্ হত্যা করে ছিলাম, কোথায় কার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছিলাম. সে সব এতে ছিল। আমি তাকে বল্‌লাম যে এ আমার গোপনীয়। কিন্তু সে বল্‌ল,—আমার সেসব জানা খুবই দরকার যা আপনার খুব গোপনীয়:

তার কথার রহস্য ভেদ করতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। তারপর কি কাজে একটু বাইরে এলাম, এমন সময় আমার ডায়েরী অন্তর্হিত হল। সে যখন চলে যায় তখন আমার খেয়াল ছিল না, চলে গেলে আমার চমক্ ভাঙ্‌লো। এ বইটাতে যে আমার জীবনের একটা পরিবর্ত্তন নির্ভর করছে? নিজের অসাবধানতার জন্য খুব লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু তখন আর কোনো উপায়ই ছিল না।

বিকেল বেলা সে জানাল যে সে সেই বইটা নিয়ে এসেছে। আমার মত অসাবধানীর কাছে ওরকম একটা ভয়ানক জিনিষ থাকতে কখনই পারে না। আমি একথা শুনে কোমর থেকে একটা ছ-নলা রিভলবার বের করে বল্‌লাম,—এই যে আরো ভয়ঙ্কর একটা জিনিষ যা আমার অনেক কিছু সাহায্য করে। সে একটু চম্‌কে উঠে বল্‌ল—এ তোমার ভীষণ বাড়াবাড়ি। দেখি কি রকম। আমি তার হাতে দিতেই সে ছুটে চলে গেলো এবং একটু পরে শূন্য হাতে ফিরে এসে বল্‌ল,—এ অস্ত্র আর পাবে না।

আমি একদিকে যেমন স্বস্তি পেলাম এই ভেবে, যে আমি আজ মুক্তি পেয়েছি, এবার আর কোনো ভয় নেই, অন্য দিকে অবাক্ হলাম এই ভেবে যে, যার সাথে আমার পথের আলাপ ভিন্ন অন্য কোনো সম্পর্ক নেই তাকে আমি এত বিশ্বাস করি কি করে—বিশেষতঃ সে স্ত্রীলোক। আর সেই বা কি করে আমাকে এ ভাবে বাধ্য করে ফেল্‌ছে!

সেদিন ছিল রবিবার। আমি আর অশ্রু অশ্রুদের বাগানে বসে গল্প করছি, বাড়ীতে আর কেউ নেই, সব্বাই কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে, অশ্রু যায় নি—তার কি অসুখ হয়েছে।

আমার মনে হল নরেশদের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক এত দিন তো জান্‌তেও চাইনি জান্‌তেও পারিও নাই। তাই 'অশ্রুকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম।

'অশ্রু' বল্‌ল—ওদের বাড়ী বর্দ্ধমান। এখান থেকে আমরা যেদিন সিমলা যাই, সেদিন সেও আমাদের এক গাড়ীতেই ছিল। তার আমাদের সেদিন থেকে পরিচয়। তারপর আমরা এখানে চলে এলাম, বাবা তাকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, সে এসে দেখা করেছে কিন্তু তার মতলব ভারী অন্যায়। আমি তার হাবভাবে বুঝেছি সে কি আশায় আমাদের সঙ্গে এত মেশে। আমি কিন্তু তাকে আমার বড় ভায়ের মতনই ভালোবাসি, পেতে চাই। আমি মা বাবার মনের কথাও শুনতে পেয়েছি—তাদেরও কিন্তু তারই সঙ্গে একমত। আমার মোটেই মত নেই, আমি কিছুতেই একমত হতে পারব না ওদের সঙ্গে। বুঝ্‌তে পারছ হয়ত কি বললাম?

আমি বুঝেও দুষ্টামি করলাম—না, অত বুদ্ধি কি আমার আছে যে না বুঝিয়ে—চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালেও বুঝ্‌তে পারি?

সে একটু বিরক্তিস্বরে বল্‌ল—ন্যাকামি রাখ! আমি আর বুঝাতে পার্‌বনা।

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম—আচ্ছা, তুমি একমত হতে পার্‌ছনা কেন? আমি কিন্তু তোমাদের—

—যাও, কি যে বল? যার তার সঙ্গে নিজকে একত্র করে দিলেই হল আর কি? তুমি কি বুঝনা যে, যে শত্রুর হাতে মেয়েদের ফেলে পালাতে চেষ্টা করে সে আবার একটা মানুষ? আমি আবার তাকে—

এখানেই থেমে গিয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল এবং মাথা নীচু কর্‌ল। কতক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বল্‌ল—আচ্ছা, বলতো, মেয়েদের বেলায় এত অবিচার কেন? ছেলেরা আমাদিগকে বাজারের জিনিষের মতো যাচাই করে নিতে পার্‌বে, আমাদের দ্বারা ওদের কত রকমের ভোগের নৈবেদ্য সাজানো যাবে. তা দেখে নেবে আর আমরা কি কিছুই দেখ্‌তে পার্‌ব না? আমাদেরও কি একটা ইচ্ছা করেনা যে—

এমন সময় খানসামা এসে জিজ্ঞেস কর্‌ল চা কি এখানেই নিয়ে আস্‌বে না ঘরে দেবে? কাজেই তার কথায় বাধা পড়্‌ল। সে এখানেই সব বন্দোবস্ত কর্‌তে বল্‌ল। চা পান কর্‌তে কর্‌তে আবার সে বল্‌তে লাগ্‌ল—

আমাদের কি এতটুকু ইচ্ছা হয় না যে জীবনে কি পেলে সুখী হতে পার্‌ব? মা বাবা কেন সেটুকু দেখে দেন না? অবশ্য তাঁরা তার যথেষ্ট চেষ্টা পান্—কিন্তু তা সম্পূর্ণ রকমে কর্‌তে পারেন না। মেয়েদের থেকে মত নেওয়া মা বাবার অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন করে ছেলেদের থেকে নেন। আমি কিছুতেই আমার মনের বিরুদ্ধে যেতে পার্‌ব না। আমার মন যাকে চায়, আমার প্রাণ যার সঙ্গ পেতে চায় আমি তাকেই চাইব, অন্যকে কি করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দেব? ঠিক এই সময় পাশের বাড়ী থেকে একটা মেয়ে গেয়ে উঠ্‌ল—

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো।
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর
কেহ নাই, কেহ নাই গো।

আমরা দু জনই স্তব্ধ হয়ে গান শুন্‌তে লাগ্‌লাম। গান যখন থেমে গেলো তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌ল—আচ্ছা, তুমি একে কেমন ভাব? যেমন আমাদের বিয়েতে। মেয়ে চেনেনা ছেলেকে—ছেলেও চেনে না মেয়েকে। কেউ কারো চরিত্র জানে না, রং জানে না—তার বিষয়ে কোনো কিছু জানে না। অথচ তাদের মিল্‌তেই হবে। বিয়ের পর এরা কি তেমনই করে মিল্‌তে পারে? কথ্‌খনই না। জোড় করে মিশানো ভালবাসা কি কখনো সুখ আন্‌তে পারে? যদি পথ থাক্‌ত, তবে কথ্‌খনও এমন মিলন হতে পার্‌ত না, পথ নেই বলেই আর কোনো উপায় নেই বলেই জোড় করে ভালোবাসা দেয়। আমার কিন্তু মোটেই তা ভালো ঠেকে না। ছেলে কি মেয়ে দু-জনেই দুজনে বেছে নিক নিজদের সারা জীবনের সহচরকে। বেছে না নিলে কি সুখ হয় বা হতে পারে?

——আমারও একথা মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত তো করি নি কোনো দিন? তবে তুমি যা বল্‌চ, আমিও সেই মতই দিচ্ছি। আমিও একে একটা কুসংস্কার না বলে পার্‌ছি না। আমার মতে ছেলেদের যতটুকু অধিকার দেওয়া হয়, মেয়েদেরও সেটুকু দেওয়া উচিত। তা হলে কোনো রকমে এদের মনের কোনো স্থানেই অমিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ কার ডাকে কথা থেমে গেলো। ফিরে চেয়ে দেখি 'লীলা' দাঁড়িয়ে। সে বল্‌লে, তামাদের যতীন বাবু ডাক্‌ছেন। চলে গেলাম

(তিন)

তারপর এক দিন আমাকে যতীন বাবুর এবং বাড়ীর সকলের অনুরোধে তাদের সঙ্গে পুরী আস্‌তে হল। পুরী এসেছি মাত্র দুই দিন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই বারান্দায় বসে গল্প করছি এরই মধ্যে দেখি নরেশ বাবু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। তার আসায় একটু যেমন অবাক্ হলাম তেমন আবার তার জন্যে একটু দুঃখও হল। সে তবে বুকভরা আশা নিয়ে অশ্রুর পেছনে ছুটে চলেছে, অথচ অশ্রু

তার দিকে ফিরেও চাচ্ছে না। আগে যদি বা তার সঙ্গে বেড়াত, একত্র আলাপ করত, আজকাল আর তাও নেই।

আমি দেখ্‌চি যতই তার আমার দেখাশুনা বেশী হচ্ছে নরেশবাবু ততই বাদ পরে যাচ্ছেন। অশ্রু আমার খুব বেশী সঙ্গপ্রিয় হয়ে পড়েছে। আমাকে ছাড়া সে কোথাও নড়্‌তে চায় না। তারই অনুরোধে তার মা বাবা আমাকে অনুরোধে ফেলে এখানে নিয়ে এসেছেন।

নরেশ যেইমাত্র এলো, অম্‌নি অশ্রু আমাকে বল্‌ল—চল একটু বেড়িয়ে আসি। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে।

মেয়ের মাথা ধরেছে শুনে অশ্রুর মা একটু ব্যস্ত হয়েই বল্‌লেন—যাও তো বাবা, ওকে নিয়ে একটু ঘুরে এস ততক্ষণ নরেশ আমাদের এখানে থাকুক।

আমি চলে এলাম। অশ্রু আমার পাশে পাশে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে এবং পৃথিবীর গায় তার সমস্ত কিরণ নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। আজই প্রথম আমার চোখে ঠেক্‌ল অশ্রু কত সুন্দর! এমন শোভা কি মানুষের কখনও সম্ভব! আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এবং আমার অজ্ঞাতে তার হাত চেপে ধর্‌লাম।

সে কোনো আপত্তি কর্‌ল না বরং, আরো গা ঘেসে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেটে চলেছিল।

কতক্ষণ এম্‌নি চুপচাপ কেটেছে, জানিনে হঠাৎ সে তার মাথাটা আমার বুকে রেখে ফুলেফুলে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি থম্‌কে দাড়ালাম। তখনই আমার চমক্ ভেঙে গেলো। এ কি।

সেই মুহূর্ত্তেই সে আর্দ্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—আজ তারা সাক্ষী করে—আকাশের দেবতা সাক্ষী করে—সম্মুখের উত্তাল তরঙ্গমালা সাক্ষী করে বল্‌চি, আমি তোমাকেই চাই। আমার প্রিয়তম,—বল তুমি আমার হবে? আমাকে আমার জীবনে সার্থক করবার অধিকার দেবে? আমি এতদিন যে এই মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষা করেই বসেছিলাম, আজ যদি সে অবসর হল, তবে একে হেলায় হারাব কেন? বল, চুপ করে থেকো না?

মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠ্‌ল। ছিঃ! তা হলে যে আরেকটি প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে যাবে? না না, তা হতে পারে না। আমি অত নিষ্ঠুর হতে পার্‌ব না। কিন্তু যদি অশ্রুকে ব্যর্থ করি সে যদি তারপর আত্মহত্যা করে, তবে এর মরণের জন্যে দায়ী থাক্‌বে কে?—আমি। সত্যিই আমি।

—চুপ করে আছ যে? বল, আমায় হেলা কর্‌বে না!

আমি আর চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লাম না, বল্‌লাম—তোমার কলিজা খান্ খান্ করে কেটে রক্ত রাঙা হাতে চলে যাওয়া আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তা না হলেও যে তোমার প্রার্থনা পূরণ কর্‌তে পার্‌ব তাও তো মনে হয় না? আমি ভেবে দেখেছি নরেশবাবু তোমার আশায় দিন রাত ঘুরে ফির্‌ছেন। তোমাকে না পেলে যে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে?

—আর আমি কি ব্যর্থ হব না? আমি যদি ব্যর্থ হই তবে কি নিয়ে বাঁচ্‌ব? আমার দিকে কি তুমি তাহ'লে ফিরে চাইবে না? নিষ্ঠুর! আমার বুকের উপর দিয়ে হেটে যেতে তোমার এতটুকু বাঁধ্‌ল না? তোমার কঠোর পদাঘাত যে আমার মৃত্যুর দ্বারে এনে পৌঁছিয়েছে? আমি মর্‌তে বসেছি!

—ভুল করো না অশ্রু! আমি তার কাছে কি দাঁড়াতে পারি? সে ধন-মানঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে, সর্ব্ববিষয়ে আমার কত উচ্চে। তার কাছে গেলে তুমি কত সুখী হবে? আর—

—চাই না - চাই না আমি ধনমানঐশ্বর্য্য? তোমার যা আছে তাই আমি চাই, এতেই আমি সুখী হব। যদি সে অধিকার না দাও আমি তোমার কাছ থেকে পাওয়া 'রিভলবারের' সাহায্যে মর্‌তে তো পার্‌ব? সে সুযোগটুকু তো আমায় দিয়েছ! বেশ তাই হবে, আমি তাই কর্‌ব।

সর্ব্বনাশ! খানিকক্ষণের জন্যে কেঁপে উঠ্‌লাম। তার হাতে চেপে ধর্‌লাম, বল্‌লাম্ ছিঃ! ও কি রকম বাসনা তোমার? এ জীবন কি অত সহজেই নষ্ট কর্‌তে আছে?

—তবে বল, তুমি আমার হবে?

—আচ্ছা তাই হবে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব যাতে তোমায় সুখী কর্‌তে পারি। ভগবান যেন আমায় সে শক্তি দেন।

এই কথা বল্‌তেই সে আমায় তার দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় নরেশ বাবু ডাক্‌লেন—অশ্রু, তোমার একটু সময় হবে? আমার একটু দরকার আছে।

সে ফিরে বল্‌ল—এখন এখানে সময় হবে না। বাড়ীতে দেখা কর্‌বেন।

—সে সুবিধা আমার হবে না। এতটুকু অবসর কি তোমার নেই, অশ্রু?

—আমি আর কতক্ষণ থাক্‌ব? তারপর তুমি—

—আচ্ছা বলুন কি বল্‌তে চান্?

—একটু এদিকে এস। আমি আমার শেষ নিবেদন তোমার পায়ে জানাতে এসেছি।

আমি দাঁড়িয়ে ঐ অতল জলধির আর উদার আকাশের চুমোচুমি দেখ্‌ছিলাম। কতক্ষণ এ ভাবে বিহ্বলের মতো—উদাসীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ অশ্রুর তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠ্‌লাম। তখন অশ্রু তাকে বল্‌ছিল—আমার যাকে ইচ্ছা ভালবাস্‌ব, আপনার তাতে ক্ষতি কি? যান্ যান্, আপনি আর কোনোদিন আমার সাম্‌নে আস্‌বেন না। আমি আপনাকে আর সাম্‌নে দেখ্‌তে চাই না। এই বলে সে চলে এলো। নরেশবাবু টল্‌তে টল্‌তে কোনো রকমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরাও ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলাম।

এসে আমি আমার ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় পিয়ন ডাক্‌ল—বীরেন্দ্র বাবুকা জরুরী তার হ্যায়!

তাড়াতাড়ি কাপ্‌তে কাপ্‌তে এলাম। বাঙ্গালীর 'তার' খুব সুখ সংবাদ অথবা দুঃখের সংবাদ ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই বহন করে না। কোনো রকমে নামটা সই করে, খুলে দেখি বাবা পীড়িত, শীগ্‌গীর যেতে লিখেছেন। বসে পড়্‌লাম। আমার ফুলে ফুলে কান্না আস্‌ছিল। কি জানি, বাবা হয়ত বেঁচে নেই।

সেইদিনই রাত্তিরে গৌহাটী রওনা হলাম। একমাস ঐকান্তিক চেষ্টা করেও তাঁকে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। বাবার ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া হয়ে গেলো। কল্‌কাতা ফিরে যাব যাব ভাব্‌চি এরই মধ্যে মা আবার পীড়িত হলেন। বাবার শোক তাঁর কাল হল। তেরোদিন জ্বরে ভুগে আমাদের আঁধারে ঢেলে চলে গেলেন। আমি আবার একমাসের জন্যে আট্‌কে গেলাম।

দুই দুইটা ঘা খেয়ে এবং হবিষ্যান্ন খেয়ে খেয়ে আমারও শরীর ভেঙে পড়্‌ল। একদিন সত্যি সত্যি আমারও অসুখ হয়ে পড়্‌ল। কোনো রকমে দেড়মাস পরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এই কয়মাসে অশ্রুর কাছ থেকে মাত্র একখানা চিঠি পেয়েছি। আমি কিন্তু একটাও দিতে পারিনি। তার নিষ্ঠুরতা আমাকে আঘাত কর্‌ল।

আরো দুইমাস পরে যখন কল্‌কাতা ফিরে এলাম, তখন শুন্‌লাম, তারা তখনও ফিরেনি। পুরী চিঠি দিলাম, কোনো জবাব নেই। তারপর একদিন সত্যিই পুরী চলে এলাম। দেখি বাড়ীতে আরেকজন বাবু ভাড়াটীয়া। আমি একেবারে ভেঙে পড়্‌লাম।

এই বুঝি ভালবাসা? আমার সারাটা বুক জুড়ে বসে আজ নিজে দূরে সরে বসেছ? ছিঃ! এই না তুমি কত ভালোবাসা দেখিয়েছিলে? আমাকে না পেলে মর্‌বে বলেছিলে? কই তোমার সে প্রতিজ্ঞা!

আর ভাব্‌তেও পার্‌লাম না, কারণ তখনই আমাকে আবার কল্‌কাতা ফিরে যেতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কিনে গাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্ছি একি এ? একজন বাঙ্গালী সাহেবের পাশে অশ্রু বসে, আর সে সাহেবটি তাকে চুমো খেতে উদ্যত!

আর পার্‌লাম না দাঁড়িয়ে থাক্‌তে। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তারপর যখন জ্ঞান হল দেখ্‌লাম, আমি হাঁসপাতালে পড়ে আছি।

সেইদিনই পালিয়ে চলে এলাম।

তারপর তিন তিনটি বছর আমি কত দেশ, কত পাহাড়, কত বন জঙ্গল ঘুরে যেদিন আবার শেষ পুরীতে এসেছি, সেদিন আবার সন্ধ্যায় আমার বুকটা হায় হায় করে কেঁদে উঠ্‌ল। ঠিক্ সেই জায়গাটিতে বসে আছি যেখান তার আমায় প্রথম মিলন হয়েছিল, সাক্ষী আকাশের দেবতা আর নক্ষত্রপুঞ্জ। ঠিক্ সেই সময়ে কে একজন বাঁশীতে গেয়ে উঠ্‌

বন্ধু আমার! থেকে থেকে
কোন্ সুদূরের বিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে।
আমার অনেকদিনের পথের বাসা
বারে বারে ঝড়ে উড়ে
পথহারা তাই বেড়াই ঘুরে।

লাগ্‌ল সে কান্না। আমার প্রাণের মাঝে সে কান্না কি তুমুল সংগ্রাম বাধিয়ে দিলো। নিজের উপর কেমন একটা ধিক্কার এলো। ডুবে মর্‌ব বলে সমুদ্রে ঝাপ দিলুম। মর্‌তে পার্‌লাম না, কে আমাকে উঠাল বলে মনে হল, তারপর আর কিছু জানিনে।

যেদিন আবার চোখ্ খুল্‌লাম, দেখি, আমি জেল হাঁসপাতালে। সুস্থ হয়ে উঠেছি, আমার বিচার হল। আমি বল্‌লাম যে আমি মর্‌তেই চেয়েছিলাম। তাই জেল হল। জুরীরা সব মত দিল যে আমাকে পাগলা গারদেই রাখা হবে। এতদিন নানা জেল ঘুরে তো এখানে এসেছি এবং এখানে এসে তোমাদের পেয়েছি।"

'মলিনা' ততক্ষণে ঘুমিয়ে পরেছে। তার এ মর্ম্মস্পর্শী আত্মকাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে এতই বিস্ময়-স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বলে উঠ্‌লাম 'পৃথিবীতে এমনটিও হতে পারে!'

'শুভা' পর্দ্দার আড়ালে বসেছিল। সে কাঁদ কাঁদস্বরে তার সাম্‌নে এসে বল্‌ল—ভয় কি ঠাকুর পো! এইতো ভালবাসার সুখ। এই ব্যর্থতা পেয়েছ বলেই তো জগতকে চিন্‌তে পেরেছ, নইলে তুমি আঁধারেই থাক্‌তে।

সে কোনো জবাব দিলে না। রুমালে চোক মুছে আমাকে এবং শুভাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল এবং যাওয়ার পথে মলিনাকে ঘুমের মাঝেই একটা চুম্বন কর্‌ল এবং খানিকক্ষণ তারদিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে তার কুঠরীর দিকে চলে গেলো।

পরদিন তো আর এলো না। আমি খবর নিয়ে জান্‌লাম, সে চুপ করে বসে বসে কি ভাব্‌চে। তার কাছে গেলাম, কত অনুরোধ কর্‌লাম, কিছুতেই সে এলো না।

এম্‌নি করে কিছুদিন যায়, একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে না উঠ্‌তেই 'শুভা' এসে জানাল যে কে একজন প্রহরী শীগ্‌গীর যেতে ডাক্‌ছে। আমি ত্রস্তব্যস্তে ছুটে গেলাম। 'শুভা' দ্বিতলের উপরের জানালা খুলে তাকিয়ে রইল। গিয়ে দেখ্‌লাম, লোহার মোটা মোটা শিকের মধ্যে কাপড় বেঁধে ফাঁসি দিয়েছে—সে আমাদের বীরেন।

আমি আর দেখ্‌তে পার্‌লাম না। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে বাড়ী চলে এলাম। এরই মধ্যে আমার পিস্‌তুত বোন্ 'অমিয়' এবং তার দেবর 'শচীন্' এলো। আমাদের বিষণ্ণ দেখে সে একটু চম্‌কে গেলো। আমি তক্ষুনি তাকে আদর করে নিয়ে গেলুম। সে সমস্ত শুনে 'বীরেন'কে দেখ্‌তে চাইল। কাছে গিয়ে তার দিকে চেয়েই দুই চোখে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠ্‌ল।

ওগো আমি তোমায় নিষ্ঠুর বলেছিলাম, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি তুমি তা নও।—তুমি দেবতা, সত্যই দেবতা আর আমি নরক, পিশাচ!

* * *

এ মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী আজ কোন্ অতীতের কোলে ঢলে পড়েছে, 'বীরেন' বা 'অশ্রু' কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে আছি কেবল আমি আর 'শুভা'! এখনও বীরেনের কথা একটা দুঃস্বপ্নের মতন সর্ব্বদা আমার মনে পড়ে। 'শুভা'ও, তার জন্য প্রায়ই দুঃখু করে, কিন্তু যার কোনো প্রতীকার নেই, তা নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আর কি উপায় থাক্‌তে পারে!

ওঁ তৎ সৎ।

সাময়িক সাহিত্য

শ্রীহেম চৌধুরী

বিগত ১৩৩৩ সনের মাঘ মাসের ভারতবর্ষে "অতি আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে" শ্রীঅমল চন্দ্র হোম মহাশয় তরুণ লেখকগণের পিঠে চাবুক বসাইতেছেন। দুঃখ হয়। দোষ কাহার নাই?

তাঁহার মতে "সতেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকেই লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, সেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই, একথা কে স্বীকার করিবে? অথচ এই বিকৃত, বিষদুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই তো অতি আধুনিক বাংলার কথা সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইতেছে।" "বিকৃত, বিষদুষ্ট অস্বাস্থ্যকর প্রেম"—চমৎকার আবিষ্কার (!)। সতেরো বৎসরের ছেলের সঙ্গে পনেরো বৎসরের মেয়ের প্রেম হইল কোন্‌খানটায়? আমরা তো জানি, পচা মাছের সার গোলাপ গাছের গোড়ায় দিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে গাছের জোর হয়—খুব ভাল বড় ফুল ফোটে—সৌরভ বাহির হয়। প্রেমও গোড়ায় কামকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িতে থাকে। তারপর প্রেমের সৌরভ। এই নিকৃষ্ট সত্যটাই যে অমল বাবু চাপিতে চাহিতেছেন, তাহা নহে,—উদ্দেশ্য শুধু তরুণদের জব্দ করা। তারা নাকি সংযমী লেখক নহেন। প্রবীণদের মধ্যেও তো অশ্লীলতার ত্রুটী দেখা যায়। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় "শাস্তি" লিখিয়া সমালোচকের নিকট খুব শাস্তিই পাইয়াছিলেন। অপ্রিয় সত্য কেহ প্রকাশ করিতে পারিবে না বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলে তাহা টিকিবে কি?

"নারীরূপে একটা মোহ আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্ব্বদাই লালসায় পঙ্কিল?' হাঁ, সর্ব্বদাই লালসায় পঙ্কিল। লোভ ও মোহ ষড়রিপুর গণ্ডীর মধ্যে—দুষ্ট। হোম মহাশয় অস্বীকার করেন কি? ছয়টা রিপুকে জয় করিয়া তাদের উপর যথাক্রমে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে বসাইতেই হইবে। মোহ সর্ব্বদাই পঙ্কিল। পঙ্ক না থাকিলে পদ্ম ফুটিবে কাকে আশ্রয় করিয়া? মোহ যখন থাকে না—মানুষ যখন মোহের বশীভূত না হয়, তখনই সে সৌভাগ্যবান্।

"অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি - সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি।" কথাটা খাঁটি সত্য। শ্রীঅচিন্ত্য সেন মহাশয়ের "কল্লোলে" প্রকাশিত 'প্রাণশ্চ' গল্পে গয়লানীর মেয়ে "বেকী" বল্লে—"মুখে ঝাড়ু, যেটা দিয়ে পাছদুয়ার ঝাটাই। তারপর মুখে কাপড় ঠাসে, আর হাসে।" "বেকী" ভোলে নাই যে, সে গয়লানীর মেয়ে, তাই মুখে ঝাড়ু মারতে চায় কৈবর্ত্তের ছেলে ভোম্‌রাকে। অথচ ছেলে বেলার ভালবাসা—মুখে কাপড় দিয়ে হাসে।

"হোক্‌না গয়লানীর মেয়ে—তবু তো নবযৌবনা।" গয়লানীর মেয়ে "জগতের সমস্ত নবযৌবনারই মতো।' নবযৌবনা হলেও কি কৈবর্ত্তের ছেলেকেই বিবাহ করিতে হইবে? এরূপভাব অসমীচীন। ইহা পাশ্চাত্য Idealism বলে মনে হয়। এখানে বাংলার সমাজের চিত্তকে ভাবে, ভাবনায় ও সহানুভূতিতে অভিভূত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ওরা কি International Alliance চালাইতে চাহেন?

বিগত পৌষের 'বীণা' পত্রিকায় শ্রীশচীন সেন রায় লিখিত 'যাবনা, যাবনা ঘরে' একটী ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রায় মহাশয় তাহার লেখায় Provincialism চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, পরন্তু নূতন styleএর লেখার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাহার মনস্তত্ত্ব কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করা যাউক।

Provincialism ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে নিত্যই গবেষণা চলিতেছে। একদল তাকে জবাই করিতে চেষ্টিত, পক্ষান্তরে styleটা আপনার বলে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্যাকরণে "গোয়াল" শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে "গোয়ালিনী" ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ছেলেদের কোনও ব্যাকরণে "গয়লা"—"গয়লাবউ"কে প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যেই দেখিয়াছি। সুতরাং রায় মহাশয়ের 'খোটা,'

'টব্‌গা,' 'ইদু,' 'কাঠের কুট্টিতাক্', ফাল্গুন, ১৩৩৩, 'কল্লোলে' অচিন্ত্য কুমার সেনের 'কুপি,' 'ফ্যা ফ্যা কচ্ছে,' 'থাবরার পর থাবরা,' 'এক দমক বৃষ্টি,' 'ঘরের ছাঁইচে,' এবং চৈত্রের মাসিক 'কল্লোলে' প্রবোধ কুমার সান্যালের 'ছয় লাপ' ইত্যাদি স্থানোপযোগী সন্দেহ নাই।

"বাইজীর গানেই যেন ওকে একদম জ্যান্ত করে দিয়ে ফেল্লে।" সুরের মোহিনী শক্তি। বনের হরিণ এবং সাপ সুরে বশীভূত হয়, নিতাইই বা আত্মহারা না হইবে কেন? নিতাইর প্রাণ সুরে ডুবে গেছে। তাই তন্ময়তায় চুপ করে আছে। প্রাণের কৃতজ্ঞতা মিটেছে—স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোটা জল পেয়েই অতলে ডুবে গেছে।

গান থেমে গেল—তন্ময়তা কেটেগেল—আবার সেই পাড়া গেয়ে নিতাই বাইজীর আহ্বানে ভীত। আবার সরল সঙ্কোচ ভাব—"বোধ হয় যেতে পারবোনা।" "আমি যে পড়ি।" আবার বাইজীর মুখে—"নাচি গাই, তা বলে কি এত ঘেন্না?" অর্থাৎ তুমি আমার সুরে আপনহারা হতে পার, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে আমার প্রাণের ঠাকুরকে তুমি কোন অধিকারে ঘৃণা করতে পার? একথায় নিতাই অপ্রতিভ। "একটা কোচে দুজনেই একত্র বস্‌ল।" "তুমি আমার সাথে থাবে—তা না হলে থাবো না।" কথা গুলি বিসদৃশ ঠেক্‌তে পারে, রুচিবিরুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু এখানে নিতাই আত্মহারা। প্রেম,—কামগন্ধ নাই।

তৃষ্ণা মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তখনই নিতাইর মায়ের চিঠি চুপি চুপি পড়ে "মন বড় ভয়ানক ব্যাকুলিত হয়ে উঠ্‌ল।" তার পরই অভিশপ্ত জীবনের প্রতি ঘৃণা—বিষ থাওয়া—সর্ব্বস্ব নিতাইর চরণে সমর্পণ করিয়া "লুপ্ত"। আত্মহত্যা মহাপাপ।

ডাংপিটে ছেলে নিশি, "পিত্তশূল বেদনায় কাতরাচ্ছে" দেখে দয়া করে তুষিকে ঘরে নিয়ে গেল। পরের বোঝা বয়ে বেড়ান নিশির মত ছেলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কেউ কেউ করেও। নবকুমারও সহযাত্রীর জন্য কাঠ কুড়িয়ে আন্‌তে গিয়ে কি বিপদ!—কপালকুণ্ডলার ভার বইতে হয়েছিল। তবুও পরের জন্য কাঠ কুড়াইবেই। নিজের খাবারের সংস্থান নাই, তার উপরে তুষি। "লজ্জার ধার ধারে না, সঙ্কোচের তোয়াক্কা রাখে না।" নূতন ঘর সংসার পাতাইয়া বেশ শান্তিতেই আছে। মাসিক পত্রিকা, চণ্ডীদাস, বঙ্কিম, মাইকেল, দান্তে, সেক্সপিয়ার, সেলিকে প্রাণের ভিতর আকড়াইয়া রাখিতে চায়। খোলার ঘরে তুষি–নিশি, বঙ্কিম সেলি (!) "এত কিসের লজ্জা! সেদিন তো গাইতে গাইতে নিতুর পঞ্জাবীর পকেটে পয়সার জন্য হাত চালিয়ে দেছিলি!" এ কেমন লজ্জা? রাস্তায় শ্রোতার উপর তুষির এত জুলুম, ঘরে এসে চেনা মানুষ বলে কি এত লজ্জা (!)? রায় মশায় কি বলেন? নিশি বড় বেয়াড়া। নিতাই ওর পিঠে দু'ঘা দিলে না কেন?

মানুষের রুচির অন্ত নাই। বাইজীর সঙ্গে স্কুলের ছেলের ভালবাসা সমাজের রুচিবিরুদ্ধ; কিন্তু তা বলে কি রুচি বাগীশেরা ভালবাসার পায়ে শিকল বেঁধে যথাতথা যাওয়ার দায় হতে এড়াতে পেরেছেন। প্রেমই চরম লক্ষ্য। যে বেশ্যালয়ে কামেরই প্রভাব বেশী, সেখানে প্রেমের আশা খুবই কম। লেখক এরূপ চিত্র পাঠক পাঠিকার সম্মুখে না ধরিলেও পারেন। তবে গোবরেও পদ্ম কোটে। গঙ্গাজল চির পবিত্র।

হোম মহাশয় তরুণদের লেখার ভঙ্গী দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়াছেন। নিরুৎসাহের কি কারণ থাকিতে পারে? একমাত্র অভিযোগ—ইহাদের সংযমের অভাব। তাই "হবু তরুণদের" তিনি তখনই বরণ করিতেছেন। "নব জীবন" পত্রিকায় ভাষার নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে ভাষার নগ্ন মূর্ত্তিটিকে অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। যারা আজ সমালোচনার ক্ষেত্রে দাড়াইয়া নিন্দা করিতে উৎফুল্ল—লেখকদিগকে নিরুৎসাহ করিতে উৎসুক, তাহাদের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল। জগতের ক্রমোন্নতিই তো বৈশিষ্ট। নিন্দা না করিয়া গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখাই ঠিক নহে কি?

ভোগের পরিপাক

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি, এ,

(সাদীর ভাবানুসরণে)

তরুশাখে পত্রতলে পাকিবারে দাও ফলে,
ছিঁড়না ত্বরায়,
ফলের পক্কতা সাথে বীজ যবে পুষ্ট হবে,
ঝরিবে ধরায়।

জন্মিবে বিশাল তরু রসালবৈভবে তায়।
মিটুক ভূতলে
শেষ বিন্দু ভোগ তৃষ্ণা সুপুষ্ট বৈরাগ্য বীজে
চতুর্ব্বর্গ ফলে।

ক্ষমা কর যত অপরাধ

শ্রীশচীন সেনরায়

ছায় ছোট্ট সহর-টা; নাম শ্রীকেষ্টপুর। গোটা সহর-টাতে মোটে একটা মাত্র বড় রাস্তা আছে। তা'তে দেশী খৃষ্টান প্যারীমোহনের একটা বেশ ফ্যাসানওয়ালা চুলছাটার দোকান আছে।

বেশ উপার্জ্জনও হচ্ছে ওতে।

তিরিশ বৎসর আগের কথা—

পরামাণিক প্যারীমোহনই তখন ফিটফাট্ বাবু ছোড়াদের কাছে চুল ছাঁটার জন্য খুবই আদর পেতো, কারণ সে' সময় তো আর নানা রকম সকমের চুল-ছাঁটার নমুনাও ছিল না। লম্বা লম্বা চুলই রাখতো সব্বাই। আর ব্যাটা-ছেলেরাও আস্‌তো চুল ছাঁটাতে কিম্বা দাড়ি কামাতেই। এখনকার মত তো তারা নানাপ্রকার সেম্পো পাউডার, গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার জান্‌তো না। তাই আগের কালের নামজাদা পরমাণিকদেরও একেবারেই অকর্ম্মণ্য করে রেখেছে, তাসত্বেও প্যারীমোহনের কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। প্রায় সকল মেয়েরাই তার দোকানে এসে কেউবা 'বব্‌ড্' করাতো, কেউবা সিঙ্গেল করাতো, কেউবা আবার শরীরও টেপাতো।

মেয়ে মহলে কাজ করে প্যারীমোহনের ছেলে প্রশান্ত। ডাক নাম হারুবার। সহরে খুব কাণাঘুসা চলে যে প্রশান্তর সুশ্রী মুখ খানার জন্যই নাকি এ মহলে খুব রোজগার। যদিও হেয়ার-ড্রেসার হিসাবে সে খুবই সুনিপুণ, তবু ওটা কিন্তু এখন একেবারে চাঁপাই পড়ে।

প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন হয় না; সত্যের একটু আধটু আভাষ তাতে থাকে। তা' নৈলে সহরের সব চৌদ্দ চৌদ্দ মেয়েরাই বা প্রিয়দর্শন প্রশান্তর কাছে এসে গল্প টল্প করতে এত সুখ পায় কেন? সে জন্য ও বড় একটা বিশ্রাম পায় না—একজন যায় আরেক জন আসে।

প্রশান্ত কিন্তু সুন্দরী যুবতীদেরও যেমন যত্ন নিয়ে বব্ করে, সিঙ্গেল করে, পুরুষদের কামাতেও কম যত্ন নেয় না।—

এর একটা বিশেষ কারণ আছে। ওর প্রাণঢালা স্নেহ প্রেম মমতা সব কিছু কে[illegible]ত হয়ে আছে কুন্তলার উপর।

অনুপম তার দেহলতা, চুলের গুচ্ছটা নিকষ কালো। হাস্‌লে সামনের দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে যূঁইফুলের আধ ফোটা কুড়ির মতন।

কুন্তলা প্যারীমোহনের দোকানেই কাজ করে। সামে একটা চেয়ারে বসে দিনের রোজগার গণে রাখে নিকটের ছোট্ট হাত বাক্সে।

প্রশান্ততে আর কুন্তলাতে বড়ই বেশী ভাব—স্বচ্ছ, পবিত্র, নির্ম্মল - ঝরণার জলের মতন।

প্রশান্তর মনে কয়েকদিন আগের শোনা একটা কথা জাগে—কুন্তলা তাকে নাকি দুনিয়ার সব্বাইর চেয়ে ভয়ানক বেশী ভালবাসে। মনে করে সারা প্রাণটা খুসীতে ভরে উঠে। কিন্তু তক্ষণ তক্ষণই সে খুসী কোথায় লুকিয়ে

যায়, যখন ওর মনে আসে যে কুন্তলাকে তো সে প্রাণভরে পাবে না, কারণ কুন্তলা নাকি সম্প্রতি তাকে বিয়ে করতে গররাজী।

দোকানে' আর কেউ নেই।

প্রশান্ত আর কুন্তলা।

তখন প্রশান্তকে কুন্তলা বলে,—আমার বয়স প্রায় উনিশ কুড়ি হলো, আর তুমিও আমার চেয়ে গোটা কতক বৎসরের বড়। আমরা তো এখন বুঝ্‌তে পারি জীবনটা কি রকম। যা আমরা এখানে রোজগার করি, তা এক রকম কিছুই না। তাই আমি স্থায়ীভাবে এখানে থাক্‌বো না। একটা ভাল রকম কিছু যোগাড় কর্‌তে পারলেই এটা ছেড়ে দেব।

প্রশান্ত সুধোয়,—তাতে শ্রীকেষ্টপুরের অপরাধ? ব্যবসাটাও তো বেশ সুন্দর চল্‌'ছে আর তুমি বোধ হয় জান, বাবা ও আমাদের দু'জনের বিয়ে দিয়েই অবসর নেবেন। তখন তো আমাদের দুজনেরই সব হবে।

শুনে কুন্তলা একটু বিরক্ত হয়ে যায়, বলে,—আঃ! তোমার ঐ এক কথা শুনে শুনে কাণ আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। আচ্ছা, তোমার কি কোন উচ্চ আশাও নেই! তুমি কী এমনি করে কামিয়ে আর চুল ছেঁটেই জীবনটা পয়পাত করবে? ছোঃ!

—এ ছাড়া আর কী করতে পারি, লক্ষীটী?

—অন্য কিছু কর্‌তে পার্‌বে কিনা জানিনে। আমার কথা বলি আমি কিন্তু এ সহরে আর থাক্‌ছিনে।

তারপরে কিছু দিন কাটে।—

হয়তো পুরো একটা মাসই।

কুন্তলা ও তার ছোট্ট হাতবাক্স নিয়ে বসে আছে; নিয়মিতরূপে কাজ করে যায়। তা দেখে প্রশান্ত মনে করেছিল কুন্তলা বুঝি শ্রীকেষ্টপুর ছাড়্‌বার আশা ছেড়ে দিয়েছে। তা কিন্তু না—এপর্য্যন্ত সে জেলার সহরে কোন কাজই জুটাতে পারে নি।

সে দিন রাতে প্রশান্ত কুন্তলাকে এগিয়ে দিতে তার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেল। পরে সেখান থেকে বিদায় নেবার কালে কুন্তলা বল্লে,—কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।

শুনে যেন সারা আকাশটা তার মাথায় ভেঙ্গে পড়লো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—তার মানে? কুন্তলা উত্তর করলে—তার মানে আমি সাড়ে দশটার ট্রেনে কালই যাব। বুঝলে?

প্রশান্ত ওর মত ফেরাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করে। ফল হয় না কিছুই।

উত্তরে খালি কুন্তলা বল্লে—যা স্থির করে ফেলেছি, তাকি আর ফেরাতে পারি? যাক্, তোমার বাবাকে বলো, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। প্রায় একমাস হ'লো ওঁকে আমি একথা জানিয়েছিলুম। তবু কাল সকালে একবার গিয়ে বলে আস্‌ব।

সুকোমল হাত জোড়া তুলে কপালে নৈশনমস্কার জানায়।

এ ছোট্ট খাট বিদায়টাই প্রশান্তকে অভিভূত করে।

পরদিন সকালে—

প্রশান্ত দোকানে ঢুকেই দেখতে পায় কুন্তলাকে রোজের জায়গায়ই বসে আছে। পুলকিত অন্তরে সুপ্রভাত জানাল, পরে কি ভেবে যেন একটু মুচ্‌কি হাসি হাস্‌লে।

প্রশান্ত তার সাদা কামাবার জামাটা গায়ে পরে এগিয়ে যায় একজন ভদ্রলোককে কামাবার জন্যে।

কিছুক্ষণ বাদে সে হঠাৎ চমকে ওঠে, শোনে কুন্তলা বল্‌চে—কাকাবাবু, এখন তবে আসি।

প্রশান্তর বাবা কুন্তলার কাছে গেল, দেখে সে জামা-টামা পরে একেবারে প্রস্তুত। পরে সে একটী দুঃখপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—কুন্ত! সত্যি আমি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু তুমি যখন বলচো যে মন একেবারে স্থির করেছ, তখন আর বাধা দেবোনা। আমি প্রার্থনা করি তুমি সৌভাগ্য-শালিনী হও এবং যে পর্য্যন্ত আমি না শুন্‌বো যে তুমি

ভাল স্থানে ঢুকেছ, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার স্থানে অন্য লোক নেব না।

প্রশান্ত আর থাক্‌তে পারে না। ক্ষণেকের জন্য সে খরিদ্দার ছেড়ে কুন্তলার কাছে এলো।

বল্লে—কুন্ত! আবারও বলি, তুমি যেও না। তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছো না।

—হারবার, কাল রাতেই তো তোমায় সব বলেছি, তোমাকে যেমন নাকি আমি নাড়াতে পারি নি—তুমিও আমাকে পারবে না।

—ওহোঃ! সে কথা! আচ্ছা, দেখাও তো এ সহরে আমার মত পরামাণিক আর কে আছে, নয় কি?

—আচ্ছা বেশ! ঝগড়া করে আর দরকার নেই। এই যে আমার জন্য ঘোড়গাড়ী এসেছে—আসি তবে, মঙ্গল কামনা ক'রো।

কুন্তলা তার বিছানাপত্র ও সুটকেশ ঘোড়গাড়ীতে চাঁপিয়ে দিলে। শেষে বেরিয়ে পড়লো দোকান হ'তে তাড়াতাড়ি, পাছে প্রশান্ত আবার কিছু ব'লে ক'য়ে বাধা দেয়।

সকাল বেলাটা তাদের বড়ই ব্যস্ততার মধ্যেই কেটেছে। দুপুর না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশান্ত একটুও সময় পায় নি তার বাবার সাথে কথা বল্‌তে। কুন্তলার অদর্শন প্রশান্ত বড়ই অনুভব করচে। শূন্য অন্তর কেবল বার বার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। কোন কাজেই মন ঠিক সুস্থির ভাবে বসাতে পারে না।

ও ভেবে ভেবে হয়রাণ হয়, কিছুই ঠিক করতে পারে না। তার এখানে বদ্ধ হয়ে থেকে জীবন কাটিয়ে দেওয়াটা কি ভাল? পরিষ্কার বুঝতে পারে যে কুন্তলা একটা বিরূপ ভাব তার উপর পোষণ করছে, শুধু এ জন্যই সুন্দর চল্‌তি ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়ে নূতনের দিকে ঝাপ্‌ দেওয়া কি উচিত হবে? কিন্তু কুন্তলা ছাড়া তার জীবন বড় শুষ্ক—অসাড় হয়ে যায়।

প্রায় দু পক্ষের বেশী হয়েছে কুন্তলা এখান থেকে চলে গেছে।—

সেদিন একজন উচুদরের মহিলা এলো প্যারীমোহনের দোকানে।

মহিলাটী এ সহরে মটরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্যারীমোহনের দোকানের কাছে আস্‌তেই তার গাড়ী বিকল হ'লো।

মহা মুস্কিল! কি করবে ভাব্‌ছিল। সহসা সে প্রশান্তকে দেখ্‌তে পেলো—সে একটী বালিকার চুল সিঙ্গেল করছে।

মহিলা তার সাথীর দিকে চেয়ে বল্লে—বাঃ! লোকটী তো বেশ চুল সাজ গোজ করতে জানে। আমারও ইচ্ছে করছে ওকে দিয়ে চুল ড্রেস করাই।

তারা দু'জনেই দেখ্‌তে লেগেছে প্রশান্তকে চুপে চুপে। ওর কাজ শেষ হলেই তারা দোকানে ঢুক্‌লো।

খুব জাকজমক-ওয়ালা এক মহিলাকে দোকানে আস্‌তে দেখে প্যারীমোহন ত্রস্তপদে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। বুড়োকে সামনে দেখে মহিলা তাড়াতাড়ি অবজ্ঞাভরে মুখ চোক ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে যুবক প্রশান্তর সুন্দর কচি মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মহিলাটী তাচ্ছিল্যের সুরে বুড়োকে বল্লে—তোমার দরকার নেই। ওই যুবককে আস্‌তে বল—চুল ছাটবে।

প্যারীমোহনের একটু আনন্দও হয়, আবার দুঃখও হয়।—

মনে ভাবলে—সত্যিইতো সেকেলে ধরণ এদের পছন্দই বা হবে কেন?

প্রশান্ত যখন মহিলার চুল ড্রেস করতে ব্যস্ত, তখন মহিলাও তার সাথে আস্তে আস্তে গল্প করছিল। চুল ড্রেস করা শেষ হলে তিনি বড়ই আনন্দিতা হলেন।

বল্লে—সত্যি তুমি কিন্তু ভারী গুণবান্‌! আগে হয়ত আমার চুল এত সুন্দর দেখাতো না। তোমার এমন গুণ—তুমি কেন হে মিছামিছি এখানে সময় নষ্ট করছো? একটা বড় সহরে গিয়ে beauty parlour খুলে বস না? অনেক বেশী রোজগার হবে। প্রশান্ত উত্তর করলে—আজ প্রায় দিন চৌদ্দ পনর যাবৎ সহরে যাবার জন্যে অনেক কিছু ভাব্‌চি।

—'যদি যাও-ই তা হ'লে আমার সাথে দেখা করো; আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি'। একটু

থেমে—'এই আমার কার্ড', বলেই প্রশান্তের হাতে ভিজিটিং কার্ড দিলে।

প্রশান্ত সাদরে গ্রহণ করে। কিছুক্ষণ ওটার দিকে নির্ণিমেষ চোখে চায়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কার্ডের লেখাগুলো যেন সব উরে গেল কোথায়। তার বদলে ভেসে ওঠে কুন্তলার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানা আর ঢল ঢল সুকোমল চোক দুটী। তখনও যেন প্রশান্ত দেখে কুন্তলার চোখে মুখে কেবল একই কথা,—দেখ ওগো, অন্ততঃ একটী বারের জন্যও পরীক্ষা করে দেখ। আমিও এখানে আছি।

সন্ধ্যা উৎরে গেল।

দোকান একটু নিরিবিলি হয়। প্রশান্ত বল্লে—'বাবা, তুমি বোধ হয় ওর সব কথা শুনেছ, না?

শুনে প্যারীমোহন খালি উদাসীন ভাবে মাথাটা নাড়লে।

—দেখ্, বাবা, আমায় ছেড়ে তুই যাস্‌নে?' দুঃখ-মাখা সুরে প্যারী সুধোয়।

—বাবা, আমি সে কথা কখনও মনে করি নি; কিন্তু কুন্ত যে চলে গেল। আরও এক কথা টাকা পয়সা উপার্জ্জনই যখন জীবনের উদ্দেশ্য, তখন সহরেই যাওয়া ভাল। খুব উপার্জ্জন হবে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, সহরেই যাব। তুমি এখানে দোকান চালাবে। যদি লোকসান দেই, তবে আবার চলে আস্‌বো। আর লাভ হলে এ দোকান বিক্রী করে ফেল্‌ব।

—কতকটা ঠিকই বলেছিস্; কিন্তু আমার মনে হয় আমরা বেশ সুখশান্তিতেই আছি। আর আমারও দিন দিন শরীর ভেঙ্গে পড়চে।...

দিন দুই পরে—

প্রশান্ত এ সহর ছেড়ে যাবার কালে তার বাবা তাকে নিজে যে ক্ষুর দিয়ে কামাত তা দিয়ে দিলে। বল্লে—অবশ্য তুমি নতুন লাইন ধরবে, এ ক্ষুর তোমার কোন কাজে আস্‌বে না জানি; তবু তোমাকে দিলাম, কারণ এটা সব সময়ই তোমার বুড়ো বাবার কথা মনে করিয়ে দিবে।

আর বল্‌তে পারে না, দু চোখ সজল হয়ে আসে।

কেউ চেনে না প্রশান্তকে।

এত বড় সহর, লোকের এত ভীড়—তবু যেন ওর কাছে ভয়ানক নিরালা ঠেকে।

প্রশান্ত সুন্দর দেখে একটী পোষাক তৈয়ারী করে নিয়ে ঐ মহিলার সাথে দেখা করতে যায়।

মহিলা কিন্তু প্রশান্তকে আদর আপ্যায়ন দেখাতে একটুও কার্পণ্য করে নি। বরং তিনি নিজে যেচেই বল্লেন—'আমার বোধ হয় আমি তোমাকে একটা ষ্টার্ট দিয়ে দিতে সাহায্য করবো। একটু অপেক্ষা কর' বলেই তিনি তিনি তাড়াতাড়ি একটা নম্বর বের করে ফোন করলেন।

"আমি সুশীলা দত্ত।"

"ওহোঃ! মিস্ দত্ত। আচ্ছা বলুন তো কি দরকার আপনার?"

"আমার হাতে একজন সুদক্ষ পরামাণিক আছে। যদি অনুগ্রহ করে তাকে একটা স্থান করে দিন, তবে বড়ই অনুগৃহীতা হ'ব। মাইরি বলছি, লোকটা যে কত সুদক্ষ ও সুনিপুণ তা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনার খুব কাজে আস্‌বে। তবে এক্ষুনিই থাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই—কেমন?"

সুশীলা দত্ত যখন ফোনে কথা বলছিল প্রশান্ত কিন্তু তখন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল। তার সাধের স্বপ্নপুরী যেন ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। যা একবার ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাই যে আবার তার বরাতে জুটে যাচ্ছে।

—ধীরেন শীল খুব ভাল লোক। ওর একটা 'হেয়ার ড্রেসিং সেলুন' আছে। বেশ ভাল বেতন পাবে। যাও। একটু হেসে মহিলা বল্লেন।

—দেখুন, যা যোগাড় করে দিয়েছেন তা তো খুবই ভাল; কিন্তু কথা হচ্ছে কি আমি আবার ও ব্যবসা করতে চাই নে। একটু বিরসবদনে প্রশান্ত শুধাল।

—তুমি একজন ভাল পরামাণিক এ পর্য্যন্তই আমি তোমার সম্বন্ধে জানি। এ ছাড়া আর কি জন্য তোমাকে সুপারিশ করতে পারি?

—কিন্তু আপনি তো কথা দিয়েছেন—একটা 'বিউটী পারলার' এর ব্যবসা আমাকে খুলে দেবেন। অত্যন্ত হতাশের সুরে বল্লে।

—সে কাজ তো পরেও পারবে। আগে লোকজনের সাথে আস্তে আস্তে চিনা পরিচয় হউক, তারপর সব হবে। বুঝলে?

প্রশান্ত বের হয়ে এল। পরে মনে ভাবলে—সত্যি তো, এ ছাড়া আমার আর কি আছে কারবার? একটা বিদ্যেই তো কেবল জানি। কি বোকামী! একবারে এক লাফেই গাছের মাথায় উঠ্তে চেষ্টা করেছিলাম।

এদিকে টাকা পয়সার থলেও খালি হ'য়ে যাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে প্রশান্ত ও-কাজই গ্রহণ করে।

সেই দিন রাত্রেই প্রশান্ত তার বাবাকে এক পত্র লিখ্ল—"বাবা! বড় বড় সহর গুলো যেন সব একাচোরা, সভ্যতা মোটেই হয় না। এত দিন যাবৎ আছি তবু আমি এখানে নেহাৎই অপরিচিত। এখানে আমার বন্ধুতা গাঢ় করেছে তোমার দেওয়া সাধের ক্ষুরটাই শুধু। আগের ব্যবসাই করি। পত্র পেলে আবার আস্‌ব।"

শীতের সকাল। রোদ উঠে, আবছা আকাশও পরিষ্কার হয়।

রাস্তা দিয়ে প্রশান্ত যাচ্ছিল তার কার্য্যস্থলে। আচম্কা চোক একটা দোকানের দিকে গেল, দেখে কুন্তলা একটা চেয়ারে বসে টাকা-পয়সা গণ্ছে।

খুসীর বান ডাকলো প্রশান্তর প্রাণে। তক্ষণই সে ঐ দোকানে ঢুকলো। পরে কুন্তলার অতি নিকটে গিয়ে বল্লে—সমস্ত সহরময় তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

—তুমি যে এসেছ তা আমি তোমার বাবার কাছ থেকে খবর পেয়েছি। হঠাৎ একটু থেমেই কুন্তলা আবার বলে—এখনও সেই ব্যবসা! ভাল! কর।

শুনতে কথাগুলো যদিও সহজই লাগে কিন্তু তবু—কেন জানি একটা তাচ্ছিল্যের খোঁচা এসে প্রশান্তর বুকের পাঁজরাটা বিদ্ধ করে।

ক্ষুব্ধস্বরে প্রশান্ত বলে—এক রকম অস্থায়ী ভাবেই এ কাজ পেয়েছি। আশা আছে বড় রকমই একটা কিছু করবো। দেখি কি হয়।

—আচ্ছা বেশ দেখা যাবে। যাক্, আমি বড্ডই ব্যস্ত আছি এখন। তোমার ঠিকানা দিলে দেখা করবো।

দেয়—

...পরে চলে ভাঙ্গা পরাণ নিয়ে গন্তব্য পথে।..

বিকেল বেলা দোকানের মনিব ধীরেণ প্রশান্তকে সুকেশ বাবুর বাড়ীতে কামাবার জন্য পাঠাল।

শীলের জন কতক ধনী বাঙ্গালী ও সাহেব মক্কেল আছে। তারা দোকানে এসে কখনই কামাতো না। তাই তাদের নিজ নিজ বাড়ীতেই পরামাণিক পাঠাতে হয়।

প্রশান্ত যায়।

একটা সুসজ্জিত কামরার ভিতর প্রবেশ করেই সে দেখতে পেলো—একজন মধ্যবয়স্ক লোক, আর একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক যুবার সহিত আলাপ কচ্ছে।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে—সুকেশ বাবু আছেন?

—হাঁ আমিই। কি দরকার? মধ্যবয়স্ক লোকটী শুধোয়।

—আপনি পরামাণিকের জন্য পাঠিয়েছিলেন,—আমিই।

পরামাণিকের এমনতর সুন্দর ও ভদ্র চেহারাখানা দেখে সুকেশ বাবুর চোখে যেন একটু আশ্চর্য্যের ছোপ ভেসে উঠ্লো।

প্রশান্ত তাকে কামাবার কালে সে বল্লে—সারা জীবন কি খালি এ কাজই কচ্ছ?

উত্তরে প্রশান্ত বল্লে—আজ্ঞে হাঁ, স্যার! কিন্তু আরও একটা ভাল ব্যবসার সন্ধানে আছি।

—তা বেশ, উচিত! এই তো বয়েস!

চুল ছাটা আর কামানো শেষ হ'ল। যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করবার জন্য প্রশান্ত বাথরুমে যায়।

জেলার সহরে এসে-ই কুন্তলা যে চাকুরী নিয়েছিল—ছেড়ে দেয়। আরেকটা জুটিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি।

ওর মন-ভুলানো চেহারা খানার দরুণই হয়ত তাই কি উচু দরের পরিবারের ছেলেদের সাথে মেলা-মেশা কর্‌বার সুবিধা ঘটে।

সন্ধ্যার সময় এত ব্যস্ত থাকে যে তাকে তখন বাসায় পাওয়া দুর্ঘট।

কতখান হ'তে নেমতন্নের আহ্বান আসে রোজ।

সেই দিন—

জন কয়েক সুন্দর যুবক বন্ধুর হাত ধরাধরি করে কুন্তলা জানি কোথায় যাচ্ছিল।

বিপরীত দিক হ'তে প্রশান্তও আস্‌ছিল তার কাজ থেকে। কুন্তলাকে দেখে সে পুলক-ডগমগ অন্তরে জয়-জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য এ'গিয়ে গেল।

আগ্রহপূর্ণ স্বরে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাচ্ছ কুন্ত? আমি তোমার বাসায় চার পাঁচদিন ঘুরে এসেছি;—একদিনও কিন্তু দেখা পাই নি।

' -এক বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে। ব্যস্ত আছি' এর চেয়ে সংক্ষেপ জবাব আসে না; তাই বল্‌তে হয় এতখানি এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেই।

মানুষ সুখের মিষ্টি স্বাদ পায়।

হয়ত ভুলে যেতে চায় দুঃখের তেঁতো স্বাদও।

প্রশান্তর বাবার দয়ায় কুন্তলা এতখানি—তাদের অধীনে চাকরী কর্‌তো। ভালবাস্‌তো প্রশান্তকে খুব।

শুধু কি মুখে মুখেই...না—মনে প্রাণেও! এখন তার আদৌ ইচ্ছে না যে একজন পরামাণিক এসে তার সাথে আলাপ করে তাকে অপদস্থ করে তার ধনী বন্ধুদের কাছে।

এমনতর অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহারে প্রশান্তর মনে দারুণ দুঃখ দেয়, কুন্তলা বলেই যে এতটা বেশী লাগে।

পরে মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেয়—যার যেমন অবস্থা তার তেমন ভাবে থাকাই যে উচিত।

গোটা কয়েক বছর কাটে—দুঃখে, সুখে। প্রশান্ত তার ব্যবসাটাকে জমিয়ে নিতে পেরেছে। ছোট্ট দোকানটা এখন বেশ একটু জমকাল হয়েছে।

শ্রীকেষ্টপুরের দোকানও উঠিয়ে ফেলা হয়েছে।

শুধু প্রশান্তর মনে একটা মস্ত দুঃখের ক্ষাপ্‌ড়ি অনবরত লেগেই আছে,—কুন্তলা যে তাকে বড়ই অবজ্ঞা করে—ওকে তো সে আর প্রাণভরে পেল না।

বুড়ো বাবা জেদ করে ছেলেকে একটী সুশ্রী পাত্রী দেখে বিয়ে দিতে।

প্রশান্ত রাজী হয় না।—

অন্তরে যার পোড়া ঘার টাটানি সব সময়ই টাটায়, তার কি আর অন্য কিছুতে সাধ থাকে!

প্রশান্তর বিয়েতে গররাজী দেখে বুড়ো বাপ অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকেন!

তবু ফল হয় না কিছুই।—

কোন সময়ের জানি একটা সকাল বেলা।—

কুয়াসাচ্ছন্ন করে রয়েছে আকাশটা।

সূর্য্য ধীর মন্থর তালে ওঠে, কুয়াসা কাটে।

কোন কাজকর্ম্ম নেই—তাই চুপ চাপ বসে আছে সব।

ডাকপিয়ন সকালের ডাক দিয়ে গেল। প্রশান্তর নামে এক পত্র।

লেখাটা দেখেই কৌতূহল বেজায় বাড়ে। তাড়াতাড়ি খাম ছিড়ে ফেলে,—আগেই নাম দেখে নিল।

...কুন্তলা।

আনন্দ-সরসঅন্তরে অতি সুস্থির ভাবে পড়ে অনেকবার। মাথায় হাত দিয়ে বসে - যেন কি দুর্ভাবনা মনেতে।

পত্রের নির্দ্দেশ মত প্রশান্ত সকাল ছ'টার ট্রেণে গেল কুন্তলার কাছে।

অনেক ঘোরা ঘুরির পর জান্‌তে পার্‌লে কুন্তলা একটা চিপা গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে থাকে।

ঢুকেই বিস্ময়ে ও বিহ্বল একেবারে অভিভূত হয়। দেখে কুন্তলা কি একটা বেদনায় যন্ত্রণায় বড়ই কোঁকাচ্ছে। নিজের মনে নিজেই ছটফট্‌ কচ্ছে। কাছে একটা কেউ নেই।

সন্ত্রস্ত পদে গিয়ে ও যেখানে শুয়েছিল সেখানে প্রশান্ত বসে।

কুন্তলা অনুভব করে কে একজন এসেছে! চোক মেলে চায়, আবার তখুনিই বুজে থাকে।

প্রশান্ত ওর কপালে নিজের হাতখানা স্থাপন করে। পরে ডাক দেয়—কুন্ত! আমি এসেছি। একী? আমি যে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি কিছুই।

কুন্তলা সাড়া দেয়না।—

খালি দু'চোক হ'তে অশ্রু গড়াতে লেগেছে অঝোরে। পরে প্রশান্তর হাতখানা চেপে ধরে রাখে।

তবু নির্ব্বাক কুন্ত। মনে হয় যেন ওর কথার ভাণ্ডার একেবারে উজার হয়ে গেছে।

এম্নি মৌনভাবে অনেকক্ষণ কাটে।—

পরে প্রশান্ত আবার রুদ্ধস্বরে ডাকে,—কুন্ত! চাও এদিকে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তুমি এমন সময় একলা কেন?

-রস যদ্দিন থাকে তদ্দিন আর বন্ধু বান্ধবের আকাল হয় না' কেঁকাতে কেঁকাতে বল্লে।

—আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তুমি এখানেই বা এলে কেন?

—হাঁ বল্‌ছি। বিনোদ মাইতি ঐ যে সহরের নাম করা ধনী মাতাল যুবকটা কারবার দেবার উছলৎ করে আমাকে আগের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। দেখাবার জন্য একটা দোকান খুল্লে।

—হুঁ তা জানি তাঁরপর!

—অনেক প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে আমার মন চুরি কর্‌লে—আমি আস্তে আস্তে উচ্ছন্নের পথে যেতে লাগ্‌লাম।

—তোমায় এখানে আনলে কে?

—তারও অতৃপ্তি লাগ্‌ল—হয়ত ঝেড়ে ফেলে দেবে দেবেই ভাব্‌ছিল- সাথে সাথে আমারও এই সাঙ্ঘাতিক রোগের সূত্রপাত হলো। হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে এনে রাখ্‌লো মাস দু'য়েক কাল। তারপর যখন ভয়ানক কঠিন হয়ে দাঁড়াল- আমিও উঠ্‌তে একেবারে অক্ষম, তখন আমায় একা ফেলে চলে গেল।

হু-হু করে আবার কান্না, সাথে সাথে খঁক খঁক করে কাশির ঠেলা—আর গল্‌ গল্‌ করে রক্তের ফিন্‌কি—মুখ দিয়ে।

খাড়াকখাড়ি এমন অসম্ভব একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে প্রশান্ত যেন ক্ষণেকের জন্য চগ্‌-ভোলা হয়ে গেল।

পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ওর শুশ্রূষায় মন দিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হলে কুন্তলা আবার বল্লে—আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে। ক্ষমা ক'রো, লক্ষ্মীটী আমার, এই দুর্ব্যবহারের জন্য।

—কেন অনর্থক আগের কথা মনে করে দুঃখ পাচ্ছ? ভাল হয়ে উঠ তুমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর।

না গো, তুমি বল—আমায় ক্ষমা কর্‌বে কিনা।

—লক্ষ্মীটী! ভালবাসার বস্তু যে সে তো সব সময়ই ক্ষমনীয়। তা ভুল করে সে যত বড় দোষই—

আর বলা হলো না। কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে কুন্তলার শীর্ণ খোলা বুকের উপর প্রশান্ত নিজের হাতখানা স্থাপন করলে, আস্তে আস্তে বুলাতেও লাগল।

কুন্তলারও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বার হ'ল।

ঘোর সন্ধ্যা।—

চৈত্রের উদাসী বাতাস জানালার সার্শিতে যেন মাথা খোঁড়ে। নিকটের মস্ত ঝাউ গাছটা বাতাসের চোটে শোঁ শোঁ করে—সাগরের সেই আকুল শোঁসানীর মতন। ঝিঁঝি পোকার দাগা দেওয়া অবিশ্রান্ত গুঞ্জরীও—

করুণতা - বুক ফাটা করুণতা

তা আরও বাড়ায় শেষকালেও কুন্তলা আকুল আকুতি কাকুতি জানিয়ে প্রশান্তর কাছে--বন্ধু, প্রাণ! অপরাধ আমার সব ক্ষমা করো—ভুলে যেও

আবার টাট্‌কা রক্ত ঝড়ে—বমির মতন কলকলিয়ে।

মেহাৎ আট পৌড়ে সাদাসিদে ভাবেই কুন্তলার জীবন তরী কোম্‌ অতলে ডুবে যায়।—

প্রশান্ত চলে যাচ্ছে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে যেন একটা লোম ওঠা সারা গায়ে চক্কর চক্কর ঘা-থাকা কেঁৎটী কুত্তা — যন্ত্রণায় সারা পথ কেঁউ কেঁউ কচ্ছে।

না চলতে পারিলেই যেন বেশ ভাল ছিল ;—অথচ না বল্লেও নয়। —

তাকে চলতে যে হবেই।—

দ্বারপণ্ডিত *

(ব্যঙ্গগীতি)

শ্রীদিলদরিয়া শর্ম্মা

তুমি, লম্বিত কর স্তম্ভিত ভুঁড়ি
ঘৃত-চপ্ চপে লুচিতে !
তব, পুষ্ট টিকীটা ঝুলে' রো'ক্ বেশ
মোহ-কালিমা-শুচিতে !
বুদ্ধিশূন্য বন্ধ্যা বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন
অকূল-গরল-পাথারে !
প্রভু, পক্ককদলী-হস্তা !
তুমি, গায়ে দিতে আগে কন্থা !

এবে, মারিতেছ মজা খেয়ে দেয়ে খুব ;
'চষ্য' পেরেছে বুঝিতে !
আছ, বিরাট্ প্রাসাদে মহাসুখ-সাধে
ফেলিতে ফাঁসাদে সবারে ;
আছ, গোপন সভায় যমদূত প্রায়,
বুঝি, "জাতি" যায়, বাবারে
আমি, কাছাটি লাগাই কসিয়া,
পাছে, সহসা পড়ে বা খসিয়া,
আগে, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
বুঝিয়া মেতেছি যুঝিতে !

সৈনিকের চিঠি।

শ্রীশান্তি চৌধুরী

প্যারী, ফ্রান্স।
সকাল ৭॥
৩০শে অক্টোবর,
১৯১৭।

প্রিয়তমা মানসী আমার !!!

এখানে এসে পৌঁছেছি। এ কয়দিন সময় হয়নি তাই লিখ্তে পারিনি। আমার সেই বন্দীরা কাল আত্মহত্যা করেছে। কি ভয়ানক ! তারা হয়ত ভেবেছিল, শত্রুর হাতে ভয়ানক নাস্তানাবুদ হতে হবে, তাই মরেছে। যেভাবে মরেছে—শিহরে উঠ্তে হয়।

ওদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে কতকগুলি দড়ি জমা ছিল। তারই কতটুকু সংগ্রহ করে রাত্তিরে ঝুলে

* কান্ত কবির "তুমি, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে"—নামক বিখ্যাত গানের সুরে গেয়।

পড়েছে। আমাদের হাতে লাঞ্ছিত অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরাই তারা শ্রেয়ঃ মনে করেছে।

আমার কবি সৈনিকের পকেটে কতকগুলো লেখা পেয়েছি। লেখাটী সত্যিই বড় সুন্দর! আমি ভেবেছিলুম বোধহয় তাঁরই জীবনের একটু কাহিনী, কিন্তু দেখ্‌লুম এ লেখা তাঁর নয়। তার নাম আমি জানি। লেখার উপরে লেখকের নাম লেখা আছে। কবির নাম 'ভিয়েন' আর লেখকের নাম 'ভ্যার্‌নার'। 'ভিয়েন' বোধহয় 'ভ্যার্‌নারের' পকেট থেকে এ লেখা সংগ্রহ করেছে। তবে একটু দুঃখ যে প্রথম বা শেষ কোনটাই নেই। মাঝের থেকে কতটুকু আছে। যে টুকু আছে বেশ সুন্দর ছাঁচে লেখা। তুমি বোধহয় খুব ব্যগ্র হচ্ছ কি আছে এতে জান্‌বার জন্য? তাই লিখ্‌লুম, ঠিক্ যে রকম লেখা পেয়েছি। তুমি পড়ে খুব আমোদ পাবে। একা আমি উপভোগ করে আমোদ পাচ্ছি না, তাই তোমাকে লিখ্‌ছি। আর তোমাকে না লিখে কি থাক্‌তে পারি?

ট্রেণ ছাড়বার বেশী দেরী ছিল না, কিন্তু তোমাকে ফুল পাঠিয়ে দেবার মতো সময়ের অভাব আমার হয়নি। 'একজিবিশন' থেকে এক থোকা 'বস্‌রাই' গোলাপ কিন্‌লুম। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে পার্‌লুম না। আরো অনেক কিন্‌বার ইচ্ছা হল। তাই 'ক্রেপান্ থেমাম,' 'ডালিয়া' এবং 'প্যান্সির' কয়েকটা থোকা তোমার নামে পাঠিয়ে ছিলুম। কিন্তু রাণী, একটা মস্ত ভুল কর্‌লুম—আমার নামের কার্ডটা গুঁজে দিতে ভুলে গেলুম।

তুমি হয়ত বুঝ্‌তে পারনি কে তোমাকে ফুল পাঠিয়েছে? এইত আমার আহাম্মকী! কার্ডটা যদি গুঁজে দিতুম্ তো নিশ্চয় আমাকে তুমি অন্ততঃ একটু ধন্যবাদও জানাতে! না না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছ, কে তোমাকে ফুল পাঠিয়েছে? যদি বুঝ্‌তে পেরে থাক তবে যতদিন না ওরা শুকিয়ে যায়, ততদিন আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

'ন্যান্সি, তুমি নাকি নার্স সেজেছ? আমি তোমাকে যা ভাব্‌তুম এখন দেখ্‌ছি তুমি তার অনেক উপরে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কি করে তুমি যুদ্ধে নাব্‌তে পেরেছ, এই হাঁসপাতালে বাসা বেঁধেছ।

তোমার সুন্দর বেশভূষা এখন কোথায় ফেলে এসেছ রাণী? আমি কোনদিন আশা করিনি যে তুমি শেষে যুদ্ধে—গোলাগুলীর মাঝে এসে দাঁড়াবে! আমি পড়াশিসের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে তোমাকেই শান্ত মমতাময়ী এবং সুন্দরী বলেই ভাব্‌তুম। নার্স হিসাবে তো কোনো দিন ভাব্‌তে পারিনি?

এই তো ডাক এলো। ভেবেছিলুম, তোমার চিঠি পাব কিন্তু নেই দেখ্‌লুম। কেন লিখ্‌লে না প্রিয়ে? জগতে আমার বল্‌তে যা আছে, সবার চেয়ে তোমার দাম আমার কাছে বেশী, সবার চেয়ে তুমি আমার কত আপন, অথচ তোমার হাতের লেখা কখনও আমি চোখে দেখিনি। এ থেকে স্পষ্টই বুঝ্‌ছি পরস্পরের কাছে আমরা কত অপরিচিত!

তোমার স্মৃতি অকস্মাৎ আমার মনে আসে—তোমার অঙ্গভঙ্গী, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা যা তখন লক্ষ্য করিনি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমাকে আমার পাশে অনুভব করছি, তোমার স্বর যেন কাণে বেজে উঠেছে, তোমার হাতখানি মুঠের মধ্যে নিয়ে যেন গার্ডেনে বসে আছি

দেখেছ কি ভেবে বসে আছি! তোমার আমার যে চিঠি লেখা চল্‌তে পারে না, তোমাকে নিয়ে বেড়ানো যে এখন আর হতে পারে না তা আমার মনেই ছিল না। এখন আমরা যে একজন আরেক জনার শত্রু?

যাক্ সে সব। আচ্ছা লক্ষ্মী, তুমি কি এই বোমার গর্জ্জনে—রাইফেলের শব্দে ভয় পাওনা? হয়ত পাও না! তুমি যে বীরত্ব নিয়ে নেমে এসেছ? বিপদের আগুন তোমার মনে আলো জ্বেলেছে।

ফ্রান্সে এটা খুব সাধারণ। পরের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া তোমাদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। মরণকে আলিঙ্গন করা তোমাদের এতটুকু অসম্ভব নয়, কিন্তু তবু তোমরা কত শান্ত! কিন্তু সবচেয়ে আমি আশ্চর্য্য হই এই ভেবে যে, তোমরা কখনও কোনো কাজে ঘুলিয়ে যাওনা। কাজে তোমরা অতিরিক্ত মুগ্ধ হয়ে যাও বলেই বোধহয় ওরকমই হয়।

আরেক কথা! তোমাদের বিশেষত্ব এই যে, তোমরা যা কর, একমনেই করে যাও। দুই দুইটী ভাব পোষণ করা তোমাদের দ্বারা হয় না সব সময় তোমাদের মনোভাব একই থাকে।

কিন্তু আমরা, জার্ম্মাণরা, সেইটাকে ঘৃণা করি, লুকাবার চেষ্টা করি। আমার কথাই ধর,—তোমাকে আমার ভালবাসার কথা জানাইনি কেন জান? পাছে তোমায় আঘাত করি বা আমি নিজে আহত হই। যদি তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে না পার, একটু করুণা কর্‌বার সুযোগ না হয়? কারণ যে যুদ্ধে যাচ্ছে, তাকে ভালবাস্‌তে হয়ত কখনও কেউ চাইবে না—তুমিও না, কেননা যদি আমি ফিরে আর না যেতে পারি, অথবা যদি ফিরে যেতেও পারি তবু কি তোমায় আঘাত করা হবে না? আমি যতদিন যুদ্ধে থাক্‌ব, ততদিন তুমি আমায় ভালবাস্‌বেই; যদি পেতে চাও, এত দিন, এত মাস এত বছর কত কষ্টে তোমার কাট্‌বে এতে তোমার বুক ভেঙে যেতে চাইবে না কি? তারপর ফিরে গেলেই তুমি ষোলআনা ভালোবাসা দিতে পার্‌বে কি? কখনই না। তখন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌বেই। এতে অনেক বেশী আঘাত করা হবে নাকি?

তারপর যদি আমি তোমাকে ভালোবাসা নিবেদন করে ব্যর্থ হতুম, তবে আমার কত কষ্ট হত? হয়ত সে আঘাতে আমার জীবনটা বয়ে যেত। তা ছাড়া তোমরা নারীরা ভালোবাস্‌তে না পার্‌লেও একটা করুণা দেখিয়ে থাক। শেষে সেই করুণাকে ভালোবাসা মনে করে জলে মর্‌তে হয়, এই ভয়েই তোমাকে কিছু বলিনি। অথচ তোমার ভাবে বিভোর হয়ে, ময়লা গর্ত্তের মধ্যে বসে এই কাগজের উপর রাশি রাশি মনোভাব ঢাল্‌ছি যার কোনো মানে নেই, উদ্দেশ্য নেই—যা একেবারেই পণ্ডশ্রম।

যুদ্ধের আগে আমি ভয়ানক খেয়ালী ছিলুম। কিন্তু এখানে এসে, সামরিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি। সাহস করে বাঁচতে এবং প্রয়োজন হলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মর্‌তে শিখেছি। বুঝ্‌তেই পার্‌ছো, তোমাকে দেখার পর থেকে আমার আগেকার সব উদ্দেশ্য কি রকম ঘুলিয়ে গেছে। মেয়েকে ভালোবাস্‌ছে অথচ ভবিষ্যতের মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছে না, তার অভাব হৃদয়ে অনুভব কর্‌বে অথচ তাকে ভাব্‌বে না—এ একেবারে অসম্ভব।

যত কিছুই বলি না কেন আর যত কিছুই ভাবি না কেন আমাদের মিলনের অভাবনীয় বৈচিত্র্যই আমাকে ভয়ানক চঞ্চল করে তুলেছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের প্রথম দেখা হল লণ্ডনে, তারপর এমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে, পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে প্যারিসে। এই আমাদের শেষ দেখা। আমরা সেইদিন বিদায় নিলুম পরস্পরের কাছে সৈনিকদলে যোগ দেব বলে।

প্রিয় আমার! আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হত্যা কর্‌ছি আর তুমি বাঁচিয়ে তুল্‌ছ। তোমার আমার স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে কোন কিছু বল্‌বার অধিকার নেই—উপায়ও নেই; কিন্তু সেই সাধারণ তুচ্ছ জীবনের আবর্জ্জনা স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বলিষ্ঠ সাহস নিয়ে মরার মধ্যেও গৌরব আছে।

আচ্ছা মণি! তুমি আমায় একটা জবাব দিবে কি? আমার জান্‌তে ভারী সাধ আছে, তুমি আমার অভাব হৃদয়ে অনুভব কর কি? কোন মেয়ে আমার জন্য ভাব্‌ছে এই কথাটা এই নিঃসঙ্গ নিরালা জীবনে বড়ই প্রীতিপদ—মনে বলের সঞ্চার করে।

ঐ দেখ কতসব অবান্তর কথা ভেবে বসে আছি! আমার মনেই ছিলনা যে আমরা দু-জনই এমন একটা কাজে হস্তক্ষেপ করেছি যা উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে নিঃসঙ্গ এবং হাল্‌কা যে স্বার্থপরতার সামান্য আঁচেই তা নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আজ সকালে সাম্‌নের লাইন থেকে ফির্‌বার পথে কামানের সারের কাছে গেলুম। আজ ঠিক্ সেই রকম দিন প্রিয়তমে, যেদিন মানুষ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশা করে।

মেঘমুক্ত আকাশ. মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুক্‌রো ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে। কাদা শুকিয়ে উঠেছে। বাতাস নবীন বসন্তের আমেজ জানাচ্ছে। এমন দিনে আমাদের দেশের লোক কত উৎসাহে, কত নূতন আশায় গার্ডেনে ছুটে যায়।

আমরা যদি একত্র থাকতুম, তো আমরাও নিশ্চয়ই যেতুম। তুমি হয়ত আমি যে পোষাকটা সবচেয়ে ভালোবাসি, যে পোষাকে তিন বৎসর আগে তোমায় আমি প্রথম দেখেছিলুম, সেই পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসতে।

দেখেছ তামাসা? আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে কোনো পুরুষকে সুখী করবার জন্য কোনো রমণীই তিনবছর আগেকার পোষাকে সজ্জিত হতে চাইবে না।

আচ্ছা প্রিয়ে! যুদ্ধটা কি রকম ভয়ানক তুমি তো দেখেছ; কিন্তু কোনো দিনই কি তুমি ভয় পাওনি? আমার কথা কি কোনো দিনই তোমার মনে হয়নি?

আমার তো তোমার কথা প্রায় সময়ই মনে হয়। আমি একেবারে মুসড়ে পড়ি, যখন কোনোদিন শুনতে পাই যে ফরাসীদের কোনো আড্ডা নষ্ট হয়েছে। আমি ভয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার নিজের সাহসী হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তুমি বিপদের সীমার মধ্যে আছ শুনতে পেলে আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠে।

একবার যখন তোমাকে প্রথম দলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হচ্ছে শুনলুম, সেবার আমার যা অবস্থা হয়েছিল, কি করে তোমাকে বুঝাব? কলজা চিরে দেখালেও তুমি বুঝতে না। কত কষ্ট হয়েছিল আমার। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে বিপুল আগ্রহে।

আমি ভয়ে শিহরে উঠেছিলুম, কারণ তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার সম্বন্ধে একবিন্দু ধারণাও তোমার নেই। তা ছাড়া জীবনে তুমি কোনোদিন কাজে হস্তক্ষেপ করনি, কেবল পোষাক পরে আর হাসিগানে ব্যস্ত থেকেই তুমি সময় কাটাতে এবং ইহাই ছিল তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রধান কাজ। তা ছাড়া প্যারিসের সমস্ত তরুণীর মধ্যে তোমাকেই মনে হয়েছিল সুন্দর ও ভঙ্গুর।

হাঁ, মনে পড়ছে তোমার সেই বিদায়কালের কথা— যা আমাকে মূক করে দিয়েছিল চিরতরে।

তোমাকে যুদ্ধে নাবতে মানা করেছিলুম বলে তুমি বলেছিলে—'তোমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের জীবনের দাম জগতে খুব কম। জগতে মেয়ের অভাব হবে না। তোমরা যদি মরবার যোগ্য বলে ছাড়া পাও, তবে আমরা কেন সে সুযোগ হতে বঞ্চিত হব?'

হে বসন্ত! যেও না কো চ'লে

শ্রীপ্রণব রায়

হে বসন্ত! যেও না কো চ'লে,
আকুল মিনতি মোর উপেক্ষায় দ'লে
নিশি-শেষে সুখ-স্বপ্নসম।
ওগো প্রিয়তম!
এই কি গো বিদায়-লগন?
স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ সুনীল গগন
পূর্ণিমার দীপালিতে গিয়াছে ভরিয়া;
রজত-নির্ঝর-শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা পড়িছে ঝরিয়া
নিখিল প্লাবিয়া
হয় নাই গীত-হারা মূক।
পরিপূর্ণ আছে আজো ধরণীর বুক
বিকশিত-যৌবন-সম্ভারে।

হে চির-তরুণ যাত্রী! কোথা যাবে—কোন্ দূর-বিস্মৃতির পারে?
কানন-নিকুঞ্জ ভরি'
আজো ফোটে মুকুল মঞ্জরী,
মুঞ্জরে কুসুম।
প্রেমিক ভ্রমর আজো এঁকে দেয় চুম্
রূপসী ফুলের রাঙা অধরের 'পরে।
মালতী মেলিছে আঁখি মৃদু লাজ ভরে;
ফোটার আনন্দ তরে হয় নি কো সারা,
গন্ধ তার হয় নি গো হারা।
এখনো পড়ে নি ঝরে বিবশ বকুল।
সৌরভ-আকুল
পথ-ভোলা সমীরণ তুলিছে মর্ম্মর
ব্যাকুলিয়া বনের অন্তর।

সুন্দর পথিক ওগো! এলে যদি যেও না কো আর।
তরুণী প্রিয়ার
আঁখিদুটি ভরা আজো স্বপ্ন-সুষমায়;
গোলাপের রাগ-রক্তিমায়—
রঙিন্ কপোল তার হয় নি গো ম্লান।
মোটে নাই সাধ আজো, তৃষাতুর অতৃপ্ত পরাণ
প্রণয়-বিধুরা
প্রিয়ার চুম্বনে আজো ভরা আছে আবেশের সুরা।
আজি এ জ্যোৎস্নাময়ী মিলন-নিশায়
হে নিঠুর! চেয়ো না বিদায়—

বিক্রমপুরের পুরাণকথা

শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বাংলার প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগণের বংশ লইয়া বাংলার ব্রাহ্মণসমাজ।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ আদিশূরের রাজত্বসময়ে বাংলা দেশে সদাচার বাক্‌সিদ্ধ সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল।

৯৪২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হয়, যথা—

"শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্ট নারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষো হথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠো হথ ছান্দড়ঃ
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেগেগর্গে হথ যাবর্নো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥"

কিম্বদন্তী শুনা যায় রামপালের নিকটস্থ যে পঞ্চসার গ্রাম বিদ্যমান আছে তাহাই নাকি পঞ্চ গ্রামের নামান্তর।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজপ্রদত্ত পাঁচখানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে যাগ যজ্ঞ সাগ্নিক ক্রিয়াদ্বারা মহারাজের অভিপ্রেয় পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করেন। এমন সময় মহারাজ আদিশূর মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় কন্যা রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী বাংলার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। বিপ্রগণ রাজকুমারীর সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ যাগ আরম্ভ করিলেন, কিছুদিন পরে রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভেই মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের জন্ম হয়। কিশোর অবস্থায় লক্ষ্মীদেবী স্বীয় পুত্রকে কয়েক বৎসরের জন্য বিপ্র-গণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োগ করেন, তৎপর সাবালকত্ব প্রাপ্তে আদিশূরের ওয়ারিস সূত্রে দৌহিত্র বল্লাল সেন রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কন্যাকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হন্। তিনি আরো বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টী সন্তান জন্মিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সীমা বিভাগ নাই। সে সময় সারা বাংলায় বৌদ্ধবিপ্লব প্রভাবে বাংলার আদি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বৈদিক, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে সে সময় কোন সমাজের নাম শুনা যায় নাই। তাহাদের সামাজিকতা ও ছিল কি না সন্দেহ? সে সময় তাহারা নিজ নিজ সংসার ও ভোগ বিলাসে রত ছিলেন। মহারাজ একদিন বিপ্রগণকে আনিয়া বংশ বিস্তার এবং তদীয় মাতামহের যশঃমান গৌরব রক্ষার জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া ৫৯ জন সন্তানের প্রত্যেককে সুখে বসবাস করিবার জন্য রাঢ় দেশে একখানা করিয়া গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া ৫৯ খানা গ্রাম দেওয়া হয়। মোটের উপর পঞ্চ ব্রাহ্মণই এদেশবাসী বর্ত্তমান "রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ বলা যায়। বিক্রমপুরের গৌরব কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণসম্বন্ধে আর বিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মনে করিয়া বিক্রমপুর সম্মিলনের অধিবেশন এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ নিয়া একটু পুরাতন সাহিত্য কথার অবতারণা করিব। বিক্রমপুরের পুরাতন ভিন্ন নূতন লিখিবার কিছুই নাই। বিক্রমপুর সম্মিলন উপলক্ষ্যে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিরচিত আবাহন কবিতাটি চিরদিনের মত বিক্রমপুরের তরুণ যুবক-গণের মনে উদ্দীপনা জাগাইয়া দিবে।

(১)

স্বস্তি, স্বাগত, বিবুধ বৃন্দ, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, বীর।
স্বাগত, স্বাগত, স্বস্তি, স্বাগত, উজল আজি গো যার কুটীর,
ভুলেছ সবে এইত সে দেশ, আদিশূর যার রাখিল মান,
পুণ্য তটের দ্বিজের তনয় ধর্ম্ম যাহারে করিল দান?
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ?

(২)

চক্র ধরিয়া ভিক্ষু যথায়, মুক্তি-মন্ত্র করিল দান,
সুগত নিরত, ভারত-বিদিত, পুত্র যাহার যতি শ্রীজ্ঞান;
সাগর-মুকুরে বদন হেরিত, যেই সমতট, এই সে দেশ
তড়াগে, দেউলে, সৌধে, শিবিরে, ধারণ করিয়া মোহন বেশ;
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিতার শেষ—
খ্যাতি যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ—।

(৩)

কৃপাণ যাহার শক্তি ঘোষিল, কামান যাহার গাহিল জয়
লীলায় নাচিল সমর তরণী মেঘনার বুকে অকুতোভয়?
হর হর বলি বম্ বম্ বম্, ধাইল যাহার তনয়বীর—
বিজয়-শোভিত, পালপূজিত, কেদার সেবিত পুণ্যতীর;
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ।

(৪)

বিদ্যার ভাতি কুন্দ ধরায় ঘোষিল যেথায় বঙ্গে আর
মাল্য পরা'লো কণ্ঠে যাহার, বয়ন শিল্পকলা কুমার—
এই সে ধরণী, বল্লাল-জননী, বিজয় বাহিনী বিপুল যার
ধনের মানের যশের স্মৃতিটী বহিছে আজিও ভীতরে তার,—
দেখ একবার, দেখ একবার হত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার, কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ?

(৫)

এস হে সৌম্য, এস হে শান্ত, বন্দি' সবারে আজি যেথায়,—
এখনো যাহার কীর্ত্তি অপার রয়েছে মিশিয়া ধূলি কণায়;
সম্পদ যার বক্ষে ধরিয়া গরবে পদ্মা বহিছে সে,
সিংহ দুয়ারে রথী বসা'য়ে ভীম দরশন মেঘনাদে.
দেখ একবার এই সে তোমার হত গরিমার চিতার শেষ—
দেবী তোমার, সাধ না তোমার, স্বর্গ তোমার, তোমার দেশ।

ভারতের বরেণ্য আচার্য্য বসু জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি এই বিক্রমপুরের বসু বংশে। এইবংশ বিক্রমপুরের একটী প্রাচীন বংশ—সেই বংশে তাহার জন্ম।

(ক্রমশঃ)



শ্রীগীর্ব্বাণ

উড়োখই। ফাল্গুনের সংখ্যা এই প্রথম আমরা পাইলাম। 'উড়োখই' যখন গোবিন্দায় নমঃ—ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত, তখন ইহার দীর্ঘজীবনলাভ অবশ্যম্ভাবী। 'অশ্রু' ও 'মুস্কিল আসান' কবিতা মন্দ হয় নাই। আশুতোষ সান্যাল মহাশয় গল্প ও পদ্য লেখক; তাহার 'বাগ্দীর মেয়ে'—'পদ্ম,' 'বুকের আগুন' নিয়া জলে ডুবিয়া মরিল; হিন্দু সমাজের বন্ধন যখন কড়াকড়ি ভাবে আছেই, তখন নিজের ছেলেকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করিয়া বাগ্দীর মেয়েকে জলে ডোবান আশুবাবুর পক্ষে ঠিক হয় নাই। 'আমেরিকায়' লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং 'অনুপরমানুর কথা' প্রবন্ধগুলি গবেষণামূলক ও সাময়িক।

সবুজপল্লী। পল্লীসেবা সমিতির মুখপত্র। আমরা ফাল্গুনের মাসিক সাদরে গ্রহণ করিলাম। মাসিক পত্রখানা পল্লীতেই জন্মিয়াছে। যদিও দুই ফর্ম্মা কাগজ, তবু পড়িবার বিষয় আছে। কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবের "একখানি পত্র" পাঠ করা প্রত্যেক উদীয়মান সাহিত্যিকেরই উচিত বলিয়া মনে করি। "সেদিন বলিয়াছিলাম, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বীর্য্যবন্ত চিত্ত চাই, যে চিত্ত সত্যকে নিজে উপলব্ধি করবার জন্য অকুতোভয়ে দাঁড়ায়" ইত্যাদি পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম। বাংলা সাহিত্য কাজী সাহেবের নিকট অনেক আশা করে। "স্বপ্নসঙ্গিনী" কবিতাটী বিদ্রোহী কবির ঢংএ গাথা। মন্দ হয় নাই। 'তবু কই'—হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রচেষ্টা,—সাধু!

সৌরভ। ফাল্গুনের হাওয়ায় 'সৌরভের' কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারের 'স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ', 'বাঙ্গালার লেখক' ও 'উপবাসতত্ত্বাবশিষ্ঠ' প্রবন্ধগুলির মূল্য আছে। ইহাতে সমাজের অনেক উন্নতি সাধন করিবে।

নবমিলন। পৌষ মাসের 'নবমিলন' পাইলাম। সকল লেখকের গল্পই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এ সুরের যে অন্ত কোথায়, কে জানে! "বাসন্তী রংএর শাড়ীতে পরিপূর্ণ যৌবন আঁটেনা। বুকের আঁচল বারবার খসে পড়ে।" সংযমের বাঁধন না থাকিলে এরূপ নগ্ন পঙ্কিল ভাব লইয়া সাহিত্য বেশী দিন বাঁচিবে না।

শ্রীপ্রণব রায় এক মুরগী দুইবার জবাই করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সচিত্র শিশিরে" যে 'অবেলার অভিসার' 'খোলার ঘর' খানিতে,—পৌষ মাসের "নব মিলনে" 'বেজাত পাড়া'র "কোঠাবাড়ীতে" "বহুদিন হোল কোন্ ফাল্গুনে"—সেই "মুক্তো" আর "অবনীর" মিলন। গল্প বা প্রবন্ধের অভাব হইলেই কি একটী গল্পকে নাম ভাড়াইয়া সম্পাদককে ছাপিতে হইবে? ক্ষেত্রবাবুর তিনটা, সত্যেন্দ্র নাথের একটা —আর না হয় হরেন্দ্র বাবু একটা লিখিয়াই দিতেন! তবু প্রণব রায়ের উপর জুলুম না করিলেই হইত।

পাততাড়ি। পূজার সংখ্যা, ১৩৩৪। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

"পাততাড়ি" নাম পড়িয়াই "তাড়ি বগলে ছেলের

দলে, পাঠশালাতে যায়" কবিতাটী মনে পড়িল। কিন্তু আগাগোড়া ঘাটিয়া দেখিলাম যে, গদাধর তাড়ি বগলে নিয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। শিশুর পক্ষে কঠিন। ৺ সুকুমার রায়ের গাড়ির "সন্দেশ" ফুরিয়ে যাওয়ার পর, তেমন আরও একটা কিছু হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা ভবিষ্যতে "ভাল" করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আমরাও সেই ভরসায় রহিলাম।

কল্যাণের পথ—শ্রীবিজয় কান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ||০ আনা।

গ্রন্থকার ব্রহ্মচর্য্যকেই কল্যাণের একমাত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং জনৈক ব্রহ্মচারীর লিখিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যে আচরণ বা নীতিপালন করিলে স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতিঃদ্বারা তমসাচ্ছন্ন দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া নিজকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সন্তানদের মুখে 'বন্দেমাতরম্ বাণী' বাহির করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কামকে দমন করিতে হইলে মাতৃজাতিকে মা ও পুরুষকে সন্তান হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। মানবজীবনের চরম উন্নতির উপায় নির্দ্দেশকে আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার জাতির ও সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা খুবই আছে, পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। কিন্তু এই থাকাটা ছেলেদের স্কুলপাঠ্য রূপে সজী থাকিলে অনেকটা কাজ সহজ হইত। গ্রন্থকারের এই কাঞ্চন, কাঁচের সংস্পর্শে গেলেও মরকতমণির দীপ্তি ধারণ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শনিবারের চিঠি। চৈত্র, ১৩৩৪। প্রবীণ বা তরুণ লেখকমাত্রেই শনিঠাকুরের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। তবে তাঁহারা, 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' মনে করিয়া শনিবারের চিঠিখানা Waste paper basketএ ফেলিয়া নিজের কাজে ব্যস্ত।

'প্রগতির' সম্পাদক "বিনীতভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে" গিয়া শনিঠাকুরের "কাণমলা" খাইয়াছেন। কি সভ্যতা! এই কি সাহিত্যের সমালোচনা! পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

"তুমি অধম তা বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন" এই মহাজন বাক্যটীও কি সম্পাদক ভুলিয়া গিয়াছেন?



বাঙ্গালীর বীরত্ব

বাঙ্গালাদেশের অবস্থা

১২০০—১৪০০খৃঃ

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সরকার বি, এ, সাহিত্যভারতী

"দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরভারতে গৃহকলহের যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া আজমীঢ়ের চৌহান ও কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজভবন বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা অচিরে উভয়েরই কীর্ত্তিসৌধ বিচূর্ণিত করিয়া চৌহান-গাহড়বালকুলের সমাধিস্তম্ভ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে ঝটিকায় ভারতের সিংহদ্বার ধ্বসিয়া গেল, সেই মুক্তপথে সানুচর মহম্মদ ঘোরী এবং মধ্য এশিয়ার মরুময় মালভূমির তুরস্ক-অধিবাসীবৃন্দ প্রচণ্ডবেগে ভারতে প্রবেশ করিল।"

মহম্মদ ঘোরী যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন কনৌজে জয়চন্দ্র এবং দিল্লী ও আজমীঢ়ে পৃথ্বীরাজ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই রাজপুত। রাজপুতগণ একতায় বদ্ধ হইতে পারিলে অনায়াসে তুর্কীবীরকে ভারত হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উক্ত রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে এমন প্রবল বিরোধ ছিল যে, একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইল। যেহেতু পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে তাহারই অভিপ্রায়মতে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, জয়চন্দ্র এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, মুসলমানগণকে আহ্বান করেন। ফলে, পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর তিরৌরী নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। ইহাতে মহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১১৯৩ খৃঃ) পুনরায় ভারত আক্রমণপূর্ব্বক পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ইহার ছয় বৎসর মধ্যে মুসলমানগণ ক্রমে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্তই জয় করিয়া লইল। তিরৌরীর যুদ্ধে হিন্দুর গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল।

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন বঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন মহারাজ লক্ষ্মণসেন বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গালীর বাহুতে তখনো শক্তি ছিল,তাহার শৌর্য্য ছিল, সাহস ছিল,ধনবল জনবলের অভাব ছিল না। বাঙ্গালী তখনও ব্যায়ামে বিমুখ ছিল না, অস্ত্রচালনায় অপটু ছিল না, যুদ্ধব্যবসায়ে হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত না।

পাঠানাগমনকালে বাঙ্গালীর বল

বঙ্গসৈন্য পাঠানগণকে পুনঃপুনঃ রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করিয়াছে। তোঘন খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বঙ্গসৈন্যের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন। দিল্লীর সম্রাটের সুশিক্ষিত পাঠানসেনা—যাহারা জয় ভিন্ন পরাজয় জানিত না—তাহারা উড়িষ্যার কৃষকসেনার নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া দুইশত ক্রোশ পর্য্যন্ত হাটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত সম্রাট্ পুনরায় বহু সেনা প্রেরণ করেন, কিন্তু বিজয়ী বঙ্গসেনার বাহুবলের নিকট বাত্যাতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া গেল।

তোঘন খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরেও পাঠানসেনা পূর্ব্ববৎ পরাজয় লাভ করিয়া উড়িষ্যার সীমা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উড়িষ্যার বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়গণের নিকট পাঠানের পরাজয়ের ও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। তিন শত বর্ষ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়গণ সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়গণ তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।"

বঙ্গের হিন্দুসমাজ ও রাজনীতি

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেহান্তের পর হইতেই বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশ ঘোর কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। "বিচারালয় তখন মর্য্যাদাশূন্য, অমাত্যবর্গ রাজার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাশূন্য, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয়া মহিষী বল্লভাদেবী এবং রাজ-শ্যালক কুমারদত্তের আচরণে প্রজাগণ তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাকিতেছে।" হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি বঙ্গের রাজভবনে বাসুকীর তপ্তশ্বাস প্রবাহিত করিতেছে, ক্ষুদ্র তখন আপনার স্থান বিস্মৃত হইয়াছে, বৃহৎ তখন আপন অস্ত্রে আপনাকেই কাটিয়া খর্ব্ব করিতেছে।

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের বঙ্গে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত সেন-সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হইতেছিল। গৌড়বঙ্গ ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকায় বহিঃশত্রুকে বাধা দিবার জন্য বঙ্গের মিলিত শক্তি অগ্রসর হয় নাই।

বঙ্গের সামাজিক অবস্থাও তখন অতি নিম্নস্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গসমাজে ছিল ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা ধর্ম্মের নামে উহার পত্রপল্লববহুল শাখাপ্রশাখার বিস্তার, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা এবং আরক্তচক্ষু সমাজের নিষ্ঠুর অনুদারতা। "বঙ্গের হিন্দু-সমাজ সেকালে এতই সূক্ষ্ম সূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, উহা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করিতে পারিত না। কোন মুসলমান একজন হিন্দুর মুখে এক বিন্দু বারি নিক্ষেপ করিলেই সে সমাজচ্যুত হইত। শেষে এমন হইয়াছিল যে একজন মগের সামান্য স্পর্শত দূরের কথা, কোন মগ বা ফিরিঙ্গীর সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলেই হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া একজন মগ হাটিয়া গেলেই হিন্দু জাতি-চ্যুত হইত।... সুতরাং পাঠানশাসন-সময়ে করতোয়ার পূর্ব্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিই ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। আর্য্যগণ সমাজের তাড়নায় ও অনার্য্যগণ সমাজের ঘৃণায় পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।" *

সমাজের অত্যাচার যখন চরমে উঠিল, তখন উৎপীড়িত ও বিপন্ন অধিবাসিগণ 'যবন-রূপী' ধর্ম্মের আগমনে পরম পুলকিত হইল। এমন কি দেবগণ পর্য্যন্ত

"সভে হয়্যা একমন আনন্দেতে পরিল ইজার।"

রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ।

অনুদার সমাজের কঠিন ব্যবস্থায় বঙ্গের সর্ব্বনাশ হইল, জনশক্তি হ্রাস পাইল, জনসাধারণের সহানুভূতি লুপ্ত হইল, বঙ্গের প্রভুশক্তি কম্পিত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার পাঠানের রাজপতাকা বহন করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেন-বংশের শেষ প্রদীপ বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন পাঠানের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা তুরস্কদিগকে নানাস্থানে পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু দেশ শত্রুমুক্ত হইল না। শেষে এমন এক দিন আসিল যখন "সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।...... গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল, আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল, কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদী-তরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল।" †

* বিভারিজ সাহেব বলেন, "The low-caste Hindus were generally glad to change a religion of degradation for one which gave them indepen-dence and self-respect."

† বিবিধ প্রসঙ্গ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে ভাগীরথী-গর্ভে নামিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া তখন এক বিপুল রণ-নিনাদ সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল—"দীন্! দীন্!!"

পাঠানের প্রবল বন্যা বঙ্গভূমি প্লাবিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পাঠানগণ মগধের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিল। মগধ-জনপদবাসিগণ পূর্ব্বেই আত্মরক্ষার জন্য ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। পাঠানেরা দেখিল তথায় জন নাই, ধন নাই—আছে কেবল রাশি রাশি বৌদ্ধ গ্রন্থ। তাহারা সে সকল অমূল্য গ্রন্থ অনলে ভস্মীভূত করিল—কত শত বর্ষের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার মুহূর্ত্তে ধরাতল হইতে লুপ্ত হইল। "পুষ্য-মিত্রের হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল শঙ্করের চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব ভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—মুসলমান আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞানবৃদ্ধি হইল, শিল্পবৃদ্ধি হইল, ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাঙ্গালারই হইয়া গেল।" *

পাঠানেরা দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মগধ, অঙ্গ ও গৌড় সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল। বঙ্গে তখনো শৌর্য্যের অভাব ছিল না। বক্তিয়ার নবদ্বীপ বা বঙ্গের কোন অংশ স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হন নাই, উহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন মাত্র।

লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের অষ্ট বর্ষ পরেও তাঁহার বংশধরগণ দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন নরপতিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তখনো তাঁহাদের হয়, হস্তী, রণতরী ও সেনা ছিল। যেমন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে, তেমনি কামরূপে, আসামে ও ত্রিপুরায়, তেমনি উড়িষ্যায় পাঠানসেনা প্রবেশাধিকার পায় নাই। "সুদীর্ঘ শাসন কালের মধ্যে পাঠানগণ তখনো পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে প্রবেশ করিতে পারে নাই, দক্ষিণে সুন্দরবন প্রদেশ হিন্দুরাজ অধিনে ছিল। ত্রিপুরায় ত্রিসীমানায় পাঠানপতাকা উড্ডীন হইতে পারে নাই, বরং ত্রিপুরারাজই মধ্যে মধ্যে পাঠানের গৌড়জনপদ আক্রমণ করিয়া সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।"

হিন্দুসৈন্য কখনও দুর্ব্বলহস্তে অস্ত্র ধারণ করে নাই। তাহারা রণনৈপুণ্যে ও যোধশক্তিতে গরীয়ান্ ছিল; তাহারা পদে পদে আততায়ী সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিল। "আরব দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছেন, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীর অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। * * * আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মোহাম্মদের মৃত্যুর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, ও তুর্কীস্থান অষ্টাদশ বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।" * কিন্তু তিন শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই।

১০১৬ খৃঃ তুর্কীজাতীয় মুসলমানগণ পুনরায় ভারতাধিকারের চেষ্টা পায়। কিন্তু পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ ব্যতীত আর কোন স্থানেই তাহাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "আরব্যেরা যেরূপ বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুর্কীরাও তদ্রূপ। * * * তুর্কীদিগের প্রথম ভারতআক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করে, তাহারা আরব্য বা তুর্কীস্থানীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুর্কীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুর্কী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্নপারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।" †

ভারতবিখ্যাত হিন্দুসাম্রাজ্য বিচূর্ণিত হইল বটে, কিন্তু পাঠানগণ তিনশত বৎসরেও বঙ্গজয়ে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু রাজন্যগণ বহুকাল স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বাহুবলই তাহার কারণ।

‡ "সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশলাভপূর্ব্বক ভারতাধিকারের

* সভাপতির সম্বোধন ১৩২১—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
† ভারত কলঙ্ক—বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
‡ আইন-ই-আকবরী।

চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হূণ, আরব্য, তুর্কী সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরের স্বল্প প্রদেশ কিছুদিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই তাহার কারণ, সন্দেহ নাই, অন্যকারণ দেখা যায় না।" *

বাঙ্গালী হিন্দুরা তখন সুখসুপ্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যায় নাই নিশ্চয়। পাঠানের রণভেরী যেদিন দিক্ প্রকম্পিত করিয়া উত্তর ভারতে বাজিয়া উঠিল,সে দিন বাঙ্গালীও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী রণজয়ে বা রাজ্যবিজয়ে, আক্রমণে বা আত্মরক্ষায় বাঙ্গালার তথা ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বীয় গৌরবস্তম্ভ প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পাঠান যে সময় উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তখনো বাঙ্গালার অধিকাংশই বাঙ্গালীর স্বাধিকারে ছিল। বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ তখন আবশ্যক হইলে ৮০১১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ২৬০ কামান ও ৪৪০০ রণতরী দিতে পারিতেন † প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সমবেত শক্তি ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে স্ব স্ব প্রধান ভূস্বামিগণ একত্র হইয়া বহিঃ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে যত্নবান্ হইলেন না। তাঁহারা একথা ভাবেন নাই যে "ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরেও একটা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার আকাশ ছিল, একথা ভাবেন নাই যে, ক্ষুদ্র একটী জনপদের কীর্ত্তিমণ্ডিত জয়স্তম্ভের স্থানে একটী সমগ্র দেশের বৃহত্তর মহত্তর অতুল কীর্ত্তিমন্দির বাঙ্গালীরই অঙ্গুলিস্পর্শে বিরাট ব্যোমপথে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য শশাঙ্কের কাল হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল।" কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয়তার অভাবই তাহার জাতীয় জীবনসৃষ্টির পরিপন্থী। বাঙ্গালার কিসের অভাব ছিল? কিসের দৈন্যে বাঙ্গালী চিরপদদলিত? ব্যক্তিবিশেষের বীরত্বেও বাঙ্গালার ইতিহাস সমুজ্জল, গৌড়ভুজঙ্গ শশাঙ্ক, সম্রাট ধর্ম্মপাল, দেবপাল বাঙ্গালীর গৌরব সন্দেহ নাই; কটাসেন, একডালা মান্দারণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর শৌর্য্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত, চাঁদ, কেদার, প্রতাপ, সীতারাম প্রভৃতির সিংহগর্জ্জনে দিল্লীর সিংহাসনও একদিন প্রকম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু এত থাকৃতেও কোন দিন একটী বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার আকাশ পায় নাই। কেহই বাঙ্গালীকে একটি জাতিরূপে গঠন করিবার চেষ্টা করে নাই। সিংহাসনের লোভে নিয়ত সমরকোলাহলে লিপ্ত থাকিয়া দুর্দ্ধর্ষ পাঠান জাতি গৌড়ে আসিয়া সেকথা ভাবিয়া দেখে নাই, বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া বাঙ্গালার মোগল তাহা বুঝে নাই।" *

পাঠানের আক্রমণে কিরূপে হিন্দুস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—

হিন্দুরাজন্যগণের "ঐক্য অবলম্বন করিয়া সম্মিলিত ভাবে অস্ত্রধারণ করিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। তৎকালে সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীমধ্যে সর্ব্বক্ষণ ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রজ্বলিত ছিল। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের ধ্বংসসাধনজন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। মোসলমান আততায়ীয়া ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে রাজন্যগণ কদাচিৎ সম্মিলিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীর বিপুল সৈন্যবল ছিল। কিন্তু এই কারণে সে সৈন্যবল অবশেষে বৃথা হইয়াছিল। তারপর ভারতের জনসাধারণ কখনও মোসলমানের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় নাই। কেবলমাত্র রাজন্যবর্গই ক্ষাত্রধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রতিপালনজন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে কখনও হিন্দু প্রজাকে বিচলিত করিতে পারিত না; তাহারা কেবল আপন আপন ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই যত্ন করিত, এবং উহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। রাজার পরিবর্ত্তনে হিন্দুপ্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজার বশ্যতা স্বীকার করিত।" ‡

* ভারত কলঙ্ক—বঙ্কিম। ‡ বিবিধ প্রবন্ধ—ঐ

† ৺রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত 'পাঠান রাজবৃত্তের' অবতরণিকা।

‡ বাঙ্গালীর বল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য।



দেশের অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। লোকের আয় নাই, অথচ খরচ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে দিন যাপন করিতেছে এবং কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। চারিদিকে হাহাকার, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্ন নাই। দিন দিন বুভুক্ষিতের চীৎকার, মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপে ভারতের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে। রোগ, শোক, জরা ভারতবাসীর দীন কুটীরে ঘর বাঁধিয়াছে। অভাগী ভারতের মুখের পানে চাহিয়া জড়হৃদয় পাষাণও গলিয়া যায়, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চিরবর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। আজিও উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান আমাদের চরণগুলি কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয় কাঁদে না, অত্যাচার-পীড়িত ভ্রাতার ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে। যে কৃষককুল দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহাদের শতকোটীর হাহাকার চীৎকারে বিলাসব্যসনলিপ্ত ধনীর আমোদে ব্যাঘাত ঘটে না।

ভারতের এ দশা চিরদিন ছিল না। এমন একদিন ছিল, যখন ভারতের স্বার্থ বিদেশী বণিকৃগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের সৃষ্টি করিত। তখন ভারত স্বাধীন ছিল, ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্য অবাধে চলিত—বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের, দেশের অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিত। তখন কামার কুমারের কাজ করিত না, জোলা তাঁতিরা জমিকর্ষণ করিয়া, বলদের ঘাস যোগাইয়া দিন কাটাইত না। ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম ফেলিয়া রাজদরবারে 'হা চাকুরী, হা চাকুরী' বলিয়া ঘুরিত না, ক্ষত্রিয় অসি ফেলিয়া মসী ধরিত না, বৈশ্য ব্যবসায় ফেলিয়া চাকুরীর জন্য ঘুরিত না। এখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, কাহাকে মারিয়া কে খাইবে সে জন্য ছুটাছুটী। এদিকে ভারতের অর্থ-শোষণ হইতে লাগিল, ভারতবাসী নিষ্কাসিত-রস ইক্ষুর ছোব্ড়া হইতেও অধিকতর শুষ্ক হইয়াছে। বলিতে গেলে ভারতবাসী রক্তমাংসবিহীন কঙ্কালসম জীব মাত্র।

স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী ১৮৭২ সালে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় জনপ্রতি ২০৲ টাকা মাত্র। লর্ড ক্রোমার বলিয়াছেন, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় সম্প্রতি ২৭৲ টাকার অনধিক। ১৯০০ ডিগ্‌বী সাহেব দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীর জনপ্রতি আয় ছিল ১৮৫০ সালে মাত্র ৩০৲ টাকা, ১৮২২ সালে ২২৷৷০ টাকা এবং ১৯০০ সালে ১১৷০ টাকা। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন যে ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা। ১৯০০ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসরের গড় নিলে পাওয়া যায় ভারতবাসীর জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ৪৪৷৷০ টাকা।

এই ত ভারতের অবস্থা। তার মধ্যে দেশের অর্থের তিন ভাগের এক ভাগেরও অধিক অর্থ ভোগ করেন শতকরা ৫ জন। শতকরা ৩৫ জন ভোগ করেন উক্ত ধনের ৩ ভাগের এক ভাগেরও অধিক অর্থাৎ এই উভয় শ্রেণীর লোক বা শতকরা ৪০ জন ভোগ করেন অর্থের ১০০ ভাগের ৭০ ভাগ। বাকী শতকরা ৬০ জন ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ মাত্র ভোগ করেন। ভারতের লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ধরিলে বুঝা যায় যে ১০০ ভাগের ৬০ ভাগ লোক অর্থের অভাবে কতই না ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ভারতের লোকের আয় এত অল্প যে প্রত্যেক তিন জনের মধ্যে দুই জন মাত্র অতি অপকৃষ্ট রকমের আহার দিনে পাইতে পারে এবং যদি শরীররক্ষার্থে

দিনে ৩ বার আহার করে, তাহা হইলে কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকিতে হয়, আশ্রয়ের অভাবে গাছতলায় বাস করিতে হয়। ভারতের অবস্থা এই মাত্র বলিলেই বুঝা যাইবে যে ইংরাজশাসনের প্রায় পৌণে দুইশত বর্ষমধ্যে ভারতে প্রায় দুই কুড়ি বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশ করিয়াছে।

এজন্য সরকারকে বা অপর কাহাকেও দায়ী করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান জগতে might is right নীতির অনুসরণ করা হইতেছে, সবলের অধিষ্ঠান এবং দুর্ব্বলের নির্ব্বাণ সে নিয়মে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না কালের মহাযাত্রার পথে সকলকে নিজ সম্বল বহন করিয়া নিতে হইবে। আমাদের মনের দৃঢ়তা থাকিলে আমরা নিজেরাই মুক্তির পথ আবিষ্কার করিতে পারি, এবং কেহই ইহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইবে না—সকল বাধা বিঘ্ন ধূলির মত উড়িয়া যাইবে।

এজন্য দৃঢ় পণ ও কঠোর অধ্যবসায় আবশ্যক। পশ্চাতে ভারতের গৌরবময় অতীতের দিকে এক চক্ষু রাখিয়া ভবিষ্যতের নবীন ভারত গঠিত করিতে হইবে। আমাদের চরিত্রদোষেই আমরা পশুত্ব লাভ করিয়াছি। সে সব দোষ বিদূরিত করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমরা গরীব, ক্ষুধায় অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, অথচ ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা করিতে আমরা পিছু-পা হইনা। আমরা মায়ের পেটের ভাইয়ে ভাইয়ে, গ্রামবাসী ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি, তারপর বিষয় সম্পত্তি বাঁধা দিয়া ১০।১২ ক্রোশ পথ হাটিয়া বা রেল কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর বৃকোদর পূর্ণ করিয়া আদালতে মোকদ্দমা করিতে যাই। হায়রে দুর্ভাগ্য! সেখানে কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা, কত অবিচার! দুই পক্ষেই সর্ব্বস্বান্ত হই, তবু চক্ষু ফোটে না। আমরা ইচ্ছা করিলেই এ সকল নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি। হায়! আমাদের কি স্মরণ আছে 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।'

এখনও দেশে বহু অর্থ আছে। দেশের ধনী সম্প্রদায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলে এখনও দেশের দুরবস্থা অপনোদিত হইয়া ভারতবাসীর হাস্য-মণ্ডিত মুখ বিকশিত হইতে পারে। আমরা বলিতেছি না যে সে অর্থ দয়া দাক্ষিণ্যদ্বারা দেশের দারিদ্র্য মোচন কর বা দুঃখীর দুঃখ দূর কর। আমাদের বক্তব্য এই যে ব্যবসায় বাণিজ্য বিনা দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য চাই টাকা। টাকা ছাড়া উহা চলিতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন, বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে নিপুণতার অভাব এবং 'বঙ্গলক্ষ্মীর' মত প্রকাণ্ড ও দেশের হিতজনক যৌথ কারবার যখন 'পটল' তুলিতে পারে, তখন বাঙ্গালীদ্বারা এ কাজ হইতে পারে না। আমরা বলি হইতে পারে বিশ্বাসের অভাব হইলে স্বতন্ত্র কারবার করিয়া। নিজ নিজ কারবারে উপযুক্ত দক্ষ লোক রাখিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে বহু কারবার চলিতে পারে এবং দেশে এমন অনেক ধনী আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তদ্দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। আমরা জানি, ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সুদের লোভে দেশের অর্থ শোষণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার অচিরে ফাঁপাইয়া তোলেন। কিন্তু ইহাতে দেশের দুঃখ দূর হয় না, দারিদ্র্যের নিষ্পত্তি হয় না। বরং দিন দিন ইহার কুফল দেখা যাইতেছে। নানাস্থানে অপারগ অধমর্ণগণ সংঘবদ্ধ হইয়া ঋণ অস্বীকার করে। ইহাতে মহাজনগণের সময় সময় নানা বিপত্তি ঘটে। বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, বুভুক্ষু কৃষকগণ নিরুপায় হইয়া, অন্নবস্ত্রের অভাবে মরিয়া হইয়া উঠিবে। তখন কাহারও সাধ্য হইবে না সে জনস্রোতের গতি নিরোধ করে। এখন হইতে দেশের হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, তৎপ্রতীকারে উদ্যম না করিলে দেশের আরো যে কত অশান্তি ঘটিবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

Printed by Radha Ballave Bısak, at the Narayan Machine Press, Dacca and
(Published by S. M. Sen Roy, Narayanganj.)

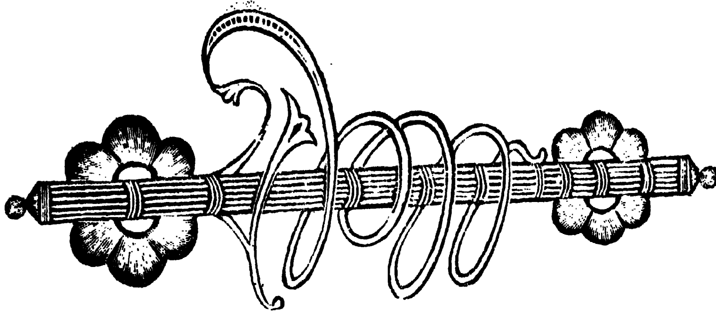


"বধূ"

"[illegible]—

[illegible]" —রবীন্দ্রনাথ

[illegible]



তৃতীয় বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৫। [৮ম সংখ্যা

বৈশাখবরণ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

ধন্য দাতা পুণ্যচেতা হে বিশাখারাজ,
তোমায় আজি কর্‌তে বরণ,
পাইনে খুঁজে উপকরণ,
নিঃস্ব আমি এনেছি মন্‌—অঞ্জলিতে লাজ।

তুমি দেছ পাখীর কূজন জুড়ায় তাহে কাণ,
দিলে—ফলের সুরস রসনারে,
ফুলের সুবাস নাসিকারে
মধুর ছায়া শীতল হাওয়া স্পর্শে জুড়ায় প্রাণ।
বনবাগানে রঙ্গীন ক'রে দিলে আঁখির ভোজ,
দানে—ইন্দ্রিয় কেউ যায়নি বাকী,
ফুটাইলে মনের আঁখি,
* রবির জনম দিলে, জ্ঞানের আলো যোগায় রোজ।

কি দিবে আর অশ্রু যাহার কেবলি সম্বল।
ঝরুক তাহাই তোমার পায়ে,
তুলসী অশথ্‌ বটের ছায়ে,
কাঙ্গাল কবির প্রাণের গভীর গঙ্গাধারার জল।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৫

---

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৈশাখ মাসে।



নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এদিকে মাণিকের অত্যাচারও দিন দিন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রন্ধনগৃহে প্রণতি কাহাকেও যাইতে দিন না,মাণিক তাহার সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছিল। এক দিন রন্ধন করিয়া রাখিয়া স্নানান্তে আসিয়া প্রণতি দেখিল, ছেলেটা নিজেই একটা থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে খাইতে বসিয়া গিয়াছে। তাহার কাণ মলিয়া তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়াসত্বেও কোন উপকার দেখা গেল না।

আহারের দিকে রীতিমত দৃষ্টি রাখায় দিন দিন মাণিক আরোগ্যের পথে চলিতেছিল। প্রণতি জানিত শুধু চিকিৎসাতেই রোগ আরোগ্য হয় না, পথ্যের দিকে আগে দৃষ্টি রাখা দরকার।

বাপুয়া প্রণতির বিছানা দুপুর বেলা করিয়া রাখিত। এই ছেলেটী কখন নিদ্রিত বাপুয়াকে ফাঁকি দিয়া আসিয়া এই দুগ্ধফেণনিভ বিছানাটীতে কাদা ধূলা পায়, গায় উঠিয়া বেশ এক ঘুম দিয়া লইত। তাহাকে যতই কেন না উৎপীড়ন করা হোক, সে নির্ব্বিকার থাকিত, যে কাজের জন্য সে আজ প্রহার সহ্য করিলে কাল আবার তাহাই করিবে।

সেদিন বৈকালে স্কুল হইতে বাসায় ফিরিয়া প্রণতি দেখিল মাণিক তাহার বইয়ের আলমারীর কাঁচগুলা ভাঙ্গিয়া নিবিষ্ট চিত্তে বই বাহির করিতেছে ও যে বইয়ের মধ্যে ছবি আছে, তাহা ছিঁড়িয়া এক করিয়া রাখিতেছে। আলমারীর উপরে যে দুইটী সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাস ছিল, সে দুটী চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বাপুয়ার সে দিন জ্বর আসিয়াছিল,সে আগা গোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া তাহার ঘরে পড়িয়া আছে, ছেলেটী ততক্ষণে নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ গুছাইতেছে। ঘরের মেঝেয় উঠানের যত কাদা মাটী, পুতুল পড়িয়া আছে, সেই মাটীবুক্ত হাত খানি মুছা হইয়াছে বিছানার চাদরে, বালিসের গায়ে।

শ্রান্ত প্রণতির আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সে একটা ঘরে সে দিনকার মত বন্ধ করিয়া রাখিয়া স্কুলের পোষাক খুলিয়া ঘর পরিস্কারে মন দিল।

সন্ধ্যা বেলা হিরণ্ময় রোগী দেখিতে দর্শন দিলেন। প্রণতি তখন বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড় কাচিয়া তুলিতেছিল। বৃহৎ চাদরটাকে কোন মতে কায়দায় আনিয়া সে নিংড়াইবার চেষ্টায় ছিল; ব্যস্তভাবে হিরণ্ময় বলিলেন, "একি, আপনি যে,—বাপুয়া কোথায়?

প্রণতি উত্তর দিল, "তার জ্বর এসেছে।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন,"এই সন্ধ্যাবেলা এগুলো কাচ্‌ছেন যে? আমার চাকরকে কাল সকালে পাঠিয়ে দিতুম, সে আপনার কাজগুলো করে দিয়ে যেত।"

প্রণতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "দরকার নেই, বাপুয়ার জ্বর প্রায় ছেড়ে এসেছে, সকালে সে নিজেই সব পার্‌বে, আমায় কিছুই কর্‌তে দেবে না।"

হিরণ্ময় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "আপনার প্রকৃতি আমি বেশ বুঝেছি মিস বোস, আপনি কিছুতেই কারও সাহায্য নিতে চান না। যাক্, মাণিক কোথা গেল, তাকে দেখ্‌তে হবে যে।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া প্রণতি বলিল, "তাকে আজ আপনার দেখ্‌তে হবে না, সে বেশ ভালোই আছে। দুরন্তপণা তার এত বেড়েছে, যার জন্যে আজ তাকে বন্ধ করে রেখেছি, এক দিন বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

হিরন্ময় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনি, আমি কিন্তু আগেই বলেছিলুম, ও ছেলেকে রাখা আপনার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। শরৎ বাবুকে আমি প্রথমেই বলেছিলুম আপনার ঘাড়ে যেন এ ভার না চাপান। আপনি কি একে শাসন কর্‌তে পার্‌বেন? আমার তো তা মনে হয় না।

প্রণতি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই পারব। তিনি পারেন নি বলে আমি ও যে পারব না এমন কথা হতে পারে না। আপনি দেখ্‌তে পাবেন আমি ওকে মানুষ করে তুল্‌তে পারি কিনা।"

সে দিনে গল্প জমিল না, খানিক বাদেই হিরন্ময়কে বিদায় লইতে হইল।

সে রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ও একা একটা ঘরে বদ্ধ থাকিয়া মাণিক খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রণতি কেবল তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই দ্বার খুলিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত বালক আপনিই চুপ করিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে তাহাকে অভুক্ত রাখিয়া প্রণতিও আহার করিতে পারিল না, সমস্ত রাত্রি তাহার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল।

কিন্তু বাস্তবিকই পর দিন হইতে এই দুরন্ত ছেলেটার দুরন্তপণা একেবারেই ঘুচিয়া গেল। সে ভারী ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল এবং একখানা বর্ণপরিচয় লইয়া অ আ পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের বেগ এই দিকে পড়ায় কয়েক দিনের মধ্যে প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয়ভাগ ধরিল। তাহার লেখা পড়ায় দ্রুত উন্নতি দেখিয়া বাপুয়া চমৎকৃত হইয়া গেল; প্রণতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাই বলুন, দিদিমণি, ছেলেটা বাঁচ্‌লে একটা মানুষ হবে। ওর মাথা আছে, আমার মত নয়।"

প্রণতি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "তাই বটে।"

স্কুলের মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটী প্রণতির বড় প্রিয় ছিল তাহার নাম লীলা; নীলা নামে সে খ্যাত ছিল।

এই মেয়েটীর অসুখের সময় শরৎ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার পিতা হরিসাধন ঘোষকে নিজের জমীদারীতে একটা কাজ দিয়া এই পরিবারকে অনাহার হইতে বাঁচাইয়াছিলেন।

নীলার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত মেয়েটীর বিবাহ হইতেছিল না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মান মহাপাপ, বিধাতার অভিশাপ। একটী মেয়ের বিবাহ দিতে যে অর্থের প্রয়োজন সেরূপ অর্থ হরিঘোষের ছিল না। মাসিক কুড়িটী টাকা বেতন পান, তাহাতে অতিক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র।

মেয়েটী ছিল শ্যামবর্ণা, পাতলা ছিপছিপে। যদিও তাহার মুখখানি সুন্দর ছিল, অঙ্গসৌষ্ঠব পাতলার মধ্যে নিন্দনীয় ছিল না, তথাপি কেবলমাত্র অর্থের অনাটনের জন্য পাত্র জুটিতেছিল না। দুই একজন পাত্রী দেখিয়া পছন্দ করিলেও পাত্রীর পিতার অবস্থা শুনিয়া প্রকাশ্যভাবে অমত জানাইয়া গিয়াছিল।

ভদ্রলোকের অবস্থা লোকে জানিত না এমন নহে, তথাপি তাহারা নিন্দা করিতে ছাড়িত না। পিতামাতা এত বড় মেয়ে সম্মুখে রাখিয়া কেমন করিয়া যে আহার করিতেছেন ইহা ভাবিয়া প্রতিবাসীদের চক্ষে নিদ্রা আসিত না। নীলার মাতা পথে ঘাটে অজস্র নিন্দা শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্বামীকে দশকথা শুনাইয়া দিতেন, অজস্র চোখের জল ফেলিতেন, দরিদ্র উপায়হীন পিতা তামাক টানিতে টানিতে নীরবে সব শুনিয়া যাইতেন।

নীলাকে লক্ষ্য করিয়া নীলার মা সনদা গালাগালি করিতেন। দরিদ্রের ঘরে কেন সে জন্ম লইল, জন্মিল যদি মরিল না কেন? সে মরিলে তাহাদের এত কথা তো শুনিতে হইত না,—এই সব কথা বলিতে বলিতে চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত।

হায়রে, কষ্ট কি তাঁহারাই শুধু ভোগ করিতেন? ।। যে লক্ষবার মৃত্যুকে আহ্বান করিত, কিন্তু সে

ডাকে তাহার নিকট মৃত্যু আসে না, তাই নীলা মরে নাই। সে বেশী কথা বলিতে পারিত না, নীরবে চোখের জল মুছিত।

প্রণতি এই অল্পভাষিণী মেয়েটীকে বড় ভালবাসিত। নীলা দিন কত স্কুলে আসিয়াছিল, তাহার পর লোকনিন্দায় আর আসে নাই। এত বড় মেয়ে স্কুলে পড়িতে যাইত ইহা পল্লীবাসীর একেবারে অসহ্য। ইহারা যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিল, বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই। সনদা কন্যাকে আদেশ দিলেন, "তুই আর পড়্‌তে যেতে পাবিনে। লেখাপড়া শিখে তো চাকরী করবিনে; আর লেখাপড়ায় দরকার নেই।"

মায়ের আদেশে নীলা স্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

কয়েকদিন সে স্কুলে না যাওয়ায় প্রণতি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, নীলা আর স্কুলে পড়িবে না।

সেদিন একটু সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিয়া প্রণতি নীলাদের বাড়ী গেল।

সনদা তখন বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বামীর উদ্দেশে তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেছিলেন; বৃদ্ধ হরিঘোষ চুপচাপ একটী পাশে বসিয়া অবিশ্রান্ত তামাক টানিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে স্ত্রীর তিক্তকথাগুলা পরিপাক করিতেছিলেন। প্রণতিকে দেখিয়াই সনদা থামিয়া গেলেন, কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিলেন, "এই যে মা, তুমি এসেছ; বেলা, একখানা আসন দিয়ে যা তো।"

কন্যা বেলা আসন পাতিয়া দিল।

প্রণতি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা সব ভাল আছেন তো মা?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া সনদা বলিলেন, "আর ভাল বাছা, এরকম ভাল থাকার চেয়ে মরাই ভাল, জীয়ন্ত থেকে দিনরাত যন্ত্রণা সইতে আর পারা যায় না।"

প্রণতি বলিল, "কেন, নীলার বাবা এখন তো কাজ করছেন, তবে—"

বাধা দিয়া সনদা রুক্ষভাবে বলিলেন, "কাজ করছেন, পেটে দুবেলা খেতে পাচ্ছি এই মাত্র, কিন্তু এমন খাওয়া তো পশুতেও খায় না! সমাজে বাস করলে সমাজের রীতিনীতি মেনে চল্‌তে হবে, যেমন তেমন করে খাওয়াই তো মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা নয় বাছা! মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিনে, হাতে একটী পয়সা নেই। কুড়িটী টাকা পান; ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না, পেটে খেতে কুলায় না, একটী পয়সা তা থেকে বাঁচে না। এই মেয়ের পানে তাকিয়ে ভাত মুখে দিতে পারিনে, রাতে ঘুম নেই, সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—কখন কি হয়। ওঁর কি সে ভাবনা আছে? বল্‌লে বলেন—ফুল ফুটবে তবে তো বিয়ে হবে, নইলে হাজার চেষ্টা করলেও বিয়ে হবে না। এ একটা বাঁধা গৎ বইতো নয়, নইলে এতবড় মেয়ের বিয়ের ফুল আজও ফোটেনি এও কি একটা কথা হতে পারে? মেয়েটা মর্‌লেও যে বাঁচতুম। সে দিনে অমন যে ব্যারাম হল, অন্য মেয়ে হলে মরে যেত, নিতান্ত হতভাগা মেয়ে বলে মর্‌ল না; আমারই কপালে বেঁচে উঠ্‌ল।"

তাঁহার চোখদিয়া হঠাৎ অনেকখানি জল উছলাইয়া পড়িল, তিনি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন।

মা কখন সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন তাহা ভাবিতে প্রণতির বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে ভাবিয়া দেখিল, বড় কষ্টে বড় দুঃখে মায়ের মুখ হইতে এমন কথা প্রকাশ হইতে পারে। মায়ের বক্ষে সন্তানস্নেহ অপর্য্যাপ্তই থাকে, সমাজের দারুণ ভ্রূকুটী, অজস্র নিন্দা মায়ের স্নেহ হইতে সন্তানকে বঞ্চিত করিতে পারে না। দোষ এ দেশের, দোষ এ দেশের ছেলের পিতার, কারণ তাহারা সময় সময় নৃশংস কশাইয়ের চেয়েও নৃশংস আচরণ করিয়া যায়। দেশে এই পণপ্রথা এমনই চলন হইয়া গিয়াছে যাহা না হইলে বিবাহ খাপছাড়া বোধ হয়। দরিদ্র কন্যার পিতামাতাকে যথেষ্ট অর্থকষ্ট সহিতে হয়, ইহার পর

লোকনিন্দা, সমাজচ্যুত হওয়া, নানাপ্রকার লাঞ্ছনা অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। এই কুৎসাশীল দেশের লোক এমনই করিয়া নিজেদের ক্ষতি করে, নিজেদের কার্য্যে নিজেদের অবনত করে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রণতি বলিল, "ওকে অমন করে বল্বেন না, মা! আহা, ওর দোষ কি তা বলুন দেখি? বল্ছেন—মরে গেলেই ভাল হতো, কিন্তু আমি তো নিজের চোখে দেখেছি তার ব্যারামের সময় আপনি যত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এরকম আর কেউ হয়নি। আপনার আহার নিদ্রা ছিল না, দিনরাত ওই মেয়ের পাশে বসে চোখের জল ফেল্তেন। আপনি তো সেই মা, আজ কোন্ প্রাণে সেই মেয়ের মৃত্যুকামনা কর্ছেন বলুন দেখি?"

সনদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বুকের জমাট ব্যাথা হাল্কা করিয়া দিতে গেলেন; বেদনাভরা কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ; আমিই সেই মা, কিন্তু কত কষ্টে যে এ কথা বল্ছি, তা আর তুমি কি বুঝ্বে প্রণতি? আমাদের মত দুঃস্থ বাঙ্গালীর ঘরে তুমি জন্মাওনি, কন্যাদায় যে কি তা তুমি জানো না; যদি জান্তে তবে আমায় বল্তে পার্তে না। জানো না—আমাদের ঘরের মেয়ে জ্ঞান হতে শিক্ষা পায় তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে, শ্বশুর বাড়ীর জন্যই তার জন্ম। দিনে একশবার আমরা তাকে জানিয়ে দেই তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে, সেখানে তাদের সঙ্গে সব রকমে মানিয়ে তাকে চল্তে হবে। এতটুকু বয়স হতে আমরা মেয়েদের নিষেধের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখি, তার যে চল্তে দোষ, উঠ্তে দোষ, বস্তে দোষ সব রকমে দোষটাই জানিয়ে দেই। তাকে আরও জানিয়ে দেই—মেয়েদের মধ্যে নিজের ভাব থাকে না, তাকে পরের মতে মত দিয়ে চলতে হবে, পরের চোখে চোখ দিয়ে জগৎ দেখ্তে হবে, পরের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েদের জানিয়ে দেই—তাদের যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় সে শুধু তাকে বিয়ের বাজারে বার করবার জন্যে, তার বেশী আর দিতে চাইনে—কারণ তার আর দরকার নেই। এই যে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাচ্ছি, এ শুধু সেই বাজারের জন্যে, জান্ছি—এর পরে এ আর কোন কাজে লাগবে না; কচিৎ এক আধখানা পত্র লেখা ছাড়া। তোমরা লেখাপড়া শেখাও জ্ঞানের জন্য, আমরা শিখাই বিয়ের জন্যে। এতেই বুঝতে পারবে—তোমাদের সঙ্গে আমাদের কতখানি প্রভেদ। বাংলার মেয়ে জীবন্ত অভিশাপ, সে নিজেও জ্বলে কেমন—বাপমাকেও জ্বালায় তেমনি। সে নিজে দিনরাত মৃত্যু প্রার্থনা করে, তার বাপ মাও তার মৃত্যু প্রার্থনা করে। মা, বাপ মায়ে কত দুঃখে সন্তানের মরণ প্রার্থনা করে, তা বাপ মা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এই সন্তান, যাকে গর্ভে ধারণ করেছি, অসহ্য যন্ত্রণা যার জন্য সয়েছি, নিজের বুকের রক্ত খাইয়ে যাকে এতবড় করেছি, যে ঘুমালে শান্তি পাইনি, চোখের আড়াল হতে দেই নে, যার অসুখ হলে আগেই অমঙ্গল আশঙ্কা মনে জেগে ওঠে, সেই সন্তানের মরণ কামনা! কেন তা আর কেউ বুঝবে না, মা! সে দিন তার মাথার কাছে, যখন বসেছিলুম, তখন লোকনিন্দা বিয়ের ভাবনা কিছুই আমার মনে হয় নি শুধু মনে হয়ে ছিল, আমার সন্তান বেঁচে উঠুক, আমি আর কিছু চাই নে। আজ আবার বাইরের কথা আমার কাণে আস্ছে, ভাব্ছি, হয় ও মরুক নয় আমি মরি, আমায় যেন কারও কথা আর না শুন্তে হয়।"

এবার প্রকাশ্যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, আর কোন বাধা মানিল না।

প্রণতির চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল, সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনি এত ভেঙ্গে পড়্ছেন কেন মা? আজকাল অনেক হিন্দু মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন, নীলাকেও তাই শিখান না। দেশের লোক নিন্দা করবে—করুক, সমাজও করবে—করুক, তাতে কাণ দেবেন না, বাংলার মেয়েকে নিজের জীবন অভিশপ্ত ধারণা করতে শিক্ষা দেন আপনারাই; কিন্তু আপনারা বলুন দেখি—তারা ঘৃণ্য

নয়; তারা হেয় নয়, তারা ও সংসারে কাজ করতে পারে। আপনারা বলুন দেখি—কার্য্যক্ষেত্র শুধু পুরুষের জন্যে প্রসারিত নয়, মেয়েদের জন্যেও প্রসারিত আছে। আপনাদের যদি এত ভার বোধ হয়, ওকে আমায় দিন, আমি ওর ভার নিচ্ছি।"

সনদার চোখে জল, মুখে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল? সে বলিল—"তা কি হয় নাকি মা? যদি তা হতো তা হলে এখনই দিতুম। সহরের দিকে ও সব চল্‌তে পারে, পাড়াগাঁয়ের দিকে কিছু চলে না। আমাদের এখানে যেমন করেই হোক—যে পাত্রেই হোক বিয়ে দিতেই হবে, নইলে জাত যাবে।"

জাত যাইবে কথাটা শুনিয়া প্রণতির হাসি পাইয়াছিল, জাত এমনই ঠুন্‌কো জিনিস বটে, নড়িতে চড়িতে কাঁচের জিনিসের মত ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্র যদি অন্ধ, খোঁড়া, বুড়ো হয়—"

সনদা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অধঃপতিত বাংলার মেয়েকে অসঙ্কোচে তার হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

প্রণতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধ, অন্ধ খঞ্জ ইহাদের যে কোনটার হাতে ইঁহারা এই পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাকে অর্পণ করিবেন, সেও সমাজের চোখে সহনীয়, জাতি তাহাতে থাকিবে, কিন্তু মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবে, তাহা সমাজ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। এই মহাপাপের শাস্তিস্বরূপ মেয়েকে বহুদূরে থাকিতে হইবে, অধিকন্তু তাহার আত্মীয় স্বজনগণকেও অনেক নির্য্যাতন সহিতে হইবে। চমৎকার বাংলার সমাজ!

আমাদের এ দেশে কয়টী পিতামাতার বুকে এমন সাহস আছে যাঁহারা সমাজের পানে না চাহিয়া ব্যক্তিত্বের সম্মান রাখিতে পুত্র কন্যাকে সমান শিক্ষা দিতে পারেন?

প্রণতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে ছিল, এমন সময়ে একটী বৃহৎ মাটীর কলসী পূর্ণ জল লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নীলা বাড়ী ফিরিল। প্রণতি তাহার সেই সুন্দর শ্যাম মুখখানার পানে চাহিল; বিশ্বের যত বেদনা সব যেন তাহার বিশালাতন নয়ন দুইটীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; হায় অভাগিনী বাংলার মেয়ে!

কলসীটা রন্ধন গৃহে নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে রাখিয়া আসিয়া নীলা সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিতে গিয়া বলিয়া উঠিল, "কাপড় যে এখনও শুকায় নি মা, বড্ড ভিজে রয়েছে।"

মা বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "ওই পর, ভিজে কাপড় পরলে মরবে না, ভয় নেই, তোমার মত মেয়েদের যম ভুলেও ছোঁবে না; তা যদি ছুঁত, যদি মর্‌বার হত, সেই ব্যারামেই মর্‌তে, আমায় এক কষ্ট সইতে হতো না।"

নীলার রেখাহীন শান্ত ললাটে কয়েকটী রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল; সে সেই কাপড় খানা পরিয়া পরণের কাপড় খানা শুখাইতে দিতে গেল।

এইবার হরিঘোষ কথা বলিলেন, হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "এই সে দিন অতবড় ব্যারাম হতে উঠ্‌ল, তারপর ওই ভিজে কাপড়টাই পর্‌তে দিলে? একখানা শুকনো কাপড়ও কি জুটল গা?"

রুক্ষকণ্ঠে সনদা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ—কি দরদ, বলে—'মার পোড়ে না পোড়ে মাসি, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া প্রতিবাসী' ওঁর হয়েছে তাই, বলে—"বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর;" অত দরদ যদি, যাও না,—যাতে মেয়েকে আমাকে লোকের কথা না শুনতে হয় তাই কর, পাত্র নিয়ে এসো—বিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে বসে অত জারিজুরী আমার ভাল লাগে না বাপু! থেকে থেকে এক একটা কথা বললে গা জ্বলে যায়।"

কথাটা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং স্বামীর উপর নিতান্ত রাগ করিয়াই প্রণতি যে বসিয়া আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া, অনাবশ্যক একটা কলসী লইয়া ঘাটে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ হরিঘোষ নীরবে শুধু তাকাইয়া রহিলেন, স্ত্রী যখন চলিয়া গেলেন, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হুঁকাটাকে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিলেন।

তাঁহার বিষণ্ণ মুখ খানার পানে চাহিয়া প্রণতি কষ্ট পাইল। সে কোন দিনই নীলার পিতার সহিত কথা কহে নাই, আজ ভদ্রলোকের বিষণ্ণ মুখখানা তাহার সঙ্কোচ দূর করিয়া দিল, ধীরস্বরে সে বলিল, "আপনাকে আমি একটা কথা বলি—শুনুন।"

তাহার সহানুভূতি পূর্ণ মিষ্ট কথা হরিঘোষের বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিল। তিনি বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইতে দিলেন, থামিয়া বলিলেন, "কি কথা বল্‌বে মা?"

প্রণতি অবনত মস্তকে বলিল, "নীলার বিয়ের ভার আমি নিচ্ছি; এখানেই যাতে তার বিয়ে হয় তার চেষ্টা আজ হতে আমিই করব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর জন্যে ভাব্‌বার কোন দরকার নেই।"

বিদায় লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ হরিঘোষ হাঁ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উর্দ্ধ মুখে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "মা ব্রহ্মময়ি! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

ক্রমশঃ—

'জ্বলেনিআলো অন্ধকারে'

শ্রীসুবোধ রায়

গিরিডি......
শুক্লা একাদশী
বারই আশ্বিন।

ভাই নীলা—

ঠিক্ যা' আশা ক'রেছিলুম তাই। একটা সোজা কথার বাঁকা মানে না ক'রে তুই যে আমায় সহজে রেহাই দিবি নে, তা' আমি আগেই জানতুম। ...... আজ পর্য্যন্ত তোর কাছে ত' কোনো কথাই লুকুইনি ভাই—সত্যি বল্‌চি তোকে যা' জানিয়েচি, তা'র এক বর্ণও মিথ্যা নয়—একটি কথাকেও পল্লবিত অথবা অতিরঞ্জিত ক'রে লিখিনি—লিখিনি।

যা' ঘটেছে, সেটা অবিবাহিতা কুমারী জীবনের পক্ষে নীতিসঙ্গত কিনা জানি নে তবে খুব যে স্বাভাবিক, একথা নিশ্চিন্তে বল্‌তে পারি। ...প্রথম দর্শনেই প্রণয়সঞ্চার পাওয়াটা সে নেহাৎ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা এবং কবির কাব্যেই শোভা পায়, এমনই একটা ধারণা আমারও ছিল আগে। কিন্তু আজ স্পষ্টভাবে একথা স্বীকার করতে আমার একটুও লজ্জা নেই যে ছেলেটিকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর মূর্ত্তিটি 'এমন গভীর ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হ'য়ে গেছল যে, সে রূপকে সমস্ত দিন রাত্রি ধ'রে ধ্যান ক'রেও তৃপ্তি পাই নি।

তারপর কি রকম অদ্ভুত উপায়ে পরিচয় হ'য়ে গেল, সে কথা ত' তোকে আগেই জানিয়েচি।

ভেবেছিলুম আমার মনের এই গোপন কথাটি কারুকেই জানাবো না—হোক্ না সে যতোই আপন, যতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু।.........আমার এই সতরো বছরের নির্দ্দোষ সুসংযত জীবনের ছোট্ট এই ত্রুটী ও

দুর্ব্বলতাটুকুর সন্ধান পেয়ে কেউ যদি উপহাস করে, অযাচিতভাবে আমার এই আচরণটার বিরুদ্ধে খবরদারী কর্‌তে আসে তা হ'লে সেই অপমান, সেই উপহাসের তীব্র খোঁচাগুলো সত্যে ভারী মর্ম্মান্তিক ভাবেই আমার বুকে বাজ্‌ত।

হিন্দু ঘরের একজন বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে তা'র নিজের মুখে প্রেম স্বীকার করার মতো অপরাধ ও লজ্জাহীনতার বিষয় আর বাকি কিছুই হ'তে পারে না। তাই এমন একটা মারাত্মক অপরাধ হঠাৎ যখন করেই ফেলেচি, তখন সেটাকে খুব সাবধানে সঙ্গোপনে রেখে দেব স্থির কর্‌লুম—কিন্তু এই ধরণের একটা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা নারীর পক্ষে যে কতদূর কষ্টসাধ্য তা' তুই নারী, বোধ হয় সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ভেবেছিলুম তোকেও কিছু জানাবো না। অবশ্য একটা দুর্নিবার লজ্জা ও সঙ্কোচই আমায় একথা ভাব্‌বার অবসর দিয়েছিল। নইলে তোর কাছে সব কথা গোপন কর্‌লে আজ এই অনাবিল তৃপ্তি বুক-ভরা সোয়াস্তিটুকু কোথায় পেতুম ভাই?······দ্বিধা ও সঙ্কোচের জগদ্দল পাথরটাই যেন বুক থেকে ঠেলে ফেলেচি, এমনই হাল্‌কা বোধ হচ্ছে।·········

ছেলেটী সে ইকনমিক্স এ এম-এ পড়ে, সে খবর ত' তোকে আগেই জানিয়েছিলুম। সঞ্জয় বাবু এম-এ পড়েন হিস্ট্রিতে, তিনি তাঁকে চিন্‌বেন কি ক'রে? অবশ্য তা'তে পরিচয় বাধে না। পুজোর ছুটীর পর সঞ্জয় বাবু অনায়াসেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে পারেন।

ছেলেটির চেহারার বর্ণনা আমি ঠিক্ যেমন ভাবে ক'রেচি, অবিকল ঐ রকম ভাবে বল্‌তে পার্‌লেই, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে চিনে নিতে পার্‌বেন।······অবশ্য তা'তে তোর একটু বিপদও আছে, কারণ স্বামীর কাছে পর-পুরুষে রূপের বর্ণনা করাও নাকি পাপ। তবে ভরসা হয়, সঞ্জয় বাবুর মতো নিরীহ স্ত্রৈণ স্বামী হয় ত' তোকে মুখ ফুটে কিছু পা-ও বল্‌তে পারেন।

বিকেলে রোজই দাদা, বৌদি, স্মৃতি ও আমি বেড়াতে যাই। বলা বাহুল্য তাঁর সঙ্গলাভ থেকেও কোনোদিন আমরা বঞ্চিত হইনে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়টুকু কাটে বেশ! বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গীতে এমন মজাদার সরস গল্প বলেন যে, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধ'রে যায়। শুধু কথা বলার মধ্যেও যে এত মষ্টতা ও মনোহারিত্ব থাক্‌তে পারে, সে অভিজ্ঞতা এই আমার একদম প্রথম। কিন্তু সব চেয়ে ভালো তাঁর ঐ প্রাণখোলা হাসি—তাঁর ভাবদীপ্ত স্বচ্ছ চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু—সত্যি সে দৃষ্টি বুঝি শুধু তাঁকেই শোভা পায়।·· ···মনে মনে হয় ত' ভাব্‌চিস—'লাভার ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল'—তা' তোর ঐ মুখের ভাব আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি। কিন্তু সে কথা যাক্—

অচিন্ত্য বাবুর 'সন্ধ্যারাগ' পড়্‌লুম। এই দরদী লেখকটির মিঠে হাতের পরিচয় এর আগেও কয়েকবার পেয়েছিলুম। কিন্তু এই গল্পটি আমায় একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিয়েচে। এমন মর্ম্মস্পর্শী এমন করুণ অশ্রুসজল গল্প খুব কমই পড়েচি।

আজ এই পর্য্যন্ত। সঞ্জয় বাবুকে আমার ছোট্ট একটা নমস্কার দিবি। তুই আমার বুকভরা ভালোবাসা নিস। ইতি—

'চিত্রা'—

দুপুর আড়াইটা
বিষ্যুৎবার···
···কলকাতা।

ভাই চিত্রা সুন্দরি,

তোর 'সাড়ে চুয়াত্তর' খানি ঠিক্ সময়ে পেয়ে ভারী খুসী হলুম।······আমার প্রতি তোর ঐ প্রেম ও ভালবাসা চিরদিন অটুট থাকুক—ভগবানের কাছে শুধু এইটুকুই আমার একমাত্র প্রার্থনা।··· ··

প্রথম দর্শনেই প্রেম সঞ্চার হওয়াটা যে অসম্ভব, এমন কথা ত' আমি বলিনি। বলেছিলুম যে তোর স্বভাবের সঙ্গে ব্যাপারটা যেন খাপ্‌ছাড়া হ'য়েচে। যে রকম রিজার্ভড্ লাজুক প্রকৃতির মেয়ে তুই,

আচম্‌কা শুনে তাই একটু খট্‌কা লেগেছিল। কপালে হাত দিয়ে ব'সে পড়েছিলুম আর কি !...... আচ্ছা হুঁশিয়ার মেয়ে যা হোক্‌—সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, তথচ সেদিন পাত্তাই দিলি নে। আমি কিন্তু সেইদিনই তোর ঐ অসংলগ্ন কথা আর উদাস চাহনির মধ্যে একটা কথার স্পষ্ট উত্তর পেয়েছিলুম। নিজেকেই আজ আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কাঞ্চনবাবুর রূপগুণের তুই যতোই প্রশংসা কর্‌চিস্‌, তোর প্রতি মন আমার অবিশ্বাসে ঘৃণায় ততোই বিষিয়ে উঠ্‌চে। আমার এই এতদিনের ব্যগ্র উদ্বেলিত প্রেমকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তুই যে তাঁর হবি, একথা যে কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌চিনে সখি! উঃ! নারী কি এমনই ছলনাময়ী—এত নিষ্ঠুর! অথই পাথার দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে আজ আমায় এম্নি নিঃস্ব কাঙাল ক'রে—

মনে আছে সেই বাইশে ফাল্‌গুণের কথা? তখন আমরা থার্ড ক্লাসে পড়ি। টিফিন পিরিয়ডে দেবদারু গাছের তলে একান্ত নিভৃতে নির্জ্জনে যে সেই আমার বুকে মুখ রেখে শপথ ক'রেছিলি। মনে পড়ে সেই যে লজ্জাজড়িত অস্ফুটকণ্ঠে আমায় প্রাণেশ্বর বলেই— ......হায়রে অবিশ্বাসিনী অকৃতজ্ঞ নারী! সে সব কথা হয় ত' এখন দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হবে।......সবই দুর্ভাগ্য আমার। তোমার পথ থেকে স'রে দাঁড়ালুম বন্ধু—প্রতিশোধ নেবার বাসনা আমার নেই। কাপুরুষের নই আমি।......কাঞ্চনবাবুকে পেয়ে তুই চিরসুখী হ'য়ে থাক্‌—এর চেয়ে বড় কামনা আমার নেই।

শুন্‌লুম তোদের চার-চোখের মিলন প্রায় রোজই হচ্ছে, এবার চারহাত মিলনের সেই শুভ মুহুর্ত্তটির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলুম...বেশ মিল্‌বে কিন্তু। তুই তা'র নয়নের মণি, সে তোর চির-কামনীয় দুর্লভ কাঞ্চন। একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ যাকে বলে।

আমার পতি দেবতাটির কাছে 'তাঁর' কথা বলেছিলুম। প্রথমে তিনি খুব এক চোট্‌ হাস্‌লেন। বল্লেন—'কাঞ্চন সেন'কে তিনি বিশেষ ক'রেই চেনেন। স্কটিস্‌ চার্চ্চ কলেজে চারটি বছর একসঙ্গে তাঁরা নাকি পড়ে এসেচেন। আরও বল্লেন—কাঞ্চন খুব ভালো কবিতা লিখ্‌তে পারে। একজন রূপদক্ষ ওস্তাদ শিল্পী হিসেবেও সে কিছু কম খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেনি চিত্রপ্রদর্শনীতে অনেকবারই সে তা'র কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েচে।

আরও একটা কথা কি বল্‌লে, শুন্‌বি? রাগ কর্‌বি নে, বল্‌ আগে? ইস্‌—কটমট্‌ ক'রে তাকাচ্ছিস্‌ যে! যেন শোন্‌বার ইচ্ছেই নেই। আচ্ছা সত্যি ক'রে বল্‌ দিকিনি এ তোর কৃত্রিম বিরক্তি, না শোন্‌বার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা? আহাহা! অম্‌নি মেয়ের অভিমান হোলো। আচ্ছা তবে শোন্‌ বল্‌চি, বল্লেন—কাঞ্চন খাঁটী প্রেমিক, একজন নিখুঁত—সৌন্দর্য্যের উপাসক। অনেক দিন থেকেই এই বাস্তব জগতে সে তা'র কল্পলক্ষ্মী, সেই অনিন্দ্য কান্তি সুরসুন্দরীর সন্ধান কর্‌চে। আজ তোকে পেয়ে—

, এই চুপ কর্‌লুম। তুই কালো কুৎসিৎ একদম সাক্ষাৎ শ্যাওরা গাছের পেত্নী। কেমন খুসী হ'য়েচিস্‌ ত?

তুই রাগ করিস্‌ নে। আমার মনে হয় রূপসীদের এই বিনয়টুকুই তা'দের অহঙ্কারের স্পষ্ট পরিচায়ক।

সবিতা ও মীরা হঠাৎ আজ এসেছিল। কাশ্মীরে দু'টী মাস থেকে সবিতা স্বাস্থ্যটা কিন্তু বেশ ফিরিয়ে নিয়েচে। ওর স্বাভাবিক লাল গাল দু'টী এবার যেন আরও বেশী রাঙা হ'য়ে রক্তগোলাপের রূপ পেয়েচে।.. এর খোকাটিও বেশ লাভ্‌লি হ'য়েছে। দেখ্‌লেই চুমো দিয়ে বিব্রত কর্‌তে ইচ্ছে করে। বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ আদর কর্‌লুম। সবিতা কি ব'লে রসিকতা কর্‌লে, শুন্‌বি? নাঃ—থাক্‌—

বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'য়ে মীরার অহঙ্কার ও চালিয়াতি আরও যেন বেড়েচে ব'লে মনে হোলো।

সে কি ভাই কথা বল্‌বার ভঙ্গী, হাঁট্‌বার সে কি বিচিত্র অদ্ভুত ঢং! কথা অবশ্য বেশী বলে নি, কিন্তু যে ক'টা ব'লেচে সে শুধু ওর ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার কথাই।

সাহানা দেবীর 'যাবার বেলায় পিছু ডাকে' গানটি শুন্‌লুম। বেশ ভালোই লাগ্‌ল। গাইবার কৌশলে ওর সব গান গুলোই বেশ মনোমুগ্ধকর শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে! একটা নূতনত্ব ও বিশিষ্টতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

বেশী আর কি লিখ্‌ব। পড়াশুনো মোটেই হচ্ছে না। তুই বোধ হয় এতক্ষণ তোর ঐ মনোচোরের মূর্ত্তিকেই ধ্যান কর্‌চিস। আর দেরী নেই, এই বারই তাঁর দর্শন মিল্‌বে। আমার বিনীত অনুরোধ, তোর উচ্ছলরঙ্গীন মদির মূহুর্ত্তে আমার নামটি ভুলেও একবার স্মরণ করিস। লক্ষীটি ভাই, ভুলিস্ নি, আমার আজ এই খানেই ইতি। পত্রের উত্তর শীগ্‌গীর চাই।

তাজা রোম্যান্সের কয়েকখানি ফিকে সবুজ পাতার প্রত্যাশী।

'লীনা'

শরৎ পূর্ণিমা
গিরিডি......
ষোলোই আশ্বিন।

ভাই লীনা,—

তোর মিষ্টি চিঠিখানি পেয়ে খুব খু-উ-ব- হলুম। ......সঞ্জয়বাবুকে এবার উনি চিন্‌তে পেরেচেন। হয় ত আমি ঠিক্ মতো বোঝাতে পারিনি বলেই তিনি গোলমাল করেছিলেন। বল্লেন—তোর স্বামী মশায়টি নাকি খুব বিনয়ী আর খুব শান্ত। আমি কিন্তু কাঞ্চন বাবুর এই উদার মতটি কিছুতেই সমর্থন কর্‌তে পার্‌লুম না। তাঁর মুখের ওপরেই বল্লুম—আপনার বন্ধুটি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে যদি সেজন্য শান্ত শিষ্ট বলেন, তা হলে অভিধানে ওকথাটির অর্থটাকেই বদ্‌লে দিতে হয়। প্রতিবাদ না করে হাস্‌লেন।

স্মৃতির অত্যাচারের মাত্রাটা ক্রমশঃই যেন বেড়ে উঠেচে। এমন অসভ্যের মতো বে-পরওয়া ভাবে কথা বল্‌তে শিখেচে যে কি বলব? আমার হয়েচে উভয় সঙ্কট। চুপ করে থাক্‌তেও লজ্জা লাগে অথচ ওকে শাসন কর্‌তেও সাহস পাইনে। জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অনিমিখে চেয়ে আছি, হঠাৎ সেদিন কোত্থেকে ছুটে এসে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—এই অনন্ত অসীমতার মাঝখানে কোথায় খুঁজে পাবে দিদি কাঞ্চন বাবুকে? তিনি যে কখন এসে নীচের ঘরে বসে তোমার অপেক্ষা করচেন।...ওকে মার্‌তে হাত উঠ্‌বে কি,—আনন্দে বুকখানি দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল।

শুধু বল্লুম—ভারী বেয়াদব হয়েচিস্ স্মৃতি! আমি না দিদি তোর? পনেরো বছরের ধাড়ী হলি, আজও তোর বুদ্ধি হল না, ছিঃ।

কিন্তু পনেরো বছরেই মেয়েদের বুদ্ধি যে সব চেয়ে বেশী প্রখর হয়ে ওঠে সে কথা ভুলে গেলুম।

বৌদিও বুঝি আমায় সন্দেহ কর্‌চে। ওর দৃষ্টি আগের মতো সহজ নয়, কেমন যেন পরিহাসচঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমায় দেখে অকারণে হাসে। কিন্তু সাহস করে কিছু বল্‌তে পারে না, হয় ত আরও দু'দিন পরীক্ষা করে একদম নিঃসন্দেহ হ'তে চায়।

কাল একটা ভারী মজা হ'য়েচে........

সন্ধ্যের সময় আন্‌মনে বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছিলুম। হঠাৎ গানের খাতাটি খুলতেই একটা পেন্সিলে আঁকা সুন্দর ছবি চোখে পড়্‌ল। শিল্পীর নাম ছিল না, কিন্তু এই রূপদক্ষ নিপুণ শিল্পী যে কে হ'তে পারে, সে কথা বুঝ্‌তে একটুও দেরী হ'ল না। আশ্চর্য্য! কখন যে চুপ করে এই কাণ্ডটি ক'রে গেছেন, কিছু জান্‌তেও পারি নি। ছবিটির নীচে স্পষ্টাক্ষরে শুধু একটি নাম লেখা রয়েচে, 'দুঃস্বপ্ন'। একটি সদ্যোত্থিত যৌবনা তন্বী তরুণী মাঝরাত্রে হঠাৎ

কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেচে। বাইরে তখন ভয়ানক দুর্য্যোগ প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হ'য়েচে। বজ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন ও ঝড়বৃষ্টির প্রচণ্ড কলরোল ছাড়া আর বুঝি কিছুই শোনা যায় না। এর মধ্যে মেয়েটির মুখে চোখে একটা ভয় ও অসহায়ের ভাবটুকু ভারী চমৎকার ফুটে উঠেচে। ......তিমিররাত্রির দুর্য্যোগ অভিসারে মেয়েটি যেন একটি ঝঞ্ঝাহত মুমূর্ষু পাখী।

ছবিখানিকে যতবার দেখ্‌চি ততবারই একটা সন্দেহ ও সংশয়ের দোটানায় পড়ে মনটা যেন দুলে দুলে উঠ্‌চে। মেয়েটির ঐ ভয়ব্যাকুল দৃষ্টির অর্থটা ক্রমশঃই যেন সহজ হ'য়ে আস্‌চে। মনে হচ্ছে ঐ রকম একটা ব্যথার স্বপ্ন আমাকেও বুঝি—

ছবিটিকে ছিঁড়্‌তে চাই, কিন্তু এতবড় রসসৃষ্টিকে এম্‌নি অবহেলায় ছিঁড়ে নষ্ট কর্‌ব ? ন,—না—সে আমি কিছুতেই পার্‌ব না।

সকালে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। বল্লুম —আপনার 'দুঃস্বপ্ন' চমৎকার হ'য়েচে। আপ্‌নি দেখ্‌চি আঁক্‌তেও পারেন। খুব মিষ্টি হেসে বল্লেন—তোমাকে একটু সার্‌প্রাইজ ক'রে দেবার অবসর অনেকদিন খুঁজ্‌ছিলুম। হঠাৎ কাল সে সুযোগ পেয়েছিলুম। তোমার গানের খাতার বিশেষত্বকে যদি নষ্ট ক'রে থাকি, তা হ'লে আমায় ক্ষমা কোরো।

মনে ভাব্‌লুম তুচ্ছ ঐ খাতাখানি আজ যে আমার কাছে দুষ্প্রাপ্য কোহীনুর সাতরাজার ধন মাণিকের চেয়েও বেশী মূল্যবান্ একথা তোমায় কেমন করে বোঝাবো গো ? ও যে আমার অমূল্য সম্পদ—আমার যথা সর্ব্বস্ব।

বল্‌তে ত' চাই অনেক কথা, কিন্তু সব কথাই কি বলা যায় ? শুধু বল্লুম—অরূপকে রূপ দেওয়া মানে যদি তা'র সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করা বোঝায়, তা হ'লে রোজই আপনি একখানি ক'রে পাতা আমার নষ্ট কর্‌বেন কাঞ্চন বাবু, আমার তা'তে বিস্তর লাভ।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কই আমার সে জিনিষটা ?

বল্লেন—হ্যাঁ—ভুলিনি, কিন্তু আমার যে তেমন ভালো ফটো আর একখানিও নেই, চিত্রা! বল্লুম—সে হবে না, ফটো আমার চাই-ই। কোনো ওজর শুন্‌ব না।

বল্লেন কি জানিস্ ? তোমার ঐ মভ্ রঙের ব্লাউস, পরিচয়ের প্রথম দিন যেটা তোমার গায়ে দেখেছিলুম —বলো সেটা আমায় দেবে ?......এমন সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। লজ্জায় চোখ দুটো তখ্‌খুনি নামিয়ে নিলুম। কিসের লজ্জা জানিনে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ আমার একেবারে আরক্ত ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

ঠোঁটের গোঁড়ায় এসেছিল। ভাব্‌লুম বলি—তোমার কাছে আমার অদেয় যে কিছুই নেই গো! নিজেকে রিক্ত—কাঙ্গাল ক'রেই ত' তোমার হাতে বিলিয়ে দিয়েচি, তোমার আমি—

কিন্তু কথাগুলো বোধ হয় নেহাৎ কাব্যের মতো শোনাতো, শেষ পর্য্যন্ত তাই চুপ ক'রে রইলুম। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, এ যেন আমাদের মজ্জাগত স্বভাব

.শুন্‌লুম মীরা নাকি এক ধনী ব্যারিষ্টারের পুত্রবধূ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ওর মতো একটি ষ্টাইলিশ্ আত্মাভিমানিনী মেয়ে যে ধরা খানিকে সরা জ্ঞান করবে তা'র আর আশ্চর্য্য কি ? মীরা নাকি পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্চে লীনা, সত্যি ?......

কাঞ্চনবাবুর দিদির কাছে ভারী সুন্দর একরকম খোঁপা বাঁধা শিখেচি। দেখ্‌লে তুই নিশ্চয়ই পছন্দ কর্‌বি। ক'লকাতায় গিয়ে নিজে হাতে তোকে বেঁধে দেব। তোর বড় চুলে মানাবেও বেশ। আর কটা দিনই ত' ?

ভালো কথা, আমাদের কলেজ কবে খুল্‌বে জানাবি। লজিকখানা ক'বার শেষ কর্‌লি ? আমার প্রিপ্যারেশন কিন্তু ভালো হ'ল না। পড়ার নামেই গায়ে জ্বর আসে। তুই হয় ত' এ কথার একটা কদর্থ করে নিয়ে ঠাট্টা কর্‌বি, কিন্তু সত্যি বল্‌চি

সেইটেই একমাত্র কারণ নয়।...... প্রতিমা ও রিণা কেমন পড়্‌চে? তাদের দু'জনকে আমার কাছে চিঠি লিখ্‌তে বল্‌বি।

তোর ধৈর্য্যের আর অপমান কর্‌তে চাইনে। আজ এই পর্য্যন্ত। আমার বুকভরা আন্তরিক ভালোবাসা গ্রহণ করিস্।

হাঁা, বল্‌তে ভুলে যাচ্ছি, কাঞ্চন বাবুকে আমি ব্লাউসটা দিয়েচি।

ইতি—

'চিত্রা'

রাত্রি পউনে ন'টা, মঙ্গলবার

কৃষ্ণা একাদশী.........

ক'লকাতা

রূপসী চিত্রা আমার—

বার বার পড়েও তোর চিঠিখানি শেষ কর্‌তে ইচ্ছে হয় না। কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি যে পেলুম, তা' প্রকাশ কর্‌বার মতো উপযুক্ত ভাষা আমার নেই।......এমন সুন্দর চিঠি তুই কা'র কাছে লিখ্‌তে শিখ্‌লি ভাই?

ব্যাপারটা দেখ্‌চি অনেকদূর গড়িয়েচে। মাসীমাকে সব কথা জানিয়ে এখন একটা দিন স্থির কর্‌লেই হয়। কাঞ্চনবাবুকে আমরাও কবে যে আপ্‌নার লোক ব'লে দাবী কর্‌তে পার্‌ব, তাই শুধু ভাব্‌চি।

'দুঃস্বপ্ন' ছবিখানি দেখ্‌বার জন্য একটা অদম্য কৌতূহলে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলুম। তোর বর্ণনা-ভঙ্গী তবু আমার অশান্ত চঞ্চল মনকে অনেকটা শান্ত ক'রেচে। কতগুলো মিষ্টি কথার হাল্‌কা আঁচড়ে ছবিখানি ঠিক রূপ পেয়েচে কিন্তু!......

যাই হোক্, কাঞ্চনবাবুর ব্লাউস চাওয়ার ভেতর বেশ একটু বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আছে। মার্জ্জিত রুচিবাগীশদের এ একটা আধুনিকতম প্রেমের নমুনা বোধ হয়।......কথাটা যখুনি মনে হচ্চে, না হেসে থাক্‌তে পার্‌চি নে!......কবিদের সবই অদ্ভুত!......

খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি থেকে নাম্‌তে গিয়ে কাল ধপাস্ ক'রে একটা আছাড় খেয়েছিলুম। আঘাতটা অবশ্য সর্ব্বাঙ্গেই অনুভব ক'রেচি, কিন্তু পায়ের চোট্‌টাই সব চেয়ে বেশী অসহ্য মনে হচ্চে!...... খুঁড়িয়ে হাঁট্‌চি। সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় টন্ টন্ করচে। তবু এই ভাঙ্গাচুরো দুর্ব্বল শরীর নিয়েই রঞ্জনবাবুর সব অত্যাচারকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা কর্‌তে হচ্চে।

বিশে কার্ত্তিক কলেজ খুল্‌বে। তুই বোধ হয় তা'র আগেই রওনা হবি। আমার ব্যাকুল প্রাণের ভালোবাসা ও প্রেমসুধাপূর্ণ চুম্বন গ্রহণ করিস— জীবনে মরণে শুধু তোমারই—

'লীনা'

* * * * *

ভরন্ত সন্ধ্যা। রাত্রির অন্ধকার মায়ের আশীর্ব্বাদের মতোই মাটীর বুকে ঝরে ঝরে পড়্‌চে।...... ... সান্ধ্যভ্রমণের পর প্রায়ই এই সময়ে চিত্রার সঙ্গে কাঞ্চনের অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। অবসর মতো দু'টী গোপন কথাও হয়। এ ওর মনের পুঁথি পড়ে।

সন্ধ্যার সেই শুভমুহূর্ত্ত।

অবসন্ন দেহটা সোফায় ঢেলে দিয়ে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চিত্রা কাঞ্চনের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সে দৃষ্টি কিছু ম্লান ও গভীর বেদনাপূর্ণ, যেন ভাষা পেয়ে অন্তরের অন্তস্তলের কোন্ রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা তা'র প্রেমাস্পদের কাছে নিবেদন কর্‌তে চায়।

চিত্রার কুসুমপেলব হাতখানি দু'টী হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে নিয়ে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা কর্‌লে— তা'হলে কাল্‌কেই ক'লকাতায় যাচ্চ?

—হাঁা এই সোমবারেই কলেজ খুল্‌বে।

—কেমন ক'রে থাক্‌ব চিত্রা? তোমায় ছেড়ে এই শুষ্ক নীরস মরুভূমিতে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাণটা আমার হাঁফিয়ে উঠ্‌বে যে!

—কেন কবিতা লিখ্‌বে, ছবি আঁক্‌বে। মনকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার সেই ত' তোমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। হয় ত' শেষটা আমাকেও আর মনে থাক্‌বে না।

ডালিমরাঙা ভরন্ত গালটিতে একটি আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত ক'রে কাঞ্চন বল্লে—এমন জীবন্ত কাব্য-খানি চোখের অন্তরালে রেখে আমি যে—

মিষ্টি ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বাধা দিয়ে চিত্রা বল্লে—আচ্ছা হ'য়েচে। কাব্যরচনা আপাততঃ ক্ষান্ত রাখ্‌লেও চল্‌তে পার্‌বে। বেশীদিন ত' নয় আর, একটি মাস পরে তোমারও ত কলেজ খুল্‌বে।

—তোমার বুঝি একটুও কষ্ট হবে না—আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটাই বুঝি দুঃস্বপ্নের মতো মনে হবে? আমায় ভুলে যাবে চিত্রা?

একটা কৃত্রিম কোপ ও অভিমানের সুরে চিত্রা বল্লে—হ্যাঁ—গো হ্যাঁ মশাই, ভুলে যাবো—বেশ যাবোই ত।

শুভ্র হাসির স্নিগ্ধ লহর তুলে কাঞ্চন বল্লে—না হয় মান্‌লুম ভুল্‌বে না, কিন্তু তাই ব'লে আমার চেয়ে আর—ব'লেই নিবিড় আবেগে থাকে বুকে টেনে নিলে।......তারপর তা'র লজ্জারক্ত গালখানি নিজের গাল দিয়ে স্পর্শ ক'রে আবেগ-বিহ্বলস্বরে বল্লে—আচ্ছা কা'র ভালোবাসা বেশী গভীর, চিত্রা?

কাঞ্চনের ব্যাকুল বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চিত্রা অত্যন্ত অধীর হ'য়ে অনুনয়ের সুরে বল্লে—এবারে ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, না—না, ছিঃ! কেউ যদি এসে পড়ে হঠাৎ!

—আগে জবাব দাও আমার।

—আগে ছেড়ে দাও।

—ছাড়্‌ব—উত্তর দাও।

—আঃ - ছাড়ো - ও।

—তা হ'লে বলো শীগ্‌গির।

বীণার ঝঙ্কারের মতো করুণ সুরের রেশ টেনে চিত্রা বল্লে—আঃ, কি জ্বালাতন! আমি কিছু জানি নে যা—ও।

পরাস্ত হ'য়ে নিতান্ত হতাশার সুরে বল্লে—ভারী অবাধ্য মেয়ে তুমি। আর কোনো কথা যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি!

—ইস্! অম্‌নি ছেলের অভিমান হ'লো!

পুষ্পবল্লরীর মতো দু'খানি শুভ্র কোমল হাত দিয়ে কাঞ্চনের কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে চিত্রা বল্লে—রাগ করলে—সত্যি? কি মুস্কিল, তোমার ঐ অদ্ভুত প্রশ্নের আমি যে কোনো উত্তরই খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের ভালোবাসা কি কোনো ভাষা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায়? ভারী ছেলেমানুষ তুমি!

আনন্দের একটা উচ্ছ্বসিত দীপ্তিতে কাঞ্চনের সমস্ত মুখখানি অকস্মাৎ অত্যন্ত দীপ্তিময় হ'য়ে উঠ্‌ল।

নির্ব্বাকবিস্ময়ে চিত্রা তা'র দীর্ঘোন্নত দেহ, তার তেজোদীপ্ত মুখের সুকুমার যৌবন শ্রীটুকুর পানে স্তম্ভিত আচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইল। সঙ্কোচ ভুলে তারপর সে এই প্রথম প্রাণের উন্মত্ত আবেগে কাঞ্চনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তা'র দু'টী গালেই গভীর ভাবে চুমোর রেখা এঁকে দিলে।...কিন্তু পরক্ষণেই একটা দুর্দ্দমনীয় লজ্জা ও সঙ্কোচে একদম সঙ্কুচিত হ'য়ে আরক্ত মুখখানি দুই হাতে ঢেকে বসে পড়্‌ল।...

কাঞ্চন ডাক্‌লে—চিত্রা!

লজ্জানত মুখে অস্ফুট কণ্ঠে চিত্রা বল্লে—কেন?

—আমার ভারী ভয় করুচে চিত্রা, শেষ পর্য্যন্ত যদি তোমায় না পাই, উঃ! আমার পক্ষে সে যে—

—তোমার দু'টী পায়ে পড়্‌চি চুপ করো গো!

—তোমার বাবা যদি অমত করেন, আমায় যদি নিঃসম্বল দরিদ্র মনে ক'রে—

অস্থির ব্যাকুলতায় দুই হাত দিয়ে কাঞ্চনের মুখ চেপে ধ'রে চিত্রা বল্লে—তা হ'লে কিন্তু চল্‌লুম আমি!

তার সুগভীর অতল অপলক দু'টী চোখ হঠাৎ যেন জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

—কাঁদছ?...কেন চিত্রা?

দু'টী সরু জলের রেখা টেনে মুক্তোর মতো দু'টী ফোঁটা অশ্রু গালের ওপর চক্ চক্ করুছিল। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে স্তব্ধ হ'য়েই চিত্রা ব'সে রইল। কোনো উত্তর দিলে না।

—কথা কও লক্ষ্মীটি—মুখ তোল। তোমার এই

ম্লানব্যথাতুর মুখখানির পানে আমি যে কিছুতেই চাইতে পারিনে গো।

তবুও নির্ব্বাক—নিষ্পলক।······তা'র সেই অশ্রু-সিক্ত দীর্ঘায়ত সুন্দর দু'টী চোখ ভাষায় মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে যেন জানাতে চায়,—ওগো এ কান্নার কারণ জান্‌তে চেয়ো না গো, নারীর সব কথা জান্‌বার অধিকার পুরুষের নেই গো, নেই।

অধৈর্য্য অস্থিরতায় কাঞ্চন দুই হাতে তার মুখখানি তুলে ধর্‌লে। তারপর ঝর্ণার ধারার মতো বাঁধনহারা চুমোর ধারা তার গালে, ঠোঁটে অশ্রুসিক্ত চোখের পাতায় অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

আর সেই ঝর্ণার তলে চিত্রা একদম তন্দ্রাচ্ছন্ন অভিভূতের মতো চোখ বুঁজে পড়ে রইল অনেক—অনেকক্ষণ।

কপাল থেকে চুলের গুচ্ছগুলো সরিয়ে, রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দিয়ে কাঞ্চন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বলো না, কেন কাঁদ্‌ছিলে?

নিকষকালো মেঘের বুকে বিজলী লেখার মত্যে ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিলে—এম্‌নিই। অনেকদিন কাঁদিনি,তাই হয় ত—কিন্তু ওকি! তুমি চল্‌লে নাকি না-না আর একটু—এবার বল্‌চি, সত্যি বল্‌ব।

দরজার বাইরে থেকে মৃদু কণ্ঠের একটা অস্পষ্ট উত্তর এল—সময় নেই। একটা বিশেষ কাজ আছে।

* * * *

হুক থেকে রিসিভারটা তুলে কাণের কাছে ধ'রে লীনা বল্লে—হ্যালো, কে আপনি?

—তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে লীনা! আমি চিত্রা।

—কি কথা ভাই? আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর। দরজাটা বন্ধ ক'রে আসি।···ফোন্‌টা পুনরায় মুখে নিয়ে লীনা বল্লে—হ্যাঁ, তারপর?

—গিরিডি থেকে এখানে আস্‌বার পর, 'রণেন বোস' নামে যে ছেলেটিকে প্রথমদিনই দেখ্‌তে পেলুম—দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে এবং কতকটা সম্পদ ও সম্ভ্রমের দাবী নিয়ে যিনি আজকাল নিয়মিত ভাবে দু'টী বেলাই আমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করেন তিনি নাকি—

—সেই আমেরিকা ফেরৎ ভদ্রলোকটি, যাঁর কথা কাল বল্‌ছিলে? কেন—তোর রূপের অব্যর্থ জালে তিনিও বুঝি আট্‌কা পড়েচেন? হায় রে—হতভাগা পুরুষ! হ্যাঁ—তারপর?

—দূর—তা কেন? আগে শোনই ছাই।···কলেজ থেকে ফিরে কেবল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ শুন্‌লুম বাবা কি একটা গোপন বিষয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করচেন এবং সে পরামর্শ সভায় বৌদিও দেখ্‌লুম একজন বিশেষ উদ্যোগী সভ্যা। শুন্‌লুম বাবা বল্‌চেন—তা হ'লে আর দেরী করে লাভ কি? এই দশই অঘ্রাণই দিন স্থির করা যাক্। রণেনেরও সেই রকম ইচ্ছা।···পরে আরও শুন্‌লুম—আমি নাকি বাক্‌দত্তা। আর রণেন বাবুই নাকি আমার ভাবী স্বামী।

—সর্ব্বনাশ! তারপর?

—অকস্মাৎ সমস্ত পৃথিবীটা ভূমিস্যাৎ হ'য়ে গেলেও বোধ হয় ততোখানি আশ্চর্য্য হতুম না। উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে প্রাণটা কেঁপে উঠল। উঃ!—এর চেয়ে কঠোর শাস্তি আমার পক্ষে যে আর কিছুই হ'তে পারে না।...পা দু'টোকে কোনও রকমে চালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে একেবারে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়্‌লুম। বুকের ভেতর বোধ হয় সমুদ্রের প্লাবন জেগেছিল দু'টী চোখে অশ্রুর বান ডাকিয়ে চুপ ক'রে পড়ে রইলুম।

—ভারী কঠোর সমস্যা বটে! কি কর্‌লি তারপর?

—নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদ্‌লুম। সর্ব্বস্ব হারিয়ে মানুষ যেমন ক'রে কাঁদে, যা'র সংসারের শেষ আশা, শেষ অবলম্বনটুকুও খ'সে যায়, সে যেমন ক'রে প্রাণ ভ'রে কাঁদে, তেমনি ক'রে অঝোরে কাঁদ্‌লুম। নারী যে কতখানি দুর্ব্বল অসহায়, সে কথা যেন আজ এই প্রথম অনুভব কর্‌লুম।···

…মনের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তবু প্রতিজ্ঞা করলুম—মনে মনে একবার যাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রেচি, তাকে ভিন্ন আর কাউকে হৃদয় দান ক'রে দ্বিচারিণী হ'তে পারব না—প্রাণ গেলেও নয়।…বিয়ে ত' অনেকদিনই হ'য়ে গেচে আমার। বাকী আছে একটা লৌকিক আচার। কিন্তু আমাদের অন্তরের মিলন-সূত্রের সেই যে দুঃচ্ছেদ্য সুদৃঢ় বন্ধন, সে কি এমনই হাল্‌কা যে বাইরের সামান্য একটা হেঁচ্‌কা টানেই ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাবে। বিবাহ-হীন প্রেম কি এমনই উপেক্ষার জিনিষ?

—বৌদিকে তুই সব কথা জানালি নে কেন?

—তাঁকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি স্পষ্টই অনুমান করচি যে তাঁর মতে রণেন বোসই একমাত্র সুপাত্র, কাঞ্চন বাবুর তুলনায় সহস্র গুণ বেশী কামনীয়।

—এক কাজ করলে হয় না? তুই যদি অবসর মতো তোর বাবার কাছে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারিস, আমার মনে হয় তিনি হয়ত' ব্যাপারটাকে একেবারেই তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেবেন না। যদি একলা সঙ্কোচ হয় তোর না হয় আমিও—

—তুই কি ক্ষেপেচিস্ লীনা? নিজের গোপন প্রণয়ের কথা বাবার কাছে স্বীকার করব? আজ পর্য্যন্ত আমার অনেক আবদার, অনেক বিচিত্র অদ্ভুত খেয়ালকে তিনি সহ্য ক'রে এসেচেন বটে, কিন্তু তাই ব'লে নিজের মেয়ের মুখে এত বড় নির্লজ্জতার কথা শুনেও কি তিনি আমায় উৎসাহ দেবেন ভেবেচিস? আশ্চর্য্য! তোর এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা শুনে অতি দুঃখেও হাসি আসচে আমার।

—কিন্তু তাই ব'লে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলেও ত চলবে না। একটা কিছু উপায় অবলম্বন করতে হবে ত?

—কাল কলেজে গিয়ে অবসর মতো এ বিষয়ে দু'জনে পরামর্শ করব। এখন চললুম ভাই, স্মৃতিটা ভারী জ্বালাতন করচে। রাক্কুসী তখন থেকে ক্রমাগত দরজা ধাক্কাচ্ছে।

*

—সব সময়েই আপনি যেন কেমন উদ্বিগ্ন, উন্মনা হ'য়ে থাকেন। আপনার এই ঔদাসীন্যের কারণ কি, চিত্রাদেবী?

শান্ত গভীর দু'টী চোক্ তুলে মুচ্‌কে হেসে চিত্রা বল্লে—আপনার দেখ্‌চি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবারও ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার মধ্যে আপনি এমন কি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য ক'রেচেন বলুন ত?

খুব সহজ ভাবেই রণেন বল্লে—আপনি যেন আমায় সর্ব্বদাই এড়িয়ে যেতে চান্, পুরুষের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করাটা আপনি যেন পছন্দ করেন না। আপনার বোনটির স্বভাব কিন্তু ঠিক্ বিপরীত। যেম্নি মিশুক, তেমনি হাস্যপ্রিয়। ঐ রকম স্পিরিটেড্ চিয়ারফুল মেয়েকে আমার কিন্তু ভারী পছন্দ হয়।

চিত্রা বল্লে—আপনার স্মৃতিকে পছন্দ হয় শুনে খুব খুসী হলুম। কিন্তু সকলেই ত' আর একরকম প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, রণেন বাবু।

—দেখুন চিত্রাদেবী, অনেকদিন থেকে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব্ স্থির ক'রেচি। রোজই প্রস্তুত হ'য়ে আসি, কিন্তু—

—আপনি অনায়াসে নিবেদন করতে পারেন।

—আমি জানতে চাই আপনি আমায় সত্যি ভালোবাসেন কি না, এতদিনে আমার প্রতি আপনার কি এতটুকু প্রেম—একটুখানি অনুরাগও জন্মায় নি? আমি আপনার স্বামী হওয়ার যোগ্য কি না সে কথা আজ স্পষ্ট ক'রে বলুন।

নিরুপায় নিরুদ্ধ বেদনায় চিত্রার বুকে তখন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। ম্লান হাসিতে চোখের পাতা দু'টো ভিজিয়ে তুলে রণেনের দিকে চেয়ে সে বল্লে—যদি ভালোবাসি না বলি, আপনি বুঝি রাগ করেন খুব?

প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে রণেন বল্লে—নিশ্চয়ই নয়। আমার অযোগ্যতার লজ্জা নিয়ে আমি আপনার পথ থেকে স'রে দাঁড়াই, কাঁটা হয়ে ফুটে থাকতে চাইনে।

মনের ওপর জুলুম চলে না চিত্রাদেবী, ভালোবাসা কখনো গায়ের জোড়ে আদায় করা যায় না।

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে চিত্রা বল্লে—সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যি। আপনি আমায় নিশ্চিন্তে বিশ্বাস কর্‌তে পারেন।

—আমার লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা কর্ব্বেন রণেন বাবু, আমি আপ্‌নাকে স্বামীত্বে বরণ কর্‌তে একেবারেই অক্ষম। কারণ আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থাৎ—না—না, থাক্ সে কথা।

—লজ্জা কি চিত্রাদেবী! আপনি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।

লজ্জায় সঙ্কোচে চিত্রা অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। মুখ তা'র রক্ত গোলাপের মতো রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। অস্ফুট কোমল কণ্ঠে প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে বল্লে—আমি একজনকে ভালোবাসি রণেন বাবু!

—আপনি ?

—হ্যাঁ আমি। সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে একমাত্র তাঁকেই আমি স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রেচি।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণেন শুধু বল্লে—ও বুঝেচি !......

পরক্ষণেই সে আবার বল্লে—ভাগ্যিস্ একথা বল্লেন আজ, নইলে—উঃ ! নইলে আমাদের দু'জনের জীবনই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হ'য়ে যেত। চিরজীবন শুধু দুঃখ ও অশান্তির পসরা ব'য়ে চলা সে কি সহজ শাস্তি চিত্রা দেবী ? মিথ্যা দ্বিধা বোধ না ক'রে আপনি যে অসঙ্কোচে একথা আজ আমার কাছে স্বীকার কর্‌লেন, সেজন্য আমি আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিচ্ছি।

একটা অবর্ণনীয় নীরব কৃতজ্ঞতা চিত্রার দু'টী চোখে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। পরিপূর্ণ আবেগে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বল্লে—আপনি মহৎ রণেন বাবু, আপ্‌নার হৃদয় যে এতখানি প্রশস্ত ও উদার তা' আমি-

বাধা দিয়ে রণেন বল্লে—আপনি ব্যস্ত হবেন না চিত্রা দেবী, প্রশংসার কাঙাল আমি নই। ভালো কথা, আপ্‌নার পিতা বোধ হয় এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানেন না ? জানেন কি ?

—না, কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা কর্‌চেন যে ?

—প্রয়োজন আছে। আমি আজ্‌কেই আপ্‌নার পিতাকে সমস্ত কথা খুলে বল্‌ব। আপ্‌নি চিন্তিত হবেন না, আমার খুব বিশ্বাস তিনি আমার অনুরোধ কিছুতেই অবহেলা কর্‌তে পার্‌বেন না। আজ থেকে এ বিষয়ে তাঁকে সম্মত না করা পর্য্যন্ত আমার আর অন্য কাজ নেই। নিজের শক্তির ওপর চিরকালই আমার অগাধ বিশ্বাস।

—আপ্‌নার মহত্ত্বের সীমা নেই রণেন বাবু! এ ঋণ আমি কোনোদিনই পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

খুব সরল অথচ উচ্ছ্বসিত স্বরে রণেন বল্লে—অনর্থক কতকগুলো বিশেষণে বিশেষিত ক'রে আমায় লজ্জা দেবেন না চিত্রাদেবী, এ আমার কর্ত্তব্য। আপ্‌নাদের দুজনের মিলন সহজ সফল সুন্দর হোক্, আমার কাছে তার চেয়ে বেশী আনন্দের বিষয় আর কিছুই হ'তে পারে না।

—আপ্‌নার মতো ন্যায়পরায়ণ শুভাকাঙ্ক্ষী উদারপ্রকৃতির মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না, আপ্‌নাকে যে কি ব'লে—

—আপ্‌নি কিছু না বল্‌লেই আমি সুখী হব। প্রশংসা জিনিষটার ওপর আমার একটুও লোভ নেই।

মিনতিভরা করুণ কণ্ঠে চিত্রা বল্লে—আমার একটা অনুরোধ আপ্‌নাকে রাখ্‌তে হবে রণেন বাবু,—স্মৃতিকে আপ্‌নার নিতে হবে। আপ্‌নাকে আপনি করে নেওয়ার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছিনে।

শুষ্ক ম্লান হাসি হেসে রণেন বল্লে—অনুগ্রহ না কি ? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আপ্‌নাকে দেখ্‌চি

অনেকখানি বাক্‌-পটু, বিবেচক ক'রে তুলেচে।...... কিন্তু আমি ছাড়াও কি আপনার বোনটির পাত্রের অভাব হবে চিত্রাদেবী ?

—অপাত্রের না হ'লেও সৎপাত্রের অভাব হবে। কেন আপনার কি মত নেই রণেন বাবু ?

—আপনি অখুসী হবেন, কিন্তু উপায় নেই। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে পারলুম না। আমায় ক্ষমা করবেন।

চিত্রা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তা'র মেজ্‌দা'র সঙ্গে স্মৃতিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সহসা তার সমস্ত মুখখানি সিঁদুরের মতো রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে সেটা লজ্জায় না প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমানে ঠিক্ বোঝা গেল না।

*　　*　　*

দশই অঘ্রাণের এক শুভলগ্নে চিত্রার জীবন সত্যিই কাঞ্চনের সুঠাম বলিষ্ঠ বাহু কারাগারের মধ্যে চিরদিনের জন্যই বন্দী হ'য়ে গেল। একমাত্র রণেনের ব্যাকুল পীড়াপীড়িতেই চিত্রার পিতা এ বিষয়ে অবশেষে সম্মতি দিয়েছিলেন।

আত্মীয় বন্ধু অনেকেই একত্রিত হ'য়ে চিত্রার বিবাহ-বাসর সরগরম ক'রে ছিলেন বটে, কিন্তু সেদিন সেই সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী রণেনকে সমস্ত শহর খুঁজেও কেউ তার সন্ধান করতে পারলে না।......

খোঁজ পাওয়া গেল বিয়ের তিন দিন পর। চিত্রার সেদিন বৌ-ভাত। ছোট দেওর এবং অন্যান্য সমবয়সী মেয়েদের অসংখ্য বিচিত্র প্রশ্নের চিত্রা তখন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ঠিক্ সেই সময়ে কাঞ্চনের দিদি সুমিত্রা দেবী ঘরে ঢুকে সস্নেহ কণ্ঠে চিত্রার পানে চেয়ে বল্লেন—তোমার নামে একটা ইন্‌সিওর আছে বৌ-লক্ষ্মী। শীগ্‌গির উঠে এস।

চিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে খুব নিরিবিলি একটা ঘরে ঢুকে সুমিত্রা প্রথমে মোড়কটি ছিঁড়ে ফেললে। তারপর একটা ভেল্‌ভেটের বাক্সের ভেতর চমৎকার এক ছড়া আধুনিক ফ্যাসনের মফচেন এবং খুব দামী পাথর বসানো একটি সুন্দর আংটি দেখে ব্যগ্রবিস্ময়ে উৎসুক হ'য়ে সুমিত্রা প্রশ্ন করলে—কে বৌ-লক্ষ্মী ? এ উপহার কে পাঠিয়েচে তোমায় ?

—আমার এক দরদী দুঃখী বন্ধু, সংসারে তার কেউ নেই।

ছোট্ট একটুক্‌রো কাগজে শুধু দু'টী কথা লেখা ছিল,—চিরায়ুষ্মতীষু—'রণেন'।......অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা কিছুতেই আর গোপন রইল না। চোখের জল ঝর্ণার ধারার মতোই চিত্রার দু'টী গাল বেয়ে নেমে এল।...অশ্রুসিক্ত নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে তবু সে ঐ ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট অক্ষর গুলোর পানেই চেয়ে রইল...



যেদিন অজানারে আপন করিয়া জানিবে তুমি

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

যৌবন-গৌরব-ভরা হে রজনীগন্ধা আমার—
প্রতি পরাগেতে তব কী কামনা জাগে অনিবার ?
ক্লান্ত তব যৌবন-উদ্বেল হিয়া বিভাবরী জাগি
যুগ-যুগান্তের অনাদি অমর কোন্ প্রিয় লাগি—
ধরণীর প্রথম প্রভাত হতে শেষ নিশাবধি
যাপিবে সোণার জীবন তব এমনি কী নিরবধি ?
কূলে কূলে তব চলিছে চঞ্চলিয়া যে পুলকের গান,
তারে কী ফিরাবে রিক্ত হাতে, বঞ্চিত সব দান ?
অবহেলে কী গো চূর্ণ করি দিবে কামনার মায়া
জাগ্রত জীবন প্রভাতের পাতে—যৌবন-উচ্ছলকায়া
নিয়া প্রিয়া লাগি রবে জাগি এই কি গো তব পণ ?
দিয়োনা বিদায়, যৌবন-ময়ী চঞ্চল-চরণ
বিধবা বনানীর কুঞ্জ-পত্র ছায় ; উন্মুখ্ চিত্ত চায়
সম্ভোগের সুরাপাত্রখানি পূর্ণ করি একেবারে হায়
কামনার মদে নিঃশেষি দিতে লক্ষ কোটী প্রলোভন—
যারা মোরে পঞ্জরে পঞ্জরে উতলিয়া তোলে অনুক্ষণ !

* * * * * *

হে বন্ধু, আমার ও হৃদয়ের দুইকূল ছাপি চলে যৌবন
চারিদিকে গানে-গন্ধে রচি আনন্দ নির্ঝর মৌ-বন—
প্রিয়া লাগি আমি বন্ধু বাহিরিনু জীবনের পথে
তুচ্ছ করি সীমার সীমানা নিখিলের নব রথে ।
জানো বন্ধু, শরতের প্রথম সুপ্ত শেফালিসম্পাতে
শীতস্নিগ্ধ মর্ম্মলিপিখানি তার, দিয়ে গেছে হেম হাতে—
আর আজি আমি আপনারে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলি
নিখিল ভুবনের মুক্ত গগনের তলে দুই বাহু মেলি

ডাকিতেছি তারে, বক্ষ আমার কেঁপে ওঠে বারেবারে—
তারি মাঝে আমি বিসর্জ্জিয়া দিনু মোর আপনারে।
সেই ধ্বনি সাগরের দোলা সম চঞ্চলি চলে নিরন্তর,
ওই বনানীর জীর্ণ-পত্রদলে সেই ঢেউ লেগে কাঁপিছে থরথর-
মনে পড়ে মোর মাতালী মেঘের বাতায়নে ক্ষণে ক্ষণে
আঁখি তার দেখা দিত যে জনা ডুবেছে কালের বিস্মরণে।

*　*　*　*　*　*

রক্ত-করবীর কবরীর তলে জানো বন্ধু কত কোটী ছলে
তপ্ত তৃষা লুকাইয়া রেখেছিল প্রিয়া মোর কুতূহলে—
আমি তারে দিনু খুলি মুক্ত করি রঞ্জনের আবরণ,
সেইদিন প্রিয়া চলি গেল হায় নিরালায় চঞ্চল চরণ
জলধি যেথা যৌবন-ঢলঢল নদী লাগি রয় জাগি
শুধু ক্ষণিকের তরে দুইবুকে প্রেম-পরশন মাগি।
হে বন্ধু, যাত্রা তব কোন্ অজানায় হবে ওগো শেষ—
যেথা শ্যামল তৃণের পরে এলাইয়া কমনীয় কালো কেশ
একেলা রহিবে তুমি আন্-মনে প্রিয়তম পথ চাহি,
যেদিন অজানারে আপন করিয়া জানিবে তুমি—
আমি রাঙা গালে দিব সঁপি চামেলীর চুল একবার চুমি।
প্রাণের প্রাঙ্গণ-তলে আনন্দ উঠিবে জাগি জীবন্ত কায়া নিয়া,
যৌবন-চঞ্চল অঞ্চল তব উন্মনা করি পুলকের বান দিয়া।



কুলীর মূল্য

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

……আটটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কলের সিটী বেজে ওঠে, হুড়মুড় ক'রে খোলা ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে অগণিত নরনারী। …যারা পিছিয়ে থাকে তারা সবাই ছুটে আসে হন্তে হ'য়ে।… সর্বনাশ! রোজকামাই……

যারা আরও পিছিয়ে থাকে, মরি বাঁচি করে ছুটে আসে একেবারে ফটোক বন্দর মুখোমুখী সময়ে।…… স্তুতি, মিনতি, খোষামোদ শেষকালে পান-খাওয়ার ইঙ্গিতে দরজার 'হুজুরে'র মেহেরবানী হয়, তবে তারা ঢুকতে পায়। আরও পিছে পড়ে থাকে যারা, তারা এসে বন্দ ফটোকের সাম্নে বসে ধুঁকতে থাকে শুধু।… প্রাণ বুঝি বেরোয়।……

বিকেলবেলা সাড়ে চারটে বাজ্‌লেই সব এসে জড়ো হয় কলের দরজার সাম্নে। দরজার হুজুরেরা রক্ত-চোখের তাড়না নিয়ে তল্লাস করে জামা কাপড়, ট্যাঁক, পকেট, কাছা প্রভৃতি। যদি কেউ কিছু চুরী করে! তারপর বেরিয়ে আসে খোঁয়ার ছাড়া পশুর দল।

এই তল্লাসীটা বড় বিরক্তি কর।……একে তো খিদের জ্বালায় নাড়ীতে পাক ধরে। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে মন আর চায় না।… তার উপর তল্লাসীর নামে হুজুরদের গুঁতো, ধাক্কা, মিঠাবুলি, তারও উপর মাঝে মাঝে ট্যাঁক থেকে, পকেট থেকে দু'চারটে পয়সাও চলে যায়।

মেয়েগুলোর মুস্কিল আরও …ওদের নাকি সতীত্ব নেই! গরীব-ছোটলোক তো। ওদের আবার সতীত্ব, নারীত্ব কি?……ময়লা, ছেঁড়া, তালি-মারা কাপড়ে কি আর সতীগিরি চলে?

হুজুরদের ধারণাই এই। তাই তল্লাসীর সময়ে তাদের ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা বুকের আঁচলে টান পড়ে।…

অকস্মাৎ তল্লাসী প্রভুরা আনন্দে মস্‌গুল হ'য়ে তান ধরে,—মেরে পেয়ারী।

কত রঙ্‌…কত ঢঙ্‌।

বুকের কাপড় হাত দিয়ে চেপে ধরে……বাকী কাপড়টা ঠিক ভাবে সামলিয়ে রেখে তল্লাসী হ'তে দেওয়া, সে এক ভারী গোলমেলে কাণ্ড।……তার উপর আবার হাওয়ার অত্যাচার আছে। তাই অনেকেরই বাধ্য হ'তে হয় লজ্জার মাথা খেয়ে বুক-খানার ওপরেই তল্লাসী হাতের অত্যাচার সইতে দিতে।

অনুপায় …, নইলে চাক্‌রী থাকে না।

রোজ রোজ এ তাদের সইতে হয়ই।

নিত্য যাদের ঘরে অভাবের তাড়না, নিত্য যাদের সংসারে ক্ষুধিতের ক্রন্দন, রোগে-শোকে-চিন্তায় শুধু দীর্ঘশ্বাসই যাদের সম্বল তাদের তো অতশত বাছ্‌লে চলে না। মান-অপমান তাদের ডুবে যায়।……

কলের মালিক আরে বিরাট মানুষ তিনি। মস্ত ভুঁড়ি, সাফ্‌ মুড়ী।…

মানুষ চোলাই ক'রে 'রুধির' তৈরী ক'রতে তিনি খুব জানেন ও করেন।

অনুগৃহীতেরা বলে,—ওঃ আপনার কি দয়া! কত গুলো লোকের অন্ন জুটিয়ে দিয়েছেন।……আপনি অন্নদাতা, অনাথের পিতা। আরও সব মেলা-রকমের। মনে নেই।……

কল—টাকা তৈরী ক'রচে রোজ। সে কত রকমে।…মালিক মহাশয়ের বাড়ী, গাড়ী, নাচ, গান, আমোদ, ফুর্ত্তি কত কি হচ্ছে।…মস্ত খেতাব-কাগজে খুব নাম। অশ্রান্ত ফুর্ত্তির ফোয়ারা।

মালিক মহাশয় যেমন ধনী—তেমনি দানী। দানও একটু আধটু নাকি! অমুক লর্ডের বিধবা পত্নীর সাহায্যে···—এত হাজার টাকা নিয়মিত বন্দোবস্ত। অমুক বল্-ড্যান্স্-পার্টির সাহায্যে এত টাকা। অমুক মিশানের টীচার ও গার্লদের জন্য এত টাকা। এই রকম সব মোটা মোটা দান।

সামান্য কথা কি?...

যাদের অন্নদাতা—সেই সব অন্নহীন সন্তানেরা রোজ রোগে, শোকে জীর্ণ দেহ নিয়ে আসে—কলের চাকার তলে দেহ রেখে দেয়—রুধির তৈরীর জন্য।··· শরীরে রক্তই নেই, তা তৈরী হবে কি? তাই অচল, অকেজো দেহগুলোর ওপর মাঝে মাঝে লক্লকে বেতের চুমু, বুটের ছোঁয়া পড়ে—তাদের কাজের ক'রে নেবার জন্য।

মেয়েগুলো - যৌবন যাদের নিরাহারী দেহেও রাজত্ব ক'রতে ছাড়ে না, হ'য়ে পড়ে খেলার জিনিষের চেয়েও খেলো।...যা খুসী তাই।··টাকা, পয়সা, প্রলোভন নয়—, জবরদস্তী।—

ঘরে কচি ছেলে কাঁদে, মাকে সারা দিনের শেষেও না পেয়ে; অনাহারী স্বামী বসে থাকে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে, মুমূর্ষু পিতার রক্ত-হীন আঁখি মেলা থাকে দুয়োরের পানে কাতর দৃষ্টি নিয়ে,... তাদের একমাত্র ভরসা যে, তার ওপর তখন চল্‌চে জুলুম, অত্যাচার। যে মায়ের প্রাণ ব্যাকুলিত রয়েচে গৃহ-পানে শুধুই, তাকে তখন যুঝতে হচ্ছে বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে।

কেউ হাঁসপাতালে যায়, কেউ মরে...কেউ ফেরে ঘৃণিত দেহ নিয়ে, হাহাকার, আত্মগ্লানি, ধিক্কারে বুক পূরিয়ে।···

হারে অভাগা দেশের অভাগা জাতি।

ফুঁ দিলে রবারের ব্লাডারটা ফোলে ব'লেই কি অবিরত ফুঁ নিতে পারে? বেশী হাওয়া হ'লেই ফেটে যায়।

কত আর সইতে পারে লোকে।...রক্ত মাংসের শরীরই তো।...একদিন সব ক্ষেপে গেল। সমস্ত কল জুড়ে সত্যাগ্রহ বিশাল লৌহ-দানব কদিন থেকে চুপ

হঠাৎ এতটা!...

ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে যে আগুন জ্ব'ল্‌তে থাকে—একটু সহযোগ পেলেই তা এমনিই প্রদীপ্ত হ'য়ে দেখা দেয়।···আমরা বলি হঠাৎ।

...গৌরী কাহারের বউ পুনিয়া—সেদিন তল্লাসীর সময়ে সকলের শেষে তল্লাস হ'ল। তখন সবাই চ'লে গেছে। একা পুনিয়া···আঠারো উনিশের মাঝামাঝি তার বয়স। কালীর ছাপের ভেতরে সাদা রেখা যেমন ফুটে ওঠে,—কলের ময়লার ফাঁকে পুনিয়ার রূপ তেমনি উঁকি দেয়।

গৌরীর অসুখ—বিছানাতে পড়ে থাকে।...বছর খানেকের একটা ছেলে, পাঁজ্‌রা সার। কাজেই পুনিয়াকে কাজে আস্‌তে হয়। নইলে কারুর ইচ্ছে নয়।

ইচ্ছে কি হয়—রোগা স্বামীর কাছে কচি ছেলেকে ফেলে সহস্র কলুষিত দৃষ্টির মাঝে নিজেকে নিয়ে আসা?...কিন্তু খায় কি?

পুনিয়া ফটোকের দিকে পা দিতেই—তাড়া এল, উঁহু...। ছোট সাহেব ডেকেছে। সশঙ্কিত চাহনীর উত্তর এল—হয়ত গৌরীর অসুখ শুনে সাহেবের খুব দয়া হয়েচে। তাই সাহেবের হুকুম তার ঘরে যেতে।

অগত্যা।...

মনিব যে, হুকুম রাখ্‌তেই হবে।

তারপর সায়েব—রাজার জাত। ওরা তো গরীবের মা বাপ্‌ দয়ার কথাটা সম্ভবতঃ সত্যিই।...

দয়াটা সত্যিই বটে, আর একদিক দিয়ে।

পুনিয়া ছোট সাহেবের ঘরে যেতেই—গম্ভীর কণ্ঠে-সায়েব ডাক্‌লে,-ইধার আও—বাত হ্যায়।...কম্পিত-দেহা পুনিয়া ক্যাম্প-খাট্‌টার কাছে যেতেই পিছনে দরজা পড়ে গেল। কে শেকল টেনে দিলে।

সাহেবের বাত প্রকাশ পেল তাকে ঝাপ্‌টে ধর্‌বার সময়।…ছেঁড়া কাপড় আরও ছিঁড়ে গেল। জবরদস্তি ও বাধার যুদ্ধে।

গৌরী কাহারের রক্ত চন্‌ চন্‌ ক'রে উঠ্‌ল।…উঠ্‌তে পারে না, হঠাৎ শক্তি এসে জুট্‌ল।…সন্ধ্যার একটু পরে ছোট সাহেব বেড়িয়ে ফিরচে—সাম্নে এসে দাঁড়াল গৌরী। কী একটু তর্ক হ'ল। অকস্মাৎ 'শালে, সুয়ার কি বাচ্ছা'—সঙ্গে সঙ্গে সবুট পদাঘাত। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে।…একটু দম নিয়ে আরও কতকগুলা।

রোগা দেহে আর কত সয়?…

গৌরীর মরা দেহ, আর পুনিয়ার কলঙ্ক দুটো মিলে আগুন জ্ব'ল্‌ল। এই সহযোগের অভাবটুকুই যেন এতদিন ছিল। অসীম সহিষ্ণুরা আজ ক্ষেপে দাঁড়াল।…বিচার—বিচার—বিচার চাই। আমাদের দাবী—মানুষের ন্যায্য পাওনা দিতে হবে। আর সইব না,—কেন?

হারে হতভাগ্য জাতি—বিচার করবে কে? কে তোদের ন্যায্য পাওনা দেবে?

মনিব—সে স্বদেশী, বিদেশী যাই হোক—সমান। বিদেশী যদিও ভালো—স্বদেশী, আরও ভীষণ। নিজের দেশ তাই কিনা! তাদের হুকুমে বড় বড় লোক খাট্‌চে, বিজ্‌নেসের ম্যানেজার হচ্ছে সায়েব। তারপর আরও কত সায়েব। ছোট, বড়, মেজ।…এদের কাজের ওপর কি কথা চলে? বদ্‌মাইস ওরাই—ছোট লোক পাজীরা।

এক দিন গেল—দুদিন গেল।

তিন দিনের দিন পুলিশ এল। বস্তি ঘিরে ফেল্‌লে।

গুলি-গোলা চল্‌ল। কতক গুলোর পিলে ফাট্‌ল,—কতক গুলোর মাথার খুলী ভাঙ্‌ল। বাকী গুলো চালান হ'ল—বাছা বাছা মোড়লরা।

কোথা থেকে কলে জুটে গেল—পাঁচ মিশুলী জাত। চীনে, জাপানী, মগ, ফিরিঙ্গী, উড়ে, বাঙালী, খোট্টা প্রভৃতি।…দিব্যি কল চ'ল্‌ল।…

আরও দুদিন বাদে—হুকুম হ'ল, বস্তির জমীদারের বস্তি ছেড়ে দেবার। কেনর কারণ নেই। খুসী…

একদিন বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। পাছে কেউ কথা অমান্য করে থাকে।…দলে দলে রাস্তার ওপর বসে কুলীরা চেয়ে রইল—ঘর দোরের প্রতি।

চোখ ফেটে কান্না আসে।…

ম্যানেজারের মাইনে বেড়ে গেল। প্রোপ্রাইটার খুব খুসী, পাজীগুলোর উচিত শাস্তিই হয়েচে!



নারীর আসন কোথায়

শ্রীহেম সেন

নারী জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস্, পি, এইচ্, ডি লিখিত "নারীজাতির প্রতি সম্মান", উচভট্ট আচার্য্য মহাশয়ের লিখিত "নারীর সম্মান—ভারতে ও ইউরোপে", 'উড়োখই' মাসিক পত্রিকায় জনৈক "নবীনার পত্র" প্রবন্ধগুলি এবং অন্যান্য আরো কত প্রবন্ধ প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতি সম্বন্ধে আলোচনা নারী এবং পুরুষ উভয়ের দিক হইতেই চলিতেছে—অবশ্যই ইহা মেয়ো—পিল্চার লিখিত পুস্তক বাহির হওয়ার অনেক পূর্ব্বেই। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনু হইতে যে সব শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ মনু ভাল মন্দ দুইই লিখিয়াছেন এবং তাহা সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যই। মনুকে তো আমরা বর্ত্তমানে old fool বলিয়া বাতিল করিতেই প্রস্তুত (!)। অন্যথায় অধ্যাপক মহাশয়ই বা এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া মনুর শ্লোক ঘাটিবেন কেন? যে সময়ে মনু নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তখনকার সামাজিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। যে দেশে লিখিত উপদেশ বা নিন্দার চেয়ে নারী সম্বন্ধে উজ্জ্বল সদৃষ্টান্ত বর্ত্তমান, সেখানে মিস্ মেয়োর স্থান নাই।

"নবীনার পত্র" খানা দাম্ভিকতায় পূর্ণ। "কার্য্যক্ষেত্রে নেমে আমরা দেখ্‌ছি তোমরা অতি বোকা, অতি নির্ব্বোধ,"—"তোমাদের মত আমরাও বলীয়ান", —"জগতে আনন্দ আমাদেরও উপভোগের যোগ্য"— "আমরা আর তোমাদের ভার্য্যা নই",—"আমরা আর আতুর ঘরে শুধু বদ্ধ থাকৃতে চাই না" ইত্যাদি পড়িলে মায়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির কথাই মনে হয়। বোকা ও নির্ব্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের অধিকার হরণ করে কিরূপে? সকলেই কি সকল 'আনন্দ' উপভোগ করিবার অধিকারী? তোমরা 'বলীয়ান' নয় কে বলিবে?— তোমরা বহুবলধারিণী। তোমরা 'ভার্য্যা' নও কেন? —এক কথায় তোমরা সব। তোমরা "নারীত্বের মুকুট" পরিয়া এক platform এ আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তখন আর তোমাদের এ ক্ষোভ থাকিবে না। "তাই আমরা আতুর ঘর ছাড়তে বদ্ধপরিকর।" এ যেন সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। নারী মাত্রই যদি এরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েন এবং তার ফলে নূতন সৃষ্টি আর না হয়, তবে হে নারী, তোমার আবশ্যকতা সমাজে নাই;— তোমার কার্য্যে জগতের কতটুকু মঙ্গল সাধিত হইবে? ক্রমে মানবের অস্তিত্ব জগত হইতে মুছিয়া যাইবে। "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" এও যে দেখিতেছি তাই। নারী দশমাস গর্ভাবরণে রাখেন — প্রসবান্তে শিশুকে কোলে জড়াইয়া স্তন পান করান, তারপর সারাজীবনই এই নারী স্নেহ-মমতা-ভালবাসার আবরণে যত্নে রাখেন। এসব তাঁর প্রকৃতি। পাখীকে বল্‌তে হয় না—তুমি তোমার শিশুগুলিকে আহার যোগাইয়া দাও। এটীও তার প্রকৃতিগত। মাতৃত্বই নারীর চরম তৃপ্তি। তবে দুই এক জায়গায় exception দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মানব মণ্ডলীর আয়ত্বের বহির্ভূত।

এ জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুইটাই বিরূদ্ধ প্রকৃতি অথচ এক জায়গায়ই মিলন,— অপূর্ণ প্রকৃতি পূর্ণতাকে বরণ করিয়া লয়েন।

আত্মার শিক্ষার জন্য যেমন প্রকৃতির অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছে, সেইরূপ পুরুষের-সমাজের—এক

কথায় জগতের শিক্ষার জন্যও নারীর অস্তিত্বের আবশ্যকতা ছিল, আছে এবং থাকিবে। পুরুষের শিক্ষার জন্য যদি নারীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়, তবে দেখা যাউক, এই নারীর স্বরূপ কি? ভগবান কারণজলে ভাসমান থাকা অবস্থায় তাঁহার কপাল হইতে যে মহাতেজঃরাশি বিনির্গত হয়, তাহাই নারী বা মহাশক্তি। এখন জানা গেল নারীর মহাতেজঃ দ্বারাই পুরুষ—পুরুষ; অর্থাৎ নারীর মহাশক্তি ব্যতীত পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে না। এই জন্যই নারীর এত সম্মান—জগতে নারীর পূজা পুরুষ কর্ত্তৃক হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজে নারীর আসন নীচে নামিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ,—

"নভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা"

কথাটা এখন আর সর্ব্বত্র নাই বলিয়াই মনে হয়। একদিকে যেমন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" কথাটার সার্থকতা নাই বলিয়া নারী জ্ঞানান্ধই থাকিয়া যায়, পক্ষান্তরে এই নারীই মাতৃস্থানীয়া হইলে শিশুকে জ্ঞান জাগাইয়া দিতে অক্ষম হয়, যদিও তাঁর হাতেই প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ে। অন্ধ কখনও অন্ধকে পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে সক্ষম হয় না। এই শিক্ষা না দেওয়ার দোষটা কার? কিন্তু এই নারী সময়ে বুঝিতে সক্ষম হয় যে সে জ্ঞানান্ধ। তখনই পুরুষের প্রতি—সমাজের প্রতি - সামাজিক নীতি ও দেশাচারের প্রতি মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এবং যার প্রতি পতিব্রতা ভার্য্যা তুষ্টা না থাকেন, তিনি অধর্ম্মই করিয়াছেন, পরন্তু তাহার কর্ত্তব্যের মস্ত একটা ত্রুটী হইয়াছে এবং ইহার প্রতিকারের উপায় না থাকায় সমাজের বিশেষতঃ জগতের খুব বড় ক্ষতিই হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ এবং নিজ নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী। অজ্ঞানতাই যদি সংসারের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়, তবে উভয়ে উভয়কে জ্ঞানদান দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে। যদিও সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে ঢাকিয়া আছে, তবু চেষ্টা করিতেই হইবে। চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং কার্য্য সময়ের অধীন। চেষ্টা করিতে করিতে সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ইহাতে ভীত হইয়া হাল ছাড়িলে চলিবে কেন? ভয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন। এই দুর্ব্বলতাই মানুষকে কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট করে। পুরুষের সংস্কার আছে যে নারী গৃহে রান্নার কার্য্য, সন্তান পালন এবং ঘর-কন্নার কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন বাহিরের বিশেষ কাজ তাহা দ্বারা হইতেই পারে না এবং হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও নাই। ইহা একটা সংস্কার মাত্র। সংস্কার মানে যদি মনের একটা বিশেষ ঝোক বলিয়া ধরা যায়, তবে ইহা স্বীকার্য্য যে ঝোক (whims, জিনিষটাই একটা মস্ত ভুল। নারী যদি মহাশক্তিই হয়েন এবং পুরুষ যদি নারীকে আশ্রয় করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া উপায় কি? এক্ষেত্রে পুরুষ, তুমি দুর্ব্বল, ভীরু! তুমি পুরুষ নও কাপুরুষ। পুরুষ তুমি বীর হও, প্রভু হও স্বাধীন হও, কামজয়ী হও। ক্রীতদাসের মত কার্য্য এবং ব্যবহার কর বলিয়াই তোমার দুঃখ দৈন্য ঘুচিতেছে না। তোমার স্বাধীনতা নাই, তুমি দাস মাত্র। দাসকে প্রেম দিতে নারী অক্ষম। বসুন্ধরা বীরের পূজাই করিয়া আসিতেছেন। তুমি যেমন স্ত্রীকে ক্রীতদাসী করিয়া রাখিতে চাও, স্ত্রীও তোমাকে দাস করিয়া রাখিতে চাহেন। এক্ষেত্রে ভালবাসা বা প্রেম কোথায়? একটা বিকার মাত্র। বিকার হইতেই তোমার যাতনা। তোমার আনন্দ আসিতেই পারে না। পুরুষ, তুমি স্বার্থপর। তাই নারী কতকটা পরশ্রীকাতর হইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগেই সুখ। তুমি ত্যাগী নহ। তাই নারীর প্রকৃত স্বরূপ তুমি দেখিতে পাওনা। তুমি নারীর মুক্তির সহায় হও, নিজেও আনন্দ পাইবে!

অনেকে স্ত্রীস্বাধীনতা দোষণীয় মনে করেন। স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। নারী যদি পরাধীন হইয়াই থাকেন, একদিন তিনি স্বাধীন ছিলেন আবার তিনি স্বাধীন হইবেনই। অক্ষম শিশু

পড়িতে পড়িতে সময়ে উঠিয়া দাঁড়ায় ও চলিতে থাকে। নারী লুপ্তশক্তি জাগাইবেই এবং তাহা পুরুষের সুখ-শান্তি ও মুক্তির জন্য। প্রকৃতি নিজের জন্য কিছুই করেন না। পুরুষ, যদি তোমার অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে তাহা ত্যাগ কর—প্রকৃতিতে আত্ম-সমর্পণ কর।

নারী, তুমিই মা মহাশক্তি। তোমার এই মহা-শক্তির উদ্বোধন নিজেকেই করিতে হইবে। তুমি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, তাই তুমি নগ্না। তুমি বিলাসিনী নও মা,—তুমি ব্রহ্মচারিণী,—কঠোর ব্রতধারিণী। তোমার আত্ম সম্মান জাগিয়া উঠুক। তোমার যেমন অনন্ত শক্তি, তেমন অনন্ত কর্ত্তব্য। তুমিই লক্ষ্মী, লজ্জা, শ্রদ্ধা, তুষ্টি ও স্বর্গ। তুমিই ত্যাগের—প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। তোমাহইতেই সকলের সৃষ্টি। তুমি জননী, সন্তানপালিনী। অয়ি প্রাণময়ী নারী, সেই কারণে তোমার আসন সর্ব্বোচ্চে।

স্মৃতির-দহন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মোর এ দীর্ণ-পঞ্জর ঠেলি' অনিবার জাগে মুরতি কার?
হ'য়ে যায় মন উদাস কেমন চিত্ত-দোলায় দোলনে তার!
তারই অশ্রান্ত-দোলার-দোলনে হৃদয় গগনে দুখের হাওয়া,
বারে বারে হায়, কাঁদাইয়ে যায়,—ভাবিলেই তারে বেদনা পাওয়া।
কে সে মায়াবিনী এত ছিনিমিনি ক'রে গেল কত অলীক খেলা?
একি জ্বালাময়ী-স্মৃতির-দহন জীবনে এসেছে গোধূলী বেলা।
চিত্ত-আকাশে লোহিত আলোর শিখাটি নীরবে নিভিছে রে,
ব্যথার-কালিমা সঘন-আঁধারে ধীরে অতি ধীরে মিশিছে রে!
জীবনের আলো ধিকি ধিকি জ্বলে, অবসান বুঝি হয় এবার;
ভালো তাই ভালো গোধূলীর-আলো নিভে গিয়ে যেন জ্বলে না আর।
চির-জনমের সঙ্গিনী হ'য়ে মন-গহনের নিরালা-কোণে,
সে 'আশার-লতা' সুমধুর কথা কহে না ত' আর সঙ্গোপনে।

*　　*　　*　　*

মনে পড়ে সেই আধ-ঘুমঘোরে রহিতাম যবে নিদ্রাগত,
নয়নে কোমল-কর-পল্লব চাপিয়া ধরিতে সাদরে কত।
সব ভুলে' গিয়ে ধরিতাম চাপি' আদর করিয়ে অধর-পরে,
চুমার-চুমকি-হারেতে তোমায় সাজায়ে দিতাম ক্ষণেক-তরে।

দুজনে বিজনে আঁখির স্বপনে কুসুম-ফোটানো-জ্যোছনা-রাতে,
অপলকে তোমা দেখিতাম চেয়ে—কি যে আঁকা আছে নয়ন-পাতে !
ঘুরাইতো মোরে তব পাশে পাশে তোমারি কাজল-আঁখির-তারা,
চিত্ত-চকোর তোমারে দেখিতে উড়িয়া বেড়াত পাগল-পারা।
তোমারি নিপুণ-কোমল-করের কঙ্কণসুর শুনেছি আমি,
কত শতবার আনাগোনাছলে দেখা হ'তো দোঁহে দিবস যামী।
ভুলিতে গেলেই ভেসে ওঠো, আর ভাসিলেই তুমি দুলিয়া ওঠো,
ধাই পিছু পিছু ধরিতে তোমারে, তুমি তো আমারে ফেলিয়া ছোটো।
চল-চঞ্চল-চরণে তোমার সরম জড়িত কি মাধুরিমা,
কত আনন্দ অন্তরে মোর সঞ্চরে' তার নাহিক সীমা !
'ডালিম' ফুলের রঙ্টি ছিটানো-নধর-অধরে মধুর-হাসি,
না জানি কেমনে 'আমার-আমায়' পরায়ে দিয়াছে প্রেমের-ফাঁসী !

* * * *

যে মনোমধুর ঝঙ্কৃত সুর উঠেছিল রণি' পরাণ-তারে,
জীবন-বীণাতে সে সুখরাগিণী আর কেহ আসি' বাজায় না রে !
কে আর বাজাবে এ ভাঙ্গা-বীণায় সে মহা-রাগিনী গভীর সুর ?
পরাণ পাগল করে' দিয়ে মোর সে যে চ'লে গেছে অনেক দূর !
ভেঙ্গে'গেছে মম জীবনের বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার সকল তাঁর,
চারি ধারে দেখি—ধীরে ধীরে ঘিরে' গভীর-ব্যথার অন্ধকার !
তবু সে রহিল সদা জাগরূক অন্তর-পুর-চিত্ত-দোলায়,
দাও সাড়া দাও, হাসাও কাঁদাও, সঁপেছি যে প্রাণ তোমারি পায়।



"আমার বিচার তুমি কর"

শ্রীহরিপদ গুহ

পৌর্ণমাসী মধুময়ী রজনী। নীল আকাশের কোলে বসিয়া সুধাকর ধরণী-বক্ষে রজত-ধারা বর্ষণ করিতেছিল; মুক্ত-গবাক্ষপথে তাহারই খানিকটা জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল মঞ্জুর চোখে-মুখে। স্বামী মৃগাঙ্ক বসিয়াছিল টেবিলের পাশে ঈজি চেয়ারখানির উপর। ইহারা নবদম্পতি; মাসখানেক হইল ইহাদের পরিণয় হইয়াছে। সেও এমনই এক জ্যোৎস্না-হসিত নিশায়।

ধীরে ধীরে মৃগাঙ্ক উঠিয়া আসিয়া মঞ্জুর গোলাপী-অধরে একটী ভালবাসার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া খাটের উপর তাহার পাশটীতে বসাইল; তারপর কত ভালবাসা, কত সোহাগ করিতে লাগিল। সে কী পুলক! আনন্দে মঞ্জুর সর্ব্বদেহ হইতে উঠিল একটা মধুর শিহরণ।

মৃগাঙ্ক নিত্যই মঞ্জুকে প্রশ্ন করে—সে কেন সব সময় বিমর্ষ থাকে? জোর করিয়া হাসিয়া কেন মুখের কালিমা ঢাকিতে চায়? এমনই আরো কত কি!

সেদিনও সে তাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার সহানুভূতিতে সেদিন মঞ্জুর বুকের ভিতরটা কি জানি কেন অসহ-বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে অপাঙ্গে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মৃগাঙ্ক আরো একটু তাহার দিকে সরিয়া গিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সকাতরে কহিল—"মঞ্জু, লক্ষীটী, বল তোমার কী এমন ব্যথা? বল, যদি কোনো উপায় কর্‌তে পারি, যদি তোমায় একটুও শান্তি দিতে পারি। বল, তুমি কেন সব সময় এতো বিমর্ষ থাক?

আজ আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল—"বল্‌ব? কিন্তু, তুমি কি তা সইতে পার্‌বে? থাক্, বলে কাজ নেই। জান তো সেই পাথর-রাজপুত্তুরের কথা। তাই, আমারও ভয় হয়,—শুন্‌লে বুঝি তুমিও সইতে পার্‌বে না।"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল—"যতই কেন কঠিন হোক্ না, আমি সইবই। আর যদি তার কোনো প্রতীকার কর্‌তে পারি, তাও কর্‌ব।"

মঞ্জু নতমস্তকে কহিল—"আচ্ছা, ধর, যদি এখন বলি—'আমি তিন মাস সন্তান সম্ভবিতা'

মুহূর্ত্তে মৃগাঙ্কের উজ্জ্বল মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন যদি সেই গৃহে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও সে ততো বিস্মিত হইত না। ইহা যে তাহার কল্পনারও অতীত।

মঞ্জু রক্তিম মুখে ধীর-কণ্ঠে কহিল—"কই, পার্‌লে না সইতে? চুপ করে এখনো বসে রইলে কেন? আমার শাস্তির বন্দোবস্তটাও সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলো।......"

অনেকক্ষণ নীরবতার পর একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃগাঙ্ক তাহাকে কহিল—"আমাদের বিয়ে হয়েছে তাও তো এখনো তিন মাস হয় নি।—"

বাধা দিয়া মঞ্জু কহিল—"না, তা এখনো হয় নি। তার আগেই আমি.........।"

মৃগাঙ্ক শিহরিয়া উঠিল।

* * *

সমস্ত রাত্রিটা দুই জনেই ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল; কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। এক শয্যায় শয়ন করিয়াও

কেহ কাহারো সঙ্গে আর কোনো বাক্যালাপ করিল না। পরদিন ভোরে যখন উঠিল উভয়েরই চোখ জবাফুলের মতো লাল; মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

তাড়াতাড়ি মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢালিয়া মৃগাঙ্ক তাহার ড্রেসিং রুমে যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। একটী 'সুটকেসে' তাহার কাপড় চোপড় ভরিয়া দেরাজ হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইল; 'বয়'কে ডাকিয়া বলিল—"যা, শীগ্গির একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন!

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ কি ভাবিল; পরে একটুক্রা কাগজে লিখিল—"আমি চল্লাম। কোথা যাবো কিছু এখনো ঠিক করিনি। ড্রয়ারের মধ্যে দেরাজের চাবি রইল। যা কিছু রইল, সবই তোমার। বোধ হয় জীবনে আর ফিরব না। সে সাধও নেই।" কাগজখানি টেবিলের উপর 'পেপার-ওয়েটে' চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। বাহিরে 'হর্ণে'র শব্দ হইতেই সে 'সুটকেসটী' হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হল ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় মঞ্জুকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

মঞ্জু 'বয়'কে বলিল—"বাবুকে একবার বলে আয়, মা ডাক্ছেন।" সে ছুটিয়া গিয়া বাবুকে মাইজীর আদেশটা শোনাইয়া দিল। মৃগাঙ্ক প্রথম কি ভাবিয়া পরক্ষণেই ড্রাইভারকে বলিল—"ষ্টার্ট দাও!" ড্রাইভার 'হর্ণ' বাজাইয়া বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। 'বয়' ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু এলেন না মা।" মঞ্জু একটা বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যারে, তোর বাবু কোথায় গেলেন রে?"

সে বলিল—"তাতো আমায় বলে নি। আমাকে শুধু ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললেন।"

মঞ্জু চা তৈয়ারী করিতেছিল, বয়কে বলিল—"তোরা চাটা খেয়ে ফেল; আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।" বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল স্বামীর হস্তের কয়েকছত্র লেখার প্রতি। সে টেবিল হইতে কাগজের টুক্রাখানি তুলিয়া লইয়া একবার দুইবার করিয়া বহুবার পাঠ করিল। প্রতিনিয়তই তাহার মনে হইতে লাগিল—কেন তিনি এমন করিয়া চলিয়া গেলেন? তিনি তো ইচ্ছা করিলে তাহাকেই পদাঘাতে দূর করিয়া দিতে পারিতেন! তাহাই যে তাহার শ্রেয়ঃ ছিল!...চখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। এ পাপিনীর জন্যই তাঁহার এই দেশত্যাগ! তাহার নিজের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল! সে নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। সহসা তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এ ঘৃণিত জীবন বহন করিতে তাহার আর সাধ হইল না। আলমারী খুলিয়া মালিশের ওষুধের শিশিটা বাহির করিল; দেখিল, এক ফোঁটা ওষুধও তাতে নাই। তখন তাহার মনে পড়িল—স্বামীর বুক বেদনার সময় একটা বাটিতে ঢালিয়া মালিস করিয়াছিল। আলমারীর নীচ হইতে সেই বাটিটা বাহির করিয়া প্যাড হইতে একখানি কাগজ লইয়া লিখিল—"স্বামিন্, দেবতা, আমি তোমার কাছে তো কিছুই গোপন করিনি; অকপটে আমার কলঙ্ককাহিনী বল্তে একটুও দ্বিধা করিনি। তোমার সোণার কাঠির যাদুস্পর্শেই আমার সুপ্ত-হৃদয় জেগে উঠেছে! নইলে গোপন করে হয় তো তোমাকে ঠকাইতে পারতুম। তাতে আমার পাপের মাত্রা বাড়্‌ত বই একটুও কম্‌ত না। আমার ধারণা ছিল সব শুনে কলঙ্কিনী বলে আমাকেই ত্যাগ করবে; নিজে যে এমন করে বিবাগী হয়ে চলে যাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! কেন, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট সইবে কেন? তোমার তুষানলের দাহন আমি দেখ্‌তে পারব না এ পাপদেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে আমার আর সাধ নেই! তাই তোমাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে চল্লাম। জন্মান্তরে যেন তোমার সেবার অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি, এই আমার অন্তিম

প্রার্থনা। হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে যাই ;—যে পাপের ছাপ বহন করছি, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে আমি দোষী নই ; মনে করো না নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছি!...আমার শেষ অনুরোধ তুমি আবার বিয়ে করো, সুখী হয়ো!...

আমার মৃত্যুর পর পুলিশে হয়তো বাড়ীর অন্যান্য লোকের প্রতি অত্যাচার' করবে, তাই জানাচ্ছি—কারো কোন দোষ নেই, আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা করছি। ক্ষমা করো স্বামী!"

চিঠি খানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, ঔষধের বাটি ও শিশি লইয়া মঞ্জু বাথরুমে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মৃগাঙ্ক ড্রাইভারকে ভাড়া দিতে গিয়া দেখিল—সে ভুলক্রমে মণিব্যাগটী সঙ্গে আনে নাই। সুটকেসের চাবিও তাহাতেই রহিয়াছে তাহার বেশ স্মরণ হইল চিঠি লিখিবার সময় সে ব্যাগটী টেবিলের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন উপায়? সে পুনরায় ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া ড্রাইভারকে বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিল।

তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃগাঙ্ক দেখিল ব্যাগটী সেখানেই পড়িয়া আছে। ব্যাগটী তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল; সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল মঞ্জুর লিখিত চিঠিখানির উপর। সে ইহা পাঠ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না; তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল। পাঠান্তে তাহার হাত হইতে মণিব্যাগ পড়িয়া গেল; সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া ডাকিল—"মঞ্জু, মঞ্জু!"

কোনো উত্তর না পাইয়া সে সব গুলি ঘর খুঁজিল কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে ছুটিয়া বাথরুমে গিয়া দেখে কপাট ভিতর হইতে বন্ধ। জোরে জোরে দ্বারে করাঘাত করিয়া মঞ্জুকে কয়েক বার ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে দণ্ডায়মান মঞ্জু বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে, আর নীচে এক বাটি গোলা ওষুধ পড়িয়া আছে।

মৃগাঙ্ক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে বাটিটার দিকে চাহিয়া আছে, মুখে তাহার একটীও ভাষা নাই।

মঞ্জু বেগে বাথরুমের হইতে বাহির হইয়া ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার লিখিত চিঠিখানি তখনো মাটিতে পড়িয়া আছে। সে সেখানি তুলিয়া লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মালিসের ওষুধটা বাটির গায়ে শুখাইয়া লাগিয়াছিল। জল দিয়া ওষুটাকে ঘসিয়া তুলিতেই এত বিলম্ব। সে যখন গোলা ওষুধের বাটিটা ধরিয়া চুমুক দিতে যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে মৃগাঙ্ক আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়াছে, কাজেই সে আর তাহা পান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মঞ্জুকে টানিয়া নিয়া খাটের উপর পাশে বসাইল। তারপর তার রক্তিম-অধরে একটী ভালবাসার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া কহিল—"আজ থেকে তোমার নব-জীবন আরম্ভ হলো। আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম মঞ্জু! তুমি জন্মান্তরে আমাকে স্বামী পাবার জন্য শেষ প্রার্থনা জানিয়েছিলে, তাও আজ পূর্ণ হলো! তোমার অনুতাপেই অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেল, আমার মনে আর কোনো গ্লানি নেই মঞ্জু! আর তুমি বলেছ—'পাপের ছাপ'। এ 'পাপের ছাপ' নয়, এ আমার 'জয়টীকা'। এরি জন্যে আজ তোমাকে নতুন করে চিন্‌তে পারলাম!"

জানি না বঙ্গসমাজ এ বিচার গ্রহণ করবে কি না!

আমার বন্দুরে

(বিরহ সঙ্গীত সংগ্রহ)

শ্রীহেম সেন

চিত্ত জ্বালাইলি রে বন্দু, আমার বন্দু বন্দুরে।
চিত্ত জ্বালাইলি বন্দু ননদিনীর কথায় রে ॥

বন্দুরে—

যখন করিলাম প্রেম, চক্ষে চক্ষে চাইয়ারে বন্দু চক্ষে চক্ষে চাইয়া,
পোলাপানের মাথা খাইতাম তারা দিল কইয়ারে।

বন্দুরে—

কোন্ বা ত্থাশে গ্যালারে বন্দু, কত দিনের কতারে, বন্দু কত দিনের কতা,
অবাগিনী নারীর দুক্কে কইল্জায় পাওনা ব্যাথারে।

বন্দুরে—

আমার বুকের মাইজে তুষের দিয়া আইল্যারে বন্দু তুষের দিয়া আইল্যা ;
নারীর বিচ্ছাদের আগুণ দিলা তুমি জ্বাইল্যারে।

বন্দুরে—

বিদেশিনীর রূপে মজ্বা আমি তবে জাইন্যারে বন্দু আমি তবে জাইন্যা,
তোমারে করাইতাম বিয়া ফুলবতী কন্যারে ॥ *

* ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার বেলাই বিলে ঘাস কাটিবার সময় কৃষকগণ এই গানটী প্রায়ই গাহিয়া থাকে।

বন্দু = বন্ধু। পোলাপান = ছেলেপিলে। কতা = কথা। ত্থাশে = দেশে। অবাগিনী = অভাগিনী। দুক্কে = দুঃখে। মাইজে = মধ্যে। আইল্যা — হাঁড়ি বা পাতিল। জাইন্যা = জানিয়া। কইল্জায় = কলিজায়, প্রাণে।



শ্রীগীর্ব্বাণ

শনিবারের চিঠি (চৈত্র, ১৩৩৩)। অন্ধ মুনির অভিসম্পাত রাজা দশরথের উপর যেরূপ বর-স্বরূপ হইয়াছিল লেখকের "দুঃখের স্বরূপ" তেমনই উদীয়মান লেখকগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ বর্ষিত হউক। কিন্তু এরূপ অভিসম্পাত দেওয়াটা সিন্ধু-মুনির আত্মা হয়তো সায় দেয় নাই; সাহিত্যের মুরুব্বি —এক হিসাবে জনক, প্রতিপালক স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ও অন্যান্য মহারথিগণের আত্মা আজ স্বর্গ হইতেও তেমন নিষেধ করিতেছেন যে, তোমরা ওদের অভিশাপ দিওনা—সে অধিকার তোমাদের নাই। "যেটুকু সংঘর্ষ ঘটিবেই; তাহাতে কোন পক্ষের অপরাধ নাই। ব্যক্তি যেখানে সত্যই সমাজদ্রোহী, সেখানে তাহার সমাজ ত্যাগ করাই উচিত।" যদি অপরাধ নাই থাকে, তবে সমাজদ্রোহীকে "সমাজ ত্যাগ" করিতে বলার অধিকারও নাই। সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই সমীচীন।

"দুঃখ চাই" কবিতাটী হইতে দুই লাইন মাত্র উদ্ধৃত করিলাম নিরপেক্ষ সুধী পাঠকবৃন্দ শনিবারের চিঠির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবেন :—

"আছে বিজ্ঞান, অর্থনীতিও আমাদেরই গাহে জয়,
শিশ্ন—উদর দুয়েরি মহিমা সমান তাহারা কয়।"

ইহাই কি সমালোচকের ভাষা এবং সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা (!)? এরূপ সমালোচনা বা এবম্বিধ সমালোচনা-পূর্ণ কোন মাসিকের আবশ্যকতা সাহিত্যে থাকা সঙ্গত কিনা তাহার বিচার **প্রবাসী** সম্পাদকের হাতেই রহিল।

সমালোচনা সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। তাহাতে একপক্ষে যেমন লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করে, পক্ষান্তরে দোষ ত্রুটী সংশোধিত হয়। কিন্তু এ যেন তরজার লড়াই। সাহিত্যে, মানুষের আত্মা যখন সমধিক উন্নত হয়, তখন সে পুরুষ এবং যখন অন্য আত্মা সেই পুরুষের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই আত্মা প্রকৃতিস্থানীয়। সাহিত্যচর্চ্চায় যদি প্রাণের ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা আনন্দবর্দ্ধন হওয়াটাই স্বাভাবিক হয়, তবে এরূপ সাহিত্য সমালোচনাদ্বারা সমাজের কল্যাণ কতটা সাধিত হইবে? অসংযমী লেখক সর্ব্বথা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু অসংযমী হইয়া সমালোচকের আসনে বসিতে যাওয়াটাও ধৃষ্টতা মাত্র। মদ্যপান গর্হিত কার্য্য। তা' বলিয়া আইন করিয়া যেমন মদ্যপান সমাজে চালানো অনুচিত, তেমনি সাহিত্যে অশ্লীলতা ঢুকিতে দেওয়াও ঠিক নহে। আদর্শ সর্ব্বদাই উৎকর্ষের চরম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেখা যাউক তরুণদের এ সাহিত্যের মূলভিত্তি কোথায়? আমি বলি, তাঁহারা মহাজনন্যস্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। স্বর্গীয় সাহিত্য মহারথীরা তাহাদের ভাষা ও ভাবকে সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই তাহাদের পুত্রেরা আজ মুরুব্বিয়ানা ফলাইতেছেন এবং তাহাদের পৌত্র তরুণরা পৈতৃক সম্পত্তি

বাড়াইতে সচেষ্ট—যাহা স্বাভাবিক। সাহিত্য-চর্চ্চাদ্বারা প্রাণের ভাবের আদানপ্রদান হয় এবং সাহিত্য দেশকালের ব্যবধান মুছাইয়া সৃষ্টির অপর পার হইতে আশা, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেমের নির্ঝরিণী বহাইয়া দেয়।

একজন ইংরেজ লেখক বলেন,—In literature three years is boom, thirty years fame, three hundred years immortality and there thousand is Homer—সম্পাদক মহাশয় threeতে কি thirtyতে ?

"প্রসঙ্গ কথা" মুরুব্বির যোগ্য উপদেশই হইয়াছে। বৃদ্ধেরা যদি তরুণদের প্রতি এরূপ সদুপদেশগুলি মার্জ্জিত ভাষায় দেন, তবে তরুণ যে ভাবে গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে বৃদ্ধদের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। কষাঘাত ও "কাণমলা" বা অযথা গালাগালিতে বিদ্রোহী, বিদ্রোহীই থাকিয়া যাইবে। সংযম-শিক্ষা সাপেক্ষ। Guy de maupassant'র বই পড়িয়া যে বিশ্বসাহিত্যের (!) ধারণা আনিয়াছে, তাহা বদ্‌লাইবে। আর কেহ নগ্ন চিত্রের "পায়ে মোজা" পরাইবে না। যুবকেরা "বৃদ্ধস্য বচনং" গ্রহণ করিলে ভোজনের বেলায় অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাদের জানা উচিত যে এই বৃদ্ধেরাই এক সময় যুবক ছিলেন, তাঁহারা হিমালয়ের চূড়া দাঁতে কামড়াইয়া ভাঙ্গিতে গিয়া তাহাদের দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। তাই তাঁহারা আজ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি আছে ?

উত্তরা (চৈত্র, ১৩৩৩)। "ধন্বন্তরি" গল্পটী মন্দ হয় নাই। "নারী প্রতিভা" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেবল মহারথীদের বীর্য্যবলেই নয়, অখ্যাতনামা ছোট, বড়, মাঝারিদের প্রাণবলেও চলিতেছে। অনেক ম্লানতর জ্যোতিষ্কের আলোও মানুষজীবনে সততই সাহায্য করে ও পথ দেখাইয়া থাকে। মেয়েরা যদি চন্দ্র,সূর্য্য নাই হন, আপনাপন শক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া আকাশের তারা হইয়াই না হয় তাহারা থাকিবেন।" এ যেন একটা গভীর বেদনা—একটা অভিমানের সুর। 'মানুষজীবনে সততই সাহায্য করে ও পথ দেখাইয়া থাকে" বই কি ? মায়ের মহাশক্তির "প্রদীপ" জ্বলেই—যদি মায়েরা নিজকে নিজে চিনিতেই পারেন, তবে তো পুরুষের সৌভাগ্য। ইহাতে পরশ্রীকাতরতাও আসিতে পারে না। জগতে কেহ কাহাকেও খাটো করিয়া রাখিতে পারে না, যদি সে নিজকে নিজে চিনিতে পারে। "কিন্তু ঘরকন্নার কাজ যে ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া ব্যক্তিগত অবিচ্ছিন্ন ভাবে কেবল তাহাদের উপরেই ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতেও মেয়েদের অধিকাংশেরই আর কিছু করিবার ভাবিবার সময় থাকে না।" ঘরকন্নার ব্যবস্থা যদি অন্য কোন "শ্রমলাঘব যাত্রাদির" সাহায্যে সমাধা হইতে পারে, সে পথও তো মায়েরাই নির্দ্দেশ করিতে পারেন। সর্ব্বত্রই তাহা সম্ভব কি ?

"কল্যাণের পথ" বইয়ের সমালোচনা করিতে যাইয়া "বারো আনা পয়সা খরচ করে কেন যে এ বই পড়্‌বে তার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া ভার" মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকানন্দই যখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ, ভাস্‌ওয়ানী ওঁরা না লিখিয়া তো কেবল ditto দিয়া গেলেই পারিতেন। এত মাসিক দেশে থাকিতে প্রতি সংখ্যা ।॰ চারি আনা দিয়া "উত্তরা" পড়িবে কেন ? উত্তরে, সমালোচক কি বলেন ?

কল্লোল (বৈশাখ, ১৩৩৫)। "কাক জ্যোৎস্না" একটী ছোট গল্প। একটু উদ্ধৃত করা গেল,—"রাঁধতে রাঁধতে এঁটো হাতেই ছবি ছুটে আসে, বলে—শিগ্‌গির একটা দাও, চট্‌পট্, ঘোমটাটা খসে' গেল—

সহসা অমলের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। ছবির ক্লান্ত মুখখানি ভারি সুন্দর লাগে। বলে, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ ছবি !

ছবি বলে—দয়া করে' তুমিও একটু দুষ্টু হওনা, লক্ষ্মী ছেলে। শিগ্‌গির,—পিসিমা এক্ষুনি দেখে ফেল্‌বেন—বলে' দুটী স্পর্শাতুর পেলব ঠোঁট অমলের মুখের কাছে নিয়ে আসে।" বৌ-ঝিদের "পেলব ঠোঁট" দুটী রান্না করিতে করিতে "শিগ্‌গির' "চট্‌পট্‌" "স্পর্শাতুর" হইয়া উঠে নাকি! তায় আবার দৌড়ে গিয়া চাওয়া। ছিঃ, মায়েরা পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা হেট্‌ করিবেন না কি? কি—বিড়ম্বনা!

প্রেমেন্দ্র বাবুর "সর্ব্বগ্রাসী দুরন্ত" প্রেমের চিত্র দেখিলে প্রায় সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন। তাঁহার "নীড়ে" এবার তীর শয্যা রচনা করিয়াছেন, না জানি কত ভীষ্মদেবের শয়ন হয়। "আলো দিতে এসে কমল থপ্‌ করে রবির হাতটা ধরে ফেল্‌লে।"

অকস্মাৎ ব্যগ্রবাহুতে কমলকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বল্লে, তোমায় কোথাও যে যেতে দিতে আমি পার্‌ব না কমল!" এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, ধরাধরি। যেমন কমলের থপ্‌ করে রবির হাত ধরা তেমনি অকস্মাৎ ব্যগ্রবাহুতে বুকের মধ্যে কমলকে টেনে ধরা। দেবরাজ ইন্দ্র তখন নিশ্চয়ই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিলেন, নতুবা তখনি একটা বজ্র ছুড়িয়া মারিতেন। লেখকেরা যদি বিধবা মায়েদের এরূপ উলঙ্গবাহার কাপড় পরাইতে থাকেন তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে।

"তার মানে তুমি যা খুশী করো, আমার আপত্তি নেই" যাক্‌, বাঁচা গেল। অঙ্কুশ মারিয়া পাগ্‌লা হাতিটাকে বশে আনা গিয়াছে (!)।

"কাকজ্যোৎস্না" এবং "নীড়" গল্পে লেখার যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা Good printing sets off an ordinary drawing, but bad printing spoils the best,—হইয়াছে।

সৈনিকের চিঠি

মানসী আমার! তোমার জন্যে আমার ভারী গর্ব্ব হচ্ছে, আমি গরব কর্‌ছি! আমার ইচ্ছা ছিল কি জান? আমার ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষে তোমার কাছে ফিরে গিয়ে আমার সমস্ত ইতিহাস—কোথায় কোন্‌ দেশ জয় করেছি, কি করে হত্যা করেছি, কতগুলি নিষ্ঠুর হত্যা করেছি, কি করে শত্রুদের ফাঁকি দিয়েছি, কি করে বন্দী হওয়ার হাত হতে বেঁচে গেছি, কতদিন তোমায় পাশে অনুভব করেছি—সব বল্‌ব এবং তোমার হৃদয় আরো বেশী করে অধিকার কর্‌ব আর তোমাকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক করে দেব, স্তব্ধ করে দেব। তার আগে যেন তুমি এই সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তে না পার।

ভালোবাস্‌লে আর সকলে যা করে, হাহাকারে ফেলে, বিরহে ফেলে ভালোবাসাটীকে ঘনীভূত করে আমিও তেমন কর্‌তে চেয়েছিলুম। আমি তারপর যখন ফিরে আস্‌তুম তখন কত আগ্রহে তুমি আমায় টেনে নিতে?

সত্যি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তুমি তোমার এই ফুল তনু নিয়ে যুদ্ধের মাঝে করুণার অসি নিয়ে আত্ম বিসর্জ্জনে নাব্‌তে পার!

মণি আমার!! এতদিন তোমাকে আমি খেলার পুতুলই মনে করেছি, সৈনিকের সঙ্গে তালে তালে চলার অনধিকারী ভেবেছি, অক্ষম ভেবেছি, কিন্তু

আজ আমার সব ভুল ভেঙেছে। আমি দেখছি তুমি তা নও যা আমি তোমাকে ভাব্‌তুম। তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। তুমি সত্যিই সৈনিকের স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্তা।

প্রিয়া আমার!!! তোমার যখন নাম হিসাবে ভাব্‌তে যাই তখনই আমার মনে পড়ে যায় শুধু আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটি মুখ। তখন তোমাকে এ পৃথিবীর বলে ভাব্‌তেই পারি না। করুণার প্রতিমূর্ত্তি না হলে কি আর অমন বেশে দাঁড়াতে পার?

আমি যখনই চোক বন্ধ করি তখনই দেখ্‌তে পাই তোমার মাথার উপরের সাদা ওড়্‌নাটা বাতাসে উড়্‌ছে। এতে তোমাকে আমার দুষ্প্রাপ্য বলে মনে হয়। তুমি যেন এ পৃথিবীর মানুষ নও। তুমি স্বর্গের দেবী।

রাণী আমার! কত সৈনিক যুদ্ধে আহত হয়ে তোমার সেবার অধীনে এসেছে কিন্তু পরপারের ডাকে তাদের চলে যেতে হয়েছে। তুমি কাছে থেকে নিজ হাতে সেবা করে শেষে নিরুপায় হয়ে কত আশ্বাস দিয়ে হয়ত বিদায় করেছ তারাও দেবীর আশ্বাস মনে করে হাস্‌তে হাস্‌তে ঐ দেশের উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

এ পারের শেষ তরুণী তুমিই যার কাছ থেকে তারা শেষ স্নেহ, মমতা, সেবা, ভালবাসা এবং সান্ত্বনা পেয়ে গেলো, শেষ তরুণী তুমিই যাকে তারা শেষ দেখা দেখে গেলো।

আজ আমারও যদি তোমার হাতে মর্‌বার সে সুযোগ হ'ত?

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধে তখন তুমি কত সৈনিককে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টুপী উড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছ—যুদ্ধে বীরের মতো মর্‌বার জন্যে। আবার যখন তাদের জীবনের আঁধার ঘনিয়ে এলো, তুমিই সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করেছ।

তোমাকে তোমার এত সব কাজের জন্যে মানুষ মনে কর্‌তে পারি না। মানুষের এত শক্তি থাকা কি সম্ভব, এত গুণ থাকা কি সম্ভব? তুমি কত উচ্চ তুমি কত মহান্!

আচ্ছা মণি—আমরা যে এতদূরে আছি হয়ত থাক্‌বও, আমাদের কি এতে কষ্ট হয়? আমি যখন খুব তলিয়ে দেখি তখন মনে হয় এতটুকু কষ্ট নেই। এতটুকু কষ্টে আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে। মন যদি আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে জ্বলে জ্বলে উঠে! আমরা দু-জনই জীবনকে কত ভয় কর্‌তুম কিন্তু আজ ন্যায়ের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভয় হারিয়েছি। এ সাহসের জগৎ। আমরা আজ তফাৎ আছি বলে, আমার মনে হচ্ছে আমাদের সাহস বেড়েই চলেছে। আমিও এখন তাই-ই চাই। তা না হলে আমি যে কতবড় একটা অন্যায় কর্‌ব তুমিও কর্‌বে তা না বল্‌লেও হয়ত বেশ বুঝতে পারছ।

কিন্তু লক্ষী এত চেষ্টা করেও কোনো রকমেই নিজকে সরাতে পার্‌ছিনা। তোমাকে যখন মনের বনে জাগিয়ে তুলি, তখনই এমন সব ভবিষ্য জীবনের কথা মনে আসে, যা কখনও আমাদের জীবনে ঘট্‌বে না। একটা কারণ—বল্‌ব না, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কখন কোন্ বোমার ঘায়ে উড়ে যাব কে জানে? কত লোককেই তো দেখ্‌লুম সকালে জেগে উঠ্‌ল আর রাত্রে চিরদিনের মত স্থির হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

অনেকে এই সময় যা দরকার এর চেয়ে বেশী বিপদের মুখে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতনা কিন্তু আমি তো তা পার্‌ব না? যে সব বিপদ লোকে এড়িয়ে চল্‌তে চায় তাইতে সাহস করে যাবার জন্যেই যে আমি এখানে এসেছি? ভাল সৈনিকের একমাত্র প্রমাণ যে সে আশার অতিরিক্ত করে।

সন্ধ্যা—৭টা।

আজ আমাদের ল্যাভার্ণের বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হল। তাকে চিনেছ বোধ হয়—যাকে আমি

খুব ভালবাস্‌তুম যে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। সে আজ অন্ধ—সে আজ বধির—সে আজ অক্ষম কিন্তু তবু তার বীরত্ব অসীম—অজেয়। সে যে আর বাঁচবে সে আশা নেই বল্‌লেও চলে। তার মৃত্যু ক্রমশঃই এগিয়ে আস্‌ছে। সে মরে গেলেও তার বীরত্বের পুরস্কার পেত, কিন্তু জেনারেল তাকে মৃত্যুর আগেই সে সম্মান তাকে দিলেন। তার জখম খুব বেশী না হলেও ভয়ানক। তাকে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই তবু তার সেবা শুশ্রূষার এতটুকু ক্রটী হচ্ছে না। ইংরেজ কৃতজ্ঞ হতে জানে, তারা বীরের সম্মান কর্‌তে জানে। তা না হলে মরণের যাত্রীক যে, তার জন্যে চেষ্টা কর্‌বার কি আবশ্যকতা ছিল?

আজ আমাদের সকলের প্রাণেই কি একটা ব্যথা গুম্‌রিয়ে উঠ্‌ছে। কত কষ্ট যে হচ্ছে তা বলে বুঝাতে পারব না। আমাদের বীর ভাইটি আজ আমাদের সম্পর্ক ছেড়ে চল্‌ল। হয়ত চিরতরেই চলে যাবে। আমরা যতটুকু গর্ব্বিত ছিলুম তাকে পেয়ে আজ তার চেয়েও ঢের বেশী অসুখী হয়েছি তার বিদায়েই।

দুপুর বেলা যখন আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়াল তখন উপস্থিত সমস্ত সৈনিকদের চোখে অশ্রুর বাণ ডেকেছিল। কেউ না কেঁদে থাকৃতে পারিনি!

তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, বুঝাবার ভাষাও আমাদের নেই তবে এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না কত মর্ম্মন্তুদ।

আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ বল্‌তে লাগলেন,—সৈন্যগণ, তোমরা আজ যে রত্ন হারাতে যাচ্ছ, তার পূরণ হওয়া যে কত অনিশ্চিত তা তোমরা সকলেই বেশ জান এবং প্রত্যেকেই বুঝতে পার্‌ছ আমরা আজ কি হারাতে যাচ্ছি। ল্যাভার্ণ তার জীবন দিয়ে তার দেশ রক্ষা কর্‌তে চেয়েছিল ভগবান জানেন তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা পাবে কি না? যে অচিন্ত্যণীয় সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেছে সে তা বেশ বিরল। তার সাহসিকতার প্রমাণ যারা তার সঙ্গী ছিলো তারা বেশ জানে! প্রথম থেকেই সে তার অসীম সাহসিকতার জন্যে বিখ্যাত ছিল। মাঝে কি কারণে জানিনা সে কেমন একটু বিমনা হয়ে গিয়েছিল, তবু কোনো দিন কোনো বিশ্বাস ঘাতকতা করেনি।

যে এমন অক্লান্ত পরিশ্রম কর্‌তে পেরেছে প্রাণের এতটুকু মায়া না করে, যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে, দেশের জন্যে, রাজার জন্যে হাস্‌তে হাস্‌তে বুকের রক্ত দিয়েছে, অন্ধ বধির হয়েছে,—সে সত্যিই মহান্‌, সে সত্যিই বীরপূজ্য,—নমস্য। তাকে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশএ' সম্মানিত কর্‌লেও তার উপযুক্ত সম্মান হয় বলে মনে হয় না —কিন্তু আমাদের তাই দিয়েই সম্মানিত কর্‌তে হবে। কারণ, আমাদের সৈনিক বিভাগে এর উপর আর কোনো পুরস্কার বা সম্মান নেই। নিয়মানুসারে আমরা তাই দিতে বাধ্য।...

তারপর একটু থেমে, রুমালে চোখ মুছে তার দিকে ফিরে বল্‌তে লাগ্‌লেন – ভাই, তুমি যা করেছ, তার তুলনায় এ কিছুই নয়—তবু তোমাকে আমরা এই 'ক্রশ' দিতেই বাধ্য হচ্ছি। তুমি আমাদের নিয়ম এবং আমাদের শক্তি এবং ক্ষমতা কতটুকু বেশ জান। ভগবান যিনি সর্ব্বশক্তিমান, ক্ষমতা-বান তিনিই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন আমরা তার পায়েই তোমাকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে, দেশের জন্যে, দশের জন্যে, সত্যের জন্যে এ ভাবে মৃত্যুর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, হয়ত বা যাকে চিরকাল একটা দুঃখের মাঝে, একটা অভাবের মাঝে থাকৃতে হবে, তাকে তিনি শান্তি দিবেনই—তাঁর সিংহাসনের পাশে স্থান দিবেনই।

এই বলে তিনি চুপ কর্‌লেন।

ল্যাভার্ণ ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বলল—বিদায়! সৈনিক ভাইরা আমার বিদায়!!! এই বলে সে সৈনিকদের দেখ্‌বার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল কিন্তু তার আশা পূরল না।

মণি—আমার উন্নতির পথ বুঝি বন্ধ হয়ে এলো।

আজ আর্ না। আমার মনটা বড্ড দমে গেছে। কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। না জানি ল্যাভার্ণের অবস্থাই হয় আমার। যাক্ যা অদৃষ্টে আছে, তা-ই হবে।

আমার আশীর্ব্বাদ, ভালোবাসা এবং চুম্বন জেনো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। Adieu.

ইতি

—শান্তি চৌধুরী

ক্রমশঃ—

স্থানাভাবে সম্পাদকের রায় দেওয়া গেল না

সমাজের জীবন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

মানুষের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা যে প্রাচীনতম যুগের তথ্যানুসন্ধানে অন্ধকারের ক্রোড়ে শেষ শয্যা পাতিয়াছে, সেই যুগেই ভারতীয় আর্য্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আপ্রাণ যত্ন সাফল্যমণ্ডিতকরতঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মী এক দিন উপযাচিকার মত তাঁহাদের প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ভুবনবিজয়ী আর্য্যনৃপতিবৃন্দ সেই প্রাচীন যুগেই বলদর্পিতহস্তে ঘনঘন কোদণ্ডটঙ্কারে বিশ্ববাসীকে চমকিত চতুরঙ্গদলের বীরপদভরে ধরণী কম্পিত, অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন যুগেই ভারতীয় সম্রাট প্রিয়ব্রতের বীরেন্দ্রাগ্রগণ্য সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। "পুরাণানুসারে ঐ সপ্তদ্বীপের নাম জম্বু, কুশ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও প্লক্ষ। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে এশিয়া, ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলেশিয়া, ইয়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।"—Hindu Superiority, Page 160.—। ভারতীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব নহুষ-তনয় রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি অসামান্য শৌর্য্যবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত করেন। যথাঃ—

সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্।
বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রানাং নাহুষস্তদা॥

ব্রহ্মপুরাণ, ১২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

বীরেন্দ্রপ্রবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভীম পরাক্রমে সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী বিজিত হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী জয় করিয়া নানাস্থানে উপনিবেশের পত্তন করেন। যথাঃ—"যোহসৌ বাহুসহস্রেন সপ্তদ্বীপেশ্বরোহভবৎ।
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা॥"

ব্রহ্মপুরাণ, ১৩ অধ্যায়, ১৬০ শ্লোক।

তিনি এক রথে সমগ্র পৃথিবী জয় করেন। ব্রহ্মপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ের ১৬৬ শ্লোক বিজয়ের আরো সাক্ষ্য দিবে। যথাঃ—

"তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
সসমুদ্র সনগরা উগ্রেন বিধিনা জিতা॥"

ভারতীয় সূর্য্যবংশোদ্ভব বীরেন্দ্রকুলাগ্রগণ্য সম্রাট মান্ধাতার সাম্রাজ্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল। বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত তাঁহার সাম্রাজ্যে ও সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেন না। যথাঃ—

"যাবৎ সূর্য্য উদেতিস্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশে ২য় অধ্যায়।

যুগে যুগে ভারতীয় সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তিগণের পৃথিবী বিজয়ের ইতিহাস আজ নাই; কিন্তু পুরাণাদি পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। ভারতীয়নৃপতিগণের বিশ্ববিজয় খৃষ্ট পূর্ব্ব কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার সঠিক কাল নির্ণয় এখন দুঃসাধ্য। তবে এ'কথা অতি সত্য যে সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার তিমিরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; আধুনিক ইয়ুরোপের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মৃত্তিকাগহ্বরে অথবা বৃক্ষকোটরে বাস করিত, দিগম্বরবেশে ঘুড়িয়া বেড়াইত এবং পশুপক্ষীর অপক্ক মাংসে জঠরানলে আহুতি প্রদান করিত;—এক কথায়, সভ্যতার অনুকণাও যখন মিশরে, গ্রীসে, রোমে প্রবেশ করে নাই—তখনি এই ভারতবর্ষ সুখৈশ্বর্য্য-বিলাস-বিলোলা ইন্দ্রাণীর মত সমগ্র জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে মহিমময় দীপ্তিতে 'মহা-ভারত রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং এই মহা-ভারতের পদতলে বসিয়াই সমগ্র দর্শন বিজ্ঞান ও সভ্যতার জটিল প্রশ্ন সমূহের সমাধান প্রাপ্ত হইয়া সভ্য সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী ভারতীয় আর্য্যনৃপতিবৃন্দ চেঙ্গিজ বা তৈমুরের ন্যায় ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া অথবা বিকটব্যাদান শার্দ্দুলের মত শোণিত-তৃষ্ণায় লোলুপ রসনা নিয়া পৈশাচিক আনন্দের তীব্র তাড়নায় বিশ্ববিজয়ে ব্রতী হন নাই;—ঝঞ্চাবাতের মত বিজিত দেশের উপর দিয়া তাঁহারা রক্তাক্ত শকট পরিচালিত করেন নাই। তাঁহারা সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকাহস্তে বিজিত দেশ সমূহের চক্ষে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত সৈনিকগণ ঐ সমস্ত দেশে যে সভ্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ফলপুষ্প প্রসব করিয়াছিল বিজিত দেশে ভারতীয় শাসন এবং উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া।

পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা বর্ত্তমান North-Western Frontier পর্য্যন্ত শুধু সীমাবদ্ধ ছিলনা;—পরন্তু যবন, পহ্নব, গান্ধার, বাহ্লীক, পহ্লব, কেকয় প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা উক্তঞ্চ বায়ুপুরাণে :—

বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্লবাশ্চর্ম্ম খণ্ডিকাঃ॥ ১১৫ শ্লো
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু সৌবীর ভদ্রকাঃ।
শকা হ্রদাঃ কুলিন্দাশ্চ পরিতা হারপুরিকাঃ॥ ১১৬
রমটা রুদ্ধকটকাঃ কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রাকুলানিচ॥ ১১৭
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ প্রিয়লৌহিকাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ॥ ১১৮
লম্পকা স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈ সহ।
অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ॥
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গনাস্তথা।
চুলিকাচাহুকাশ্চৈব পূর্ণদর্ব্বাস্তথৈবচ॥
এতে দেশাঃ উদীচ্যাশ্চ...............

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—

উপরোক্ত দেশসমূহ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল; পুরাণবর্ণিত বাহ্লীকদেশ বর্ত্তমান বল্‌খ (Bulkh) প্রদেশ। গান্ধারের বর্ত্তমান নাম নাম কান্দাহার। অনেকে রামায়ণের বর্ণনা দৃষ্টে অনুমান করেন কেকেয়দেশ ককেশাস পর্ব্বতের পাদমূলস্থ কোন জনপদ ছিল। রাজা দশরথ তৎদেশীয় রাজকুমারী কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর পিতা বহ্লীক দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পহ্নব দেশ ও মদ্রদেশ বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। হিন্দুগণ গ্রীক-গণকে যবন আখ্যায় অভিহিত করিতেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি জরাভারগ্রহণে অস্বীকৃত পুত্র তুর্ব্বসুকে

যবনগণের অধিনায়ক হইবেন বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন এবং নির্ব্বাসিত করেন। যথাঃ—

"তুর্ব্বসোর্যবনা জাতাঃ"—মহাভারত।

মহাভারতে কথিত আছে রাজা বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের ধেনু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে গেলে তাঁহার শরীর হইতে শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি পরাক্রমশালী ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব হয় এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করে। এই সমস্ত জাতির সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের বিবাহাদি পর্য্যন্ত হইত। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যর প্রপৌত্র গান্ধার নামক এক রাজা গান্ধার জনপদ স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস। উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের অবস্থান। তথা উক্তঞ্চ ব্রহ্মপুরাণে—

"পূর্ব্বে কিরাতাঃ যস্যাসন পশ্চিমে যবনাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তে স্থিতা দ্বিজাঃ॥
২৭ অঃ, ১৭ শ্লোক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রীকগণকে যবন বলা হইত। ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী Ionia দ্বীপপুঞ্জ গ্রীক অধ্যুষিত দেশ; Ioniaকে যুনানী বলা হইত। যুনানী অর্থাৎ যবন অধ্যুষিত দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত হইলে ভারতের পশ্চিমসীমা Asia Minor পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ধরা যায়। মধ্যযুগে ইয়ুরোপীয় ভৌগলিকগণও তাহারই সমর্থন করেন। যথাঃ—"European Geographers in mediaeval times classified East Africa as one of the Indies and Marco Polo located Abyssinia in "middle India."—Ibid, Page 92. ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই বিশাল ভূখণ্ড প্রাচীন যুগে ভারতীয় শিক্ষাসভ্যতায় দীক্ষিত এবং ভারতীয় অনুশাসনে শাসিত হইত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে আফগানিস্থান এবং পারস্য প্রভৃতি দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে পহ্লব, পারদ, যবন, শক দরদ, কিরাত, চীন প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু বহুকাল যাবত ব্রাহ্মণগণের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা পতিত হইয়াছিল। মহাভারতও ঐ উক্তির সমর্থন করেন। ইক্ষাকুবংশীয় নৃপতি বাহুর রাজ্যহরণে শক, যবন, পারদ, কম্বোজ ও পহ্লবগণ হৈহয় ও তালজঙ্ঘকে সাহায্য করায় তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রকেশরী রাজচক্রবর্ত্তী সগরনৃপতি ঔর্ব্ব ঋষির প্রসাদে আগ্নেয়াস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যাপহরণে প্রধানতঃ লিপ্ত হৈহয়গণকে নির্ম্মূল করিয়া শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্লবগণের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইলে তাহারা ইক্ষাকুকুল-পুরোহিত ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়। বশিষ্ঠের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সগর তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না বটে, কিন্তু বেশবিন্যাস ব্যত্যয় করিয়া তাহাদিগকে ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন। তিনি শকদিগের মস্তকার্দ্ধ এবং কাম্বোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করতঃ বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ, ও পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। শক, কাম্বোজ, যবন, পারদ ও পহ্লবগণের স্বাধ্যায় ও বষট্কার প্রভৃতি রাজা সগর বারিত করিয়া দেন। তথা :—

"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং তু গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশানন্যাংশ্চকারঃহ॥ ৪৭
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যাসর্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥ ৪৮
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবা শ্মশ্রুধারিনঃ।
নিঃ স্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥" ৪৯
৮ম অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ।

বাণিজ্য ও উপনিবেশের যোগসূত্রে ভাবের আদান প্রদানে যেমন প্রত্যেকের জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—তেমন বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐক্যতানে সমাজের জীবন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকগণ ভীষণ বোলান বা খাইবার গিরিশঙ্কট অতিক্রম করিয়া কাবুল ও পারস্য ইরাণ দেশের মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগর

অতিক্রম করতঃ ইয়ুরোপে বাণিজ্য করিতেন। ইয়ুরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের এই পথ বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত ছিল। প্রাচীন বণিকগণ এই স্থলপথে কি অকুতোভয়ে, কি অসীম অধ্যবসায়ে পণ্য দ্রব্য নিয়া যাইতেন তাহা ভাবিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বুকের উপর দিয়া যুগে যুগে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার ধারাও বিভিন্ন দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সন্ধিস্থল এই মধ্য এশিয়াও ইরাণ। ভাবের আদান প্রদানে অতি প্রাচীন যুগেই ভারত ও ইরাণ জ্ঞান গরিমায় বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগেই উভয়ের জাতীয় জীবন ও সামাজিক জীবন একই ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। একই ধর্ম্ম বিশ্বাসের নবীন আলোক তরুণ উষার স্নিগ্ধ আলো রেখার মত বিশ্ববাসীর প্রাণে এক অননুভূত সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়া ইরাণে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূচনা হয়,—সেই ধর্ম্মবিশ্বাস পঞ্চনদের সরস্বতী তীরে আর্য্য ঋষির ত্রিতন্ত্রীতে নূতন ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া বেদের ভাষায় সেই মোহন মূর্চ্ছনার রেশ মিশাইয়া দিয়া পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সরস্বতীর পুণ্যময় তটে নবলব্ধ জ্ঞানের অমিয়সিক্ত বার্ত্তা ইরাণের ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিতরণ করিতে আর্য্যগণ কার্পণ্য করেন নাই। মহিমময় অতীত যুগের পূর্ণ গৌরবের মধ্যে পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ পঞ্চনদের প্রান্তে আর্য্য ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগুরু জরথুশত্র দেব প্রভাতের বিহগ কাকলীর মত সুমধুর স্বরে বেদের প্রতিধ্বনি করিয়া ইরাণের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এই নূতন ধর্ম্মস্রোত স্বীয় পবিত্রতায় ইরানের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধন্য করিয়া-মধ্য এশিয়া প্লাবনে ভাসাইয়া দিকে দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদোপনিষদ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কম্বুকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন;—আবার একই "বহুধা ভবন্তি" বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্র পাদঃ" বলিয়া বেদে বিরাটরূপেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে প্রথমতঃ প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর রূপকে ঈশ্বরের প্রতীক বলিয়া উপাসনা করা হইত। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে উপাসনা হইতেই পরবর্ত্তীকালে সাকার উপাসনার সৃষ্টি হয়। ভগবানকে কেবল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই—তিনি "ভয়ানাং ভয় ভীষণং ভীষণানাং"—উদ্যত বজ্রের সহিত ও উপমিত হইয়াছেন। মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উল্লেখওবেদে পাওয়া যায়। মানুষের দার্শনিক প্রাণ যখন ভাবের নব নব ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনি রূপের নানা কল্পনা ও ধর্ম্মবিশ্বাস সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। "একম্ অদ্বিতীয়ম্" এর এই যে রূপের কল্পনা তাহা মানবের সমাজপ্রিয়তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ যখন "এক অদ্বিতীয়" গুণাতীত, নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনায় স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথক্ করিয়া শান্তি পাইতেছিল না;—নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনার বিড়ম্বনায় যখন সে অন্ধকারে ইতস্ততঃ সাঁতার কাটিতেছিল, তখন দুই একজন ভাবুক সাধক সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব বাণী প্রচার করিলেন—"বহুরূপে বিরাজিছে সম্মুখে তোমার,

বৃথা কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—

* * * *

আব্রহ্মস্তম্ভ সকলি তাঁর রূপের বিকাশ। নদ নদী, বৃক্ষলতা, সাগরভূধর, মনুষ্য, কীটপতঙ্গ, প্রতি ধূলিকণা সকলি তাঁর বিভিন্নরূপ। ধর্ম্মের এই যে নূতন তত্ত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভেদ করিয়া দিয়াছে তাহা সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের যখন আত্মসম্মান জ্ঞান হইল;—

সে যখন সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল, তখনই প্রকৃত পক্ষে এই ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্ম। শক্তি-বাদের মধ্য দিয়া এই ধর্ম্ম-মত অতি প্রাচীন কালেই সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়। শাক্ত জানেন আধার ও আধেয়ে যে সম্বন্ধ;—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ—শক্তি ও শাক্তে সেই সম্বন্ধ অগ্নি ও দাহিকা শক্তির মধ্যে যেমন একটী বাদ দিলে অপরটীর কোন মূল্য থাকেনা তেমনি শক্তি ও শাক্তের মধ্যে সম্বন্ধ। এই দ্বৈত বাদই শক্তি বাদের মূল সূত্র। শক্তিবাদের উৎপত্তি স্থল বাংলা;—তন্ত্র সকল বাংলাতেই রচিত। বাংলা হইতেই এই ধর্ম্ম তাঁহার সুযোগ্য বরপুত্রগণের মারফতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়া তদ্দেশীয়গণের সামাজিক জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার গৌরব এখন ধূল্যবলুণ্ঠিত, সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত;—বাংলার শক্তি পঙ্গু, বাংলার শাস্ত্র লুপ্ত, সাহিত্য কীটদষ্ট, বাংলার বাণী এখন নিষ্ক্রিয়; কিন্তু এই বাংলাই এক দিন ভাবপ্রবণতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদে নীরস কঠোর জ্ঞানমার্গের সংস্কার সাধনে ভক্তির পীযুষ-নিঃস্যন্দিনী ধারায় ভারত এবং বহির্ভারত প্লাবিত করিয়া ধর্ম্ম এবং সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বাংলা সেই যুগেই 'মাকে চিনিয়াছে— শক্তি এবং শাক্তকে অভেদ দেখিতে শিখিয়াছে। জগতে মূর্তিপূজার প্রথম প্রচারক শাক্ত সম্প্রদায়। বাংলা হইতেই এই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। রোমে, গ্রীসে, মিশরে, আফ্রিকায়, প্যালেষ্টাইনে, মক্কা ও মদিনায় এক সময়ে ভারতীয় প্রথাতে প্রতিমা পূজা হইত। Moses তাহাই নিবারণ করিতে যাইয়া বাইবেল লিখেন;—হজরত মহম্মদ সেই সাকার উপাসনার মূলে কুঠারাঘাত করেন। আজও ভারতের শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধ্যান ধারণা, পূজাপদ্ধতি শাক্ত প্রণালীতে নিয়মিত হয়। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারগত এবং আনুষ্ঠানিক যত বৈষম্যই থাকুক না কেন-ধর্ম্মের মূল সূত্র পৃথক্ নহে। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—বৈদিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিকেই মূল সূত্র করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা, এড্ডা, প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রতীচ্যের ব্যাস, বাল্মিকী, গৌতম, কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামনিষীগণের উপদেশাবলীর পার্শ্বে পাইথাগোরাস, সক্রেটীশ, প্লেটো, আরিষ্টাটল, হোমার, সিসিরো, ভার্জিল, হাফেজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির উপদেশাবলী রাখিলে সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তখন স্বতঃই মনে হয় এত সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ আদান প্রদান ভিন্ন হইতে পারে না। তাই Col. Alcot বলেন—"প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিদের মতের সহিত পরবর্ত্তী গ্রীস ও রোমের দার্শনিকগণের মতের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে জ্ঞান হয় যে প্রথমেরই প্রতিবিম্ব পরবর্ত্তী দর্শনরূপ দর্পণে দেখিতেছি। শিক্ষক বা পুস্তক প্রাচ্য দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশে না আসিলে এরূপ সাদৃশ্য হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস বুদ্ধির অগম্য। আবার উহা আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়াছে যে ভারতবাসীরাই মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক Plato পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় প্রাচীন দার্শনিকগণই জ্ঞান আহরণার্থে মিশরে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন আলো যখনই ভারতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তখনি ভারতীয় আর্য্যগণ ইরাণে প্রচার করিতে বিলম্ব করে নাই! প্রাচীন যুগে ভারত ও ইরাণ সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সেই যুগে প্রাচীগগণে এই দুইটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃজাতি জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ, শৌর্য্যবীর্য্য ও সভ্যতায় অতুলনীয় হইয়া তরুণ তপনের মত বিমল কিরণ বিচ্ছুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমশঃ—

Printed by Radha Ballav Basak, at the Narayan Machine Press, Dacca.

মার্কিণ ও জাপ-কৃষকের বাড়ী।

বীণা—
৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা



মার্কিণ-দেশের গরীব কৃষকের বাড়ী।



জাপানের গরীব কৃষকের বাড়ী

"কৃষি-সম্পদ"-সম্পাদক

কৃষি সম্পদ প্রেস, ঢাকা

[illegible] সৌজন্যে।

বীণা
সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫। [নবম সংখ্যা

রাই

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বঁধু তুহারি তৃপ্তির লাগি' ফুটেছি যৌবনে,
গাঁথিয়াছি হার পরাতে তোমারে পীরিতি রঙ্গনে।
পরাণ-বন্ধু মোর,
ভেঙ্গোনা-তন্দ্রা-ঘোর
আঁখি যে মজেছে কাজল মেঘের রূপের অঞ্জনে!

গান হ'য়ে বাজে গুরু-গঞ্জন; কুলমান চুরমার্
তুমি বই ওগো রাই কমলের কেবা আর আপনার?
কারে বা লজ্জা নাথ!
বিরহ অশ্রু-পাত
আঁচলে চাপিয়া লোকের সুমুখে লুকাতে চাহিনে আর।

ছিঁড়িলে বন্ধু আমার সরম দুকূল-গুণ্ঠনে,
কি নিধি মিলেছে আমার পূজার দেউল লুণ্ঠনে!
এ দুখ দুঃখ নয়,
মিছে আশঙ্কা ভয়,
সকল খোয়ানু বাঁশীর খেয়ালে সুরের মূর্চ্ছনে!

এত যে কেঁদেছি বুকে মাথা থুয়ে অদূর বিচ্ছেদে,
কাছে পেয়ে পাছে আবার তোমারে হারাই সেই খেদে।
কহিছে করুণ আঁখি
দিওনা দিওনা ফাঁকি,
রেখো গো আমারে দিবস রজনী সুদৃঢ় পদে বেঁধে।

চির যুগ ধরি রয়েছি জাগিয়া ব্রজের ফুল শেজে,
মধু মন্তরে অন্তর গাঁথা তোমারি সঙ্গে যে।
লও গো অঞ্জলি,
গানের শেষ কলি,
জল-তরঙ্গ সারঙ্গে ওই ওঠে কি সুর বেজে !

খেলায় খেলায় উতল রহিনু গেল যে দিন চ'লে,
প'লনা চরণে কমল-পরাগ এ নীল-অঞ্চলে।
আঁধারে অশ্রু-ঝরা
হ'ল না কুম্ভ ভরা—
ভাসিল না হিয়া চুম্বন রসে সুধার হিল্লোলে। *



* "তরুণ কিশোর-সম্মিলনী" র হাতে লেখা মাসিক "সাধনার" সৌজন্যে



নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৫)

কথাটা বলা যত সহজ, কার্য্যে প্রতিপন্ন করা তাহাপেক্ষা লক্ষগুণ কঠিন। প্রণতি কথা দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে কথা যে কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যাইবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া প্রণতি অস্থির হইয়া পড়িল।

শরৎ এখানে থাকিলে সে তাঁহার কাছে একবার কথাটা তুলিত। শরতের স্বরূপ সে দেখিতে পাইয়াছিল, শরতের হৃদয়ের ভাব সে অনুভব করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে যেরূপ দয়া তাহাতে এই দুস্থ পরিবারকে যে তিনি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন ইহাতে প্রণতির একটুও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কোথায় শরৎ? একমাসের স্থলে দেড়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। পূজার আর কয়েকদিন মাত্র বিলম্ব আছে, কাল স্কুলের ছুটি দিয়া পরশ্বদিনে সে বাড়ী যাইবে, মানিকের উপায় সে কি করিবে? শরৎ তাহার হাতে মাণিককে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে মাণিককে লইয়া যায় কি করিয়া?

প্রতিদিনকার মত হিরণ্ময় আজও সন্ধ্যাবেলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রণতি তাঁহার এরূপ আগমনে মোটেই খুসি হইত না ইহা বলাই বাহুল্য। উপায় নাই, বাধ্য হইয়াই তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

এ কথা সে কথার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজোর বাড়ী যাচ্ছেন কি?"

প্রণতি উত্তর করিল, "যেতে হবে বই কি? এতদিন ছুটি, এখানে থেকে কি করব?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সে কথা ঠিক, প্রবাসীর মন দেশের পানেই পড়ে থাকে, একদিনের অবকাশ পেলেও সে বাড়ী ছুটতে চায়। আমি যখন কলকাতায় থেকে পড়তুম, একদিন ছুটি পেলে আর সেখানে থাকতে পারতুম না, বাড়ী পালিয়ে আসতুম। তবে আমার সঙ্গে আপনার কথা আলাদা। এখানে আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই ছিলেন, আপনার তো শুনেছি তেমন আত্মীয় কেউ নেই, মা বাপ, ভাই বোন—"

প্রণতি শুষ্ক হাসিল, বলিল, "কেউ নেই তবু ভিটের টান বলে একটা কথা যে চলিত আছে সেটা জানেন কি? আবার যার ভিটে নেই তারও জন্মভূমির 'পরে একটা টান থাকে এ কথাটা ও বোধ হয় মানবেন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "নিশ্চয়ই মানতে হয়, না মানলে আর চলে কই? তবে একটা কথা—আপনি তো পল্লীগ্রামের দুর্গোৎসব ব্যাপারটা কখনও দেখেন নি, এ বছরটা এখানে থেকে না হয় দেখেই যাবেন।"

তাহাকে এখানে রাখার জন্য হিরণ্ময়ের এত ব্যস্ততা কেন তাহা স্পষ্টরূপে না বুঝিয়াও প্রণতি শঙ্কিত হইয়া উঠিল; নত দৃষ্টিতে বলিল, "দুর্গোৎসব ব্যাপারটা দেখবার আগ্রহ আমার কোন কালেই নেই। যা চিরকাল হয়ে আসছে এখনও তাই হচ্ছে তবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত ভাবে, এর পর ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হতে হতে শেষটায় একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।"

"বাপুয়া—"

প্রাঙ্গণ হইতে এই আহ্বানটা ভাসিয়া আসিল। কথা বলিতে বলিতে প্রণতি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, হিরণ্ময় সহজেই তাহা লক্ষ্য করিলেন।

"বাপুয়া বাড়ী আছিস না কি ?"

প্রণতি উঠিয়া পড়িল, হিরণ্ময়ের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শরৎ বাবু এসেছেন, তাঁকে—"

সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপর শরতের সুদীর্ঘ সুগৌর দেহ দেখা দিল। প্রণতি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতে তিনিও নমস্কার করিলেন, হিরণ্ময়ের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এই যে হিরণ, এখানে। বেশ বেশ, ভারি খুসী হয়েছি।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। প্রণতির পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আমার কথার সত্যতা দেখছেন মিস বোস? সেই যে একটা গল্প বলেছিলুম না,—ভিখারীকে যদি এতটুকু অধিকার দেওয়া যায় সে ক্রমে সবটা চেয়ে বসে। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আপনি,—আপনি রইলেন দাঁড়িয়ে, আমি কিন্তু আপনি না বলতেই আপনার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লুম।"

নতমুখে প্রণতি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "না না, আপনি বসুন। আপনারই বাড়ী—জিনিসপত্র সবই, আপনি বসবেন না ?"

শরৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হিরণ্ময়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "মিস বোসের কথা শুনছো হিরণ,—আমি কিন্তু আপনার এ সব কথা মেনে নিতে রাজি নই মিস বোস। আপনাকে এই অতিরিক্ত বিনয়ীভাব ছেড়ে দিতে হচ্ছে, নইলে আমার সঙ্গে কিছুতেই বনবে না।"

হিরণ্ময় এ হাসি তামাসার মধ্যে মোটেই যোগ দিতে পারিলেন না, চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া অবিরত হাই তুলিতে তুলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

শরৎ প্রণতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তারপর, আমার সে রত্নটী কেমন আছে, আপনাকে খুব বিরক্ত করে মেরেছে বোধ হয়? যা হোক, আচ্ছা এক বোঝা আপনার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, যখন খুব বিরক্ত হতেন, নিশ্চয়ই আমায় খুব গালাগালি দিতেন,—না—"

বাধা দিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রণতি বলিয়া উঠিল, "আপনি নিজে অনেকগুলো অন্যায় কথা ব্যবহার করছেন। আমি আপনাকে গালাগালি দিয়েছি এমন কথাটা আপনি বলতে পারলেন কি করে? হিরণ্ময় বাবু জানেন, আমি কোন দিন আপনাকে কোন কথা বলেছি কিনা।"

হিরণ্ময় মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টায় তাঁহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র; তিনি, শরৎ ও প্রণতির দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন;—ইহাদের কথাবার্ত্তা কেমন সরল, ইহারা যেন কতকালের পরিচিত। ইহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে ধার করিয়া আনা সভ্যতার অকারণ গাম্ভীর্য্য নাই, কেমন অকুণ্ঠিত।

এই রকম সময়ে এইসব কথার মাঝখানে মাণিক তাহার পুষ্ট দেহখানা আনিয়া দাঁড়াইল, তখন শরৎ সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেড়মাস আগে তিনি যে মানিককে রাখিয়া গিয়াছিলেন, এ সে মাণিকই নয়, আশ্চর্য্য হইবারই কথা।

তাঁহার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া প্রণতি একটু হাসিল, বলিল, "দেখছেন মাণিক কিনা ?"

প্রশংসমান নেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া শরৎ বলিলেন, "বাস্তবিকই তাই দেখছি, বিস্ময়ে আমার প্রাণ ভরে উঠেছে। মাত্র দেড়মাস আগে, যাকে রেখে গেছি, সে আজ মানুষ হয়ে গেছে, এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না কে বলুন দেখি ?"

প্রণতি বলিল, "হিরণ্ময় বাবুকে ধন্যবাদ দিন শুধু তাঁর চিকিৎসার গুণেই—"

ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "অমন মিথ্যে কথাটা মুখে—আনবেন না মিস বোস, আর শরৎ, তুমিও এ কথাটা এমন চট্ করে মেনে নিলে চলবে না। তোমার ওখানে থাকতেও তো চিকিৎসা করতুম, কোনদিন সামান্য কিছু উন্নতিও দেখতে পেয়েছিলে কি? জেনো বাস্তবিকই ওর উন্নতি শুধু মিস বোসের হাতের গুণে, ওর হাতের সেবা না হলে শুধু ওষুধে কি হোতো ?"

শরৎ একটু হাসিলেন, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে কথা আমি বেশ জানি। মেয়েদের কাছ হতে যা

না পেলে ছেলেপুলে কিছুতেই বাঁচতে পারে না, কারণ পুরুষ তাদের লালন পালন করবার নীতি কিছুই জানে না। ওরা যেখানে কোন কিছু পাওয়ার জন্তে আবদার করে আমরা পুরুষেরা সেখানে ধমক দিয়ে থামাতে চাই, মেয়েরা সেখানে আদর করে ভুলিয়ে দেন। মেয়েরা যে মা না হতে পেরেছে সেও সংস্কার বশে শিশুপালন নীতি বেশ জানে, এটা তার মহাকাজ, কিন্তু আমাদের মত অপদার্থ লোক গুলো কিছুতেই এ সব কাজ পেরে উঠবে না; সারা জীবন শিশুদের কাছে কাটালেও তাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারব না এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

প্রণতি মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল, তাহারপর বলিল, "একে কি আপনি আবার নিয়ে যাবেন, না আমাকেই দান করলেন বলুন দেখি?"

শরৎ বলিলেন, "সেটা আপনার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে এর যদি ঠিক মত মিলে যায় তবে রাখতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি করবার কোন কারণ নেই; আর যদি না রাখতে চান,—আমার জিনিস আমায় ফিরিয়ে দিন—আমি নিয়ে চলে যাই।"

প্রণতি একটু ভাবিয়া বলিল, "তবু এই ছুটির সময়টা আপনি ওকে নিজের কাছে রেখে দিন, তারপর আমি এসে ওকে নেব। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু আমার মামিমা,—তিনি এ সব বড় একটা পছন্দ করেন না।"

শরৎ বলিলেন, "না না, আপনাকে ওর ভার আমি এখনই দিতে চাই নে। প্রতুলের স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে এসেছেন, তিনিই এ ছেলেটার ভার নেবেন, তাঁর ছেলে মেয়ের সঙ্গে এই হতভাগাটাকেও তিনি মানুষ করে তুলবেন।"

প্রণতি বিস্ময়ে বলিল, "তিনি আপনার সঙ্গে এসেছেন?"

শরৎ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাঁকে নিয়ে এলুম; একদিন তাঁর কথা সব শুনতে পারবেন।"

সেই অভাগিনী অপরিচিতার কথা মনে করিয়া প্রণতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "বেশ করেছেন তাঁকে এনেছেন; আপনাকে দেখা শোনার একজন লোক হ'ল।"

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বুঝি সে জন্তে বড় ভাবনা হয় মিস বোস?"

প্রণতি শান্ত কণ্ঠে বলিল, "ঠিক তা নয়; তবে সময় সময় আমার মত আর কারও অদৃষ্টের কথা ভাবতে গেলে আপনার কথাই মনে হয়।"

তাহার এই কথা গুলিতে একটা ভারি করুণ সুর বাজিয়া উঠিল যাহা দুইটী শ্রোতারই হৃদয় স্পর্শ করিল।

শরৎ বলিলেন, "কেন মিস বোস,—আপনার মামি-মা—"

প্রণতির বেদনা ভরা হাসি সে কথা সমাপ্ত হইতে দিল না। কথাটা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

হিরণ্ময় একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া আলস্য ভরে বলিলেন, "এখন তবে ওঠা যাক, আটটা বেজে গেছে।"

শরৎ তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চল, একসঙ্গেই দুজনে যাওয়া যাক। তা হলে আপনি পরশু দিনই যাচ্ছেন মিস বোস?"

প্রণতি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, পরশুই যাব।"

শরৎ উঠিয়া বলিলেন, "তবে কাল এসে একে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনার বেতন—"

প্রণতি বলিল, "সেক্রেটারী সব মিটিয়ে দেছেন।"

শরৎ ও হিরণ্ময় বিদায় লইলেন।

নীলার কথাটা মনে জাগিতেছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ের সম্মুখে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। স্থির করিয়া রাখিল কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে শরৎকে এ কথাটা জানাইতেই হইবে।

(১৬)

মাণিক আসিয়া জ্যোতি ও মিনতির পার্শ্বে গম্ভীর মুখে যখন দাঁড়াইল তখন তাঁহারা দুইটী ভাইবোন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই অপরিচিত ছেলেটা কোথা হইতে আসিল এবং তাহাদের পাশে দাঁড়াইল তাহাই তাহারা ভাবিয়া পাইল না।

অবশেষে তাহারা নিতান্ত দয়াপরতন্ত্র হইয়াই মাণিককে তাহাদের খেলার সঙ্গীরূপে কাছে ডাকিয়া লইল।

কিন্তু কি যে ছেলেটা প্রবল উপেক্ষা ভরে তাহাদের আহ্বান সে এড়াইয়া গেল, কিছুতেই কোন কিছুর মধ্যে ইহার নাগাল পাওয়া গেল না। জ্যোতি ভারি রাগিয়া গেল, মিনতি মুখ বাঁকাইয়া দাদার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "হোক গে দাদা, আমরা দু'জনের কেউই ওর সঙ্গে কক্ষনো খেলব না, চল আমরা দুজনে একলা একলা খেলি গিয়ে।"

মাণিক যেন এ বাড়ীতে পর হইয়া গিয়াছে। সে এই বাড়ীতে পূর্ণ চারমাস কাটাইয়া গিয়া দুদিন তফাতে গিয়া যেন নিঃসম্পর্কীয় হইয়া গিয়াছে। প্রণতির সেই ছোট বাড়ীখানাই যেন তাহার বড় আপনার ছিল, প্রণতি যেন তাহার নিজের,—আর সব পর। সেখান হইতে আবার তাহার পূর্ব্ব পরিচিত এই স্থানে আসিয়া সে যেন অতল জলে পড়িয়াছিল, এই অতল জলে পড়িয়া সে বৃথা আঁকু বাকু করিতেছিল, কিছুতেই স্থল পাইতেছিল না।

এবার শরতের সহিত আড়ি করিয়া দারুণ বিদ্বেষে ইন্দু খুব বেশী করিয়া পূজার যোগাড় করিয়াছে। পূর্ব্বের সঞ্চিত অর্থ—শুধু শরৎকে দেখাইবার জন্য সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া ভাইয়ের সাহায্যে কলিকাতার থিয়েটার, যাত্রা, কীর্ত্তন আনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

শরৎ একবার মাত্র মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "এতগুলো টাকা অনর্থক খরচ করছেন মা, এ গুলো দেশের কোন সৎকাজে দিলে ভালো হতো। অনেক জায়গায় লোকে জলের অভাবে শুকিয়ে মরে, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা যেত, যারা খেতে পায় না, তাদের খেতে দেওয়া যেত। টাকাগুলো শুধু জলে ফেলে দিচ্ছেন মা, একটী পয়সার জন্যে কত লোক হাহাকার করে ফিরছে।"

ইন্দু একটাও উত্তর দিল না। মণিশকে গিয়া বলিল, "শুনছিস মণি, শরতের কথা? বলছে—এতটাকা এমন ভাবে উড়িয়ে দিয়ে কি হবে, তার চেয়ে কাজ করতে এই টাকা গুলো দেওয়া হোক। এর কাজ পরের ধনে পোদ্দারী করা, অর্থাৎ কি—না আমার টাকাগুলো আমি ওর হাতে দেই, সে নিজের নামে কাজ করে লোকের কাছ হতে বাহবা নিক। আমি ছেলে মানুষ নই, সব বুঝি,—কেন দেব? আমার টাকা আমি যা খুসি তাই করবো, কেউ তাতে কথা বলতে আসবে কেন?"

সেবাকে দেখিয়া ইন্দু মোটেই খুসি হইতে পারে নাই। সেবার সম্বন্ধে সে মনের মধ্যে কি ধারণা করিয়া লইয়াছিল তাহা সেই জানে। সেবা নিজে সাধিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, ইন্দু তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না, অপমানিতা সেবা ফিরিয়া গেল।

পূজার পূর্ব্বে একদিন ইন্দু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেবাকে ডাকিয়া বলিল, "ওই বাগদীর ছেলেটাকে এ কয়দিন একটু সাবধান করে রেখো গো,—যেন পূজোর দালানে কখন না উঠে পড়ে। তোমাদের তো বাছা জাতজন্ম কিছু নেই, হিঁদুর কোনও আচার বিচারও তোমরা রাখতে চাওনা। তোমাদের খিষ্টেন বলি কি সাধে বাছা,—কেউ কখনও শুনেছে কোনও বামন কায়েতের ঘরের ছেলেমেয়ে বাগদীর সাথে বসে খায়? তোমাদের বাছা সবই চলে, নইলে ওই "জলজ্যান্ত" বাগদী ছোঁড়া তোমাদের ঘরে দোরে ওঠে, সব ছোঁয়, একসাথে বসে খায়? যাক গে ওসব কথা, তোমরা মর বাঁচ তাতে আমার কিছু এসে যাবে না, আমার নিজের ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চললেই হল। পূজো এসেছে, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে হয় তো ও ছোঁড়াও দালানে উঠে পড়বে।

সেবা শান্তকণ্ঠে বলিল, "একসঙ্গে থাকতে গেলেই তা হতে পারে মা। আমার ছেলেমেয়ে এবার না হয় ওর জন্যে ঠাকুর দেখবে না,—ওকে নিয়ে তফাতে খেলা করবে। ওরা বেঁচে থাকলে বছর বছর ঠাকুর দেখতে পাবে, বড় হলে মানিকেরও জ্ঞান হবে, সে নিজেকে তফাতে রাখবে।"

গলার সুর নরম করিয়া ইন্দু বলিল, "তা বাছা, যা ভাল হয় তাই কোর,—আমার পুজোটা যেন ভালয় ভালয় হয় আমি শুধু তাই করতে চাই। ও সব অনাচারের ছোঁয়া আমি সইতে পারব না, আমার ভালও লাগে না। যত সব স্বেচ্ছাচার এই বাড়ীতে,—বাড়ীর কর্ত্তারই ধর্ম্ম জাত জ্ঞান নেই,—অন্যের আর থাকবে কি?"

সেবা নীরবে শুনিয়া গেল,—উত্তর দেওয়া তাহার প্রকৃত বিরুদ্ধ বলিয়াই সে উত্তর দিতে পারিল না। অন্তরের

অন্তরালে তাহার ক্ষুব্ধ মন কাঁদিয়া ফিরিতেছিল—উহারা কি কেহই নয়? বিশ্বের দরবারে এইসব উন্নত শ্রেণীর লোক আরজি পেশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সকল অধিকার আছে, নীচ অস্পৃশ্যদের কোন অধিকার নাই। এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ জ্ঞান জাতিকে কতটা নত করিয়া রাখিয়াছে তাহা এ দেশের লোক কোনদিন কি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবে? যেখান হইতে আসিয়াছে এবং দুদিনের খেলা শেষ করিয়া যেখানে আবার যাইয়া মিলিতে হইবে সেখানে কি জাতির পার্থক্য থাকিবে? কবি সত্যই বড় দুঃখে গাহিয়াছেন

ছুঁলে তোর জাত যাবে—

জাত ছেলের হাতে নয় তো মোয়া।

সেবা আজ বেশ বুঝিতেছিল জাতির গলদ কোথায়—কোথায় এবং কেমন করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে? যে দিন দেশের মেয়েরা নিজেদের মন হইতে এই আচারের মিথ্যা মোহ দূর করিতে পারিবেন, সেইদিন বড় ছোটকে নিজের পাশে টানিয়া লইতে পারিবে,—জাতি আবার বৃহৎ জাতিরূপে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

সেবা জ্যোতি ও মিনতিকে মাণিকের রক্ষক নিযুক্ত করিল, মাণিককে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল সে যেন পূজার দালানে না উঠে!

বালক সে, তাই যাহা তাহাকে নিষেধ করা যায় তাহাই করিয়া বসে। অনেক করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধম বাগদীর ছেলেটী সে সাবধানতা ভুলিয়া অন্য ছেলে-মেয়েদের সহিত মহাষ্টমীর দিন পূজার দালানে উঠিয়া পড়িল।

ইন্দু তখন স্নানান্তে শুদ্ধ দেহে, শুদ্ধ মনে অঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল, মাণিককে নিজের পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে একবারে স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

"রামচরণ—জলদি এদিকে এসো—"

অঞ্জলি দেওয়া হইল না, রামচরণকে ডাকিতে ডাকিতে ইন্দু দালান হইতে নামিয়া পড়িল,—ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, তাহার সুগৌর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্দুর আহ্বানে জমাদার রামচরণ দোবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অস্পৃশ্য বাগদীর ছেলেটার কান ধরিয়া তাহাকে দালান হইতে নামাইয়া লইল, তাহার পর তাহার পাকা হাতের বিরাশী সিক্কার চড় গণ্ডে বসাইয়া পৃষ্ঠে গোটা কত কীল দিয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে পূজাবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। জ্যোতি ও মিনতি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। দেবী প্রতিমাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া আবার পূজার আয়োজন চলিতে লাগিল।

পুরোহিত যখন স্তোত্র পাঠ করিতেছিল—

যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু আত্মারূপেন সংস্থিতা,

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তখন তাঁহার স্তোত্র কাহারও হৃদয়ে হতভাগ্য পতিত বাগদী ছেলেটার কথা জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। সর্ব্ব ভূতে আত্মারূপে যে দেবী বিরাজিতা, প্রাণী মাত্রই যে শক্তি অনুভব করে সেই আত্মা—সেই শক্তি বাগদী বালকের মধ্যেও ছিল কিনা তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিল না। ইহারা মাপকাঠি লইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করে, সেই জন্য যদিও স্বীকার করে দেবী সকলের মধ্যেই আত্মারূপে বিরাজিত, কাজের বেলায় সেটা মানিয়া লইতে চায় না। বাগদী, হাড়ি, মুচি প্রভৃতি অস্পৃশ্যদের অতি সাবধানে তফাতে রাখিয়া দেশের স্পৃশ্যরা নিজদের বাঁচাইয়া চলিয়াছে। দেবী, তোমায় ডাকিবার অধিকার যখন অস্পৃশ্যেরও আছে, কেন ইহারা তোমার নিকটে যাইবার অধিকার পাইবে না? তোমার সন্তানের মন তুমি পবিত্র করিয়া তোলো, জানাও মাতৃ পূজায় সকলেরই অধিকার আছে।

(ক্রমশঃ)

ব্যথিত ভগবান

শ্রীফণীন্দ্র পাল

জীবনের এত ক'টা দিন কাটিল এম্‌নি করিয়াই।—বন্ধনহীন।

ভিতরের অস্থির যাযাবরটি চিরউন্মুখ।

মনে হয়, এই বৃহৎ জগৎটার সহিত সুনিবিড় পরিচয় তো এতদিনেও হইল না—কিন্তু হইবে হয়ত একদিন......

কে জানে...!

ভালই লাগে –

উন্মুক্ত দুরন্তপনার উদ্দাম কল-কাকলি।

তাই চলি আর চলি পৃথিবীর বুকে তাল ঠুকেই।

দুর্য্যোগের রাত্রি।

সম্মুখের অনন্ত অন্ধকার রহস্যময় মায়াপুরীর মত ভয়োদ্দীপক।

আকাশের চোখের জল দুর্ব্বার

পৃথিবীর বুকে তার পতন।—কান্তিহীন।

একেবারেই ভিজিয়া গিয়াছি।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়াছে।

পথের পাশের জীর্ণ বাড়ীটার টিম্‌টিম্ আলোটি মৃত্যু-প্রতীক্ষার যাত্রীটি যেন।

ডাকিলাম। সাড়া নাই।

...অবিশ্রাম পতন আর বাতাসের হুহুঙ্কার।

ঢুকিয়া পড়িলাম।

জরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ আধঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

আর তাহার বুকের উপর...

যেন কাণ পাতিয়া শুনিতেছে— কখন বুঝি ওই স্তিমিত লোকটির স্পন্দনটুকু থামিয়া যায়।

একখানি সুপ্তি-নিমগ্ন আনত কমনীয় মুখ...

অপরূপ ভঙ্গীটি।

ছিন্ন বিস্রস্ত বসনের ফাঁকে মদির যৌবনের উচ্ছলতা।

গরীব বেচারী...

নির্লজ্জ চোখ দুইটি আমার জ্বলিয়া উঠে।

কিন্তু আমি যাযাবর—আমি সন্ন্যাসী।

ভাবি, হয়তো তা' শুধু আত্মছলনা!

তবু—

ডাকিলাম, বুড্ডা।

সাড়া দিল, হুঁ...

সিক্ত গৈরিক বসন দেখিয়া বলিল, চুল্লিকা পাশ বৈঠিয়ে সাধুজী।

নিবু নিবু আগুনের পাশে বসিয়া কাঁপি।

বুড্ডা বল্ল, তার নাম ভজন...আরো কত কি বলিয়া চলে।

তার পূর্ব্বজীবনের কথা.. তার দারিদ্র্যের কথা...আর রোগের...

অৰ্দ্ধেক কথা কাণেই আসে না!

বলে, একটা ঝাড়ফুঁক, না হয় তো একটা ওষুধ- সন্ন্যাসী আদমীর মেহেরবানি না হইলে সে মারাই যাইবে···

হাসি আসে।

সন্ন্যাসী হওয়ার মত সর্ব্বনাশা ছলনা আর দ্বিতীয়টি বুঝি নাই।

কিন্তু তবু তাহাকে আশ্বাস দিই।

বাহিরের প্রলয়ক্ষুব্ধ রাত্রি উত্তাল।

ঘরে বসিয়া তাহার উন্মত্ত গর্জ্জন শুনিতে পাই।

এম্‌নি করিয়াই ভজনের সহিত আলাপ জমিয়া উঠিল।

সে গৃহী, আমি বৈরাগী।

একটা প্রশ্ন কেবলি মুখের কাছে আসিয়া ছটফট্ করে।

কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারি না।

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিই—সন্ন্যাসীর আবার লজ্জা...

বলিয়া ফেলিলাম—

ওই বুঝি তোর বিটিয়া?

ভজনের চোখ দুইটি ক্ষণিকের জন্ম জ্বলিয়া উঠিয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বলিল, ওর জন্তেই তো বাঁচ্‌তে চাই দেব্‌তা ; ওই আমার কলিজা...আমার সাদি-করা 'বহু'...

আশ্চর্য্য হই, কিন্তু হাসিতে পারি না।

বাহাত্তুরে বৃদ্ধের স্ত্রী এক ষোড়শী তরুণী।

উত্তপ্ত যৌবনের দৈহিক সুখ উহার কাছে মরীচিকা...

ভাবিতে, তাহার জন্ম আমার বুকের ভগবানটি ব্যথায় উদ্বেল হইয়া উঠে।

ঈশ্বর বলিয়া ওপরের লোকটি বোধ হয় কাণা...

...আমি সন্ন্যাসী সেকথা ভুলিয়া যাই—

ভুলিয়া যাই যে কামনার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযানের তিলক কাটিয়াই সন্ন্যাস ব্রত।

ওই তরুণীটির কথা বলিয়া যেন নিজ হাতেই ভজনের মুখের ছিপিটা খুলিয়া দিলাম।

ভজন বলে, ওর নাম জাহ্নবী। ছয় মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে .....তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পাওনা—তাহার যথাসর্ব্বস্ব তিন কুড়ি সাত টাকা খরচ করিয়া।......

ভাবিতেছিলাম—

অন্নের সংস্থানের চেয়ে বিবাহটাই কি বড় হইল!

ভজন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

বাবাজী, তুমি নারীর স্নেহ মমতার মূল্য কি বুঝবে...... পথই তো তোমার ঘর—

মনে হইল, সত্যই তো—

এত বড় সমস্তার মীমাংসা করার জীবন আর যাহারই হয় হউক্...

আমার তো নয়ই।

কিন্তু ভজনের বাকী কথাটুকুও শুনিতে হইল—

...জাহ্নবী নাকি তাহাকে ভালবাসে—খুব।

বলে আর স্খলিত দন্তের ফাঁকে হাসি উপ্‌চাইয়া পড়ে।

লোলচর্ম্মে বিকৃত মুখখানিতে অপার আনন্দ।

উন্মাদ!—

না হইলে এমন অসম্ভব কথাটা...

আবার বলে আমিই নাকি তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিব—

হতভাগ্য মরুক্!...

চুপ্‌ করিয়া থাকি।

জাহ্নবীর ঘুমন্ত চোখ দুইটি বিস্মিত...

আমার দিকে চাহিয়াই রহিল।

নিজের দিকে—নিজের বেশের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল—

তবু বিরক্ত হইতেছিলাম।

জাহ্নবী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, সন্ন্যাসী!—

অসহ্য!—

আমার জীবনের পদ্ধতি লইয়া এই তরুণীটির শ্লেষ করিবার স্পর্দ্ধা।

কাসিতে কাসিতে বুঝি ভজন দম্ আট্‌কাইয়া মরে।

আমার দিকে আঙ্গুলটি তুলিয়া বলিল, দেব্‌তারে দেব্‌তা...

আর যেটুকু বলিল সেটুকু একান্তই অস্পষ্ট।

নিমিষে পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখিলাম।

কাতর কণ্ঠে সেদিন জাহ্নবী আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া পারি নাই।

বলিয়াছিল—

তাহার স্বামীটিকে আরাম করিয়া দিতে হইবে।

ইহাদের অন্ধবিশ্বাস দেখিয়া করুণা হয়।

দুর্য্যোগের মতই ভজনের নিশ্বাস আজ অসরল...

তাহার যন্ত্রনাবিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া জাহ্নবীর দুশ্চিন্তা...

উৎকণ্ঠা।—

বুঝিলাম, এই সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মোহ বেদনার অনুভূতি নিরুদ্ধ হইলেও জাগ্রত।

জাহ্নবীর পাশে বসিয়া ভজনের শুশ্রূষা করি।

তিনদিন পরে ভজন আজ পথ্য করিবে।

স্নিগ্ধ মনটা একটা ভাবনায় অন্তমনস্ক।—ভাবি কেবলই...

জীবনের প্রয়োজন তো এতদিন পথেই চালিয়া দিয়াছি, নিঃশেষে।

কিন্তু—

আজ্‌কে আমার সে উদ্দাম পথিকটি গেল কোথা!

পাশে বসিয়া ভজনের অবিশ্রান্ত বকুনি···

বলে, ওই দূরের তালবন তারপর একটি উন্মত্ত সমুদ্র ......আশেপাশের দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য খণ্ড পাহাড়......তারি একটির গুহায় থাকে এক জাগ্রত দেব .....ছোট গ্রামটির উপর কখন তাঁর স্মিত আনন্দ, কখন রুদ্র ভ্রুকুটী—ভণিতার হয়তো প্রয়োজন ছিল।

সে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল—

তাহার সহিত আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।—

শুধু তাহাই নয়······

সুফল চাই—তাহার অন্ন কষ্টের নিবৃত্তির জন্য আর রোগ শান্তির......

বিমুখ দেবতাটি নাকি আমি না গেলে কিছুতেই তাহার উপর প্রসন্ন হইবেন না!

একটা উত্তর হয়তো দিতাম—

সম্মতি-অসম্মতির।

তাহার পূর্ব্বেই আসিল জাহ্নবী। মুখে তার অসঙ্কোচ হাসি, বৃহৎ।

আমার পথ সম্বল ঝুলিটি হাতে লইয়া।—

তাহার ভিতর ছিল সন্ন্যাসী সাজিবার সরঞ্জাম।

কাঁধের ঝুলিটি ফেলিয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

আপত্তি করিবার অবসরও মিলিল না।—এমনই সন্ত্রস্ত।

...কৈফিয়ৎ সে একটা দিল—

বলিল, ভিক্ষা না করলে খাবে কি?

চমৎকার তার অতিথি সমাদর...

সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি।

জাহ্নবী কি করিয়া আমার মনের কথাটি জানিল জানি না!

বলিল একজনকে তিনটা লোকের আহার্য্য ভিক্ষা দিবার মত বিশ্বাস এখানকার লোকের নাই।

মনে হইল, কি অবিচারই না এতক্ষণ উহার উপর করিয়াছি।

ভজনের অনবদ্য দারিদ্র্য তো আমার অজ্ঞাত নয়।

অদ্ভুত সঙ্গীনীটিকে লইয়া ভিক্ষা শেষে ফিরি।

ভুখা কুকুরটির মত অন্ধকার যেন অবসন্ন বেলাকে চিবাইয়া গিলিতেছে .....

তাহার রক্ত উদ্গার—

আর দূর সমুদ্রের অধীর কলোচ্ছ্বাস।

ক্লান্ত জাহ্নবীর অপরূপ রূপ।

...চাহিয়া থাকি।

ভিতরে মৌন সন্ন্যাসী যেন চোখ রাঙাইয়া বলে—

সাবধান যাযাবর, এইবার পথ পিচ্ছিল।

জাহ্নবীকে মনে হয়, ও জটিল—

হয়ত নয়।

একটা লুব্ধ গোপন অবয়ব আমার নিকট প্রার্থনার ভাষায় উন্মুখ হইয়া উঠিতে চায়...

কিন্তু পারে না—

সুফল আনিয়াছিলাম তাহার পরদিনই।

এক সুদূর রেখার এপারে শুধু শুভ্র ফেনপুঞ্জ......।

তাহার ক্রন্দন, গর্জ্জন।

জাগ্রত পাথরটি—দেবতাটি কোন আদিম যুগ হইতে তাহার তারকাহীন চোখ মেলিয়া সুমুখের পানে চাহিয়া থাকে—

যেন স্তব্ধ প্রহরী; সতর্ক, উৎকর্ণ।

আর তার আছে এক সঙ্গী—পূজারী...

বৃদ্ধ।—কুব্জ।

একটি চক্ষু বুজিয়া গেছে।

তাহার সজীব চক্ষুটি আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে পাষাণের বুকে চেতনার মত তার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস—

বলিল—

মর যা ব্যাটা, মর যা।

মনে হইল পথের বেদনা ও ব্যথার সহিত এই লোকটি সুপরিচিত।

হাসিয়া বলিলাম, আর তুমি? এই নির্জ্জন বেলাভূমি... কোন্ আলেয়ার পিছনে ছুটিয়াছ!

পাথরের পিণ্ডটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—

ওই আমার হাসিকান্না—আমার জীবন—

অন্ধ চক্ষুটির কোলে এক ফোঁটা জল জমিয়া উঠে।

আবার বলিল –

শান্তি, অশান্তি ওই ওপরের দেনেওলার হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘর যা ব্যাটা।

.. নেহাৎ মামুলি।

কিন্তু ভিতরে কোন্ খানটা যেন ধাক্কা খাইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

অবসন্ন দেহ ততোধিক অবসন্ন মন লইয়া ভাবিতেছিলাম।

ভজন আসিয়া হাজির।

সুফল পাইয়া তার আনন্দ।

বলে, মানুষের মায়া যেখানে সেখানেই তার ঘর......

চম্‌কাইয়া উঠিলাম।

বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল।

নিজেকে আশ্বাস দিলাম—

এ মায়া নয় এ রোগীর সেবা।

ভজন কিছুক্ষণ আপনার মনে বক্ বক্ করিয়া চলিয়া গেল।

...আজ ভাল করিয়া সন্ন্যাসী-সাজিতে হইবে।

ঝুলিটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি।

দেখি জাহ্নবী হাসিতেছে।

বলিল, ফেলে দিয়েছি...

—কোথায়?

—ওই পুকুরের অতলে।

সে হাসিয়াই আলুথালু—দুঃখ নাই, অনুতাপ নাই।

যেন একটা মস্ত বড় আমোদ।

অভিমান হইল বৃথাই আমি সন্ন্যাসী।

চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। গম্ভীর।

জাহ্নবী আর হাসে না।—

তার মুখখানিতে অদ্ভুত বিষন্নতা ঘনাইয়া আসে।

ওই মেয়েটিকে দেখিয়া বিস্ময় লাগে।

দেবতার চেলা আমি; সকলের কাছ থেকে পাই নির্জলা ভক্তি।

স্নেহহীন—শুষ্ক, কঠোর।

কিন্তু ও ..।

গভীর রাত্রি

বদ্ধ ঘরে অন্ধকার; বাহিরে উৎফুল্ল জ্যোৎস্না।

জীর্ণ ঘরটায় শুইয়া আছি।

পাশের ঘরটায় ভজন আর জাহ্নবী।

আমার মাথার উপর বাদুড়ের ঝটাপট্, চাম্‌চিকার হুড়াহুড়ি

যেন কার তৃষিত প্রেতাত্মা ছট্‌ফট্ করে।

·· অশরীরি কায়ার বুকেও কামনা—তৃষ্ণা জাগে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর··· ।

তন্দ্রা আসিতেছিল।

পায়ের উপর দুইটী কোমল স্পর্শ ..

চম্‌কিয়া ডাকিলাম, কেও।

ও শুধু কাঁদে।—জাহ্নবী।

···শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সেকি তাণ্ডব নৃত্য?···

ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গারের মত কঠোর ব্রতধারীর দেহে কি সুগুপ্ত প্রচণ্ড ক্ষুধা! ··

পা ছাড়াইয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলাম।

মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত রাত্রির বুকে আলো, আঁধার নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার।

ঘরের ভিতর জাহ্নবীর কান্নার শব্দ।—হাহাকার।

রাত্রির এই শুভ্র সজ্জার দিকে চাহিয়া থাকি।

হঠাৎ জাহ্নবী ছুটিয়া আসিয়া পা দুইটী জড়াইয়া ধরিল···

বলিল—

শুধু বল, তুমি মানুষ ..তোমার রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা আছে, তৃপ্তি আছে···

উত্তর দিবার সামর্থ!- সে হারাইয়া ফেলিয়াছি।—

চৈত্রের প্রখর রোদের মত চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিল নারীর দুইটা দিক।—

অক্ষমের উপর করুনা।

প্রেম।

কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না।

এক অস্পষ্ট শব্দে ভজনের কক্ষদ্বারে আসিয়া হাজির হইলাম।

ভজন মানুষ—

···সে তখন বীভৎস দৈহিক তৃপ্তিতে মত্ত।

জাহ্নবী দুই হাত দিয়া মুখটা ঢাকিয়া ফেলিল—

আবার পথ; উষ্ণ—নিষ্করুণ।

এক নিপীড়িতা নারীর জীবনব্যাপী দীর্ঘনিশ্বাসের মতই দীর্ঘ—বেদনাময়।

চলিয়াছি—

চিরবন্দী

শ্রীহরিপদ গুহ

পদ্ম-পলাশ আঁখি প্রিয়া মম গৃহ-নন্দী।
সুন্দরী ওগো প্রেয়সী মম চরণ তব বন্দি॥
তোমার মধুর হাস্যে, বিজলী পুলক লাস্যে
আমারে করেছ গো তুমি বন্দী।
তুমি জান যে অনেক ফন্দি॥

(২)

আমার হৃদি-সরসী মাঝে
তোমার বুকের কমল রাজে।
তোমার প্রেমের মন্তরে, হংস-হংসী সন্তরে—
বন্ধ করে দ্বন্দ্বশত লভে গো আজি সন্ধি।
হৃদিপুর-বন্দ্য তুমি মম গৃহ-নন্দী॥

(৩)

বিম্বাধর-চুম্বরত কম্বুগ্রীবা ভঙ্গে;
শুভ্রকান্তি-পদ্ম গন্ধ তোমার সর্ব্ব অঙ্গে।
তোমার যাদু মন্ত্রবলে, রেখেছ মোরে চরণ তলে
অসীম-অতুল অশেষ তোমার ফন্দি।
আঁখি বাণে তাই করেছ আমারে চিরবন্দী॥

মমতার ফুল

শ্রীশচীন সেনরায়

নেহাত-ই যেন নাছোড়-বান্দা,—হাতের ছবিটা শেষ করে দেবে বলেই।

হাঁ,—মুখ-খানা বা' দিকে আরেকটু ফেরাও তো। এই হচ্ছে—হলো প্রায়—আর সামান্য একটুখানি হলেই চলবে। ফেরাও! ব্যাশ—ঠিক হয়েছে। বাঃ! এখন এ 'পোজ'টাই ঠিক করে রাখ তো। নড়োনা কিন্তু। অঃ কী চমৎকার!

ঈশ! আমার কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরী লাগচে। অসিত বাবু আপনি ভারী কড়া লোক তো। মেয়েটী একটু খিট্‌খিটে ভাবে বল্লে।

ওর চেহারা কেমন মনোরম, শরীরের গড়নখানিও কি মোলায়েম—নিটোল্! চোক জোরা ভাসা ভাসা, টল্‌টলা। নিখুৎ রূপের লহরি যেন দেহে সারাক্ষণই দোলে। এমনতর যে রূপ তা তো প্রকাশ পাচ্ছে না... লুকিয়ে রয়েছে কিনা এই পঙ্কের মধ্যে! তাই বুঝি পদ্মেরও জন্ম ঐ পঙ্কেই! অসিত বাবু ভাবেন।

হঠাৎ অসিত বাবু জিগ্‌গেস করে, আচ্ছা—আজ তোমাকে এত উতলা দেখাচ্ছে কেন? মন যেন ঠিক বসাতে পারছো না! বলবে, কি ব্যপার?

মেয়েটী শুধোয়, তা হয়ত থাকবে—পরে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নেয়। সন্দেহপুর্ণ দৃষ্টিতে অসিত বাবুর দিকে তাকায়।

অসিত বাবু বালিকার মনের সন্দেহ ভাবটা চট্ করে ধরতে পারে। একটু খানি ফিক্ করে হেসে বলে, কি গো ঠিক করে উঠতে পারছো না বুঝি বিশ্বাস করবে কিনা সংবাদটা বলতে—না?

ঈপ্সা অবাক হয়ে যায় ওর মনের কথা ধরবার অপুর্ব্ব শক্তি দেখে।

শেষে সরল ভাবেই বল্লে, সন্দেহ করাটা বোধ হয় কোন অসঙ্গত হয়নি। সত্যি তো আমরা আপনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই যে জানি না। মোটে তো মাস দু'তিন যাবৎ এখেনে আছেন এবং অল্প দিনের মধ্যে এ নোংড়া স্থানটাকে কেমন সুন্দর একটা studio করে গড়ে তুলেছেন! এ ছাড়া কত গরীব লোকদের যে আপনি সাহায্য করেন তাও যে আমরা জানি। তাই বলি কি—আপনার মত বড়লোক এমন পাড়াতে এসে থাকবে কেন?—

সে রকম ভাবে মুচ্‌কি হেসেই অসিত বাবু আবার বল্লে, আমি ধনী কি করে হবো?—আমি একজন সামান্য চিত্রকর। চিত্রকররা প্রায় সকলেই গরীব থাকে;—তা বুঝি তুমি জান না?

কিন্তু আপনি তো আর গরীব নন;—তা হলে সে দিন পাড়ার ঐ দুঃখী ছেলেটা যক্ষা রোগে মর মর হলো শুনে সমুদ্রের ধারে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠালেন কি করে? এ ছাড়া আরও কত জনকে যে কত ভাবে উপকার করেছেন তার খবর বুঝি আমরা জানি না?

অসিত বাবু যেন একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আর এক তুলি রং ভর্ত্তি করে নেয়, পরে একবার একটু ঢোক গিলে জবাব দেয়, দেখ, কথা যখন উঠিয়েছ তখন তোমার কাছে সরল ভাবেই সব খুলে বলচি। বাস্তবিক যদিও আমার অবস্থা তেমন অসচ্ছল না.....। আমি ফ্যাসানওয়ালা স্ত্রীলোকদের বিস্তর ছবি একেছি, রোজগার ও করেছি বেশ এ যাবৎ। কিন্তু হঠাৎ আমি বুঝতে পারলুম আমার ছবিতে এমন একটা কিছুর অভাব থাকে যা নাকি খুব মারাত্মক! ঈপ্সা, আমি একজন শিল্পীর মত শিল্পী হতে চাই। ফ্যাসান-ট্যাসান আর ভাল লাগে না। তাই ওসবের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এখানেই এলাম;—যাতে গরীব দুঃখী পরিবারের সাথে মিশতে পারি এবং খাঁটী জিনিষ গ্রহণ করতে পারি।

বলেই একটু থামে, কি যেন একটু ভাবেও, আবার বলে, আমার মনে হচ্ছে আমি পেয়েছি।

শুনে ঈপ্সারও স্বভাবগত সরল মুখ-খানি যেন সজীব, সতেজ হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বল্লে, মনে কিছু করবেন না—আমিও কিন্তু আপনাকে পুলিসের লোকই মনে করেছিলাম। কোন গোয়েন্দা টোয়েন্দা।

কেন আমাকে সে রকমটা দেখায় নাকি? একটু কৌতুকপূর্ণ সুরে জিগ্‌গেস করলে।

দুই হাত জোর করে, জীব্‌টা একটু কেটে বল্লে, মাপ করুণ। যাক্—আপনাকে বলচি কেন আমি উৎকণ্ঠা ছিলাম? খালি আমিই না—বাড়ী শুদ্ধ সব্বাই; কারণ আমাদের অমল আজ বাড়ী আসবে—দীর্ঘ দু' বছর হাজত খেটে।

—হাজত খেটে! অমল কে? ভাই?

—না।

—তবে—বন্ধু?

—আজ্ঞে হাঁ। আমি তাই মনে করি। আমি তাকে জানি তখন থেকে, যখন আমি নাকি একেবারে ছোট্টটি ছিলাম। ওঁর মত চালাক চতুর লোক হয়ত এখেনে নেই। সত্যি, আমরা তার আসার আশায় চেয়ে আছি।

নিঃশব্দে ভাবতে লেগেছে কত কি। ঈপ্সার বাবার কথা—একটা জুচ্চোর, লম্পট। তার কিনা এই মেয়ে;—কত কমনীয়তা—কত বন্ধুতা এই কচি মুখখানাতে। ওকে দেখলে যে কিছুতেই ভাবাও যায় না যে এমন অপদার্থ পিতার ঘরে এমন মেয়ে হয়।

বালিকার পবিত্রতা মাখা চেহারাখানা আরও একবার পষ্ট করে দেখবার জন্য নজর করে, অনুভব করে, হ্যাঁ—মেয়েটী নির্ম্মলতার আধারই বটে। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ওর জীবনটা হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। ও হয়ত ধারণাই করতে পারে না—তার বাবা কি রকম জঘন্য জীবন যাপন করছে।

হঠাৎ অসিত জিগ্‌গেস করে, আচ্ছা ঈপ্সা তুমি যে তখন বল্লে আমায় এমন স্থানে থাকতে দেখে তুমি নাকি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছ্‌লে; কিন্তু সে' রকম ডবল আশ্চর্য্য যে আমি হয়ে যাচ্ছি তোমায় এমন একটা পাড়াতে দেখে! এখানে থেকেও তুমি কেমন লেখা-পড়া শিখেছ—কেমন সুন্দর গাইতে জান, কি মিষ্টি গলার স্বর। তাই বলি—এ যায়গাটা যেন তোমাকে কিছুতেই মানায় না—যেমন নাকি মানায় না ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা।

শুনে ঈপ্সার প্রাণ বিপুল খুশীতে টল্‌মল্ করতে থাকে। হাসেও।

বাইরের সিড়ীতে জুতার শব্দ শুনা যায়। অসিত বাবু ও ঈপ্সা নির্ব্বাক অথচ উৎকর্ণ।—

সহসা গেটের দরজা খুলে যায় ঝানাৎ করে।...এক যুবক নিশ্চল ভাবে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে। সুন্দর বলিষ্ট চেহারা।

অসিতের ভারী ভাল লাগে ওর পেশল দেহ ও বুদ্ধিমন্ত চোখের দৃষ্টি দেখে। এমন লোক আবার কেন জেল খাটলো।

অমলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ঈপ্সার প্রতি। সামে যে অসিত রয়েছে সে দিকে যেন তার হুঁসই নেই।—

অমল ধীরে ধীরে ঈপ্সার অতি কাছে গিয়ে দাঁড়ায় বলে—ঈপ্সা না? তুমি কি সেই?

—হাঁ। কেন, খুব বদলে গেছি নাকি?

—যখন আমি যাই চলে তখন তো তুমি কত ছোট্টটী ছিলে! আর এখন যে ত্যাখ্-ত্যাখ্ করে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঈপ্সাই পূরণ করে—কত বড় হয়ে গেছি! না?

অসিত বাবু হয়ত তাদের দুজনের আলাপের মধ্যে থেকে নিজেকে খুবই ফাল্‌ত্ মনে করে। নির্জ্জন আলাপ নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে দেবার জন্যে একটা উছ্‌লৎ দেখিয়ে সরে পড়বার মৎলব আঁটে। অমলের নিকট গিয়ে নেহাৎ পরিচিতের মতই নিজের হাতখানা অমলের কাঁধের উপর স্থাপন করে বলে—আপনার সাথে আমার যদিও পরিচয় নেই তবু আপনার কথা আমি অনেকদিন শুনেছি ঈপ্সার কাছে। আপনার উপস্থিতির জন্য আমার খরচায় আজই একটা ছোট্ট-খাট আমোদ করা যাক্। আমি এক্ষুনিই বাজারে যাচ্ছি। আমি না আসা পর্য্যন্ত আপনারা এখেনে ততক্ষণ থাকবেন কিন্তু।

অসিত চলে যায়।

তারা দুজনেও পাশাপাশি হয়ে বসে থাকে।

—এ লোকটা আবার কে? হিংসুকে সুরে অমল জিজ্ঞেস করে।

ভাবটা বুঝতে পেরে ঈপ্সা খালি হেসে কুটপাট্ হয়; আস্তে আস্তে ওর অতি কাছে গিয়ে একদম ঘেঁসেই বসে। পরে বলে—ওঁকে ভয় কচ্ছো কেন? তিনি একজন মহৎ লোক—খুব নামজাদা চিত্রকরও আবার।

অমল আর কিছু বল্লে না। একবার খালি উদাসীন দৃষ্টিতে 'ষ্টুডিও'র দিকে তাকাল। অকস্মাৎ পুলকের তড়িৎ ওর সারা মনে খেলে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আরে, তোমারই যে চেহারা একেছেন! সত্যি লোকটী কিন্তু ভারী গুণী।

শুনে ঈপ্সাও অমলের দিকে গর্ব্বিত চাহনিতে তাকায়।

—তোমারও তো খাঁটী জিনিস চিন্‌বার বেশ শক্তি আছে দেখছি!

বলেই আনন্দের আতিশয্যে অমলের শরীরের উপর ঢলে পড়ে, নিজের কোমল পুষ্ট হাত জোড়া দিয়ে ওকে জড়িয়ে রাখে।

অমলও ঈপ্সার ঘন কুন্তলাবৃত মাথাখানি অতি সন্তর্পণে ধরে' ওর পুষ্প-পেলব ঠোঁটে একটী মধুর চুমা খেলো।—

আবেশ ও ব্রীড়া হেতু দুজনেরই চোখ বুজে আসে।

পুরাণ অথচ নেহাৎ-ই অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনা অমলকে জানাবার জন্যে ঈপ্সার প্রাণ চায়, বল্লে—দেখ, দিন পোনার আগে মস্ত বড় একটা দা' ফস্‌কে গেছে। সে'দিন রাস্তা দিয়ে একটি লোক হীরার আংটী আর মূল্যবান চেন পরে যাচ্ছিল। দেখে আমরা ক'জন মিলে কত কারসাজী করলুম ওটা মারতে। তুমি তো ছিলে-ই না—বাবাও অন্য কাজে আরেক যায়গায় গেছ্‌লো। মেঘনাথ কিন্তু লোকটার পেছনে ভারী লেগেছিল,—খুব খেটেও ছিল, কিন্তু কোন সুরাহা আর করা গেল না।

ঈপ্সার যতখানি উৎসাহ লাগছিল অমলকে শুনাতে—অমলের কিন্তু ততখানি বিস্বাদ লাগছিল সে-সব শুনতে। তাই কি ঈপ্সা কিছুক্ষণ অমলের প্রত্যেক হাব-ভাবের দিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে?—কেন যেন অমলের চোক মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে, কি একটা কইবে কইবে করে-ও যেন কইতে পারে না, সরবতের গেলাশটা ধুপ্ করে থুয়ে দিল অল্প একটুখানি খেয়েই ইত্যাদি।

কৌতুহলী ঈপ্সা অমলকে জিগেগস করে তোমাকে আজ এমনতর লাগ্‌চে কেন? কোথায় এদ্দিন পরে এলে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে—তা না তুমি যেন একেবারে চুপ্ মেরে গেলে......বল না কেন?—

অমল খালি ঔদাসীন্যভাবে মাথাটা নাড়ে, তারপর উত্তর করে—আমি আর এসব কাজ কক্ষনও করবো না,—বল, তুমিও করবে না। তোমার বাবা একজন কেমন লোক···; তুমি তার মেয়ে,—কিন্তু তোমার প্রকৃতি তো সে' রকম মোটেই না,—ঠিক শিশুর মতন নরম ও পবিত্র।

হেসে হেসে ঈপ্সা বলে—আচ্ছা গো রাখ, সাম্নে প্রশংসাটা আর না-ই বা করলে!

—আচ্ছা বেশ! আমি কক্ষনও এসব জঘন্য কাজ কর্ব্বো না। বুঝলে?

—ওমা! কি যে বল! আমরা তো আরও কত কিছু জল্পনা-কল্পনা করে রেখেছি, তুমি ফিরে এলে আমরা দু'জনাতে মিলে কত রোজগার করবো!

—ঈপ্সা, ভগবানের আমার উপর বড়ই অনুগ্রহ—ঠিক সময়েই এই জঘন্য জীবন যাপন থেকে তোমাকে রক্ষা কর্ব্বার সুযোগ আমায় দিয়েছেন। ওঃ এসব দুষ্কর্ম্মের দরুণ কি সব ভয়ানক ভয়ানক শাস্তি যে চোকের সাম্নে দেখেছি! আমার ইচ্ছা—এস আমরা দুজনে একত্র থেকে সৎকর্ম্মে জীবন কাটিয়ে দি।'

বলেই ঈপ্সার খুব কাছে গিয়ে ওর ফুরফুরে চুলগুলোর উপর হাত বুলাতে বুলাতে আবার বলে—লক্ষ্মীটী! আমার কথা রাখবে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি—

ক্রুদ্ধ অন্তরে নিশ্চুপে অমলের কথা শোনে, সহসা হেচ্‌কা টান মেরে অমলের হাতখানা সরিয়ে দেয়, তারপর তার স্বরে বলে' উঠে—ঈশ্! তারকথা আবার রাখবে! বোকা ভিক্ষু কোথাকার—যাও! খালের আবার বান ডাকতে

ইচ্ছা করে! মেঘনাথ ঢের ভাল! বলেই ঝাঁ করে বের হয়ে পড়ে ঘুর্ণী বায়ুর মত।

অমল হতবাক্ ও হতভম্ব।—

অবস-তবস ব্যক্তির মতন হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে থাকে চেয়ারের উপর।

কি একটা ব্যাপারে আটুকে গিয়ে অসিত বাবুর ফিরতে দেরী হয়। এসেই অমলকে ঐ রকম অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বড়ই অবাক্ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার কি হয়েছে? এম্নি ভাবে বসে যে? ঈপ্সাই বা কোথায়?

অসিত বাবুর সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনে অমল চোক তুলে তার দিকে তাকায়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সে জবাব দিলে—দেখুন, জেল হ'তে মুক্ত হয়ে এসেই জানলাম যে অসভ্যের দল আমার জন্য একেবারে খাঁপ্ পেতে বসে আছে। আমি ঈপ্সাকে যখন বল্লাম যে এসব খারাপ সঙ্গে আর আমি থাক্‌বো না—সদুপায় দ্বারাই জীবন কাটাব, তখন ও আরও আমাকে বাঁধা দিতে চাইলে। কিন্তু টল্‌লুম না দেখে আমার সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গাল দিলে—আমি নাকি ভীতু, বোকা! বলেই দু' হাত দিয়ে মুখ চোক ঢেকে ফেল্লে। পরে ফের কান্না ভাঙ্গা সুরে বলে, আমি যে ওকে ভালবাসি। ওর বিচ্ছেদ যে আমায় একেবারে পাগল করবে! ওদের দলে থাকলেই হয়ত ভাল হতো—অন্ততঃ ঈপ্সাকে তো হারাতাম না।

অসিত তাকে বুঝ দিয়ে বল্লে—বুকে বল্ নিন্। যা ভাল বলে জানবেন তা-ই গ্রহণ করবেন।

অসিতের উপদেশপূর্ণ কথা শুনে সে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তার দিকে নোয়া মাথা তুলে চাইলে, ওর কথা শুনতে মন দিলে।

—জুচ্চোর জীবনরাম ওর বাবা—তাই ও হঠাৎ তার বাবাকে ছেড়ে আসতে পারে না। ঈপ্সা এত সরল যে শঠতা কাকে বলে সে অভিজ্ঞতাই ওর একদম নেই। ব্যাপারটা যখন ও বেশ বুঝতে পারবে তখন নিশ্চয়ই ও ফিরে আসবে।

—হ'তে পারে;—কিন্তু আমি যে চাইনে ওর সেই অভিজ্ঞতা হউক্। জেলটাকে আমি বড্ডই ভয় করি। দেখুন জেলে একজন খুব ভাল লোকের সাথে আলাপ হয়েছে। লোকটী একটু প্রবীন কিন্তু তবু আমি তার সাথে খুব ঠাট্টা তামাসা, গল্পগুজব করতাম। তার নাম গজেন্দ্র। তিনি একজন নামজাদা ব্যাঙ্কার ছিলেন। প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ জেলেই আছেন। ওর অংশীদারই তাঁকে বিপদে ফেলেছে। খাম্‌খা ওর বিরুদ্ধে তবিল তছরূপের চার্জ্জ আনে। রক্ষা পাবার জন্যে তিনি ওর অনেক ব্যবস্থা করেন। কোন লাভ হলো না। পরে একদিন আফিসে গিয়ে অংশীদারের সাথে সাক্ষাৎ করে এককথা দু' কথার পর বেশ হাতাহাতির পালা গড়ে উঠলো। রেগে গিয়ে তাকে তিনি গুলী করলেন; সৌভাগ্য বশতঃ মারা পড়েনি—কিন্তু সাঙ্ঘাতিক জখম হয়। তাই পোনার বচ্ছর কারাদণ্ড। ওদের দলে থাকলে তো আমাকেও আবার কত লোকের প্রাণ নষ্ট কর্ত্তে হবে! উঃ এসব কথা মনে কর্‌লেই আমার চোকের উপর ভাসতে থাকে ফাঁসি কাঠ, জেলের পৈশাচিক অত্যাচার। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কক্ষনও ওদের সঙ্গ নোব না।

—তা বেশ! আর কক্ষনও ঐ পথে যাবার নামও কর্ব্বেন না। যাক্, আপনি যদি কোন সাহায্য চান তা আমি আপনাকে খুশীতেই কর্ব্বো।

শুনে কৃতজ্ঞতায় অমলের মাথাটা নুয়ে গেল। রা করতে পারে না তাই।

—আচ্ছা আপনার বন্ধু কবে জেল হ'তে বের হয়ে আসবেন? তাঁরও যদি কোন সাহায্য দরকার মনে করেন আমি তাও কর্ত্তে রাজী আছি।

—খুব শীগ্‌গীরই মুক্তি পাবেন। আমি তাকে কথা দিয়েছি—ওর খালাস হবার দিন আমি তার সঙ্গে দেখা করবো। ওরে বাবাঃ! মনে করতে ডর এখনও লাগে কি সব ভীষণ ভীষণ কথা আমাদের কাছে তিনি বলতেন! একটা কিন্তু সৌভাগ্যই বলতে হবে—ওর এই অপমানের কিছুদিন আগেই স্ত্রী মারা যায়—একটী কন্যা প্রসব করেই। জেলে যাবার আগে তিনি তার মেয়েকে পালন করবার ও

সুশিক্ষার জন্ত তার একজন বন্ধুর হাতে এই প্রতিজ্ঞা করে সঁপে দেন—মেয়েটীকে যেন কক্ষনও তার বাবার পোড়া অদৃষ্টের কথা জানতে না দেওয়া হয়। কি আশ্চর্য্য! নিজের মেয়ের কাছেও আত্মগোপন করলে!

তার কথা শুনে কি চিন্তা করতে করতে যেন অসিত বল্লে—এ সংসারে কত রকম কাণ্ড ঘটচে যে!—একটু থামে, আবার বল্লে—দেখুন, কাল আপনাকে আমি এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব। আপনি যদ্দিন কোন ভাল কিকির করতে না পারেন তদ্দিন ওখানেই লেগে থাকবেন—কেমন?

অসিত ফ্রেম হ'তে ঈপ্সার অসমাপ্ত আঁকা ছবিটীতে দু'চারবার তুলীর পোঁচ দিলে, এগিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ ছবিটা ভাল করে নজর করে দেখলে, পরে আস্তে আস্তে ওটী ঢেকে রাখলে।

বড় রাস্তায় গিয়েই একটা টেক্সী ডেকে উঠে পড়ল।—

টেক্সী চলতে থাকলো বেদম, বেহুস চলতি। নিমিষের মধ্যে ঐ স্থানটী পেছনে পড়ে গেল।—

মটর একটা স্কোয়ারের ধারে মস্ত একটা বাড়ীর দ্বারে এসে জিরুতে লাগলো। বাড়ীটা দেখে অমল আশ্চর্য্যে অভিভূত হয়ে গেল, ভাবলে—অসিতবাবুও নিশ্চয় খুব ধনী; কারণ তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও যখন এত বড়লোক।

অসিত দরজার সামে এসে নিজের আগমনবার্ত্তা জানায় আস্তে অস্তে কড়া নেড়ে।

দরজা খুলে গেল। একজন চাকর বেরিয়ে এল, অসিত বাবুকে দেখেই বিনীত নমস্কার জানিয়ে সসম্ভ্রমে কোঠায় নিয়ে গেল।

—বিচিত্রাদি বাড়ী আছেন তো? চাকরটীকে জিজ্ঞেস করলে,—নিজের গায়ের চাদর ও ছড়ি তার হাতে রাখতে দিয়ে। ভাবটা এমন—এ বাড়ীও যেন অসিতবাবুর নিজেরই।

একটু পরেই একজন যুবতী দোতালা থেকে নেমে নীচের কোঠায় ঢুকেই অসিতের দিকে চেয়ে এক নিশ্বাসে বল্লে—অসিতদা, তোমার জন্ত ভেবে ভেবে হয়রাণ। আচ্ছা, বল দেখি ঐ নোংড়া স্থানটা কবে ছাড়বে? কি করে যে রয়েছ এমন একটা বিচ্ছিরী যায়গায়! ঘেন্নাও করে না?

প্রায় একমাস বাদে অসিতকে কাছে পেয়ে বিচিত্রার মন খুশীতে টুপ্-টুপ্। আদরহেতু অসিত নিজের হাতখানা বিচিত্রার হাতের উপর সংস্থাপন করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না।

অসিত আরেকটু বিচিত্রার কাছে সরে গিয়ে বল্লে-যাক, কাজের কথা বলি। একটী বন্ধু বড়ই বিপদে পড়েছে। তাকে তোমার একটা হীল্লা করে দিতে হবে।

তক্ষুনিই বিচিত্রার স্নিগ্ধ-কালো-চোক জোড়া দিয়ে অমলকে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে দেখে নেয়।

একটী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে দৌড়ে এসে অসিতের হাত খানা ঝাকুনী দিয়ে বলে—কখন এলেন দাদাবাবু?

—এই ত কতক্ষন যাবৎ। কোথায় ছিলিরে? দেখ তো কানু, একে তোর মাষ্টার রাখতে পছন্দ হয় কিনা?

বালকটী অমলকে সামে দেখেই তার অভিমত জানাবার জন্যে অসিতের অতি কাছে যায়, খুব অস্ফুট স্বরে বলে—আচ্ছা।

অমলের প্রতি চেয়ে অসিত বল্লে—আপনি তবে এখানেই থাকুন। আপনার সেই বন্ধুর জন্তও একটা কাজ ঠিক করে রেখেছি। উনি খালাস পেলেই আমায় জানাবেন।

অসিতের কথা শুনে অমলের দু'চোক দিয়ে যেন কৃতজ্ঞতার একটা সুস্পষ্ট ছোপ ভেসে ওঠে। হয়ত ভাবে—দু'দণ্ডের আলাপে পরিচিত আমি—আমার জন্ত তিনি কতটা কষ্ট স্বীকার কচ্ছেন। এই পাপী সংসারে এমন মহান উদারচেতা ব্যক্তিও আবার থাকেন।

গজেন্দ্রর খালাস পাবার দিন এসেছে।—

অমল সকাল বেলা জেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় ওর সাথে দেখা করবার জন্যে। দেখা হয়। নিয়ে আসে সাথে করে ওর ওখানেই।

বিচিত্রাও তাকে বিশেষ আদর আপ্যায়নদ্বারা গ্রহণ করেন। গজেন্দ্রকে দেখে ওর বড়ই দুঃখ লাগে। ভাবে—গজেন্দ্র-ই যেন মানব জীবনের দারুণ করুণতার জাজ্বল্যমান আদর্শ। পোনারটী বচ্ছর হাজত খেটেছে।……কত রকম জ্বালা-যন্ত্রনা, আত্মক্ষোভ এবং মৃত স্ত্রীরও বিষাক্ত অতীত স্মৃতির দংশন করে করে এমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহটাকে কেমন কাঠখোঁট্টা,—কড়াতি করে দিয়েছে!

একটা দুঃখ-ভরাট দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বিচিত্রাকে বল্লে—মা, দেখচো কি? আমি একটা মানব জীবনের পচা কীট। দুঃখের সাথে মিতালী পাতিয়েছি—তাই ও আমাকে ছাড়তে চায় না। মা, এত দুঃখেও আমার এক শান্তি যে আমার একটী মেয়ে কোন একখানে আছে হয়ত। ও যদি এখনও বাঁচা থাকে তবে হয়ত তোমার মতই এতখানি হবে।

বলতে বলতে গজেন্দ্রর চোক দু'টো সজল হয়।

বিচিত্রা তার কথা শুনে যেন গলে গেল। ভেবে চিন্তে গজেন্দ্রর জন্য একটা কাজ নির্দ্ধারণ করলে। ওর মস্ত বড় বাগানের ও বাগানবাড়ীর ম্যানেজার করে দিলে।

চাকরীটা ও স্থানটা ওর বাসনা-খিন্ন মনের সাথে খাঁপ খায়;—নিস্তব্ধতাপূর্ণ বলেই। সে নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভাঙ্গে কৃত্রিম ঝর্ণার কল্-কল্ তানে, বৌকথা-কও পাখীর 'কথা কও কথা কও' বলে একটানা আকুল কাকুতি মিনতিতেই।

ব্যর্থ জীবনে আনন্দের ক্ষীণ আস্বাদ পায়। এক রকম আশাতীতই বটে!

এতে অমলের একটু আধটু অসহ্য লাগে; এ রকম লাগাটা খুবই—স্বাভাবিক—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।—যে হেতু অমলের মনে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সোয়াস্তি নেই। ঈপ্সার অহরহ চিন্তাই যেন ওকে ভয়ানক জ্বালা দিচ্ছে—যেন শত সহস্র দাবানল জ্বলচে।

এদিকে আবার তুমুল-ব্যস্ততার ব্যাপার অমলের উপর। অসিতের আঁকা চিত্রগুলির এক প্রদর্শনী হবে তার প্রায় সমস্ত ভারই ওর 'পরে ন্যস্ত। সে জন্য খুব খাটুনি খাটতে হচ্ছে;—নেমন্তন্ন চিঠি ছাপতে হবে, ওসব আবার নামে নামে পাঠাতে হবে, ছবিগুলোতে পছন্দ-সই ফ্রেম লাগাতে হবে। এত কাজ—তার মধ্যেও ঈপ্সার কথা তুষের আগুনের মত গুম্-গুম্ করে সর্ব্বক্ষণ জ্বলচেই! —বাদ নেই!

প্রদর্শনী আরম্ভ হবার আর মোটে দু'দিন বাকী। কাজ কর্ম্ম সব প্রায় একরকম শেষ।

মলয়ের কোঠায় বসে অসিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের জন্য একটা লিষ্ট কচ্ছে। মলয় কোঠায় ঢুকে বলে, মাষ্টার বাবু, একটা নেমন্তন্নের চিঠি এই ঠিকানায় দয়া করে পাঠাবেন, বলেই পকেট হ'তে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ ওকে দেয়।

অমল খানিক্ষণ ঐ ঠিকানার দিকে স্থির চোকে চায়। ওর মন যেন বারবারই বলে—এই অশ্রু দেবীই আমার অন্তরের ধন ঈপ্সা। পরক্ষণেই আবার ভাবে, দূর ছাই, দুনিয়ায় কত শত অশ্রু নামে যে মেয়ে আছে! হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বিচিত্রা দেবী কি এ'কে জানেন?

—না। আমার সাথেই যে মোটে এক হপ্তা যাবৎ খাতির হয়েছে। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই ও যেন আমাকে ভারী মুগ্ধ করেছে। বলেই অতি গর্ব্বভরে নিজের বুকের উপর আস্তে আস্তে দু'তিনটা থাবড়া মারলে।

একটু টিপ্পনী কেটে অমল বলে, মেয়েটী নিশ্চয় খুব সুন্দরী। এক কাজ করুন না—তাকে বিয়ে করে ফেলুন না?—

—হাঁ, মাষ্টার বাবু, খুবই সুন্দরী! অতিশয় গর্ব্বভরে মলয় তার পকেট থেকে একটা ফটো বের করে অমলকে দেখ্‌তে দেয়।

অমলের মাথার উপর যেন সারা আকাশটা ভেঙ্গে পড়ে আর কি। সত্যিই তো, তার অনুমান যে ঠিকই! ঈপ্সার অন্য একটা নাম যে অশ্রু! আগে যদি এসব সে জানতো তা হলে অসিতবাবুর আঁকা তৈল চিত্রটা তো প্রদর্শনীতে জুড়ে দিত না!

মলয় ফটোটা নেবার জন্য হাত বাড়ায়, বলে, দিন তো। ওঃ বড্ড ঘুম পাচ্ছে—শুতে যাই। একটা কার্ড ওকে পাঠাতে ভুলবেন্ না কিন্তু!

অমল ভাবে কত সব আশঙ্কার কথা। খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। অপলক, উদাস, অর্থহীন দৃষ্টি বাইরের দিকে পড়ে। তারাগুলি রয়েছে নিকষ কালো আকাশটার বুকের উপর ঝুলে ঝুলে। কৃষ্ণা রাতের বুক-কাটা চাঁদ আস্তে ধীরে উঠতে লেগেছে—বড্ড মন্থর গতি ওর। ছিন্ন মেঘের বহর সাগরের ঢেউএর মতনই চলে' যায় এক মনে ;—কোথায়—কে জানে !

কোন রকমে ওর চঞ্চল মনকে সুস্থির করে, ভাবে অসিত বাবু তো আমার কথা সব জানেন। তিনি তো আর আমার সাথে প্রবঞ্চনা করবেন না !

প্রদর্শনী আরম্ভ হচ্ছে।—

বাছা-বাছা কায়দাদুরস্ত দর্শকের ভির। বাজে খেলো লোকের ভির না কিন্তু।

অমল গেটের সাম্নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট নিচ্ছে, আর দেখচে বাজে বেনিমন্ত্রিত লোক যেন না ঢুকতে পারে।

খানিকক্ষণ বাদে ঈপ্সা আস্‌চে দেখতে পায়, ওর প্রাণের মধ্যে আনন্দের প্রচুর শিহরণ দিতে থাকে।

আজ তো ঈপ্সাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। যেন সৌন্দর্য্যের কিরীট। আজ যদি সৌন্দর্য্যের প্রদর্শনী হতো তা'হলে ও-ই হয়ত এখানে প্রথম স্থান পেতো।

ঝাঁ করে মলয় এসে জিগ্‌গেস করে—মাষ্টার বাবু, দিদি কোথায়? সেই অশ্রু দেবী এসেছেন, তাকে সাথে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

অমল উত্তর করে, কতক্ষণ আগে ঐ কোনার ঘরে অসিত বাবুর সাথে কথা বল্‌তে শুনেছি। আপনি ওকে খুঁজে আমুন ততক্ষণ আমিই ওর সাথে আলাপ করছি।

দূর থেকে পরিচিত স্বর শুনে ঈপ্সা চমকে যায়, সাম্নে এগিয়ে গিয়ে অমলকে দেখেই ওর মুখখানা ফ্যাকাসে হলো। কাঁপা সুরে জিগ্‌গেস করে, অমল! তুমি যে এখানে

—হ্যাঁ। বিচিত্রা দেবীর অধীনে চাকরী করি যে। থেমে একটু চোট্‌কা সুরে খোঁচা মেরে বলে, আচ্ছা ভালই আছ। তোমার সাথে কার কথা ;—না ঈপ্সা?

আহত হয়ে কুপিত স্বরে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি মনে কচ্ছো?

কই—না, কিছু না। এই ধর না এক হপ্তা বাদে অসিত বাবু হবেন মলয়ের ভাবী ভগ্নীপতি ; আর তুমিও তখনই হবে কিনা—এই যে গিয়ে—মলয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী। মনে হয় এতে তোমার যেন একটুও মত নেই। কেমন ঈপ্সা?—

অমলের চোট্‌কা চোট্‌কা কথাগুলো যেন ওকে সপাং সপাং করে চাবুক মারলো।—এমনতর কড়া ব্যঙ্গ সে জীবনে কক্ষনও শোনে নি। দুঃখে, ক্ষোভে ওর সুন্দর গোলাপী মুখ কাল্‌চে মেরে গেল।......

এক এক করে লোকজনের ভির বাড়ে। ছবির কাছে জড় হয়। মহা ব্যস্ততার সাড়া পড়ে।—ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি।

মলয় আর বিচিত্রার সাথে অসিতকেও আসতে দেখে ঈপ্সা যেন ভ্যাবাচাগা লেগে যায়। একটা ভীতিকর চিন্তা এসে ওর মনকে আচ্ছন্ন করে। অসিতের সাথে চোখাচোখি যখন হবে তখন? সে কি তাড়াতাড়ি কোথায়ও পালাবে?......

মলয় কাছে এসেই সুরাজড়িত স্বরে বল্লে—মিস্ ডট্, এই আমার দিদি। এ দুনিয়ায় তুমি আর দিদি ছাড়া আর কেউ আমার আপনজন নেই।

বিচিত্রা মলয়ের ভাব দেখে ঈপ্সার অলক্ষিতে একটু চোক পাকিয়ে শাসায়। পরে ঈপ্সার হাতখানা সাদরে চেপে ধ'রে মৃদু সুরে বল্লে—ভাই, তোমার মত সুন্দরীর জন্য আকুল হওয়া মলয়ের পক্ষে আশ্চর্য্যের ব্যাপার কিছুই না।

একবার একটু মুচকি হেসেই ঈপ্সার প্রতি অনুসন্ধিৎসু ত তাকায়।

ঈপ্সা কিন্তু কোন কথা কয় না। ফিক্ করে একটু হাসলে—বার দেখান হাসিই যেন। বিচিত্রার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ওর মগজ বন্ বন্ করে ঘোরে। এমন একটা কাণ্ড দাঁড়াবে তা যে সে কক্ষনও ভাবেও নি।

মুখে যদিও প্রকাশ করে না—কিন্তু ওর মনপ্রাণ যে সতত ছট্‌ফট্ করে অমলের জন্য।—শেষে না কেন আবার

কোন রকম ঘোর-প্যাঁচে পড়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালের সাথেই একটা রাহাজানি কাণ্ড ঘটে' বসে! এ সব কথা ভেবে ভেবে ওর মন বড়ই ব্যাকুলিত। এখন ওদের কাছ থেকে ফাড়াক্ থাকতে পারলেই ও যেন পরিত্রাণ পায়।

মতলব আঁটে। লুকিয়ে লুকিয়ে খোঁজাখুঁজির পর দেখে বাগানের একটা দরজা খোলা।

ওদিকে যায়।

এখানেও যে সে একা না। দেখে একজন লোক,—একটা চারা গাছের ডাল নুয়িয়ে যেন কি কচ্ছে।

পায়ের শব্দ শুনে সে পেছনদিকে ফিরে দেখে ঈপ্সাকে।

লোকটা তার কাছে আসে। সন্ত্রস্তভাবে ঈপ্সা বল্লে—আমার শরীরটা খুব বমি বমি কচ্ছে, তাই এখানে এসেছি। এক গ্লাস জল দিন না, খাব।

—স্থানটা খুব নির্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ। লোকটী বল্লে। পরে এক গ্লাস জল এনে ওকে দিলে।

ঈপ্সা একটু সুস্থ হলে লোকটাকে ভাল করে দেখে নেয়। কি একটা বৈশিষ্ট্য যেন লোকটার মধ্যে আছে। .. তার সাদা চুল, পাংশু বিবর্ণ মুখ, কোটরগত চোকের দুঃখিত দৃষ্টি। ও ভাবলে, কোথায়,—কখন যে তাকে ও দেখেছে,—হয়ত বা সপ্নেই।

সরল হাসি হেসে বৃদ্ধ বল্লে—তুমি কিন্তু খুব সুন্দর। আমার ভয়ানক ভাল লাগে তোমাকে দেখতে। একটু থেমেই একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছেড়ে আবার বল্লে—মা, তোমার চেহারাটা দেখে আমার মৃত পত্নীর কথা মনে করে দেয়।

লোকটীর ভদ্রোচিত অথচ মায়াময় কথা শুনে ঈপ্সা অতি সহজেই তার 'পরে যেন বিশ্বাস স্থাপন করে। পরে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বল্লে—খুব দুঃখ লাগলো যে আপনি বিপত্নীক। কোন ছেলেপিলে আছে না?

একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি যেন ভেসে ওঠে বৃদ্ধের চোকে, মুখে।—

—হাঁ, একটী মেয়ে আছে মাত্র।

—খুশী হলেম।

আঙুল দিয়ে চোক দু'টো ডলে, মৃদু কণ্ঠে বলে,—কিন্তু সে যে আমাকে চেনে না।

—সে কি! চেনে না!

ঈপ্সা হঠাৎ আৎকে ওঠে।—ভাবে, এ কি রকম ব্যাপার! কেমনতর লোক! কিন্তু তবু—সে যেন ধীরে ধীরে মায়ার বাঁধনে আকর্ষণ করে!

—একজন লোক যদি পোনারটী বৎসর কারাবাসে থাকে তা' হলে সে কি আর ফিরে মুখ দেখাতে পারে?—যদিও সময় সময় দেখবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা জাগে তবুও—

—পোনার বচ্ছর!......আর বলতে পারে না। ধীরে ধীরে নিশ্বাস আটকে আসে যেন।........তার জীবনের আখ্যাণগুলিও যেন আংশিক ভাবে এই বৃদ্ধের করুণতার সাথে মিলে যায়। পাড়ার এক বুড়ো পিসির কাছে সে একদিন শুনেছিল তার জীবণের একটুখানি কাহিনী।

—বলবেন কি আপনার মেয়েটী কোথায়? একটু ব্যস্ত কণ্ঠে জিগ্গেস করে।

আবার সেই পুরাণ স্মৃতির ক্ষীণ আলোটুক তেল পেয়ে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

কান্না-ভাঙ্গা সুরে বল্লে—বেশ নিরাপদেই আছে হয়ত। আমার যাবার আগে ওর সুবন্দোবস্ত করেছি। বিষয়-আশয় যা ছিল তা সমস্ত ওর নামে লিখে দিয়েছি। এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে রেখেছি।

শুনতে শুনতে ঈপ্সার শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে বইতে লেগেছে—, মাঝে মাঝে যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে চায়। চিন্তা, স্মৃতি, কোন্-একদিনের-দেখা একটা আশ্চর্য্য সপ্ন, বুড়ো পিসির কথাগুলি সব একত্রিত হয়ে মগজের মধ্যে যেন হিজিবিজি করতে থাকে।

খুব অসহিষ্ণুভাবে ঈপ্সা শুধোয়—দয়া করে আপনার বন্ধুর নামটা বলুন না? আমি বোধ হয় আপনার মেয়েকে চিনি। তার সম্বন্ধে আমি হয়ত অনেক কিছু সংবাদ দিতে পারি

গজেন্দ্র ব্যথিত।—

সে তো অনেক কথাই বলে ফেলেছে। আর না।

...কিন্তু প্রলোভনের তেজ যে কত তীব্র!...

—প্রতিজ্ঞা কর তুমি কক্ষনও তাকে আমার কথা জানাবে না।

ঈপ্সা খালি মাথাই নাড়ে।

—তার নাম জীবণরাম দত্ত· তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছ খুব গোপনে রাখবে।

—জীবণরাম! আমি ছাড়া আর কোন মেয়েই যে নেই ওখানে। তবে কি আমার ধারণাই সত্য, সেই পিসির কথা, সেই সপ্ন? কাঁপা কণ্ঠে বল্লে।

—হাঁরে, সবই সত্য—সবই সত্য! তুই-ই আমার মমতার ফুল—তুই-ই! পুলক-গদগদ সুরে বলেই ঈপ্সার অতি কাছে যায়; দু'হাত বাড়িয়ে ওকে চেপে ধ'রে রাখে।—আর বারে বারে ওর মুখের দিকে স্থির চোকে তাকিয়ে তাকিয়ে খালি দেখে...

অমল ঈপ্সাকে কোথাও না দেখতে পেয়ে বড়ই চিন্তিত হয়।

খুঁজতে খুঁজতে বাগানের দরজা খোলা দেখেই ঢোকে।

অবাক্ হয়ে যায় ঈপ্সাকে এরকম অবস্থায় বাগানের মধ্যে দেখে। কৌতূহলের আতিশয্যে গজেন্দ্রকেই জিজ্ঞেস করে—আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে—কি ব্যাপার! বলুন না। তারপরে গজেন্দ্রর উত্তরের জন্য সবুর না করেই ঈপ্সাকেই বল্লে—ঈপ্সা! তুমিই বল না কি হয়েছে? এমন—দেখাচ্ছে যে?

তন্বু গ্রীবা তুলে অশ্রু-ভেজা চোকে স্থির ভাবে বিষাদ চাহনি চায়, একটু পরে মৃদু সুরে উত্তর করে—এসো না লক্ষ্মীটী! এই আমার বাবা। আলাপ কর না বাবার সাথে?

—এস অমল। কাছে। আমার হারাণ-ধনই যে তোমার ঈপ্সা। দেখ বন্ধু, আজ আমার কত সুখের দিন। গম্ভীর অথচ মমতা-মাখা-সুরে গজেন্দ্র বল্লে।

তারপরে বুড়ো মনে মনে হয়ত এক বোঝা কথা ভেবে ফেল্লে,—অমলের ঈপ্সাই যে শেষে আমারই অশ্রু হয়ে গেল।

—ওর কথা তো অমল আমাকে জেলে থাকতে কত বলেছে। কথাচ্ছলে আমরাও কত যে ঠাট্টা করেছি। তারপর উপর দিকে চেয়ে দু'হাত তুলে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রর্থনা করে—ঠাকুর! বুড়োকে শেষ সময় একটু শান্তি দাও—ওদের মধু-মিলন দেখতে দাও, ওদের সৎপথে থাকবার সুমতি যেন চিরকাল থাকে।

... ঈপ্সা অবাক, কৌতূলী, জিজ্ঞাসু।

অমল ঈপ্সার ভাব বুঝতে পারে, জিজ্ঞেস করবার আগেই বলে,—তোমার বাবার সাথে আমার আলাপ তোমারও আগে। ওনিই আমায় সৎপথে থাকবার কত উপদেশ দিতেন।

বুড়ো কি একটা ছুঁতো ক'রে ওখান থেকে সরে যায়।—

—লক্ষ্মীটী, তোমার সাথে যে কত দুর্ব্ব্যবহার করেছি! ওসব ভেবে কত দুঃখ পাই! ভুলে যেয়ো সব।—কেমন? অনুসোচনার সুরে ঈপ্সা বল্লে।

—কেন অনর্থক দুঃখ পাচ্ছ আগের কথা ভেবে?...

আস্তে আস্তে ওর এলান দেহখানার 'পরে নিজেকেও সচ্ছন্দে ডুবিয়ে দেয়, দু'হাত দিয়ে ওকে শক্ত করে জড়ায় যেন মিশে যাবে। পরে ঈপ্সার অশ্রু-ভেজা চোকে চুমা দেয়, পেলব ঠোঁটে, তুল্‌তুলে গোলাপী গালেও।...

ভালবাসার মতন কোমল, সুচারু বুকে অমল নিজের মুখ গোঁজে শেষে ওখানেও চুমা......।*

* ইংরাজীর অনুবাদ।

বিক্রমপুরের পুরাণ কথা

শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

চৈত্র সংখ্যার "বীণা"—"বিক্রমপুরের পুরাণ কথা" আদিশূরের ইতিহাস সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে কতিপয় ঐতিহাসিক কয়েকটী প্রশ্নের উল্লেখ করায় আমি বাধ্য হইয়া—আদিশূরের সময়ের সেরূপ কোন ইতিহাস অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে না পারায় বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারি নাই।

Mr. Vincent Smith, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 'ফুট্ নোট' দেখিয়া যত দূর খুঁজিয়া পাইয়াছি তাহাই লেখা গেল। পরে আরও অনেক বিষয় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব প্রবল ছিল। এমন কি এই দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ইত্যাদি এক প্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মহারাজ আদিশূর প্রথমতঃ কনোজপতি হিন্দুরাজ বীরসিংহের নিকট পাঁচজন সুব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান।

কান্যকুব্জ হইতে সুব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা ব্যতীত বাঙ্গলা দেশে আসিতে চাহিলেন না। কারণ অন্য কোন কারণে বাঙ্গলাদেশে আসিলে সে সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

এই সম্বন্ধে মনু বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥"

ঢাকার ইতিহাসপ্রণেতা লিখিয়াছেন—

"সমুদয় কুলজ্ঞগণের মতেই আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্যু, হোম এবং উদ্গান এই তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু-সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ দ্বারা, হোম-ক্রিয়া ঋক্ দ্বারা, উদ্গান সাম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইলে, শুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

৺লালমোহন মুখোপাধ্যায় বন্দ্যবংশে লিখিয়া গিয়াছেন, "কনোজ জাত মহর্ষি দক্ষের কাশ্যপ গোত্রের বংশধরগণ যখন যজুর্ব্বেদীরূপে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিয়াছেন, তখন তিনিও প্রধানতঃ যজুর্ব্বেদী ছিলেন এবং আদিশূরের যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরো বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "দক্ষঋষি যজুর্ব্বেদী ছিলেন।"

আদিশূরের রাজধানী যে রামপাল নগরের অনতিদূরে পঞ্চ গ্রাম—এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আদিশূরের ইতিহাস সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—যাঁহারা বলেন, আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। আদিশূর নিশ্চিতই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আদিশূরের কথায় পূর্ণ থাকিবার বিষয় আছে। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ত ছিলেন না। অথচ এই রাঢ় ও গৌড় বিজয়ী আদিশূরের সত্তা কেন যে ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না তাহা বুঝা যায় না।

আদিশূর এই বাঙ্গলা দেশের একজন মহাপরাক্রমশালী স্বাধীন হিন্দু নরপতি ছিলেন। সে সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে সমগ্র ভারতেই ভাসিয়া চলিয়াছিল, এই বঙ্গেশ্বর আদিশূর সে সময়কার সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে ভাসমান বাঙ্গলাকে ফিরাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কূলে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রদীপ্ত আলোক শিখা তাঁহারই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় আবার নবভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গলার সে সময়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি দেখিয়া তিনি যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত সকলেই জানেন। আজ এই সকল কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা চলবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। বাঙ্গলার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ সকলেই সেই আদিশূরের আনীত সেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশসম্ভূত।

তাহা ছাড়া সেই—পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান উচ্চ বংশীয় কায়স্থগণও সকলেই, আজ আদিশূরের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিলে বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমাজ, সামাজিকতা, বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সবই যে অস্বীকার করিতে হয়—সমস্তই যে ওলটপালট হইয়া যায়। বাঙ্গলার ইতিহাসটাকে যে তাহা হইলে সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়! কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গলার যথার্থ ইতিহাস হইবে?

আদিশূর বাস্তবিকই একজন চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আদিশূরের ঐতিহাসিকতা বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা দিকের ভিত্তি। সে ভিত্তি উড়াইয়া দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সামাজিকতার পূর্ব্ব ইতিহাসটী তাহা হইলে সত্য হইবে না। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমাজ গঠন ও সামাজিক পদ্ধতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি যে গুলি এখনও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আদিশূরের ঐতিহাসিকতা না মানিলে, এগুলির মধ্যে সত্যতা ও সারত্ব থাকিবে না। তবে কেমন করিয়া বলিব, তাহা বাঙ্গলার যথার্থ ইতিহাস?

আদিশূরের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সে যুগের সেই হিন্দু নরপতি আদিশূরের প্রবর্ত্তিত নীতির উপরই এখনও বাঙ্গলার বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

Vincent Smith বলেন,—পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আদিশূর নামক একজন ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেও পারেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান বিভাগবাসী রণশূর বাঙ্গলার শূরবংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য পালরাজগণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চৌলকে বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় এই রণশূর রাজা মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।"

ইহা হইতে আমরা দুইজন আদিশূরের সন্ধান পাইতেছি। একজনের রাজধানী গৌড়ে, অপর জনের রাজধানী রাঢ়ে। অথচ রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন,—আমরা সেই এক পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশধর, অথচ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপাধি বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাই এবং বেদও উভয়ের এক নহে।

যাহা হউক, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। যে সকল কথার উল্লেখ এস্থলে আবশ্যক নাই। রাঢ়ভূমে যে একজন আদিশূর ছিলেন, সেই আদিশূরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

Vincent Smith যে ভাবে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন আদিশূরের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ঐস্থানে কোনও আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ঘটকদের কুলগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সকল কথার সহিত স্থানীয় জনপ্রবাদাদি মিলাইয়া এখন আমরা আদিশূরের ঐতিহাসিকতা কতদূর নির্ণয় করিতে পারি তাহাই দেখিব।

দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলায় আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আর সেই সব কথা না বলিয়া বর্ত্তমানে আরও কিছু নূতন কথা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা

করিল। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহারই কয়েকটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম।

১। আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান হইতে তাঁহার অন্যান্য সৈনিকগণ নিয়োজিত হইত। এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানেই, বিশেষতঃ যে অংশে আদিশূরের রাজধানী ছিল, সেই অংশ সপ্তশতী বা সাতশইকা পরগনার অন্তর্গত।

এখন ইংরাজ আমলে সাতশইয়া পরগণার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। নতুবা পূর্ব্বে এই সাতশইয়া পরগণা বোলপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে সমগ্র রাঢ় দেশই ছিল এই সাতশইয়া পরগণা।

তাহা অসম্ভব নহে। কারণ মুসলমান আমলে বাঙ্গালা দেশ নব নব পরগণায় বিভক্ত হইলেও সাতশইয়া পরগণা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এ পরগণা হিন্দু আমলের। হিন্দুযুগ হইতেই মুসলমান রাজত্বে এবং তাহা হইতে ইংরাজ আমলে আসিয়া বাঙ্গালাদেশের আয়তন ও যেমন কমিয়া গিয়াছে, সাতশইয়া পরগণারও আয়তন ক্রমশঃ সেইরূপ হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের উগ্র-ক্ষত্রিয়—২। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা যে "উগ্রক্ষত্রিয়" নামক একটি বিশেষ প্রভাবশালী সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি, মনে হয় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সে যুগে আদিশূরের সৈনিক বিভাগে নিয়োজিত হইতেন এইরূপ প্রবাদও আছে এবং বর্দ্ধমান জেলার এই উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে একটা কিছু ছিলেন। এখনও সমগ্র বাঙ্গলার মধ্যে শতকরা ৭৭০৫ জন কি তাহারও বেশী উগ্র ক্ষত্রিয় এক বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে।

এ জেলায় এই সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়টি সমগ্র বাঙ্গলার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় যে একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানের হিন্দু নাম—৩। সাতশইয়া পরগণার জমিদারগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবী আমল হইতে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থান সমুদ্রগড়; ইঁহাদিগকে এখনও সমুদ্রগড়ের রাজা বলে।

সমুদ্রগড়ের ঠাকুর নামেও ইঁহারা অভিমত হইয়া থাকেন। এখনও ইঁহারা একটা করিয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করেন।

ঐ বংশের সকলেই নাকি একটী হিন্দু এবং একটী মুসলমানী নাম থাকে। বর্ত্তমান জমিদারের হিন্দু নাম কেশব লাল ঠাকুর ও মুসলমানী নাম ইয়াসিন খাঁ।

আদিশূরের প্রাসাদ—বর্ত্তমান মুটরা গ্রামে অন্ততঃ ২০০০ গজ লম্বা এবং ৬০০ গজ চওড়া। আদিশূরের যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইটগুলি পুরু, চৌকো টালির ন্যায় এবং ঠিক যেন পাথরের মত কঠিন। ইটগুলি আকারেও খুব বৃহৎ। এইরূপ ইট সচরাচর অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজা শশাঙ্কের কাণ সোণার ধ্বংসাবশেষের ইটগুলির সহিত এই ইটের মিল হয়। কিন্তু এই ধরণের ইট বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ ঐ ইট বর্ত্তমানে কাইশ গ্রামে অবস্থিত আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপাল দেবের মন্দিরে এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীরাদিতেই দেখা যাইত। এখন আবার অনুসন্ধানের ফলে কাইগ্রামের অনেক স্থানেই মৃত্তিকার ভিতর হইতে এই ধরণের ইষ্টকময় ভিত্তি বাহির হইয়া পড়িতেছে।

নূতন নদী—৫। যে গ্রামে আদিশূর দুর্গের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই গ্রামটির বর্ত্তমান নাম মুটরা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সকলে বলিত—শূউরো। এখনও অনেকে বিশেষতঃ প্রাচীন লোক মাত্রেই তাহাই বলিয়া থাকেন। তৎপূর্ব্বে ছিল শূরো। প্রাচীন দলিলাদিতে কুত্রাপি মুটরা নাম নাই। শুঁরা বা শূরো এইরূপ নামই পাওয়া যায়। এই ধ্বংসাবশিষ্ঠ দুর্গের সন্নিকটেই যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, সেটি আদিশূরের দীঘি বলিয়া এখনও প্রবাদ। এই দীঘির অনতিদূরে এবং বর্ত্তমান মুটরা গ্রামের নিম্ন দিয়া যে খড়োশ্বরী বা খড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সে নদীর অস্তিত্ব যে পূর্ব্বে ছিল না, সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এ কথার আরও একটা প্রমাণ পাইয়াছি। কিছুদিন আগে এই মুটরা গ্রামের খুব একখানি প্রাচীন নক্সা জনৈক গৃহস্থের কুটীরে পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই নদীর কোনও পরিচয় বা চিহ্ন মাত্র ছিল না।

আদিশূরের মুদ্রা—৬। আদিশূরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধানের ফলে এখানে কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তৎসহ যে একটী ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি এবং একটী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহারই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণ মুদ্রাটীর আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-একটী গুটকে পয়সার মত। অনেকটা পুরু। খাঁটি সোণায় নির্ম্মিত। মুদ্রাটির একদিকে একটী বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিজয় ঠামে দণ্ডায়মান। মস্তকে শিরস্ত্রাণ কতকাল পূর্ব্বে খোদিত এই মূর্ত্তি, তবু সে মূর্ত্তির মুখখানি এখনও কত উজ্জ্বল কত যেন দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্র অঙ্কিত। এই বহুদিনের পুরাতন মুদ্রার চাকচিক্য এখনও নষ্ট হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই শিল্প নৈপুণ্য গুপ্ত যুগের শিল্প ধারার অনুরূপ। কাই গ্রামের একটি নিষ্ঠাবান সদ্ ব্রাহ্মণের গৃহে এই মুদ্রা দৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ পরিবারে মুদ্রাটি দেবতারূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। এই মুদ্রাটি কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আদিশূর-দুর্গের সীমার মধ্যেই হউক বা সীমার বাহিরেই হউক, এইরূপ কোন এক স্থানে পাইয়া বিক্রয় করিতে চাহিলে এই পরিবারস্থ একাগ্র স্বধর্ম্মানুরাগী ও পরম ভক্তিমান

পুরুষ স্বর্গীয় হরিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার নিকট ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহারই নির্দ্দেশ মত তদবধি এইভাবে মুদ্রাটীর পূজা হইয়া আসিতেছে।

মূর্ত্তির-সাদৃশ্য—৭।—আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপাল দেবের মন্দিরে—"অনন্ত বাসুদেব"—নামক আর একটী দেববিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছে। বরাহগোপাল দেবের সহিত সেটীরও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি—সেই অনন্ত বাসুদেবের—একাংশে খোদিত অপর একটী প্রতিমূর্ত্তি এবং সুট্রা হইতে সংগৃহীত ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি, এই দুটিই একরূপ এবং এই দুটি মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ স্বর্ণ মুদ্রার খোদিত মুর্ত্তিটীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় এবং আরও অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এই স্থানই যে আদিশূরের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আরও একটী কথা এইখানে বলিয়া রাখি। কয়েকদিন পূর্ব্বে সুট্রা গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে ভূগর্ভ হইতে একখানি পাথরের চৌকী পাওয়া গিয়াছে।

প্রস্তরটি লাল রং এবং খুবই দীপ্তিময়। আদিশূরের দুর্গের পার্শ্বেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রাও এই সঙ্গে বাহির হইয়াছে।

প্রতীক্ষায়

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

(১)

রঞ্জন যেদিন প্রভু কন্যা সারাকে জানাইল সে তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক, সে দিন প্রথমে সারা তাহার মুখের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ধীর কণ্ঠে রঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"রঞ্জন আজ তোমার কথা শুনে আমি ম'নে বড় আঘাত পেলাম! আমি আশা করিনি যে তোমার মুখে এরকম কথা আমি কোনদিন শুনতে পাব। যাক্ যা হবার তা হ'য়েছে, আমার ইচ্ছা, এখন হ'তে আর একদিনও যেন একথা আমার কানে না আসে।"

রঞ্জন কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে ডাকিল—"সারা"—

সারা হস্তস্থিত গোলাপ গুবকটি মস্তকের কবরীতে গুঁজিতে গুঁজিতে উত্তর দিল—"কেন?"—

রঞ্জন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পরে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"তুমি কি কিছু বুঝতে পারো না? না,—বুঝেও অবুঝের মত থাক দয়া ক'রে আমার তার একটা উত্তর দেবে কি?

সারা দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল "না।"

রঞ্জন কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। পরে বলিল—"যদি ম'নে ক'রে থাক আমি তোমার দয়া ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি, তবে জেনো এ তোমার ভুল ধারনা। আমি তোমায় অনুরোধ ক'রেছিলাম, ভিক্ষা নয়!"

সারা তীব্র দৃষ্টিতে রঞ্জনের মুখের প্রতি চাহিল। বলিল "কিন্তু তোমার মুখে, আমার পিতার কর্ম্মচারীর মুখে এত গর্ব্বের কথা শোভা পায় না। দুর্ল্লভ জিনিসের আশা করাও বাতুলতা মাত্র। সাহারিয়ার সর্দ্দারের মেয়ের মুখের সম্মুখে একটা নফর দাঁড়িয়ে কথা বলবার স্পর্দ্ধা করে? আশ্চর্য্য বটে!"—

রঞ্জনের সুগৌর মুখমণ্ডল অপমানে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। পরে বলিল—"সারা, তুমি আজ সাহারিয়ার সর্দ্দারের মেয়ে ব'লে নিজের মধ্যে গর্ব্ব অনুভব ক'র্ত্তে পার, সামান্য নফর ব'লে আমাকে অপমান ক'র্ত্তে পার বটে, কিন্তু ম'নে রেখ সকলের দিনই সমান যায় না বা চিরদিনই আমি নফর থাকবো না। চিরদিনই তোমার বাবার কাছে কাজ শিখবো না, চিরদিনই আমার পয়সার অভাব থাকবে না। আমি আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি আমার গায়ে যদি

আমার মায়ের রক্ত থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই একদিন মানুষ হ'ব! যাক্ আর আমার কিছু ব'লবার নেই। তোমার বাপ্‌জান কে জানিয়ো আমি চল্লুম। যেখানেই যাই, খোঁজ কেউ পাবে না। যদি আবার মানুষের মত মানুষ হ'তে পারি তখন ফের এই দেশে, তোমাদের সামনে ফিরে এসে দেখাব আমি কাপুরুষ নই! আমি পয়সার কাঙাল নই! গেলাম, সারা বিবি 'চল্লুম'!—

রঞ্জন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সারা তখনও নীরবে নত নেত্রে কক্ষতলে বিস্তৃত গালিচার প্রতি চাহিয়াছিল। তাহার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছিল—রঞ্জনের সেই কথাটি "আমি পয়সার কাঙাল নই।"

সত্যই! সেতো পয়সার জন্য লালায়িত নয়। যদিও তাহার পয়সার স্তূপ নাই, তথাপি সে পয়সার জন্যও কাঙাল নয়।......

কেন?—সে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করে না। তাহার সঞ্চিতও কিছুই নাই'—......

সারা যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তাহার বহু পূর্ব্বে রঞ্জন সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে। সারা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল "রঞ্জন"—

কেহ সাড়া দিল না। সারা দুয়ারের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার ডাকিল—"রঞ্জন রঞ্জন"—রঞ্জনের সাড়া পাওয়া গেল না। দাসী আসিয়া জানাইল সে কিছু পূর্ব্বে আস্তাবল হইতে তাহার আপনার অশ্বটিতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সারা তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেল জানিস্"—দাসী জানাইল —"না"! সারা সেই স্থানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল—"রহমান"!

"রহ্‌মান আসিলে সারা তাহাকে আদেশ করিল— "যত তাড়াতাড়ি পার আস্তাবল হ'তে ঘোড়া নিয়ে রঞ্জনকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। ব'লবে সারা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব'লেছেন। যাও' যত শীঘ্র পার!—"

রহ্‌মন চলিয়া গেল!—সারা দুয়ারের উপরে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—"সে এত ছোট ব্যাপারে তাহার উপরে রাগ করিয়া চলিয়া গেল'?—সে কি জানেনা সাহারিয়ার সর্দ্দার বংশের কন্যার মান কিরূপ'? সে কি জানেনা, তাহাদের সর্দ্দার বংশীয় পুত্র ভিন্ন তাহাদের বিবাহ হইবার উপায় নাই? তবে সে এমন অবুঝের ন্যায় কার্য্য করিল কেন? যদি সেরূপ পাত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়, সবই তো সে জানে, তবে সে কেন এরূপ কার্য্য করিল? সে কি সারাকে ভুল বুঝিয়াছে? হাঁ তাহাই সম্ভব! কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপই—না, না, সে তাহার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল! সে বুঝিতে পারিল না, কেন তাহাকে সারা অপমান করিল! হায়,—সে যে ভাবিয়াছিল গোপনে যাহা আছে তাহা গোপনেই থাকুক। রঞ্জনও যেন তাহার আভাষ না পায়।

কিন্তু রঞ্জন,—তুমি উল্টা বুঝিলে,—ভাবিলে সারা তোমাকে উপেক্ষা করিল, অবহেলা করিল?—

রহ্‌মন ফিরিয়া আসিয়া সারার হস্তে একখানি পত্র দিল। সারা খুলিয়া দেখিতে পাইল,—রঞ্জন লিখিয়াছে—

"সারা,—চলিলাম কোন অজানা পথের উদ্দেশে! তোমার উপরে রাগ করিয়া নয়,—নিয়তির উপরে দুঃখ করিয়া। যদি পারি, আবার তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইব! আর যদি না পারি, তবে এই শেষ! আশা করি, সর্দ্দার কন্যার মুখের উপর কথা কওয়ার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবে! ইতি—রঞ্জন।

সারার হস্ত কম্পিত হইয়া পত্রখানি গালিচার উপরে পড়িয়া গেল! বিবর্ণ মুখে সে পত্রখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। 'চলে গেলে—'সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িল! অশ্রুতে তাহার পরিধেয় ভিজিয়া উঠিল!—'চলে গেলে'—কিছু বুঝলেনা, আমাকে ফিরেও দেখলে না,—তুমি চ'লে গেলে'—তুমি জানতে চাইলে না, আমাদের সংসার যাত্রার পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ। অভিমান করে চলে গেলে! বড় গর্ব্বিতা নারী আমি—তাই কি আপনার হাতে সাজা দিয়ে গেলে রঞ্জন,—কিন্তু এ সাজা কেন দিলে,—দিনান্তে যদি একবারও তোমায় দেখতে পেতাম,—তাও যে আমার শতগুণ বাঞ্ছনীয় ছিল। নিষ্ঠুর!

পয়সা! সারার যা আছে, তা যে অনেক রাজার ভাণ্ডারেও প্রায় থাকে না—তবে তুমি কিসের জন্য চলে গেলে।

"তুমি লিখিয়াছ ধৃষ্টতা, কিন্তু রঞ্জন, স্বামী,—দেবতা,—আমি যে তোমার এ ধৃষ্টতাকে আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। তুমি যখন কথা বল তখন আমি তোমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু তুমি সমস্ত ভুল বুঝিলে—তাই, তাই প্রিয়তম, দুঃখিনী সারার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেলে—"

(২)

সুদীর্ঘ এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রঞ্জন আর ফিরিয়া আইসে নাই। সারা তাহার আশার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, সে ফিরিল না।

স্নেহের কন্যার বিষন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সলোমন চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দিন দিন সে যেন শুখাইয়া যাইতেছে। তাহার মুখে হাসির রেখা নাই। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। কেন? কেন এমন হইল?—

কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া স্নেহ-সিক্ত-কণ্ঠে ডাকিলেন—"সারা",—সারা তাহার নিষ্প্রভ দৃষ্টি পিতার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া উত্তর দিল—"কেন বাপ্‌জান"—সলোমন কন্যার ললাটে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন মা? তোর কি কোন অসুখ করেছে?" সারার শুষ্ক ওষ্ঠের কোণে বিষাদের ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"না বাপ্‌জান!—" সলোমন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হায় রে পিতৃহৃদয়! সদ্য মাতৃহারা কন্যাটিকে তিনি যেদিন বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন তখন সে কতটুকু?—পাছে সে মনে দুঃখ পায় ভাবিয়া তাহাকে কোন প্রকার পরাধীনতার ভিতরে থাকিতে দেন নাই। এজন্য তাঁহাকে মুসলমান সমাজেও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অটল! হায়, ও যে মাতৃহারা! ... ...

সলোমন কিছুক্ষণ কন্যার নিকটে বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে কি ভাবিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। হায়, আজ যদি সারার মাতা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে তো সলোমনকে এত ভাবিতে হইত না!

কক্ষ মধ্য হইতে সারার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল—"বাপ্‌জান—"

সলোমন পুনর্ব্বার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারা একখানি হস্তে পিতার একখানি হস্ত টানিয়া লইয়া, অনুরোধ ভরা স্বরে বলিল—"বাপ্‌জান্ রঞ্জন কি আর আসবে না?" —"কে? রঞ্জন?" মুহূর্ত্তে একখানি কাল যবনিকা যেন সলোমনের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। সলোমন চমকিত হইয়া উঠিলেন। বিবর্ণ মুখে কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে ডাকিলেন—"সারা—"

সারা উত্তর দিল না। মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া তখন তাহার দৃষ্টি বহুদূর বিস্তৃত মাঠের উপরে গিয়া পড়িয়াছিল।

সলোমন অধীর কণ্ঠে ডাকিলেন—"সারা"।—সারা অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিল—সলোমন উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন—। হায়, কত বড় ভুল! এ ভুলের জের কি সারাজীবনই সারাকে বহিয়া চলিতে হইবে! মাতৃহারা কন্যা আমার,—আজ যদি তোর মা বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে হয়তো তোকে এইরূপে জ্বলিয়া ছাই হইতে হইত না। হয়তো সে তোর একটা উপায়ও করিতে পারিত।

কিন্তু তোর পিতা?—সে যে অক্ষম! তারও মন পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে তোর ঐ শুষ্ক মুখখানি দেখে।—

"সারা,—মা আমার! অক্ষম বাপ্‌জানকে তোর ক্ষমা ক'র্ত্তে পার্ব্বি না রে?—কথার শেষে সলোমনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সারা ব্যথিত দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কথা কহিতে পারিল না। সলোমন বলিলেন—"বড় ভুল করেছি সারা! কিন্তু কি ক'রবো মা? চেষ্টা ক'রেও তো কিছু হ'তো না! আমার বুকটা ছিঁড়ে পড়লেও তো আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষের মুখ হেঁট ক'র্ত্তে পার্ব্ব না!—

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—"আমি-আমি না পারলেও কি তুই তাঁদের মুখ নিচু ক'র্ত্তে সম্মত হ'তিস্ সারা?—"

সারা মৃদু অথচ কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল—"না বাপ্‌জান!"

কন্যার মনের ভাব বদ্‌লাইবার জন্য সলোমন সারার বিবাহের জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুযোগ মত একটি পাত্রও মিলিয়া গেল। সলোমন একদিন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"সারা'—আমি তোর বিয়ে দিয়ে, শান্তিতে যেতে চাই মা!"

মুহূর্ত্তে সারার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার নীরব হইল। সলোমন ডাকিলেন—"সারা"—

"বাপ্‌জান"—

আর্ত্তস্বরে সে ডাকিল—'বাপ্‌জান,—ক্ষমা কর়ো!" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বক্ষ কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সলোমন কিছুক্ষণ নীরবে কন্যার মুখের প্রতি চহিয়া রহিলেন, পরে হতাশপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"কিন্তু আমি বড় আশা ক'রে নওরজকে ভিন্‌দেশ হ'তে আনিয়ে ছিলাম সারা! বড় আশা ক'রেছিলাম তোকে সুখী দেখবো ব'লে! আমি বিশ্বাস করি নওরজের মত ছেলে লাখ্‌কে একটি মেলে! বড় আশা ক'রেই যে আমি ওকে আনিয়ে ছিলাম সারা! তোর সঙ্গে ওর বিবাহ দিয়ে তোকে—সুখী দেখে নিশ্চিন্তে ম'রতে পারবো বলে, কিন্তু আল্লা যে আমার দুষ্‌মন রে!—তিনি আমার সুখ দেখবেন না!—সারা কথা কহিল,—ধীরে ধীরে বলিল—"বেশ তো বাপ্‌জান, নওরজকে এখানে রেখে দাও! তুমি ব'ল্লে সে নিশ্চয়ই থাকবে। আর সে যাতে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা ক'রে দাও!"—

সলোমন নীরবে বসিয়া রহিলেন!—অনুশোচনা তাঁহার হৃদয়ে সূচীকার ন্যায় বিদ্ধ হইতেছিল! বহুদূরে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

(৩)

ঘন কৃষ্ণ মেঘ গগন ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। ঘন ঘন বিজলী চম্‌কাইতেছিল। বাতাস হায় হায় শব্দে বহিয়া যাইতেছিল

সারা পুষ্পোদ্যানে একটী মর্ম্মর বেদীর উপরে বসিয়া সারেঙ্গ্ হস্তে মৃদু কণ্ঠে গাহিতেছিল—

"আজু সখি কাহে পিয়া, আবহুঁ ন আওয়ে।
গগন পটহে শোহে সে সুখ তারা।
চন্দ্রকা পাঁতি জ্যোতি হীন ভেই—
পরশে দহতি মোহে,—মতি মো হ'রা।"

ধীরে ধীরে সারেঙ্গএর তারে তারে করুণ স্বরে মূর্চ্ছনা উঠিতেছিল! বড় বেদনা ভরা, বড় করুণ সে সুর! স্তব্ধ আকাশের ক্রোড়ে যেন সে সুর আছড়াইয়া পড়িতেছিল! অদূরের বকুল গাছটি হইতে বাতাসে কতকগুলি বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িল।

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া সেই মূর্চ্ছনা উঠিতেছিল—"আজু সখী কাহে পিয়া, আবহুঁ ন আওয়ে—গান শেষ হইল। সারা নীরবে বসিয়া রহিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ! শুধু এক একবার বাতাসের শন্ শন্ শব্দ কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছিল!

—"সে আজও ফিরিয়া আসিল না। আর ফিরিয়া আসিবে কিনা কে জানে? যাহার উপরে অভিমান করিয়া সে বিদায় লইয়া গেল,—সে কি জানিতে পারিল,—তাহার হৃদয়ে কত গভীর আঘাত লাগিল? সে কি জানিতে পারিয়াছিল সারা কখনও তাহার জন্য অশ্রুতে সেই দরিদ্রের চরণতলে হৃদয়ের বেদনাকে নিবেদন করিবে? সে কি জানিয়াছিল—সারা তাহার আসায়,—আশা পথ চাহিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বার বার ডাকিবে—"ওগো, অভিমান ভুলে ফিরে এস? আমি ক্ষমা ভিক্ষা কর্ চ্ছি। ফিরে এস, ওগো স্বামী, ফিরে এস!" না সে তাহা জানিতে পারে নাই! হয়তো আর পারিবেও না! সেই ভাল!... সে, অকারণে তাহার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল! কোথায় গেল! হয়তো কোন অজানা দেশের পথিক হইয়াছে! আর অসিবে না! আর রজবের মোহন মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ডাকিয়া উঠিবে না! আর সে তাহাকে তিরস্কার করিতে আসিবে না! আর সে তাহাকে বিদ্রূপ করিবে না! সস্নেহে "সারা" বলিয়া ডাকিবে না! সে চলিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসরের

জন্ত শুধু সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল! সে কোথা হইতে আসিয়াছিল তাহাও কেহ জানে না, কোথায় চলিয়া গেল তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। স্রোতের ফুলের ন্যায় সে একটি তৃণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আবার স্রোতের মুখে পড়িয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেল!

"সারা"—

পিছন হইতে ডাক শুনিয়া সারা মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল অদূরে নওরজ দাঁড়াইয়া—তাহার প্রাত চাহিয়া আছে।

উড়াণীখানি গায়ে আর একটু টানিয়া দিয়া সারা উঠিয়া দাঁড়াইল। নওরজ তাহার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল—"দাঁড়াতে হবে না, বোস! আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে!—তাই ব'লতেই আমি এখানে এসেছি!—মুহূর্ত্তে সারার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল! কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এখনই?"—

"হাঁ,"—

সারা স্থানুর ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিসের আতঙ্কে তাহার হৃদয় কাঁপিতেছিল। নওরজ কিছু দূরে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপরে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পরে নওরজ ধীরকণ্ঠে বলিল—"আমি একটা ঠিক কথা তোমার কাছে শুনতে এসেছি! আশা করি, উত্তর দেবে।" সারা উত্তর দিতে পারিল না। নত নেত্রে নিম্ন দিকে চহিয়া রহিল। নওরজ সে দিকে লক্ষ্য করিল না। অন্য দিকে চাহিয়া বলিল—

"তোমার বাবা আমায় একটা কথা ব'লে এখানে নিয়ে এসেছিলেন! সে কথা তুমি বোধ হয় জানো!"

সারা ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল "জানি"—

নওরজ বলিল—"কিন্তু তিনি এখন আমায় অন্য কথা বলছেন! এর কারণ কি?

সারা অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল—"এর কারণ অন্য কিছুই নয়,—আমারই অমত —"

"তোমার অমত,—"নওর'জ একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে সারার অনিন্দ্য সুন্দর মুখের প্রতি চাহিল। তৎপরে দৃষ্টি নত করিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিল—"তবে তিনি, তার মেয়ের মত না জেনে কেন—আমাকে নিয়ে আসতে যান—একি প্রতারণা করা নয়—"সারা নওরজের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—'তার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, নওর'জ সাহেব! আর আমাদের প্রতারণা করা স্বভাব নয়। যদি ইচ্ছা করেন,—এখানে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে, বিবাহ ক'র্ত্তে আপনি পারেন। আর অর্থের যদি আবশ্যক বোধ করেন,—আমি আপনার সে অভাব পূর্ণ ক'র্ত্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

নওর'জ সারার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার তা ইচ্ছা নয়।"—

—"তবে—"

"আমি যাকে বিবাহ ক'র্ত্তে এসেছিলাম, তাকেই চাই।" সারার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তাভ হইয়া উঠিল। যথাসাধ্য আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমি আপনার মুখে একথা শুনতে ইচ্ছা করি না—নওর'জ সাহেব। অন্য কথা বলতে পারেন।—"

"আমি কিন্তু আজ এই কথাই ব'লতে এসেছিলাম।" সারার মুখের উপরে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অধীর কণ্ঠে বলিল—"আমি কিন্তু ওকথা শুনতে ইচ্ছুক নই।—নওর'জ কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিল। পরে বলিল—"কিন্তু আমি তোমার আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারি কি, কেন? সারা নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। বোধ হইল সে যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই। নওর'জ পুনরায় প্রশ্ন করিল। সারা চমকিত হইয়া উঠিল। সজল নয়নে নওর'জের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"সত্যি কি—আপনি আমার আত্মীয়ের মত জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন—"

"হাঁ, বিশ্বাস করো।"

চঞ্চল চরণে সারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এখন নয়! বোলবো আপনাকে সমস্তই ব'লবো। সন্ধ্যার পরে। নির্জ্জনে ব'সে।—"

সারা আর সেইস্থানে অপেক্ষা করিল না। দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায় নওর'জ তাহার গমনপথ

মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

সমস্ত কথা শুনিয়া নওর'জের উভয় চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারা করতলে মস্তক স্থাপিত করিয়া নীরবে বসিয়াছিল। বহুক্ষণ পরে নওর'জ সারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বহিন, যে চ'লে গেছে তারই স্মৃতি নিয়ে জীবনটা কি ব্যর্থতায় ভরিয়ে তুলবে? সে ফিরবে কিনা তার তো কোন আশাই সে রেখে যায় নি!—"

সারা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—না থাক্—, কিন্তু সেই ব্যর্থতাকেই যে আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি ভাইসাহেব।" নওর'জ নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। সারা বলিল—"সে গেছে যাক,—কিন্তু আমি তাকেই স্বামী ব'লে জানি,—সেই জন্য, আর কাউকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারব না!—জানো ভাইসাহেব,—আমিই তাকে বড় কঠোর কথায় বিদায় দিয়ে ছিলাম, তখন জানতে পারিনি সে আমার কত আপনার ছিল!—"

কথার শেষে তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারা ক্ষিপ্র হস্তে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল—"ভাইসাহেব,—তোমার যতদিন খুসি তুমি এখানে থাক। যদি বাড়ীতে খুব কাজও থাকে তা হ'লেও দিন কতক কি এখানে থাকবেনা,—মনে কর তোমার বহিনের অনুরোধ।" নওর'জ কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিল—"আচ্ছা"—সারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমি একটু পরে আসবো। তুমি যদি পারো, এই স্থানে কিছুক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করো।—সে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল, পরে গালিচার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া, আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

(৪)

ধীরে ধীরে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে সারার জীবন প্রদীপ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিতেছিল।

কতদিন, কতমাস, কতবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল—, আকাঙ্ক্ষিত যে সে আসিল না। অশ্রুহায় শুখাইয়া গেল, ভাষা ফুরাইয়া গেল, দয়িত ফিরিয়া আসিল না। সে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল,—সারাকে ভুলিয়া গেল। কিন্তু সারা তো তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। সে যে আজও আল্লার নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করে—তাহার মধুময় স্মৃতি-ভার বক্ষে লইয়াই সে যেন অনন্ত পথের যাত্রী হইতে পারে।—বেহেস্তে স্থান পাইবার আশা সে রাখে না। যদি দয়িতের স্মৃতি বক্ষে লইয়া,—জাহান্নামেও যাইতে হয়,—সেও ভাল,—কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া সে বেহেস্তে স্থান পাইতে চাহে না।

শ্রাবণের শেষ। সারাদিন বরষা নামিয়াছিল। ঝর্ ঝর্ ঝর্-মাঝে মাঝে সজল 'বাতাস' কি করুণ সুর তুলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আজও যেন বাদল দিনে সেই বেদনগীতি কে গাহিয়া যাইতেছিল—"আজু সখী কাহে পিয়া আবহুঁ ন আওয়ে।"

সারার ক্ষীণ দেহলতা সুকোমল শয্যার উপর পড়িয়া ছিল একটি ঝরা ফুলের মত। কোন দিন সে বসন্তের বাতাস আসিয়া একটি গোলাপ বৃন্তচ্যুত করিয়াছিল, তাহা জানিত না। আজ যেন সে ধরণী হইতে বিদায় চাহিতে-ছিল। প্রদীপ যে নিভিয়া আসিয়াছে, আর সে জ্বলিয়া উঠিবেনা, আর তাহার স্নিগ্ধ আলোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেনা। আজি অসময়ে সে ধরণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা জানাইল।

সারার মস্তকের উভয় পার্শ্বে নওর'জ এবং সলোমন বিষণ্ন বদনে বসিয়াছিলেন। কন্যার পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সলোমন অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিলেন—সারা! সারা চমকিত হইয়া পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষুদ্র কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—"বাপজান"—

নওর'জ সলোমনকে তুলিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গেল, সে বুঝিয়াছিল—মৃত্যু পথ-যাত্রী এখন একটু নীরবতার ছায়ায় শান্তির আশা করিতেছে। সারা এখন কিছুরই প্রার্থিনী নহে।

নওর'জ ডাকিল—"সারা,—বহিন—"

সারা বলিল নওর'জ ভাই, অন্তিম সময়ে কি একটু শান্তি দিতে পার না,—

নওর'জের নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"যা ইচ্ছা হয় বল সাধ্যানুসারে চেষ্টা করবো।"

সারা বলিল—"বাপজান বড় কষ্ট পেলো, ভাইসাহেব। আমি চ'লে গেলে কে আর তাকে দেখবে নওরজ?—" সারার কোটরাবিষ্টচক্ষু দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল। নওর'জ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল—"তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার, কারণ আজ হ'তে আমি তোমার নামে শপথ ক'রে ব'লছি সারা তোমার বাপজানের ভার আমি নিলাম। যদি আমি পথের ফকিরও হই, তা হলেও আমি ভিক্ষা ক'রে তোমার বাপজানকে খাওয়াব।—"

"ধন্যবাদ,—! নওর'জ সাহেব আমি যে আজ কি শান্তি পেলাম, তা তোমাকে মুখের কথায় জানাতে পার্‌বনা। আমার বুকের ভিতর বড় কাঁপছে। নওরোজ, বাপনাজকে একবার ডাক তো!—"

নওর'জ সলোমনকে লইয়া আসিল। সারা পিতার শুষ্ক বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার অন্তর দুর্ভাগ্য পিতার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল! সে আপনার অন্তর সংযত করিয়া লইয়া পিতাকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবার জন্য ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"বাপ্‌জান্—তুমি আর ভাইসাহেব আমাকে ধরে আস্তে আস্তে ঐ মুক্ত মাঠটার উপরে নিয়ে যেতে পারনা? ওখানকার বাতাস মুক্ত। এ বদ্ধের ভিতর যে আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে বাপ্‌জান!—"

সলোমন ও নওর'জ যখন বহু কষ্টে সারার দেহ ধরাধরি করিয়া আনিয়া ময়দানের কোমল তৃণগুচ্ছের উপরে শয়ান করাইয়া দিল; তখন দিবাকর অস্ত গিয়াছেন। সমস্ত আকাশটির গাত্রে কে যেন এক কোটা আবির ঢালিয়া দিয়াছিল। পক্ষীকুল দিনান্তের কলগান গাহিতে গাহিতে আপন আপন কুলায়াভিমুখে উড়িয়া যাইতেছিল।

সলোমন অধীর চিত্তে অদূরে পাদচারণা করিতেছিল। নওর'জ সারার নিকটে বসিয়া ছিল। সারা ডাকিল—"নওর'জ"—"কেন সারা?—"

সারা করুণ কণ্ঠে বলিল—"বড় আশা ছিল মরণের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তার দেখা পাব! কিন্তু কই ভাই? সে তো এলো না আমার যে আর সময় নাই। আমি যেন কার ডাক শুনতে পাচ্ছি!—" নওর'জ কাঁদিয়া ফেলিল। কোন কথাই সে কহিতে পারিল না। ... ...

এমন সময়ে কিছু দূরে ঘোড়ার পদধ্বনী শ্রবণ করিয়া সারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"দেখ তো কে আসছে রঞ্জন কি ফিরে এল? আমার মনে হচ্ছে সেই-ই যেন আসছে!" নওর'জ ফিরিয়া চাহিল। ঘোড়ার উপরে সে একটি লোককে দেখিতে পাইল বটে কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে রঞ্জনকে চিনিত না।

সলোমন দূর হইতে অশ্বারোহিকে দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিলেন। সে রঞ্জন! উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"রঞ্জন, রঞ্জন" অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সলোমন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রঞ্জন—আজ তোর জন্যে আমি সারাকে হারাতে ব'সেছি। শয়তান,—আজ তুই আমার ক্ষমার অযোগ্য।" তিনি রঞ্জনের প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিলেন, নওর'জ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। সারার প্রতি চাহিয়া ডাকিল—"সারা,—সারা—রঞ্জন এসেছে। তাকাও! চেয়ে দেখ!—" সারার উভয় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে পুনর্ব্বার চাহিল। রঞ্জন সারার পার্শ্বে বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

সারা নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।—রঞ্জন ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—"কোথায় যাচ্ছ সারা"—আমি, আমিই যে আপনার হাতে তোমায় হত্যা কর্‌লুম! আমায় ক্ষমা করো!—"

সারা বহু কষ্টে উচ্চারণ করিল—আমি যাচ্ছি, রঞ্জন, আমার পশ্চাতে এস! সে আর কথা কহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর নিম্নভাগ হইতে একটি সাদা পর্দ্দা উঠিয়া সমস্ত চক্ষু ছাইয়া ফেলিল। রঞ্জন বাণাহতের ন্যায় তাহার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল।

তখন সলোমন নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন এবং নওর'জ যুক্তকরে আল্লার নিকটে মৃত আত্মার জন্য মুক্তি প্রার্থনা করিতেছিল। হায়, চিরজীবন যাহারা তৃষ্ণা বহিয়া চাহিয়াছিল, জীবনের পরপারে তাহারা পরস্পরকে পাইবে কিনা কে জানে?——

পুস্তক-পত্রিকা-সমালোচনা

আলোচনা

শ্রীগীর্ব্বাণ

"বিবাহের চেয়ে বড়" শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত একটী গল্প। বিগত ১৩৩৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসের "শনিবারের চিঠিতে" এই গল্পটীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে; যদিও আমি ইহাকে সমালোচনা বলিতে রাজী নহি; কারণ, সমালোচনায় ভাল মন্দ দুই-ই থাকিবে। সমালোচক মাত্র একটা দিক দেখিয়া আলোচনা করিয়াছেন, অন্যদিকটা বাদ পড়িয়াই গিয়াছে।

প্রভাত দিদিকে "বিয়ের নায়রী" আনিতে মধ্য প্রদেশের এক "বুনো গাঁয়ে" রওনা হইয়াছে—রেল গাড়ীতে। রাস্তায় এক গাড়ীতে অশ্রু ও তার দাদার সঙ্গে দেখা। "দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্ব্বাসিতা নারী বাঙলার" পিত্রালয়ে চলিয়াছেন। কত উৎসাহ!—বাপের বাড়ীর—জন্মভূমির কত কথাই এক সময়ে মনে জাগিয়া উঠিয়াছে—কত তৃপ্তি! সে আবেগ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে;—যেন গোমুখীর পূতধারা বহিয়া চলিয়াছে। "বঙ্গে—সবুজ মাঠ কত দিন দেখিনি প্রভাত—ভুয়ে পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো সাদা পাল তুলে ঘোমটা দেওয়া বৌর মত নৌকা নাচে, পানকৌটী ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা—গাঙশালিক? ছেলেরা উঠোনে তেমনি কাণামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? হ্যাঁরে আর তেমনি কাঠগোলাপ ফোটে—সজনে ফুল? হাওয়ায় তেমনি পাটের থোপা দোলে আর? সালিধানের চিরা পাওয়া যায়? কাউনের চাল?" কি সুন্দর গ্রাম্য চিত্রের বর্ণনা! বিদির পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের এ সৌন্দর্য্যের স্মৃতি বড়ই শোভনীয় হইয়া লেখকের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "চিরা" পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় খাদ্য বিশেষ। 'চিরা' শব্দের অর্থ—বলপ্রয়োগে উন্মুক্ত করা অর্থাৎ যাহা বল প্রয়োগে উন্মুক্ত করা হইয়াছে (ধান হইতে বল প্রয়োগে বাহির করা হইয়াছে ইত্যর্থ)। 'চিরা' শব্দ অপ-প্রয়োগ বা অশ্রাব্য হয় নাই। কবি ৺মদনমোহন সেন "রএর উড়িষ্যা যাত্রায়" লিখিছেন যে, গোয়ালন্দ ষ্টেশন হইতেই "র"টী 'ড়' হইল:—

> "এই এঁড়েদহ, এই পোড়াদহ
> এই গড়ুইএড় পোল,
> কানে গড়গড়, দাঁতে কড়কড়
> কড়েসে মাছেড় ঝোল।"
>
> * * * *
>
> "জগন্নাথেড় পণ্ডাড়া তখন
> নামাইল ধড়াধড়ি।"

'এঁড়ে' বাছুর বলার চেয়ে 'ষাঁড় বাছুর' বলা বোধ হয় শুদ্ধ। দেশ বিশেষে একার্থ বোধক ভিন্ন শব্দ এবং একার্থ বোধক ভিন্ন বানানযুক্ত একই শব্দ প্রায়শই দেখা যায়। "কাউনের চাউল" শুনিতে যেমন মিষ্টি ও স্বাভাবিক লাগিয়াছে, 'চিরা'ও তেমনি অপ-প্রয়োগ হয় নাই। 'নায়রী' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়:—

> "খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে ঘর কর,
> বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র।"
>
> (কবি কঙ্কণ)

হিন্দিতেও 'নৈহর' শব্দের অর্থ পিত্রালয়। নায়রের স্ত্রীং নায়রী। লেখকের কি অপরাধ হইয়াছে?

প্রভাতের সঙ্গে অশ্রুর "প্রথম দেখা ট্রেনেই।" "কোণের ঐ ছেলেটীর দিকে চেয়ে কেমন ওর একটু ভালো লাগ্‌লো - এমনিই।" প্রথম দর্শনেই একটু ভাল লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। মানুষের মনের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন ভাবের সঙ্গে ঐ নূতন মুখখানির কোনও বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে কখনো চিন্তাই করে নাই। প্রত্যহ শত শত মানুষ দেখিতেছে, কিন্তু মনের শত শত ভাবের মিলন মাত্র ঐ একখানি মুখে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সম্বন্ধ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং অতি সহজেই ঐ মুখ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু 'অশ্রু' বুঝিল না কেন এমন হইল; তাই ভাবিল - "এমনিই"। "পাতাবাহারের চেয়ে ভাল বনতুলসী।" কথাটা অতি সুন্দর - অতি পবিত্র। এরূপ উপমা একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তই দিয়াছেন—'তুলসীর মূলে যেন সুবর্ণ দেউটী।" অশোকবন বাসিনী সীতার সহিত পবিত্র তুলসীর উপমা অতি শোভনীয় হইয়াছে এবং এরূপ উপমা বোধ হয় প্রথম মধুর কলমেই মধু ক্ষরিত হইয়াছিল। লেখকের এমন ধারা আর একটা কথা ভারি সুন্দর লাগিয়াছে,—"অশ্রুর হৃদপিণ্ড পূজার ঘণ্টার মতো বেজে উঠ্‌ল।" এ যেন মন্দিরে প্রাণের ঠাকুরের আরতির শঙ্খ ঘণ্টার বাজনা। ঘুমন্ত হৃদয় দেবতা ঘণ্টাবাজিতেই জাগিয়া উঠিলেন 'যেটুকু বেজুত লাগ্‌ছিল,—ঠিক হয়ে গেল।"

"আমাদের ছোট-খাটো স্নিগ্ধ সংসার শান্তিনিকেতনই ভালো।" কি সুন্দর আদর্শ। বি, এ পাশ করা মেয়ে ছোট কু'ড়ে ঘরে বড় মন নিয়া থাকার শান্তিটুকু বুঝিয়াছে। হিমগিরিস্থিত প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে চাহে না—চাহে পথপার্শ্ববর্ত্তী পত্রপূর্ণ বটবৃক্ষ হইতে, যাহার তলায় নিদাঘতাপ-দগ্ধ পথিক ক্ষণেক বিশ্রাম সুখলাভ করিবে। অতল স্পর্শী সীমাহীন সমুদ্র হইতে চাহে না—চাহে ক্ষুদ্র স্রোত-স্বতী হইতে যাহার সুশীতল বারি পান করিয়া পথিক সংসার যাত্রার পথে শান্তি পাইবে! "অশ্রুর কথাগুলি যেন মদের কৌটার মতো!" উন্মাদনা আসে। হর্ষজনিত সম্মোহের কৌটারই মত—আনন্দের একটা কণার মতই।

"হ্যাঁ, শেষে হোচট খেয়ে পড়ুন। সে সেবার ভার কিন্তু আমার ওপর নেই।" এ কিসের ইঙ্গিত? হোচট খেয়ে পড়লে পায়ে ব্যথা পওয়াটাই স্বাভাবিক, সে সেবার ভার নিতে—অর্থাৎ পদসেবার ভার নিতে অশ্রু রাজী নহে। ইহা মুখের কথা। অথচ প্রাণের কথা হচ্ছে—"আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে"—অর্থাৎ তোমার পদসেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতেও রাজী আছি। কিন্তু প্রভাতের ভাবটা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা; বাহিরে প্রকাশ নাই, অথচ সংযমের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে।

পিতার সঙ্গে দেখা। "রোগ শয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন - এবার কলা চোষ।" শরতবাবুর লিখিত 'দত্তা' বইখানিতেও রাসবিহারী বিলাসবিহারীকে বলিয়াছিল—"কুলধর্ম্ম করে বেড়াও গে।"

"এখানে কেউ ঘুমায় না, এই নিয়ম।" এই কয়টা কথায় প্রভাতের গভীর বেদনার একটা উচ্ছ্বাসই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। "আমি তোমার বুকের কাছে শুয়ে মরে যাব,—আর তুমি উলু দেবে।" প্রভাতের জীবন জোড়া দুঃখের মাঝে এই যে মরণের সাধ, ইহাতেও অক্ষয় স্বর্গ আছে। এই মুহূর্ত্তটাই তার সুখের চরম।

সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। বহুদিন হইতেই সুযোগ বুঝিয়া এই বাংলা ভাষার সহিত অনেক আদিম শব্দ যথা কুলো, কিচ্‌কিচ্‌, খাম্‌কা, সেয়ান, বেঁটে প্রভৃতি,—মুসলমান রাজত্ব কালে, আইন, আদালত, আবদার, কাগজ, কসুর, খবর, খরচ, নরম, ফুল, কণ্টক ইত্যাদি এবং ইংরেজী আমলে বহু ইংরেজী শব্দ যথা,—অফিস, ইস্কু, একার, কলেজ, কলেরা, কুইনাইন, ট্রেন, টিকেট্‌, টিন, প্রভৃতি আরো কত বিদেশীয় শব্দ বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইয়া চল হইয়া গেল, কিন্তু আম্র - আঁব, অজ্জ - আছে, অহম্মি —আমি, বহু—বৌ শব্দগুলি প্রাকৃত হইতে অপভ্রষ্ট হইল, তাহাতেও জাতি গেল না; কেবল প্রাদেশিক শব্দ প্রচলনের বেলায় চিরা, চিপা, চুল চিপ্‌তে, চণ্টা পড়া, টইটুম্বুর ইত্যাদি শব্দ একঘ'রে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আদিখ্যেতা, মাইরি, গ্যাছ্‌লো প্রভৃতি শব্দের আগমন কোথা হইতে? বাংলা ভাষার standard কি? শব্দ সম্পদে বাংলা ভাষা যে দীমা, তাহায় সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিদ্যাসাগরী আমল হইতেই শব্দ সংগ্রহ চলিয়া আসিতেছে।

"যেমন রাঙ্গা আম্‌লা, তুলে মমলা
গাম্‌লা ভাঙ্গেনা,
আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব
ঘুসী খেলে বাঁচব না।"

কবিবরের আমলা, মামলা, গামলা, ভুষি ও ঘুসি কোন্ সংস্কৃত শব্দ? অথচ সেকাল হইতেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। আশা করি কালে, চিরা, টইটুম্বুর, টব্‌গা ইত্যাদি অচল থাকিবেনা। কিন্তু "অশ্রু এবার মৌটুস্‌কি,"—"টাটু ঘোড়ার মতো বৌ টগ্‌বগ্‌ করে' ফেরে'—এসব বুঝিতে পারি নাই।

অচিন্ত্য কুমার সেন ও তদীয় সঙ্গবদ্ধ তরুণ লেখকগণের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র নাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকা ডুবির' তীব্র সমালোচনা ও যে হইয়াছিল, তাহাও বেশ মনে আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও "ভাল করে মুখস্তিবে পড়া" ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তি শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু—আজ—তাঁহারা প্রণম্য। কে জানে যে এই "মৌটুস্‌কি" লেখকও একদিন বরেণ্য না হইবেন। প্রতিভাবান ব্যক্তি একটা প্রবন্ধের জন্যও স্মরণীয় হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যে অসংযমীর স্থান নাই ইহা নিশ্চিত।

শনিবারের চিঠি—বৈশাখ, ১৩৩৫। প্রগতি সম্পাদক বুদ্ধদেব বাবুর 'কালো কলম' ও 'একটী মাসিক পত্রিকার' "নাম মুখে আনতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।" সেই মাসিক পত্রিকাখানিই বুঝি শনিবারের চিঠি, উক্ত মাসিকই অন্যত্র লিখিতেছেন—"সেই তথাকথিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে।" আলোচনা করা যাউক, 'তথাকথিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন" করা সঙ্গত কিনা এবং এরূপ আন্দোলনকারীর সাহিত্যক্ষেত্রে থাকার আবশ্যকতা আছে কিনা যদ্দ্বারা সাহিত্যিকের কলম লাল হইয়া উঠিতেছে।

বসন্ত মাষ্টারের 'সেকান্দরী কিল' হজম করতঃ class IX পর্য্যন্ত উঠিয়া যখন Hd. master মহাশয়ের রক্ত চক্ষু, বাক্যবাণ আর বাংলার সরু লিক্‌লিকে বেত্রদণ্ড যথাক্রমে নয়ন-শ্রবন ও দেহের গ্রাহ্য হইতে লাগিল, তখন ছাত্রের দল অতিষ্ট হইয়া কেহবা অন্যত্র চলিয়া গেল; কতক অনন্যোপায় হইয়া স্কুলেই রহিয়া গেল, আর কেহবা বিপথগামী হইয়া গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল। তখন অভিভাবকগণ প্রমাদ গনিলেন। প্রশ্ন উঠিল, কচি-কাঁচাদের শিক্ষার জন্য অন্য শিক্ষক আনা হউক, অথবা তিনিই যদি শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে রাজী হয়েন, তবে এ শিক্ষক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু স্কুল নষ্ট হইতে দেওয়া যাইবে না। ফলে শিক্ষকের শিক্ষার ধারাই পরিবর্ত্তিত হইল। আমার মনে হয়, "দেশ, কাল ও আবহাওয়ার দোষ" যখন সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেনই, তখন আন্দোলনের ধারা বদলাইতে আপত্তি কি? শনিবারের চিঠি বা এবম্বিধ মাসিকের আবশ্যকতা খুবই আছে। মাষ্টার চাইই। কিন্তু ছেলেরা না বিগ্‌ড়ায়। আমি আন্দোলন করিতে বলিনা—ধাকা চাই—শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা। বৃথা আন্দোলন প্রয়াশঃই কুফল প্রসব করে। নীরব কর্ম্ম ও অধ্যবসায়ই জয়কে বরণ করে। শনিবারের চিঠির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রোগীর মুখে ঔষধ তিক্ত লাগিবেই।

খাঁটী সত্য প্রকাশ করিতে দোষ নাই। কিন্তু কেহ কেহ প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের মত বর্ণনা দিয়া ইহারা সুস্থ দেহকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। "Realistic মহলে সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বিষয় স্বভাবতই নারী।" চিত্রকর যখন নিজের ইচ্ছামত কোন চিত্রাঙ্কন করেন, তখন প্রকৃতির চিত্রই তাহার নিকট লোভনীয় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও চিত্রকর শিক্ষকের আসনে বসিয়া বলিয়াছেন যে, চিত্রকর নারীচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যখন মাতৃভাব আনিতে পারিয়াছেন, তখনই শিল্পীর কলা-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু উলঙ্গবাহার কাপড় পরাইয়া নারীকে জগত সভার মাঝে দাঁড় করাইলে পরিণামে দুঃশাসনের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

মানুষের চিন্তা, কথা এবং কার্য্য মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই মুখদর্পনে প্রতিফলিত হয়।

কাজেই নারীর দৈহিক-সম্বন্ধ অঙ্কনেরও আবশ্যকতা থাকে। তবে সবুজ বা অন্য রঙ্গিন আবরণ দিয়া নগ্ন আলোর সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিলাম, কীট পতঙ্গ আসিয়া পুড়িয়া মরিতে পারিল না, এবং তজ্জনিত দুর্গন্ধে ঘরটীর বায়ু দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যহানি ঘটিল না।—সমাজ নিষ্কণ্টক রহিল।

"একযুগ আরএক যুগকে লুপ্ত না ক'রে আপনার স্থান পায় না…ইত্যাদি।" স্বীকার করি। নূতন যুগ-প্রবর্ত্তক যখন নূতন জিনিস লইয়া নবোদ্যমে দাঁড়ায়, তখন সে দেখ্‌তে পায় যে তার দাড়াইবার শীলাতল (foundation stone) প্রস্তুত হইয়াই আছে। এবং তার প্রচার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববর্ত্তীদের সহিত একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু "তার কোন এক ভবিষ্যত তার অতীতের চেয়েও" জীর্ণতর হয় না, যদি সে পশুবল লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে না নামে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীরা যখনই বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটা নূতন সত্য বস্তুর স্পর্শ প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতেছেন, তখনই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকর্ত্তা পরবর্ত্তীকে আসন ছাড়িয়া দেন। যতদিন না সে সত্যটী বোধগম্য হইবে, ততদিন বিদ্রোহ চলিবেই। আর যদি সেই সত্যপ্রসূনে লুক্কায়িত বিষধর তার বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার মৃত্যু অদূরে।

মিলন বাসর রাতে—

শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ।

ভরা পদ্মার দু'ধারে নিয়ত জাগিছে বালির চর,
সুখের সেতারে কে যেন কেবল চালায় ব্যথার ছড়।
মিলন বাসর রাতে
বিধবার বীণা নিঃস্ব-শয়নে কাঁদনের সুর গাঁথে।
সাগরের জল-উর্ম্মিতে ভুলোনা শাহারার খরা বুক,
মাধবীর মধু-মিলনে স্মরিয়ো প্রবাসীর ব্যথাটুক্।
তোমার সুখের উৎসবে শুনো ব্যথিতের কোলাহল,
শ্রাবণের নব প্লাবণে ভেবো বোকোকের ভূখানল।
অকালে শুকাল যারা
বিকশিত নব পুষ্প হেরেও মনে যেন রয় তারা।
যে নদী তাহার হারায়েছে গতি সাগরে মেশার আগে,
জাহ্নবী কল-উচ্ছ্বাসে যেন তাহাদের কথা জাগে।
হাসেনি যে আশাহত
তোমার হাসির বাঁশীতে তাদের জানিয়ো বুকের ক্ষত।
চোতের সবুজ সন্ধ্যায় ভেবো শীতের শিশির রাত,
গোধুলী শোভায় ভুলোনা রবির বুকের রক্তপাত।
মিলন বাসর রাতে
মনে রেখো কোথা কোন্ অভাগার নিঁদ্ নাই আঁখিপাতে।

শাস্তি।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অম্বিকাচরণ সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। অন্ধকার একটা ভাঙা আস্তাবলের ভিতর হইতে কে আর্ত্ত-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওঃ, আর যে পারি না! দয়া, দয়া, ওগো, একটু দয়া···"

অম্বিকা বাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভিতরে ঢুকিবেন কিনা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ আবার শুনিলেন, "ছুটির দিন কি এখনও আসেনি ভগবান্! তিন দিন উপোস, হাত গেছে, পা গেছে কিন্তু পেট যে যায় নি..."

অম্বিকা বাবুর মনের দ্বন্দ্ব মনেই রহিয়া গেল। ত্বরিত-পদে তিনি ভাঙা আস্তাবলটায় ঢুকিয়া পড়িয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইলেন। সেই ক্ষণিক আলোকে চকিত হইয়া ভিতরের লোকটী বলিয়া উঠিল, "কে, কে আসে গা!"

অনেক নভেল বোধ হয় পড়াছিল, তাই এ প্রথম সম্ভাষণের উত্তর অম্বিকাবাবু সেই ভাবেই দিলেন। "ভয় নেই, আমি বন্ধু!"

"বন্ধু, বন্ধু কে? এ জগতটায় বন্ধু বলে কি কারও কেউ আছে? মিথ্যে, মিথ্যে, সব ভুয়ো, সব ধাপ্পাবাজি :· সব..."

উত্তেজিত স্বর যেমন হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক্ তেমনই জুড়াইয়া গেল। তার স্থানে কাতরতাভরা-কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, "না, না, না, ভুলে গিয়েছিলুম! তুমি আছ, দেবতা, জগতে কেউ না থাকলেও, দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা তুমি, তুমি আছ!!"

দেশলাইয়ের ক্ষীণ আলোকে অম্বিকাবাবু যাহা দেখিলেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন! হাতের কাঠিটা নিভিয়া গেলেও সে বীভৎস দৃশ্য তখনও তাহার চক্ষের সম্মুখে খেলা করিয়া ফিরিতেছিল। নিশ্বাস ছাড়িয়া আপন-মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কী ভয়ানক, ওঃ!"

লোকটী 'হো হো' শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে বিকট হাসিতে স্থানটা যেন গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

জল, খাবার ও বাতি লইয়া অম্বিকাবাবু দ্বিতীয় বার যখন নিকটে আসিলেন, তখন সতৃষ্ণনয়নে সেগুলির দিকে চাহিয়া লোকটী বলিল, "নেহাৎ বাজে খরছা করে ফেল্‌লেন বাবু। আগে শুনুন, তারপরও যদি দয়া থাকে, বল্‌বেন, খাবো। কিন্তু, না, না, তার আগে নয়, কিছুতে না?"

সেই গলিত হস্তপদ বুভুক্ষু কুষ্ঠীর ভিতরেও যে এত বড় প্রলোভন জয় ক্ষমতা আছে দেখিয়া অম্বিকাবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহার কথাগুলি শুনিবার অদম্য কৌতুহল ও তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "যদি একান্তই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে বল, শুনি।"

লোকটী একটু দূরে অম্বিকাবাবুকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "ভয় নেই বাবু, এ ছোঁয়াছ আপনার গায়ে লাগ্‌বে না, কত বড় পাপের সাজা তা যদি জান্‌তেন,..." বলিয়া খানিক সে নীরবে কি চিন্তা করিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল।

"গ্রামের নাম শ্রীপুর, শ্রী কিন্তু তার অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের জমিদার যদি অত্যাচারী হয় বাবু, সেখানে কি লক্ষ্য থাকে? মনিব যদি করেন এক গুণ; চাকর লোকজন করে শতগুণ? পাঁচ ভূতের জ্বালায় গ্রাম শ্মশান না হয়ে আর যায় কোথায়?

"শ্রীহরের দশা ঠিক্ এমনই হয়েছিল, এই সময় আমি আসি। পশ্চিমে ঘর-বাড়ী, যুবতী বৌ সব ছেড়ে...পয়সার লোভে বাবু, পয়সার লোভে! এ শয়তান যার ঘারে চেপেছে বাবু, তার কি সুস্থির হবার যো আছে?

"বোলছিলুম, দশ বিঘে ক্ষেত, ভাগীদার কেউ ছিল না। লোকজন নিয়ে নিজে চষ্‌তুম, মেহন্নতে সোনা ফল্‌ত বাবু, সোনা ফল্‌ত। আকাশের মুখচেয়ে বসে থাকতে হ'ত না; সামনেই নদী, তবে বলে কখন কখন যা কিছু গোলযোগ লাগাত।...তাতেই অতিষ্ট হয়ে উঠ্‌তুম; আরও পাঁচজনে বাঙলা থেকে ফিরে গিয়ে গল্প যা বলত তাতেই......

"এসে দেখলুম, সত্যিই বাঙলায় পয়সা উড়ছে; কেউ ধরতে জানে না। চক্ষুলজ্জা আর মান-সম্ভ্রম ভয় জড়িয়ে তারা পড়ে আছে। তাদের কাছে হয় ত সেগুলো বড় হ'তে পারে, কিন্তু আমরা বিদেশী, ও বালাই আমাদের থাক্‌বে কেন?

"আস্‌বার সময় বাড়ী মুখে প্রাণ নিয়েই এসেছিলুম বাবু, তাই মাইনে সবে বার টাকা হলেও প্রথম প্রথম সব মাসেই অন্ততঃ বার গণ্ডা টাকা দেশে পাঠাতে ভুল কর্‌তুম না। কোথায় পেতুম!—বললুম ত অত্যাচারী মণিবের তাঁবে থেকে প্রজার রক্ত শুষে খেতে একতিল আমরা উদাস ছিলুম না। সবে এ পথে পা দিয়েছি, তাই ভয় কর্‌ত। কেমন মায়াও যে হ'ত না, তা নয়। তবে বিদেশীর এসব ঝঞ্ঝাট ভাল নয় বলে মনকে প্রবোধ দিতুম। আবার দেশের পাঠান টাকার রসিদখানা হাতে পাবার আশায় হাঁ করে পথ চেয়ে থাক্‌তুম। জানি, কোম্পানীর ঘর, তবু, কেমন ভয় কর্‌ত, যদি ভোগে না আসে? যদি, মাঝ রাস্তায় পাঠান টাকাটা উরে যায়। এ চোরের ওপর যদি কেউ বাটপাড়িই করে বসে.........

"ক্রমে সয়ে গেল! তখন দুচার টাকায় আর মন উঠ্‌ত না, এ দিকে হাতে উপরি পয়সা এলে যে সব রোগ হয়, একটার পর একটা এসে দেখা দিতে লাগ্‌ল! দেশ, পরিবার, মা একে একে সব ভেসে চল্‌ল বাবু আমি রীতিমত......"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল। বুঝি হারাণখেই খুঁজিয়া বাহির করিবার আশায় মুক্ত দ্বার পথে পাগলা হাওয়ার তালে বার কয়েক হাঁ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া লইল। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ব্যথার তাড়নায় অস্থির হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবু বেঁচে আছি, ধন্য এ প্রাণকে......এই হাতে ঘর জ্বালিয়েছি, বেচারীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, ছোট ছেলের গলা এমনই করে টিপে......ভাবলুম, দিন বুঝি এমনই করেই কেটে যাবে; কিসের ভয়! জীবনের চাকা একদিন যে গড়িয়ে ভিন্ন পথেও চল্‌তে পারে, সে কল্পনাই আস্‌ত না। আস্‌বে কোথা থেকে, অন্ধ যে, সে কি কখন সূর্য্যের আলো দেখ্‌তে পায়?

"মনিবের প্রিয় হ'তে একতিলও দেরী হ'ল না। ক্রমে তাঁর অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটাবার ভার আমারই ওপর পড়্‌ল। গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে পাগ্‌ল। আমার কিন্তু মহাস্ফূর্ত্তি ......"

"সেদিন" বলিয়া সে খানিক নীরব রহিল।

"তারপর সেদিন বামুনেদের বিধবা বৌকে নিয়ে আসার ভার পড়্‌ল!......রাবণের সীতা হরণের মত আমিও তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে এলুম।......

"সে অপমান সে সহ্য করতে পার্‌লে না, কেঁদে অভিসম্পাৎ কর্‌লে কায়মনোবাক্যে যদি সতী হই......

"হেসে উঠ্‌লুম, বল্‌লুম, 'সে সতীত্ব এই মাত্র ধুলোয় লুটিয়েছে তাত জান্‌ছ; আর কেন, কিসের গুমোর .....'

"ডাক্ ছেড়ে সে কেঁদে হাত দু-খানা ওপর দিকে তুলে বলে উঠ্‌ল, 'ভগবান্, তুমি কি নেই?'

'হো হো' করে হেসে উঠে বল্‌লুম, 'ওটা কোন দুর্ব্বলের চালাকি বুঝ্‌লে! মোটের ওপর সব বাজে, সব ঝুটো, সব......'

"নিশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে, 'ঠাকুর, বুঝ্‌লুম, তোমার বাজের আগুণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নইলে......'

"আমি তেমনই হেসে বল্‌লুম, 'সে অনেক কাল। আপাততঃ, আমার কাছে যা হবার তা'ত হ'ল, এখন মনিবের কাছে বল!'

"তিন দিন কাটেনি! সত্য বল্‌ছি, তার সে গুমরে-পড়া দেহটা মনিবের ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌বার পর তিন দিন কাটে নি!......পরে শুনলুম আর বেশী অত্যাচার সহ্য তাকে করতে হয়নি, পথেই বুক ফেটে সে মারা গেল...... সে দিন হাস্‌তে পেরেছিলুম বাবু, আজ কিন্তু তা পারি না; কারণ, সত্য মূর্ত্তি ধরে আজ আমার পাপের দণ্ড দিতে এসেছে!......

"হ্যাঁ, তিনটে দিন আমি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই ছিলুম। বাদাম পেস্তার সিদ্ধি ভাল ভাল ওড়াতুম, আর হজম করবার জন্যে......কিন্তু, তিনদিন মাত্র তিনটে সূর্য্যের আলো আমার অক্ষত রাখ্‌তে পেরেছিল! তারপর......

"দেখ্‌তেই পাচ্ছেন তারপর কি? হ্যাঁ, কি করে হ'ল তাই বলছি, দেবতার কোপ যখন সাধ করে কিনে এনেছি, তখন……তবু উপলক্ষ্য, হ্যাঁ, তাও একটা আছে।

"সেদিন কিছুতেই আর স্বস্তি আস্‌ছিল না। তিন তিনটে পালোয়ানকে কসরতে হারিয়েও 'দম্‌' হয় নি। কোদাল হাতে মাটি কোপাতে লেগে গেলুম। সেই হ'ল কাল।

"বাবু দূর থেকে হয়ত দেখেছিলেন, কাছে এসে উৎসাহ দিয়ে বল্‌লেন, এমন কোপাতে পার তুমি রাম সিং, আর পেছনের বাগানটা রদি হয়ে পড়ে আছে! একটু যদি দেখ……

"স্ফূর্ত্তি দেখে কে, আমি তখনই লেগে গেলুম। বাবু মানা করলেন; বড় বড় সাকরেদেরা হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিতে এল! দু'জন বুড়ো আমার বাপের বয়সী হবে, বল্‌লে, 'গরম হয়ে গেছে বাচ্ছা, আর নয় ছোড়্‌…"

"আমি ঠাট্টা করে বল্‌লুম, 'এ তোমাদের ঠাণ্ডা রক্ত নয় দোবেজী, আমি এখন পাঠ্‌ঠা গরম হতে ঢের দেরী?'

"সকলের নিষেধ না শুনে গিয়ে একখানা এতটুকু কাঁচের আচড়ে এই পা খানা জখম করে এলুম! রক্ত আর থাম্‌তে চায় না! কত ডাক্তার, বদ্দিই এল, সাক্‌রেদেরা কত জলপটিই বাঁধলে! কিন্তু দেখ্‌ছেন ত অবস্থা? বলুন, বলুন, বাবু, এর পরও কি এ পাষণ্ডটাকে আপনার দয়া হয়? খেতে দিতে হাত উঠে?…"

অম্বিকা বাবু উত্তর দিবেন কি, তাঁহার সে শক্তি তর্খন একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে!

মুক্তি গীতি

শ্রীমতী শরৎকামিনী সেন

(১)

নিদাঘের ভীষণ দাহনে
মনে হ'ল অধীনতা জ্বালা
বরষার ঘন বরিষণে—
মুছিল না হৃদয়ের ম'লা।

(২)

শরতের শিশির সম্পাতে
জাগে যবে মুক্তি পুরুষ,
হিমানীর কৃপাণ সঙ্ঘাতে
আর্য্য নারী হয়নি বেহুস্।

(৩)

বরফের চাপা বক্ষঃ তলে
লক্ষ বলির করি আয়োজন,
বসন্তের ফাগ্‌ মাখি ভালে
জননীরা হেসে হেসে বলে
রক্ত গঙ্গা হল আয়োজন।

সম্পাদকের রায়

বাঙ্গলার পাটের চাষ সম্বন্ধে এত দিনে কংগ্রেসকর্ম্মীর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সত্যিকার কাজ যদি কিছু করিবার থাকে তবে প্রথম কৃষি ও পরে শিল্প। বাঙ্গলার পাটের চাষ যদি Control করা যায়, তাহা হইলে পাটের বিক্রীটাও হাত করা যাইবে এবং ইচ্ছামত মূল্য দিয়া বণিকগণ নিতে পারিবে না, পরন্তু middle man (মধ্যবর্ত্তীদের) দের হাতে পড়িতে হইবে না বলিয়া কৃষকগণ পাটের মূল্য বেশীই পাইবে। কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা হইলে, মহাজনের ঋণ, জমীদারের খাজানা দিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিবে, তাহা দ্বারা ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেও পারিবে। কিন্তু এই সঞ্চয় সম্বন্ধেও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। মোট কথা, কংগ্রেস যদি এ কাজ হাতেই নিয়াছে তবে সবদিক ছাড়িয়া একনিষ্ঠ কর্ম্মী দ্বারা যদি কৃষকদের সংগঠন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে দেশে Common wealth বাড়িবে ও অন্ন সমস্যার (Bread question) সমাধান হইবে। অবশ্য বেকার সমস্যাও ইহার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। পাট সম্বন্ধে, বিগত আশ্বিন মাসের পূজায় Forward পত্রিকায় শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, যে suggestion দিয়াছিলেন তাহা মূল্যবান মনে করি।

পাটের চাষ কমাইয়া দিলেই হইবে না। ব্যাঙ্কও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক Jute Centre গুলিতে গোলা স্থাপন করতঃ কৃষকদের উচ্চদরে পাট বিক্রীর ব্যবস্থাও করিতে হইবে। নতুবা ব্যবসায়ীগণ সংঘবদ্ধ ভাবে অনুগ্রহ করিয়া যে দর নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তাহাই তাহাদের দয়ার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের অন্ন সমস্যা দূর করিতে হইলে, শিল্পোন্নতি চাই। বাঙ্গলায় [illegible] আছে, [illegible] হইতে [illegible] থাকি। অথচ চটকল করিয়া অন্ততঃ দেশের ছালাগুলিও তো বিক্রী চলে। তাহাতে হাজার হাজার লোক খাটিয়াও খাইতে পারে। যে সব জেলায় সুবিধা আছে, যেমন—নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে চটকল করিয়া কাঁচা মালগুলির দ্বারা ছালা ও চট করিতে পারিলে সত্যিকার কাজ হইত। এক ঢাকেশ্বরী মিল হওয়ায় বহুলোক খাটিয়া খাইতেছে। আরো ২।৩টী চটকল হইলে পাটের বাজার চড়িয়া যাইত। প্রতি বৎসর প্রায় ১১০০ খানা চট ও ছালার তাঁত বাড়িতেছে। কলিকাতার চটকলগুলি প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা রিজার্ভ ফণ্ড রাখিয়াও লভ্যাংশ কোটী কোটী টাকা বিভাগ করিয়া দিতেছে। অবাক হইতে হয় যে, ১৯২০ সনে 'কিনিসন মিল' (Kinnison) শতকরা চারিশত টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। গৌরীপুর জুট মিলের রিজার্ভ ফণ্ড (Reserve other funds) সওয়া দুই কোটী টাকার মত। এসব দেখিয়া শুনিয়াও কি দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে না? কাউন্সিলে গিয়া গলাবাজী করিয়া যে কাজ কিছুই হয় নাই, তাহা কি এতদিনেও দেশের নেতারা বুঝিল না? কিন্তু একটা প্রবল নেশা! সুভাষবাবু যতদিন জেলে ছিলেন, ততদিন তো কোন কাজ করেন নাই—কাউন্সিলেও যান নাই, এখনো কাউন্সিলে না গিয়া বাঙ্গলার পল্লি সংগঠনই করুন। তারপক্ষে যেয়র না হওয়াটা ভালই হইয়াছে। বাঙ্গলার পল্লীজননী তাহাকে ডাকিতেছেন, তিনি বদ্ধ থাকিতে পারেন কি?

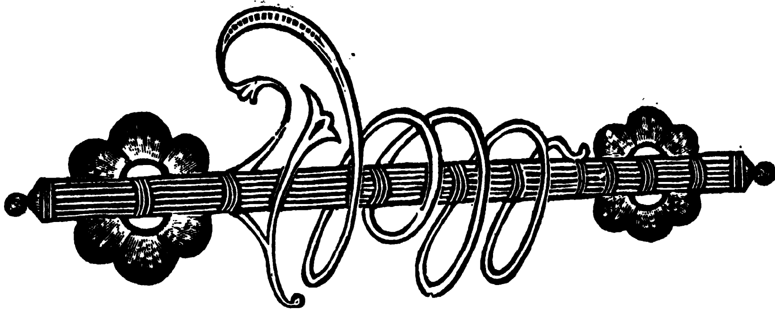
বাংলায় অর্থের অভাব নাই কর্ম্মীরও অভাব নাই। প্রত্যেক জিলা কংগ্রেসগুলি শিল্প বিষয়ে অবহিত হউন [illegible] লোক [illegible] রাখিতে পারিলে অন্ন কষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে চুরি ডাকাতি বাড়ির

যাইবে। দেশের বহু যুবক আধলক লেখাপড়া শিখিয়া নিরুপায়—কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া আছে। দুঃখ দৈন্য আরও বাড়িয়া যাইতেছে। বিপদ হইয়াছে মধ্যবিত্ত লোকদের। একসঙ্গে কন্যা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি কত কি যেন চারিদিক হইতে গ্রাস করিতে উদ্যত। যে নিজকে নিজে সাহায্য করে, ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। নিজের পায়ই দাড়াইতে হইবে। দেশের ধনিক ও শ্রমিক মিলিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে উভয়কেই মরিতে হইবে।

বাণিজ্য বলিতে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের আদান প্রদান। এবং ঐ সকল দ্রব্য আনা নেওয়ার যান বাহনাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি ভারতের নিজস্ব তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। অন্য দেশ যেমন আমাদের কাছে পাকামাল (Finished manufactured goods) পাঠায় আমরা তৎপরিবর্ত্তে তেমনি কাঁচা মাল (Raw produces) পাঠাই। ইহাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ অতি সামান্যই। লোহার কারখানা, কাঁচের কারখানাগুলি হইয়া কতকটা টাকা দেশে থাকিয়া যাইতেছে বুটে এবং চা পাঠাইয়া বিদেশের টাকা আসিলেও পাট চামড়া গম প্রভৃতি শস্য সস্তায় পাঠাইয়া অতি অল্প টাকাই আসিতেছে।

'চট্টগ্রাম পোর্ট' বর্ত্তমানে বাঙ্গালার খুব বড় অন্যতম (মাল বিদেশে বাণিজ্য করিবার) 'বন্দর'। রেঙ্গুন হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর (Pacific Ports) গুলিতে মাল পাঠানো পূর্ব্ববঙ্গের মহাজনদের খুবই সুবিধা হইয়াছে এ সময় দেশীয় বৈশ্য সাহা মহাজনগণ শিল্পোন্নতির দিকে চেষ্টা করুন না। সাহস করিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিবার এ সুযোগ ত্যাগ না করিতে অনুরোধ করি।

অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব মুখ্য না হইলেও ইহার গৌণ কারণ। আমার মনে হয় সামাজিক খাঁটী সরকারের দিকে যতটা না গিয়াছে, ঈর্ষা সমাজকে ততটা অন্যদিকে নিয়াছে। বাস্তবিক উন্নতি যদি মানুষ চাহিতই তবে পেটের সংস্থান ঠিক রাখিয়া অন্য সব করিত। যে দেশে 'অন্নচিন্তা চমৎকার' সে দেশের লোক কি করিয়া দলাদলিতে যোগ দিয়া সমাজের উন্নতির চিন্তা করিতে পারে। ইহার মূলে জন কয়েক লোকের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতাই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত জাতীয়তা যদি জাগিয়া উঠে, সে তো ভাল কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে উপনয়ন রূপ সার্টিফিকেট নিয়া অশৌচ কমান ব্যতীত আর কিছু সামাজিক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হিন্দুর কর্ম্ম, পতিত—অন্ত্যজ হিন্দুর মধ্যে জ্ঞানদান দ্বারা জাতির উদ্ধার করা। সমাজের নেতাগণের সে প্রচেষ্টা আছে কি ? কেবল 'আমি তোমার বলে বড়' ইহা ব্যতীত অন্য কথা কারো মুখে নাই। তাই হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা।



তৃতীয় বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৫ [১১শ সংখ্যা

বাদল-বেলার অন্ধকারে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদলবেলার-অন্ধকারে সাগর-তীরে একা'
পেলাম তোমার দেখা।
তরঙ্গেরি রঙ্গভরা—আঁখির পানে চেয়ে,
দেখ্‌ছ' কারা আস্‌ছে ধেয়ে আপন তরী বেয়ে
ধূসর বালুকায় ;

লুকিয়ে বসে এক্‌লা আমি দেখ্‌ছি গো তোমায়।
দিনের আলো পালিয়ে গেল জ্বালিয়ে কালো বাতি,
মন-গহনে কোন্, পাগলের এমন মাতামাতি!
কাজল আঁধারে

না জানি হায় কোন্ তরুনী আস্‌বে এপারে?
বসে' আছ আজ্‌কে তুমি অন্ধকারের মাঝে,
শূন্য জুড়ে' গভীর সুরে বাদল ভেরী বাজে!
ক্ষ্যাপা পবন আন্‌ছে বয়ে' মেঘের-মেলা ওই,
লেখা আছে ওইতে তোমার প্রিয়ের হাতের সই।
অমন করে করুণ-ভরে বাদল-আঁধারে,
চেয়ো না আর পথের দু'ধারে!

দেখ্‌ছ' না ওই দূরে,
শাল তমালের সুর মিশেছে বাদল ধারার সুরে !
ওই সুরে মোর পাগল হিয়া যায় গো ভেসে যায়,
কোন্ সীমানার আড়াল হ'তে কে ডেকেছে হায়।
সেই পুরানো প্রিয়ায় আমার লাগছে না ভালো,
সাগরকুলে আপন ভুলে এসেছি তাই খুঁজতে সে আলো
সেই আলো ওই তোমার আঁখি তারায়,
আজ্‌কে মোরে পথ দেখায়ে যায় নিয়ে যায় কোন সুদূরের সীমায়
সেই আলো মোর লাগ্‌লো ভালো
মন মাঝারে,
কোম্ তরুণীর আনাগোনা
অন্ধকারে ?
বুঝ্‌তে নারি পরাণ কোণে কাহার ব্যথা ?
নিঃশ্বসিয়া বইছে কেবল করুণ কথা !
বাদল-ব্যথার সুরে সুরে
কে কাঁদে আজ পরাণ-পুরে ?



বাঙ্গালা ও আসামে বিধবা-বিবাহ*

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কোন কোন পরাক্রান্ত অনার্য্য নৃপতি বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরূপ রীতি যে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতায় সংঘটিত হইয়াছিল, প্রণিধানপূর্ব্বোক বিচার করিলে তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেহ কেহ বলেন—"মহাভারতে আভাষ পাওয়া যায়, দময়ন্তী জানিতেন নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলেও জীবিত ছিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর পিতা ইহা জানিতেন না। মহাভারতের যুগে বিধবা বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকিলে দময়ন্তীর পিতা তদীয় প্রাসাদে সয়ম্বর সভার অধিবেশনে বাধা দিতেন। যাহা হউক, অনার্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের কোনরূপ আভাষ এই দুই প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত কলিযুগে 'নিয়োগ" পদ্ধতি রহিত হইয়াছে। ইহা বিবাহের অন্যতম পদ্ধতি বিশেষ নহে। অপুত্রক বিধবার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে তাহার দেবর অথবা জ্ঞাতি উপগত হইতে পারিত। এই প্রথাকে নিয়োগ এবং এই বিধবার গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে "ক্ষেত্রজ" বলে। নিয়োগ প্রাপ্ত রমণীকেও বিধবার যাবতীয় আচার পালন করিয়া চলিতে হইত। আদিত্য পুরাণের মতে নিয়োগ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

কোন স্মৃতি শাস্ত্রকার "বিধবার বিবাহ হউক" বলিয়া স্পষ্টভাবে কোন বিধিবিধান দেন নাই। মনু বিধবা বিবাহের কর্ত্ত্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন, "বিধবা বিবাহের কোন শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি নাই।" আপস্তম্ব স্মৃতিতে বিধবার পক্ষে দুইটী পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী সহমরণ এবং আর একটী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই :—

গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥ ২৭

অর্থাৎ—স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া গেলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে অথবা পতিত হইলে, এই পঞ্চবিধ আপদে স্ত্রীলোকদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে। এখানে উল্লেখ যোগ্য—শ্লোকস্থ "পতিতে" অর্থে পতিত হইলে, অর্থাৎ স্বামী শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার অথবা সংস্কার ভ্রষ্ট হইলে নারী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে। এক্ষনে কথা হইতেছে—বর্ত্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তি বেদবিহিত আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করেন না? এরূপ স্থলে নারীমাত্রকেই পুনর্ব্বিবাহের বিধিব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত "পঞ্চাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে" এই উক্তির অন্তর্গত পতি শব্দে ঠিক স্বামী বুঝায় না। বাগদানের (১) পর পাত্রকেও যে পতি বলিয়া অভিহিত করা চলে, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যা। সুতরাং পরাশরের এই বিধানটী বাগদত্তা কন্যা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে নহে।

যে নারী অন্য ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করে সাধারণতঃ তাহাকে 'পুনর্ভূ' "বলে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কি অক্ষত যোনি, কি ক্ষত যোনি, যে স্ত্রীর

* এই প্রবন্ধটি "বঙ্গীয় গ্রন্থকার সমিতির উদ্যোগে লেখক কর্ত্তৃক কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিটিউটে পঠিত হইয়াছিল।

(১) বাগদান—প্রায় ৫০ বৎসর (অর্থাৎ প্রায় ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের) পূর্ব্বে বৈদিক কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বে

পুনরায় বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভ বলে। প্রমাণ যথা :—

"অক্ষত চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতঃ পুনঃ॥" ১।৬৭
যাজ্ঞবল্ক্য

বশিষ্ঠ বলেন :—

পাণি গ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭ অঃ

অর্থাৎ—পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

মহাভারতের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগ হইতে হিন্দুর সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে সকল জাতির লোকেরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ আমোল পায় নাই। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়—উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা ছিলেন সংযমী। তাঁহাদের সামাজিক রিতি-নীতি সাত্বিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা বিধবা কন্যাদিগকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ইহার ফলে ঐ কন্যাদিগের মনে সংসার অসার, ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দ কিছুই নহে এইরূপ বোধ হইলে, ভগবৎ চিন্তা মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহাতেই তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭৫৬ সালে ঢাকার রাজা রাজবল্লব রায় বাহাদুর বৈধব্যদশাপন্ন তদীয় কন্যার পুনর্বিবাহ প্রদানার্থ ইচ্ছুক হইয়া তৈলঙ্গ, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সকল অধ্যাপক মহাশয় রাজা বাহাদুরের মতানুকূল স্মৃতিসম্মত বিধিবিধান না পাওয়ায় বহু আলোচনার পর পরাশরের উক্ত বিধি ব্যবস্থাটী প্রদান করেন। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, অক্ষতযোনি বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসিদ্ধ। স্বামী সহবাস ঘটিয়াছে, এমন কোন বিধবার বিবাহ তিনি সমর্থন করেন নাই, বরং তাহাতে প্রতিকূল অভিমত প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এই মহাত্মার উক্তি প্রণিধান যোগ্য।

বহুকাল হইল বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ অতীব গ্লানিকর কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে তথাকথিত বৈষ্ণব ও কাওরা ব্যতীত অতি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও আমরা বিধবা বিবাহ দেখিতে পাই নাই। মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অথবা উঠাইয়া দিতে বলেন নাই। তথাকথিত বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছানুযায়ী কণ্ঠিবদল করিয়া বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। ১০।১১ বৎসর (অর্থাৎ—১৯১৭—১৮ সাল) পূর্ব্বে কোন কোন কাওরা জাতীয় বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের কথা আমরা শুনিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সমাজ হইতে এই প্রথাটী ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজে আজিও বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের কয়েক জন উচ্চ শিক্ষিত নমঃশূদ্র বিগত ১৯২৪—২৫ সাল হইতে তাঁহাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনার্থ সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। আমরা জানি—তাঁহাদের চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের কয়েকটী স্থানে বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বিধবা গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে পৌনর্ভব বলা হইত। বর্ত্তমানে (অর্থাৎ ১৯২৭ সাল) বঙ্গদেশে এই পুত্র কি উচ্চ-শ্রেণীর কি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য? যাহাতে বিধবার গর্ভজাত ভ্রূণহত্যা সংগোপনে না হয়, এজন্য কিছু দিন হইল নবদ্বীপ ধামে "মাতৃ মন্দির" নামক একটী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাগদান হইত। কোন কারণে যে সকল কন্যার বাগদত্ত পতির সহিত বিবাহ হইত না, সেই সকল কন্যার পিতামাতা সমাজে পতিত হইতেন। অতঃপর তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী সমাজে গৃহীত হইলে ঐ কন্যাগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতেন না।—লেখক :-

উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে সচরাচর দেখা যায়—যদি বিধবার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে কি পিত্রালয়ের, কি শ্বশুরালয়ের আত্মীয়রা সাধারণতঃ তাহাকে গলগ্রহ ভাবিয়া তাহার সুখ-দুঃখে ঔদাসিন্য দেখাইতে থাকে। তখন বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়া বোধ হয় *। অধিকাংশ সংসারে পিতামাতার অবর্ত্তমানে বিধবার দুঃখ-কষ্টের পরিসীমা নাই। আর এক কথা—অল্প বয়স্কা বালিকা, বিধবা হইবার পর পিতামাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের নিকট নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইল না কিংবা তাহার কোন আদর্শ চরিত্রা সঙ্গিনী মিলিল না। যৌবনে মানসিক বৃত্তি নিচয় প্রবল থাকে। সঙ্গিনীগণের বেশভূষার পারিপাট্য দর্শন ও বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের নিকট স্বামীর নিত্য নূতন আদর সোহাগের কথা শ্রবণ দ্বারা অনেক সময় যুবতী বিধবাদিগের মানস ক্ষেত্র হাহুতাশে বিক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভবপর। ইহার দ্বারা মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকৃত হইয়া থাকে। ৫০।৬০ বৎসরের কোন কোন বিপত্নীকে দারপরিগ্রহ করিতে দেখা যায়। তাহার অন্তিমকাল আগত প্রায় তথাপি তিনি সংসার বাসনা ও সুখের আশা করেন, হিন্দুসমাজে সে বিষয় কর্ত্তব্য নহে। আর দুষনীয় হইল অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ দেওয়া!! আমাদের বিশ্বাস—সমাজ সংস্কার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হইলে সমাজে বয়স্থা বিধবার বিবাহও ক্রমশঃ আমোল পাইবে, হিন্দুর বড়ই গৌরবের এই সাবেক প্রথাটী বিলুপ্ত হইবে।

অধুনা পাশ্চত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশের কোন কোন ব্যক্তি—(যাঁহারা নামে হিন্দু, আচারে হিন্দু নহেন) – বলিতেছেন :—"প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মলোপ পাইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে ভাবের মতিগতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আদর্শ নিয়মপ্রণালীর ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে পূর্ব্বের মত বিধবার আদর্শ পিতামাতা পরিলক্ষিত হইতেছে না এবং "আপনি শিখান ধর্ম্ম আপনি আচরি" এই মহান ভাব এককালে যাহা তাঁহাদের অন্তর্ণিহিত ছিল, এখন তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এ কারণ সাবেক বিধি ব্যবস্থা জাহান্নামে গিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং বিধবা বিবাহ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত।" এই অভিমতের মিমাংসা সুধিগন করিবেন। ইহাদের (২) সমাজ গঠন, জাতীয়তা সংগঠন এবং নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। এই কয়টি বিষয়ের সুফল উৎপাদনে ইঁহারা যদি প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে হিন্দুর বিলুপ্ত গৌরব ক্রমশঃ উন্মেষ লাভ করিত। সত্য কথা বলিতে কি—ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধোপা, মেথর ও বিধর্ম্মীর সহিত একত্রে ভোজন করিয়া জনসাধারণের নিকট আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন—অথচ সাধারণ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য উপলক্ষে ইঁহাদের বাড়ীতে গিয়া ধন্না দিয়াও সাক্ষাৎ পান না।

আসামে ব্রাহ্মণ, 'খাতি' (বিশুদ্ধ) কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ (গনক) ব্যতীত কলিতা, কেওট, নাজিত, কুমার, নট প্রভৃতি জাতির সমাজে বিধবা বিবাহ' প্রচলিত আছে। আসাম কলিতা প্রধান দেশ। ইঁহারা কৃষিজীবি। বিগত ১৯২৯ সন হইতে গৌহাটী অঞ্চলের চাষ্ট, বেনসর প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত কলিতা জাতীয় ভদ্রলোক আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (৩) কলিতা বলিয়া সর্ব্ব প্রথম ঘোষনা করেন। অতঃপর তাঁহারা সমাজে উপর্যুপরি ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন চালান। ইহার ফলে প্রথমে তাঁহাদের কয়েক জন আত্মীয় স্বজন এবং তৎপরে অন্যান্য স্থানের কলিতাগণ তাঁহাদের দেখাদেখি ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু

---

(২) পুত্রগণের ন্যায় এরূপ কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।—লেখক। (৩) ক্ষত্রিয়—কলায় জন কয়েক কায়স্থ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। কায়স্থ কখনই ক্ষত্রিয় নহে—মৌলিক জাতি।

আজিও গৌহাটী অঞ্চলের এই নব্য 'ক্ষত্রিয়কলিতা' সমাজে বিধবা বিবাহের পূর্ব্ববৎ প্রচার প্রচলন আছে। প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রিয় সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আমোল পাইয়া আসিতেছে কিনা, তাহা ঐতিহাসিকগণের আলোচনা সাপেক্ষ। যাহা হউক আসামে কলিতা, কেওট, নট আদি জাতির সমাজে বহুকাল হইতে একই পদ্ধতিতে বিধবা বিবাহ' হইতেছে।

আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবা বিবাহ 'কনর গুরিত গা ধুয়ান'র' কালে গাত্র হরিদ্রার আবশ্যক হয় না। হোম করিবার বিধিও নাই। 'মধ্য আসাম'ও 'উপর আসাম'এ এই বিবাহ উপলক্ষে 'বে'ই' নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রচলিত প্রথার কথা পরে বলা হইতেছে। অসমীয়া বিধবারা কপালে সিন্দুর পরিধান কিংবা ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন না। নগণ্য-সংখ্যক ভদ্রঘরের কলিতা, কেওট ও 'সাধারণ কায়স্থ' জাতীয় মহিলাদিগের পর্দ্দা আছে। গোস্বামী বংশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, বিশিষ্ট দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ কায়স্থ দিগের বাটীর মহিলারা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর মহিলারা 'নাট—ভাওনা' (যাত্রা), 'ভঠানি' (৪),দেউল প্রভৃতি উৎসব দেখিতে বাটির বাহির হইয়া থাকেন।

তেজপুরের শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি মহাশয় বলেন (৫)—দরঙ্গ জেলার তেজপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহে গাত্র হরিদ্রা দেওয়া অথবা প্রথম বিবাহে যেরূপ নিয়মমত হোমাদির অনুষ্ঠান করা হয়, এ অঞ্চলে তদ্রূপ করা হয় না। পাত্র পাত্রী উভয় পক্ষের অত্মীয় স্বজন এবং গ্রামস্থ ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ সভায় সম্মিলিত হইলে বরপক্ষ, পাত্রীকে অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সভাস্থলে উপস্থিত করিলে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জলযোগ করে।

নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় বর, বিধবার পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে 'আলোচাউল' দেওয়া হইলে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু নিম্ন আসামের অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার প্রথা অনুসারে বিধবাকে তাহার পিত্রালয় অথবা মৃত স্বামীর বাটী হইতে লইয়া গিয়া নূতন স্বামীর বাটীতে 'আলোচাউল' দেওয়া হয়। যদি কন্যা স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ব্বে বিধবা হয়, এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্কার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন স্বামী ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। বিধবা বিবাহে 'আলোচাউল' প্রদান কার্য্যটী সংক্ষেপে হয়। অবশ্য ভদ্রলোক হইলে একটু শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য পূরাভাবে উহার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে পায়সপূর্ণ পাত্রদ্বয়ের আদান প্রদান হয় না। 'আলোচাউল' দেওয়ার অগ্রে কন্যার বাটীতে উলুধ্বনি ব্যতীত শঙ্খ বাজান কিংবা বিবাহের কোন নিয়ম প্রতিপালিত হয় না—কেবল বিধবাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। বরের বাটীতে 'আলোচাউল' দেওয়া হইয়া গেলে খাওয়া দাওয়া হয়।

নিম্ন আসামে বিধবার পূর্ব্বস্বামীর গৃহে কিংবা পিত্রালয়ে কোনরূপ উদ্বাহ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় না। বিধবা বিবাহিত হইলে পিত্রালয়ে যাইতে পারে—তাহাতে কোনরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নাই। আসাম অঞ্চলের সর্ব্বত্র পূর্ব্ব কথিত কলিতাদি জাতীর বিধবার বহুবার বিবাহ হইতে পারে। তাহাতেও সমাজে কোনরূপ আপত্তি নাই। মনে করুন—স্বামীর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হইল। তখন ইচ্ছা করিলে সেই বিধবা তৃতীয়

(৪) উঠানি—এই পার্ব্বন কেবল নিম্ন-আসামের স্থানে স্থানে হইয়া থাকে।—লেখক

(৫) ১৯২৩ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র—লেখক।

পতি গ্রহণ করিতে পারে, এক তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি—এই প্রকারে যত ইচ্ছা তত পতি গ্রহণ করিতে পারে। বিধবারা তৃতীয় অথবা চতুর্থ পতি গ্রহণ করিলে অসমীয়ারা তাহাদের স্বামীর এই বিবাহ কার্য্যটীকে 'ঢেমনি-আনা' বলেন। ঢেম্‌নির পানিপীড়নার্থ যে কোন সময় তাহাকে বরের বাটীতে আনা যায়।

বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা 'সৃত কুলিয়া' বনাম 'বরিয়া' বলিয়া থাকেন। প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র যদি মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে,অসমীয়ারা ঐ পুত্রকে 'গুরগুরীয়া' বলেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে বৃটীশ শাসিত ভারতে Civil marriage Act প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিধবার গর্ভজাত পুত্রগণ সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আসাম অঞ্চলে বিধবার প্রথম পতির ঔরসজাত পুত্র বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না সে বড় হইলে, তাহার নিজ পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে। সতীন পুত্রেরা ও বিধবার পুত্রেরা সমভাবে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়। মনে করুন—জনৈক নাপিত বা বৈশ্যের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত একপুত্র আছে। পত্নীর মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি একটী বিধবাকে বিবাহ করিল। এই বিধবার গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মিল। ঐ নাপিত বা বৈশ্যের মোট তিনটী পুত্রের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হইবে।

মোলায়েম চাবুক

শ্রীরেবতীমোহন সেন

সুখ্যাতির সহিত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া মনীষা যখন বেথুন কলেজে আই, এ পড়িতেছিল, তাহার পিতা গোপেশ্বর বাবু তখন অবধি নানাদিকে তা'র সম্বন্ধ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু মেয়ের ইচ্ছা ছিলনা তাহার ছাত্রী-জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি হয়। হৃদয়ে তা'র জ্ঞানার্জ্জনের আকুল বাসনা, বেশি না হউক, অন্ততঃ বি, এ পর্য্যন্ত পড়া চাই-ই।

গোপেশ্বর বাবু যে মেয়ের মনোভাব জানিতেন না তা' নয়। কিন্তু তাঁহার দেশের ও সমাজের অবস্থা ভাবিয়া, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থের পক্ষে কন্যাদায়ের কঠোরতা কিরূপ ভীষণ তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি গোপনে দু'একটি ছেলের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য যে তিনি উপর্য্যুপরি চারিটি কন্যার পিতা। এই দুর্ভাগ্য লইয়াও তিনি যখন কনিষ্ঠা কন্যার নাম "ক্ষান্ত-মণি," "আন্না," বা "খামকা" না রাখিয়া শব্দ-কল্প-দ্রুমের সহস্রাধিক পাতা খুঁজিয়া অবশেষে "মনীষা" নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিবেশিগণের শুধুই যে বিস্ময় লাগিয়াছিল তা নয়, গোপেশ্বর বাবুর মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধেও তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভীষণ কন্যা-দায়ের দিনে এতটা কন্যা-প্রীতি সঙ্গতি-বিহীন গৃহস্থের পক্ষে একান্তই অশোভন, গ্রামের মধ্যে এই রকমের একটু সমালোচনা বেশ জমিয়াই উঠিয়াছিল।

গোপেশ্বর বাবুর অপরাধ, গ্রামের অপর দশ জনের মত তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, অথচ মনের বলে, সত্য-নিষ্ঠার সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে সহায়তা উৎসাহ প্রদর্শনে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ, ইউনির্ভাসিটির একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ

গ্রেজুয়েট হইয়াও তিনি চাকরিতে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার সামান্য ৪০।৫০ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করাইয়া সাধারণ ভাবে জীবিক নির্ব্বাহ করেন। সমাজের চক্ষে ইহা হীন-বৃত্তি বলিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তিনি গ্রামে রীতি মত অবজ্ঞাত হইয়াই ছিলেন। গোপেশ্বর বাবু তথাপি বিচলিত না হইয়া স্বগ্রামের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন, কিন্তু প্রতিবেশিগণের প্রতিকূলতায় তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সমজাইয়া দিলেন, মেয়েদের লেখা-পড়া জানার কোনও প্রয়োজন নাই, তাহাতে সমাজে শুধু কতকগুলি মেম সাহেবের সৃষ্টি হইবে। ছেলেদের জন্য হাই-স্কুল করিবার প্রস্তাব করিলে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায় একবাক্যে বলিলেন, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লেখা-পড়া শিখিয়া সকলকে অগ্রাহ্য ও অসম্মান করিবে। কাজেই গোপেশ্বর বাবুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে নিজ কন্যাগণের শিক্ষার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী ও চারিটি কন্যা লইয়াই গোপেশ্বর বাবুর সংসার। পরিবারে এতদ্ভিন্ন দুইজোড়া বলদ, তিনটি গাভী এবং চাষ আবাদের কাজের জন্য দুই তিন জন ভৃত্য আছে। দিন দিন সংসারের ব্যয়-বৃদ্ধি ও জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য হইতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আয়ের অপর একটি পথ বাহির করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি সস্তার সময়ে ধান, চাউল, যব ইত্যাদি ক্রয় করিয়া গোলাজাত করিতে লাগিলেন এবং পরে চড়া-বাজারে বিক্রয় করিয়া সংসারের অভাব অনটন দূর করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সংঘটিত হইল। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি গ্রামবাসিগণের অবজ্ঞার ভাবও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল।

গোপেশ্বর বাবু একে একে তিন কন্যার বিবাহ দিলেন। সমান ঘরে সম্বন্ধ করিতে গিয়াও তাঁহাকে পণ ও যৌতুকে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইল। তাহার ফলে, তিনি ঋণ-ভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই তিন কন্যাকে ইচ্ছানুরূপ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছিল। এইজন্য তিনি মনীষাকে তার দশবৎসর বয়স হইতেই কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বড় দিনের ছুটি। মনীষা বাড়ী আসিয়াছে। গৃহ আনন্দময় সে যেন জগতের যাবতীয় আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে ছড়াইয়া দিয়াছে।

দুপুরে ঠাকুর-মার রান্নাটা মনীষাই করে। সে শুধু লেখাপড়া লইয়াই সময় কাটায় না। গৃহের যাবতীয় কর্ম্মেই সে তা'র জননীর সহায়তা করে।

সে দিনকার ডাকে একখানা পত্র পাইয়া গোপেশ্বর বাবু কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইলেন। তিনি মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না—তাই মাতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলেন। সমস্ত শুনিয়া মাতা বলিলেন, "দিনকাল এখন বদ্‌লে গেছে, এখনকার ছেলেরা নিজেদের চোখ ছাড়া আর কারো চোখ বিশ্বাস করে না। কি করবে বাপু, রাজি হও এতে আমদের পক্ষেও ছেলে দেখাটা সহজ হ'য়ে থাকে। তা'ছাড়া এখানে পণের টাকাও দেড় হাজারের বেশী দিতে হবে না।"

গোপেশ্বর বাবুর মনটা যেন রাজি হইতেছিলনা। তবে মা যখন অনুমোদন করিয়াছেন, তখন আর দ্বিধা বোধ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কথাটা বেশীক্ষণ চাপা রহিল না; মনীষার কানেও গেল। সে এখন আর শিশু নয়, সমস্তই বুঝিতে পারিল। পিতা যে দেশের ও সমাজের অবস্থা ভাবিয়াই তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, বুদ্ধিমতী বালিকা তাহা বেশ অনুভব করিল। পিতামাতা ও অন্য

গুরুজনের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া কি সঙ্গত হইবে? মনীষা একটা মস্ত সমস্যার ভিতর পড়িয়া গেল। জীবনকে জ্ঞানোন্নত করিবার আকুল তৃষ্ণা তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। পরিণয়বদ্ধ-জীবনে সে তৃষ্ণা মিটিবার সম্ভাবনা কোথায়?

অবশেষে মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিয়া মনীষা তা'র ঠাকুর মার নিকট গিয়া নিভৃতে বলিল, "ঠাকুরমা, একি তোমাদের কাণ্ড! লুকোচুরি করে কা'র বিয়ে দিতে যাচ্ছ?"

"কেন লো, বিয়ের নাম শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিস্ যে?"

"কেন উঠ্‌বনা ঠাকুর-মা? আমরা তো আর তোমাদের কালের মতো অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা নই, যে মা বাপকে গৌরীদানের ফলভোগ করবার সুযোগ দিতে পারব। আমাদের মতো ঢেঙা মেয়েরা হয়েছে এখন সমাজের আবর্জ্জনা। এই সমাজকে একটু সায়েস্তা করার দরকার হ'য়ে প'ড়েছে; তাই ক্ষেপে উঠেছি।"

"স্বয়ম্বরা হ'য়ে বুঝি সমাজকে সায়েস্তা করবি?"

"ক্ষতি-ই বা কি? যেম্‌নি ব্যাধি, তেম্‌নি তার প্রতিকার চাই তো?"

"তবে সেই সঙ্গে ধনুর্ভঙ্গ-পণটাও তো থাকা চাই।"

"নিশ্চয়—আমরা এত সহজ-লভ্য ব'লেই তো যত অত্যাচার আমাদের উপর দিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমাদের উপর হ'লেও যা' হোক কিন্তু-এ অত্যাচারের পীড়নে যে গরীব মা বাপের হাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল।"

"তা আর বল্‌তে। কিন্তু যাক্ সে কথা। তোকে আর গোপন ক'রে কি হবে, তোর একটা বিয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হ'য়েছে। বর মশাই নাকি স্বচক্ষে কনে দেখে পরখ ক'রে পছন্দ হ'লে তবে বে' করবেন। তোর বাবা তো কিছুতেই তাতে রাজি হবে না, আমি ব'লে ক'য়ে তাকে সম্মত ক'রেছি, কারণ কালের রীতি না মান্‌লে চল্‌বে কেন? তুই কি বলিস্?"

"আমি আবার কি বল্‌বো। তোমার বর-মশাই যে, কোনো অন্যায় আব্‌দার ক'রছেন তাতো আমার মনে হয় না। যাকে চিরদিনের জন্য সুখ দুঃখের সঙ্গিনী করতে হবে, তা'কে না দেখে শুনে বে'করাটা কি বোকামো নয়?"

"তবে তুই রাজি আছিস্?"

"তোমরা যখন আমাকে আর আইবুড়ো থাক্‌তে দেবেনা, তখন এই Matrimonial Examination অর্থাৎ বিয়ের পরীক্ষাটা দিতে রাজি না হ'য়ে আর কি করি ব'ল।"

"তবে যে বলেছিস্ স্বয়ম্বর হ'য়ে সমাজ-শাসন করবি, তোর ধনুর্ভঙ্গ-পণটা গেল কোথায়?"

"ভয় পেয়ো না ঠাকুর-মা, সব ঠিক আছে।"

"ভাল দেখা যাবে। তোর কেরামতি।"

"কেরামতি যে দেখ্‌বে ঠাকুরমা, বাবা কি তবে সত্যি মত দিয়েছেন?"

"শুধু তোর মতের অপেক্ষা। তুই আপত্তি কর্‌লে সে আর এতে এগোবেনা

"না, ঠাকুরমা, আপত্তির দরকার নেই। ইউ-নিভার্সিটির পরীক্ষা তো একটা দিয়েছি, আবার না হয় তোমার এই সমাজেরও পরীক্ষা দেবো; যদি পাশ করি তো মন্দ কি?"

"বেশ, তা-ই হবে।"

জননীর কথানুসারে গোপেশ্বর বাবু পত্র লিখিয়া দিলেন। উত্তর আসিল, তিন দিনের ভিতর পাত্র স্বয়ং মনীষাকে দেখিতে আসিবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পাত্র শ্রীমান্ বিমলকুমার মজুমদার তাঁহার বন্ধু বিভূতিভূষণ রায়কে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর বাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। বিভূতিভূষণ এই গ্রামেরই অধিবাসী এবং গোপেশ্বর বাবুর নিকট আত্মীয়। কলিকাতায় রিপণ কলেজ-হোষ্টেলে একই

সময়ে বাস করায় উভয়ের পরিচয় হয়। এই বিবাহ-প্রস্তাবের মূলেই ছিল বিভূতিভূষণ। যাই হোক, বিভূতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসায় বিমলকে আর আত্ম-পরিচয় দিবার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে বিভূতি বাড়ীতেই ছিল।

গোপেশ্বর বাবু বিমলকে সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং বিভূতিকে বিমলের নিকট বসিতে বলিয়া বাটীর ভিতর গিয়া জননীকে সংবাদ দিলেন। গোপেশ্বর বাবুর মাতা পূর্ব্ব হইতেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে আসিয়া বিভূতি ও বিমলকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন; এবং বিশ্রামান্তে উভয়কে কিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ করাইলেন। বিভূতির নিকট ঠাকুরমার পরিচয় পাইয়া বিমল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেশের চিরাচরিত প্রথা না মেনে এরূপভাবে উপস্থিত হওয়ায় আমাকে হয়তো অনেকেই মন্দ বল্‌বেন এবং আপনার চোখেও হয়তো এটা খুবই খারাপ ঠেকে থাক্‌বে, কিন্তু এ বাটীতে পা দিয়ে অবধি আমার যেন সে আশঙ্কাটা দূর হ'য়ে গেছে। আশা করি, আপনি আমায় তেমন কিছু বল্‌বেন না।

"না বাছা, মন্দ বল্‌বো কেন? আগেকার দিন তো এখন আর নেই, যে মা-বাপ যা ধ'রে এনে দেবে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে। এখন তোমরাও বেশ লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশ ঘুরে নূতন ভাবে তৈরি হচ্ছো, আর মেয়েরাও খনা, লীলাবতী হবার চেষ্টায় আছে। বাছাবাছিটা এখন তোমরা নিজেরাই কর্‌বে, এতো স্বাভাবিক।"

"আপনার হৃদয়ের উদার ভাবের কথা বিভূতির মুখে যা শুনেছি, তা দেখ্‌ছি সবই ঠিক। বাস্তবিক আপনার বয়সের মহিলার কাছে এমন আধুনিক ভাবের কথা শুনতে পাওয়া আশ্চর্য্য।"

বিভূতিভূষণ বাধা দিয়া বলিল, "তা আমার কাছে আপত্তি বোধ হ'তে পারে, কারণ তুমি জানো না, ঠাকুরমা এই বয়সে এখনও তেমন পড়াশুনা ক'রে থাকেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল, "আশা করি, আপনার নাত্‌নী তা'র ঠাকুরমার এই বৃত্তির উত্তরাধিকারিনী হ'তে পেরেছে।"

"নাটক নভেল ছেড়ে পুরাণ মহাভারতাদি পড়ার বৃত্তি সৎ কি অসৎ ঠিক বল্‌তে পারিনা, কারণ সকল লোকের রুচি একরকম নয়। তবে নাত্‌নী এর কতকটা পেয়েছে, কিংবা আদৌ পেয়েছে কিনা, পরখ করলেই বুঝ্‌তে পারবে। এখন এসো তুমি আমার সঙ্গে এই পাশের ঘরে।"

বিভূতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিভু, তুই তো বাড়ীর ছেলে; তুই বাছা বৌমার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প কর। তোর কাছে মাণ হয়তো লজ্জা বোধ করবে।"

বিভূতিভূষণ তাহাই করিল।

তখন বিমলকে লইয়া ঠাকুরমা পাশের ঘরে গেলেন। এইটিই ঠাকুরমার ঘর—মনীষা ঠাকুরমার সঙ্গেই থাকে। গৃহটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটী-রূপে গোছান। এক পাশে একটি বড় খাট, অপর দিকে মনীষার পড়ার স্থান। একখানি বড় টেবিলের উপর তার পড়ার পুস্তকগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত টেবিলের কাছে দু'খানা চেয়ার ও একটু দূরে একটি দেরাজ ও আলমারী। আলমারী কাঠের আবরণের ভিতর দিয়া উপরের দুই শেল্‌ফে সুন্দর চক্‌চকে বাঁধানো বইগুলি দেখা যাইতেছিল। সমস্তই ঠাকুর-মার বই।

ঠাকুরমা যখন বিমলকে নিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, মনীষা তখন টেবিলের কাছে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই ঠাকুরমা তাকে বলিলেন, "মাণ, ইনি সেই বিমল বাবু, যাঁর আস্‌বার কথা ছিল। ইনি যা জিজ্ঞেস করেন, উত্তর দিয়ো—লজ্জা করোনা।" বলিয়া তিনি তাঁহার খাটের উপর গিয়া বসিলেন।

মনীষা উঠিয়া বিমলের দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরমা উভয়কে বসিতে বলিলেন। বিমল আসন গ্রহণ করিলে পর মনীষাও বসিল। একটু ইতস্ততের পর বিমল মনীষার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি বই পড় ছিলে?"

"দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য!"

"এই বই যখন পড়ছো, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই বেশ একটু পরিচয় হয়েছে।"

মনীষা কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "ওর বাবা এ বিষয়ে একটু কড়া—সে নিজে বেছে বেছে বই এনে দেয়, মণি তাই পড়ে। বাজে বই পড়া সম্বন্ধে তার নিষেধ আছে।"

"সে তো ভাল কথা।" তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মেট্রিক পাশ ক'রেছ কোন্ স্কুল থেকে?"

"ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় হ'তে।"

"এবার তোমার কোন্ ইয়ার?" "আই, এ ফাষ্ট্ ইয়ার।"

"Combinationএ সংস্কৃত অবশ্যই আছে।" "হাঁ।"

"শেলাই, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চ্চা আছে তো?" "সামান্য। যা' স্কুলে শেখানো হয়।"

"কোন পার্টিতে কখনো গান ক'রেছ কি?" "পার্টি বল্‌তে যা বুঝায় তা'তে গাইবার ইচ্ছা বা সুযোগ কখনো হয়নি।"

"হার্মোনিয়ম বাজাতে পার?" "একটু একটু অভ্যাস আছে।"

"সেমিজ, ব্লাউজ, সার্ট এর কাট-ছাট শেলাই জানো?"

"সামান্য রকম জানি।"

"তোমার গায়ের ব্লাউজটা কি দরজির তৈরি?" "এটা ঘরেই করা হয়েছে।"

"বেশ হয়েছে তো। আচ্ছা, জামার উপরের নক্সার কাজগুলো?" "এই Embroidery workও ঘরেই হয়েছে।"

"Excellent it is indeed—a very fine piece of work."

"আজকাল স্কুলের মেয়েরা এর চেয়ে অনেক ভাল কাজ করতে পারে, আমার হাতের কাজতো তেমন ভালো নয়।"

"তোমার বিনয় প্রশংসার যোগ্য।"

আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বিমল টেবিলের উপর হইতে একখানা বাঁধানো খাতা টানিয়া লইল। পাতা খুলিতেই তার চোখে পড়িল একটি বাংলা প্রবন্ধ, নাম "পল্লী-জীবন"। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এই সুন্দর প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে বিমল এমন তন্ময় হইয়া গেল যে তার মন হইতে তখন যেন অন্য সকল চিন্তা দূরে অপসারিত হইয়া গেল। মিনিট তিন চারি পর খাতার পৃষ্ঠা হইতে চক্ষু উঠাইয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল, এ তোমার লেখা?"

মনীষা নিরুত্তর। বিমল বলিতে লাগিল, "বেশ প্রবন্ধটি মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা আদরের সহিত গ্রহণ করবে। প্রবন্ধের ভিতর একটা নূতন চিন্তার ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।"

বিমলের পরবর্ত্তী প্রশ্ন হইল, "আমাদের এ সাক্ষাতের অভিপ্রায় অবশ্যই জানো?" "হাঁ, জানি।"

"আমার দিকে একবার চাও দেখি?"

মনীষা একটিবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াই মাথা হেঁট করিল।

"আচ্ছা, আমার দিকে পেছন দিয়ে একটিবার দাঁড়াও।"

মনীষা নীরবে এই আদেশ বা অনুরোধটিও রক্ষা করিল। বিমল দেখিল, মনীষার ঘন-কৃষ্ণ কেশদাম কোমর ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছে।

"ভাল, দেখি তোমার হাতখানা।"

মনীষা তাহার বাম হাতখানা বাহির করিল। বিমল বলিল, "বা হাত বের করলে যে?"

"জ্যোতিষীরা শুনেছি মেয়েদের বা-হাতই দেখে থাকেন।

"আমি কি জ্যোতিষী ?"

"তা জানিনে, তবে যখন হাত দেখতে চাইলেন, তখন মনে করলুম, হয়তো সে বিষয়ে আপনার বেশ জ্ঞান আছে।"

"জ্ঞান বিশেষ কিছুই নেই, আর সে উদ্দেশ্যেও হাত দেখ্‌তে চাইনি।"

"তবে ?" বলিয়াই সে হাত গুটাইয়া লইল।

"হাত সরিয়ে নিলে যে ?"

"যদি জোতিষীর চোখে হাত দেখার প্রয়োজন না থাকে, তা হলে আর হাতে কি দেখবেন ?"

"বিশেষ কিছুই নয়—তবে, হাতের তলা আর আঙ্গুলের গড়নটা দেখা মাত্র। তা থাক্, আর দেখতে হবে না।"

"স্বচ্ছন্দে দেখ্‌তে পারেন—তবে কি না, এই গোটা দেহটাই ভগবানের দান—এতে খুঁত ধরবার অধিকার বোধ করি মানুষের নেই।"

উত্তর শুনিয়া বিমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার ধারণায়ই আসে নাই কোন বাঙ্গালী মেয়ে এরূপ অবস্থায় এমনভাবে কথা বলিবার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে। মনীষা পরমাসুন্দরী না হইলেও কুৎসিৎ ছিল না। একটা উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি কমনীয়তার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার মুখমণ্ডলকে অপূর্ব্ব লাবণ্যমাণ্ডত করিয়া রাখিয়াছিল। বিমলের মনে হইল, সেই প্রতিভার নিকট সে যেন হীন-প্রভ হইয়া পড়িতেছে, আবার সেই লাবণ্যের আকর্ষণও এড়াইতে পারিতেছে না। তখন তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া বিমল উঠিয়া পড়িল এবং ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই,—আপনার নাত্‌নীর সুশিক্ষা, বিনয় ও তেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট প্রীত হয়েছি। আমার খুব সৌভাগ্য যে বিভুতির কাছে এই পরিবারের সংবাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল।"—বলিয়াই বিমল ঠাকুরমার পদ-ধূলি লইয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলে—মনীষা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি যাবেন না—এতটা সময়ই নষ্ট করেছেন, আর একটু বসুন।"

বিমল অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল এবং মনীষার নিকট হইতে এরূপ অনুরোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে বস্‌তে বল্‌ছো ?"

"হাঁ, আপনাকেই।"

বিমল মনীষার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল। মনীষা সংকুচিত না হইয়া বলিল, "আপনি হয়তো আশ্চার্য্য বোধ কচ্ছেন, কিন্তু কথাটা এই—আচ্ছা, আপনি বসুন, তারপর বল্‌ছি।"

বিমল অগত্যা বসিল।

মনীষা গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনিতো আমাকে নানারকমে পরীক্ষা করলেন ; এখন এ পক্ষ থেকেও একটু পরীক্ষার দরকার।"

"সে আবার কি ?"

"বিয়েটা তো শুধু আপনার নয়, আমারও সুতরাং আমার এ প্রস্তাবের আপনার আতঙ্কিত হ'বার কিছু নেই। যে ব্যাপার দুইটি জীবনে ইহকাল ও পরকালের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সৃষ্টি করে, এবং যার উপর দু'জনের সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনিও সেই আদর্শ নিয়েই আজ এখানে এসেছেন। আমাদের তরফ থেকে যদি আপনারই আদর্শের অনুকরণ করা হয় তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি হ'তে পারে ?"

বিমল কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহাকে এরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে। তাহার মনে হইল, কলিকাতার আবহাওয়া আর কলেজের শিক্ষা এই বালিকাকে প্রগল্‌ভা করিয়াছে। মনীষার বাক্য যতই যুক্তিপূর্ণ হউক তাহা তাহার কাছ হইতে বাহির না হইলেই শোভন হইত। পরীক্ষা করিতে আসিয়া নিজেরই পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহা আবার একটি বালিকার কাছে, এ শুধু বিড়ম্বনা নয়—

অতি লজ্জাকর। কিন্তু ইহা এড়াইবার পথও বিমল খুঁজিয়া পাইল না—আবার ভাবিল, একটি বালিকা এমনই বা কি জিজ্ঞাসা করিবে যে জন্য তাকে ভাবিতে হইবে ? তখন যথাসম্ভব ঔদাস্যপূর্ণ হাসির ভাব মুখে আনিয়া বলিল :—

"আপত্তি ? মোটেই নয়—এ তোমার অতি সঙ্গত প্রস্তাব।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাজ-কর্ম্ম কি করেন ?" "আপাততঃ স্কুল-মাষ্টারি।"

"হাইস্কুলে ?" "হাঁ।"

"হেড্-মাষ্টার ?" "না, এসিষ্টাণ্ট টিচার।"

"আপনি গ্রেজুয়েট ?" "হাঁ।"

"মাষ্টারিতে আয় কত ?" "সম্প্রতি ৫০৲ টাকা হিসাবে পাচ্ছি—তবে স্কুলে গবর্ণমেণ্ট aid পাওয়ার কথা আছে, তা পেলে বেতনের হার হয়তো আর কিছু বাড়বে।"

"এই মাষ্টারি-করাই কি আপনার জীবনের লক্ষ্য ?"

"অন্য কোনদিকে কিছু সুবিধে হ'য়ে উঠ্‌লো না ব'লে এই নিয়েই থাকতে হচ্ছে।"

"অন্য কোন্‌দিকে চেষ্টা করেছিলেন ?" "সামান্য কেরাণীগিরি থেকে অনেক কিছুরই চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু আজকাল বড় মুরুব্বি পেছনে না থাকলে চাকরি পাওয়া অসম্ভব।"

"চাকরি ছাড়া কি অন্য কোনো দিক আপনার চোখে প'ড়েনি—যেমন ব্যবসায়াদি ?"

"ব্যবসা করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন, তা'ছাড়া তাতে risk ও যথেষ্ট।"

"আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হ'তে পারলুম না। আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি, বড় ব্যবসায়ীদের ভিতর অনেকেই সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করে বড় হয়েছে। তাতে riskও কম অথচ সফলতার সম্ভাবনাও বেশি। নিরক্ষর মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল নিয়ে এদেশে এসে ক্রোড়পতি হ'য়ে যাচ্ছে—তাকি শোনেননি ?"

"মাড়োয়ারীরা মোট বইতে পারে, ছাতু খেয়ে থাক্‌তে পারে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা তা পারে না।"

"এইখানেইতো গলদ। তা যাক্, পরিবারে আপনারা কে কে আছেন ?" "আমার মা, ছোট দুইটি ভাই, আর একটি ভগিনী মাত্র।"

"এরা সব বাড়ীতেই থাকেন ?" "হাঁ।"

"দেশে বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে ?" "ছিল এক সময়ে বেশ ভালই, এখন অতি সামান্য আছে।"

"তা'র আয়ে বাড়ীর সকলের খরচ পুষিয়ে যায় ?" "না, তবে বৎসরের চিঁড়ে মুড়ির ব্যবস্থা হয়।"

"অন্যান্য খরচ তবে কি ক'রে চলে ?" "আমি সাহায্য ক'রে থাকি।"

"কি পরিমাণ ?" "মাসে বিশ, পঁচিশ, সময় সময় ত্রিশ টাকা ক'রেও মাকে পাঠাই।"

"খুব ভাল কথা, মার সাহায্য করা সব ছেলেরই কর্ত্তব্য।"

"মার চেয়ে বড় কিছু নাই।

"আপনার মাতৃ-ভক্তি প্রশংসনীয়। আজকাল অনেক ছেলেই শুনতে পাই বুড়ো মা-বাপের কথা তেমন ভাবেনা।" "যারা ভাবেনা তারা নরাধম।"

"আচ্ছা, আপনি যেখানে মাষ্টারি করেন সেখানে আপনার থাকার জন্য free quarters আছে কি ?" "শুধু আমার একার কথা হ'লে আছে, কারণ স্কুল বোর্ডিংএ থাকার জন্য seat ভাড়া স্বরূপ আমার কিছু দিতে হয় না। তবে পরিবার নিয়ে বাস করার জন্য কোনও বাসা নেই।"

"পরিবার নিয়ে থাকার প্রয়োজন হ'লে কি করবেন ?" "তখন একটা বাসা ভাড়া করতে হবে।"

"ভাড়া দিলে সেখানে বাসা পাওয়া যায় ?" "হাঁ।"

"কত টাকার ভিতর হ'তে পারে ?" "মাসিক সাত আট টাকা।"

"আপনার হার্ম্মোনিয়ম আছে ?" "না।"

"তবে গান-বাজনা শোন্‌বেন কি ক'রে ?"

"একটা কিনে নেওয়া যাবে,—আর যদি শ্বশুর থেকে যৌতুক স্বরূপ পাওয়া যায়.

"শ্বশুর অসমর্থ হ'লে ?" "নিজেরই কিনে নিতে হবে।"

"তার মানে পঞ্চাশ ষাট টাকা।" "হাঁ, এর কমে আর কি ক'রে হয়।"

"আপনার বাড়ীতে সেলাই-কল আছে ?" "না।"

"না থাক্‌লে, সার্ট, সেমিজ বডিস্ ইত্যাদি কি ক'রে তৈরি হবে ?" না, এটাও হতভাগ্য শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাতে চান ?" "শুনেছি, মাসিক ৫৲ টাকা ক'রে দিলেই একটা নূতন কল পাওয়া যায় সুতরাং এর জন্য বিশেষ ভাবনার কারণ নেই।"

"আপনি রাঁধ্‌তে জানেন ?" "রাঁধতে জানি—আমি ?"

"হাঁ।"

"অতি অদ্ভুত প্রশ্ন।" "তা হ'তে পারে, কিন্তু আপনি আপনার ভাবী পত্নীর যে সমস্ত qualifications খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার মধ্যে রান্নার item টা নেই। কাজেই সংসারের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটা কি ক'রে সম্পন্ন হ'তে পারে তা নির্ণয় করবার জন্য ওকথা জিজ্ঞেস্ ক'রেছি।"

"একজন পাচক ঠাকুর রাখলে কি এ কাজটা হ'তে পারে না ? "পারে বৈ কি, কিন্তু তার মাইনে পড়বে কত ?

"সাত আট টাকাই যথেষ্ট।" "Menial work এর জন্য আবার একজন চাকর চাই তো? ঘর-লেপা, বাসন-মাজা, কাপড়'কাঁচা, কুট্‌নো-কোটা, বাট্‌না-বাটা ইত্যাদি কাজ, নইলে কে করবে ? "চাকর চাই বই কি।"

"তাকে দিতে হবে কত ?' "ছয় সাত টাকার ভিতরই হ'তে পারে।"

"তা হ'লে আপনার বাড়ীতে পাঠাতে হয়, ২৫৲ টাকা, বাসাভাড়া ৮৲ ঠাকুর চাকরের বেতন আট আর সাত পনের টাকা। আপনার আয়ের সব টাকা এতেই তো ব্যয় হ'য়ে গেল—খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য খরচ তবে কি ক'রে চল্‌বে ?"

বিমল নিরুত্তর।

মনীষা বলিতে লাগিল, "আপনার আয় ব্যয়ের এই হিসাব দেখিয়ে আপনাকে ভীত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহিত জীবনের জন্য পত্নী-নির্ব্বাচনে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে ঐ হিসাবটা একটু খতিয়ে দেখ্‌লেই বোধ করি ভাল হ'তো।"

বিমলের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটি অপরিচিতা বালিকার কাছে এমন ভাবে অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইতে হইবে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। লজ্জা ও অবমাননায় বিমল নতমুখ হইয়া রহিল।

মনীষার ভাষায় বিনয় ও সম্ভ্রমের অভাব না থাকিলেও উহা যে তাহার দারিদ্র্যের প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিত, ইহাই বিমলকে বেশী পীড়ন করিতে লাগিল। মনীষা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই বলিল—

"আয়-ব্যয়ের কথা তুলে যদি আপনার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি তবে আমায় মার্জ্জনা করবেন। আর সেই কথা থেকে যদি অপেনি বুঝে থাকেন যে আমি দারিদ্র্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি, তা হ'লেও আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। কারণ আমি নিজে দরিদ্রের সন্তান, আর প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য একটা অপরাধ নয় ; অপরাধ হ'য়েছে তা দূর করবার যথোচিত চেষ্টার অভাব। আমাদের দেশের যুবকেরা hero হবার কল্পনায় মাতোয়ারা, অথচ নিজেরা কর্ম্ম-বিমুখ। শ্বশুরকে নিপীড়িত ক'রে তাঁর অর্থে নিজের দারিদ্র্য ও অভাব দূর করবার চেষ্টার চেয়ে হীন কাপুরুষতা যে আর কি হ'তে পারে জানিনে। অথচ এঁরাই আবার নিজেদের পুরুষ ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না।"

বিমল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই ঘরের ভিতর দিয়া যেন একটা গরম বাষ্প বহিয়া যাইতেছে। মনীষা পুনরায় বলিতে লাগিল ;—

"যথোচিত চেষ্টা করলে আপনি যে আপনার

বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি বিবাহিত জীবনের যে সকল চিত্রের কল্পনা ক'রে রেখেছেন, সেই কল্পনা-গুলিকে বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে নিজের অবস্থার যতটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন সেই পরিবর্ত্তন সংঘটন না ক'রে বিবাহের জন্য অগ্রসর হওয়া কি অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই? আমার মনে হয়, আপনার জন্য মাত্র দুইটি পথ আছে—হয় আপনি উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা প্রথমতঃ নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকুন, নয়তো অর্থাৎ এখনই যদি আপনার বিবাহ না করলেই নয়, তবে পাড়াগাঁয়ের এমন একটি মেয়ের সন্ধান করুন, যে অত গান-বাজনা সেলাই প্রভৃতির ধার ধারবে না, অথচ নীরবে অম্লান-চিত্তে আপনার সংসারের যাবতীয় কাজ, ক'রে যেতে পারবে আপনি তাই করুন।"

বিমল আস্তে আস্তে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, "বাছা, একটু দাঁড়াও একটা কথা শুনে যাও।"

বিমল ততক্ষণ বাটীর বাহিরের আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়াছে।

ঠাকুর-মা বলিলেন, "মণি, তুই করলি কি? তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলি?"

"অপমান কি ঠাকুর-মা? দু'টো সত্যি কথায় যদি তাঁর অপমান হ'য়ে থাকে, তার আর আমি কি করবো? একটু কড়া না হ'লে কি সমাজ-শাসন হয় ঠাকুর-মা? তুমি ধনুর্ভঙ্গ পণের কথা ব'লেছিলে, দেখ্‌লেতো—লঙ্কাধীশ্বর দশমুণ্ড আর কুড়ি হাত নিয়ে এসেও অবশেষে চুপি চুপি পগার পার হ'য়ে গেলেন।"

হঠাৎ বিভূতি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুর-মা, শুনলুম, বিমল নাকি চ'লে গেছে। আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে দেখাটাও করলে না?"

ঠাকুর-মা বলিলেন, "দেখা আর কি করবে বেচারা বড় অপ্রতিভ হ'য়ে পালিয়ে গিয়েছে বল্‌লেই হয়।"

"সে কি, পালিয়ে যাবে কেন? কিছুইতো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।"

ঠাকুর-মা তখন বিভূতিকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিলেন। বিভূতি সমস্ত শুনিয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে মনীষার দিকে চাহিয়া বলিল—"মণি, তুই যে এমন সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারবি, ভাব্‌তেও পারিনি। বেশ ক'রেছিস্ বোন্, তুই আমাদের চোখ্ খুলে দিয়েছিস্।"

"বিভূ-দা, সমাজের চক্ষে আমার একাজটা হয়তো খুবই নিন্দনীয় হবে, কিন্তু যা সত্য ও সঙ্গত, আমি শুধু তা'-ই ক'রেছি।"

"এ নিন্দায় কিছু আসে যায় না—বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা যা হ'য়ে পড়েছে তাকে দুরস্ত করতে হ'লে এই রকম একটু মোলায়েম চাবুকেরই দরকার।"





ঝাঁকা-মুটে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

আম্‌রা ঝাঁকা-মুটে !
পেটের দায়ে রাজধানীতে সবাই এলাম ছুটে !
নাইকো মোদেব আপন ও পর,
খাটছি মোরা রাত্রি দুপর,
ঝাঁকা মাথায় 'রকে'র উপর
আম্‌রা পড়ি লুটে' !

২

আম্‌রা ঝাঁকা-মুটে !
হরেক রোজ্‌ই দিন্‌-মজুরী কর্‌ছি খেটে-খুটে !
মূর্খ হিন্দু মোসলমান,
কাজ করে, যাই সমান সমান,
মানের চেয়ে পাই অপমান
কই যদি মুখ ফুটে' !

৩

আম্‌রা ঝাঁকা-মুটে !
শহরের বুক জরিপ করি আমরা সবাই জুটে !
হাঁকায় বাবু মোটার, জুড়ী,
খাটার মতো কই মজুরী ?
মোদের পেটে চালায় ছুরি
পাওনা কেটে-কুটে !

৪

আম্‌রা ঝাঁকা-মুটে !
খেয়ে দেয়ে রয় না কিছুই, স্বাস্থ্য গেল টুটে !
মাগ্‌ছেলেদের কোথায় কাপড় ?
চাইলে কসে' লাগাই চাপড়,
অম্‌নি লাগে ভীষণ ফাঁপর,
পুলিশ ঠোকে 'বুটে' !

আম্‌রা ঝাঁকা-মুটে !
মার খাওয়াটা ভাগ্য মোদের, দেখছি ঘেঁটে-ঘুঁটে
জন্ম থেকে মৃত্যু নাগাদ্‌
আঘাত পাওয়া পড়বে না বাদ,
ধর্ম্মঘটে পূরাতে সাধ
মরবো এবার 'স্যুটে' !

ভাগীদার

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

রামগোপাল দাদার সহিত বধূরূপে বাল্য-সঙ্গিনী সরলা যখন গৃহে আসিল তখন বিধু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কহিল—বাঁচলুম সরি।—এইবার তোর হাতে আমার বুড়ী মায়ের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি দেশ ছাড়ব।—

মুখের ঘোমটা তুলিয়া সরলা কহিল—কেন ?—

হাসিয়া বিধু কহিল—"কেন আবার কি ?—জানিসনে যে চিরকালই আমি দেশ বেড়াতে কত ভালবাসি। তবে তখন একটা ভাবনা ছিল—ওই বুড়ী মায়ের জন্যে। এখন তো আর তা নেই, তুই তো বউদি হ'য়ে এসেছিস এখন তোর শাশুড়ীর ভার তুই নে সরি, বেঁচে যাই।"---

সরলা কিছুক্ষণ নির্ব্বাকে বিধুর মুখের প্রতি চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

বিধু কহিল—হাসলি যে—

সরলা কহিল—"হাসি পাচ্ছে বড্ড, হাসবোনা--"

"কিন্তু কেন ?—"

"তোমার কি বলে ডাকবো বলতো দাদা ? না নতুন সম্পর্কের ঠাকুর পো" ?—

বিধুও হাসিয়া ফেলিল। সত্যই এ কথাটা হাসবার মতই কথা বটে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"যা ইচ্ছে হয় বলো, তবে আমি আর তোমায় 'তুই' ব'লব' না সরি। সত্যি বলছি এবার হ'তে সরবৌ ব'লে ডাকবো।—নইলে লোকে কি মনে ক'রবে---মধ্য পথে বাধা দিয়া সরলা বলিয়া উঠিল---না বিধুদা, তুমি আমায় তুমি ব'ল না। ও কথাটা ছেড়ে দিয়ে তুই ব'লে ডেকো। সেইটেই আমার কাছে খুব ভালো লাগে।—

"আচ্ছা—আচ্ছা সে দেখা যাবে।—এখন কিছু খেতে দাও তো। খাওয়া যাক,—তার পরে মার কাছে গিয়ে সে মীমাংসা হবে এখন।— আন কিছু খাবার।—"

সরলা কি একটা কথা অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে এক হস্তে খাবারের রেকাবী এবং অন্য হস্তে জলের গ্লাশ লইয়া আসিল। সে গুলি মেঝের উপরে রাখিয়া দিয়া ও একখানি আসন বিছাইয়া দিয়া সরলা কহিল "বোস—"

বিধু বসিল না। কচুরী একখানা তুলিয়া মুখে দিয়া কহিল, তুই খেয়ে নে সরি—

বিধুর স্বভাব যে চিরদিনই এইরূপ বালকের মত সরল তাহা জানিত। এবং সে চিরদিনই বিধুর সহিত অসঙ্কোচে মিশিত। খাওয়ার ব্যাপারেও সে বিধুকে দেখিয়া কোনও দিনই লজ্জা করিত না কিন্তু আজ তাহা না করিয়া পারিল না। চতুর্দ্দিকে সচকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল—"যাও বিধুদা' কি যে বল।—"

হাসিয়া বিধু কহিল, কি যে বলি তার মনে---চটছিস কেন।—রাগের ভান করিয়া সরলা কহিল—চটবো না ?—এটা শ্বশুর বাড়ী না—এখানেও বুঝি তুমি আমায়—

বিধু হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—আপনি কেন ? বল্ বল্ ব'লে যা—তেমনি পেয়েছ কিনা, এখন আমি একজন হ'য়েছি, বিশেষ তোমার বৌদি।

সরলা হাসিয়া ফেলিল। ছোট বেলার মতই ছোট একটি কিল উঠাইয়া কহিল—ভাল হবে না

বিধুদা,—চুপ কর ব'লছি। সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্রুতপদে বৃদ্ধা জননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল "মা—"

মা তখন মালা জপ করিতেছিলেন। কাহলেন "কেন বাবা"—হর্ষাপ্লুত স্বরে বিধু কহিল—"মা তোমার বড় ছেলের বৌয়ের কাণ্ড শুনেছ, আমি খাবার খেতে দিলাম, লজ্জা ক'রে খাওয়া হ'ল না। দেখ তার আক্কেলখানা কেমন ধারা—"

মা হাসিয়া কহিলেন—" ও তেমনি ধারা পাগ্‌লা মেয়ে। ওর দোষ ধরিসনে বিধু।—"

বিধু উত্তরে শুধু একটু হাসিল মাত্র।

(২)

মাতৃপিতৃহীন বিধু যখন মায়ের ছেলে-বেলার সই রাইমনির স্নেহময় বক্ষে স্থান পাইয়াছিল সে আজ প্রায় সতের কি আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। —তখন সে মাত্র চার বৎসরের। সইয়ের ঘরে, বাড়ীতে ডবল তালা লাগাইয়া সইয়ের ছেলেকে বক্ষে লইয়া রাইমনি স্বামী গৃহে চলিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পুত্র রামগোপাল আট নয় বৎসরের।

রাইমনির স্বামী এই পিতৃমাতৃহীন বালককে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিলেন।—মারা যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাহারও রামগোপালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আপনার বিস্তৃত জমীদারী ও টাকা কড়ি সমভাবে আধা-আধি বখরা করিয়া উইল করিয়া দিলেন।

রামগোপালের পিতা মাতার স্নেহমায়া বিধুকে জড়াইয়া উঠিলেও একজন কিন্তু বিধুকে সুদৃষ্টিতে দেখিল না, সে রামগোপাল। পিতামাতার স্নেহ দৃষ্টি যে দুইজনকেই পাশাপাশি রাখিয়া নিক্তির ওজন করিয়া চালবে ইহা রামগোপাল ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিল না।

সে ধীরে ইহাদের নিকট হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মা কাহলেন—"হ্যাঁরে গোপ্‌লা, তুই যেন দিন দিন কেমন ধারা হ'য়ে যাচ্ছিস—কেন বলতো'—ছেলে উত্তর দিল না।

বড় হইয়া সে যখন জানিতে পারিল পিতার যাহা কিছু বিষয় আশয় ছিল, সমস্তই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ের বিদ্বেষ ভাব গিয়া পড়িল নিরপরাধ সরল চিত্ত বিধুর উপরে। বিধু কিন্তু ইহার কিছুই জানিল না। সে হাসিয়া খেলিয়া প্রতিদিনকার কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল।

রাইমনি কিন্তু পুত্রের মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এ বিষয় লইয়া তিনি পুত্রকে কোনও প্রশ্ন করিলেন না। কেবল নির্জ্জনে স্বর্গগত স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির পদতলে হাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন—

—"এ কি হ'ল গো"—

রাইমনির ম্লান মুখ দেখিয়া বিধু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কহিল—"কি হ'য়েছে মা তোমার"—

ম্লান মুখের উপরে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া মা বলিলেন—"কিছুইতো হয়নি, বাবা।"—বিধুর মনে তথাপি বাধা মানিতে চাহিল না। তাহার ম'নে হইতেছিল, মায়ের ওই কাতর দৃষ্টির অন্তরালে কিছু গোপন রহিয়াছে। রাইমনি বিধুর অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ সস্নেহে সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"জল খাবি চ' বাবা। এই রদ্দুরে অনেকটা পথ এসেছিল, মুখখানা শুকিয়ে আমসী-পানা হ'য়ে গেছে। আর, ইস্কুলও তো কাছে নয়, ক্রোশ খানেক পথ হবে।"

হাতের বইগুলি কক্ষ মধ্যে সেল্‌ফের উপরে রাখিয়া আসিয়া বিধু কাহল—"চল,।"

পুত্রের বিবাহ দিয়া বধু গৃহে আনিয়াও রাইমনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে মনে ভয় হইতে লাগিল ছেলে এই বুঝি কিছু বলে—

ছেলে কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিল না, বলিল সরলাকে। কহিল—"ও তোমার কে হয় বৌ, যে এত তোমাদের—"

সরলা অতটা তলাইয়া দেখিল না। দেখাও তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। হাসিয়া কহিল—"কেন জান না নাকি ;—বিধুদার সঙ্গেতো সেই ছোট-বেলা হ'তেই আমার মেলামেশা।—"

"ওকে তুমি ভালবাস ?—

"তা আর বাসবো না'—তোমার কথাগুলো যেন কেমন ধারা"—রামগোপালের চক্ষুর্দ্দয় ধ্বক্ করিয়া একবার যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সরলা কহিল—"তোমার কথাগুলো এত বেঁকা বেঁকা কেন ব'লতে পার—"

রামগোপাল যেন অতিকষ্টে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—"সে তো তোমার কাছে লাগবেই বৌ।—হয়তো তোমার সঙ্গে কথা ব'লবার সময়ে অনেকটাতে আমার গলার স্বরে জড়িয়ে যায়।—"

সরলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এইরূপ কথাগুলো আর কাহারও মুখে সে শুনিয়াছে বলিয়া মনে হইল না,—কিন্তু কথাগুলির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল কথাগুলি যেন কেমন ধারা—রামগোপাল স্ত্রীর সহিত কথা কওয়া বন্ধ করিয়াদিল। সরলা ইহার কারণ কিছু বুঝিল না ; জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কোনও উত্তরই রামগোপালের নিকট হইতে পাইল না।

তাহারই প্রায় নয় দশ দিন পরে রামগোপাল যখন রাত্রে স্ত্রীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে বিধুর সহিত তাহার মেলামেশাই রামগোপালের এই ব্যবহারের কারণ, তখন সে যেন কেমন ধারা হইয়া গেল। চক্ষু ভরিয়া অশ্রু উছলিয়া উপধানের উপরে ঝরিয়া পড়িল। রামগোপাল ডাকিল—বৌ—

ভগ্ন কণ্ঠস্বর যথা-সম্ভব পরিষ্কৃত করিয়া সরলা উত্তর দিল। রাম গোপাল কহিল—"কাঁদ্‌ছ নাকি ?—

তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া সরলা কাহল—"ভারি দায় পড়েছ আমার।—পাগল নাকি—"

(৩)

বিধু আসিয়া ডাকিল—সরি—

সরলা রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সেই চিরসুন্দর হাসিটুকু আজ যেন তাহার অধর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। কহিল—তোমার সঙ্গে আজ একটা কথা আছে—

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিধু নিজের অজ্ঞাতে যেন একটু চমকিয়া উঠিল।

কাহল "কি কথা সরি ?—"

"রান্নাঘরে এস, তরকারী চড়িয়ে দিয়ে ব'লব এখন। নইলে এখন তো আমার দাঁড়াবার সময় নেই, এস।" বালিকা সরলা ধীরপদে রন্ধন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিধুও রন্ধন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল

একখানি পিঁড়ী পাতিয়া দিয়া সরলা কহিল "বোস।—"

বিধু বসিল। কহিল—"কি ব'লছিলে ?—"

সরলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—"তুমি আমায় আর "সর" ব'লে ডেক না বিধু দা,'—বৌদি ব'লেই ডেক। আর আমিও তোমায় বিধুদা ব'লে ডাক্‌বো না ঠাকুরপোই ব'লবো। সে চুপ করিতেই দেখিতে পাইল বিধু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। সরলা দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিল।

বিধু কহিল—"কিন্তু আজ হঠাৎ কেন তোর এ খেয়াল হ'ল সরলা ? কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধরা গলায় কহিল—"তুমি কি কিছু বোঝ না বিধুদা'—না আরও বুঝবার সাধ হয়,—"কেন, তোমার দাদাকে কি আজও চিনতে দেরী রয়েছে ?—"

বিধু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! সরলা কহিল—"চল্লে—সবটা শুন্‌লেনা—"

"না—ওকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তবে তোমার কথা প্রতিপালন ক'রবার চেষ্টা ক'রবো।"—

বিধু দ্রুতপদে রন্ধন গৃহ ত্যাগ করিল। সরলা হাতের খুন্তিটা কড়ার মধ্যে ফেলিয়া নীরবে আগুণের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পর হইতে বিধু যথাসম্ভব সরলার সঙ্গ এড়াইয়া চলিল, কিন্তু সরলা তাহা সহজে পারিতেছিল না। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, যে আজ হইতে বিধুদা'ও তাহার পর হইয়া গেল। সেও বুঝিল না যে সরলা তাহাকে কতখানি ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে।...

একদিন না থাকিতে পারিয়া সে অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে বিধুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"আচ্ছা, তুমিও কি আমায় জ্বালাতেই চাও শুধু ?—"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিধু কহিল—"কেন ?—"

—"আমার দিকে আস না, কথাও কও না—কেন তা আমি বুঝতে পারিনি'—আমি—আমি এত কি দোষ ক'রেছি তোমার কাছে, বলতে পার ?—" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিধু হাসিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল—"তুই দেখছি পাগল হ'য়েছিস সরি।—নইলে এমন ধারা কথা ব'লতে পারিস ?—"

সরলা কথা কহিল না, শুধু নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধু সরিয়া আসিল। একখানি হাত সরলার মস্তকে স্থাপন করিয়া ডাকিল—"সরি—"

সরলা কথা কহিল না।

বিধু একটু হাসিয়া বলিল—"তোর ওপরে কি আমি রাগ ক'রে থাকতে পারিরে !—তুই যে আমার বোন্, সরি। তবে এইটুকু জেনে রাখ যে—শুধু শুধু —তোকে বিপদে ফেলতে, মানে, কারও বকুনি কিম্বা মুখ ভার, আমার জন্যেই সহ্য ক'রতে দিতে ইচ্ছে আমার নেই সর।—শুধু, তুই সুখে থাক্, এই আমার ইচ্ছে।"—

সরলা কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া মুখ নত করিয়া ফেলিল।

(৪)

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল।...

রামগোপালের মাতা মারা গিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি হইয়া যাইবার মাস কতক পরে রামগোপাল বিধুকে ডাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়ী ভাগ করিয়া দিল।...বিধু বাড়ীর অন্যাংশে চলিয়া গেল।

সরলা—রামগোপালের আদেশ ক্রমে সমস্ত জিনিস পত্র ঝি-চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিল। বিধু শূন্যকক্ষ মধ্যে একাকী পাদচারণা করিতেছিল। ঝি চাকরকে জিনিস লইয়া আসিতে দেখিয়া সে একটু হাসিল মাত্র। কহিল "নর্দ্দমায় ফেলে দিয়ে আয় মেধো,—ওতে দরকার তো আমার কিছুই নেই।..."

জিনিস লইয়া মেধো পুনরায় সরলার নিকটে ফিরিয়া গেল। আদেশের স্বরে সরলা কহিল—"বারান্দায় রেখে দিয়ে ব'লে আয়, যে তোমার জিনিস তুমি ফেলে দাও গে, আমরা পারব না।—যা, আর দাঁড়াসনে।"—

মেধো চলিয়া আসিল। বলিতে হইল না, বিধু আপনিই শুনিতে পাইল। মেধো জিনিস দিয়া চলিয়া গেল। বিধু বাহিরের রৌদ্র—দগ্ধ আকাশের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া জানালার উপরে বসিয়া রহিল।

রামগোপাল কোর্টে যাইবার পরে, দ্বিপ্রহরে সরলা যখন বিধুর অংশে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল তখনও বিধু তেমনি ভাবে নীরবে বসিয়াছিল। সরলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল— বিধুদা-

বিধু চমকিয়া চাহিয়াই বিরক্তি ভরে বলিয়া উঠিল "আবার তুমি লুকিয়ে এলে যে'—ভয় হয় না প্রাণে" ?—সরলা বারান্দা হইতে জিনিস গুলা কুড়াইয়া আনিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে নিশ্চিন্ত ভাবে কহিল, ভয় হ'বে কেন, চিরদিন তো ওঁর কথা রেখে চ'লবই, তবে আজকের দিনটি ছাড়া। পরে একটু হাসিয়া

কহিল "ভয় নেই, তোমার সামনেও এর পর হ'তে আমি আসব না।—"

বিধু মুখ ফিরাইল না, শুধু তেমনি বিরক্তি ভরা স্বরে কহিল—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাই-ই হয়। আর কিছু চাইনে আমি তোমার কাছে।"

বিধুর কথা শেষ হইতেই সরলা সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে বিধুর মুখের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল, কিন্তু কিছু উত্তর দিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নত হইয়া হস্তস্থিত কার্য্যে মনো-নিবেশ করিল।

বিধু তাহার আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে কহিল—"আমার গেরস্তালী গুছিয়ে দেবার জন্যে তো তোমায় ডেকে আনা হয়নি নতুন বৌদি। রাখ ওগুলো, হাতের নরমতলা যে লাল হ'য়ে যাবে, ফোস্কা পড়'বে।—ছাড়।"—

সরলা কোনও উত্তর দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই এই ভাবে সে হাতের কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, ইহার ঠিক দিন তিনেক পরেই একদিন গভীর রাত্রে বিধু কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিস লইয়া গৃহত্যাগ করিল। প্রভাতে উঠিয়া সরলা রামগোপালের নামে একখানি পত্র পাইল। তাহাতে লেখাছিল—

পূজনীয় দাদা,

সম্পত্তিতে আমার কোনও দরকার নেই,—বাড়ীতেও নেই। আমি আজ এই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইলাম, আর আসিব কিনা বলিতে পারি না। তবে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন ফিরিতে না হয়। আমার নামের যাহা কিছু ছিল, আজ হইতে সমস্তই আপনার। প্রণাম লউন, ইতি—

বিধু।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সরলা স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। প্রভাতের বাতাস তখন চতুষ্পার্শ্বে কি একটা উদাস স্বরের অজানা গান গাহিয়া চলিয়াছে। ... ...

* * * * * *

সাত বৎসর পরে ... ...

তেমনি ভাবেই দিন চলিয়া যাইতেছে। বিধু আর ফিরিয়া আসে নাই। সে কোথায় এবং কেমন আছে তাহাও কেহ জানিত না।

বৈকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম-গোপাল, উপরের এক খানি ইজি চেয়ারে বসিয়া, পার্শ্বস্থিত ছোট টেবিলের উপর জল—খাবারের রেকাবী হইতে এক এক খানি খাবার তুলিয়া লইয়া মুখে দিতেছিল।

পার্শ্বে চেয়ারের উপরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল সরলা। রামগোপাল ডাকিল—বৌ—অন্যমনে সরলা উত্তর দিল—"কেন" ;—

"আজ ফুটপাতের ওপোরে বিধুকে ভিক্ষে করতে দেখে এলুম, অন্তরে সরলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—কি কি বল্লে ?—

পূর্ব্ব কথাটির পুনরুক্তি করিয়া রামগোপাল হাসিল সরলা আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। তড়িৎস্পর্শে সে যেন একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

পথের পার্শ্বে অন্ধ ভিক্ষুক একাকী বসিয়াছিল, হঠাৎ একটি চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর আসিয়া কানে বাজিল—"বিধুদা—" বিধু আপনার অজ্ঞাতেই যেন শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"কে, কে তুমি ?—

"আমি সরলা।—"

তেমনি স্বরে বিধু কহিল—"তুমি, তুমি এসেছ ?—কিন্তু, কেন ?—"

সরলা রুদ্ধ স্বরে কহিল, তোমায় নিয়ে যেতে—

বিধু কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল। সরলা বিধুর হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিল—' আমার হাত ধরে ওঠ বিধুদা, চল।—

বিধু কহিল—"না, সরলা, আমি আর যাব না সেখানে, আর যাব না।—"

"যাবে না ?—কেন ? –"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিধু কহিল—"এমনি ভিক্ষে করেই তো দিন আমার বেশ কেটে যাচ্ছে—আবার কেন সরি"......সরলা বলিল—"তুমি যা তোমার দাদাকে দিয়ে এসেছ তা তোমার দাদারই থাকবে বিধুদা,—তার থেকে তোমার খরচের জন্যে একটি পয়সাও আমি নেব না। আমার হাতে যা আছে তাতে যে তোমার জীবনটা সচ্ছন্দে কেটে যাবে, এই কথাটা আমি বলতে পারি।—"

বিধু নীরবে কি ভাবিতেছিল। উত্তর দিল না। সরলা কহিল—"ওঠ, তোমায় না নিয়ে যে আমি যাব না বিধুদা। বিধু কি একটা কথা বলিতে মুখ তুলিতেই সরলা দেখিতে পাইল—অন্ধের দুই চক্ষুর কোন বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সরলা ডাকিল "বিধুদা"—শীর্ণ ওষ্ঠের উপরে ম্লান একটু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বিধু কহিল—"আশীর্ব্বাদ করি, – সরি তুই সুখী হ', বোন্। —কিন্তু আমায়, আমায় আর তুই টেনে নিয়ে যেতে চাসনে দিদি"—। অন্ধ হ'লেও এ আমি বেশ সুখেই আছি।—

আর্ত্তস্বরে সরলা ডাকিল—"বিধুদা—"

বিধু কহিল—সত্যই—কি তুই আমায় নিয়ে যেতে এসেছিস, সরি—সরলা কথা কহিল না, শুধু দুই ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু অন্ধের ললাটের উপরে ঝরিয়া পড়িল।......

বিধু ক্ষণ-কাল নীরবে থাকিয়া ডাকিল, সরি—

"কেন ? -"

"আচ্ছা আজ তুই যা, কাল আমায় নিয়ে যাস।—

পরদিন প্রভাতে সরলা ও অনুতপ্ত রামগোপাল যখন বিধুকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিল, তখন যে স্থানে বিধু বসিয়া থাকিত সেখানে কেহই ছিল না।

তাহার পার্শ্বের বটগাছের ছায়ায় যে খঞ্জ ভিক্ষুক বসিয়াছিল রামগোপাল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিল—কাল রাত্রে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানে না।

সরলা স্তব্ধ ভাবে ফুট-পাতের উপরে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল।—রামগোপাল ডাকিল—"বৌ—"

সরলা উত্তর দিল না। রামগোপাল কহিল—"আর কেন,—চল যাই।" সরলা রামগোপালের মুখের প্রতি চাহিয়া হতাশ স্বরে কহিল—তাই চল—

উভয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

উভয়েই নীরব। এক জন ভাবিতেছিল—সে চলিয়া গেল, কিন্তু কোথায় ? আর কি সে ফিরিয়া আসিবে না ? – কবে ? সে আবার কবে আসিবে ?—

আর একজন ভাবিতেছিল—যে আর এক জনকে দুঃখের অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করিতে সেচ্ছায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া—কোন অচেনা স্থানে চলিয়া গেল সে কত দূরে ?





রূপের নেশা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঠোঁটের একটু সুধা
ঢালো—ঢালো ;
তোমার রূপের রঙ্গিন্ বাতি
জ্বালো—জ্বালো ।

তোমার অলস পরশ খানি,
তোমার সোহাগ সরস বাণী,
তোমার কাজল ডাগর আঁখি
ভালো—ভালো ।
রঙ্গিন্ ঠোঁটের মদির সুধা
ঢালো—ঢালো ।

দীপ্ত সুরায় পেয়ালাখানি
ভরো—ভরো ;
রূপের নেশায় মাতাল মোরে
করো—করো ।

কুসুম লতার বাঁধন দিয়ে
নিবিড় কোরে জড়িয়ে নিয়ে,
নিভিয়ে আনো আমার আঁখির
আলো—আলো ;
তোমার ঠোঁটের একটু সুধা
ঢালো—ঢালো ॥



দক্ষিণান্ত

শ্রীশচীন সেনরায়

অসিতা তাকে লক্ষ্য করেছিল - আলাপ হবার অনেক আগেই।

অসিতা মনে আনতে পারে না—কোন্ দিন যুবকটীকে প্রথম দেখেছিল—কোন অবস্থায় বা কোথায়।...কিন্তু খুব চিন্তা করলে হয়ত বা পারতে পারেও আবার। —

নরেশ খালি একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের 'বাসেই' সহরে যাতায়াত করে। বাদে রবিবার,—তা' নৈলে রোজ। সকাল নয়টার সময় যে 'বাস' খানি এসে দাঁড়ায় পেসেঞ্জার নিতে অসিতার বাড়ীর দ্বারেই, সেখানির দোতালার উপর একটী সিটে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে।

সেই দিন—

অসিতাকে একটু সকাল ক'রে হাসপাতালে যেতে হবে। তাই নয়টার 'বাস' ধরবার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে।—

'বাস' আসে। অসিতাও উঠে। মধ্যে এক তিল স্থানও নেই। খালি নরেশ যে 'সিটে' বসেছে সেখানে ঠেলাঠেলি করে বস্‌লে একজনের আন্দাজ জায়গা হবে।

পুরুষমানুষের সাথে লেগে বসতে ওর যেন কেমন—কেমন লাগে। ও যে স্বভাবতঃই লজ্জালু। বেশী লোকের সাথে মিশতে বড় একটা চায় না। তাই দোতালায় জায়গা আছে মনে করে সিড়ি দিয়ে উঠ্‌তে যায়—তখন কন্‌ডাক্টার বাধা দেয়। উপরে নাকি একটুও স্থান নেই।

বাস ছোটে বেদম।—

অগত্যা ওখানেই বসবার জন্যে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে একটা হাতল ধরে এগোয়।

বসতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভাবে, এই যুবকটীকেও রোজ দোতলার উপর বসতে দেখি।

সহসা চোক তুলে চাইতেই সাম্নে এক মহিলাকে দেখে নরেশ যেন কেমনতর হয়ে গেল। পরে নিজেকে একটু কষ্টে রেখেও তার পাশে হৃষ্ট অন্তরে একটা জায়গা করে দেয়।

বিনয় নম্রভাবে অসিতা বসে।

নরেশ অতর্কিতে দু'চার বার অসিতার অনুপম মুখখানা দেখে, মনে ভাবে হয়ত, কোথায় যেন একে একবার দেখা হয়েছে।

অসিতা কিন্তু তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনে ফেলে। খুসীতে ভরে ওঠে মন। সহসা ওর মনটা যেন অহৈতুক পুলকে নেচে নেচে উঠল যেমন নাকি শারদীয়া পূজায় মুখরিত ঢাকে আরতির তালে—

নরেশ আস্তে আস্তে হস্তস্থিত খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে, জোড়-করে-রাখা হাটুর 'পরে রাখে, খুব সন্তর্পণে মোচড় ফিরে অসিতার দিকে বসে। একটা উছলৎ দেখিয়ে হেসে কথা পারে—আপনাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি—না? ভারী চেনা-চেনা লাগচে কিন্তু আপনাকে!

অসিতা কোন জবাব দিতে পারে না। জিব আড়ষ্ট হয়ে আসে। ভাবে, একজন অপরিচিত যুবকের সাথে আলাপ করতেই যে কত লজ্জা করে তার উপর আবার একেবারে গা ঘেঁসে বসা---ছিঃ!

নরেশ আবার বল্লে—বাস্তবিক, আমার ভারী

দুঃখ হয় যে কিছুতেই মনে করতে পারছিনে কোথায় দেখেছি। আপনার কি মনে আছে?

অসিতা ধীরে ধীরে মাথাটা দোলায়। সে ভাবে, কি একটা বিচ্ছিরী শুনাবে যদি আমি তার মুখের উপর বলে দি 'না'—। তাই বল্লে—সত্যি, আমিও কিন্তু মনে করতে পারছিনে কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল একদিন!

বলেই নির্ম্মল আনন্দ হেতু একটা স্বচ্ছ সুশিতল তরল হাসি অসিতার ঠোঁট বেয়ে যেন গড়ায়।

আলাপ-ই আস্তে আস্তে সঙ্কোচের অবগুণ্ঠন উদ্ঘাটিত করে।

ক্ষণিকক্ষণ চুপ করে থেকে নরেশ আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি এই সময় রোজ এই বাসেই যান?

অসিতাও হেসে জবাব দেয়—সাধারণতঃ কিছু পরেই যাই! আপনি তো এই বাসেই যান রোজ না?

—হাঁ, আমি প্রায়ই দোতলায় উঠে যাই। কিন্তু আজ যা ভীড়! আমি 'লাকি' যে নীচে একটা জায়গা পেয়েছি।

—আপনার বুঝি আফিস করতে হয়?

—হাঁ।

অসিতা একদৃষ্টে নরেশের প্রতি স্নিগ্ধ চোখে চায়, আবিষ্কার করে বাস্তবিকই লোকটী নিতান্ত ভদ্র,—তার কথা বলবার ধরণ, তার বেশ-ভূষাও

—আপনি কোন্ বাসে বাড়ী ফেরেন? নরেশ উৎসুকের সহিত জিজ্ঞেস করলে।

—কাজ বেশী থাক্‌লে শীগ্‌গীর ফিরতে পারিনে। তা' নইলে রোজই প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরি

অসিতা হাসপাতালে গিয়ে ভারী অস্বস্তি অনুভব করলে। মনের কোন একটা জায়গায় যেন সহসা ভয়ানক বেজুত হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে চুপচাপ বসে রয়েছে; তখনও যেন ওর মনের পটে স্পষ্ট করে কে এঁকে দিয়ে গেল—যুবক নরেশ বাবুর সুচারু পেশল দেহখানা, তার ভাসা-ভাসা কুচ্‌কুচে চোক দুটী।

নরেশ দত্ত নিশ্চয়ই সচ্ছল অবস্থাপন্ন একজন ভদ্রলোক। অসিতা শয্যা গ্রহণ করতে গিয়েও সে' কথাই ভাবলে।

সে দিন শনিবার।—

সাক্ষাৎও সেই সাড়ে নয়টার বাসেই।—

একত্র এক 'সিটেই' দু'জনে বসে, পুট্‌র-পুট্‌র করে দু'জনে আলাপের তুবড়ি ছুটায়।

কথায় কথায় নরেশ বলে, আপনি বায়স্কোপ-টায়স্কোপ দেখ্‌তে যান না?

ঘাড় নেড়ে অসিতা বলে—হাঁ, যাইতো। ভালো ফিল্ম হলে বড় একটা বাদ পড়ে না।

—কাল তো খুব ভাল ফিল্ম আছে। চলুন না কেন কাল যাওয়া যাক?

—কি ফিল্ম? কে করেছে?

—'ডার্ক এঞ্জেল' (Dark angel)। প্রধান এক্টার হচ্ছে 'রানাল্ড কোলম্যান' আর এক্ট্রেস—'ভিমা-বেংকি'

—'রোনাল্ড কোলম্যান'! কিন্তু 'ভিমা-বেংকির' নাম তো আগে শুনিনি।

—বড় 'প্লে'তে এই এক রকম নূতন নাব্‌ছে। কাগজে তো ওর ভয়ানক সুখ্যাতি পড়েছি। 'চারলি' নাকি এই ছবি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে—'রুড্‌লাফ-ভেলান্টেস্‌' নাকি এ ফিল্ম ও 'ভিমা-বেংকি'কে দেখেই তাড়াতাড়ি নিজের জন্যও 'সান অফ শেখ্' (Son of shick) আর ঈগল্ 'প্লে'তে প্রধান নায়িকা করে নিলে।

—তাই নাকি! আশ্চর্য্য সুরে অসিতা বল্লে। পরে রাজি হয় বায়স্কোপে যাবার জন্যে। স্থির করে

যে নরেশ চারটা কি সাড়ে চারটার সময় অসিতার হাসপাতালে এসে তাকে নিয়ে যাবে।

পরের দিন—

ঠিক সময়েই নরেশ,—অসিতা যে হাসপাতালের 'নার্স' সেখানে গেল। গেটের সাম্নে দাঁড়াল। তাকে দেখে হাসপাতালে অসিতার বিশেষ আলাপী জনকতক নার্স জানালা দিয়ে তাকে দেখতে লেগেছে। এতে অসিতার মন যেন বেশ গর্ব্বিতা হয়ে ওঠে।

নিকটেই আরেক জন নার্স, নাম তার সুকৃতি,—ভারী পরশ্রীকাতরা, হিংসুটে। ভ্রূ কুচ্‌কে, নাক সিট্‌কে শুধায়—উনি কি তোমার কাছে এসেছেন নাকি? কে তোমার?

—এই যে গিয়ে—বন্ধু। একটু সলজ্জ সুরে অসিতা উত্তর করে।

—আগে তো তাঁর কথা কোন দিন বল নি।

বলেই জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অসিতার প্রতি একটা খোঁচা-মারা দৃষ্টিতে চায়, একটা বিদ্রূপ পূর্ণ হাসি হাসেও। পরে সাম্নের 'বেডের' একটা রুগীর কাছে জ্বর দেখবার জন্যে যায়। সুকৃতি চলে গেলে উষা বল্লে—ভাই অসিতা! তোর বন্ধুকে আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে। খুব সুরুচি-সম্পন্ন তো। নিশ্চয় তিনি বড়লোক—না?

উষার কথাগুলিতে বেশ একটা অকৃত্রিমতার ভাব আছে।

দুর থেকে সুকৃতি শুনতে পায়। এতে যেন ভারী গাত্রশূল হলো। ঈর্ষার সুরে বল্লে, দেখতে তো বেশই লাগে। ধ্যাক্ করে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, বুঝলে?

সুকৃতির কথাগুলো যেন অসিতা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিল না, তাই একটুখানি চোরা হাসি হাসলে। একটা জবাবও পর্য্যন্ত দেয় না। বরং সুকৃতির হিংসাটা প্রচণ্ডভাবে জ্বালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ধুপ্ ধুপ্ করে নেমে নরেশের কাছে গেল; পরে একটা টেক্সি ডেকে তার চোকের সাম্নেই দুজনে একত্র বসে' চলে গেল।......

গোটা কতক সপ্তাহ অতীতের গর্ভে মিশে যায়

সে'দিন সুকৃতি অসম্ভব রকম মুখখানা কালো করে' অসিতার সাম্নে এসে দাঁড়ায়,—কাল বৈশাখীর মেঘে ঢাকা কৃষ্ণা আকাশখানা আর কি

কপালের চামড়া কুঞ্চিত করে সুকৃতি একটু উত্তেজিত সুরে প্রশ্ন করলে—অসিতা, তুমি কি জান তোমার বন্ধু কি করেন?

—কে? কার কথা বলচো? একটু আম্‌তা আম্‌তা করে অসিতা বল্লে।

—ঐ যে নরেশ বাবু! যিনি এখানে এসেছিলেন।

—নাঃ! আমি ভাল করে জানি না। একথা আমি তাকে কক্ষনিই জিজ্ঞেস করিনি। কেন—বলতো ভাই কি ব্যপার? একটু ভীতু কণ্ঠে শুধোয়।

—এই যে তোমার গিয়ে—না থাক,—বলেই কতক্ষণ চুপ করে থাকে, পরে আপনা-আপনিই আবার বলতে থাকে—আমি তো যেদিন ওকে দেখেছি সেইদিনই বলে রেখেছি লোকটা খাঁটি না। আমার সন্দেহ হয় ও একটা সামান্য লড়িম্যাণ যে!

—কেন—কি করে বুঝলে? ব্যাকুলিত সুরে অসিতা বল্লে।

—আরে,—সেদিন তো যাচ্ছিলাম ডালহৌসী স্কোয়ারের ধার দিয়ে, দেখি কি ওই নরেশ অনেকগুলি মাল নিজেই বয়ে লড়িতে উঠাচ্ছে। কী ধাপ্পাবাজ লোকটা! সুন্দর সেজে-গুজে ভদ্রলোকটী হয়ে থাকে!

আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ। চিন্তান্বিতা ভাবে অসিতা বল্লে। হঠাৎ তার সুন্দর ফর্শা চেহারাখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে উঠল

অসিতার শঙ্কিত ভাবটা সুকৃতি চট্ করে ধরে ফেলে, ভাবে—তার কথাগুলি কার্য্যকরী হয়েছে, তাই আরও একটু ভাল করে শানিয়ে দেবার জন্যে

আবার বল্লে—বিশ্বাস তো কর না! শোন তবে। সেই দিন তাকে ঐ রকম করতে দেখেই কাছে গিয়ে আলাপ করলুম,—তোমার কথাও বল্লুম। সে তখন ফট্ করে ঘাব্ড়ে গেল। আর বেশী ভিড়লে না। অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় যেন।—

বলতে বলতে খীল্ খীল্ করে হাসতে লাগ্ল। অসিতা এমন একটা অবস্থা বোধ করলে—ছ'চোক দিয়ে যেন কান্নার ফাপ্ড়ি হুঁ-হুঁ করে এখনই ছুটবে আরকি। আৎকা গালে হাত দিয়ে একেবারে মাটীর উপরেই বসে ভাবলে—যখন একবার নিজেকে সমর্পণ করে ফেলেছি—তখন কি আর পরিবর্ত্তন করা যায়? যদি সে রাস্তা ঝাড় দিয়েও জীবিকা অর্জ্জন করে তবু আমার এখন ক্ষোভ নেই। তারপর প্রকাশ্যে স্বকৃতিকে শুনিয়ে বল্লে—ভাই! তবু তো কোন অসদুপায়ে রোজগার করে না।...

স্বকৃতি একটা অস্বাভাবিক ভাবে হাসি দেয়।

– তা বেশ, ভাল কথা! বলেই আবার আরেকটা অশ্রাব্য হাসিও।—

স্বকৃতিকে চোখের সাম্নে দেখলে ওর মন বিষিয়ে ওঠে।

কী নীচ এর অন্তঃকরণ! কী ঘৃণিত এর মন!—

সেই দিনও অসিতা ছুটীর পর নরেশের জন্য মটর ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কচ্ছে

নিয়মিত সময়ের বাসে অসিতা ওঠে পড়ে, একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা ওর মনকে ছেয়ে ফেলেছে—

নরেশ নাই ওখানে।—

তাই তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার জন্যে। কত 'বাস' যায়, কত 'বাস' আসে;—তবু নরেশের পাত্তা নেই।

নিতান্ত হতাশ ভাবে অসিতা একাই বাড়ীর দিকে চলে। ও যেন নিজেকে ছন্দ-পতন কবিতার মতন বোধ করলে। ওর পুলকিত অন্তরটা যেন হঠাৎ বোবা ঝিঁঝির মতন হয়ে গেল।

বাড়ী গিয়ে হাসপাতালের কাপড় জামা জুতা না ছেড়েই বাড়ীর পেছনে মাঠটার ধারে গিয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে বসে রইল। দূরে বনের গাছের পাতার মর্ম্মর ধ্বনির সাথে ওর নিজের উদাসী অন্তরকে মর্ম্মরিত করতে চায়। অতি দূরের একে বেঁকে প্রবাহিতা কাহিল খালটার কলকল্লোলের সাথে কল্লোলিত করতে চায় ওর হুতাসী প্রাণকে। নক্ষত্র বিহীন বিস্তীর্ণ আকাশের নির্জ্জনতা ও নিঃসঙ্গতার সাথে মিতালি পাতাতে চায় ওর বন্ধ্যা মন।······

অনেকক্ষণ ওখানে বসে থেকে কত কথা ভাবে, আর খালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। পরে ঘরে গিয়ে নরেশকে এক চিঠি লিখতে বসে। মনোভাব ভাষায় ফুটান একপ্রকার যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।······ তবু লিখ্বেই।—

"বিকেলে ওইখানে তোমার সাক্ষাৎ না পেয়ে আমার মনে যে কী রকম একটা অবস্থা হলো—তা তোমাকে কে জানায়? সেই অতীত দিনগুলো হয়ত আমার জীবনের অনন্ত সুখের দিন গেছে। তুমি কেন না জেনে, না শুনে আমার উপরে রাগ করলে, বন্ধো! স্বকৃতি কি তোমাকে কোন অপমান-জনক কথা বলেছে? মাপ করো। পবিত্র বন্ধুত্বকে নষ্ট করো না। তুমি যা-ই হও না কেন তবু তুমি আমার কাছে বন্ধু। দয়া করে একবার এদিকে এসো, লক্ষ্মীটী।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থেকেও নিদ্রাদেবী অনুগ্রহ করতে চায় না।—

পরে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই নির্দ্ধারণ করে—নরেশ যদি একটা কুলিও হয় তবু ওর সংকল্প অক্ষুন্নই রাখবে।

ঠিক পুরোপুরি দু'টী দিন কাটে।

অসিতা নিজেকে অসুস্থ ও দুর্ব্বল বোধ করে, তাই হাঁসপাতালেও অনুপস্থিত থাকে।

ভোর অনেকক্ষণ হয় হয়ে গেছে; তবু আধা জাগ্রত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। সহসা যেন চম্‌কে ওঠে, চোক মেলে চেয়ে নরেশকে সাম্নে দেখেই ধর-ফরিয়ে উঠে পড়ে, বলে,—মাইরি, তুমি যে এসেছ তা ঘুমের চোকে টের পেয়েছি,ভাব্‌ছিলুম বুঝি স্বপ্নেই তোমাকে দেখ্‌ছি। আমার চিঠি পেয়েছ ?—

কোন কথা না কয়ে নরেশ এগিয়ে অসিতার অতি কাছে গেল, ওর পুষ্ট হাতখানা ধারণ করে একটা বেশ মোলায়েম ভাবে চাপ দেয়;—এইটুকুতেই যেন অসিতার সমস্ত কথার উত্তর দিল; তাই কথা বলে জবাব দেওয়ার কোন দরকার হয় না।

চা পান দু'জনে একত্রই সম্পন্ন করে।······

সোমবার দিন কিনা তাই নরেশের সময় খুব কম, আফিস করতে হবে। সকাল সকাল যাবার জন্যে উঠে পড়ে। তাই আর বেশী আলাপ জমে না। যাবার বেলায় বলে যায়, আচ্ছা উঠি—কেমন ? বিকেল বেলা আসবো একবার, থেকো কিন্তু। আজ 'ইডেন গার্ডেনে' গেলে হয়,—যাবে ?

বিকেল বেলা একবার সে আসবে শুনে অসিতা আনন্দে ডগমগ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বল্লে—হাঁ, এসো কিন্তু। বেশ, যাওয়া যাবে 'ইডেন গার্ডেনে;— ওঃ কতদিন যাবৎ ওদিকে যাইনে !

নরেশ বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে পেছন দিকে একবার ফিরে তাকালে।

অসিতা দরজায় দাঁড়িয়ে দু'হাত জোর ক'রে নিজের হাত ঘাড়ের উপর রেখে, স্থির চোকে চেয়েছিল তার যাওয়ার পানে। নরেশকে আর একবার তাকাতে দেখেই জানিয়ে দিলে—এসো কিন্তু লক্ষ্মীটী। দেখো ভুল না যেন। এসো—এসো—এসো—বুঝলে ?—

মুহূর্ত্তের মধ্যে ওর···বেশ ঝড়-ঝড়ে রৌদ দিনটা যেন একেবারে মেঘলা হয়ে গেল।

পরে অসময়েই বিছানায় আবার শোয়, শুয়ে শুয়ে মনে ভাবে—আজও তো সে কি কাজ করে তা' স্পষ্ট করে' কিছুই বল্লে না। তবে কি সুকৃতির কথাই- আর ভাব্‌তে পারলে না। শেষে নিজের মনে নিজেকে প্রবোধ দিলে—করুক গে সে যে-কোন কাজ ! তবুও পবিত্র। চাঁদিনী যামিনী হাসা উজ্জ্বল আলোক দিয়ে আমার কি হবে ? চাইনে আমি তা ! আমার তুলসীতলার নিম্‌নিমে প্রদীপটী অক্ষয় হয়ে থাক্। তারপর বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়—ঠাকুর ! এই প্রদীপটী আমায় জ্বালাতে দাও, তার পবিত্র আলো আমায় ভোগ করতে দাও।—কোন বাদ সেধো না !

নির্দ্ধারিত সময়ও কেটে যায়, তবু নরেশ আসে না

অসিতা নিজেকে যেন অবশ স্থবির ব্যক্তির মত বোধ করলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ওর বুকের পাজড়া ভেদ করে শা করে বেরিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ যাবৎ কত মস্ত একটা আশা বুকে চেপে অসিতা বসেছিল ! কিন্তু হায় !

সারা পৃথিবীটাই যেন ওর কাছে একেবারে তেঁতিয়ে উঠ্‌ল। চুপ করে নিরাশার ছায়া বক্ষে চেপে সটান শয্যায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বারাণ্ডায় জুতার শব্দ শুনে অসিতা তাড়াতাড়ি উঠে, একেবারে চোকের সাম্নেই নরেশকে দেখে ওর মন প্রফুল্লে এমন দীপনীয় হয়ে ওঠে ঠিক বাড়ীর সাম্নে পুষ্পিত কৃষ্ণচুড়া গাছটার মতনই যেন,—

নরেশকে অসিতা নিজের পাশেই বসতে ইঙ্গিত করে।

নরেশও বসে,···নিঃসঙ্কোচেই—

একটু ভনিতার সুরে অসিতা বল্লে—তবু যা' হো'ক। আমি তো প্রতীক্ষা করে করে হয়রান হ'য়ে গেছলুম। ভাব্‌লুম এলে না বুঝি আজ আর।

নরেশ একটু লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দেয়—রাস্তায় একটা লোক আটকালে, তাই।

—যাক্, একটু চা করে দি' ?

—ক্ষেপেছ ? এই কতক্ষণ হ'লো খেয়ে-দেয়ে বা'র হয়েছি।

—না—তবু একটু খাও।

বলেই রান্নাঘর থেকে একটা 'ডিসে' করে খান কতক লুচি, তরকারী, সরভাজা আর কত কি এনে হাজির করলে। পরে চা-ও।

—ওরে-- বাবাঃ! এত গুলো!

—আহাঃ—হাঃ, এতগুলি না—আরও কিছু! নাও, খাও তো ধীরে ধীরে

-তোমরা মেয়েমানুষ কিনা—কেবল খাওয়াতে পারলে-ই তোমাদের সব হলো।

অগত্যা খেতে সুরু করলে।

—আজ আর যাওয়া হলো না বেড়াতে বলেই গায়ের দামী চাদরটা নির্ব্বিবাদে অসিতার হাতে দেয় আলনার উপর থুয়ে দিতে।

খানিকক্ষণ মৌন ভাবে কাটে।

পরে নরেশ আরও একটু অসিতার কাছে সরে গিয়ে বসে বলে—তোমার চিঠি আমি পেয়েছি সেই দিনই

—পেয়েছিলে?

—হাঁ।

—কি স্থির করলে? ওহ্! তুমি যে আমার কি করেছ তা' কি তুমি একবার ভাব?

তবু কোন কথা কয় না। ধীরে ধীরে অসিতার গায়ের একেবারে কাছে লেগেই বসল

অসিতা আরও বল্লে—তুমি আমার মনটা ছিঁড়ে নিয়েছ। তোমার ভাব্না, তোমার চেহারা, তোমার কথা বলার ধরণ, তোমার সব কিছুই যে আমার চোকে ভাসে। তা আবার মনে করতে আমি যে কত ব্যাকুলিত হয়ে পড়ি—সে-টা তোমাকে কে জানায়? আমার খরচা চালাবার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। নিজেই রান্না-বান্না, ঘর ঝাড়—সব আমিই করবো।

—লক্ষ্মীটী, তুমি এসব কি বলচো? জেনো, নিজের স্ত্রীকে সুখে-সচ্ছন্দে রাখবার মত শক্তি ও অর্থ আমার খুবই আছে।

খুব সরল অথচ বিনীতভাবে আসতা উত্তর করে—কেবল 'লড়ি' চালিয়ে বেশী রোজগার না-ও হ'তে পারে; তাই আমি বলছিলুম, দু'জনে মিলে উপার্জ্জন করবো, ঘর-সংসারের কাজও সবই আমি করবো—তখন কত অর্থ হবে।

নরেশ শুনে আৎকে উঠে। কি একটু চিন্তা করে হা-হা করে হেসে বলে,—আমি যে 'লড়ি' চালাই—তোমাকে বল্লে কে?

—কেন, সুকৃতি।

—অ-হুঃ! তোমার সেই বন্ধুটী যিনি আমার কাছে তিন দিন ঘুরে গেছলেন। হাঁ, ভারী খারাপ কিন্তু মেয়েটা

—কেন—কি করেছে তোমার?

—তেমন কিছুই করেনি যদিও আমার, কিন্তু তোমার ভারী বদনাম করেছে। ও এসেছিল আমার সাথে খাতির করতে।

—তাই নাকি?

—থাক্ এখন ওসব কথা। তুমি তো আমার বিষয়-আশয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও কিছুই জান না। তোমাকে জানান উচিত আগেই। আমি সোম-চা-কোম্পানীর ম্যানেজার। তার মালীক আমার কাজের উপর খুশী হয়ে আমাকে চার আনা সেয়ার দিয়েছেন।

নরেশের কথা শুনে অসিতা মাথা নুয়ে বসে থাকে, পরে লজ্জিত কণ্ঠে বল্লে—ছিঃ, কি লজ্জা! সুকৃতির কথা মত আমিও তোমাকে ভেবেছি—কোন একটা ছোট কাজই বুঝি তুমি কর।

—এতে তুমি অনর্থক এত লজ্জা পাচ্ছো কেন? তুমি যা আগে শুনেছ, তাই ভেবেছ।

বলেই অসিতাকে অতি সন্তর্পণে নিজের কোলের কাছে টেনে আনে।...অসিতার শিরিষ পেলব ঠোঁটে

চুমা দেয়, পরে আরার বলে, লক্ষ্মীটী, আমার খালি বারে বারে একটা কথাই মনে হচ্ছে। শুনবে ?

অসিতা তার কোলে নিজের মাথা রেখেই শুধোয়—বলনা,—কি ?

—অমি ভাব্‌ছি তোমার কথা। তোমার মনটা কত উদার—কত উচ্চ!...আমার সম্বন্ধে এতসব কথা শুনেও তোমার সংকল্প থেকে একটু নড়োনি।

শুনে অসিতার সুন্দর মুখ খানি ব্রীড়া হেতু লাল হয়ে গেল।—

কোন একটা জবাবও দিলে না।

কিশোরী

শ্রীহেম সেন

কেমনে বাঁধিয়া রাখিব তাঁহারে আচল-বাসে,
যাহারে ধরিয়া রাখিতে নারিনু বাহুর পাশে !
যে দিন দেখিনু বরাঙ্গ সুন্দর আঁখির কোণে,
অলখিতে চিত হরিয়া লইল নয়ন-বাণে।
নিরমল তনু কষিত-কাঞ্চন হৃদয়ে এনে,
দিবস রজনী পরাণের দাহে মরণ আনে।
আজো মনে পড়ে 'বিকিয়ে দেওয়া'সে যমুনা কুলে।
সুবরণ হেরি, নিজ কু-বরণ দিলাম ঢেলে।
"নিজ তনু জারি' ভসম করিতে অনল মাঝে"।
-দাহত রয়েছে, আলো নাই, সুধু বেদন বাজে।
সখি সে চতুর বড়।
'মম-মন-কাঞ্চন, আপন প্রেম-মণি
জোড়ি পরাইল হার।'
কুল কাঠে জ্বালি মদন-অনল বুকের 'পরে,
বেণুটী ফুকিয়া হাপর বানা'য়ে হৃদয়ে ধরে।
পরশ-সোহাগা, দরশন-পানি, স্বেদ-সলিলে,
নব অনুরাগ-রঞ্জনে রঞ্জিল, পরাণ ঢেলে।
গুরুজন-আঁখি-চৌর ভয়ে ঝাপি বুকের কোণে
সেই প্রেম-হার, সুধু দেওয়া তার, আপন জেনে।
তাই নিয়া আমি মরিব ডুবিয়া যমুনা জলে।
কাঁদুক বাঁশরী শত বিনাইয়া কদম তলে।

সমাজের জীবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীরবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

বৈদিক যুগে যৌবন বিবাহই প্রচলিত ছিল; কিন্তু পৌরাণিক যুগে যৌবন বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বাল্য-বিবাহও ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। সমাজে কখন বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয় তাহা নিয়া নানা মুনির নানা মত। গান্ধর্ব্ব বিবাহ যৌবন বিবাহ সন্দেহ নাই। গান্ধর্ব্ব বিবাহও যখন সমাজের কল্যাণ সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে অসমর্থ হইল তখন উক্ত বিবাহ প্রথা সময়োপযোগী পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইতে হইতে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজে অর্দ্ধাঙ্গিনীর এক আখ্যা সহধর্ম্মিনী। পত্নীর সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা হয় বলিয়া তিনি সহধর্ম্মিনী। পতি পত্নী একত্রে এক মন এক প্রাণে গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি সাধনের মধ্যেই ধর্ম্মাচণের প্রধান অন্তরায়। তাই শাস্ত্রকার পরিণয়োন্মুখ বরের মুখ দিয়া উপদেশচ্ছলে পত্নীকে বলাইয়াছেন "যদেদং হৃদয়ং মম তদেদং হৃদয় তবঃ।" সস্ত্রীক আচরণ ব্যতীত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—তাই শাস্ত্রকার বরের মুখে অনুরোধচ্ছলে কন্যাকে বলাইতেছেন—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদাতু, মম চিত্তমে চিত্তমনুবর্ত্ততে।"

বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে ভারতে বাল্য-বিবাহের প্রচলন আরম্ভ হয়। মনে হয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ বনাম যৌবন বিবাহে নরনারীর আত্মতৃপ্তির পূর্ণ সাফল্য হইলেও সমাজের কোন প্রকার স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ায় ধীরে ধীরে বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছে। সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয়। ভারতীয় সমাজে যৌথ-পরিবার বা Joint familyর বহুল প্রচলন অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যৌথ-পরিবারে বাস করিতে হইলে বালিকাবধূ নির্ব্বাচনই সব দিকে মঙ্গলকর। তাই অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে মুষ্টিমেয় আর্য্য এই দেশ জয় করেন—অনার্য্য জনসংখ্যা তাহাদের লক্ষ গুণ ছিল সন্দেহ নাই। কালক্রমে বহু অনার্য্য আর্য্য সমাজে মিশিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তখন বহু আর্য্য পুরুষ অনার্য্য নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিত। আর্য্য সমাজে মিশিয়া আর্য্য সভ্যতা প্রসাদে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইলেও সেই সমস্ত অনার্য্য রমণীর পক্ষে আজন্মসঞ্চিত-সংস্কার বিসর্জ্জন দেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। আর্য্য অনার্য্যের এইরূপ সংমিশ্রণে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রচলন হয়। কারণ কোনও অনার্য্য বালিকাকে আর্য্য পরিবারে রাখিয়া আর্য্যের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দিলে তাহার জাতি ও বংশগত সংস্কার তাহার চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না—অচিরে সে আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আর্য্য পরিবারে আত্মগোপন করিত। বাল্য-বিবাহের প্রচলনের পরবর্ত্তী কালে প্রশ্ন উঠিল যে নারীত্ব প্রকটিত না হইলে বালিকার পতিত্বে বরণের কোন মূল্য নাই,—তাই

সমাজে Second marriageএর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহের সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন—"দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (Promiscuous) ছিল। ইহারা যখন আর্য্য সভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল তখন হইতে আর্য্যদের প্রধান চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে এই উদ্বেল ভাব হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময়ে বাল্য-বিবাহ ছিল না, কিন্তু মনুর সময়ে বাল্য-বিবাহ সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্য্যেরা হয় তো শীত প্রধান দেশে ছিলেন; সেখানে যৌবনোদ্গম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে। বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহ যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে এবং যখন যৌবনোদ্গম অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হইতে আরম্ভ হইল তখন বিবাহের বয়সও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন সমাজে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল। শাস্ত্রে তাহার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন। যথাঃ— উভয় জাতিই আদান প্রদানের স্বর্ণশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ ছিল—তাই অতি সহজে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতিবিম্ব ইরাণের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইতে পারিয়াছিল। বেদান্ত যখন বিশ্ববাসীর সমক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গুরুগম্ভীরে গাহিয়া উঠিলেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'—তখন পূর্ণ জ্ঞানের এই চরম সত্যকে বিশ্ববাসী অহঙ্কারের কণ্ডুয়ন আখ্যায় বিভূষিত করিলেও— পরবর্ত্তী যুগে পারস্যের পার্ব্বত্যকান্তারে ভারতের এই চরম সত্যের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। এই সত্য সাধারণের ধারণার অতীত হইলেও পারস্যের দার্শনিক বজ্রস্বরে জগতে 'আনলহক' প্রচার করিতে ত হন নাই। রাজরোষের ভ্রুকুটী-কুটিল-নেত্র তাঁহাকে এই সত্য প্রচারে বিরত করিতে পারে নাই। তারপরে ভারতের পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ মধুর ভাবের উপাসনাও ইরাণীয়গণের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। পারস্য কবির সুমধুর লেখনী নিঃসৃত "লায়লামজনুর" আখ্যায়িকা তদ্দেশীয় সমাজে প্রেমের বন্যা ছুটাইয়া দিয়াছিল। সুফীধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত প্রেমের ধর্ম্ম—প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া এই উভয় মতবাদই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবের যেমন 'রাধাকৃষ্ণ' একে অন্যের প্রেমে আত্মহারা, তেমি সুফীর 'লায়লামজনু'। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মের প্রভাব অতি পুরাকালেই আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই উভয় জাতির সামাজিক জীবনকে পূর্ণ সাফল্য দান করিয়াছিল।

বিভিন্ন বংশধারায় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ গঠন শীল হইয়া উঠিলে প্রাচীন সমাজে আমরা নারীর সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাই। পুরাণে দেখিতে পাই দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের সঙ্গে বিবাহিতা হন। তাহাদের নাম যথাক্রমে অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধ-বশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি বা মনু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন সমাজে সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। মুনি বা মনুর সন্তানগণ মানব বলিয়া পরিচিত। তখন নারীর আধিক্যপ্রযুক্ত এক এক পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করিত। বর্ত্তমান বিবাহপ্রথা বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন সমাজে আত্মতৃপ্তিটাই বোধ হয় কাম্যবস্তু ছিল। তাই নরনারীর একত্র সম্মিলন কিয়দংশে সামাজিক শাসনাধীনে থাকিলেও বর্ত্তমান বিবাহের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হয় না। সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ যথেচ্ছভাবে বিচরণের চেয়ে যেন তেন প্রকারেণ নরনারীর সম্মিলনকেও তখন ভাল মনে করিতেন। তাই মনু আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের প্রকার ভেদ করিয়াছেন;—

অর্থদ্বারা কন্যাকে ক্রয় করা আসুর, কন্যাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করাকে রাক্ষস এবং সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়াকে পৈশাচ বিবাহ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে মিলনের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রতিবিম্ব আমরা আধুনিক Courtshipএর বিবাহের মধ্যে দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের ঈষদ্বিকাশের মধ্যে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বা সুপ্তাবা্যা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। কন্যার সংখ্যা কম হওয়ায় বাধ্য হইয়া বহু পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হইত এবং বিবাহোপযোগী কন্যা নীলামে বিক্রীত হইত। আসুর বিবাহের যুগে হয়ত একই কন্যার পাণিপ্রার্থী চারি পাঁচটী পাত্র জুটিত, তখন যিনি অধিক অর্থ দিতে পারিতেন তিনিই কন্যার পতিত্বে বহাল হইতেন। তারপরে গান্ধর্ব্ব বিবাহ;—উপরোক্ত তিন প্রকার বিবাহ প্রথা হইতে অনেকটা উন্নত সন্দেহ নাই;—কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য নহে। মনু ইহাকে কামজ বিবাহ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তরুণ তরুণীর হৃদয়ের বিনিময়ে যে মিলন তাহা কবি তাহার কল্পনার ঐন্দ্রজালিক রঙ্গে যতই রঙ্গীন করিয়া তুলুন না কেন—তাহার মূলে আছে কঠোর সত্যের মত আত্মতৃপ্তি এবং ইন্দ্রিয় সুখ। মানুষ যখন বুঝিতে পারিল যে ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সমাজের হিত বেশী মূল্যবান;—ব্যষ্টির তৃপ্তি সমষ্টির তৃপ্তির নিকট অতি হেয়;—লোকে যখন সম্যকরূপে বুঝিতে সমর্থ হইল যে "আমাদের ধন, জন, বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়"—তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ বর্জ্জন করিয়া সমাজ দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ ভালবাসা যদি বিবাহের মূলসূত্র বলিয়া পরিগণিত হয় তবে আত্মতৃপ্তি প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কি পরিমাণে সাধিত হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। তাই Sir Adam Paul বলেন—"Love can not be adequate basis for marriage, because the latter is a social institution existing on the benefits of Society. A young girl should not marry for love a penny-less fellow, for their children will not receive their due, seeing the education is an expensive matter. So also, an old man of fifty should not marry and thereby frustrate the legitimate hopes of their nephews and nieces."

সামাজিক জীবনের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আর্য্যসমাজসংস্কারকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আত্মতৃপ্তির মধ্যে সমাজ দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তাঁহারা অতি প্রাচীন যুগেই মেঘ-মন্দ্র-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে মানবজীবন শুধু আত্মতৃপ্তিতে উন্মত্ত Gay Butterfly হইয়া ঘুরিবার জন্য নহে;—তাই প্রাচীন আচার্য্যগণ যুগে যুগে ত্যাগের মহিয়সী মন্ত্র জগতকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজে গান্ধর্ব্ব বা Courtshipএর বিবাহের পরিণাম আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাই। কিছুদিন হয় চিকাগো সহরের এক Justice আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"Marriage has been proved to be a failure in this Country." পাশ্চাত্য সমাজে প্রস্ফুটযৌবন নরনারী Courtship এর সময়ে নিজের অভ্যাসগত বা চরিত্রগত দোষ যথাসম্ভব গোপন রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে—তাই পরস্পরের দোষ কাহারাও চোখে ধরা পড়ে না। পরিণয়ান্তে নিশ্চিন্তাবস্থায় প্রকৃতির প্রভাব চরিত্রের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয়—তখন নানাকারণে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়—এবং সেই মনোমালিন্য পরিশেষে বিবাহবিচ্ছেদে পর্য্যবসিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের এত ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে হয় যে অচিরে তদ্দেশীয় সমাজ বিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে।



আলোচনা

শ্রীগীর্ব্বাণ

সাহিত্যের সমালোচনা কিরূপ হওয়া সঙ্গত সে সম্বন্ধে অনেক অনেক ব্যবস্থা দিলেও ১৩২২ সনের জৈষ্ঠ মাসের প্রবসী পত্রিকায় "বিবিধ প্রসঙ্গ" লিখিতে গিয়া সমালোচকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তথাবিধ-সমালোচক আছেন কিনা (একমাত্র উক্ত প্রবন্ধ-লেখক ছাড়া), সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ সমালোচনা কার্য্যটী বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্ম-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। নবজীবন, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় যে ভাবে এবং যে ভাষায় কোনও গল্প, নবেল বা প্রবন্ধের সমালোচনা হইত, তাহা মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন বলিয়াই ধরা হইত। তবে বঙ্কিম বাবু নাকি "কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেন যে, তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তাঁহাদের বেত্রাঘাতের উপযুক্ত নয়", (প্রবাসী, ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ)।" কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার——মানে, তিনি প্রায়ই গ্রন্থকারদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেন। আবার একটু পরেই তিনি লিখেন,— * * * "কলম ছাড়িয়া চাবুক ধরিলে লোকে হঠাৎ ভাবিতে পারে যে আমাদের রাখালী বা গাড়োয়ানী করাই পেশা।" স্বর্গীয় বাঙ্কিম চন্দ্রকে রাখাল বা গাড়োয়ান আখ্যা দিয়া প্রবাসী-সম্পাদক যে বাহাদুরী নিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্পাদকের আসন খানা কতটা নীচে নামিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমি প্রত্যেক সাহিত্যিক বিশেষতঃ সমালোচকমাত্রকেই এই প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

'আর্য্যজীবন' নামে একখানা মাসিক বাহির হইয়াছিল। তাহাতে কোনও কবি বিক্রমপুরের বর্ষাবর্ণনা দিয়া একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার সমালোচনা করেন। নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

কবি—"ডাকে কেড়ালিয়া অহহ অহরে
মান্দার গাছে।"

সমাজপতি—"আর্য্য-জীবন কবি কি তাহার
শাখায় নাচে?"

কাহারো কাহারো কানে বেশ মিষ্টি লাগিবে, কিন্তু ইহা কি ভদ্রোচিত হইয়াছিল? অথচ সমাজপতি মহাশয়কে একজন বড় সমালোচক না বলিয়া উপায় কি? একথা মানি যে, কোনও বিষয়ে নিজ মত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি মানীর মান রাখিবেন না, ইহাকে অরাজকতা বই আর কি বলিব! এরূপ সমালোচনা দ্বারা সমালোচকের লুক্কায়িত রূপটী

প্রকাশিত হইয়া পড়ে মাত্র। যুগে যুগে যেমন অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে বলিয়া নহে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্মীর আগমন হয়। পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরও আবির্ভাব সম্ভব হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কত সমালোচক কত কত উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়া ফল ফলাইয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে যাহারা আছেন তাঁহারা ও যাইবেন। কিন্তু অনেক শত্রু আছে, যাহারা সেই ফলবান বৃক্ষ গুলি মূলে ধ্বংশ করিতে যত্নবান অর্থাৎ খলের যা প্রকৃতি।

রাক্ষস সর্ব্বভুক্ এবং শণি পরছিদ্রান্বেষী সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। রাক্ষস বলেন—"আর এক রকমের সমালোচনা আছে, যাহাকে পণ্ডিতি বলা চলে। এইরূপ সমালোচনায় সমালোচক গ্রন্থকারের বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রচলিত পুস্তক লিখিত নিয়ম অনুযায়ী কিনা, প্রধানতঃ তাহাই দেখেন্ এবং উহার মিল না থাকিলে গ্রন্থকারকে পাশ না করিয়া ফেল করেন। বানান ভুল, ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ, এই গুলি থাকিলেই কোন গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয়, এমন কথা কে বলিবে ? কিন্তু অন্যদিক বিবেচনা করিবার বিষয়ও কিছু আছে। * * * যদি বানান ব্যাকরণ ছন্দ, অলঙ্কার আদিতে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ না করেন এমন কি যদি সত্য সত্যই দু' চারটা ভুলও করেন, তাহা হইলেও শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের রচনা যেমন কাটিয়া কাটেন, কোন সমালোচক তাহাদের লেখার উপর সেইরূপ পণ্ডিতি ফলাইলে বড় অবিবেচনার কাজ হয়, এবং অশোভন হয়। বাঙ্গলা-ভাষা ও সাহিত্যের গতি বিদ্যালয় পাঠ্য, ব্যাকরণের লেখকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবেনা, এই সব সমালোচকের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না ; নিয়মিত হইবে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা দ্বারা। সবদেশে যাহা হইয়াছে, বঙ্গেও তাহাই হইবে।" বেশ কথা। সাহিত্যিকগণ এই ঘোষণা পত্র (declaration) পাঠ করিয়া প্রকৃত সমালোচকের রূপটী চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করুন এবং তার পাশে, Cock Brand letter খানি পড়িয়া, সমালোচকের স্বরূপটী—যার গায় অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর আঁচ্ লাগিয়া ফোস্কা পড়ে, রাখুন। অন্যত্র আষাঢ়ের 'সৌরভের' লেখক খাচ্চে, কচ্চে, নিচ্ছে, বলো, করো ইত্যাদিকে যিনি 'জারজ', ভাষা বলেন এবং কেহ,কেহ "যাবনী ভাষা" এবং "পুর্ব্বের বর্ব্বর শব্দ" ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি (!) করেন, তাহাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করুন যে কোন্টা ঘোষণা-পত্রের সঙ্গে মিলে। দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে সাহিত্যিকদের অবস্থা—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" হইতে বসিয়াছে। কাজেই মা সরস্বতী এখন মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া স্বর্গে গেলে দোষ দেওয়া যায় না। এবং তিনি হয়তো শণ মণ্ডল হইয়াই যাইবেন। মা সরস্বতীর অন্তর্দ্ধানের জন্য দায়ী লেখকগণ নয়, যতটা তথা কথিত সমালোচকগণ। কারণ সমালোচকগণই একের সহিত অন্যের লেখার তারতম্য করিয়া দোষগুণ দেখাইয়া তাহাদের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এখন সেই সমালোচকরাই যদি লেখকের কেবলই দোষ খুঁজিয়া বেড়ান এবং মুক্তার মালা গাঁথিয়া নিজের গলায় পরেন তবে তাহারা রোগীকে ঔষধ দেওয়ার পরিবর্ত্তে বিষই দিতেছেন এবং সাহিত্যের সেবা না করিয়াই সাহিত্যকে উদ্ধার করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন।

এবার Cock brand letter ঘোষণা করিতেছেন যে 'খোকা ভগবান' অবতার রূপে বঙ্গে কলম ধরিয়াছেন। সে তো আমরা বহুদিন হয় জানি যে, ভূস্বর্গ ইউরোপ হইতে Journalism শিক্ষা করিয়া তিনি বঙ্গে মীন, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইহার কোন একটীর ন্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আজ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, যে মাসিকের পাতাগুলি আবর্জ্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া সম্পাদক পত্রাঙ্ক না দিয়া perforate, করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সে পাতাগুলি অশ্লীলতার

বিজ্ঞাপন স্বরূপ উক্ত মাসিকে না দেওয়াই সঙ্গত ছিল। মাসিক পত্রিকার প্রচলন হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন সম্পাদক এহেন গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই বা দেখি নাই। সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগের মাসিক পত্রিকার প্রবীণ কর্ণধার প্রবাসী-সম্পাদকের মাথায়ও বোধ হয় এরূপ উদ্ভট খেয়াল গজাইয়া উঠিবে না।

মোরগ-মার্কা চিঠির চিত্র সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলার যে সব সু-সাহিত্যিকদের চিত্র যে ভাবে মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছ, তাহাতে তাহাদের সম্মানের লাঘব হইয়াছে কি উক্ত মাসিকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে বিচার সাহিত্যিকদের কাছে। রুচির পরিচয় মাত্র। "অতিত্যহি গুণান্ সর্ব্বান স্বভাবো মূর্দ্ধি, নবর্ত্ততে।"

বিগত ১৩২৫ সনের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকা হইতে কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। কাজী সাহেব একজন নিপুণ শিল্পী। সাহিত্যিক মাত্রই কথাগুলি জানেন।—"সে কথাটী এই যে সাহিত্যে এরূপ গালাগালি করা ভাল কাজ নয়। ইহাতে মানুষে মানুষে একটা দৃঢ় ব্যবধান রচনা করা হয় এবং এরূপ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে নিজের শক্তিরও যথেষ্ট অপব্যয় হয়। * * * * মানুষের অন্তরে যাহা অনন্তের আভাস, বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার পীড়নে অনেক সময় তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু প্রকাশ হইতে না পারিলেও তাহার বেদনা মানুষের মনে থাকিয়াই যায়। * * * আর এরূপ গালাগালি, কুৎসা, নিন্দা প্রভৃতি ছোট কাজ, কবির পক্ষে বাস্তবিকই শোভা পায় না। বিশ্বজোড়া মিলনের জয়গান গাওয়াই তাহাদের ধর্ম্ম। তাই তাহারাই যখন কোনরূপ পক্ষপাত করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করেন, তখন তাহাদের সেই সংকীর্ণতা পাঠকের প্রাণে বড়ই বাজে।" যদি ওদুদ সাহেবের উক্তি বাস্তব সত্য হয় (আমি স্বীকার করি), তবে জানিয়া শুনিয়া লেখাপড়া জানা ব্যক্তিরা কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গালাগালি, কুৎসা, নিন্দা প্রচার করিয়া, ভদ্রলোককে নাচ্‌নেওয়ালী সাজাইয়া বাহবা নিতেছেন অথবা "আধো আধো ভাষী বাঙ্গালটী উঁকি মারিতেছে" লিখিয়া নিজকে ইহুদী-বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাহার একজন পরমাত্মীয় "আস্তানানারিভো হইতে তাহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—"হোৎ ফিন তিদ্‌কো ছুয়োস্তপে বা রবীন্দ্রনাথ, কিউটীপাক্স লোহাম।' পোপোকেটা-পাটল হইতে—কপট সাম লোন্‌টিফিস্ প্রশান্ট অপূর্ব্ব প্রমঠ ষ্টুবেলানডিফিক্স। ডিনেশা বুড়ু অচিন্ট্ পুদ্ পান্ধের?" ইত্যাদি। পাঠক-পাঠিকা, ভাষা পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন শনিবারের চিঠির "চিপোর্ট" লেখক কোন্ বংশধর? তবে তিনি যে বাঙ্গালার মানুষ নহেন ইহা নিশ্চিত।

সমাজ ও সাহিত্য লইয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে তিনটী মতই দেখিতে পাইতেছি। (১) সাহিত্যের জন্য সমাজ, (২) সমাজের জন্য সাহিত্য এবং (৩) "উভয় পক্ষই ভুল করেন। * * সমাজ বিদ্রোহ বা সমাজ সমর্থন কোনটাই সাহিত্যের কাজ নয়। * * রুচি যদি অতিমাত্রায় দুর্ব্বল ও সৌখীন হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই এ অপবাদের জন্য লেখক দায়ী নহেন। কারণ, এটাও মনে রাখিতে হইবে যে, বস্তু ও বর্ণনা অশ্লীল হইলে রচনা অশ্লীল হয় না" (শনিবারের চিঠি)। অন্যত্র ১৩২৫ সনের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী পত্রিকায় নরেশ সেন মহাশয় লিখেন—"সত্য যে ভাবে অনুভব করুক না কেন, ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে জগতে উপস্থিত করিতে হইবে—সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এই এক সূত্র ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। নূতন কোনও কথা যদি তোমার মনের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা

জগতের কাছে যত আশ্চর্য্য বা যত অরুচিকর হউক না কেন, তাহা তুমি জগতে প্রচার করিতে বাধ্য।” সমাজের সহিত যদি সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে না থাকে, এবং রুচি যদি অতিমাত্রায় দুর্ব্বল ও সৌখীন হওয়ায় লেখক অপবাদের জন্য দায়ী না থাকেন, পরন্তু বস্তু ও বর্ণনা অশ্লীল হইলেও রচনা অশ্লীল যদি নাই হয়, তবে নরেশ সেন মহাশয়ের সঙ্গে মতের অনৈক্য কোথায়? এবার হইতে শনিবারের চিঠির আবশ্যকতা আছে কিনা, সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকার উপরই রহিল। মণিমুক্তার থলিয়াটী ও তো অতলে ডুবিয়া গেল (পত্রাঙ্ক নাই ইত্যর্থ)। ডুবুরিবা এবার নিরাকারের উপাসনা করিবে।

*　*　*　*　*

সম্পাদক মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ‘ধুপছায়া’, ‘গল্পলহরী’, এবং “অর্চ্চনা” মাসিক পত্রিকার প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি।

বীঃ সঃ।

নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

গ্রামের সীমা পার হইয়া শরৎ ও মণীশ উভয়ে মাঠে আসিয়া পড়িলেন।

যতদূর দৃষ্টি চলে—ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র সুনীল বর্ণ ধান গাছে ভরিয়া গিয়াছে, ইহারই মাঝখান দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার অপরিসর পথটী; চলিতে গেলে দুই পার্শ্বের ধান গাছ নুইয়া গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

হৈমন্তিক ধান পাকিয়া উঠিয়া সমস্ত মাঠ আলো করিয়া আছে। বাতাস বহুদূর হইতে বহিয়া আসিয়া ধান গাছের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। স্থির নদীবক্ষে তুফান আসিলে নদীজল যেমন তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, বাতাস লাগিয়া ধান গাছগুলিও তেমনই বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছিল। সে এক অভিনব দৃশ্য। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, শেষ বেলার লাল আলোটুকু যাহা কিছু চুম্বন করিতেছে তাহাই বড় রমণীয় হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় ধান গাছের পর ধান গাছ চলিতেছে, বাতাসে দোলা খাইতেছে। দূরে কোথায় একটা পক্ষী দিবা-শেষের বিদায়গীতি গাহিতেছে।

নীলাকাশের তলে সবুজের বাহার নীলাকাশের তল দিয়া সবুজ ক্ষেত্রের উপর দিয়া পাখীগুলি দল বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। শরৎ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার আকাশের পানে একবার নীচের পানে চাহিলেন তাহার পর অগ্রসর হইলেন।

“বল দেখি মণীশ, সহর দেখতে ভাল না গ্রাম দেখিতে ভাল?”

হঠাৎ এই প্রশ্নে মনিশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, “আমার তো গ্রামই ভাল মনে হয়, তবে বর্ষাকালে নয়।”

শরৎ ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “বর্ষাকালে বড় জঙ্গল

হয়, ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয় সেই জন্যে বর্ষাকাল ভাল বোধ হয় না, কেমন ? কিন্তু সে হয় কাদের জন্যে কাদের দোষে তাই বল দেখি মণীশ, সেটা কোনদিন ভেবেছ কি ? মণীশ চুপ করিয়া রাহল।

শরৎ বলিলেন, সেটা হয় আমাদের—তথা কথিত বড়লোকদের দোষে। অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশের অবস্থা যে এখনকার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল, এখনকার তুলনায় গ্রাম স্বর্গ ছিল তা আমরা বেশ জানতে পারি। আমাদের ঠাকুরদারা যখন বর্ত্তমান ছিলেন তখন দেশে রেলওয়ে হয়নি, জল নিকাশের পথ বন্ধ হয়নি,—তখন এত খানা ডোবা থাকলেও জল পচতে পারত না, জঙ্গলে দেশ ভরে উঠত না। বাস্তবিক সেদিন আমি ভাবছিলুম আমাদের দেশে কেন এত ব্যারাম হয়, কেন আমাদের দেশের লোক এমন করে মরে—কিন্তু এর উত্তর পাওয়াতো খুবই সোজা, মোটেই ভাববার দরকার হয় না। আমাদের জমির 'পরে আমরাই রেলপথে তৈয়ী করতে দিয়েছি, নিজেরা দেশ ছেড়ে সহরবাসি হয়েছি, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে ! দেশ যে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, এর জন্যে দোষ আমরাই, আর কেউ নয়।

বিশাল ধান্যক্ষেত্রে পার হইয়া তাহার পর ক্ষুদ্র নুরপুর গ্রাম। অধিবাসীরা অধিকাংশ মুসলমান, হিন্দু যে কয়জন থাকে তাহারা একটা পাড়ায় বাস করে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বড় সুন্দর, পরস্পর পরস্পরের সহিত যে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ।

দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। কত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কৃষকেরা এইস্থানে এইক্ষুদ্র পল্লীটি স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে তাহা কে জানে। ইহারা এখানে মনের শান্তিতে দিন কাটায় কারণ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তাহাদের নাই। আধুনিক সভ্যতার ধার তাহারা ধারে না। একজনের বিপদ হইলে হিন্দু মুসলমান সকলেই নিজেদের বিপদ জ্ঞান করিত। কাহারও।হইলে জাতি ধর্ম্ম না মানিয়া তাহারা সেবা করিত। একতা সূত্রে এই গ্রামবাসী গ্রথিত তাই ইহাদের মধ্যে শান্তির অভাব ছিল না ; আনন্দের অভাব ছিল না।

বর্ষার সে ঘন জঙ্গল বর্ষাশেষে উৎপাটিত হইয়াছে। জলপূর্ণ খানা ডোবায় অসংখ্য শ্বেতবর্ণের লিলিফুল ফুটিয়াছে ; কলমী লতা জলের মধ্যে থাকিয়া মাথা তুলিয়াছে, নীল বর্ণের ফুল ফুটিয়া বাতাসে দোলা খাইতেছে। গৃহস্থের বাড়ীগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার, প্রাঙ্গনগুলি গোময়লিপ্ত ; প্রত্যেক প্রাঙ্গনে একটী দুইটী করিয়া ধানের গোলা, তাহার কপাটে সিন্দুর ও আলিপনা চিত্রিত। কৃষকগণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পথে খেলিয়া বেড়াইতেছে, গৃহিনীরা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। পুরুষেরা দু পাঁচজন মিলিয়া কোথাও গল্প করিতেছে, কোথাও বা দু'চারজন বসিয়া চেটাই, মাদুর বুনিতেছে।

শান্ত এই পল্লীবক্ষে দাঁড়াইয়া শরতের চক্ষু ও প্রাণ জুড়াইয়া গেল। একদিন বাংলার সব পল্লীগুলি এই রূপেই ছিল, আজ সেদিন অতীতে মিশিয়া গিয়াছে। একদিন বাংলার হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বিপদ-ব্যথা নিজেদের বলিয়া মনে করিত,আজকার মত পাশাপাশি বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের বুকের শোনিত লইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিত না। পর-স্ত্রী হিন্দুই হোক,মুসলমানই হোক, মাতৃতুল্য জ্ঞান করিত, নারীর সম্মান রাখিতে ছোট বড় সকলেই প্রাণ দিতে পারিত আজ সে দিন নাই। দারুণ হিংসাবৃত্তি মানবের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে, মানুষ এখন সবই করিতে পারে।

ইহারাই ছোটলোক, ভদ্রলোকেরা ইহাদের ঘৃণা করেন। তাঁহারা ভাবেন না এই সব নিরক্ষর ছোট লোকদের মধ্যে যা আছে, তাঁহারা শিক্ষিত ভদ্রলোক হইলেও তাহাদের মধ্যে তাহা নাই। তাঁহারা যাহা বলেন, করেন তাহা মুখস্ত মাত্র। ইহারা যাহা করে বা বলে তাহা আন্তরিক। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা আসে

নাই বলিয়াই ইহারা ছলনা শিখে নাই, মনের মধ্যে এক ভাব রাখিয়া মুখে এক কথা বলিতে শিক্ষা করে নাই।

জমিদারকে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ সন্ত্রস্থ হইয়া উঠিল, যে যাহা করিতেছিল সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রবীন রতন মণ্ডল এবং ইসমাইল খাঁ অগ্রসর হইল।

একটু হাসিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, গাঁয়ের সব ভাল তো? পুকুর কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে কি?"

ইসমাইল খাঁ সেলাম করিয়া বলিল, "এখনও আরম্ভ হয়নি হুজুর, সোমবার নাকি দিন ভাল আছে, মোড়লের কথা মত আমরা ওইদিন হতে পুকুর কাটাব ঠিক করেছি।"

উৎফুল্ল মুখে শরৎ বলিলেন, "বেশ বেশ মোড়ল, খরচের জন্যে ভাবতে হবে না,—তুমি আর খাঁ সাহেব থেকে সকলকে খাটিয়ে নেবে। তোমাদের ছেলে পুলেরা মাঠের কাজ করবে, তোমরা শুধু পুকুর কাটানোর দিকে থাকবে। আমি মাস খানেক বাদেই আবার আসব—দেখে যাব কি রকম হয়।"

রতন মণ্ডল একটু থামিয়া বলিল, "খরচ পত্র হুজুর ম্যানেজার বাবুর হাতে"—

"ক্ষেপেছ তুমি মোড়ল, ম্যানেজার বাবুর হাতে দেব, কেন,—তোমাদের হাতে দিলে তোমরা কি খেয়ে ফেলবে? এতটা অবিশ্বাস আমি রাখিনে মোড়ল, তা হলে আমায় মোটে কাজ চালাতে হতো না। এই নাও, শ' খানেক টাকা নিয়ে এসেছি, আমি না হয় দশ দিন পরে আবার আসব, দেখে শুনে যাব।"

পকেট হইতে দশ টাকার দশ খানি নোট বাহির করিয়া তিনি রতনের হাতে দিলেন।

রতন সে টাকা ইসমাইল খাঁর হাতে দিয়া বলিল, "খাঁ সাহেবের হাতে থাক হুজুর,—উনি খুব ভাল হিসেব রাখতে পারেন।—"

শরৎ বলিলেন, "বেশ তো, খাঁ সাহেবের হাতেই থাক, কিন্তু তোমরা দুজনে থেকে সব কাজ করো কেউ যেন ছেড়ে দিয়ো না। মনে রেখো তোমাদেরই জন্যে পুকুরটা হচ্ছে, যেন ছেড়ে দিয়ো না।"

খাঁ সাহেব একটু হাসিয়া বলিল, "তাকি আর একবার করে বলতে হুজুর, আপনি আমাদেরই জন্যে নিজের পয়সা খরচ করছেন, আমরা ছেড়ে দেব, এ কখনও হতে পারে?"

সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া শরৎ বিদায় লইলেন, ইসমাইল খাঁ বলিল, "সন্ধ্যে হয়ে এলো হুজুর, এ সময় মাঠের রাস্তায় যাবেন না, রেলের রাস্তা দিয়ে যান। আমার ছেলে একটা আলো নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে এখন।"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিছু দরকার নেই খাঁ সাহেব, আমরা দু'জন আছি, জ্যোৎস্না রাত্র আছে, বেশ চলে যেতে পারব এখন। এই তো রেল লাইন, গাঁ ছাড়িয়ে সামনেই পড়বে এখন।"

তথাপি কৃষকগণ সঙ্গে চলিল, জমীদারকে লাইন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা ফিরিবে।

শরৎ পিছন ফিরিয়া বলিলেন, "আর আসতে হবে না মোড়ল, তোমরা ফিরে যাও, এই তো সামনেই লাইন পড়েছে, জ্যোৎস্না উঠছে, আমরা বেশ যেতে পারব।"

কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম দিয়া বিদায় লইল।—

সম্মুখে রেল লাইন, চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করিতেছে। রেল লাইনের উপর দাঁড়াইয়া শরৎ একবার পিছনের পানে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ যেন রূপ-কথার একখানি ছবি মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রালোক নিস্তব্ধ পল্লীখানার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—গাছ লতা পাতা, কুটীর সব যেন হাসিতেছে।—

পার্শ্বে ধূ-ধূ করিতেছে মাঠ, আর এক পার্শ্বে নীবিড় ধান্য ক্ষেত্র। খাল বিলের জলের উপর, চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে।

গভীর সুরে শরৎ ডাকিলেন, "মনীশ,—"

মনীশও স্তব্ধ ভাবে ব্যগ্র চোখে প্রকৃতির এই অপরিমেয় রূপরাশি দেখিতেছিল। তাহার ভাগ্যে এমন দৃশ্য দেখা কখনও জুটিয়া উঠে নাই, আজ এই প্রথম তাহার এমন স্থানে পদাপর্ণ করা।—

"কেমন দেখলে মনীশ ?"

মনীশ উওর দিল "চমৎকার।"

শরৎ চলিতে চলিতে বলিলেন, "ডি, এল, রায় একখানা গানে লিখে গেছেন—

'এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে,' অনেকে গানটা গেয়ে থাকে,—মুখস্ত বলে যায় মাত্র, অন্তরের মধ্যে কেউ কি ধারণা করেছে ধানের উপর ঢেউ খেলিয়ে বাতাস কেমন করে বয়ে যায় ? চাঁদের আলোর গান অনেকেই করেছে, তারা কি জানতে পারে সীমার বাইরে আসীমের সৌন্দর্য্য কতখানি ? অনেকে আকাশকে জন্মাবধি সীমাবদ্ধ দেখে আসছে, তারা কখনও বাইরে অসীম আকাশ দেখতে পায়নি, কাজেই অসীমের ধারণা তারা কোনদিন করতে পারেনি।"

একটু থামিয়া নিজেই আসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাদের কথাই বা বলি কেন, আমি নিজেও ঠিক এমনি আনাড়ি ছিলুম। সৌন্দর্য্য ঢের দেখেছি মনীশ, এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে এমন সৌন্দর্য্য জীবনে কখনও দেখিনি।"

ক্রমশঃ—

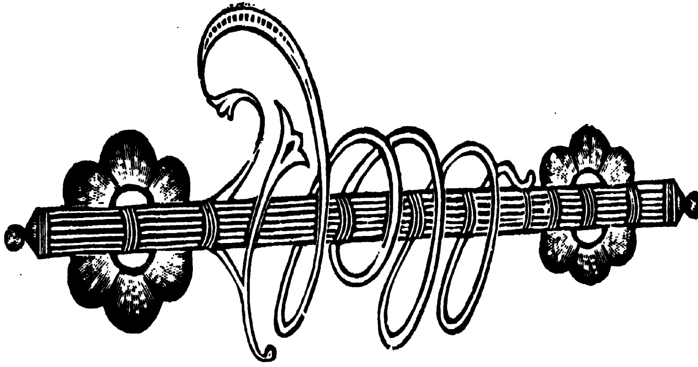


স্বর্গগত গিরিজাকান্ত ঘোষ।

জন্ম—১২৯০ সনের ১৮ই পৌষ, মঙ্গলবার। মৃত্যু ১৩৩১ সনের ১৯শে আশ্বিন, রবিবার।

৺গিরিজাকান্তের লিখিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধই "ঢাকা রিভিউ", "প্রতিভা" প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সমাজে পঠিত এবং মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধেই ৺গিরিজাকান্ত পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে বহু অজ্ঞাত বিষয় জানিতে দিয়াছেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

KRISHI-SAMPAD PRESS, DACCA.



তৃতীয় বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩৩৫　　[১২শ সংখ্যা

বর্ষ বিদায়

শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী, বি-এ

আজি বর্ষশেষে !
পুরাতনে দেও গো বিদায় !
যেই বর্ষ মাঝে হাসি কান্না, সুখ দুঃখ লভি,
রহিয়াছ কত ভাবে, কত ছন্দে এই ধরা 'পরে,
সে আজি মাগিছে বিদায় !
নবীন এসেছে আজি দ্বারে—
বরিয়া লও সবে তা'রে,—
ছাড় পুরাতনে, ধর নব কায় !
সে নবীন
পুরাতনে কহিছে ডাকিয়া,—
"ছাড় দ্বার। ওগো পুরাতন !
আমাকেও যেতে হবে বর্ষশেষে
তোমারি মতন, এমনই বিষাদ মুখে।
তুমিও যে আমারি মতন
বরষের প্রথম প্রভাতে,
উষার অরুণালোকে

বিস্মিত জগতের পুষ্প অর্ঘ্য লাভ
কাটায়েছ মহানন্দে এই ধরা'পরে সেই একদিন।
তবে কেন ছাড়িয়া যাইতে এই ধরা,
ধরনীর শান্ত শ্যামতল,
হৃদয়ে বেদনা তব বাজে ?
মোরেও লভিতে দাও সেই পূর্ণ সুখ।
পূর্ণানন্দ লভিয়া ধরায়, দুঃখ ভার সহি নিশিদিন!
শ্রান্তিহীন অবিরাম সময়ের স্রোতে
ঢালিয়া দিতে যে হবে সব আশা সকল সম্পদ !
তুমি যবে ধরা'পরে প্রথম আসনখানি তব
পাতিয়া লইলে ধীরে ধীরে, তখনও যে
দুঃখ ভারে নত সকরুণ দুটি আঁখি
সকাতরে বার বার চাহিয়াছে এই ধরাপানে ;
ফিরে কি তাকায়েছ কভু তাহাদের পানে ?
আজি তারা অনন্তের কালস্রোতে
গিয়াছে মিশিয়া !
সবারই যে যেতে হবে সেথা
তবে কেন ব্যথা ?

*

হে বন্ধু !
বরষ মাগিছে বিদায় !
যতনে সেবিলে যারে দীর্ঘ দিন যাপি,
রৌদ্রতপ্ত ধরা'পরে যাহারে বরিলে সবে
নবীন আলোকে !
বিহগের আকুলিত আনন্দ কুজনে,
শিখীর আনন্দ নৃত্যে,
অর্দ্ধ-সিক্তাধরণীর পুষ্প অর্ঘ্য ভারে
নবীন অতিথি জ্ঞানে যাহারে পূজিলে সবে
বরষের প্রথম প্রভাতে,-
সে আজি মাগিছে বিদায় !
জনে জনে অর্পিয়াছি সুখ দুঃখ ভার ; —
সে নহে নহে গো সখা কীর্ত্তি আমার !
আমার এ ক্ষুদ্র বক্ষো'পরে,
বিধাতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—
আমি শুধু লক্ষ্য মাত্র তার !
আজি তাই ছাড়ি যেতে শ্যামধরাখানি
পরাণে জাগিছে ব্যথা। হৃদয়ের পরতে পরতে
রহে শুধু বেদনার ভার।
কিন্তু তবু ছেড়ে যেতে হবে এই শ্যামধরাখানি,
শেফালি বকুল আজি মোর তরে পড়িবে না লুটি
ক্ষুদ্র মম জীবনের আজই হবে শেষ
তাই ধীরে সবাকারে নমি,
চিরতরে লইলাম ছুটি।





নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২০)

ধীর পদে শরৎ অগ্রসর হইলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনীশ চলিতেছিল।

শরৎ বলিলেন, "আচ্ছা, ভাব দেখি মনীশ, এমনি সময়ে একটা ভীষণ কাণ্ড হয় আকাশ নিবিড় মেঘে ছেয়ে আসে, ঝড় এসে সব ছারখার করে, বজ্রাঘাতে সব পুড়ে যায়, সেটা কি রকম দেখতে হবে? এমন সুন্দর প্রকৃতি, এত সৌন্দর্য্য আর নিমেষে সে দেখতে কদর্য্য হয়ে যাবে—"

মনীশ বলিল, "সে কল্পনাও অসহ্য মনে হয় শরৎ বাবু।"

কোমল সুরে শরৎ বলিলেন, "কিন্তু এমন মানুষও ঢের থাকে মনীশ, যারা সৌন্দর্য্য দেখতে পারে না; জগতে যা কিছু ভাল তা তারা সযত্নে বর্জ্জন করে চলে, কদর্য্যতাটাই মনে-প্রাণে উপভোগ করতে চায়।"

মনীশ বিস্ময়ে বলিল, "এমন মানুষও আছে?"

চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া ফিরিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শরৎ বলিলেন, "আছে বই কি? আমি যদি বলি সে রকম মানুষ তুমি,—সেটা কি বড় আশ্চর্য্যকর মনে হবে, মনীশ?"

"আমি—" বজ্রাহতের ন্যায় মনীশ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, চাঁদের আলোকে স্পষ্ট তাহা বুঝা গেল না।

শরৎ তাহার স্কন্ধের উপর হাতখানা রাখিলেন,—"হ্যা তুমি. শুধু তুমিই নও,—আরও কতকগুলি অপরিনত বুদ্ধি, তরুণও এ দলে আছে। আমি সব জানি মনীশ, এক অচিন্তিত উপায়ে তোমাদের দলের সব কথাই আমি জানতে পেরেছি।"

অতি কষ্টে কণ্ঠে সুর ফুটাইয়া মনীশ ক্ষীণ ভাবে বলিল, "কি জানতে পেরেছেন?"

শরতে চক্ষু ডুটি নিমেষে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল, তখনই শান্ত হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "আমি জানতে পেরেছি তোমরা তরুণ-সঙ্ঘ নামে একটা দল গড়ে তুলেছে, এ দলের লক্ষ্য দেশ সেবা নয়, দেশ উদ্ধার করা। কিন্তু আমি বলি মনীশ উদ্ধার করবে কাকে,—এই দেশকে? যারা নিজেরা হাজার সংস্কারের বেড়াজালে পড়ে রয়েছে, তারা কি অপরকে উদ্ধার করতে পারে? দেশের বুকে অভাব অনাটন, নিত্য হাহাকার,—এ ডুঃখ আগে দূর কর, ভেতরের পানে দৃষ্টি কর,—শুধু বাইরের পানে চেয়ে ছুটলেই তো চলবে না, ভাই। তোমরা তরুণ, তোমাদের মধ্যে আশা আছে, উৎসাহ আছে, সাহস আছে, শক্তি আছে, তোমরা দেশকে আগে বাঁচাও, তারপর একে উদ্ধার করবার চেষ্টা কোরো। যে মরতে বসেছে,—আগে তার দাহের বন্দোবস্ত না করে—যাতে সে শান্তিতে মরতে পায় তাই করা উচিত।

রোগ হলে চিকিৎসা করানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। একবার সন্তানের চোখ নিয়ে মায়ের পানে চাও দেখি—দেখ মায়ের প্রকৃত ব্যথা কোথায়, তারপর ব্যবস্থা কর।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "আমি সব জানি মনীশ রাজদ্রোহী গোপাল মিত্র তোমার সঙ্গে মিশেছে। একদিন সে আমারও বন্ধু ছিল, আমাকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। সে আমার চোখ ফুটিয়ে দেছে এজন্যে তাকে আমি প্রণাম করতে পারি, কিন্তু সে যে পথ সোজা বলে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, যা সব কথা বলেছিল তার জন্যে তাকে আমি ঘৃণা করি। মনীশ, রক্ত দিয়ে কখনও মায়ের পূজা হয় না, রাক্ষসীর তৃপ্তি হয় মাত্র। আমাদের দেশ মাতৃকা যে দেবী, তিনি তো রক্ত চান না মনীশ, তবে মায়ের চরণে তোমরা বলিদান দেবার আয়োজন করেছ কেন বল দেখি?"

মনীশ শিহরীয়া উঠিল, চোখ সম্মুখের দিকে ফেলিতেই শরতের চোখের পরে তাহার চোখ পড়িল, শিহরীয়া সে চোখ ফিরাইল।

আবার চলিতে চলিতে শরৎ বলিলেন, "তোমরা যে পথ বয়ে চলেছ, ভারতের মহাগুরু সে পথ তো দেখাননি মনীশ, তিনি অহিংসা অসহযোগের পথ বলে দিয়েছেন, হিংসানীতি বর্জ্জন করবার উপদেশ দিয়েছেন। রাজার সঙ্গে বিবাদ করে কতক্ষণ টেঁকতে পারা যায়, কারণ তোমার যে এতটুকু শক্তি নেই। নিজের জিনিস পরে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার বাণিজ্য ব্যবসা সব বিদেশীরা একেচেটিয়া করেছে, অবশেষে তোমার জমীজমা পর্য্যন্ত তারা দখল করছে, তুমি ওই একদিক লক্ষ্য রেখে ছুটেছ। উদরে অন্ন নেই,—দেশের মাঠ অনুর্ব্বর; দলে দলে আফগানিস্থানের লোক এসে চাষাদের পাঁচ টাকা ধার দিয়ে দশ আনা সুদ আদায় করছে। জমীদারের পীড়নে দরিদ্র চাষা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে,—এর পরে আছে ম্যালেরিয়া-নানা রকম ব্যারাম। ভুল পথে বেয়ে চলেছ মনীশ, রক্তের ছবি মুছে ফেল, দেশের অবস্থা ফিরাবার চেষ্টা কর, যাতে ব্যারাম দূর হয়, বাংলার চাষা আবার মানুষ হয় তাই কর।"

অদূরে ট্রেনের শব্দ শুনা যাইতে ছিল, শরৎ বলিলেন, "লাইন ছেড়ে নেমে এসো, ট্রেন আসছে।"

হুস হুস করিয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল, আবার তেমনই ভাবে চলিয়া গেল।

শরৎ এক দৃষ্টে ট্রেনের পানে তাকাইয়া রহিলেন, ট্রেন খানা যখন মিলাইয়া গেল তখন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশের পানে তাকাইয়া তিনি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "এই রকম—এক খানা ট্রেণ যদি কেউ ডিন-মাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে কি বলা যায় বল দেখি মনীশ? একজনের 'পরে তোমাদের আক্রোশ, তার জন্যে শত শত নির্দ্দোষী প্রাণীকে তোমরা হত্যা করবে মনীশ? বল দেখি, এক খানা ট্রেণে কত নারী কত শিশু রয়েছে, একজনের পাপে এরা সবাই মরবে মনীশ? এতগুলি প্রাণীকে জগৎ হতে বিদায় দিতে তোমাদের প্রাণে কি এতটুকু ব্যথা বাজবে না?"

মনীশ খানিক মূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ শরতের হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমায় মাপ করুন শরৎ বাবু, আমি বুঝতে পারি নি—"

শরৎ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "তা আমি জানি মনীশ, আমি জানি তোমরা কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারনি, কেবল ঝোঁকের বশেই চলেছ। তোমরা তরুণ—দেশ তোমাদের কাছে অনেক পাওয়ার প্রত্যাশা করে, সে পাওয়া তো এ রকমে নয়। সন্তানের উপযুক্ত কাজ কর, স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়ো না। তোমরা বাঁচলে কত কাজ হবে, কিন্তু বাঁচার পথ তো তোমরা রাখছ না ভাই। স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝুঁকে পড়ছো, ভবিষ্যতের পানে চাও নি, বর্ত্তমান নিয়ে থাকতে চাও। এই সুন্দর

একে এমন করে কদর্য্যতায় ভরিয়ে তুলো না, সুন্দরকে আরও সুন্দর—আরও রমণীয় করে তোলো।"

মনীশের দুই চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল।

উভয়ে তখন গ্রামের প্রান্ত সীমায় আসিয়া পৌছাইয়াছেন।

শরৎ বলিলেন, "আমাদের ওসব কথার এই খানেই শেষ হয়ে যাক্ মনীশ। তোমায় শেষবার বারণ করে দিচ্ছি,—তুমি গোপাল মিত্রের সঙ্গ ছেড়ে দাও—সে তোমার উন্নতির নামে অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে, দেশ সেবার নামে দেশদ্রোহী করে তুলছে। তোমরা যা করছ এর নাম দেশদ্রোহীতা, —এর ফলে দেশকে আরও বিপদগ্রস্ত হতে হবে, আরও কতকগুলি নির্দ্দোষী লোক পর্য্যন্ত জড়িয়ে পড়বে, দণ্ডভোগ করবে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল, "অনেকদুর এগিয়ে গিয়েছিলুম শরৎ বাবু, এবার যাতে ফিরতে পারি তারই চেষ্টা করব।"

শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা তখন আকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে অনেকদুর উঠিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বের একটী বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে গলা মিলাইয়া কে গাহিতেছিল—

আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী,
ওই স্বপন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

নিস্তব্ধে চলিতে চলিতে শরৎ হঠাৎ কথা কহিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে মনীশ চমকাইয়া উঠিল।

"হ্যাঁ,—আমি তাদের বড় ঘৃণা করি যারা দেশ সেবার নামে দেশের ক্ষতি করে, মাথার বোঝা নামাবার নাম করে আরও বোঝা চাপিয়ে দেয়, একজনের পাপে সহস্রজনকে পীড়ন করে। আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর দেশোদ্ধারের চেষ্টা কর। যাদের দাঁড়াতে গেলে পা কাঁপে, চলতে গিয়ে যারা আছাড় খায়, যারা অন্ধকারে একলা বার হতে পারে না, তারা চায় এমনি করে দেশোদ্ধার করতে,— পাগলের পাগলামী, ছেলেখেলা মাত্র।"

পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন মনীশ সরিয়া গিয়াছে।

২১

গ্রামের বুকে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রণতি শুনিতে পাইল মাণিক এজগতে নাই।

প্রণতি আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে—যে ছেলেটিকে সে এত যত্ন করিয়া বাঁচাইল, সে আজ এমন করিয়া লাঞ্ছিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

বেশী দিনের কথা তো নয়, এই তো মাসখানেক আগে প্রণতি তাহাকে সুস্থ হৃষ্টপুষ্ট অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। যখন সে গাড়ীতে উঠিতেছিল, কাঁদিয়া বালক তাহার পানে চাহিয়াছিল, কেবলমাত্র একটী শব্দে তাহার আর্ত্তকণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়াছিল, "মা।"

সমস্ত পথ এই "মা" শব্দটা প্রণতিকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় গিয়াও সকল কাজের মাঝে আনন্দের মাঝে তাহার কানে সেই মা শব্দটী ভাসিয়া আসিয়াছে, প্রণতি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। মামার বাড়ীতে লাঞ্ছনার ভয়ে সে মাণিককে লইয়া যাইতে পারে নাই; নহিলে সে লইয়া যাইত।

সেই কণ্ঠস্বর আজও প্রণতির বুকের মধ্যে বাজিতেছিল। পথে আসিতে গাড়ীর ফাঁক দিয়া সে ব্যগ্র চোখে বাহির পানে চাহিতেছিল—যদি মাণিককে দেখা যায়। সে আশা করিয়াছিল পথের ধারে হয়তো সে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়াই মা বলিয়া ছুটিয়া আসিবে।

প্রণতি অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে তাকাইয়া রহিল;—দুর্ভাগ্য বালক, দুদিনের জন্য আসিয়া মনের মধ্যে এমন একটা রেখাপাত করিয়া গেল, যাহা আর এ জীবনেও মুছিবে না।

শরতের উপর প্রথমটায় তাহার বড় রাগ হইল, পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিল—তাঁহার কোন দোষই নাই। তিনি কি করিবেন, তিনি তো দিনরাত তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে পারেন না।

অভাগা মাণিক—

প্রণতির বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বাপুয়া তাহার মলিন ভাবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতেছিল, "আহা দিদিমণি,—মরে গেছে কে বলবে; জল হতে যখন তুললে, ঠিক তেমনি চেহারা,—তেমনি মুখ, তেমনি হাসিটুকু পর্য্যন্ত রয়েছে। মনে হচ্ছিল সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে,—ঠিক যেন—"

"ওরে তুই থাম রে থাম,—"হাঁকাইয়া উঠিয়া প্রণতি বলিল, "আর জ্বালাস নে বাপুয়া, থেমে যা। ও সব কথা আর আমার কাছে বলিস নে, ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়।"

তাহার আর্দ্র কণ্ঠ স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া বাপুয়া তাহার পানে তাকাইয়া দেখিল প্রণতি উদাস নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া আছে, তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাপুয়া বাস্তবিকই হৃদয়ে বেদনা পাইল। সেই যে প্রণতিকে অকারণে কাঁদাইল, ইহা ভাবিয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বিমর্ষ মুখে সে প্রণতির পানে চাহিয়া রহিল, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইল না।

প্রণতি আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া শরৎ একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তাহারপর দেখা করিতে আসিলেন।

প্রণতি অভিবাদন করিল, বসিতে চেয়ার দিল, কিন্তু তাহার মুখে সে হাসি ফুটিল না। তাহার মলিন মুখের পানে একবার তাকাইয়াই শরৎ চোখ নামাইয়া লইলেন।

হাত দুখানা কচলাইতে কচলাইতে নিতান্ত বিপন্নভাবে তিনি বলিলেন, "আপনি সবই শুনেছেন মিস বোস্, আমি ··"

মলিন হাসিয়া প্রণতি বলিল, "হ্যাঁ, আমি সবই শুনেছি, কিন্তু তার জন্যে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, বলুন দেখি?"

শরৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কারণ আমি নিজে বড় বেদনা পেয়েছি মিস বোস। হয় তো সে মরত না, সে সেরাত্রে আর কারও কাছে যায়নি,—আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে সান্ত্বনা দেইনি, তাকে কাছে ডাকিনি,—তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। যদি তাকে তখন সান্ত্বনা দিতুম তবে সে এমন করে মরত না—মিস বোস।"

শান্ত কণ্ঠে প্রণতি বলিল, "আপনি জ্ঞানী হয়েও বুঝতে ভুল করেছেন। জীবের মরণ যখন আসে, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না,—যেমন করেই হোক তার দণ্ড সে জীবের অঙ্গে ছোঁয়াবেই। আপনার চারিদিকে চেয়ে দেখুন,—কত রকমে কত লোক মরছে। কেউ ব্যারামে ভুগে মরছে, কেউ অতর্কিতে মরছে, কেউ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে মরছে; যে যেমন করেই মরুক, মরণ যে সেই এক—এতো অস্বীকার করবার যো নেই। যে কোন রকমেই জীবমাত্রেরই মৃত্যু আসবে, একে এড়াবার যো কিছুতেই নেই। বুঝতে গেলে বোঝা যায় কিছুই না,—সবই মিছে, কিন্তু আঘাতটা হঠাৎ লাগলে প্রথমটা আমাদের বোধ শক্তি থাকে না, আমরা বেদনায় কাঁদি। প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা কিন্তু এত সহজে ভেঙ্গে পড়েন না। আপনি ভুল ধারণা করে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছেন; আপনার সান্ত্বনা দেবার অভাবেই যে সে মরেছে তা নয়।"

শরৎ স্থির দৃষ্টিতে প্রণতির পানে তাকাইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি একটী কথা বলিতে পারিলেন না। এই জ্ঞানবতী তরুণীটী তাঁহাকে প্রতি কথায় এমনি করিয়া স্তম্ভিত বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রণতি চোখ তুলিতেই দেখিল শরৎ তাহার পানে তাকাইয়া আছেন; কুণ্ঠিত সলজ্জ দৃষ্টি সে তাড়াতাড়ি নামাইয়া লইল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিলেন, "আপনি যে কথাগুলো বলেছেন মিস বোস তা সত্য এবং মূল্যবান। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি আপনি এই অল্প বয়সে এত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন কি করে?"

প্রণতি হাসিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "মানুষ ঠেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে। যাদের মা ছোট বেলায় মারা যায়, তারপর পরের দয়ায় কোন ক্রমে যারা মানুষ হয়, তারা সংসারকে বড় বেশী রকম চেনে।"

শরৎ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "মা তো অনেকেরই থাকে না মিস বোস, আমারও তো মা নেই।"

প্রণতি হাসিল, সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল অন্তরের জমাট বাঁধা বেদনা;—সে বলিল, "অনেক প্রভেদ,—আপনার মা গেলেও পরের লাঞ্ছনা আপনাকে সইতে হয়নি, আপনার বাপ ছিলেন, কিন্তু আমার যে কেউ নেই সে কথা বোধ হয় জানেন। আমার মামা যদিও আমায় স্নেহ করেন তাঁর দয়াতেই আমি মানুষ হতে পেরেছি, কিন্তু মামী আমার কিছুতেই সুচোখে দেখতে পারেননি। চিরদিন তাঁর ঘৃণা অবহেলাই কুড়িয়ে এসেছি। বলবেন তবু আমি ছুটির সময় কোথাও থাকতে পারিনে কেন, কেন তবু ছুটে সেখানে যাই,—যাই শুধু আমার মামার জন্যে,—তিনি আমায় আজও বড় ভালবাসেন।"

শরৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—বাপুয়া আলো দিয়া গেল। গ্রাম বক্ষ হইতে শঙ্খনিনাদের শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাপুয়া—"

"যাচ্ছি বাবু—"

বাপুয়া বাহিরে চলিয়া গেল, একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হরিবাবু আপনার খোঁজ করছেন দিদিমণি।"

অনেকদিন পূর্ব্বের একটী কথা প্রণতির মনে জাগিয়া উঠিল। সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে কথা নানা ভাবনায় সে ভুলিয়া গিয়াছিল, হরিঘোষের নাম শুনিয়াই সেকথা মনে পড়িয়া গেল।

প্রণতি অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তাঁকে নিয়ে এসো।"

হরিঘোষ প্রবেশ করিতেছিলেন, বারাণ্ডায় শরৎকে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, আর অগ্রসর না হইয়া আস্তে আস্তে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

শরৎ ডাকিলেন, "ঘোষ মশাই যে, আসুন।"

মুখখানা অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে হরিঘোষ বলিলেন, "একটা দরকার ছিল মায়ের কাছে,—তা উনি এখন ব্যস্ত আছে, এখন বরং থাক, আমি এর পরে এক সময়ে এসে—"

তিনি থামিয়া গেলেন দেখিয়া শরৎ তাঁহাকে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া প্রণতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে ওঁর দরকার আছে বুঝি?"

প্রণতি বিবর্ণ মুখে বলিল, "হ্যাঁ, আমার কাছে ওঁর একটা দরকার আছে বটে।"

হরিঘোষ কম্পিত হস্তে পকেট হইতে এন্‌ভেলাপ বদ্ধ একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু এই পত্রখানা দিয়েছেন। আপনার হয়তো মনে নেই মা,—মনে না থাকবারই কথা—সেই জন্যে—"

"দেখি" বলিয়া হাত বাড়াইতে হরিঘোষ একটু ইতস্ততঃ করিয়া শরতের হাতে পত্রখানা দিয়া প্রণতির পানে তাকাইলেন।

শরৎ সাদা এন্‌ভেলাপখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন। কভারে সুন্দর ইংরেজিতে লেখা—মিস প্রণতি বোস।

শরতের প্রশান্ত ললাট মুহূর্ত্তেরতরে কুঞ্চিত হইয়া তখনই পরিষ্কার হইয়া গেল, তিনি সেখানা প্রণতির হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে পত্রে কথা বার্ত্তা চলে দেখছি। গোপনীয় কথাবার্ত্তার মধ্যে আমি থাকার ইচ্ছে করিনে, সুতরাং আমি এখন উঠি।"

প্রণতির উজ্জ্বল মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল, সঙ্কুচিতভাবে সে বলিল, "আপনি ভুল করছেন, গোপনীয় কথাবার্ত্তা কিছুই নয়, তিনি নিজে আসতে পারেননি, এঁকে কথা দিয়েছেন সেই জন্যেই—"

হরিঘোষ বলিলেন, "আমি এখন যাচ্ছি মা খানিক বাদে আসব এখন।"

তিনি যে চলিয়া গেলেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শরৎ বলিল, "আমি আপনাকে লজ্জিত করবার জন্যে কোন কথা বলিনি মিস বোস। আমার একটা কাজ আছে,—ফিরে গিয়ে করতে হবে। আবার কাল যদি পারি তবে আসব। নমস্কার—"

তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া প্রণতি থতমত খাইয়া গিয়াছিল, প্রতি নমস্কার দিতে তাহার মনে ছিল না।

ক্রমশঃ —

ছল

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তুমি নাকি আমার সঙ্গে আর কখ্‌খনো কথা বোল্‌বে না শুনলুম। আমার অপরাধ এই দেখিয়েছো যে সেদিন ডেকে পাঠিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা কইনি, তুমি এলে মুখ ফিরিয়ে বোসেছিলুম।

কথা তুমি আমার সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই কওনি, দেখাও করোনি। সুতরাং আর কখ্‌খনো কথা না কইবার বিভীষিকা যে দেখিয়েছো তার কোনো অর্থ নেই, ভীষণতাও নেই। তবুও তোমার উক্তির মধ্যে দু'একটা ভ্রম আছে বোলে তা সংশোধন কোর্‌ছি।

সেদিন আমি তোমায় আস্‌তে ব'লিনি—বোলেছিলেন তোমারই প্রিয়তম আত্মীয়, আমার বন্ধুটি। তুমি দেখা না কোরলেও বা কথা না কইলেও, প্রতিদিনই যে আমার খবর নিতে সে কথা আমার অজানা নেই। আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে আমি দৃষ্টি, বাণী এবং স্পর্শ হারালেও, করুণা হারাইনি। যে কথা বোল্‌ছিলুম:—বন্ধুটি ডাকতে তুমি যে এলে, কই এসে, অতোদিন পরে আমায় দেখে একবার প্রশ্নওতো করোনি তুমি 'কেমন আছেন' বা 'কেনো ডেকেছেন'? বন্ধু তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন বটে কিন্তু আমার নাম কোরেই। সুতরাং তুমি জান্‌তে যে আমিই ডেকেছি। অথচ তুমি এসেই তোমার আত্মীয়জনের সঙ্গে রসালাপ কোর্‌তে সুরু কোর্‌লে আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে।

এর পরে যদি আমি বিমুখ বা বিপরীতমুখ হোয়ে বোসে থাকার অপরাধ কোরেই থাকি তো তার নিন্দা বা শাস্তি ঘট্‌তে পারে না।

তুমি কেনো বোল্লেনা 'আমাকে ডেকে কথা কইছেন না যেই' আমি তোমার চেয়ে বয়েসে ও সম্পর্কে বড়ো ভুলে যেয়ো না। তা ছাড়া লোকে ও তোমার আপনজনে তোমার সঙ্গে আমার যে নিবিড়তম সম্বন্ধের কথা নিয়ে রঙ্গরহস্য করে, সে সম্বন্ধ ধ'রলে তোমারই উচিত ছিলো আলাপ সুরু করা। তোমার শীগ্‌গীর বিয়ে হবে শুনছি, যারপর নাই সুখের সন্দেশ। কিন্তু যতদিন তা' না হচ্ছে, ততদিন বিনা কারণে নিজের ও অপরের মনের পবিত্রতম ও মিষ্টতম সম্বন্ধকে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত কোরে অন্ততঃ একজনেরও বুক ভাঙ্‌বার তাৎপর্য্য কি বুঝতে পারলুম না।

তুমি যে আমাকে ঘৃণা করো না এ কথার প্রতিবাদ স্বয়ং ভগবান এসে কোরলেও বিশ্বাস কোরবো না! বোলতে পারো 'ভালো তো বাসিনা'; তর্কের খাতিরে না হয় এটুকু মান্‌লুম যে এই উক্তি যথার্থ। তা হোলেও, মনে কষ্ট দেবার অধিকার এই যুক্তির বলে প্রমাণিত হয় না। ভালো না বাস্‌লে যে পায়ের তলায় ফেলে ঠাস্‌তে হয়, এমন কথা কোনো শাস্ত্রই বলে না।

আমার বলা এইখানে শেষ হোলো—তোমার চলা আরো কতোদিন চ'লবে?

তিমির-শর্ব্বরী-শেষে অরুণ-প্রভাত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—প্রথম—

সন্ধ্যায় লগ্ন; কাজেই বিবাহ চুকিয়া গেল খুব সকাল সকাল। বিজন যখন বাসর ঘরে উপস্থিত হইল, তখনো দশটা বাজিতে দেরী আছে।

বিজনের বরাত ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, কেননা বাসর জাগিবার মতো সঙ্গিনী সে রাত্রে একজন ছাড়া আর কেহই ছিল না। সেই একজন আবার নব বিবাহিতা। একালের ছেলে বিজনের রসিকতা খুবই ধারালো, তাই লজ্জায় সঙ্গিনীটি উঠিয়া পালাইলেন বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে খড়খড়ির ফাঁকে দেখা দিতে কসুর করিলেন না। কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নহে রাত বারোটার পরই সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

জীবনের প্রথম মধুময় বসন্তের রাতে উপভোগ করিবার বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটী এইবার উপস্থিত হইল।

খাটের উপর শুভ্র নরম বিছানা—ফুলে ফুলময়। বেল ও যুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধে সমস্ত ঘরখানি আমোদিত বৈদ্যুতিক নীল আলোর পার্শ্বে নিদ্রিতা (?) জীবন সঙ্গিনীর নীল ওড়নাখানি বিজনের মনে এক মোহন কল্পলোকের সৃষ্টি করিল। ছাদের দিকের খোলা জানলাটা দিয়া মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে দখিনা বাতাস প্রবেশ করিতেছে।

বিজন উঠিয়া বসিল,—একটু নড়িল চড়িল,—খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশিলও—কিন্তু ও পক্ষ, হইতে কোনওরূপ সাড়া পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পরে অতিষ্ঠ হইয়া একটু সরিয়া গিয়া বিজন ডাকিল—সুষমা!

কোন উত্তর নাই। বিজনের শুধু যে আশ্চর্য্য ঠেকিল তাহা নহে,—রাগও একটু হইল। সত্যই তো, রাত আর এমন কি বেশী হইয়াছে? বারোটা অবধি এমনিই তো সাধারণ লোকে জাগিয়া থাকে! জীবনে বাসররাত একবার বই দু'বার আসে না! আর সুষমা?—কচি খুকিটি নহে হাজার হইলেও বাংলা দেশের সতেরো বছরের তরুণী! তবে?

বিজন রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল—থাক্ আমার একারই বা এতই কি গরজ?

কিছুক্ষণ চোখ বুজাইয়া শুইয়া থাকিয়া বিজনের অনুতাপ হইতে লাগিল। নাঃ একজন নির্ব্বুদ্ধি ও ভুলের বশে এমন মধু-যামিনী যদি ব্যর্থ করিয় দিতে চায়, সেও কি তাহাতে সায় দিবে? কি বোকা সে!

বিজন আবার উঠিল। এবার অনেকখানি আগাইয়া গিয়া বধূর লীলায়িত একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—শুনছ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুষমা পাশ ফিরিল। মাথার একরাশ ঘোমটা, আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল—ডাক্‌ছিলে?

হায়রে! তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? বিজন ক্ষুণ্ণ মনে বলিল—হাঁ, কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলে?

—প্রথমটা বটে, কিন্তু তুমি ডাক্‌বার পরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছ্‌ল।

শুনিয়া বিজনের মন আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—তুমি অত ভয়ে ভয়ে শুয়ে আছ কেন সুষমা? মাথায় একরাশ ঘোমটা, অত জড়ো-সড়োভাব—কেন? আর তো কেউ আড়ি পাতছে না।

সুষমা উহার উত্তর দিল না, শুধু মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘামিতে লাগিল।

বিবাহিত বন্ধুদের নিকট বিজন শুনিয়াছিল—প্রথম প্রথম সকলেই ওইরূপ করিয়া থাকে। হাজার চালাক মেয়ে হইলেও প্রথম প্রথম কেহ কেহ লজ্জায় কথাই বলিতে পারে না। একটু একটু করিয়া লজ্জা ভাঙ্গাইতে হয়—সবুরে নাকি মেওয়া ফলে!

বিজন কহিল—আচ্ছা সুষমা, আজ থেকে তুমি আমার কে হ'লে বলত?

সুষমা শুনিয়াই উত্তর করিল—বউ!

বিজনের রসিক মন এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—ও কথা তো সাধারণ লোকেও বলে থাকে, তুমিও তাই বলবে?

—তবে কি জীবন-সঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রিয়া? বলিয়া সুষমা অধর টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজন মনে মনে লাফাইয়া উঠিল—বাঃ সুন্দর 'ফর্‌ওয়ার্ড' মেয়ে তো?

মুখে বলিল—এই তো জানো সুষমা, বলিয়া তাহার হাতে একটু চাপ দিল।

বিজন আবার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি তো বেথুন স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছ শুনেছি,—রবিবাবুর কবিতার বই কখনো পড়েছ সুষমা?

—প্রায় সব গুলোই।

—সোনার তরী?

—হাঁ।

—ওতে মানস সুন্দরী বলে যে কবিতাটা আছে, সেটা?

সুষমা হাসিয়া বলিল—সেই—

অয়ি প্রিয়া

চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরাও না মুখ
উজ্জল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধর পুটে—তো?

বিজন মুগ্ধ হইল। সত্যই তাহার বিবাহ করা সার্থক হইয়াছে! মনের কথাটী এরূপ ভাবে টানিয়া আনিবে—এতখানি সে মোটেই আশা করে নাই!

এই তো চাই! এই-তো তাহার যুগ যুগবাঞ্ছিতা আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়া!

সুষমার হাতখানি নিজের মুঠার ভিতর শক্ত করিয়া ধরিয়া অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় বিজন বলিল—তুমিই তো আমার মানস-সুন্দরী সুষমা, অতএব বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ।

হঠাৎ একি হইল? বিজনের হাত হইতে নিজের হাত মুক্ত করিয়া সুষমা সহসা উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিয়াছে। আয়ত হরিণাক্ষিও অশ্রুতে চক্ চক্ করিতেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুষমা মুখ ফিরাইল।

কি হইতে কি হইল? বিজন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। তাহার যেন সমস্ত গোলমাল ঠেকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে পর সে উঠিয়া বসিয়া কহিল—সুষমা, একি?

সুষমার চক্ষু হইতে দুফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আঁচলে তাহা মুছিয়া সুষমা ধরা গলায় বলিল—আজ আমায় মাপ করো।

সেকি! বিজনের বুদ্ধি যেন লোপ পাইতে লাগিল। সুষমা এরূপ বলে কেন?

বিজন বলিল—ওকি সুষমা, তুমি ওসব কি বলছ? দোষই বা কি করলে যে মাপ চাইছ? এসব কি?

সুষমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল তোমার চরণে আমি শত সহস্রবার অপরাধী, মাপ চাইবারও আমার পথ নেই; তুমি আমার কাছে আজ যা চাইছ, আমি তা দিতে পারবো না, আমায় কিছু দিনের ছুটি দাও, জানি বাসররাত একবার গেলে আর ফেরে না, কিন্তু কি করবো আমি যে বড় অভাগিণী,পারবো না উপায় নেই, উপায় নেই,—বলিতে বলিতে সুষমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—দ্বিতীয়—

বিবাহের দুই মাস পরে আর এক পূর্ণিমা রজনীতে ছাদের উপর দখিনা বাতাসের লুকাচুরি খেলা চলিতেছিল। সতরঞ্চির উপর বিজন বসিয়া। আর তাহারই পায়ের কাছে বসিয়া সুষমা কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছিল—বিয়ের পর এই দুটো মাস কেন যে আমি আমার এই তুচ্ছ দেহটাকে তোমায় দান করতে পারিনি, সেই কথাটাই আজ বলবো। দয়া করে শুনে আমার বিচার কোরো।

"আমাদের বাড়ীর পাশে তেতালা বাড়ীটায় মাসীমারা যখন ভাড়া এলেন, তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি,—বয়স আমার তখন চোদ্দই হবে। দু' এক মাসের ভেতরই মাসীমাদের সঙ্গে আমাদের খুব আত্মীয়তা জমে' গেল। আমরা যখন তখন ওঁদের বাড়ীতে যেতুম—ওঁরাও আসতেন, এক কথায় কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সব একই সংসারের ছেলে মেয়ে বনে' গেলুম।

"কি জানি কেন মাসীমার ছেলে হীরেনদার সঙ্গে আমার যেন একটু বেশী বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। হীরেনদার বোন রমলাও আমার বন্ধু ছিল বটে কিন্তু অবসর সময়ে হীরেনদার কাছে থাকতে পেলে আমি যেন আর কিছু চাইতাম না।

কারণটা অবশ্য আবিষ্কার করলুম পরের বছর থার্ড ক্লাসে ইস্কুলের বন্ধু মীরার কাছে।

"আমার তেরোবছরের জীবনে হঠাৎ একদিন টের পেলুম যেন জগতের সব জিনিসেই একটা আনন্দের উৎস উথলে উঠছে। চোখে যেন আমি এক নতুন দৃষ্টি পেলুম। নারীত্বের প্রথম আস্বাদনে মন প্রাণ আমার যেন এক নতুন আনন্দে, নতুন পুলকে ভরে উঠলো।

সেই সময় যৌণ তত্ত্বের একখানা বাংলা বই মীরা আমায় পড়তে দিয়েছিল। পড়ে অবধি, যৌবনের একটা চঞ্চল আবেগ সারা দেহে অনুভব কোরতে লাগ্লুম। পুরুষের কঠিন আলিঙ্গনে আমার তরুণ দেহটাকে নিপীড়িত করবার প্রবল কামনা আমার পাগল কোরে তুল্তো।—একদিন মীরা বোল্লে—সে নাকি একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে, আর এই

গোপন প্রেমকে সার্থক করতে তারা লুকিয়ে বিয়ের চেষ্টাতেও আছে। মীরার ওপর রাগ হতে লাগলো—তার কি দরকার ছিল আমায় এসব জানাতে? আমি এ মোহের হাত থেকে উদ্ধার পাই কি করে?

"কিন্তু উদ্ধার পাবার পথ একদিন দেখিয়ে দিলে হীরেনদা। আমার সমস্ত জীবন মন সার্থক করতেই সে একদিন এমনি পূর্ণিমা রজনীতে ছাদের ওপর হীরেনদা পরিপূর্ণ সুধা পাত্র আমার বহুকালের তৃষিত হৃদয়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে।

তারপর থেকে আমার অবস্থা মীরার মতই হ'য়ে উঠ্লো। অবসর পেলেই আমাদের অভিসার চল্তে লাগলো।

"এমনি করেই তিন বছর কাটলো—আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলুম। হঠাৎ শুনলুম, বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন। শুনে ভাবনা ও দুঃখে মনটা বড় দমে গেল। হীরেনদার কাছে পরামর্শের জন্য ছুটলুম—বললুম—তুমি আমায় বাঁচাও হীরেনদা, তোমাকে ছাড়া, আরতো কারু গলায় মালা আমি দিতে পারবো না। হীরেনদা অভয় দিয়ে বললেন—দুদিন সবুর কর, দেখি আমি কি করতে পারি।

"সেই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলুম—কিন্তু হায়রে পুরুষ! ভণ্ড! স্বার্থপর!"

সুষমার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল—সমস্ত মুখ রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার সে বলিতে লাগিল—

"তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা যেদিন আমার পাকা হ'ল সেই দিনই হটাৎ পশ্চিমে বেড়াতে যাবার নাম করে সেই যে সে গোপনে পালিয়ে গেল তারপর আর তার দেখা পাইনি।

"তখন থেকে মনকে কঠিন করলুম—সব ভুলতে চাইলুম, তবুও স্মৃতির কাঁটা বুকে বিঁধেই রইলো।

তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল কিন্তু এই কলঙ্কিত দেহটা কি করে তোমায় দান করবো এই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠলুম। কপট অভিনয় করতে গেলেই মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো। তখনো একজনকে ভুলতে পারিনি, তাই বিবেক ধমক দিয়ে উটতো—দ্বিচারিনী!

"এই নিয়েই এতদিন তোমার নিষ্কলঙ্ক উদার মনে কষ্ট দিয়ে এসেছি—এতখানি ছলনা করেছি। কিন্তু আজ আর আমার কিছু বল্বার নেই। সেই স্বার্থপর নীচ ভণ্ড কাপুরুষকে শুধু ভুলিনি তাকে আমি আজ ঘৃণা করি, গলিত কুষ্ঠের চেয়েও ঘৃণা করি। কেন জান? এই চিঠিখানাই আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছে—পড়বে একবার?

হাতের মুঠার ভিতর হইতে চিঠিখানি সুষমা বাহির করিয়া দিল। বিজন পড়িল—চিঠিখানির অর্দ্ধেক প্রণয়োচ্ছ্বাসে ভরা, শেষে হীরেন লিখিয়াছে—"বিবাহই প্রেমের চরম পরিণতি নয়। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ—আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমাদের বিবাহ হইতে পারে না কিন্তু চুলায় যাক্ বিবাহ, আমাদের এতদিনকার প্রেম কি ব্যর্থ হইবে? না, তাহা হইতে পারে না—সুষমা, তোমার বিবাহ হইয়া গেলেও আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও তুমি তোমার মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে না, ইহা জানি। আমি শীঘ্রই যাইতেছি তুমি ভাবিও না, এ চিঠি কাহাকেও দেখাইও না,—গিয়া তোমার শ্বশুরবাড়ীর পার্শ্বে যাহাতে বাড়ীভাড়া করিবার সুবিধা হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি—

বিজনের চিঠি পড়া হইলে সুষমা বিজনের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল—সমস্তই তোমায় খুলে বললুম, সমস্ত শুনে এখনও কি এই কলঙ্কিনীকে তোমার পায়ে স্থান দিতে পারবে?

অশ্রুতে বিজনের পাদুটি ভিজিয়া উঠিল।

বিজন বাহু প্রসারিত করিয়া সুষমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—অনুতাপই মানুষকে শুদ্ধ করে—আগুণে পুরে তুমি খাঁটি সোনা হয়েছ আর ভয় কি সুষু? সব শুনে এখনও যদি তোমার ওপর সুবিচার না করি, তা'হলে জগতে কোথাও আমার স্থান হবে না। আর সে যুগ নেই সুষমা। তরুণের দল আমরা, সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে দূর ক'রে আজ আমরা উদার, আজ আমরা মহৎ। এস রাণী আমার, নবযুগের প্রাতঃ সূর্য্যকে আজ আমরা নমস্কার করি।

সুপরামর্শ

(রঙ্গসঙ্গীত)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দুনিয়ায় যারা টি^ঁকিয়া থাকিতে বাসনা করেছে ভাইরে —
তারা, ভেক্‌ধারী হোয়ে টিকি নেড়ে কোরো 'তাইরে নাইরেনাইরে'।
কভু, সত্য কথাটি বলিও না, ভায়া, মিথ্যা কথাটি বিনে !
আর, দোকানীরে কভু নগদ পয়সা দিয়ো না দ্রব্য কিনে !
এই, স্বার্থের লাগি মেজাজ বুঝিয়া তোয়াজ করিও সদা ;
আর, সুযোগ পাইলে যার খাবে তার মাথায় ঠুকিও গদা !
ওরে, হাতে হাতে ঘুস খেয়ো না আপিসে, চাকুরী যাইবে তাইতে ;
শুধু, বিজনে বসিয়া রাতে খাবে ঘুস আজ্ঞাধীনের হাতে !
আরে, 'বড়বাবু' হোক্ হস্তিমূর্খ, তার কাছে সেজো বোকা ;
তা'লে, কার্য্য হাঁসিল করিতে পারিবে লাগায়ে ভীষণ ধোঁকা !
আর, যাহার সর্ব্বনাশটি করিবে, খুসী রেখো তারে হাসি' ;
আহা, কন্যাদায়ের ভাবনা রবে না, মরিলে লাগায়ে ফাঁসি !
ভবে, ভণ্ডামি কোরো, গুণ্ডামি কোরো, বিবাহ কোরো না, বাবা ;
এই, টিকি-কাটা ভট্‌চাজের নিকটে খাঁটি পাঁতি এই বাবা !

নারী প্রগতি

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

বাঙ্‌লার 'কাল্‌চার' বা বৈদগ্ধ্য আজ আবার আপনার স্বরূপটীকে চিনিতে চলিয়াছে ইহা আনন্দের বার্ত্তা বটে। যুগ-নির্দ্দেষ্টার সবুজ-পতাকার তলে দাঁড়াইয়া সে দিকে দিকে স্বাধীন প্রাণ বিস্তার করিয়া দিতেছে—মুক্ত যাহা, শুদ্ধ যাহা তাহাকে আবার গ্রহণ করিতেছে। ঋষি আর্য্যাবর্ত্তের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!" নিখিল মানব-চিত্তে সাড়া পড়িয়া গেল, জগৎজনের দুয়ারে কে যেন কড়া নাড়িল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া অসীম আকাশের পানে যখন তাহারা বিপুল বিস্ময়ে চাহিল উপর হইতে তখন আলোর ঝরণা তাহাদের মাথায় চিরকালের মানুষটীরই আশীর্ব্বাদরূপে ঝরিয়া পড়িতে-ছিল। সে আলোতে তাহাদের আঁখি ঝলসিয়া গেল—বিরাট্‌কে তাহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

* * * * *

বাঙ্‌লার নারী, কল্যানশ্রীর কল্প-প্রদীপ নারী—

সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ধরণীর সুরের সেতারের একটী তার সে আপন মহিমায় ছড়িয়া আছে, তাহাকে একপাশে ঠেলিলে চলিবে কেনো!···মায়া-পুরীর সোনার কাঠির পরশে সে যদি জাগিয়াই উঠিল তো তাহাকে তাহার যোলআনা বুঝাইয়া না দিলে চলিবে কেনো!···নারী, পৃথিবীর পায়ের তলায় যাহারা প্রীতির পাত্র ধরিয়া যুগে যুগে মানুষের মুখে অমৃতের আস্বাদনই দিতেছে তাহাদের আজ দাবইয়া রাখিতে চাহিলে আমি বলিব মানুষ বিশ্ব-শিল্পীর বিধান উল্টাইয়া দিতে চায়, আমি বলিব মানুষ তাহা হইলে আমার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষন করে—বিবেকের নিশানকে পদদলিত করে। নারীকে এমনভাবে কারারুদ্ধ করিয়া, ধরণীর আলো-বাতাসের রাজ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়া, প্রাণের প্রকাশের চেতনা লুপ্ত করিয়া কোন্ জনা সে এই ভুবনে আপনাকে প্রবল বলিয়া প্রচার করে?·· জননীর স্নেহ-স্নিগ্ধ মন লইয়া, আঁখির কোণে অতল অশ্রু লইয়া, বুকে স্তন্য-সুধা লইয়া—কে মানব তোমাকে ধরণীর পথে চলিতে শিখাইয়াছিল?··· নারীর স্বাধীনতার কথা স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টির মতনই সত্য। ··················

* * * দার্শনিক স্বফ্ নহুর বলিলেন—'নীল চোক যত উপারিয়া ফেলো!' কেন, ওই কালো-চোখের মনোরম স্নিগ্ধতা যে আকাশ-স্পর্শী আগুণকেও মুহূর্ত্তকে জল করিয়া প্রাণের প্রলেপ দিয়া যায়। শেলির এমিলিয়া ভিভিয়ানী, দান্তের বিয়াত্রিস আর মোনালিসার হাসি—এদের বাদ দিতে চাহিলে মানব-মনের ইতিবৃত্তের সাড়ে পনেরো আনাই যে পড়িয়া থাকে। ধরণীর পথে চলিতে চলিতে মানুষ যখন ক্রমাগত ঠোক্কর খাইয়া অচল হইয়া পড়ে নারীরই বুকের বাণী তখন জীবনী-শক্তির বয়লারে তাহার পাঁচ গুণ জোড় আনিয়া দেয়—এর পাল্টা জবাব কোন্ [illegible] দিবে? পৃথিবীর commercialism বা ব্যবসানেশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেউ কেউ বলিতে শুরু করিয়াছেন···নারীও commercial commodity. আমার একজন ইংরেজ-বন্ধুও ভারতীয় নারী সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মুক্তাকাশের নীলাবরণের তলে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, নারী যদি ব্যবসার বস্তুর মতনই সস্তা হয় তো মানুষের বুকের ব্যথা, মানুষের মনের মানুষটীর স্বাচ্ছন্দ্য বাজারের পণ্য। নারীকে যতদিন আমরা না চিনিব, নারীর অন্তরের গুহা-তলে যে কাম্য-ধন চিরন্তনী-রূপে লুকাইয়া আছে যতদিন না তাহাকে জানিব ততদিন আমাদের সমাজ, আমাদের আমাদের তথা-কথিত সমাজ পঙ্গু ও অচল হইয়া জগদ্দল পাথরের মতই দাঁড়াইয়া থাকিবে। যন্ত্রশক্তি ও বিংশতাব্দীর সভ্যতা ছাড়িয়া নারীকে আজ এই সূর্য্যোলোকদীপ্ত বিচিত্রবর্ণময়, নদী-মেখলা বনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ সুন্দরী ধরণীর মুক্ত বক্ষে ক্রীড়ার জন্য স্বাধীনতা দিতে হইবে। এ পরোয়াণা অস্বীকার করিবে যে মাথার উপরে তাহার পড়িবে ভগবানের উদ্যত বজ্র। কবি শেলী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"·········And man and woman ;
And what still is dear
Attracts to ctush repels
to make thee wither,
The soft sky smiles, the low
wind whispers near."

নারীর ভিতরকার মানুষটী সম্বন্ধে সত্য, শিব ও সুন্দরের কবি বলিতেছেন—"that light whose smile kindles the universe." নারীকে ইহার চেয়ে ভালো করিয়া বুঝাইতে গেলে ভাষা হার মানিবে। নারী·····নিখিলের নীলাঞ্চলতলে সে আপনার নীলাম্বরীর অঞ্চল-প্রান্ত দোলাইয়া দিবেই দিবে, জীবন উৎসের সন্ধান যখন একবার সে পাইয়াছে তখন শত বন্ধন আপনা হইতে খসিয়া যাইবে—নিষেধ মানার দুর্গ ধ্বসিয়া নারীর নব-অভিযানের পথ সুগম করিয়া দিবে।··············

* * * [illegible] আগুন ছড়াইয়া গিয়াছে—সে সাধনা তার শুভ সমাপ্ত হউক্। ওই শোনা যায় ঋষির জলদ্-গম্ভীর ডাক।

—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! *

* প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত একটি বক্তৃতা মর্ম্ম কথনে—বিঃ সঃ

দিল্-খেয়ালী

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

(১)

আজ্‌কে তোমার এ কোন্ খেয়াল
ও খেয়ালী মন !
খেয়াল বশে খেল্‌ছ তুমি
আজ হেঁয়ালী কোন্ ?
ও খেয়ালী মন !
ফুল ফুটেছে নদীর ধারে,—
হৃদয় মাঝে চাওকি তারে ?
চাও কি তুমি চাঁদের সাথে
ক'রতে আলাপন ?
আজ কি তোমায় হাতছানি দেয়
শিউলি ফুলের বন ?
ও খেয়ালী মন !

(২)

ভেবেছিলাম তোমার ব্যথার
নাইক' বুঝি শেষ।
আর কভু না পর্‌বে তুমি
উষার রাঙা বেশ।
তোমার মানস-ফুলের মধু
লুঠ্‌বে নাক জ্যোৎস্না-বঁধু,
উঠ্‌বে না আর তোমার বীণায়
মাতন-সুরের রেশ।
তোমার ব্যথার ভেবেছিলাম
নাইক বুঝি শেষ !!

(৩)

আবার কেন ভাঙা বীণায়
গাইতে চাহ গান ?
অনাদরের শুষ্ক-গাঙ্গে
আরকি আসে বান ?
হেলায় দ'লে ভালবাসা—
আবার কেন সুখ আশা ?
বরণ ক'রে মরন, কেন
প্রেমের অভিমান ?
আর কি পারে ছিন্ন-তারে
গাইতে বীণা গান ?

(৪)

সেদিন গেছে, যখন তুমি
কাটিয়ে দিতে দিন—
শত ব্যথার ঝড়ের মাঝে
বাজিয়ে সুখে বীণ্।
সেদিন গেছে অতল তলে—
সখের-আনা-চোখের-জলে,
ভগ্ন আজি আশার বাসা
ব্যথায় হ'য়ে লীন।
অতল তলে আজ্‌কে তোমার
অতীত-সুখের দিন

(৫)

থাম্ খেয়ালী মনরে আমার
এ কোন্ খেয়াল আজ ?
চাঁদের পানে চাইতে ফিরে
হয় না মনে লাজ ?
কইবে কথা প্রেমের সাথে ?
চুমতে চাহ মুকুল মাথে ?
ফুলের বনে ফুলের হাতে
পর্‌বে ফুল সাজ ?
এ সব কথা ভাব্‌তে কি গো
হয় না মনে লাজ ?

(৬)

খেয়াল রাখ, খেয়ালা-মন
হেঁয়ালী কাজ কি।
সত্যি ক'রে বল্‌তে হবে
চাইতেছ' আজ কি !
অনেক কিছু নূতন খেলা
খেল্‌লে তুমি জাগার বেলা ;
অরুণ রাগে—তরুন রাগে
চাইতেছ সাজ কি।
খেয়াল রেখে সত্য বল,
হেঁয়ালী কাজ কি ॥

বাঙ্গালার মাঝি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, বি-এ

পৃথিবীতে বঙ্গালীর নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সে কলঙ্ক কল্পনা বলে ক্রমে ঘনীভূত করিয়া লেখকবর্গ তাহাকে দুরাপনেয় করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী আজি অধঃপোতিত হইলেও, চিরদিন এরূপ অধঃপতিতভাবে জীবন যাপন করে নাই। তাহার জীবনেও একদিন গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালীর বীরবাহু দিগ্বিজয়ে বিশ্ব বশীভূত করিয়া রাজসিংহাসনে অপহরণ করিতে সমর্থ না হইলেও, জ্ঞানবিস্তারে ভারতবর্ষের মূল অনুসন্ধান করিয়া জগতে কীর্ত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের ভগ্নমন্দিরে বা গিরিকোটরে অদ্যাপি পর্য্যটকদিগকে বিস্ময় উৎপাদক করিয়া থাকে। জাপানেও তাহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। (Ideals of the East).

চিরদিন কাহারো সমান যায় না। উত্থান, পতন, জয়, পরাজয় প্রকৃতির নিয়ম—নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দাশা চক্রনেমিক্রমেণ। আজ ভীরুতা বাঙ্গালীর কলঙ্ক—কিন্তু চিরদিন বাঙ্গালী সত্য সত্যই ভীরু ছিল না, তেজ বীর্য্য শৌর্য্য বাঙ্গালীর জগতে গৌরব ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী আজ সকল ভুলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত, কারণ বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। ইতিহাস সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া জাতির স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস সেই আদর্শ, সেই জাতীয় গৌরব নবীনের মনশ্চক্ষো ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই গৌরব গাথা নাই। তাই "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্ব বৃক্ষই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করেনা, চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

বাস্তবিক অতীত কার্য্যের চিন্তা ভাবী কার্য্যের উত্তেজক। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। "অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠে তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদিগকে প্রথমে ইহা জানিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তারপর সেই পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্য্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাস বলে, সেই অতীত মহত্বের জলন্ত ধারণা হইতেই পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠণ করিতে হইবে।"—ভারতে বিবেকানন্দ।

অতীত ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের জীবন-বৃত্ত ব্যতীত কিছুই নহে। স্বদেশের অতীত কাহিনীর শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা,

স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। যাহার অতীতের গৌরব স্মরণে হৃদয় আর্দ্র হয় না, যে জাতীর কি ইতিহাস, কি সাহিত্য কোনটারই মর্য্যাদা অনুভব করিতে অসমর্থ তাহার জাতি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র। সাহিত্য ও ইতিহাস জাতীয় চরিত্র গঠনের মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জাতিমাত্রই গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ। নতুবা, বালুস্তূপের উপরে জাতীয় সৌধ নির্ম্মাণ করিলে অচিরে উহার ধ্বংস অনিবার্য্য।—

A people that can feel no pride in the past, in the history and literature loses the mainstay of its national character—*Max Muller.*

সুখের বিষয় বাঙ্গালী এখন প্রাচীন গৌরবগাথার অনুসন্ধানে উদাসীন নহে। অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীর সম্মুখে আজ বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনী সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। এখন আমরা জানিতে পারি বাঙ্গালীর শৌর্য্য কল্পনার কাহিনী নহে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে যুগে মিসর ও পারশ্য জল বিহার করিতে ভীত হইত, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ সাগরপথ জয় করিয়াছিল। মিসরের প্রাচীন কবি লিখিয়াছিল যে হিন্দুগণ স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা জলযুদ্ধেই অধিক প্রতাপশালী হইয়াছিল (Asiatic Research. Vol. XVII. P. 619—620.) কেরি সাহেব কৃত হেড়ো ভোটানের অনুবাদে দেখিতে পাই হিন্দুসেনা পারস্যের সম্রাট Xernes এর সহিত গ্রীসে গমন করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৫ সালে হিন্দুগণ যখন যবদ্বীপে ভারতবর্ষের—জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়াছিল, সেই সঙ্গে বাঙ্গালীও ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টের পূর্ব্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কলিঙ্গগণ যবদ্বীপে অর্ণবপোতে উপস্থিত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যে কলিঙ্গাধিপতি রাজরাজ দশম শতাব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন —বাঙ্গালী-ই সেই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।*

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত দুই শতাব্দী সমতট, তাম্রলিপ্ত ও হরিকেলব—বাঙ্গালার এই প্রধান তিনটী বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এই সকল বন্দরে বাঙ্গালীর পোত অবস্থান করিত এবং বাঙ্গালী বণিক্ পণ্যসম্ভার লইয়া নানাদেশে যাতায়াত করিত। রাজ্য বিজয় ও সমর জয়ের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালীর অকুতোভয়তা, সাহস ও বাহুবলের পরিচয় দেয় মুসলমানের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নাবিকগণ পুরাতন বাণিজ্যপথে অগ্রসর হইয়া সিংহল, যবদ্বীপ, ও সুমাত্রায় উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক চীনসাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তৎসূত্রে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের সমুদ্রোপকূলে বর্ণসঙ্কর জাতির অভ্যুদয় সাধিত হয়

পরাক্রান্ত বীরের সহিত অনায়াসে যুদ্ধে লিপ্ত হইতেও সেকালে বাঙ্গালী পরাঙ্মুখ হইত না। একদিন ইক্ষ্বাকুবংশাবতংশ রঘুর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালীর

* It was the Bengalis who founded the Kalinga Empire whence they spread their conquests beyond the seas and colonised Java and other islands (Indian Aicipelago).— Dawn, 1909.

Down to the days of the Mahomedan conquest, went by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal Coast, founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra, baring Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burma and Siam, and binding Cathay and India fast in mutual intercource. Ideals of the East, P. 64.

নৌ বিভাগ পরাজিত করিয়া রঘু জয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেকালে বাঙ্গালীর নৌ-শক্তি হীন ছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বরং মহাকবি কালিদাস কর্ত্তৃক বঙ্গের সৈনিকের বিশেষ উল্লেখ * দেখিয়া মনে হয় যে সেকালে বাঙ্গালীর নৌ বাহিণীর গর্ব্ব করিবার মত শক্তি ছিল।

সিংহপুরের উদ্ধত যুবরাজ বিজয়সিংহ পিতৃ নির্ব্বাসিত হইয়া পঞ্চদশ শত বীর অনুচর সহ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালার পোতাশ্রয় হইতে সমুদ্র যাত্রা করেন এবং বাহুবলে কনকলঙ্কা অধিকার করিয়া তথায় বাঙ্গালীর জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। তাই কবি গাহিয়াছেন।

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত
বহিল ভারত-সাগরময়।

যে পোতে আরোহণ করিয়া বিজয় সিংহ লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন তাহা এত বৃহৎ ছিল যে, উহাতেই সপ্তশত আরোহীর স্থান হইয়াছিল।*

ভারতের নৌবলের কাহিনী বহু চিত্রে, বহু স্থাপত্যে, বহু সুবর্ণ মুদ্রায় ও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং দৈনিক সাহিত্যে আজিও সুব্যক্ত রহিয়াছে। জনক, সুপ্পরক, শঙ্খ, বালহস্ প্রভৃতি যাতকে অনেক বৃহৎ লোকের-সন্ধান পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের রেখাখণ্ডে দরিদ্র সহদেব ও সখা সোমবর্ম্মার আখ্যায়িকায় দূর সমুদ্র যাত্রার কাহিণীর ইঙ্গিত লাভ করা যায়।

---

* বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥

* The ship in which Prince Vijoy and his followers were sent away by king Sinbahu (Singhabahu) of Bengal was so large as to accomodate full seven hundred passengers, all Vijoy's followers.

The fleet of Vijoy carried no less than fifteen hundred passangers. (Mr. Mukherjee's Indian shipping.)

"বেগশালিনী নদীর প্রবাহ, উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের লীলাভঙ্গ বাঙ্গালীকে যৌবন দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছা, বাণিজ্য শ্রী-লাভের ইচ্ছা তাহাকে সমুদ্রপথ যাত্রী করিয়াছিল; পরবর্ত্তীকালে আত্মরক্ষা ও রাজ্য জয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহাকে জলযুদ্ধে তীব্রতা প্রদান করিয়াছিল।"

ঐতিহাসিক মারে বলেন, অতিপ্রাচীন কালে ভারতের বণিক্‌গণ পণ্যসম্ভার লইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে গমনাগমন করিত।

মেক্সিকোতে গণেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় হস্তী নাই। সুতরাং এমূর্ত্তি তদ্দেশবাসিগণের কল্পনা সম্ভব নহে। তাই অনেকে মনে করেন হিন্দুবণিক্‌গণই ঐ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দুবণিক্‌গণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও জর্ম্মনীতে গিয়া বাণিজ্য করিতেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৭৬ পৃঃ)।

একদিন বাঙ্গালীর অর্ণবপোতসমূহে সাগর হইতে সাগরান্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে লীলাবিভঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও বাঙ্গালার বণিক্‌কুল চীণদেশে গমনাগমন করিত। কথিত আছে যে একদা ঔপনিবেশিক হিন্দুবণিক্‌গণ চীনপতির সাহায্যার্থ ২৮০০ নৌসেনা এবং কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। চীন, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে তাহাদের ধর্ম্ম আজিও স্তুয়মান। কি কোরিয়ায়, কি কোচিন চায়নায়, কি ব্রহ্মদেশে, কি মার্ত্তাবান উপসাগরের কূলে আজিও বাঙ্গালীর স্মৃতি বিদ্যমান। বস্তুতঃ অন্য সমুদ্র যাত্রার প্রভাব বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান বিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে একটী বৃহত্তর ভারতের রচনা আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে দ্বিশৃঙ্গ পোতের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে ভারতের নৌ-শিল্পের ধ্যান রচিত হইয়াছিল সেই যুক্তেকল্পতরুর প্রভাব বলও ছিল

প্রাচীনকালে জলযান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল সামান্য ও বিশেষ। 'সামান্য' জলপথগুলি নদীপথে এবং 'বিশেষ' সমুদ্র পথে চলাচল করিত। কোন কোন যানের ৪টী পর্য্যন্ত গুণবৃক্ষ থাকিত। পোত নির্ম্মানোপযোগী কাষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল পোতে যে কেবল বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বহন করা হইত তাহা নহে, আবশ্যক হইলে উহারা কখনো আক্রমণে, কখনো বা আত্মরক্ষায়, এমন কি জলযুদ্ধে কখন কখন ব্যবহৃত হইত।

যুদ্ধ জাহাজগুলিকে 'নৌবাট', 'নৌবাটক' বা নৌ-বিতান বলা হইত। নৌ-সেনার অধ্যক্ষ 'নাবাধ্যক্ষ' বা 'তারক' নামে পরিচিত হইতেন। পোত নির্ম্মাণ স্থান সমূহ 'নাবতাক্ষেদী' নামে কথিত হইত।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ও গাথায় আজিও বঙ্গের নৌবলের কাহিনী পাওয়া যায়। কবি নারায়ণ দেব ও বংশীদাস, কেতকদাস ও ক্ষেমানন্দ নৌবাণিজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। খুল্লনার কাতরোক্তিতে দেখিতে পাই,—

বহুত মিনতি মালি অর্ণবে না লও ডিঙ্গি
পাটা যার শতেক যোজন।

অথবা বিজয়গুপ্তের 'মনসা মঙ্গলে'—

চুয়ার বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে গড়া
শুকুতি বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

কিম্বা মাণিকগাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলে'—

আনল নিশাণে নৌকা ছোটে ঐরাবত।
শিশারু মালুথ কাঠে দিশা করে পথ॥

মাল দহের 'গম্ভীরায়'

গৌড় কিনারা হ্যায় ভাগীরথী নদী।
জাহাজ সে ছানিয়া হ্যায় ধনপতি॥
ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বেহারাসে।
নাহি আদমি পারে পাণি ভরণে॥

অথবা কবি কঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে—

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে॥

আমরা যুগে যুগে বাঙ্গালার নৌ-সাধনের পরিচয় পাই। চম্পকনগরের বণিক্ চাঁদ সদাগরের নাম কে না জানে? তিনি সেকালে 'কুশাই কামিলা'র দ্বারা নৌ নির্ম্মাণ করাইতেন। গৌড় তখন নৌনির্ম্মাণের জন্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলেন, সেকালে নৌপরিচালনা ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য রাজকুমার দিগের নিত্যশিক্ষার বিষয় ছিল। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার বীর উপনিবেশিকগণ বঙ্গে ও নবদ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন (Hunter's Orissa, vol I. P. 216.) পঞ্চশতাব্দী পরেও ঐ নৌ-বিস্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বঙ্গের অন্যতম পোতাশ্রয় তাম্রলিপ্ত হইতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

বক্তিয়ার খিলিজীর দেহাবসানের পর গিয়াস্উদ্দীন যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন দিল্লীর সুলতান আল্তামাস্ লক্ষণাবতী আক্রমণ করিলে বঙ্গের নৌশক্তি তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহার প্রায় ৩৭ বৎসর পরে বঙ্গের সুলতান তোগ্রল খাঁর রণতরী এবং সেনা অযোধ্যার সীমান্তে কাড়া প্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।



সোনার বাঙলা

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

সময়—গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। নির্জ্জন পল্লীপথের তপ্তধূলিকণার উপর দিয়া ভুবন লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছিল। মাঠের পার্শ্বের পুকুরটার লালজল একপুরু সর বুকে লইয়া আসন্ন-ব্যাধির শুভাগমন সূচনা করিতেছে। মশককুল তাহা হইতে উত্থিত হইয়া পল্লীবাসীকে বেশ একটু সজাগ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। ভুবনের সে দিকে দৃষ্টি নাই। হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্বারে আসিয়া সে একেবারে নিশ্চেষ্টের ন্যায় ভাঙ্গা মাটির দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। ভগ্নী পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশের রান্নাঘর হইতে পত্নী উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসার জন্য প্রাণটা তাহার চঞ্চল হইয়া পড়িলেও ভুবনের ভাব দেখিয়া সে তাহা করিতে পারিতেছিল না।

দিদি—খোঁজ কিছু পেলি ভুবন, নন্দরা কোন খবর পাঠালে?

ভুবন—না দিদি, এত বড় জোরবরাত অন্যে যে করে করুক, তোমার ভাই করে নি! আঃ! মাঃ! (খানিক নীরবে কাটিয়া গেল) ভুবনের কিন্তু এ নীরবতা সহ্য হইল না; সে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—ব্যস্, এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে দিদি? মুর্খ,কুঁড়ে ভাইয়ের কোন যোগ্যতা নেই বলে দু'-দশটা গালই নয় দাও, একা যদি নাই পার, ভাই বলে মায়া হয়, মেয়ের গর্ভধারিনীকে ডাক, সে এসে সাহায্য করুক।

দিদি—ভাবিস্‌নি ভুবন, ভগবান্ আগে বর গোড়ে তবে ওকে সৃষ্টি করেছেন! একদিন না একদিন জুটবেই! তবে দু'দিন আগে আর পিছে!

ভুবন—ভুল দিদি, ভুল! জীবনে ভগবান্ অন্ততঃ এই একটা ভুল ক'রেছেন। তুমি দেখে নিও, বেদ যদি মিথ্যে হয়, হবে; ওর বর কিন্তু জুটবে না।

দিদি—বালাই, ষাট্! ঠিক্ দুপুরবেলা বাপ হয়ে ওকি কথা! এই ত কত আস্‌ছে, আমাদের অবস্থায় কুলুচ্ছে না, এই যা! যার হাঁড়িতে মিনু আমাদের চাল দিয়েছে,একদিন না একদিন তার টান পড়্‌বেই, ঘুরে ফিরে এসে জুট্‌তেই হবে।

ভুবন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল তোমার ভাসুর পো বলেই সেখানে গিয়েছিলুম দিদি। তারা দেখালে কি জান,—সে এক লম্বা চওড়া ফর্দ্দ; হাজার দুই হবে। বল্‌লে কাকীমার ভাই, তাই এত সস্তায় স্বীকার কর্‌ছি, এর কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়?

দিদি—আমারই ভুল ভুবন, তাই মর্‌তে তোকে সেখানে পাঠিয়ে ছিলুম! যাক্, ভালই হয়েছে যে চামারের বাড়ী আমিই টিক্‌তে পারিনি, অতটুকু মেয়ে মনু টিক্‌ত কি ক'রে।

ভুবন—টেকাঁ টেকিঁ পরের কথা দিদি, প্রবেশ-পথই বন্ধ। আজকাল মেয়ের ছাড়-পত্রের দাম শুনেছ ত, খুব সস্তায় যদি হয়, একটা মোদো-মাতালের হাতে যদি তুলে দেওয়া যায়, তবুও হাজার টাকা! তার কম খুঁজ্‌লে তোমার ভাসুরপোর ভাষায় বলি, মানুষ জুটবে না, শ্যাল, কুকুর, গাধা, ঘোড়া যা হয় একটাকে ধরে এনে বিয়ে দিতে হবে।

দিদি—এ্যা! নন্দ, একথা বল্‌লে! তুই তাই শুনে কোন জবাব না দিয়ে এমনই চলে এলি?

ভুবন—না এসে কি করব দিদি, বাঙলা-দেশে মেয়ের বাপ হ'য়ে জন্মেছি যে! আমার হাত-পা মুখ

সব বাঁধা, সব বাঁধা! (মিনু এই সময় পুকুর হইতে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, দিদি কি কথা তুলিতে দিলেন, ভুবন নিষেধ করিয়া পরম আগ্রহে মেয়েকে ডাকিয়া বলিল), বাঃ! লক্ষ্মী-মা আমার সব কাজ সেরে এসেছে। যা ত, একটু তেল নিয়ে আয় ত মা! (মিনু তাড়াতাড়ি তৈল আনিতে গেল ততক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু কিন্তু আর গোপন রহিল না, ভুবনের চোখ ঠেলিয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

বঁটি পাতিয়া দিদি বিন্দুবাসিনী আনাজ কুটিতে ছিলেন। দোয়াল গাই দুইয়া রাখিয়া গেল। একটা বিড়াল চক্ষু বুজিয়া দু'এক বার শূন্যে নাকটা তুলিয়া সে দুগ্ধ অনায়াস-লভ্য কি না বিচার করিয়া লইল, কিন্তু, কর্ত্রীর হস্ত তাড়নার কথা স্মরণ হওয়ায় বিষণ্ন মনে এক পার্শ্বে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। মাথার উপর একটা টিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—'ও বৌ খেলে, খেলে।' বাড়ীর বৌ'টী তখন ম্যালেরিয়া সুন্দরীর কবলে পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে-ছিল। পাখীর ডাকে সাড়া দিতে পারিল না। পিসীমা নিজেই 'দূর, দূর' করিয়া উঠিলেন এমন সময় ভুবন বাড়ী ঢুকিয়া বলিল,—আজ বনগাঁ থেকে দেখতে আস্ছে দিদি, কিছু ফল-টলের যোগাড় আছে ত?

দিদি—খুব, খুব, বাড়ীতে আম-কাঁঠাল আনরসের ছড়াছড়ি; খায় কে, তার ঠিকানা নেই। কথায় বলে ওই যে, বাড়ীর গাছা, আর পেটের বাছা থাক্তে বিপদ কিসের?

ভুবন—পেটের বাছায় যে পথে টেনে নিয়ে চলেছে তাতেই অস্থির। ভাগ্যে বাড়ীর গাছের জন্যে বরের বাপের খোসামোদ কর্তে হয় না, তাই রক্ষে!

দিদি—কি যে বলিস্! দেখে নিস্, দেখে নিস্ মিনু আমার রাজরানী হবে। হ্যাঁরে, ছেলেটী কেমন কিছু পাশ-টাশ?

ভুবন—তা আছে দিদি, ভাবনা নেই। মদ-গাঁজা-চণ্ডু-চরসে পয়লা-নম্বর সার্টিফিকেট আছে।

দিদি—সে কি রে! জেনে-শুনে বাপ হয়ে এমন ছেলেতে মেয়ে দিবি?

ভুবন—কি কর্ব দিদি, আমি যে অর্থহীন! তোমাদের দয়াল সমাজ কি বলেছেন জান—হর ঠাকুরের সপ্তম সংসারটী খালি হয়েছে, ঘর-বর দুই ভাল, মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাক্বে।

দিদি—বলিস্ কি, হরজ্যেঠা আবার বিয়ে কর্বে! এমন ঘাটের মড়ার হাতে মেয়ে তুলে দিতে বল্লে! সমাজের কারুর কি ছেলে-মেয়ে নেই?

ভুবন। আছে দিদি, সেই সঙ্গে আরও একটা আছে যেটা তোমার আমার ঘরে অভাব। ওদের সঙ্গে আমার তুলনা কর না, আমি লক্ষ্মীছাড়া!

এই সময় কতকগুলি যুবক গান করিতে-করিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"...........মানুষ আমরা নহি ত মেষ!"

দিদি—কি রে, কি হয়েছে রে, সবাই যে একেবারে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিস্ দেখ্ছি?

যুবক—দেশের এ দুর্দ্দিনে না বেরিয়ে আর করি কি! জাপানের মত অতবড় একটা দেশ ভূমিকম্পে ওর নাম কি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে! এখন না দেখ্লে—

দিদি—ও মা, কি সর্ব্বনাশ! এমন কাণ্ড ত কখন শুনিনি! হবে না, বেস্তর ব্রহ্ম শাঁপ লেগেছে নিশ্চয়।—কোথায় বল্লি?

যুবক হাসিয়া কহিল—সে দেশ তোমার ও বামুন-ফামুন মানে না, সে স্বাধীন জাত পিসী, টিকিগুলো একদিনেই শেষ করে মাথাটা হাল্কা করে দেবে, যত.........

দিদি—ষাট্, ষাট্! মার একটী ছেলে তুই, আর ও কথা মুখে আনিস্ নি! সে ম্লেচ্ছদের জন্যে, তোদের এত মাথা ব্যথা কেন বল ত? আমাদের

মিনুর জন্যে একটী ভাল বরটর দেখ্না বাবা, ভুবন আমার ভাবনায়-ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে !

অন্য একটী যুবক—এই সেরেছে ! কেবল বিয়ে আর বিয়ে ! এই সব কারণেই ত এদেশ এত পিছিয়ে আছে। চল হে, চল, আমাদের যে 'রেজ্জিলিউসন' ক্লাব থেকে পাস হয়েছে, তার এক চুল এদিক কর্‌লে চল্‌বে না।

(সকলে "মানুষ আমরা নহিত মেষ" গান করিতে—করিতে চলিয়া গেল)

ভুবন—দেখ্‌লে দিদি, স্বাধীনতার হাওয়া কেমন বইছে ! আর ভাবা নয়, ওই বনগাঁর ওদের ওখানেই মেয়ে দেবো। তবু ত দুদিন মাছ-ভাত খেতে পাবে !

তৃতীয় দৃশ্য

চ'খের উপর চসমা লাগাইয়া বর পক্ষীয় একজন মেয়ের রঙ পরীক্ষা করিতেছিলেন ; যদিও তাঁহার নিজের রঙ পোড়া হঁড়ির তলা অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার ছিল না। আর কয়জন তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষকের কিছু ভুল-চুক থাকিয়া যায় কি না তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরণে কাহার ছিটের জামা, তাহাও তিন স্থানে তালি দেওয়া ; কাহার একখানি চাদর, কাপড় অপেক্ষা সেখানি বেশী রকম উজ্জ্বল, কিন্তু দু-একস্থানে ইন্দুরে কাটা। ইত্যাদি।

বর পক্ষীয় পরীক্ষক—যাক, এত গোলমালে কায কি ? এখনই সব সন্দেহ মিটে যাবে, এক বাল্‌তি জল, আর একখানা সাবান আনান ত

ভুবন—আজ্ঞে, শেষের ও জিনিষটার পয়সা জোটান আমার মত ঘরে অসম্ভব। যদি বলেন ত চারটী খোল আনিয়ে দি।

বঃ পঃ পঃ—থাক, বুঝেছি, এতেই কোনো রকমে চলে যাবে। তবে দেনা পাওনার কথাটা মেটাতে হয়।

ভুবন—আজ্ঞে বলেছি ত, শুধু হরতকীর বেশী আমি আর কিছুই দিতে পারব না।

বঃ পঃ পঃ—তার গায়ের এ গুলো ?

ভুবন আজ্ঞে এগুলো আমাদের নয়। আর আপনারা আস্‌ছেন বলে পাশের বাড়ীর ওঁরা দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বঃ পঃ পঃ—সেই রকম পাঁচ জনে দয়া করে ওগুলো নয় দানই কর্‌লেন।

ভুবন—এই হাজার দেড় হাজার টাকা দামের গয়নাই যদি যোটাতে পারব মশাই, তবে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে অমন সার্টিফিকেট্‌ওয়ালা ছেলের হাতে দিতে যাব কেন ?

বঃ পঃ পঃ—কি ! বাড়ীতে এনে অপমান ! চল হে, চল চল ! এখানে ভদ্র লোক আসে ! (সকলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন)।

দিদি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

ভুবন একবার সেই দিকে চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল।

তারপর ধীরে ধীরে কহিল—শেষে হরুঠাকুরের পায়েই পড়্‌তে হ'ল দিদি। নিজের মুখে যখন সে দুখানা গিনির লোভ দেখিয়েছে, তখন ছাড়ি কি করে ? তা ছাড়া, পেটে না ধরে মনু আমার একপাল বুড়ো বুড়ো ছেলে মেয়ের মা হয়ে দাঁড়াবে, সেইটাই কি কম লাভ ?

দিদি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—তোর এত দিনের শিব পুজোর ফল কি এই হলোরে মনু !

ভুবন—আমার মেয়ের অকল্যাণ করো না দিদি, শিব আরাধনার ফল এর চেয়ে আর ভাল কি হবে, তাই বল ? নিজের যেমন বয়সের গাছ-পাথর নেই, বরও ত তেমনই জোটাবেন ? দেখো, দেখো, দু'দিনেই মায়ের আমার হাতের মালা আর রুদ্রাক্ষ সার হবে। বেশ হবে ! বেশ হবে ! (বলিতে-বলিতে উত্তেজিত ভাবে সে বাহির হইয়া পড়িল)

চতুর্থ দৃশ্য

বহির্বাটীতে সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত। ভুবন চোরের মত চাহিতে চাহিতে ঢেঁকি শালের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাথার উপর দিয়া একটা কালপেঁচা সশব্দে ডাকিয়া উড়িয়া গেল। মেয়ে ভয় পাইয়া বাপের বুকের ভিতর মুখ লুকাইল।

ভুবন—এটুকু খেয়ে নে ত মা! কাযের ভিড়ে সবাই ব্যস্ত আছে, কেউ দেখ্‌তে পাবে না! এই বেলা খেয়ে নে, খেয়ে নে!

মিনু—এ কি বাবা?

ভুবন—জিজ্ঞাসা করিস্ নি, মুখ বুজে খেয়ে নে! বাবা হয়ে তোর অমঙ্গল দেখ্‌তে পার্‌ব না রে, নে-খা!

মিনু—গলা যে জ্বলে উঠ্‌ল বাবা, না আমি খাব না!

ভুবন—জ্বলুক, জ্বলুক, কিন্তু চিরদিনের জ্বালার থেকে এটা তোকে শান্তি দেবে! নে, দেরী করিস্ নি; এ টুকু চোঁ করে টেনে নে! আমি চোক বুজে আছি, খা খা! সোন খায়, যাদু খায়, মা খায়!

এমন সময় কে একজন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভুবন একবার সেই দিকে চাহিয়া 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, আমি মেয়েকে শশুর-বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করাছি মিত্তির!

মিত্রজা—ওকি, তুমি কি ক্ষেপেছ! বাপ হয়ে বিষ মেয়ের মুখে তুলে দেয়! জান, তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি!

ঠিক্ সেই সময় বিষের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া মিনু ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ভুবন সেই দিকে চাহিয়া ধীরে-ধীরে কহিল—চুপ, চুপ, কথা বল না, মা আমার শ্বশুরবাড়ী চলেছে! এ যার সঙ্গে বিয়ে দিলুম তাতে চিরআরতি আর ঘুচবে না, দেখে নিও বরং! (পুনরায় উন্মাদের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল)

মিত্রজা সে দিকে আর না চাহিয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়া ডাকিলেন—ডাক্তার। ডাক্তার! শীগ্‌গির একজন ডাক্তার!

নিকটস্থ থিয়েটারের আখড়া হইতে তখনও গানের সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা!.........

সন্ধ্যা

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যা এলো মন্দ ধীরা চিত্ত-জুড়ানী
ঘরে ফিরলো রাখাল ধেনুর সনে,—ফিরলো কুড়ানী!
খেলাভাঙার বাজ্‌লো বাঁশী
ছেলের দলে কী উল্লাসী,
ধরলো ঘরের পথ :—
ধীর স্নিগ্ধ হাওয়া বইলো,—ফুলের পরাগ-উড়ানী!

গুঞ্জিত কোন্ কুঞ্জভবন পুষ্প-শোভনা!
কোন্ দূরের আলো আব্‌ছায়া-লীন, দৃষ্টি-লোভনা!
দূর-আকাশের তীরে তীরে
জ্বাল্‌ছে তারার দীপালি রে
দিগ্বধূরা সব :—
কোন্ পথ-হারাণো আপনজনের বেদন-ক্ষোভণা!

পড়েছে ওই পথের'পরে কেমন লতা'য়ে
কোন্ অজান্-ফুলের অবুঝ-ঘ্রাণে সবুজ-লতা এ!
ব্যস্ত-চপল চরণ তলে
কোন্ সে নিদয় পাথক চলে
অঙ্গ দ'লে তা'র :—
ও সে জান্‌লো না তা'র বুকটি কেমন উঠ্‌লো ব্যথা'য়ে।

অস্ত-অরুণ-অঙ্গে মাথা রক্ত-লালিমা!
ছায় বসুন্ধরার অন্ধকারের কোন্ সে কালিমা!
শ্রান্ত শিথিল পক্ষে ধীরে
সাঁঝের পাখী যাচ্ছে নীড়ে
কী-সুর ছড়া'য়ে :—
তোরা পথহারাদের পথ দেখা- সাঁঝ প্রদীপ জ্বালি' মা!

দীপ্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী শরৎকুমারী সেন

সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়া জননী স্নেহভরে পুত্রের মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন—"মাথাটা ভাল করে বালিশে তুলে নে নারে ? কি শোবার শ্রী দেখ। এখনো তুই কচি খোকা নাকি ?"

অরুণ মাথাটা বালিসে উঠাইয়া বলিল "আমার ত তাই মনে হয় মা।" "যা, যা – ছেলেমী রেখেদে, এখন কয়টা কাজের কথা বলি – লক্ষ্মী ছেলেটীর মতো জবাব দাও ত ? এখন তোমার বিয়ে করাটা দরকার। কোথায় 'বে' করবে—এ সম্বন্ধে তোমার মতামতই প্রধান। তোমাকে অসুখী দেখ্‌লে আমি সুখী হ'তে পারবো না।

অরুণ চোখ্‌ মুদিয়া একবারে চুপ।

মা, পুত্রের মাথাটা নাড়া দিয়া বলিলেন—"ঘুমুলি না কি রে?" "না,—বিয়ে বিয়ে করে কি জ্বালাতনেই ফেলেছো মা! আমি যদি বলি আমি ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে কর্‌ব তোমার কি আপত্তি"—

"ওকি কথা বলিস্‌রে ? ব্রাহ্ম কেন ? কেন হিন্দু ঘরেও কি এখন মেয়ে কোন অংশে অযোগ্যা আছে বলিস্ ? মলিনার মত কয়টা মেয়ে ব্রাহ্ম পরিবারেও খুঁজে মেলে কিনা সন্দেহ। কত সম্ভ্রান্ত সমাজের উপযুক্ত ছেলে এখন তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। কেবল ওর বাবা, মা, এখনো আমার আশা পথ চেয়ে বসে আছেন।"

অরুণ এক চোট্ হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,"মলিনা ? ওকে বিয়ে করবার কথা একদিনও ত আমার মনে আসেনি মা। সেই যে একটা কাঁদুনে মেয়ে, আমার সাথে ঝগড়া করে মর্‌তো, ওকে আমি কখ্‌খনো বিয়ে করব না, আমার পিঠে যে আঁচড় মেরেছিল, এখনো তার দাগ স্পষ্টই আছে।"

ছেলের কথা শুনিয়া জননী ভিতরের হাসি চাপা দিয়া, যথাসম্ভব সংযত হইয়া বলিলেন "সে ছোট্ট মেয়েটা এখনত আর অবুঝ নেই, এখন সে প্রশংসার সহিত আই, এ পাশ করেছে। কোন্‌ গুণে সে শ্রেষ্ঠা নয় ?"

অরুণ পাশ ফিরিয়া বলিল—"সে দেখা যাবে। তবে এই জেনো মা, তোমার ছেলে কখনো তোমাকে আঘাত দেবে না।"

মা পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"অরুণ, বাবা আমার! তোর যা ভাল মনে হয় তাই করবি।"

ভৃত্য আসিয়া জানাইল ডাক্তার বাবুর মেয়েরা সব আসিয়াছেন। মলিনার হাত ধরিয়া তার মা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মলিনার সাজ-সজ্জা আজ পৃথক রকমের। পরিধানে গেরুয়া রংএর শাড়ী। ব্লাউসে ঐ রং, জড়ির পাঁড়। পায়ে সাদা জুতা।

ধোয়ানো চুল গুলি সারা পৃষ্ঠে এলায়িত। অরুণ আজ মলিনাকে যেন নূতন করিয়া বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইল।

মনে ভাবিল—মলিনা সুন্দরী বটে। কোন উচ্চ শিক্ষিত যুবকই তাকে অপছন্দ কর্ত্তে পারে না ঠিক্। তবে আমি......আমিতো মলিনাকে তেমন ভাবে কখনো চেয়ে দেখিনি। মলিনাকে বউ করলে মা যদি অতই সুখী হন, আমরই বা এতে আপত্তির কি কথা থাকতে পারে ? যাক্ একটু বাইরে আসি ঘুরে।

ফিরিয়া আসিয়া সে ঐ উচাটন মনে হল ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মা তখনো মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে নিয়ে গল্পে ব্যস্ত। নিজের রিডিং রুমের দিকে দৃষ্টি-পাত করে' মলিনা কার একখানি ফটো গ্যাসের আলোতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে।

চেয়ারে উপবিষ্টা ঐ নারীকে সহসা রাজরানীর মতই ঐ গৃহ খানির অধিশ্বরী বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

অরুণকে ঐ দিকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়া মলিনা হাতের মধ্যে ফটোখানি তাড়াতাড়ি সামনের টেবিলক্লথ্‌টার নীচে লুকাইয়া রাখিল।

অরুণ হো, হো করিয়া হাসিয়া বলিল—কি চালাকি কত্তেই শিখেছ মণি? তুমি তো সেই দুষ্টু মলিনাই র'য়ে গেছ দেখচি। বলিয়া ফটোখানি টানিয়া বাহির করিল।

"এই যে, এতো আমারি বিলেত যাবার সময়-কার ফটো? কেন তুমি আর দেখনি নাকি? আমাকে দেখে লুকানো হচ্ছে কেন? এর মানে?"

মলিনা বিষম অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আপনিই বা এ জন্যে আমাকে অনর্থক জব্দ কচ্ছেন কেন? এতে এমন কি দোষ হয়েছে?"

মাথা চুলকাইয়া অরুণ বলিল—"ওরে বাবা, আমি আবার আপ্‌নি সম্বোধনে সম্মানিত হলেম কবে হ'তে মলিনা?"

মলিনা মুখ নীচু করিয়া বলিল—"তা করতে হয় বৈকি, বিলেত ঘুড়ে এলেন বড় বড় ফ্যামিলীতে মেলা মেশা কচ্ছেন, সম্মান না রাখলে চল্‌বে কেন?"

এটী কোন্ ফ্যামিলীর ইঙ্গিত,—অরুণ বুঝিল। পরে বলিল "এত পর মনে কচ্ছো যে মলিনা? মাইরি, আমি কিন্তু তোমার সে অরুণদা'ই আছি। আমার উপর রাগ করেছ কি?"

মলিনা বিশেষ কোন কথাই বলিল না। একটু চুপ থাকিয়া—পরে বলিল "না আমি কিচ্ছুই আপনাকে ভাবিনি। আচ্ছা তবে আসি—বলিয়া অরুণকে কোন একটা কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই চঞ্চল পদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অরুণ চেয়ারে বসিয়া দু'টী নারীর বিষয় মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

একটী মলিনা!—অপরটী মিলি!...

শৈশব হইতে এই মলিনা তার সঙ্গিনী। মলিনা কি সত্যি তাকে ভালবাসে?

মিলি কে?......

স্নেহময়ী জননীর আগ্রহ স্মরণ করিয়া ভাবিল, যতটা সম্ভব সে রায় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হইতে দূরে থাকিবে।—

অরুণ এখন বাকুড়াতে জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্। আজ এক বছর সে এখানে। মার সনির্বন্ধ অনুরোধ পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে—দুমাসের ছুটী নিয়ে বাড়ী চলে এসো, আমার শরীর, মন উভয়ই অসুস্থ। কয়েক দিনের ছুটী নিয়া অরুণ বাড়ী চলিয়া গেল।

* • * *

মাকে অসময়ে শয্যায় শয়ান দেখিয়া অরুণ মা'র শিয়রে গিয়া হাত পাখাখানা তুলিয়া বলিল—"মা, তোমার কি—অসুখ করেছে?"

মা একটু ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলেন—"আজ বিকেলে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জিকে ডেকে আনিস্ ত? তিনি সব বুঝ্‌তে পারবেন।" অরুণ মনে ভাবিল—মলিনার বাবাকে কি প্রয়োজন? তেমন রোগ ত মা'র দেখতে পাইনে।

চারটে বাজিতে অরুণ ডাঃ চ্যাটার্জ্জির বাড়ী উপস্থিত। দালানের সিঁড়িতে পা দিতেই সুমিষ্ট গানের সুর শুনিতে পাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—কে গায়?......

"যদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াস:—
চোখে দেখা দিতে শুধু এসো না"—

গানের বর্ণে বর্ণে গায়িকার সকরুণ হৃদয় বেদনার সুর ভাসিয়া আসিয়া অরুণের হৃদয়-তারে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া উঠিল।

অগ্রসর হইয়া অরুণ মলিনার কক্ষে ঢুকিয়া মৃদু হাস্যে বলিল—"মলিনা! থেমে গেলে কেন? সবটাই গাওনা শুনি?

মলিনা একটু লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—"আপনি কখন এলেন? জানতেও পারিনি। বসুন।"

"তোমার বাবা কোথায় মলিনা? তাঁকেই নিতে এসেছি।" "বাবা, মা, মামাবাবুর বাসায় গ্যাছেন।"

"সেখানে কোন দরকার আছে নাকি?" "হাঁ, সপ্তাহের মধ্যেই আমরা দার্জ্জিলিং যাচ্ছি।"

"দার্জ্জিলিং কেন?" "চেঞ্জে যাচ্ছি মনটন ভাল না।"

"তোমার পড়াশোনা ছেড়ে দিলে নাকি?" "এক রকম ছাড়ার মধ্যে।"

অরুণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"এই কি তোমার ঠিক্ মত নাকি?"

"তা একটা গ্যারান্টি দিয়ে ফেলতে পারিনে সত্য, তবে ইচ্ছা। আপনি কি বলেন?"

উদাস কণ্ঠে অরুণ উত্তর করিল—আমি—?"

"আমি কেন বলতে যাব মলিনা! আমার বলাও ত অনধিকার চর্চ্চা।"

মলিনা কপালের ঘাম রুমালে মুছিয়া, চেয়ারটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অরুণ নিঃশব্দ।

খানিক পরে মলিনা নিজেই প্রশ্ন করিল—"আপ্‌নি ক'দিন বাড়ী থাক্‌বেন?" "খুব শীগ্‌গীর যাব। আর হয় তো শীগ্‌গীর তোমাদের সাথে দেখাই হবে না—আচ্ছা আসি—" বলিয়া অরুণ একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এ নিঃশ্বাসের জোরটুকু মলিনা লক্ষ্য করিল। পরে অগ্রসর হইয়া অরুণের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল—"দোষ ত্রুটি আপনার পায়ে অনেক দিন—অনেক করেছি, আজ মাপ চাচ্ছি।"

বিদায় কালে.........

আর একটা কথাও মলিনা বলিতে পারিল না। একটা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে গিয়া—ঝর্ ঝর্ করিয়া তার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এ লজ্জা ঢাকা দিতে, মুখ ফিরাইয়া, দ্রুত পদে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অরুণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

(৮)

"নমস্কার মিষ্টার রায়! আপনাদের সাথে, বছর পরে দেখা।" "এ্যাঁ, অরুণ নাকি? অনেকদিন তোমার খবর পাইনি।"

"মিস্ রায়কে দেখতে পাচ্ছিনে যে?"

মিঃ রায় বলিল "মিলি তার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছে। শুনে সুখী হবে যে, আস্‌ছে মাসের দশ তারিখে মিলির বিবাহ। শীগ্‌গীরই আমরা বোম্বে চলে যাচ্ছি। অমর ছেলেটী চমৎকার! বেশ সুশ্রী, সবল চেহারা। অল্প দিন হয় ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে।" একটু কাশিয়া পরে আবার বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! ভবিতব্য বলতে যে একটা কথা আছে,—ঠিক্। পুরীতে যখন অমরদের সহিত পরিচয় হয় তখন অমরের বয়স অল্প। মিলিও ছোট। দু'জনাতে বেশ ভাব ছিল। কিন্তু কে জানতো এ দুটীতে 'বে হবে। বিয়ের কথা তখন মনেও আসেনি। সেদিন অমরের বাবা যখন হঠাৎ এসে বল্লেন—আমার অমর একমাত্র মিলির পাণি প্রার্থী। সহসা, কি যে বলব বাবা, ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কারণ দু'মাস আগে মেয়ে আমায় জানিয়েছে সে কখ্‌খনো বিয়ে করবে না। শুনে মাথা আমার গরম হয়ে গিয়েছিল—"

অরুণ আগ্রহ ভরে মিঃ রায়ের সব কথা শুনিতেছিল, বলিল "তার পর?"

"তারপর বাবা, মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম

—দেখ, মা, লেখাপড়া তোমরা যতই শিখে থাক, প্রকৃতির রাজ্যে, তার নিয়ম লঙ্ঘন করা ঠিক নয়। আর আমরা কি চিরদিনই বেঁচে থাকব? তোমাকে একটা নির্ভরে, সহজ, সংসারী দেখে যেতে পারলেই শান্তি, এবং আমাদের অবসর। কি বল অরুণ ঠিক্, কিনা?

অরুণ অন্য মনস্কভাবে জবাব দিল—"হাঁ তাতে নিশ্চয়ই।"

"দেখ অরুণ, পরে ওর বন্ধু মিসেস্ মিত্রকে এনে সব কথা বল্লুম। মিলির ঘর হ'তে বেরিয়ে যাবার সময় তিনি, বিয়ের ঐ তারিখই ঠিক রাখতে বল্লেন। বাবা, বিয়ের দিন তোমার কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে।"

বিনীত স্বরে অরুণ উত্তর করিল—"আমি সেদিন উপস্থিত থাকতে পারলে খুবই সুখী হতুম বটে, কিন্তু সে ঘটে উঠবে না। সপ্তাহের মধ্যে আমাকে কাজে জয়েন্ কর্ত্তে হবে।"

"ওঃ—তাইত বড় দুঃখের বিষয়।" "এখন উঠি, নমস্কার।"

"কাল সকালে এসো বাবা, মিলির সাথে তো দেখা হল না তোমার।" "আচ্ছা"—বলিয়া অরুণ চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে অসময়ে অরুণকে এদ্দিনের পর নিজেদের বাসায় দেখিয়া মিলি যথার্থই বড় আনন্দিতা হইল। কাছে আসিয়া বলিল—"কি মিষ্টার ব্যাণার্জ্জি! এতকাল পরে মনে করে এসেছেন? পরম সৌভাগ্য!" অরুণ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল—"মাপ করুন মিস রায়! সে অনেক কথা—বলবার সময় নেই। আমাকে এখ্খুনি বেরুতে হবে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই আসা—" একটা সুন্দর কাস্‌কেট্ বাহির করিয়া অরুণ মিলির হাতে দিতে গেলে—মিলি বলিল—"এ কি দিচ্ছেন আমাকে?" "আপনাকে দেবার উপযুক্ত কি সম্বল আছে আমার! আপনার জীবন-প্রভাতের উৎসব উপলক্ষে, গরীবের সামান্য তি-উপহার গ্রহণ করুণ।"

হাত পাতিয়া মিলি অরুণের দান গ্রহণ করিল। খুলিয়া দেখিল মুক্তা বসানো একটী নেক্‌লেস্। মৃদু হাসিয়া মিলি বলিল,—"কি ভাবছেন মিষ্টার বাণার্জ্জি! আমি যে আপনাদের বাড়ী গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, সে খবর পেয়েছেন ত? বড় ভাল আপনার মা। শীগ্‌গীর আপনার বিয়ে করাতে তিনি ইচ্ছুক। আপনি স্পষ্ট জবাব দিলেই ত, বিয়ে হয়ে যায়। মলিনাকেও দেখে ভারী সুখী হলুম, এম্নি স্বভাব একদণ্ডে আমাকে আপনার করে ফেল্লে। আপনার পত্নী হবার সম্পূর্ণ যোগ্য বটে অরুণ চুপ করিয়া দেয়ালে টানানো তৈলচিত্র গুলি দেখিতে লাগিল।

"একটু দাঁড়ান, এই আমি আস্‌ছি।" একটু পরে এক জোড়া মূল্যবান ব্রেস্‌লেট্ সমেত একটা রূপার বাক্স হাতে নিয়া মিলি অরুণের হাতে দিয়া বলিল—"আমার এই 'প্রেজেণ্ট' মলিনাকে দেবেন। প্রার্থনা করি আপনাদের দুটীতে শুভমিলন সুসম্পন্ন হোক।"

অরুণ এই উচ্চ শিক্ষিতা উদার হৃদয়া নারীর মুখ পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল শিক্ষায় মানুষকে কি পরিমাণে সুসংযত করিতে পারে।

অরুণ মৃদু কণ্ঠে বলিল—"এ প্রেজেণ্ট আপনি নিজ হাতে দিলেই ভাল হয় না কি? আর আমার ইহা নেবার অধিকারই বা কি?"………

মিলি স্থির দৃষ্টিতে অরুণের মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিচলিত চিত্ত লইয়া অরুণ আর যেন বসিয়া থাকিতে পারে না। অন্তর মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল। একবার নির্জ্জনে সুস্থ মনে, একটা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারলে সে যেন বাঁচে। তাড়াতাড়ি কাজের দোহাই দিয়া অরুণ বিদায় চাহিলে—মিলি কাতর কণ্ঠে বলিল—"আর কি আসবেন না?" এই বেদনা জড়িত স্বর অরুণের

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বাবা ও মার সঙ্গে আজ প্রায় বছরখানি ধরে দেখা-শুনা হয়নি। তাঁরা বর্ত্তমানে কোথায় আছেন, তাও জানিনে।"

উৎফুল্ল বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন—এখন বাবা ও মাকে দেখা দেবার দরকার নাই—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁরা সমস্ত সংবাদই রাখেন।" চারু স্থির দৃষ্টিতে বিমলের মুখের প্রতি চাহিলেন, সে দৃষ্টি বিমলের বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থলে গিয়া পৌছিল।

চারু একটু শ্লেষের স্বরে বলিল—মিছামিছি এসব বাজে বকুনি বকে বিমলকে অবুঝের মত অপমান করতে কুণ্ঠিতও হ'লে না। মানুষকে কি এমনি ধারা অপমান মুখের সামনে করতে হয়।"

উৎফুল্ল বিরক্তির সঙ্গে সুরটাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চড়াইয়া বলিল—"বিমলকে আমি অন্যায় কিছুই বলিনি—চারু।" এই বলিয়া উৎফুল্ল ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরিয়া যাইতে ছিলেন—মাঝখানে বিমলের কথায় বাধা পাইয়া কহিল "আপনি যেসব সন্দেহ করছেন—সব ভুল ও মিথ্যে কথা—তবে এখন আসি দাদাবাবু। উৎফুল্ল বিকট ভাবে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—রাত্রি এখন প্রায় এগারটা, ক্ষুদ্র গলি রাস্তা প্রায় জনশূন্য—তুমি এখন পাগলের মত কোথায় যাবে বিমল—বাবা ও মার কাছে আমি যা শুনেছি—তা যদি সত্যি না হয় ভালো কথা, ভগবান করুন সবই যেন মিথ্যে হয়। বিমল অন্য দিকে চোখ ন্যস্ত করিয়া বিনম্র ভাবে উত্তর দিল—আপনি আমার দাদা, আমার অপবাদের কথা শুনেই আপনি আমাকে শাসন কর্ত্তে পারেন,—সত্যি কিন্তু অন্যায় অপবাদ আমার প্রাণে বড়ই বেজেছে। উৎফুল্ল কহিল, এখন দেখছি ন্যায়-অন্যায় তোর কাছে আমার শিখ্‌তে হ'বে বিমল ?

চারু বিমলের হাত দু'খান ধরিয়া অপর কক্ষে নিয়া গেলেন। বিমল যন্ত্র চালিতের মত বৌদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

"আচ্ছা বৌদি, বাবা ও মা কোথায় বাসা করেছেন, আপনি কি সে বাসার নম্বরটা জানেন ?"

চারু বলিল "ভবানীপুরই বাসা করে থাক্‌বেন—আমি বাবাকে বাসার নম্বর জিজ্ঞেস্ করতে তিনি কোন সাড়া দিলেন না। বিমল বড়ই করুণ দৃষ্টিতে চারুশীলার মুখের দিকে চাহিল—বিমল প্রতিমার চিন্তা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু বিমলের পক্ষে তাহা যেন অসম্ভব হইয়া উঠিল।

চারুশীলা দুঃখিত ভাবে বলিল—"তাকি কর্‌ব বিমলাবাবু, সংসারে সব রকম দুঃখ সহ্য কর্ত্তে পারা যায় কিন্তু মা ও বাবার চোখের জল যে আর দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় না। এখানে তাঁরা যে কয় মাস ছিলেন —আমাদের যথাসাধ্য যত্ন নিতে ত্রুটী হয়নি—বাবা শত দুঃখ দৈন্যে পীড়িত হয়েছেন বলেও কিছুতেই আত্ম মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চান না।"

বাপ দরিদ্র হ'লেও মেয়ের সুখে সুখী হওয়া যে বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ! বাবা ও মা যে তোমার ও অমলার এক মাত্র—তা ত আমরা একদিন ও মনে স্থান দেইনি—বাবা মনের দুঃখে আমাদের কহিলেন—আমরা যে গরীব—গরীবের ধাঁতে অতটা সইবে কেন মা ? তোমরা বেঁচে থাকো, সংসারে যশ খ্যাতি নিয়ে সুখে ঘর কন্না করো।"

* * * *

বিমল ঘড়ীতে চাহিয়া দেখিল—বারটা বাজিতে বিশ মিনিট দেরী আছে—উৎফুল্ল দরজার পর্দ্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারুর কথায় যোগ দিল। চারুশীলা অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া অতি মৃদু ভাবে বলিতেছিলেন—"মা ও বাবার মত লোক বলিতে কয়জন জন্মায় ?"

বিমলের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মাথা বাড়াইয়া জানালার ভিতর দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—পশ্চিমের চাঁদ বেশ হেলিয়া পড়িয়াছে।

(২)

সুদীর্ঘ তিন মাস কাটিয়া গেল—প্রতিমা ও বিমলের সঙ্গে দেখাশুনা, চিঠি আদান-প্রদানও হয় নাই। প্রতিমা বিমলের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রতিমা কেমন জোর করিয়া হৃদয় হইতে বিমলের স্মৃতি একদিনে মুছিয়া ফেলিবে? বিমল যে এত বড় বিশ্বাস ঘাতক তাহা ত প্রতিমা আগে জানিত না—কেমন করিয়া সে তাঁহার প্রাণের কথা খুঁজিয়া পাইবে?

কি নিদারুন অপমান—

প্রতিমা যে মনে মনে বিমলকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে! তবে আজ কেন অকস্মাৎ তাহার কোমল অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

ডাঃ বোস্ সাহেব যে চিন্তাটাকে হৃদয় হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—সে চিন্তা এমনি ভাবে জমাট হইয়া তাহার মনকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কয়েক বছরের মধ্যেই ডাঃ বোসের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা উদাস ভাব আসিয়া জুটিল। তিনি প্রায়ই নির্জ্জন বসিয়া নিবিষ্ট মনে—রেখা ও প্রতিমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিতে ছিলেন। রেখার জীবনের দুঃখের স্মৃতির কথা মনে উঠিলে তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—সবেমাত্র সতেরোর ঘরে পা দিয়েছে—ফাষ্টইয়ারে পরে।

নীরব সন্ধ্যার সময় দরজার কড়া বেজে উঠ্‌ল প্রতিমা অনিচ্ছা সত্তে নীচে নামিয়া গিয়া দোর খুলে দেখিল্—জগদীশবাবু ও অমলা একখানা থার্ড্ ক্লাশের গাড়ীতে বসা—

প্রতিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমলার পানে চাহিয়া রহিল। অমলার চোখ দুইটী সজল হইয়া উঠিল সে মুখখানা কালো করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল—

জগদীশবাবু শোকতাপ দুঃখ দৈন্যকে বুকের মধ্যে চাপিয়া এক হাতে অমলাকে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন

তখন সন্ধ্যা তার কালো সাড়ীর আঁচলখানি বিছাইয়া দিয়া জগদীশের হৃদয়ে সেই শুভ্র বসনা মনোরমার সেই মুখখানার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ডাঃ বোস্ এতদিন পর জগদীশবাবুকে দেখিয়া—হঠাৎ আর চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—এযে জগদীশবাবু, আপনার দেখ্‌ছি সমস্ত মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে - বাসার সব ভালো ত?

জগদীশবাবু অকৃত্রিম শুষ্ক ম্লান মুখে হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল হাঁ, বোস্ সাহেব—চিরদিনের জন্য বাসার ভালো…এই বলিতে জগদীশের বুকে চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে আর একটা কথাও বলিতে পারিলো না। বোস সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

টেবিলের সামনে লেখা দাড়াইয়াছিল, সে উত্তর দিল দাদাবাবুর মাথায় যে বাজ ভেঙ্গে পড়েছে—দিদিমণি যে গঙ্গা পেয়েছেন…।

লেখার কথা শুনিয়া বোস্ সাহেবের চোখ দুটী যেন জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না।

জগদীশ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখের জল সামলাইয়া লইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া—মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

সামনে একখানা ইজিচেয়ারে তাহার দেহখানা এলাইয়া অনেক কিছু ভাবিতেছিলেন।

প্রতিমা অমলার নিকট বাবার ও মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিতেছিল—প্রতিমা নিঃশব্দে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর অমলার বড় বড় দু' ফোঁটা চোখের জল এসে পড়্‌ল—প্রতিমা

তার কাপড়ের আচল দিয়া অমলার চোখের জল মুছাইয়া ফেলিয়া বলিল—"ভাই দুঃখ করে আর মনটাকে কষ্ট দিও না। যা হবার তা ত হয়ে গেছে—এখন কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থাকো। বিমলদাদাও আমাদের বাসা ছেড়ে আজ তিনমাস যাবৎ অন্যত্র গিয়েছেন—বাবা ও মা, অনেক খোঁজ খবর করলেন; কোথায়ও সন্ধান মিলল না।" জয়ন্তী দরজার পর্দা সরাইয়া বারাণ্ডায় আসিলেন—অমলাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। প্রতিমা জলখাবার আনিতে অন্য কক্ষে চলিয়া গেল—জয়ন্তী একে একে বাসার সকল সংবাদ জিজ্ঞেস্ করিলে—কিন্তু অমলার মুখে থেকে একটা শব্দ বাহির হইল না—দেহের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে খুনী আসামীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কতখানি ব্যথা যে তার বুকে জমে ছিল—তা কত দূর মর্ম্মস্পর্শী ছবি।

অমলা জয়ন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—রেখার প্রাণে তখন দুঃস্বপ্নের স্মৃতি যেন কে জাগিয়ে দিল।

তারপর জগদীশবাবু ডাঃ বোস সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বোস্ সাহেব জীবনের বড় একটা দুঃসংবাদ সহ আজ আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনে অনেক বিপদে পড়েছি—কিন্তু কোন্ দিনও সেসব বিপদকে হৃদয়ে স্থান দেইনি......আজ দেখছি নিয়তির নির্ম্মম উপহাস—বিমলও দেখছি শেষটা শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল—ভগবানের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা আজকে বিপদের পাহাড় চাপা পড়ে প্রাণ হীন হয়ে পড়েছি... বোস সাহেব সংসারে সকল কষ্ট নীরবে সয়েছি কিন্তু এই নূতন সমস্যার মীমাংসার ভার সম্পূর্ণ আপনার হাতে......মান মর্য্যাদা এখন আর জগদীশ চন্দ্রের নেই—আছে মাত্র একটা পিশাচের ছবি।"

জগদীশ বাবুর কথায় ডাঃ বোস খাণিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলিলেন—যদি জানতুম আপনি সুখে আছেন, কিম্বা সুখী হ'বেন তাহ'লে হয়ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম - কিন্তু......তারপর ডাঃ বোস স্পষ্ট দেখিতে পাইল জগদীশবাবুর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেছে। জগদীশবাবু কি যেন বলিতে ছিলেন কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চোখের কোণ থেকে বহিয়া বড় বড় দু'ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—মান মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখ্‌বার মত সাহস আর আমার নেই—টানে বেটানে এই জীবনটা চালিয়ে দিয়ে এসেছি। দু'চার দশমাস একতীর্থে গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসবার ইচ্ছে। অনেক তপস্যায় আপনাদের আশ্রয়ে এসে বিশ বছর যাবৎ বেশ সুখেই ছিলাম, কখনো এভাবে যে চিরকাল কাটাতে পারবো না—তা আমি বেশ বুঝেছি। মনোরমা শাখ্ সিন্দুর বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেছেন আর আমি মর্ত্তে বসে চলার দিনগুলি পাহাড়া দিচ্ছি। অনেক দুখে.........বিমলের কথা মনে হ'লে - পরকালে বসেও আমার বুকের মাঝে যে শেল বাজ্‌বে বোস্ সাহেব! আমি যে সবংশে ধ্বংশ হয়ে গেলাম ....বিমল যে এমনি ধারা লক্ষ্মীছাড়া হবে তা আমি একদিনও মনে স্থান দেইনি। অকৃতজ্ঞ পুত্রের জন্য আর আমি এক মুহূর্ত্ত ও.........ভাববার সময় কোথায়? তবে আর দেরী করে কোনই ফল হ'বে না—এই নিন্ বোস্ সাহেব উইলখানা, আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি—অমলের"—

এই বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাঃ বোস্ পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন—পর্দ্দার আড়াল থেকে জয়ন্তী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"উঃ কি ভয়ানক দুঃখ! দুঃখ পেলেই মানুষ লোকালয় হ'তে সরে পড়্তে চায়—মানুষ কত দুঃখের ঘর পেরিয়ে সংসারের জন্য প্রানপণ চেষ্টা করেও যখন সুখী হ'তে পারে না তখন আপনা হ'তে গ্লানি এসে ভবিষ্যতের সকল গাঢ় অন্ধকার চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখায়"। সে সময় আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল.........

জগদীশ বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া তারপর পাগলের মত চোখের নিমিষে অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা বোস্ সাহেব কলেজে বিমলের খোঁজে লোক পাঠাইলেন—কিন্তু কোনই খোঁজ হইল না।

(৩)

জগতের কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়,—বিমল সভ্য জগতের উজ্জ্বল জীবন প্রবাহ হইতে কতদূর সরিয়া পড়িয়াছে—প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার লোক অনেকই আছে.........সন্ধ্যার সময় একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া বোস্ সাহেবের গেটের সামনে দাঁড়াইল—প্রতিমা ব্যতীত গাড়ীর আরোহীর জন্য কাঁহারো উৎসুক দৃষ্টি ছিল না বস্তুতঃ সে সময় বাসার সকলেই এদিক ওদিক কাজে ব্যস্ত ছিল।

বিমলের-দৃষ্টি কিছু ম্লান ও ব্যথাতুর—তাড়াতাড়ি গেটের নিকট আসিতেই বিমলের চোখ হইতে গোটা কতক অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল প্রতিমাকে গাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া............ ধৈর্য্যের-সীমা অতিক্রম করিয়া—ভালোবাসার গভীরতা হেতু পরস্পর পরস্পরকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া প্রানের আবেগ ঢালিয়া দিল, কোচম্যান গাড়ী হাঁকিল—গাড়ী অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়ী যথাস্থানে পৌছিবা মাত্র—চারুশীলা উচ্চ হাস্য-ধ্বনি করিয়া নবাগত যুবতীকে নিয়া ড্রয়িংরুমের মেঝের উপর বসিয়া হাসি ঠাট্টায় অনেক গল্প গুজবের বৈঠক জমিয়া গেল...... .....

এমন সময় বিমল অতি ধীরে দরজার পর্দ্দা সরাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বৌদি ও প্রতিমার পার্শ্বে বসিল।

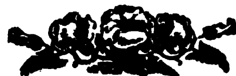
চারু বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল বিমলবাবু—আজ দেখছি একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার করে বসলেন ....বিমল নস্যের কৌটা হ'তে একটিপ নস্য নাকে দিতে দিতে কহিল ....আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে যখন, আপনার বাড়ীতে নেমন্তন করে বেড়াতে নিয়ে এসেছি.........তখনত বৌ'দি এটা যে একটা বড় রকমের রোম্যানটিক ব্যাপার হ'বে তা ত আমি গোড়া থেকে ভেবে আসছি. ......এযে প্রথম থেকে বরফ সরবৎ বিতরণ কচ্ছেন –শেষে কি অর্দ্ধ চন্দ্র অদৃষ্টে আছে নাকি ?

চারু বিমলের কথায় বড় রকমে একগাল হাসি হাসিয়া ফেলিল—তারপর সে প্রতিমার নিকট হইতে ব্যঙ্গ কৌতুকের দু'চারটা কথা আদায় করবার জন্য নানা প্রকার হাস্য ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না।

তারপর বিমল বলিল, বৌ'দি আমার যে কুগ্রহ উপস্থিত হয়েছে - আজ ত দাদাবাবুর নিকট যোড়শোপচারে না হউক দশোপচারে অনেক কথাই শুনতে হ'বে, নয় কি ?

চারুশীলা বলিল—বিমলবাবু তোমার যদি কথা শুনতে ভয় করে তবে এক কাজ কর না কেন ? আজকার রাত্রির জন্য তুমি অন্যত্র চলে যাও......কাল তোমার দাদাবাবু চলে গেল বাসায় এসো।

বিমল চারুশীলার কথাটা সত্য ধরিয়া সে রাত্রির জন্য অন্যত্র চলিয়া গেল।



দৃষ্টিহীনার মর্ম্মকথা

শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

ভাই নীলা—

অন্ধ আমি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি আজ তিন বছর হোল। আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ নিশ্চয় খুবই কিন্তু সত্যিই আজ আমি দৃষ্টিহীনা অভাগিণী; বলবার এতে কিছুই নেই; নিজের অদৃষ্ট দোষে নিজেই ভুগ্‌ছি। জীবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ওপার হ'তে অসীম অনন্ত নিরন্ধ্র আঁধার ব্যগ্র বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমারই জন্যে। কি করে যাবো নীলা? উনিশ বছরের এই তরুণ জীবন যে আজ কেঁদে ফিরছে—ব্যর্থ কাঁদনে। কোন আশাই তো মিট্‌লো না ভাই এ ক'দিনে! জীবনজোড়া এ কি অভিশাপ আজ আমার চারিধারে বল্‌তে পারিস্ নীলা কোন্ সময়ে আমার এ জীবন যাত্রা স্বরু হয়েছিল? কী মহাপাপে আজ আমার এ দুর্দ্দশা ভাই? উঃ পারি না যে আর! নিশিদিন এ কী ব্যথা আজ আমার তরুণ জীবনকে দুর্ব্বহ করে তুলেছে?

জীবনের অবসান হবার আগে তোকে আমার তরুণ প্রাণের বেদন ইতিহাস জানিয়ে যাচ্ছি নীলা। পড়িস্ ভাই—পড়ে দুফোঁটা চোখের জলও ফেলিস্। তোর এই দুর্ভাগিনী বন্ধুর হৃদয়ের বেদনা স্মরণ করে মনে করিস্ এ তোর বন্ধুর শেষ অনুরোধ। আজ চার বছর আগে স্কুল ছাড়িয়ে মা বাবা যে দিন আমায় জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন, সে দিন বিরক্তির তিক্ত রসে মন তখন আমার ভরে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকেই আশা ছিল লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হবো। কিছুই হোল না, উপরন্তু বিয়ে হোল আমার জংলী পাড়াগাঁয়ে। প্রথম প্রথম এম্‌নি রাগ ধর্‌তো নিজের জীবনে যে আজকাল সে গুলো মনে কর্‌লে হাসি পায়।

বিয়ের পর নতুন জীবন যাত্রা স্বরু হোল। বর্ণে গন্ধে ছন্দে ছন্দিত হয়ে জীবনের মধ্যে সেই একটা বছর কিছুতেই ভুল্‌তে পারবো না নীলা। কী মাধুর্য্যই না বছরের সেই প্রত্যেকটী দিন তখন আহরণ করে এনেছিলো! অম্লান বিকশিত ফুলের মতো প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তের স্মৃতি আজও আমার হৃদয় দুয়ারে উজ্জ্বল হয়ে আছে! অণু পরমাণু দিয়ে আজ আমি তাদের অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি—তাদের কি ভুল্‌তে পারা যায়?

স্বামীর সোহাগ প্রেম যে কী বস্তু তা তুই বুঝতে পার্‌বি না নীলা কারণ তোর তো এখনো বিয়ে হয়নি। হবে যখন তখন বুঝ্‌বি কী জিনিষ সে। তাই সেই চিরারাধ্য স্বামীর প্রাণ ঢালা আদর সোহাগে একটী বছর আমার স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। বুঝ্‌লুম না ওরই পেছনে লুকিয়ে আছে অমানিশার গভীর আঁধার—অসহায় এ তরুণী জীবনকে গ্রাস কর্‌বার জন্যে! সেবার পুজোর পর হঠাৎ রোগে পড়্‌লুম; ডাক্তার দেখে বল্লে—শক্ত টাইফয়েড্, বাঁচা দুস্কর।

প্রাণ শিউরে উঠ্‌লো। একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় ভাবনায় মর্‌তে আমি পার্‌বো না। ওঁর প্রেম ওঁর সোহাগ ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমি সুখী হতে পার্‌বো না। ওঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সে যে একেবারেই অসম্ভব! মনে মনে দিনরাত ভগবানের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগ্‌লুম, বল্লুম—হে ঠাকুর এ যাত্রা আমাকে বাঁচিয়ে দাও, মর্‌তে এখন আমি কিছুতেই পার্‌বো না।

এখন কি ভাবি জানিস্ নীলা? ভাবি—তখন ওরকম করে বাঁচবার আকাঙ্খা না কল্লেই হতো।

দুর্ব্বহ এই জীবন কি দরকার ছিলো একে আবার বাঁচিয়ে তুল্‌বার—?

সেরে উঠ্‌লুম ওঁরই প্রাণঢালা সেবা যত্নে। শ্বাশুড়ি বল্লেন—বৌমার আমার কপাল ভালো এর আগে স্বামী সেবা বোধ করি আর কেউ অতো পায়নি—

গর্ব্বে পুলকে বুক আমার ভরে উঠ্‌লো। প্রিয়তম দেবতা আমার তোমার প্রেম ভালবাসা আমাকে যেন অমর করে রাখে। রাত্রে নির্জ্জনে ওঁকে বল্লুম—দেখো সকলে কি বল্‌ছে জানো? বল্‌ছে—তোমার মতো স্ত্রীকে এর আগে কেউ অতো সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারেনি। সত্যিই তাই আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কি দিয়ে যে তোমাকে সন্তুষ্ট করে তুল্‌বো ভেবে পাচ্ছি না—

উত্তরে মিষ্টি হেসে বল্লেন তুমি যে সেরে উঠেছো এইতেই আমি সন্তুষ্ট। শান্তা, এর বেশী আর তো আমি কিছুই চাই না।

বোল্‌ব কি নীলা ওঁর মুখের ওই দুটো মিষ্টি কথা শুনে আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে গেলুম। রোগ থেকে অনেক কষ্টে সেরে তো উঠ্‌লুম, সেই সঙ্গে জন্মের মত হারলুম দৃষ্টিশক্তি, অন্ধ অসহায়া দৃষ্টিহীনা নারী উঃ কী দুর্ব্বিসহ বেদনাময় জীবন! তারই সঙ্গে সঙ্গে হারালুম কি জানিস্ নীলা? স্বামীর প্রাণভরা প্রেম, সোহাগ, শ্বাশুড়ির স্নেহ, যত্ন সমস্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল এই জীবনের ওপর দিয়ে! সেই একটী বছর নীলা মধুময় সেই একটী বছর—আমার জীবন বসন্তের রঙ্গীন্ স্বপ্নের সেই দিন গুলি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে রইল, বঞ্চিতার এই জীবন ইতিহাসের খাতায়—আঁধার এলো ঘনিয়ে, অন্তরে বাহিরে চারিদিকে জমাট্ বেঁধে তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেল্‌বার মতো শক্তি আমার ছিলো না তাই দু'হাত মেলে অন্ধকারকেই আঁকড়ে ধর্‌লুম নিবিড় ভাবে। মাস ছ'য়েকের মধ্যেই এ গৃহে আমারই অধিষ্ঠিত আসনে নূতন গৃহিণী এলো বিদ্যুৎ—আমার সতীন—শুন্‌লাম বিদ্যুতের মতোই সে রূপসী এবং সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিতাও...বিধাতা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে তাই তাকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হোল না। না হোক্ তবু সে যে রূপসী সুন্দরী সেটা নিঃসন্দেহেই বুঝ্‌লাম—কারণ আমার স্বামী তার রূপে মুগ্ধ হয়েই নাকি তাকে বিয়ে করেছেন—। দৃষ্টিহীনা পঙ্গু কুৎসিৎ আমার এই তরুণী জীবন—কি দিয়ে আর তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাখ্‌তে পার্‌বে—? তাই তিনি বিয়ে কর্‌লেন নূতনের মোহে প্রলুব্ধ হয়ে। জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্যও তো একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ—? সুখী হোন্ উনি, সুখী হোক্ বিদ্যুৎ কিন্তু দৃষ্টিহারা বাঞ্চিতার এই যে আর্ত্ত বেদনা সে কি কেউ বুঝ্‌বে না নীলা—? সর্ব্বহারা রিক্ত বেদনায় প্রাণ তার কাঁদবে চিরদিনই? জানি না এ কান্নার নিবারণ কবে হবে?

বিদ্যুৎ এলো হাসি গান গল্পে কাজে কর্ম্মে বাড়ী একেবারে সরগরম করে জাঁকিয়ে তুল্লে; শ্বাশুড়িও মুগ্ধ হয়ে গেলেন তার ব্যবহারে—আর স্বামী? তিনি তো বিভোর হয়ে রইলেন বিদ্যুতের প্রেমে। তার মাঝে তলিয়ে গেলুম আমি দৃষ্টিহীনা অন্ধ নারী কে আর তার কথা ভেবে মাথা ঘামাবে? অনাহত পথের ধূলার মতো পড়ে রইলুম বিজন ঘরের একটী কোনে। হোক্ এই খানেই আমার বঞ্চিতা জীবনের অবসান, মিথ্যা হোক্ তার জীবনের আশা-ভরসা, প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যে জীবন তার ভারবহ হয়ে উঠুক্, কেউ যেন বুঝ্‌তেও না পারে তার ব্যথাতুরা জীবনের রিক্ত বেদনা! নীলা, নীলা জীবনের অবসান আমার কবে হবে রে?

বিদ্যুতের খোকা হোল। শুন্‌লাম প্রস্ফুটিত শতদলের মতোই সে সুন্দর দেখ্‌তে। একটীবার তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার এই তৃষিত জীবন উন্মুখ ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু মিথ্যা—সে আশা বিলীন হয়ে গেল মনের মাঝেই।

বিদ্যুৎকে বল্লুম—তোর খোকাকে আমায় দে বিদ্যুত। দৃষ্টিহারা অন্ধ জীবন যে আমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে ভাই। বিদ্যুৎ হাস্‌লে, বল্লে—তা নাওনা দিদি আমি তো তাহোলে বাঁচি—

খোকাকে বুকে টেনে নিলুম। আমার মরুময়

জীবনে অমিয়ধারা খোকা—তারই জন্যে সুধু আবার আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হোল। শ্বাশুড়ি রাগ কর্ল্লেন, বল্লেন—ও কি ন্যাকামি বড় বৌমা। ওকে বুকে টেনে নিলেই কি ও তোমার হয়ে যাবে? পরের ছেলে কি কখনো আপন হয়? না-না ওসব আমি ভালবাসি না মোটেই—পর! খোকা আমার পর! বেদনায় বুক আমার আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিদ্যুৎকে বল্লুম, নে ভাই তোর খোকাকে ফিরিয়েনে—কি হবে মিথ্যে দু'দিনের জন্যে মায়া করে? বিদ্যুৎ হাস্‌তে লাগ্‌লো, কিছু বল্লে না।

মুখে বিদ্যুৎকে ও কথা বল্লেও মন আমার কেবলই খোকাকে চাইছিল। আমার এ মরুভূমির মতো নীরস বন্ধ্যা জীবন খোকার অমৃতসম স্নেহ-রসের আশায় উন্মুখ তৃষাতুর হয়ে উঠেছিল, খোকাকে ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি? তাই আমারই স্নেহাশ্রয়ের মাঝে খোকা দেড় বছরটী হয়ে, বড় হয়ে উঠ্‌ল। খোকার সেই মিষ্টি আধো আধো বুলি, মা বলে ডাকা আমার বেদনাতুর হৃদয়ে কী অমৃত সিঞ্চনই না করতো। তার উপমা দেওয়া যায় না নীলা। ছেলের মা হবি যখন, বুঝ্‌বি কি মধুর সেই মা বলে ডাকা তবু তবু খোকা সত্যিই আমার ছেলে নয়—বিদ্যুতের। সে আমার সতীন বিদ্যুতের ছেলে। শ্বাশুড়ি মারা গেলেন কার্ত্তিকের মাঝামাঝি। বিদ্যুৎ কাঁদ্‌লে, উনি কাঁদ্‌লেন, আমিও কাঁদ্‌লুম, তবু খোকাকে বুকে করে মাতৃসমা শ্বাশুড়ির মৃত্যুশোক ভুল্‌লাম। বিদ্যুতও ঝেড়ে-ঝুড়ে দু'দিনের মধ্যে উঠে বস্‌ল। স্বামী পুত্রের সংসার তার—তাকেই যে আবার নতুন করে সব দেখ্‌তে-শুন্‌তে হবে।

মাস তিনেক বাদে একটী মৃত সন্তান প্রসব করে বিদ্যুৎ পড়্‌লো শক্ত অসুখে। ডাক্তার দেখে বল্লেন—অত্যধিত দুর্ব্বলতা বশতঃ এ যাত্রা বিদ্যুতের বাঁচা দুষ্কর.. এ কথা শুনে উনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। নয়নের ধ্রুবতারা ওই বিদ্যুৎ, গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিণী—তাকে ছেড়ে থাকা ওঁর পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। জীবনের একান্ত অবেলায় স্বামী সোহাগিনী সতী-লক্ষ্মী বিদ্যুৎ স্বামীর কোলে মাথা রেখে, মৃত্যু-পথে পা বাড়ালে—ওঁকে একেবারে ছন্নছাড়া পাগল করে দিয়ে।

খোকা কাঁদ্‌লো না, দুই হাতে আমাকে আরোও জোরে আঁক্‌ড়ে ধরলো।

বিদ্যুতের মৃত্যুর পর বিদ্যুতের মা এলেন—খোকাকে নিয়ে যেতে, তাকে মানুষ করে তুল্‌তে হবে তো?

খোকাকে ছেড়ে থাকা প্রাণ আমার বেদনায় ভেঙ্গে পড়্‌তে চাইলো। পার্‌বো না, খোকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না! উনি এলেন, কর্কশ কণ্ঠে বল্লেন, দাও খোকাকে দিয়ে দাও। বিদ্যুৎকে খেয়েছো, আবার ওকেও গিল্‌তে চাও নাকি?

প্রলয়ের বজ্র হুঙ্কারে পায়ের নীচে পৃথিবী দুলে উঠ্‌লো! বিদ্যুৎকে আমি খেয়েছি? আর্ত্ত বেদনায় লুটিয়ে পড়্‌লুম। ওঁরই পায়ের তলায় কেঁদে বল্লুম ওগো না না খোকাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌বো না। ভিক্ষা চাইছি আমি—খোকাকে আমার কাছে থাক্‌তে দাও। দৃষ্টিহারা অন্ধ জীবনে খোকাই যে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। দয়া করো তুমি, খোকাকে কেড়ে নিও না।

নিষ্ঠুর পৃথিবী অনুপরমাণু তার কঠিনতায় গড়া। তাই দয়া হোল না, খোকাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা উনি আর খোকার দিদিমা চলে গেলেন সুদূর এলাহাবাদে—

শেষ! আমার জীবনের শেষ আশাটীও চিরতরে নির্ম্মূল হয়ে গেল—বড় আশা করেই তাকে আঁক্‌ড়ে ধরেছিলুম তাই বিধাতার তাও সহ্য হোল না!

বিদ্যুৎ মরে গেছে আমার জীবন বিড়ম্বিত করে দিয়ে। বসে আছি আমি অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি নিয়ে সুদূর ওই ওপার হতে কবে আমার ডাক্ আস্‌বে এই অপেক্ষায়।

জীবনের আর কোন আশা আকাঙ্খা নেই নীলা। ফুরিয়ে গেছে সমস্ত নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে। বেদনার ভারে প্রপীড়িত এই জীবন, এরই বেদন ইতিহাস তোকে জানিয়ে গেলুম নীলা, জীবন বসন্তে ক্ষণিকের জন্যে যে বসন্ত এসেছিল, উৎসব মাধুর্য্যে রঙ্গীন্ হয়ে তারই একটী রেখা আজও আমার মনের মাঝে উজ্জল হয়ে আছে। ব্যস্, ওই প্রথম—ওই শেষ! তার পরেই আঁধার, নিরন্ধ্র গভীর আঁধার।

এখনো মাঝে মাঝে খোকার আধো আধো মা বলে ডাকা কানের কাছে বেজে ওঠে—বাছারে কোথায় আজ তুই? হেথায় যে তোর অভাগিনী মা বসে আছে—শুধু তোরই কচি টুল্‌টুলে মুখখানি স্মরণ করে। ভুলেও কি একবার আস্‌বি না রে?

মরণ বঁধু ডাক্ দিয়েছে—আয় আয় আয় আয়...

চল্লুম নীলা, ভুলিস্‌নি—ওপারের অনন্ত বিশ্রামের জন্যে প্রাণ যে আমার হাঁপিয়ে উঠেছে ভাই...একটু বিশ্রাম।

ইতি, দুর্ভাগনী বন্ধু শান্তা।

সম্পাদকের রায়

বাঙ্গালায় শিক্ষার নমুনা

কানাডার লোকসংখ্যা ৮৭, ৮৮, ৪৮৩। উহাতে ১৯২৪ সালে ১৫৫৪টী খবরের কাগজ ছিল। তন্মধ্যে ১১৯টী দৈনিক, ৬টী সপ্তাহে তিনবার, ৯৪৮টী সাপ্তাহিক, ৩২টী সপ্তাহে দুই বার, ৩৫৭টী মাসিক ৩৪টী বার্ষিক এবং বাকী ৫৮টী অন্য রকম প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ৪, ৬৬, ৯৫, ৫৩৬ অর্থাৎ কানাডার পাঁচ গুণেরও অধিক। বঙ্গে কানাডার মত শিক্ষা বিস্তার হইলে খবরের কাগজও পাঁচগুণ অর্থাৎ ৭৭৭০টী থাকিত। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সালে ছিল মোটে ৬৩২টী।

বঙ্গে অন্নকষ্ট

বঙ্কিমের 'সুজলা সুফলা সস্যশ্যামলা' বাঙ্গালায় আর কিছুর অভাব থাকুক আর নাই থাকুক, অভাব আছে অন্ন ও জলের। নদী-মাতৃক বাঙ্গালার জলকষ্ট আর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্নক্লেশ অধম অকৃতী বঙ্গসন্তানের পাপের ফল! বঙ্কিমের পর ৩০।৪০ বৎসরের ব্যবধানে সোণার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এবার বঙ্গের নানা জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, বাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে লোকের অন্নাভাব ঘটিয়াছে। এরূপ অল্পাধিক পরিমাণে দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়াই আছে। অথচ ভারত গবর্ণমেণ্টের জনৈক মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী বলিতেছেন—ভারতবর্ষে আর দুর্ভিক্ষ হয় না! তিনি সকল বিষয়েই সরকারী খবর যোগাইয়া থাকেন এবং প্রতি বৎসর ভারত সম্বন্ধে একটী বহি বাহির করেন। বর্ত্তমানে যিনি একাজ করেন তাঁহার নাম মিঃ কোটম্যান। সম্প্রতি ১৯২৬-২৭ সালের বহিতে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন :—

"Fortunately one of the grimmest of the spectres, which formerly dogged the Indian agriculturists' footsteps, has now been laid. Famine is no longer the dread menace it used to be......Even the well-marked areas of constant draught are now secure against famine by reason of the extension of well and canal irrigation and facilities for the use of river bed moisture."—*India in 1926-27, P 114.*

অর্থাৎ যে ভীষণ ভূত পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষিজীবিগণের অনুসরণ করিত তাহাকে এখন মন্ত্রমুগ্ধ করা হইয়াছে। আগের মত দুর্ভিক্ষের আর সেই ভীষণতা নাই। যে যে স্থলে অনাবৃষ্টির মুল্লুক বলিয়া প্রসিদ্ধ সে সে স্থলে কূপ ও খাল খনন করিয়া এবং নদীর অভ্যন্তর হইতে জল গ্রহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু

ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি অপরিণত বয়সে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়া তথাকার কোন কলেজের শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি অ্যানি নাম্নী জনৈক মার্কিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীও যুক্তরাজ্যের এক কলেজের শিক্ষয়িত্রী। তিনি

ল্যাটিনে এম্. এ এবং ফরাসী, ইটালিয়ান, স্পেনিস ও জার্ম্মান ভাষায় ব্যুৎপন্না। বর্ত্তমানে তিনি সাগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন

ডাক্তার বসু সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল প্রবাসে যাপন করিয়া তাঁহার বর্ষীয়সী জননীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাত্র ছয় মাসের জন্য বঙ্গজননীর ক্রোড়ে পদার্পণ করিয়াছেন। দেশবাসী সর্ব্বত্র তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থিত করিয়াছে। ডাক্তার বসু আমেরিকা রাজ্যের অভিজ্ঞতার কথা নিবেদনচ্ছলে বলিয়াছেন, "আমেরিকার শিক্ষাদান প্রণালী অতীব সুন্দর। অধ্যাপক ছাত্রের জ্ঞানস্পৃহা এবং স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক। তাহার শিক্ষা সম্পর্কে উচ্চনীচ ও ধনি দরিদ্রের মধ্যে কোনও তারতম্য করা হয় না। সেখানে অন্ধ, মূক ও বধির সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার আছে।"

শ্রীমতী অ্যানি ভারত মহিলার মত সাড়ী পরিধান করেন। এদেশের প্রতি তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। তিনি মিস্ মেয়োর কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, ভারতের জননী আদর্শরূপে সকল দেশে গৃহীত হইতে পারেন।

মেঘনার উপর সেতু

ভৈরব আশুগঞ্জে মিলিত করিয়া মেঘনার উপর একটী পুল নির্ম্মাণের পরামর্শ চলিতেছে। পুল কত খানি উচ্চ হইলে জাহাজ যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে এখন কোনও মীমাংসা হয় নাই।

কচুরি পানা

বাঙ্গালার নদী নালা সকলই কচুরি পানায় ভরিয়া যাইতেছে। খাল, বিলাদিতে নৌকা চলাচল এক-প্রকার বন্ধ বলিলেও চলে। মেঘনা বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নদী। উহার উপর দিয়া প্রত্যহ শত শত জাহাজ নৌকা লক্ষ লক্ষ মানবের পণ্য বহন করিয়া যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সেই বিশাল মেঘনা বক্ষও আজ কচুরি-পানার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছে না। পল্লীগ্রামে কৃষকগণের মুখে শুনিতে পাই কচুরি পানার অন্য নাম 'জার্ম্মনি'। জার্ম্মান সেনা যখন গত ইরোপীয় মহাসমরের সময় ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিপুল মিত্র-বাহিনীর অদম্য শক্তি উলঙ্ঘন পূর্ব্বক চারিদিকে বিভীষিকা ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল সেই সময়ে এই দেশে কচুরি পানার আবির্ভাব হয়। এজন্যই সাধারণ লোকের নিকট ইহার 'জার্ম্মানি' আখ্যা লাভ হয়। যাহা হোক্ দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান সেনা মিত্র সেনার নিকট পরভূত হইয়া বহুদিন হইতে 'good boy' এর মত স্বীয় শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গের উপদ্রব কচুরি-পানা আজিও দিনের পর দিন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া সমুদয় সলিলের বিশাল কলেবরে রক্তচোষা জোঁকের মত উহাকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতেছে। কিন্তু এযাবৎ ব্রিটিশ সিংহের সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই বলিলেও চলে। মানুষ চিরদিন সুখ এবং শান্তির জন্য অর্থ ও দেহত্যাগ করিয়াও শত্রু ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এমন মহাশত্রুর কবল হইতে আজ বঙ্গজননীর উদ্ধার করিবে কে? বাঙ্গালী যদি নিজের বিপদ দূরীকরণে নিজের শক্তি প্রয়োগ না করে তবে আর রক্ষা নাই। অদূর ভবিষ্যতে দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। আজ-কাল যত প্রকার দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আবির্ভাব দেখা যায়, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না। ম্যালেরিয়া এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, সাধারণ জ্বর রোগের আজকাল আর সুচিকিৎসা হয় না, বসন্ত, কলেরার আর কালা-কাল নাই, ইনফ্লুয়েঞ্জা, উদরাময় বাঙ্গালীর পরিবার ভুক্ত। আমাদের মনে হয় কচুরি জনিত আবর্জ্জনাই এ সকল রোগের মূল। যদি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য Prevention is better than cure একথার

যথার্থ্য স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বরোগের মূল কচুরি-পানার ধ্বংস অচিরে আবশ্যক। পল্লীগ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলেও মফঃস্বলের সহরগুলিও ঐ দারুণ দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।

আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড লোক্যালবোর্ডের সাহায্যে প্রজাকে আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। ইউনিয়ণবোর্ড গুলিতে আজকাল প্রচুর আয় হইতেছে, শুনা যায় সেই আয় হইতে স্থানীয় ইউনিয়নের জলকষ্ট নিবারণ রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কার, কূপ খনন প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু এ যাবৎ সর্ব্বত্র এ সকল বিষয়ে বিশেষ ঔদাস্য দেখা যাইতেছে। সহরের মিউনিসিপ্যালিটী গুলি যদি বার্ষিক আয়ের টাকা হইতে অপ্রয়োজনীয় বা অল্পপ্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য এক বৎসর অর্থ ব্যয় না করিয়া জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করেন এবং আবশ্যক বোধে স্থানীয় জমিদারগণকে উৎসাহিত ও বাধ্য করেন তাহা হইলে সহর হইতে কচুরি দানবের নির্ব্বাসন অবশ্যম্ভাবী। পল্লীগ্রামেও সেইরূপে জন-সাধারণকে সাহায্যে ও উৎসাহিত করিয়া এবং আবশ্যক হইলে বাধ্য করিয়া নিজ নিজ অধিকারভুক্ত স্থানগুলির সংস্কার করাইলে দেশের কল্যাণ সুনিশ্চিত। আমরা জানি এ সকল চীৎকার অরণ্যে রোদন মাত্র। 'কার বা গোয়াল কেবা দিবে ধুয়া!" বাঙ্গালী, এখনও সাবধান হও, আর আত্মবিনাশ করিওনা, বৃথা আত্মকলহে স্বীয় শক্তির আর অপব্যবহার করিও না, যাহাতে ভাই ভাই প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সকলে সমবেত ভাবে শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ছোট বড়, উচ্চ নীচ ভুলিয়া সুখে ও শান্তিতে গণাদিন কয়টা কাটাইতে পার তজ্জন্য যত্নবান্ হও। মনে রাখিও, সুপ্ত, তোমার মুখে কেহ অন্ন তুলিয়া দিবেনা—নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ। সুতরাং আত্মশক্তি দ্বারা নিজকে বাচাইতে চেষ্টা কর—কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা! মনে রাখিও—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

অভাব ও স্বভাব

শ্রীসারদাচরণ রায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ

অভাব কহিছে ডাকি স্বভাবেরে 'ভাই'
দাস তুই চিরকাল, মোর দুখ তাই
আমি যবে নৃত্য করি, তোর মৃত্যু হয়
অভাবে স্বভাব নষ্ট, মিথ্যা কভু নয়।
শত্রু ভাবি মোরে তাই, তোর দাস যত
আঁখি জলে ভাসে সদা নরনারী কত
স্বভাব অমনি হানে, বিদ্রূপের আঁখি
মরণের দাস তুমি, দেরী কত বাকী।
গরীবের কুঁড়ে ঘরে, বিরাজিছ নিতি
ধনীর দুয়ারে তুমি লভিছ যে ভীতি
যুগে যুগে তোমা লাগি, বিদ্রোহের গান
মানীরে কাঁদাও তুমি, রাখো নাকো মান
কেন তুমি বেঁচে আছ, অপমান সাথে
আমারে করিও সাথী, দুর্দ্দিনের রাতে।'

বীণার নিবেদন

আগামী ১লা আশ্বিন "বীণা" চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবে। বীণা শৈশবে নিতান্ত সহায়হীন হইলেও সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের অনুকম্পায় আজ উহার তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকাগণের সহানুভূতি হইতে 'বীণা' আগামী বর্ষেও বঞ্চিত হইবে না।

'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। 'বীণা'র প্রচার দ্বারা আমরা লাভবান্ হইব এ আশা আমরা কখনও করি নাই, এখনও করি না। সৎসাহিত্যের প্রচার, বিশেষতঃ স্থানীয় ছোট বড় সকল সাহিত্যিক-গণের হৃদয়ে সাহিত্য-চর্চ্চার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র হইতেই বৃহতের উৎপত্তি, যিনি আজ নগণ্য বা অজ্ঞাত লেখক, কালে তিনি একজন সুসাহিত্যিক হইতে পারেন। কিন্তু সুযোগ অভাবে কত সুপুষ্প না জানি কালের মরু-কান্তারে কোথায় হারাইয়া যায়। যদি আমাদের প্রচেষ্টায় সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয় তাহা হইলে আমদের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে মনে করিব।

কলিকাতা হইতে প্রচারিত দুই চারি খান বা শত দুই শত সাহিত্যিক পত্রে আট কোটী বাঙ্গালীর সাহিত্য-তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। সাময়িক পত্র লোকশিক্ষার প্রথম উপাদান। জেলায় ২, মহকুমায় মহকুমায়,এমন কি পল্লীতে পল্লীতে সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ও প্রচার হইতে পারিলে বাঙ্গালায় প্রকৃত লোকশিক্ষা হইবে। ফলে, পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রধান ২ সাময়িক পত্রগুলির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং ক্রমে ২ দেশের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণা আজ বঙ্গবাসীর দ্বারে অতিথি। অতিথির সৎকার করিতে বাঙ্গালী জানে।

বীণা পত্রিকাখানি ছোট হইলেও ইহার একটী বিশেষত্ব আছে—এই সম্বন্ধে অনেক পাঠক-পাঠিকা-বর্গের নিকট হইতে অনেক প্রকার লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। অক্ষমতা দরুণ যে সকল ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহাও আমরা অবগত আছি। প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পত্রিকা চালান যে কতদূর কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য তাহা আমরা এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

বীণার বয়স মোটে তিন বৎসর এবং ইহার প্রায় অনেক লেখক ও লেখিকারাও অল্পদিন যাবৎ লেখনী ধরিয়াছেন, তাই তাহাদের লেখাতে অন্যায় বা অসঙ্গতি থাকাটা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকাদের রচনা দ্বারাই যে বীণা পূর্ণ থাকিবে আর নূতন লেখকেরা রচনা স্থান পাইবে না এইরূপ সংকীর্ণতা যেন আমাদের মনে কখনও না আসে। এইজন্য এই তিন বৎসর যাবৎ আমরা যে কত গালমন্দ পাইতেছি এবং যদি ভবিষ্যতেও এইজন্যই পাইতে হয় তবু দুঃখ নাই বরং মনে একটা অপরিসীম তৃপ্তি আসিবে যে অখ্যাত লেখক লেখিকারা বীণা দ্বারাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটু পরিচিত হইবার সুবিধা লাভ করিলেন।

নূতন লেখকদের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের ইহা মস্ত অভিশাপ যে, কলিকাতার নামজাদা কাগজে লিখিবার বড় একটা সুবিধা বা সুযোগ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

বীণার দাবী সামান্য। এবার 'বীণা' বার্ষিক সডাক ২৷৷০ আড়াই টাকায় আত্মবিক্রয় করিতেছে। কারণ, 'বীণা' জানে বাঙ্গালীর ধনভাণ্ডার অটুট নহে। তাই 'অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা' করিয়াছে।

আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বীণার দাবী পূর্ণ করিয়া উহার মঙ্গল কামনা করিবেন। বর্ষ শেষে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।